শওকত ওসমান

উপন্যাস সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাগম
রাজা উপাখ্যান
জাহান্নম হইতে বিদায়
দুই সৈনিক
রাজসাক্ষী
পিতৃপুরুষের পাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ওসমান এটি লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতা: শেখ মোহম্মদ এহিয়া, মাতা: গুলেজান বেগম। জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯১৭, পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খনাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে। পাড়ার নাম মেহেদি-মহল্লা।

গ্রামের মাদ্রাসার লেখা-পড়া শেষে ১৯২৯-এ ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়ায়। ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ.পাস করেন। এখান থেকেই বি.এ পাস ১৯৩৬ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বাংলায় এম.এ. ১৯৪১ সালে।

ছাত্র জীবনেই বিয়ে করেন হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনকে ১৯৩৮ সালের ৬ই মে।

১৯৪১ সালে কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। দেশ-বিভাগের পর অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করে অপশান দিয়ে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কমার্স কলেজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে দুই বাংলায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটায় তাঁর পুরো পরিবার চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তখন থেকে চট্টগ্রামে ৩৪বি চন্দনপুরায় বসবাস করেছেন। ১৯৫৯-এ ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসেন এবং পূর্বে মোমেনবাগে কেনা জায়গায় বাড়ি করেন এবং আমৃত্যু ৭৪ মোমেনবাগে কাটিয়ে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময় কাটান কলকাতায়।

১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করেন, লেখায় পুরো সময় দেবেন বলে।

১৯৭৫-এ ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ভীষণ মনোকষ্টে ভোগেন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ফিরে আসেন ১৯৮১ সালে।
ভ্রমণ করেছেন নানা দেশ : পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক ও ইরান।

১৯৯৮-এ ২৯-এ মার্চ হঠাৎ সেরিব্রাল এ্যাটাকে আক্রান্ত হন। ১৪ই মে সকাল ৭-৪০ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। প্রথম কিছুদিন লেখেন কবিতা। পরে আসেন গদ্যে। নিরন্তর লিখে গেছেন, নাটক, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস-রচনা, রাজনৈতিক লেখা, শিশুতোষ রচনা, এমন কি কাব্য রচনাও করেছেন ব্যঙ্গ আকারে। অনুবাদও করেছেন প্রচুর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন। বাংলা একাডেমী, স্বাধীনতা ও একুশে পদকসহ পেয়েছেন দেশের সব পুরস্কার ও পদক। তাঁর 'জননী', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'রাজসাক্ষী' ও 'জলাংগী' উপন্যাসসহ বেশ কিছু ছোটগল্পের সংকলন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

তাঁর পরিবারের সব সদস্যই শিল্পী। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুলবন ওসমান সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্স্টিটিউটের শিল্পকলার ইতিহাসের প্রফেসর। মধ্যম পুত্র আসফাক ওসমান মৃৎশিল্প-শিল্পী। তৃতীয় সন্তান ইয়াফেস্ ওসমান স্থপতি। কনিষ্ঠ পুত্র জাঁনেসার ওসমান চলচ্চিত্র নির্মাতা।

ISBN 984-458-243-1
9789844582439

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই–

উপন্যাস

জননী
ক্রীতদাসের হাসি
বণী আদম
জাহান্নম হইতে বিদায়
উপন্যাসসমগ্র ১
উপন্যাসসমগ্র ২
উপন্যাসসমগ্র ৩
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র

গল্পগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠগল্প
গল্পসমগ্র
পিঁজরাপোল
ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী

মুক্তিযুদ্ধ

কালরাত্রি খণ্ডচিত্র
১৯৭১ : স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর

স্মৃতিকথা/আত্মকথা

রাহনামা ১
রাহনামা ২
উত্তরপর্ব মুজিবনগর

কিশোরসাহিত্য

কিশোরসমগ্র ১
কিশোরসমগ্র ২

অন্যান্য

হন্তারক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ওসমান

উপন্যাস সমগ্র

২

সময় প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসসমগ্র ২
শওকত ওসমান

তৃতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০১

সময়
সময় ২৪৩

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

উপন্যাস অলংকরণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

UPANYASHSAMAGARA-2 by Shaukat Osman. First Published: Bookfair 2001. 3rd Print: October 2012 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan. 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 500.00 Only

ISBN 984-458-243-1 Code : 243

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বাবার উপন্যাসসমগ্রের প্রথম খণ্ডটি লেখার ক্রম অনুযায়ী চারটি উপন্যাসে বিধৃত। উপন্যাসগুলো হলো বণি আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি ও চৌরসন্ধি।

এটি প্রকাশের পর স্বাভাবিকভাবে আসছে দ্বিতীয় খণ্ডটি। এই খণ্ডে থাকছে মোট ছ'টি উপন্যাস : সমাগম ও রাজা উপাখ্যান ষাটের দশকে লেখা, পরের রচনা দুটি যথাক্রমে জাহান্নম হইতে বিদায় ও নেকড়ে অরণ্য ১৯৭০ ও '৭১ সালের রচনা। পরের দু'টি উপন্যাস রাজসাক্ষী ও পিতৃপুরুষের পাপ মধ্য-আশির দশকে লেখা।

ষাটের দশকে বাবার সৃষ্টিশীলতা ছিল প্রবল। বিশেষ করে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রটি। এই সময় ক্রীতদাসের হাসি, চৌরসন্ধির পর তিনি রচনা করেন সমাগম ও রাজা উপাখ্যান।

সময়টি সামরিক আইনের শাসনকাল।

১৯৫৮ সালে আয়ুব খান গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে।

পরে উপহার দেয় মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক শাসনপদ্ধতি। যেখানে পাকিস্তানের দুই অংশে মোট আশি হাজার সদস্য নির্বাচিত হবে। এরা স্থানীয় শাসন চালাবে— আর নির্বাচিত করবে প্রেসিডেন্ট।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রগতিশীল আন্দোলন প্রবলভাবে বাধা পায়। বিশেষ করে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ধর-পাকড় শুরু হয়ে যায়। অনেক হিন্দু-কমিউনিস্ট কর্মী দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে যান। যাঁদের অনেকে আর কোনোদিন দেশে ফেরেননি। যেমন চট্টগ্রামে আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন শ্রী গোপাল বিশ্বাস, যিনি ছিলেন সাহিত্যিক ও চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি-কর্মী, যাঁর ছোটগল্প তখন কলকাতার নতুন সাহিত্য পত্রিকায়ও ছাপা হতো... তিনি যে গেলেন তারপর আর দেশে ফেরেননি। তিনি বর্তমানে সপরিবারে হুগলীর শ্রীরামপুরে বসবাস করছেন। এ-রকম অনেকেই চলে গেছেন আর ফেরেননি।

বাবা যখন সমাগম উপন্যাসটি রচনা করছেন তখন তিনি ঢাকায় এবং নিজের তৈরি ঘরে। এই বাংলায় নিজের একটা আবাস করে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলেন, কিন্তু চট্টগ্রামে তাঁর এক যুগের মতো অবস্থানের কথা কখনো ভুলতে পারেননি। তিনি বলতেন... চট্টগ্রাম আমার দ্বিতীয় বাড়ি। এ-ক্ষেত্রে প্রথম বাড়ি ঢাকা নয় হুগলীর সাবলসিংহপুর গ্রামের বাড়ি। অর্থাৎ ক্রম অনুযায়ী ঢাকা ছিল তাঁর শেষ বা তৃতীয় গৃহ।

সমাগম উপন্যাসটি সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত মাসিক 'সমকাল'-এ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। তখনি যথেষ্ট আলোচিত হয় এর গঠন ও চিন্তার ক্ষেত্রটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় তিনি নানা আকারে তৎকালীন বদ্ধ চিন্তার জগতকে আন্দোলিত করতে চেয়েছেন। সমাগমে সেই সব মনীষীদের এনেছেন যাঁরা মানবতার জয়গান গেয়েছেন এবং স্বৈরাচারকে নিন্দা করেছেন এবং রীতিমতো লড়াই করেছেন।

সমাগমকে একটি অন্তর্লিন নাট্য-কাঠামোর মধ্যে রেখে সাজিয়েছেন, তাই এটির শিল্পরূপ সব সময় বজায় থেকেছে। চিত্ররূপ পোস্টারে পর্যবসিত হয়নি।

চট্টগ্রামে বসবাস করার প্রভাব এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিধৃত। মাঝেমাঝে চাটগাঁর আঞ্চলিক ভাষা এসে গেছে। যেমন নিজ ছেলেকে কাহিনী বয়ানকারি জুহা বলছে ফুয়া। চট্টগ্রামে ফুয়া মানে ছেলে।

এই জুহা একজন সাংবাদিক ও পত্রিকার অনুবাদক। পুরো উপন্যাসে জুহা নিজে থেকে কোন তর্কে যোগ দেয়নি। এভাবে লেখক শওকত ওসমান নিজেকে সব কিছু থেকে দূরে রেখেছেন। কিন্তু জুহার স্ত্রীকে আবার করেছেন যথেষ্ট বুদ্ধিমতী যদিও উচ্চ শিক্ষিত বলতে যা বোঝায় জাইদুন চরিত্র তা নয়।

জুহার মাধ্যমে লেখকের চট্টগ্রাম-প্রীতির আরো বড় প্রমাণ কবি আলাওল।

জুহার চাকর আলি চরিত্রটি একেবারেই বাস্তব থেকে নেয়া— আমরা যখন চট্টগ্রাম থেকে ১৯৬০ সালে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি তখন আমাদের বাসার কাজের ছেলেটির নাম ছিল আলি এবং সে-ও চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে ঢাকা হিজরত করে। এ-ভাবে আমাদের পারিবারিক পরিবেশ ও চরিত্ররা ঘুরে ফিরে এসেছে। এসেছে পাড়া-প্রতিবেশি ও বাবার বন্ধু-বান্ধবগণ। যেমন তেছোদিন চরিত্রটিকে খুব সহজে চেনা যায়— প্রয়াত কবি-সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিন।

আমাদের বাড়ির বাগানের পরিবেশটি একেবারে আক্ষরিক। কাহিনীর সূত্রপাত একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। বাসার চাকর আলি বাগানে একটা চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে। বেশ ময়লা। পুরোনো চিঠি বলে মনে হয়।

"জুহা দেখে পরিষ্কার তুলট কাগজ। ...প্রায় তিন শ' বছর আগেকার তুলট কাগজ। ... শেষ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করল জুহা অনেক ধস্তাধস্তির পর :

বিসমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।
অতঃপর নিবেদিত সালাম আলেকম॥

খাহেস হৈল তাহে মুসাফির হৈয়ে।
পৌছাইমু একা একা তুস্কার আলয়ে॥

মুনশী করিমে দেহ কুশল-খবর।
নেকনাম নেককাম পুত্র-বরাবর॥
দোওয়া খায়ের মাঙ্গি তুস্কার কারণে।
রোসাঙ্গের হীন কবি আলাওল ভনে॥

বিস্ময়ে আনন্দে জুহা চিৎকার করে উঠেছিল : মধ্যযুগের মহাকবি আলাওল!....
জুহা অজানিতে বারবার আবৃত্তি করতে থাকে :

বাক্য-সুত দিয়া যেন বান্ধয় পবন।
তাহার মরম জানে সেই মহাজন॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...কথার সুতো দিয়ে যে-মহাজন বাতাসকে বাঁধতে পারে, সেই শুধু তার মর্ম বোঝে।"

জুহা এরপর তার স্ত্রী জাইদুনকে ডেকে জানায়— "তিনি আসছেন। জানো কোথায়? এই বাড়িতে— তোমার এই বাড়িতে।"

"...তিনি আবার মুনশী আবদুল করিম অর্থাৎ সাহিত্যবিশারদকে খবর দিতে বলেছেন।"

কাহিনীতে কিন্তু আমরা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের উপস্থিতি দেখিনি। যে-সব কবি-সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করা হবে আলাওলের আগমন উপলক্ষে তার মধ্যে আমন্ত্রণের জন্যে জুহা বলছে, 'আচ্ছা, মেয়েদের মধ্যে কাকে ডাকি? কবি চন্দ্রাবতীকে?

না। আমার প্রস্তাব বেগম রোকেয়াকে ডাকা যাক।' জাইদুনের প্রস্তাব।

কিন্তু কাহিনীতে আমরা রোকেয়াকেও পাইনি। কেন এঁরা থাকলেন না বোঝা গেল না।

আলাওলের আগমন উপলক্ষে জুহার বাড়িতে যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয় তাঁরা হলেন মাইকেল মধুসূদন, বার্নার্ড শ', রমা রলাঁ, বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মহসীন, আর সব শেষে এবং কাহিনীর শেষ পর্যায়ে আসে রবীন্দ্রনাথ ও লিও টলস্টয়। তাঁরা যেন এসেছেন কাহিনীর সমাপ্তি টানতে।

কবি আলাওলকে দিয়ে মহাকবিদের সম্মিলনের প্রস্তাবনা টানা হয়। কবি আলাওলের জবানিতে পাঠান কবি খুশহাল খান খটকের কথাও আসে। সেই পশতু কবির কবিতা আবৃত্তি করেন কবি আলাওল। যিনি কবিকে একজন যোদ্ধা মনে করেন। খুশহাল খানের একটি কবিতা :

রোখ্ না ফর্দ্ মুলক্ পে খুনা কিস্
মারান দি।
চে মারান্ দখুনে যেত্রা খুর্বা গাদাম॥

পর দেশলোভী যারা, তারা অহিপ্রায়।
সর্প-পূর্ণ গৃহ-বাসে আরাম কোথায়?

এই কবি আরো বলেছেন,
সন্ধি হয় যদি— সেই শ্রেয়তর।
কেবা চায় যুদ্ধের রণন॥
সন্ধি-সমঝোতা জীবনেরই কথা।
তেগ্ তীরে কিবা প্রয়োজন॥

কবি আলাওল শ' ও রলাঁর দিকে বিশেষভাবে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "য়ুরোপের বন্ধু, এই হচ্ছে প্রাচ্যের কবি। দেহে মনে যোদ্ধা, ...সমস্ত পার্বত্য এলাকায় খুশহাল খটক আজও রূপকথার নায়ক।"

পাঠানদের প্রতি বাবার কেন জানি একটা টান ছিল। আমরা যখন চট্টগ্রামে, একবার দেখেছি পাকিস্তান ঘুরে এসে তিনি পাঠানদের খয়েরি রঙের ফুলশার্ট আর সালোয়ার পরতে শুরু করেন। আর পায়ে কাবলি স্যান্ডেল ত ছিলই। এই কাবলি স্যান্ডেল তিনি পশ্চিমবঙ্গেও পরতেন। তাঁর সেই যৌবনে ঝাঁকড়া চুলের সঙ্গে কাবলি পোশাক খুব মানাত। খান ওয়ালি খান আর তাঁর ছোট ভাই গনি খানের সঙ্গে বাবার খুব সুসম্পর্ক ছিল। এঁদের প্রতি টানের কারণ হয়ত এঁরাও ছিলেন পাকিস্তানে নির্যাতিত। শুধু পাকিস্তান আমল কেন বৃটিশ আমলেও এঁরা সব ইংরেজের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে লড়ে গেছেন। স্বাধীনতার চয়ে বড় কিছু এদের কাছে ছিল না। আর বাঙালিদেরও স্বাধীনতা ছিল একমাত্র কামনা।

শুধু মাত্র স্বাধীনতা নয়, মানুষের সামগ্রিক মুক্তির জন্যে যে-চিন্তা তারই ফসল এই উপন্যাসটি।

যদিও এই পুস্তকে লেখক বার্নাড শ'-এর যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর বাহাদুরিটুকুও স্বীকার করেছেন। আর মার্শাল ল-র অধীনে থেকে বার্নাড শ'-র আর্মস এ্যান্ড দ্যা ম্যান নাটক থেকে বলতে পেরেছেন, Nine soldiers out of ten are born fools. দশজন সিপায়ের মধ্যে নয়জন জন্ম-নাদান।

কাহিনীর শেষাংশে এসে সবাই আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের কথায় এসে জড় হয়েছেন।

"মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক।"

আর টলস্টয় বলেছেন, Down with war the most stupid institution of mankind.

"আকাশের শুকতারা নিভে গেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তের আলো ভেসে আসছে ধীর স্রোতের মতো।

শূন্যে হেঁটে চলেছেন তাঁরা একটু আগে যাঁরা ছিলেন এখানে মাটির মানব-রূপে। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় পাশাপাশি, পেছনে শ' ও অন্যানেরা।

সিন্দুর রঞ্জিত নবারুণ।

নিমেষে আলোর যাত্রীরা আলোয় মিশে গেল।

সমাগমের সমাপ্তি।

AMARBOI.COM

সাহিত্যিক শওকত ওসমানের দার্শনিক স্ট্যান্ডটি এই পুস্তকে সূর্যালোকের মতো পরিষ্কার। পাঠককে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই।

রাজা উপাখ্যান উপন্যাসটির কাঠামোটি ক্রীতদাসের হাসির সঙ্গে কিছুটা মেলে। প্রথমে একটি উপক্রমনিকা আছে। এই উপক্রমনিকা শাহ্‌নামা মহাকাব্য রচয়িতা কবি ফিরদৌসীকে নিয়ে। কবি গজনি থেকে প্রাণ-ভয়ে পালাচ্ছেন। তাঁর পেছনে সুলতান মাহ্‌মুদের চরেরা লেগে গেছে। ধরতে পারলে নির্ঘাত মৃত্যু। ফিরদৌসী একটি গর্হিত কাজ করে ফেলেছেন, বাদশাহ সম্বন্ধে উক্তি করেছেন, 'সুলতান তো সুলতান নয়। বাঁদীর বাচ্চা।' একজন নির্বিত্ত আশ্রিতের কাছ থেকে এমন গালি খাওয়ার পর কোন ব্যক্তির রক্ত ঠাণ্ডা থাকবে?

যখন কবি পলায়নরত আমরা তাঁর পিঠে গাঁঠরীর খোঁজ পাই। তার মধ্যে আছে তার লেখা-পড়ার সরঞ্জাম।

এই কবি তাঁর তুষ গ্রামের কথা ভাবছেন। যে-গ্রাম তাঁকে বুকে ধারণ করেছে। এখান থেকেই তিনি রাজকবি হয়েছেন।... কিন্তু দরবার জৌলুষের দাম জানে, প্রতিশ্রুতির মূল্য বোঝে না। অর্থাৎ সুলতান ফিরদৌসীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

"শাহ্‌নামার শেষ অংশ সুলতান মাহ্‌মুদের গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পেরেছিলেন বলে নতুন অধ্যায় যোগ করে আসতে পেরেছেন। কিন্তু প্রাণ-ভীতিময় দ্রুততার মধ্যে আর যা লেখার বাসনা না ছিল, তা আর মেটেনি।

আফ্‌শোষ বিহ্বল চিত্তেই ফিরদৌসী দিগ্বলয়ের চক্ররেখায় নিবদ্ধ-দৃষ্টি অবলোকন করেন : শাহ্‌নামার সম্রাট জাহ্‌হকের কাহিনীর সারি সারি অন্যান্য ছায়া-চিত্রাবলী যা বিশ্ববাসীর জন্যে তিনি কথায় অঙ্কিত করে যেতে পারেননি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপক্রমণিকাটি এইখানে সমাপ্ত। আর পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কবি ফিরদৌসীর চিন্তার চিত্রটি শওকত ওসমান অনুবাদ করেছেন রাজা-উপাখ্যানে। আর শাহ্‌নামা কথার অর্থ তো রাজা-উপাখ্যানই।

রাজা উপাখ্যানের প্রথম অধ্যায় শুরু হচ্ছে একদল কয়েদিকে পাহারাদার নিয়ে যাচ্ছে— এই চিত্র দিয়ে। শান্ত্রীরা তাদের সুখ-দুখের আলাপ করতে করতে চলেছে। এই কয়েদিরা হলো একদল তরুণ যুবক-যুবতী। এই কয়েদিদের মধ্যে এক যুবক নাম হরমুজ শান্ত্রীদের জিজ্ঞেস করে তাদের কেন কয়েদ করা হচ্ছে।

শান্ত্রীর জবাব— তা কি আমি জানি?

"এ তো আজব ব্যাপার। একটা কাজ আপনারা করছেন, অথচ জানবেন না, কেন করছেন?'

শান্ত্রীরা জানায় রাজা জাহ্‌কের হুকুম যুবক শ্রেণীর লোকদের কয়েদ করা, তারা তাই করছে। কিন্তু তাদের মনেও প্রশ্ন জাগে, তাই তো তারা কেন এ-কাজ করছে কোনদিন জানতে চায়নি কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই প্রশ্নের জবাব পাই।

সম্রাট জাহ্‌কের বিরাট প্রাসাদ-শীর্ষে বাদ্‌শাজাদি গুলশান থাকে। রাজকুমারী চলেছে বাবার দর্শনে।

"সে জানে বৈকি, তার পিতা অভিশপ্ত। কিন্তু এমন দুর্বিপাকে পড়ার পর আর সম্রাটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

সাবেক দৈববাণী বাদশাজাদির কর্ণপট ছিঁড়ে ফেলতে লাগল : "শোন জাহ্‌ক, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার দুই কাঁধ আজ থেকে দুই কৃষ্ণ-গোক্ষুর পেঁচিয়ে বসে থাকবে। তোমাকে সর্পদ্বয় দংশন করবে না। কিন্তু প্রতিদিন তাদের আহার তোমাকে যোগাতে হবে। আর সেই রসদ কি জানো? বিশ তিরিশ জন তরুণ, তরুণী অথবা জ্ঞানের আলোকে সরস বৃদ্ধের মগজ, তরুণের মগজ অপেক্ষা তা টাটকা— এমন মগজ। যত দিন এই রসদ যোগাতে পারবে, ততদিন তুমি বাঁচবে। নচেৎ যেদিন খোরাকের অভাব ঘটবে, সেদিনই গোক্ষুরদ্বয় তোমার মাথার খুলি ভেঙে তার ঘিলু আহার করবে। সেদিনই তোমার মৃত্যু। মনে রেখো।"

এ-ভাবে আমরা জানতে পারি কেন রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের কয়েদ করা হয়।

গুলশান বাবাকে দেখতে যায়। সাপদ্বয় তাকে ফোঁস ফোঁস করে ভয় দেখায়। রাজাও কন্যাকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেন।

প্রাসাদের কাছেই একটা কয়েদখানা আছে। বাদশাজাদি এই কয়েদখানায় গিয়ে হরমুজের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং তাকে মুক্ত করে দেবার কথা বলে। কিন্তু হরমুজ তার সঙ্গীদের না নিয়ে একা একা ফেরত যাবে না। তখন বাদশাজাদি তার বাবার অভিশাপের কথা জানায়।

রাজা জাহ্‌ক কি কারণে অভিশপ্ত এর পটভূমি লেখক কোথাও ব্যক্ত করেন নি। এবং এই ব্যাপারে অনেক পাঠকই প্রশ্ন তুলেছেন। এর একটি পরোক্ষ জবাব আছে যা হরমুজের একটি উক্তি থেকে জানা যায়।

বাদশাজাদি যখন বলে তার বাবা অভিশপ্ত— তখন হরমুজ এবার নিজের মনেই উচ্চারণ করে যায়, "অভিশপ্ত, নরহত্যার পাপ।..."

এর মধ্যে পৃথিবীর সকল রাজার পাপের কথা বলা হয়ে যায়। রাজারা যখন তখন নিজেদের খুশি মতো নরহত্যা করে, সুতরাং এই একটি পাপের জন্যে রাজারা অভিশপ্ত হতেই পারে। এই একটি ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোন সূত্র এই উপন্যাসে বিধৃত নেই।

AMARBOI.COM

এই ঘটনা জানার পর হরমুজ বলে, "আমি দুই সাপ ধ্বংস করব। বাদশা শাপমুক্ত হবেন।"

এবং একদিন হরমুজের কৌশলে দুই সাপ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে দু'জনই মারা যায়।

রাজা জাহ্হক জানতে চায় কোন মন্ত্রে সাপ দুটি মারা যায়।

তখন হরমুজ তার ছেলেবেলায় দেখা এক সন্ন্যাসীর কথা বলে। যে বলেছিল, "লোভ করো না।" আরো বলেছিল, "যখন লোভ করবে, তা গোটা রাজ্যের সকলের জন্যে করবে। তাহলে লোভ আর লোভ থাকবে না। কিন্তু একার লোভ থেকে জন্মায় ঈর্ষা, হিংসা, আর তা থেকে আসে ধ্বংস।"

এই কথার গূঢ় রহস্য ধরেই হরমুজ এক সাপকে দিত কিছু বেশি ঘিলু অন্যটাকে কম খেতে দিত। ...এভাবে ওদের মধ্যে রেষারেষি শুরু হলো... তারপর একদিন যুদ্ধ ও মৃত্যু।

রাজা জাহ্হক হরমুজকে গুলশানের সঙ্গে বিয়ে দেবার ঘোষণা দেয়, কিন্তু হরমুজ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আর এক কয়েদি তরুণী লুতকে বিয়ে করার কথা জানায়।

বাদশা তখন হরমুজের মা-বাপকে আনিয়ে বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে ধুম-ধামের সঙ্গে উৎসব সম্পন্ন করে।

শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি হরমুজও লুতের বিদায় কাফেলা চলেছে।

"একাকী বাদশাজাদি গুলশান প্রাসাদ-শীর্ষে দাঁড়িয়ে, কাফেলার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে। প্রায় অপলক নেত্র।

আর কয়েক পল মাত্র।

কাফেলার শেষ বিন্দু পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাঁকের আড়াল হয়ে গেল।"

বাদশাজাদি গুলশানের জন্যে সবার মনই ভারাক্রান্ত হবে।

পৃথিবীতে সকল সংঘাতের মূল অশীদারিত্ব নিয়ে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার সময় একটি পোস্টার বের করেছিল যার ক্যাপশান ছিল : সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

এই পোস্টারে ছিল একটি পরিসংখ্যান। তাতে দেখান হয়েছিল পাকিস্তানের দুই অংশে কে কতটা রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ পায়।

স্বাভাবিকভাবেই তাতে পূর্ব অংশের ভাগে সবই ছিল কম। এবং এখান থেকেই আমরা পাই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মূল সূত্রটি। আর এর পরিণতি স্বাধীনতা যুদ্ধ। এবং দুই সাপ-রূপী পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্ম।

এই উপন্যাসেও আর্মিদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি উক্তি আছে। আর্মিরা জানে না যুবক-যুবতীদের তারা কেন কয়েদ করছে। সমাগমে আমরা বার্নাড শ'-র আমর্স এ্যান্ড দ্য ম্যান নাটকে বক্তব্য পেয়েছি যে দশজন সৈনিকের মধ্যে ন'জনই জন্ম-নাদান। তাই তারা কোন কাজের প্রশ্ন তোলে না। এই উপন্যাসে তাই ভাবগত একটা অন্বয় অনেকাংশে পাওয়া যায়।

'জাহান্নম হইতে বিদায়' ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরের দিকে কলকাতায় লেখা— বিশেষ করে 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্যে সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ তাড়া দিয়ে এটি লেখান। ২৫-এ মার্চ রাতে ঢাকা শহর পাক-বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ই.পি.আর. পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন ছিল আক্রমণের টার্গেট। আমাদের ৭ নং মোমেনবাগের বাসা ছিল একেবারে রাজারবাগ পুলিশ লাইন সংলগ্ন। আমরা ঐ রাতে সমস্ত পরিবার পেছনে এক প্রতিবেশীর বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিই। কারফিউ ওঠার পরই আমরা বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো নামি এবং পরিচিত ব্যক্তিত্বকে গ্রামে পাঠিয়ে দিই। আমার ছোট ভাই জাঁনেসার এ-ব্যাপারে স্কাউটিং করত। পাইওনিয়ার প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী মরহুম মোহাইমেন সাহেব তখন ছিলেন বাবার সঙ্গী।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা বাবার বাংলাদেশে থাকাটা নিরাপদ নয় মনে করে ভারতবর্ষ পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিই। এ-ব্যাপারে আমার মেজভাই আসফাক ওসমান সব ব্যবস্থা করে। সে তখন সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অফিসার হিসেবে চাকরিরত। তার পিয়ন ইদ্রিস মিয়া ও অন্যতম অধঃস্তন অফিসার জীবনকে সঙ্গে নেয়। ওদের বাড়ি কুমিল্লার কোনাবন বর্ডারের পাশে। ওরা বাবাকে আগরতলা পৌঁছে দেবে। আমার ছোটভাই জাঁনেসারও ছিল এদের সঙ্গে। এই সময় বাবার যে মানসিক দ্বন্দ্ব তা আমরা তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারতাম। যেটি উপন্যাসে বারবার এসেছে। কয়েক দিন পর আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিল্পী রফিকুন নবী আমাকে জানায় যে আমার ও বাবার ঢাকায় থাকা বাঞ্ছনীয় হবে না, কারণ তার বাবা যিনি ইনটেলিজেন্স বিভাগের পুলিশ অফিসার, গোপনে জানতে পেরেছেন যে পাকিস্তানিদের ব্ল্যাক লিস্টে আমাদের দু'জনেরই নাম আছে। এই ব্ল্যাক লিস্টের অর্থ খতম কর।

অগত্যা আমি মা আর বোন আনফিসাকে নিয়ে একই রাস্তা ধরে আগের গাইড নিয়ে কোনাবন হয়ে আগরতলা যাই। বাবা তখনও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন চট্টগ্রামের এক হিন্দু-বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে। এখান থেকে আমরা যাই কলকাতায়। এখানেই তিনি 'জাহান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসটি রচনা করেন।

এই উপন্যাসে গাজী রহমান দেশ ছেড়ে যাচ্ছে প্রাণ সংশয়ের কারণে। তার যাবার পথে নানা ঘটনার অবতারণা। সবই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিককার ঘটনা। গাজী রহমান যে শেখ আজিজুর রহমানের ছদ্মবেশ তা লেখককে যাঁরা চেনেন তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হবে না।

'দুই সৈনিক' উপন্যাসটি ১৯৭২ সালে রচিত। কাহিনীতে আমরা দেখি মখদুম মৃধা, মুসলিমপন্থী চেয়ারম্যান আগ বাড়িয়ে পাক-সেনাদের ঘরে ডেকে আনে এবং দুই সেনা অফিসারকে আদর-আপ্যায়ন করে। এমন-কি কলেজ পড়ুয়া দুই কন্যার সাথেও এদের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়। রাত্রে প্রচুর মদ্যপান করা অফিসারদ্বয় মৃধার মেয়েদের বিয়ে করতে চায়। তখন মৃধা অরাজি হলে অফিসাররা মেয়েদের কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যায়। তখন ওদের দাদিমা সন্তান মখদুমকে পৌত্রীদের কথা জিজ্ঞেস করে। তারপর নিরুত্তর মৃধাকে বলে, "কথা কস না ক্যান?... পাকিস্তান বানাইছিলি না? তহন হিন্দু মাইয়াদের উপর জুলুম অইলে কইতিস অমন দু'একডা অয়। অহন দ্যাখ্ আল্লার ইনসাফ আছে কি না।..."

কাহিনীর শেষ দৃশ্যে দেখা যায় গাছের ডালে মৃধার ঝুলন্ত দেহ।

মানব সমাজে নারী নির্যাতন প্রায় একটি সর্বজনীন ব্যাপার। সমাজ উন্নয়নের প্রথম দিকে কোন কোন সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে। ফলে সেখানে মহিলারা এক সময় সমাজের হর্তা-কর্তা ছিল। ছিল পরিচালক, ফলে এই একটি সময় নারী নির্যাতন বলে কিছু ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজে পুরুষের আধিপত্য প্রায় সর্বত্রই অধিষ্ঠিত হয় এবং শুরু হয় নারী নির্যাতন। এর নানা ধরনের মধ্যে পতিতাবৃত্তি অন্যতম।

বাংলা সাহিত্যে নারীদের পক্ষ নিয়ে সাহিত্যিকগণ প্রায় সবাই সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এ-ব্যাপারে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আমাদের প্রধান পুরুষ। শরৎচন্দ্রের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। নারীর মূল্য নামে তিনি একটি গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন। এ-থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমান করা যায় ব্যাপারটাকে তিনি কতটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

শওকত ওসমানের সাহিত্যে 'জননী' উপন্যাস যেহেতু নারী-চরিত্র-প্রধান তাই আমরা এখানে নিম্নবিত্তের বাঙালি পরিবারের একজন প্রতিভূ হিসেবে পেয়েছি জননীর নায়িকা দরিয়াবিবিকে। নড়বড়ে সংসারের চাকাকে কিভাবে গ্রামের শিক্ষা-বঞ্চিত এক নারী সচল রাখার নিরন্তর সংগ্রাম করে যায় তার চিত্র। নারীর চিরন্তন বাসনা সংসারে সুখের মুখ দেখা... দরিয়াবিবির ক্ষেত্রে সেই সুখের মুখ দেখার আশায় আশায় জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। সুখ আর আসে না, সর্বশেষ পরিণতি আত্মহত্যা। পরিণতিটি বিয়োগান্ত। এবং এর ব্যতিক্রম এখনো দেখা যায় না।

'রাজসাক্ষী' ও 'পিতৃপুরুষের পাপ' উপন্যাস দুটি 'জননী'র মত নয়, ভিন্ন ধরনের। দুটি উপন্যাসই মানব সমাজের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বেশ্যাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে। 'রাজসাক্ষী' সরাসরি আর 'পিতৃপুরুষের পাপ' প্রকারান্তরে যে বেশ্যাবৃত্তি করান হচ্ছে মেয়েকে দিয়ে এবং কাজটি করছেন পিতা— লেখক এটিই বলতে চেয়েছেন এবং আসলেও এখানে পিতা হাওলাদার এই পদ্ধতি কৌশলে গ্রহণ করে।

'রাজসাক্ষী' উপন্যাসটি চারটি অধ্যায়ে রচিত। প্রথম অধ্যায়ে সবুরন নামের এক গ্রাম্য যুবতীর বয়ান। এই মেয়েটি উত্তম পুরুষে কাহিনী বয়ান করে চলেছে। অর্থাৎ বলা চলে লেখক এখানে সবুরনের মুখ দিয়ে সব বলাচ্ছেন।

সবুরন গ্রামের এক গরীব চাষীর মেয়ে। তার নিজের মা মারা যায় তার জন্মের দু'বছর পর। বাড়িতে আসে সৎমা। কিন্তু এই মায়ের হাতে সে কষ্ট পায়নি। সে হাজতে বসে বসে তার পুরনো দিনের কথা ভেবে চলেছে। সবুরনের বয়স এখন পঁচিশ। পূর্ণ যুবতী। কাহিনীর প্রথম পৃষ্ঠায় আমরা পাচ্ছি, আমি গেরামের মেয়ে। আমি কী চাইতাম? দু'মুঠো ভাত ভূখের ওয়াক্তে, পরনের দু'খান কাপড়, একটু মাথা-গোঁজার ঠাঁই...তা-ও জুটল না। তখন বাঁচার চেষ্টা করতে লাগলাম। জানা যায় সবুরনের এগার বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তার স্বামী একদিন চলে যায়... আর ফেরত আসেনি... তারপর শহরে আসে চাচার সঙ্গে, থাকে বস্তিতে। ক্রমে নানা বাড়িতে চাকরি, তার সব অভিজ্ঞতা... সব শেষে কাজী আলামিন নামে এক লোকের ব্যবসায় সে জড়িত হয়ে পড়ে। এই ব্যবসা আর কিছু নয়, নারী ব্যবসা। এবং বিদেশে নারী পাচার। এই ব্যবসায়ীর ঠিকানায় একদিন পুলিশ রেইড করে আর তার ফলে আলামিনসহ সবুরনও ধরা পড়ে জেল হাজতে। এই জেল হাজতে বসে সবুরন তার পুরনো দিনের কথা ভাবতে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি সবুরনের ব্যবসার বস কাজী আলামিনের। এখানে কাজী সাহেব তার জীবনের পূর্বাপর কাহিনী ভেবে চলেছে।

ছিল একটি অফিসের কেরানী, না ছিল ভালো বিদ্যে, না তেমন পেছনের জোর, এক সময় বুদ্ধি করে পাপের পথে পা বাড়ায়। আর গ্রহণ করে নারী ব্যবসা। সবুরন তার এই সংস্থার দেখভাল করার কাজে নিয়োজিত। যদিও সবটা তার চোখের সামনে হয় না। অনেকটাই থাকে অন্তরালে।

আলামিনের ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে চেহারারও উন্নতি হতে থাকে। একটা নূরানি জৌলুস ফুটে ওঠে। বাইরে থেকে মনে হবে একজন পরহেজগার আদমি। তাতে ব্যবসার সুবিধে। সমাজে চলাফেরা করতে সুবিধে। পুলিশের নজরকে ধোঁকা দিতে সুবিধে। আলামিন তার ব্যবসার সুবিধের জন্য যা যা করণীয় তাও করে, সাংবাদিকদের হাতে রাখে, অবশ্যই উচ্চমূল্যে। আইন আর পুলিশ প্রশাসনও যে তার পেছনে থাকবে এতে সে স্থির নিশ্চিত। ধরা পড়লেও ছাড়া পেতে দেরি হবে না। সবই জানা যায় আলামিনের বয়ান থেকে। আলামিন এ-ও জেনেছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুরন পুলিশকে কিছু কিছু নামও বলে দিয়েছে। আলামিনের বয়ানে, '...সবুরন পুলিশের জেরার মুখে নাকি শেষ পর্যন্ত সোজা হয়ে থাকতে পারেনি। অনেকের নাম বলেছে। কিন্তু তাদের ঠিকানা তো একটা নয়। পুলিশ হয়ত তদারকে গিয়ে দেখবে, খাঁচা আছে, চিড়িয়া গায়েব ...।' এই ভাবে সব ফন্দিফিকির চিত্রিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়টি পুরোটাই আদালতকে কেন্দ্র করে।

এটি শুরু হচ্ছে এ-ভাবে, 'মাননীয় আদালত, আজ আপনার হুজুরে আমি যে অভিযোগ আনছি, তার কলঙ্ক কালো কাফনের মতো গোটা দেশকে ঢেকে রেখেছে। অপরাধীর অপরাধ প্রায় পাপের পর্যায়ে পড়ে। অপরাধ এবং পাপ একত্রে যখন একে-অপরের হাত ধরাধরি করে আসে, তা মানব সমাজের শুধু কলঙ্ক নয়, সমাজ জীবনে তার ঘা শুধু বাইরে নয়, জাতীর আত্মাও দূষিত করে তোলে। বর্তমান অভিযোগ-উত্থাপনের দায়িত্বের ভার পেশাগত দিক থেকে আজ আমার উপর পড়েছে। আমি লজ্জিত যে এমন দূষিত ঘায়ে আঙুল দিতে আমি বাধ্য। আর কারো উপর তা থাকলে আমি খুশি হতাম।'

পাবলিক প্রসিকিউটর মকবুল আহমদের ভারি এবং তীক্ষ্ণ-তীব্র কণ্ঠস্বরে নাতি-দীর্ঘ আদালতকক্ষ পূর্ণ হয়ে ওঠে। বড়ো আবেগাপ্লুত সেই নিনাদ।"

পাবলিক প্রসিকিউটর আরো বয়ান করে চলে "...কাজী আলামিন বেশ ঘড়েল, প্রতাপশালী ব্যক্তি মনে হয়। ...কারণ, আসামীর জাল শুধু স্বদেশে নিবদ্ধ নয়। এক কথায় বলা যায়, প্রায় আন্তর্জাতিক। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, কুয়েত, বাহরায়েন, ওমান, সৌদি আরব প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের আরো আরো শহর তার ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে।"

এই প্রসিকিউটর আরো জানায় যে মধ্যপ্রাচ্যে তেলের খনি আবিষ্কারের পর মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা পশ্চিমা বিলাস ও রীতিনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে...চাকরি যারা করতে যায় তাদের অনেককে ফড়িয়ারা বিক্রি করে দেয়... মেয়েদেরও...এইভাবে আধুনিক যুগে নতুন করে দাস-ব্যবসার জন্ম দিচ্ছে এই সব আদম-ব্যাপারিরা।

এখানে বিবাদীর পক্ষে দুই ব্যারিস্টার লাগান হয়। তারা নানাভাবে দেখলেন চেষ্টা করে যে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তেমন জোরাল প্রমাণ নেই।

এই মামলার রায়ের ব্যাপারে এক মাস সময় লাগবে। খুবই জটিল মামলা। কিন্তু রায় বেরবার আগেই সংবাদপত্রে আইন-আদালত কলামে ছোট টাইপে একটা খবর বেরয়, বিচারাধীন আসামীর মৃত্যু।

এই আসামী আর কেউ নয়, কাজী আল আমিন।

অন্যান্য আসামী পলাতক, তাই কেস্ ঝুলতে লাগল।

চতুর্থ অধ্যায়ে সবুরন যে ছিল রাজসাক্ষী ছাড়া পেয়ে যায়। দরকার হলে তাকে আবার ডেকে আনা হবে।

জেল হাজত থেকে বেরিয়ে সবুরন বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সবুরন স্টেশানে টিকিট কিনে ঢুকেছে এমন সময় এক মহিলার ডাক শোনে। এক বৃদ্ধা। জানা যায় এই বৃদ্ধাও ওদের গ্রামে যাবে। সবুরন খুশি।

রাত্রে বৃদ্ধা তাকে নিয়ে অন্য আর এক স্টেশনে নেমে পড়ে। তারপর বলে যে কাছে তার এক বোন আছে তার বাসায় গিয়ে উঠবে। সকাল হলে তখন গ্রামের জন্যে ট্রেন ধরবে।

উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় আমরা দেখছি লেখক লিখেছেন :

সবুরনকে তারপর আর কেউ কোনদিন কোথাও দেখেনি।

...পুলিশের তদন্তে পরে নিখোঁজের খবরটা তার গ্রাম ও আশপাশের লোক জানতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুরন তার বাজানের কাছে আর কখনও ফিরে যায়নি।

নির্জন ভিটায়, বিজন বন-বনান্তরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে, দিন-রাত্রি অসংখ্য ঝিঁঝি ডেকে যায় অবিরাম, অবিশ্রান্ত...

রাজসাক্ষীর কাহিনী এ-ভাবেই সমাপ্তি লাভ করে।

প্রথম দিকের মনো-বিশ্লেষণের পর শেষাংশটি একেবারে উপন্যাসের কাহিনীর জীবন্ত আকার গ্রহণ করে। যেখানে বাংলার মেয়েদের করুণ পরিণতিটি সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল অথচ শিল্পতত্ত্বের প্রয়োজনে কুয়াশামাখা। যার নিগূঢ় প্রভাব পাঠক-মানসে দৃঢ়ভাবে পড়ে।

পরবর্তী উপন্যাস পিতৃপুরুষের পাপ পাঁচটি অধ্যায়ে রচিত। এটিতেও একটি মেয়ের মানস-চিন্তার মাধ্যমে কাহিনী এগিয়ে চলে। মেয়েটির বয়স এখন তিরিশ, নাম লালবানু। অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারের মেয়ে সে। বাবা জব্বার হাওলাদার বেশ শক্ত-সমর্থ পুরুষ। কিন্তু এক সময় জব্বার অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্ত্রনালীতে টিউমার। অপারেশান দরকার। জমি বেচতে বাধ্য হলো। অবস্থা আর আগের মতো থাকল না।

এরপর আসল মেয়ের বিয়ে। যথা-সাধ্য জাঁক-জমক করেই বিয়ে হয়। ছেলেপক্ষ ভালোই সোনাদানা দেয়। জব্বার মেয়ের সব গহনা নিজের হেফাজতে রাখে। সাবধানতা।

হাওলাদার মেয়েকে প্রায় নিজের কাছে রাখতে চায়। কারণ একটিই তার সন্তান। শুধুই লালবানু। এটা বাহ্যিকভাবে খুবই জোরাল যুক্তি। কিন্তু এর ভেতরে যে আরো কোন নকশা আছে তা আমরা জানতে পারি কাহিনীর শেষাংশে।

লালবানুর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা লালবানুর জন্যে খবর পাঠিয়ে পাঠিয়ে বিরক্ত।

জামাই শেষে নাকি কথায় কথায় উত্তপ্ত, শ্বশুরকে বলেছিল, 'যার জবান ঠিক নেই, তার জন্মের ঠিক নেই।'... অমন উচ্চারণ তো হেস্তনেস্ত একটু চরমপত্র জাতীয় ব্যাপার। জন-রবে আরো জানা যায়। শ্বশুর নাকি এমন ক্ষিপ্ত এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন যে জামায়ের গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেন... ভোর হওয়ার পূর্বেই কয়েকজন জামাইকে একদম গাঁয়ের শেষ সীমানায় পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল...

লালবানুর দ্বিতীয় বিয়ে হয় এই ঘটনার কিছু দিন পর। আবার সোনাদানা যৌতুক আসে। একদিন হাওলাদার এই দ্বিতীয় জামাইকেও তাড়িয়ে দেয়। আর রীতি মাফিক সোনাদানা সব জমা থাকে বাবার কাছে।

এর কিছু দিন পর লালবানুর তৃতীয় বিয়ে হয়। এই বর মুবারক। তার বউ মারা যাওয়ায় এই বিয়ে করছে।

তারপরের ঘটনা বইয়ে এ-ভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'মুবারকের ডাক পড়েছিল এক রাত্রে বাইরে আমাদের সদরে। সে আর ফিরে এলো না। পরদিন এবার সাহস করে মার কাছ থেকে তার খোঁজ নিতে তিনি বললেন, বাপের সঙ্গে কী যেন বচসা থেকে কাইজ্যা। তারপর সে রাতেই চলে যায়।'

সপ্তাহ খানেক পর জানা গেল মুবারক মহকুমা সদরে নালিশ করেছে হাওলাদার নাকি জবরদস্তি খুন করার ভয় দেখিয়ে তালাক-নামা লিখিয়ে নিয়েছে।

এই নালিশের খবর পেয়ে হাওলাদার সচেতন হয়। সে লালবানুকে বলে, "মা, এখন আমার মান-ইজ্জত সব তোমার উপর নির্ভর। আদালতে তুমি বলবে— আমার স্বামী আমার ওপর জুলুম করত। ...এইভাবে আদালতে হাকিমের সামনে তোমাকে বলতে হবে। তা না হলে আমার জেল হয়ে যাবে।..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদালতে তারা একদিন সবাই উপস্থিত। মুবারকের উকিল বলতে থাকে, "...মাননীয় আদালত...নানা রকম ফন্দিবাজ আছে দুনিয়ায়। ...তবে এমন ফন্দি আর সহজে দেখা যায় না। ...এই মেয়ের আরো দুবার শাদি হয়েছিল। তৃতীয় দফা শাদি হয় আমার মক্কেলের সঙ্গে। আগে দু'জন ওকে তালাক দিয়েছিল। ওরা নিশ্চয় স্বেচ্ছায় তালাক দেয়নি। জোর করে নিয়েছে। ওর দ্বিতীয় স্বামী...দরকার হলে সাক্ষী দিতে রাজি আছেন।...

"অর্থাৎ ফন্দিটা বুঝতে পারছেন... মেয়েকে ভাড়া-খাটানোর এক চমৎকার তরিকা... সোজা খান্‌কি নিকেতন মানে বেশ্যাবাড়ি না পাঠিয়ে এই ফিকিরে অনেক কিছু রক্ষা করা যায়... মান-ইজ্জত বাঁচল...আর রক্ষা পেল পাকস্থলী... এক কথায় পেট...।"

হাকিম ব্যাপারটা মীমাংসার জন্যে লালবানু ও মুবারককে এক কামরায় পাঠিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে বলে সময় দেয় পনেরো মিনিট। অর্থাৎ সব নির্ভর করছে লালবানুর ওপর। সে বাবার কাছে যাবে না স্বামীর কাছে, এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে লালবানুকে।

পনেরো মিনিট পর আদালত আবার বসে।

হাকিম বলেন, "...এখন আমি বেগম লালবানুকে একটি প্রশ্ন করব। তার ফলাফলই হবে আমার রায়... বেগম লালবানু, তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যেতে চাও, না তোমার বাবার সঙ্গে?"

জবাব আসে, "আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যেতে চাই, হুজুর।"

"বেশ বেশ। মুবারক খান, আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এজলাস থেকে আপনার যেখানে খুশি যান।"

কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

সমাগম ১৯
রাজা উপাখ্যান ১২১
জাহান্নম হইতে বিদায় ১৯৭
দুই সৈনিক ২৬৫
রাজসাক্ষী ৩২৭
পিতৃপুরুষের পাপ ৩৯৫
শওকত ওসমান : সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৪৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

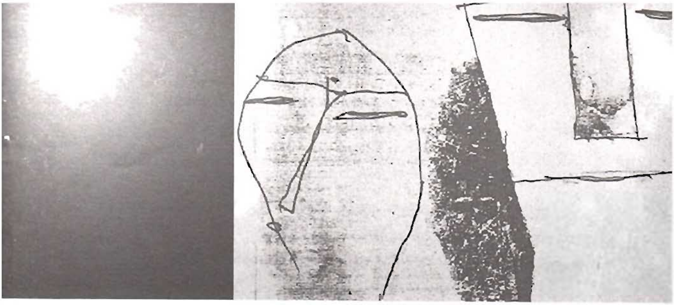

সমাগম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ১ম পালা ॥

আলি সহকারী।

অরি-যুক্ত পাটোয়ারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু এই নামের এমনই বিদ্‌ঘুটে লেজুড়! তাই কিঞ্চিৎ তফ্‌সীরের প্রয়োজন। অবিশ্যি স্বয়ং মল্লীনাথ হয়ত বিশ পৃষ্ঠা ফেঁদে বস্‌তেন। এযুগের টীকাকার অত লম্বা দড়ি ব্যবহারে অপারগ। তা আমি জানি, যেমন আপনারা জানেন। কারণ, সময়ের মূল্য আছে। Time is money.

জুহা এই লেজুড় জুড়েছিল। কিন্তু এখন লেজুড় বদনের সঙ্গে এমন মিশে গেছে যে আলি-কে আর স্রেফ আলি-শব্দে কেউ ডাকে না, যদিও প্রথম যখন সে এই বাড়িতে ফায়ফরমাসের কাজে বহাল হয় তখন তার পুরা নাম আছে কি না তেমন গবেষণার মত সদিচ্ছা ভুলেও কারো জাগে নি।

আলি সহকারী!

বাড়ির মালিক জুহার কাছে দিন-রাত আছে, কিন্তু সময় নেই। সে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, কখন ঢোকে, কখন খায়, কখন সংসারের তদারকে ঈষৎ আড়চোখ ফেরায়— তা প্রতিবেশীর পক্ষে কেন ঘরের বাসিন্দাদের পক্ষে আন্দাজ করা মুশ্‌কিল। হয়ত ভোরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল, আবার ইংরেজি সময়-গণনা-অনুযায়ী ভোর একটা-দেড়টার সময় ফিরল। বাংলা মতে যদিও তখন রাত। এমন রুটিনের গড়বড়ি এক দেবী (কারণ তা তাবৎ পাথরের) ছাড়া আর কোন মানবীর হাড়ে-চামড়ায় কুলোর বাতাস লাগাবে? সুতরাং, "ইয়া আলী"! জুহা মাঝে মাঝে এমন চিৎকারই দিত কোন কোন দিন দিনে। কিন্তু রাত্রে এই উচ্চরব ফিসফিসানির গর্তে ঢুকত। 'চিক্করে পাড়া হুদ্দা লড়িব'— এমন সাহস ছিল না জুহার! তবে পাড়াও অত ভয়ের জিনিস নয়। কারণ পাড়াকে কোন ভাষায় কেউ গৃহিনীর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করতে শোনে নি। এই অবস্থায় আলি শরণ ছাড়া উপায় থাকে না। টেবিলে ঢাকা ঠাণ্ডা ভাত, কিন্তু গরম তরকারি অর্থাৎ তাতানো তরকারি প্রতি রাত্রেই আলি পরিবেশন করত।

জুহা তাই ঠাট্টাচ্ছলে বলত, "আলি সহ 'কারী'।" মদ্র ইংরেজি 'কারী' বাংলা তরকারি। মনস্তত্ত্বের অনুসঙ্গ-নিয়মে আলি-সহ-কারী। শেষে আলি সহকারী। জুহা আরো ঠাট্টা করত, অবশ্য তা সহকারীর পক্ষে বোঝা শক্ত : "বাবা, ইংরেজি-বাংলা জবানে এমন মাখামাখি আছে বলেই ত কমন্‌ওয়েলথী গাঁটছাড়া এ্যায়সা মজবুত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলির চেহারা ও বুদ্ধি ছিল ঈষৎ মোটা। মনিবের আড়ং মাঝারি। উদারা-মুদারার সংমিশ্রণে একটা বিচিত্র রাগিণী গড়ে উঠেছিল। কালেভদ্রে রাগারাগি চলত বৈকি। তবে এই বাড়িতে প্রভু-ভৃত্যের ফারাকটা যথাসম্ভব চিরকাল এত ক্ষীণ থাকে যে মাইক্রোসকোপ এঁটে তার হদিস বের করতে হয়। জুহা আই-কিউয়ের (I.Q.) জন্য কারো উপর চটত না। সে বলত এবং বলে, "বাবা ওটা ক্রমোজমের জড়াজড়ির ব্যাপার। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। লোকটা সৎ কি না তাই দ্যাখো। অত আই-কিউয়ের উপর জোর দিলে ত গুটিকয়েক লোক ছাড়া আর দুনিয়ার তামাম লোক-কে আত্মহত্যা করতে হয়।"

ক্রমোজোম থিয়োরি কি বলে, তা বৈজ্ঞানিকদের ব্যাপার। জুহা নিজের থিয়োরি অনুযায়ী কখনও ঠকে নি।

কিন্তু মোটা আক্কেল মাঝে মাঝে মোটা ফ্যাসাদ তৈরি করে বসে। জুহা তার জন্য প্রথমে প্রস্তুত থাকত না। এখন পরিস্থিতি জুহার ধাতস্থ। সে জানে আলি ঈষৎ মোটা আর তার আক্কেল ততোধিক মোটা। অতএব...

অবিশ্যি ফ্যাসাদ বাধত-ই। জুহা ধরিত্রীর মত সর্বংসহা, সাফাই দিত : "ওসব যা-হয় হোক, আমি কিন্তু আলি-শরণ। কল্‌কাতায় এক আলি আছে। মৌলা আলি। তার দর্গায় সিন্নি দেয়, মানৎ মানে। ঢাকায় একটা আলি না থাকলে বাঁচব কী করে? ঠাণ্ডা তরকারি কারো পাকস্থলী ভালো রাখে না। আর পাকস্থলী ড্যামেজ মানে দুনিয়া ড্যামেজ। ইয়া আলি...সহ কারী।"

একবার কিন্তু জবর ফ্যাসাদ বাধল।

কিঞ্চিৎ জট ছাড়াতে হয়।

আলির বাগানের শখ যদ্দুর নয়, বাগান বাঁচিয়ে রাখার নেশা তার চেয়ে ঢের বেশি। জুহা অকুস্থলের নতুন অধিবাসী। জংলা উঠান হাসিল করার মতো শৌখিন কৃষক নয় সে। কিন্তু আলির কোদাল চর্চার ফলে (Spade work বল্‌তে পারেন) উঠানে একটা বাগান দর্শন দিয়েছিল। বাগান নয় বাগিচা। সংস্করণ ছোটা-সে-ছোটা। হাব্‌জা নানা রকমের লতা আর ফুলের গাছ। ছোট জায়গা বলে জুহার মন এদিকে এগোয় নি। কিন্তু আলি আর বাটীস্থ তার ক্ষুদ্র মনিবেরা নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে সচেতন বলেই বোধহয় বাগিচা একটা বানিয়েছিল। আলি আবার কোথা থেকে শুনেছে, সব্‌জিতে কব্জি মোটা হয়, তাই কোণায় পুঁতে দিয়েছিল দশ পনেরটা ঢ্যাড়স চারা। সেগুলো এখন সামাদ-সই (ফুটবল খেলোয়াড়) উঁচু। ফুলন্ত, ফলন্ত। আলি আরো কয়েকটা চিচিঙ্গা গাছ পুঁতেছিল গোলাপি দোপাটির ভিড়ে। সেগুলো এখন চিঁ চিঁ করছে। মাটি খুঁড়তে ত কব্জি সরু হয়ে যায়, কবে মোটা হবে, তা আলি আর আলির আল্লা জানে। বাগিচা না জঙ্গল তা-ও হিসেব কষে ঠিক করতে হবে। এক কাঠা জায়গার ভিতর চৌহদ্দির ধারে ধারে লতাগুল্ম গাছ সব ঠাসাঠাসি। মাঝখানে আবার দুব্‌ঘাসের চত্বর আছে। এমন বাগিচা না থাকলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আলির মগজে যখন ঢুকেছে, তখন আর বের করে কার সাধ্যি। অথচ ফ্যাসাদ বাধল এই বাগান নিয়ে।

জুহা দৈনিক সংবাদপত্রের তরজমাকারী। আলির নাম লম্বায়নের এ-ও একটা হদিস হতে পারে। এ বাহ্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরজমাকারী বিকেল থেকে আফিসে রাত আটটা পর্যন্ত খেটে বাড়ি ফিরেছে। কিছু নাস্তা করে ভাবছে পড়তে বসবে। এমন সময় তরজমাকারীর পাশে সহকারী এসে দাঁড়াল।

"আব্বা!" সহকারীর সম্বোধন। জুহা এই স্বেচ্ছা-আরোপিত পিতৃত্ব বহু দিন থেকে মেনে নিয়েছে।

"কি রে?" পড়ার টেবিলের দিকে তাকিয়ে চেয়ারাসীন জুহা জবাব দিলে।

"আপনের চিঠি", বিনয় গলা। সহকারী হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। হল্‌দে তুলট কাগজ।

সম্মুখে হারিকেন জ্বলছে। জুহা তাড়াতাড়ি কাগজটা আলোয় ধরল। এক মিনিটের মধ্যে সে মাত্রাধিক তন্ময়চিত্ত, বেশ বোঝা যায়। সহকারী তখনও পাশে জজের পেয়াদার মতো খাড়া, যেহেতু এজ্‌লাস ভাঙে নি।

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল। তরজমাকারী উল্টে পাল্টে কাগজটা দেখে, নাড়ে চাড়ে। সহকারী ত 'থ'।

জুহা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, "চিঠি কোথায় পেলি?"

"বাগানের কাম করছিলাম। দেহি একডা চিডি দোপাটি গাছের তলায় পইড়া আছে।" কথা শেষ করতে দেয় না জুহা। বিরক্তি বিস্ময় অস্থিরতা একযোগে তার চোখে মুখে উপচে পড়ছে।

"চিঠি দেখলি ত চিঠির খাম কৈ?"

"খাম ছিল।" সহকারী তখন মাটিতে মিশে গেছে।

"খাম ছিল ত খাম কৈ। আর তুই আমার চিঠি খুলেছিস?"

"খুলি না আব্বা।"

"খুলিস নি ত খোলা কেন?"

"খামের ওপর আপনের নাম ছিল না। শুধু লেখা ছিল আলি— আলি। তয় আমি ভাবলাম, চিডি যখন আপনের নয়, হে আমার হৈব।"

অন্য সময় হলে জুহা হেসে কুটিকুটি হত। চিঠিটা পিতার না হলে পুত্রের হবে নিশ্চয়। কি লজিক! কিন্তু এখন রসিকতার সময় নেই। তেতো গলায় তরজমাকারী ধমক দিয়ে উঠল, "তুই ত পড়তে জানিস নে, বুঝলি কী করে আলি লেখা আছে?"

"দরজির দোকানে নিছ্লাম। হেরা কইল আলি-আলি লেখা আছে। তারপর হেরা কয় এডা তোর না তোর সাবর হৈব।"

"ব্যাটা খামটা কোথায়?"

"হে ত ফেইলা দিছি।"

"ফেলছস্ কোথায়?"

সহকারী আর জবাব দেয় না। রাস্তার দিকে তখন দৌড় মারে। দোকানের আশেপাশে কোথাও হয়ত খামের ছেঁড়া টুকরো পড়ে থাকতে পারে।

জুহা দেখে পরিষ্কার তুলট কাগজ। খুবই পুরাতন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগে সে কিছুদিন কাজ করেছিল পাৎলা-কায় ডক্টর মহামেদের অধীনে। প্যালিওলজির সঙ্গে মহব্বৎ তখনই কিঞ্চিৎ ঘটেছিল। কিন্তু পূর্বরাগেই সবকিছু কাবার হয়ে যায়। আজ জুহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ নিজের মগজ আঁচড়াতে লাগল। প্রায় তিন শ' বছর আগেকার তুলট কাগজ। বাংলা অক্ষরের নমুনা বয়সে তার চেয়ে কম নয়। শেষ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করল জুহা অনেক ধস্তাধস্তির পর :

বিস্‌মিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।
অতঃপর নিবেদিত সালাম আলেকম।।
শুনো বৎস শুনো বৎস আব্বার কথন।
বহু দিন হতে বড় উচাটন মন।।
খাহেস হৈল তাহে মুসাফির হৈয়ে।
পৌছাইমু একা এক তুব্বার আলয়ে।।
সহস্র বাইস মঘী সন রোজ রবিবার।
পত্র যোগে লহ এহি ক্ষুদ্র সমাচার।।
মুন্‌শী করিমে দেহ কুশল-খবর।
নেকনাম নেককাম পুত্র-বরাবর।।
দোওয়া খায়ের মাঙ্গি তুব্বার কারণে।
রোসাঙ্গের হীন কবি আলাওল ভনে।।

বিস্ময়-আনন্দে জুহা প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল : মধ্যযুগের মহাকবি আলাওল। মানুষের কবি আলাওল। সুফী আলাওল। চিৎকার সে দিল না ঠিক। কিন্তু কখন চেয়ার ছেড়ে ঘরময় পায়চারি আরম্ভ করে দিয়েছে সে নিজেও জানে না। তুলট কাগজ বার বার দেখে আর বুকে চাপে। ওদিকে দুই চরণ মেঝে-মোতাবেক পায়চারির তাল দিচ্ছে। কিন্তু সমস্ত শরীর ভেতর থেকে কে যেন ঝাঁকুনি মারে! রাম-দৌড় পর্যন্ত সে মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট নয়। জুহা অজানিতে বারবার আবৃত্তি করতে থাকে :

বাক্য-সুত দিয়া যেন বান্ধয় পবন।
তাহার মরম জানে সেই মহাজন।।

ব্যাখ্যান তার মনের মধ্যে গুঁজরে ওঠে, কিন্তু বাইরে তার কোন আলামত নেই। কথার সুতো দিয়ে যে মহাজন বাতাসকে বাঁধতে পারে, সেই শুধু তার মর্ম বোঝে।

জুহা হঠাৎ প্রায় অর্ধ-চিৎকার দিয়ে উঠল, আমি বুঝব না ত কে বুঝবে আলাওলের মর্ম? পায়চারিরত অবস্থায় এবার সে পাড়া-ফাটানো চিক্কর দিয়ে উঠল : জাইদুন— জাইদুন।

নেপথ্যে নারী-কণ্ঠ শোনা গেল : কী? এখন আসতে পারব না। ইলিশ মাছ এইমাত্র চড়িয়েছি।

ইলিশ মাছ কি, গোটা দুনিয়ার সাধ্যি আছে জুহাকে রোখে? সে এবার জোর চেঁচাতে লাগল : জাইদুন, জাইদুন।

জাইদুন নাজেলের আগেই বাকি পরিচয় দিয়ে রাখা ভালো। কারণ ভদ্রমহিলার সামনে অনেকের কলম, ঠোঁট 'অফ' হয়ে যেতেও পারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাইদুন এই বাড়ির গৃহিনী, ধোপানি, নাপ্‌তানি, মেথরানি, চাকরানি, কাঁপানি, দাপানি, তাপানি ইত্যাদি ইত্যাদি...

জুহার রেশ আর কাটে না। এবার বাঘের-মুখে-পড়া আর্ত-চিৎকার : জাইদুন, জাইদুন।

মজকুর জানানা অকুস্থলে হন্তদন্ত ছুটে এল। হাতে তরকারি-নাড়া চামচ।

হলো কী? চেঁচিয়ে ত কানের পোক্ বের করে দিলে।

— এই দ্যাখো। পায়চারি পথিকের এবার যেন ডেরা মিলছে। চিঠি সে বাড়িয়ে দিলে।

কার চিঠি? অনিচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দিলে জাইদুন।

— পড় না?

— কিছু পড়া যায় না। ঠোঁট বাঁকায় জাইদুন। শেষে বিরক্তির সুরেই বলে, "ভনিতা রাখ। কী ব্যাপার বল।"

— কার চিঠি জান? কবি আলাওলের। রোসাঙ্গের কবি আলাওল।

— তোমার কাছে কেন?

— তিনি আসছেন। জান কোথায়? এই বাড়িতে— তোমার এই বাড়িতে।

মুখ ফুলিয়ে প্রতিপক্ষ ঘাড় নেড়ে বলে, "এই জন্যে পাড়া মাথায় তুলছিলে?"

"অন্যায় কী দেখলে। কি আনন্দের ব্যাপার। একজন মহাকবিকে দেখতে পাব সশরীরে। কী সৌভাগ্য!"

— সে না হয় হল। কিন্তু খেয়াল আছে মাসের ছাব্বিশ তারিখ? উবে-যাওয়া স্মরণশক্তি একটু খুঁচিয়ে উপরে তোলার জন্যেই যেন জুহাপত্নী ঘাড় কাৎ করে স্বামীর চোখের উপর চোখ রাখলে।

অপর পক্ষ তখন শীতকালের কেঁচো। তেজ নেই আর। জবাব দিলে, : "তা ত জানি। কিন্তু কবি নিজে লিখেছেন—।"

বাক্য ফুরায় না, খতম করে আর একজন, "লিখে দাও। মাসের প্রথম সপ্তাহে আপনার পদার্পণ ঘটিলে অতিশয় ধন্য হইব। গৃহে এক লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত, তবে অপর একজন সোসাইটি-গার্লের মতো প্রায় বাহিরে বাহিরে অবস্থান করেন। অবরে-সবরে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু তাহার দৃষ্টির মধ্যে আদৌ করুণার লেশ থাকে না।... এইসব লিখে দাও না। খবরের কাগজের লোক তোমাকে আবার কী শেখাব?"

কেঁচো এবার জেলিফিশ্।

"না, না। তা কি হয়। অন্য কেউ হলে লিখতে পারতাম। বয়সে কত বড় আর তাঁর দর্জা কত উঁচু। এসব কি লেখা যায়? তুমি চেষ্টা করলে—।"

জাইদুন তখন দরজার দিকে দ্রুত গায়েব হতে হতে খন্‌খনায়, "তোমার কোনো আক্কেল আছে বলে ত আমার ধারণা নেই। বুদ্ধির মাথার সঙ্গে নাকের মাথাটা পর্যন্ত খেয়েছ। ওদিকে ইলিশ মাছের হাঁড়ি-আঁচা গন্ধ উঠেছে—।"

লাভা নয়, ছ্যাঁকা-চাখা জুহা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তুলট কাগজ বুকে চাপা আছে। হয়ত আত্মকরুণার কোন আওড়-খোঁজার ইচ্ছা। কিন্তু ভাষা চুপসে নিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদচারী তাই আসমানচারী।

কতক্ষণ কাটল সে জানে না।

"সাহেব য়ে ফুল-মাত্রায় গম্‌গীন," হঠাৎ চমকে উঠে জুহা পেছন ফিরে তাকায়। দেবী আবার নাজেলা হয়েছেন।

"আরে তোমরা আমাকে পেলে কী? আমার গায়ে কি মানুষের চাম নেই?"

জুহা নতুন হামলা-রোখার জন্য আর তৈরি হয় না। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হল কী?"

"হয়েছে ত তোমার। বিশ বছর দেখছি এক অবস্থা। তবে আর ভেবে লাভ। অত বড় কবি নিজে যেচে পত্র দিয়েছে, আর আমি কী বলব, মেহমান রাস্তা দেখ? দেখছিলাম সাহেব ক'লাখ সর্ষে ফুল দেখে দশ মিনিটে," কথা শেষ না হতে-হতে জাইদুন হাসতে থাকে। এ হাসির মানে জুহা জানে। তাই সে দ্রুত জাইদুনের বাজু ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে, "naughty girl, just a naughty girl।"

"ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে" হাত ছাড়াতে ছাড়াতে জাইদুন জবাব দিলে, "চল, এখন বসে প্ল্যান করা যাক।"

শোওয়ার ঘরের এক দিকে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। ওরা দুইজনে বসল। জাইদুনের চোখে তখনও দুষ্টুমির ঝিলিক।

"আচ্ছা হুনেন নি, সাব? মেহমান ক'জন?"

পালে ঝিরিঝিরি বাতাস লেগেছে। জুহা উল্টো বৈঠা মারে, "হুনেন, বিবিসাব, আপনাকে বিব্রত করার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। আজ শুক্রবার। উনি আসছেন রোববার। এখন চিঠি দিলেও পাবেন না। সেই আরাকানের বর্ডার। চিঠি যেতে সাত দিন লাগে।" কথাটা ঝুট। স্তোকবাক্য। তা জুহা জানে।

— বুঝেছি ঠাকুর তোমার কেরামতি। এখন বসন ফিরিয়ে দাও। আচ্ছা, কে কে আসছেন?

— কবি আলাওল। তিনি আবার মুনশী আবদুল করিম অর্থাৎ সাহিত্যবিশারদকে খবর দিতে বলেছেন। তাঁকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে খবর দেব। উনি হয়ত কাল রাত্রে এসে পৌঁছবেন। সুতরাং মেহমান এক এক দুই।

— আর বাড়ির ছেলেপুলেরা।

— সেও জুড়ে দাও।

— সুতরাং কাহন ত পুরা হল। এই জন্যে আমি আর এক কথা ভাবছি—

জাইদুন শান্ত চোখে জুহার দিকে তাকায়।

— কী?

— আমি ভাবছি, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। দশ জনের জন্যেও আমার যে মেহনত বিশ জনের জন্যেও তা-ই। সুতরাং তুমি আরও কয়েকজনকে ডাক। অবিশ্যি বৃহৎ বৃহৎ ব্যক্তিদের।

জুহা আনন্দে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে জাইদুনের দুই কাঁধে চাপ দিতে দিতে বলে, "মাই ডিয়ার, মাই ডিয়ার—।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জায় ঈষৎ লাল জাইদুন এক পাশে হেলে ঝঙ্কার দিলে, "আচ্ছা, অত উৎসাহ দেখাতে হবে না, শেষ দু দিন ডালভাত খেতে আবার সাহেবের ঠোঁট না বাঁকে।"

"আমি হলফ করছি— বাঁইকত নঅ," বলে জুহা নিজেই হেসে ফেললে।

"আর বাজে কথা নয়। তোমার মেহমানদের লিস্ট দাও। আমার শুধু একটা শর্ত আছে।"

"কী?"

'একদম মরদানা ব্যাপার করতে পারবে না। একজন মেয়ে অন্তত ডাকতে হবে।"

"বিবি, মঞ্জুর।"

জাইদুন এবার জুহার হাতে ঠোনা কষায়, "যাও। এখন রসিকতা অসহ্য।"

"আচ্ছা মেয়েদের মধ্যে কাকে ডাকি? কবি চন্দ্রাবতীকে?"

"না। আমার প্রস্তাব বেগম রোকেয়াকে ডাকা যাক।"

"বেগম রোকেয়া?"

"মিসেস আর. এস. হোসেন।"

"ও বুঝতে পেরেছি।"

"তুমি যে দেরিতে বোঝ, তা আমার জানা আছে।"

— হঠাৎ বেগমকে কেন স্মরণ?

— আমি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালের ছাত্রী ছিলাম।

— ছাত্রী ছিলে? ক' দিন পড়েছ?

— তিন দিন।

মুচকে মুচকে হাসে জুহা, "ও তাই আমি শুনেছিলাম দু'দিন তারপর তুমি শৈলরাণী হাই স্কুলে ট্র্যান্সফার নিয়ে যাও।"

— যাও, আর খোঁচাতে হবে না। একদিন পড়ি আর দু'দিন পড়ি। ছাত্রী ছিলাম ত।

— তা ছিলে। অতএব মঞ্জুর।

— আচ্ছা তুমি কাকে ডাকতে চাও?

— আমি একজনকেই ডাকব। তার নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এস্কোয়ার, ব্যার-এ্যাট-ল, সাকিন সাগরদাড়ি, জেলা যশোর।

— বড্ড কথা লম্বা কর। আমি যেন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী আর কি।

— তা ত বটেই।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল জাইদুন এমন সময় আলি সহকারী ঘরে ঢুকল। তরজমাকারী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলার আগেই অন্য 'কারী' হেফ্‌জ শুরু করে দিল, "আব্বা, খাম পুরা ন ফাই। টুক্‌রা দু'খান পাইছি।"

জুহা তার হাত থেকে খপাৎ রবে কাগজ কেড়ে পড়তে লাগল, দু'টুকরো একাঙ্গ সাজিয়ে। অপর দু'জন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শুধু।

দু'মিনিট পরে আনন্দে ফেটে পড়ে জুহা।

"এই দ্যাখো জাইদুন। লেখা আছে সৈয়দ আলাওল সাকিন জুব্‌রা, জেলা চট্টগ্রাম। সুতরাং আর কোনো সন্দেহ নেই। জুব্‌রা গ্রাম কবির জন্মভূমি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাইদুন আলি সহকারীকে ধমক দিলে, "যা ব্যাটা। যত ফ্যাসাদের মূল হচ্ছিস তুই। রবিবারে তুইও বুঝবি কত কাজ। আমাদের বাড়িতে কবি আসবে। কবি আলাওল, মধুসূদন।"

সহকারী চলে গেল। কিন্তু কথা ত দু'কান থেকে তিন কানে পৌঁছেছে। সুতরাং— বার্তা রটি গেল ক্রমে। প্রথমে অবিশ্যি বাড়ির চৌহদ্দির ভিতর।

প্রথমে এলো জুহাগোষ্ঠির অন্যতম ফুয়া। সে ইংরেজি ভাষায় অনার্স পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ফুয়া জিদ ধরল, "বাবা, যখন গ্রেট ম্যানদের দাওয়াত করতে চান, বার্নার্ড শ'কে দাওয়াত না-করার কোন অর্থ হয় না। মারি ত হাতি।"

পিতা জীবনে খেদা দেখে নি। হস্তী শিকারে অনিচ্ছুক ছিল, তাই বললে, "দ্যাখো বাপু, বার্নার্ড শ'কে নেমন্তন্ন করার অনেক হাঙ্গামা। এলে হয়ত ঝগড়া বেধে যাবে কারো না কারো সঙ্গে। ঠোঁট-কাটা ত। আর দুনিয়ার লেখকদের মধ্যে ঐ হচ্ছে নারদ। কাইজ্যার একটা খুঁৎ পেলে হয়। ঢুকবে সুঁচ, বেরুবে ফাল। ওকে বাদ দাও।"

ফুয়ার মুখে ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদ এখনও টাটকা। সে পেছপা হয় না।

— ঝগড়া বাধলে ত আরো মজা। বাবা, মনে রাখবেন এ ত আর ষাঁড়ের যুদ্ধ নয়। মহাপুরুষদের লড়াই। তার dignity ঐশ্বর্য দেখার মতো। আপনি রমাঁ রোলাঁর ভক্ত। আমি বলছি, দু'জনকেই ডাকেন। রোলাঁ কি লড়েন নি?

বাবা তর্কে হেরে অন্য আশ্রয় নিলে। বললে, "জানো মাসের শেষ। বিদেশী খাবারপত্র যোগাড় করতে পয়সা কুলোবে না।"

"না, বাবা তা সত্য নয়।" ফুয়া জোর দিয়ে বললে, "মাইকেলকে দাওয়াত করেছেন। তিনি কি চিংড়ি চচ্চড়ি খাবেন নাকি? তিনি ত বার্নার্ড শ'র চেয়ে বড় সাহেব। শ' ত মাছ-মাংস খান না। দুধ রুটি দিলে যথেষ্ট। আর মাইকেল। গোল দীঘির ধারে কাবাব ত ছেলেবেলায় খেত। তার পরের ঘটনা আপনিও জানেন। সুতরাং আপনার ওকথা খাটে না।"

বাপ তবু আমতা-আমতা করতে লাগল। ছেলে কোপ চালালে সুযোগ বুঝে, "আপনি মাইকেলকে ডেকে বড় ভুল করেছেন। আমি ত মার কাছে শুনলাম, মোয়ায়েদ বখত চাচার কাছে দু'বোতল হুইস্কির দাম দিয়েছেন। ঠিকই করছেন। মাইকেল ত উঠান থেকেই হাঁকবে, Boy, এক বড়া হুইস্কি—whisky with water. আব্বা, হুইস্কির বোতলের দাম কত?"

জুহা ছেলের দিকে চেয়ে চট করে জবাব দিতে পারল না।

বংশধর কিন্তু কাবুলীর মতো পাওনাপ্রার্থী। কড়ায়গণ্ডায় সুদসহ। সুতরাং সায় দিতে হয়, "আচ্ছা তোমরা যখন বলছ, তখন বার্নার্ড শ'কে ডাকা যাক। কিন্তু সামলানোর ভার তোমার।"

"সারা য়ুরোপ যাকে সামলাতে পারে নি, তার ভার আমার ওপর নয়। মাইকেল পারবে," পুত্র জবাব দিলে। তারপর বেরিয়ে গেল।

পকেটে পয়সা না থাকলে খিদে লাগে বেশি। দেশী কথা, জুহার পক্ষে কিন্তু সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলতে লাগল।

খবর ছড়িয়ে পড়েছে। আর এক বংশধর তখনই এসে হাজির।

"আব্বা, আমি সব শুনলাম এখনই। আমার আর একজন অতিথি আছে," বলে সে জুহার দিকে তাকালে।

"না, না। এম্নি বেশি হয়ে গেছে। আর না।"

"বাবা, আমার কথা না শুনেই আপনি কেটে দিচ্ছেন— এ ভারি অন্যায়।"

পিতা রুক্ষস্বরেই বললে, "কে তোমার অতিথি? তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আমার কত কাজ জান? এখনই টেলিগ্রাফ অফিসে ছুটতে হবে। তারপর আছে বাজারের ফর্দ।"

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!"

"না, না। ও হবে না। আমার এখানে সব গণ্যমান্য আন্তর্জাতিক উদার-মনের মহাত্মারা আসবেন, সেখানে টিকিওয়ালা পণ্ডিত।" জুহা হাত ধোয়ার জন্যে যেন এবার তৈরি।

কিন্তু এই কিশোর বংশধর তপ্ত তৈলপূর্ণ কড়ার উপর সদ্য ছাড়া মৎস্যখণ্ডের মত ছ্যাঁক করে উঠল। শব্দ কি সহজে থামতে চায়।

"বলেন কি বাবা? টিকিধারী পণ্ডিত! সময়টা মনে রাখবেন। উনবিংশ শতাব্দী। গোঁড়া ব্রাহ্মণের ছেলে সমস্ত জগদ্দল সমাজের সামনে বুক ফুলিয়ে বললে, 'তোমরা যে-ধর্মের কথা বল, ও একটা ধোঁকাবাজি। একটা খোলস। যে-ধর্ম অবলার উপর এত অত্যাচার চালায়, পেষণ চালায় মানুষের উপর, মানুষের মর্যাদা দেয় না— সে হিন্দু ধর্ম আমার নয়। ধর্মের নামে তোমাদের এই ভণ্ডামি, অন্যায়ের যাঁতাকল, শোষণের গৃধ্নুতা আমি ভেঙে চুরমার করব।' করেছিলেন তাই। বিধবা-বিবাহ, সতীদাহ—।"

জন্মের সবক শিশুর কাছ থেকে নিতে নারাজ, তোড়ের মুখে তাই জুহা একখণ্ড পাথর ছুঁড়লে। "তা হবে কী?"

"আপনি তাকে বলেন টিকিধারী পণ্ডিত?"

"টিকিধারী ত বটেই।"

"আব্বা, আপনিও খোলস দেখেছেন— যেমন প্যান্ট আর হাওয়াই কামিজ লাগালেই আজকাল লোকে জেন্টেলম্যান হয়ে যায়—"

"ডেঁপোমি কর না।" জুহার কণ্ঠ রুক্ষ।

"বাবা, আমার কথাটা শোনেন। বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ আর একটা মানুষ আমাকে দেখান ওই সময়কার। টিকিধারী কিন্তু প্যান্টধারী মাইকেল তাকে দেবতা বলে জানত। আমি হয়ত ছেলেমানুষ, সব কথা—।"

"বাপ-ব্যাটার চ্যাঁচানিতে পাড়ার কাক-চিল সব উড়ে পালাল," জাইদুন এই সময় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে।

জুহা এবার যেন হালে পানি পায়। সমর্থন লাভের আশায় মুখ খোলে— "এই শোন। তোমার পুত্র-রত্ন আবার বিদ্যাসাগরকে ডাকতে চায়।"

"মা, ক'দিন আগে বিদ্যাসাগরের 'স্ট্যাচু' করতে গিয়ে, দেখলেন ত, ঠোঁট ঠিক হল না। একবার চোখাচোখি দেখলে, অবিকল গড়ে ফেলব। দেখেন না, আব্বা—," ততক্ষণে বংশধর মার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, না পয়সায় কুলাবে না।" জুহা রীতিমতো বিরক্ত।

পরিস্থিতি ঘোলা দেখে তখনই রায় দিলে জাইদুন, "আসুন না বিদ্যাসাগর। এক জন বাড়লে আর কী আসে যায়? আমি ত আগে বলেছি যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন।"

পানি আরো গড়িয়ে গেল। উঠানের মধ্যে আটকা থাকল না।

এল পাষণ্ড সাধু নাম প্রাণ-শশী আঢ্য। জাতি সুবর্ণ বণিক। পেশা আন্ডার-রাইটার। সে বললে, "জুহা, আমার একজন প্রার্থী আছে।"

— তোমার?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার। তুমি লেখকদের ডাকছ, আমিও ত লেখক। তবে তলার লেখক। আমি আসছি, আমাকে নেমন্তন্ন কর আর না কর।

পাষণ্ড না-ছোঁড় সুরে, নিজের দুর্বিনীত সৌজন্যে বোধহয়, হাসতে লাগল।

— তুমি সুহৃদ মানুষ। তা আসবে বৈকি।

— বেশ। কিন্তু আমার প্রার্থী আছে।

— প্রার্থী?

— হ্যাঁ। কেন লোক বেড়ে যাচ্ছে?

— তা ত যাচ্ছেই।

পাষণ্ড আবার আস্তিন-গুটানো গলায় ফরমান ঝাড়লে; "দ্যাখো জুহা, তোমার মতো মেনি-নরগুলোকে আমার দু'চোখে নেই দেখি। আরে লোক বাড়ছে ত কী হবে? খোলাখুলি বল না, মানিব্যাগে টান পড়বে সে ব্যবস্থা আমি করব। জান ত আমরা পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাই।"

সত্যি পাষণ্ড জুহার মাথার উপর হাতে বুলাতে লাগল।

জুহা জানে সে মোগলের হাতে পড়েছে। পেশা আর নেশার পেল্লায় ফারাক সত্ত্বেও প্রাণ-শশী সত্যি সুহৃদ-শশাঙ্ক। কাব্যের মর্ম বোঝে, ইতিহাসের চাকার খোঁজ রাখে, মনুষ্যত্ব তার মজ্জাগত। সুতরাং টেণ্ডাই-মেণ্ডাই করে একে ফেরানো হয়ত যেতে পারে, তবে তা শোভন হবে না, মন 'ডিটো' দেবে না।

শেষে সাংবাদিক বললে যথাশান্ত গলায়, "তোর প্রার্থীর নামটা বল। ভোটের ব্যাপার আছে।"

"ভোট? ভোটের উর্ধ্বে সে। হাজী মহম্মদ মহসীন।" পাষণ্ডের ঠোঁটে মিঠে-মিঠে হাসি!"

"হাজী সাহেবকে ডাকতে চাও?"

"আমি হুগলি কলেজের ছেলে। সেখানকার লেখাপড়ার ঋণ আমি ভুলতে পারি নি, পারব না। বেতন কম ছিল। বেতন দিত কেরানি দাদারা। তা না হলে আর under-writer পর্যন্ত বিদ্যে দৌড়োত না। একদম পাকাপাকি (writer) রাইটার হয়ে যেতাম। দৌড়তাম ইডেন বিল্ডিং অথবা রাইটার্স বিল্ডিঙে— দশটা-পাঁচটার ঘানি।"

জুহা সায় দিলে, "হাজী সাহেবকে ডাকার কোনো অসুবিধা নেই। মাইকেলকে খবর দিলেই হবে।"

"আঠার শতকে এত বড় Humanist আর বেশি দেখা যায় না। তখন মানবতার

AMARBOI.COM

রূপ-প্রকাশের অন্য উপায় ত থাকে নি। তুমি স্বীকার কর?" পাষণ্ড জুহার দিকে তাকায়। দুই জনে দুই চেয়ারে উপবিষ্ট। জুহা সাধারণ সৌজন্য রক্ষার্থে জবাব দিলে, "তা স্বীকার করি।" অবিশ্যি কথার মধ্যে তার প্রাণ ছিল না। কারণ, বোধহয় আগমনীর ইমন-ধ্বনি সে শুনতে পেয়েছিল।

"এই যে পাষণ্ড, তুমিও এখানে?" বলতে বলতে জাইদুন ঘরে ঢুকল।

নমস্কার, বৌদি। দেখা হলেই গাল দেবেন। ঐটি (জুহার দিকে আঙুল) কোন অণ্ড?

— ঐটি! বেশির ভাগই Pro-কাণ্ড আর অন্যথায় কুষ্মাণ্ড। এই দ্যাখো না কি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। হাতে মাত্র এক দিন। আমি ত হেফাই-সেফাই।

পাষণ্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে, "বসুন। কুষ্মাণ্ড তবু তরকারিতে লাগে।" হাসতে লাগল সে।

— আ মোর বরাত রে। তার আগে যে অকাল-যোগ আছে, ভাই। তরকারিতে লাগবে কী করে? আমি বসতে পারব না। হাতে নানা কাজ। বসো, পাষণ্ড বসো।

জাইদুন হাতের উপুড়-তালু উঁচিয়ে-নামিয়ে অতিথিকে সম্বোধন করলে। তারপর দৃষ্টি স্বামীর দিকে।

— তোমার খবর আছে কিছু?

— আর একজন Madam— হাজী মহম্মদ মহসীন অফ হুগলী ইমাম বাড়া।

— না, আমাকে বসতে হলো, ভাই পাষণ্ড।

জাইদুন চেয়ার টেনে নিলে আর একখানা।

— এই না কাজ ছিল বললে।

স্বামী সম্ভাষণ করে।

— কাজ ছাড়া আমি আছি নাকি? আমি কাজ কমাই তুমি তা বাড়াও। তফাৎ শুধু এ-ই।

জাইদুনের গলা এইমাত্র কড়ায় উঠেছে।

— আবার কী কাজ বাড়ালাম।

— তুমি জান, হাজী মহম্মদ মহসীন শিয়া ছিলেন?

— তা কী হয়েছে?

— তোমার মগজ কি অত পানি কাটে? আলাওলকে ডাকছ। তিনি সুফী। মহসীন শিয়া। পাড়ার লোকের জিভ আছে, না সব বোবা?

— দোষটা কী হলো?

জুহা পাষণ্ডের দিকে সমর্থন-লোভী দৃষ্টিতে তাকায়।

— শোন, পাষণ্ড-ভাই। বলে হল কী?

— সত্যিই ত হবে কী। শিয়া হয়েছে ত কী হলো। কী অপূর্ব মানুষ! আর মুসলমান ত?

পাষণ্ড এই দ্বন্দ্বের হদিস হয়ত ভালো বোঝে না। সে বোকার মতো একবার স্ত্রীর আরবার স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। জাইদুন গলায় একগাদা ঝাল উগরে তুললে, "শিয়ারা মুসলমান? তুমি আমি না হয় বলি। সুন্নিরা কী বলে? লাক্ষ্ণৌ-লাহোরে এত দাঙ্গা হলো কেন? তুমি জাস্টিস মুনীরের লাহোর রায়ট-ইন্‌কোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট

AMARBOI.COM

পড়েছ?"

— না।

— (তাচ্ছিল্যের সুরে) তা পড়তে যাবে কেন? তুমি পড়বে— শরৎচন্দ্র ক'টা বারাঙ্গনাকে সতী বানিয়েছে, অতিথিকে ঘরে শুতে দিয়ে পাশের ঘরে শুতে গেছে— বাতি নিভোয় নি— বিধবা প্রেম করছে, কিন্তু প্রেমিককে হাতের আঙুল পর্যন্ত ছুঁতে দেয় নি। পড় ত এই সব ছাইভস্ম—।

জাইদুন ভয়ানক চড়াও। জুহা তবু শান্তভাবে বললে, "আমার দরকার কী লোকটা শিয়া না সুন্নি, হানাফি না মালেকি, শাফেয়ি না হাম্বলি, লা-মজ্‌হাবি না বাহায়ি, হুকমতে-এলাহি না কাদিয়ানি— ওসব দেখার। আমি দেখব, লোকটা সৎ মানুষ কি না। ব্যাস!"

"আহা আমার যুধিষ্ঠির-নন্দন রে! হাত উপুড় করিয়া ভক্ষণ শেখেন নাই, চিৎ-তালুতে যে-যাহা দান করে তাহাই আহারে লাগান। তাহা হইলে আর সমস্যা কী ছিল? মিয়া সাহেব, ভিতরের মাল অপেক্ষা লেবেলের দাম অনেক বেশি।" জাইদুন গ্রীবা এবং ঠোঁট এমন ধনুক পর্যায়ে টেনে এনেছিল, তা দেখার মত।

কিন্তু প্রতিপক্ষ আজ কেন জানি না, বেশ কুঅৎ-সঞ্চয় করেই ক্রমশ গলা চড়ায়, "ঠিক তেম্নি আমি শৈব, শক্তি, ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, ব্রাহ্মণ, ডায়োসেসানিস্ট, এ্যানাব্যাপ্‌টিস্ট, কোয়েকার, বৈষ্ণব, কাদেরিয়া, চিস্‌তিয়া এপিস্‌কোপ্যালিস্ট, ক্যালভিনিস্ট, বেনেডিক্‌টান, এ্যাসিসিয়ান, শূদ্র-তফসিলি, ডায়োক্লিটান,— দূর ছাই সব কি মনে আসে, মুসলমানদের মত খ্রিস্টানদেরও কত রকম ঝাঁক আছে ওসব কিছু আমি বুঝি নে। আমি দেখতে চাই মানুষটা কেমন। সৎ না অসৎ। যদি সৎ হয় আমার লেবেল দেখার দরকার নেই।" জুহার ঝাঁজ এক্কেবারে কর্ণ-বিদারী।

"লেগে যা, লেগে যা ভেল্কি, লেগে যা, মা দুর্গা," পাষণ্ড দাঁড়িয়ে তখন হাততালি যোগে প্যালা দিতে শুরু করছে। নাচের ভঙ্গিতে দুই পা সুদ্ধ নড়ছে।

হেসে ফেললে জাইদুন। পাষণ্ড তবু থামে না, "লেগে যা মা দুগ্‌গা লেগে যা।" কিন্তু তার উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলে জুহা সুদ্ধ নিজে হেসে। এবার তিন জনে হাসতে লাগল।

"বৌদি, আমি আপনাদের সিভিল ওয়ারের মধ্যে নেই। হাজী সাহেব কিন্তু আসছেন", পাষণ্ড কোরাস থেকে কেটে পড়ে বললে।

"তা আসুন। ক্ষতি কী। কিন্তু জান ভাই দিনকাল খারাপ। লোকের জিভ নাড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।" জাইদুন ঠাণ্ডা হয়ে জবাব দিলে।

"ব্যস, ব্যস, থ্রি চিয়ার্স", পাষণ্ড আঙুল-যোগে 'ফট্' শব্দ করে হাত তুললে উপরে। এমন সময় বাড়ির চৌহদ্দির লগ্ন বেড়ার পাশে মটোরের হর্ন শোনা গেল।

জাইদুন চট করে উঠে, গলা বাঁকিয়ে বাইরে দেখে নিয়ে বললে, "আমি চললাম। তোমাদের জন্য চা বানাই গিয়ে, আরো হনুমান নাজেল হচ্ছে।"

"নবজলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব পাসরিয় গেলি।" চলে গেল জাইদুন।

পাষণ্ড-জুহা দুই জনে বাইরের দিকে তাকাতে উঠে দাঁড়ালে।

— এস, এস বঁধূ আধ-আঁচলে—। পাষণ্ড কুর্নিশের ভঙ্গিতে পদাবলী আওড়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল।

— ওরে ব্যাটা সুবর্ণ বণিক, বলতে বলতে ঘরে ঢুকল সৈয়দ বোক্‌জা কবি আমাসা। উভয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে রাখা ভালো। ফলে হোঁচট থেকে বাঁচা যাবে।

সৈয়দ বোক্‌জার আসল নাম কেউ জানে না। যে-প্রোফাইল দেখলে আপনার কাছে নিম্‌হিম নিম্‌তাপ শরৎকালের কথা মনে হবে, সৈয়দ বোক্‌জা তেমনই প্রোফাইলের অধিকারী। ফর্সা-রঙ খাড়া নাকের নিচ দিয়ে ওষ্ঠ-চিবুক ভাঁজে ভাঁজে নেমেছে দিগন্ত-বিলীন রেখার মত। পাশ থেকে মানুষটাকে ঢের সুন্দর দেখায়। চোখের পাতা, ভুরু উভয়ে চুম্বনপিপাসু ঠোঁটের মত বৃত্তাংশ-রেখার সমান্তরাল। গ্রীকদের কাছে ফিগার হিসেবে বৃত্তের শ্রেষ্ঠতার হদিস এখান থেকে ধরতে পারবেন। চেহারাটা সত্যি ক্লাসিক্যাল। অবিশ্যি সৈয়দ সাহেব কোনো কালে প্রাচীন সাহিত্যের সমজ্‌দার ছিলেন না, যদিও পড়তেন ভালো। সুগঠিত দেহ, তার চেয়ে সুগঠিত কণ্ঠ— মাইকে সুরের 'ডাইক' গড়ে তুলতে পারে। এহেন সৈয়দজাদা একবার প্রাণপ্রাচুর্যের গুঁতানিতে দু' ঘণ্টায় দশ বোতল বিয়ার, পাঁচ পেগ্‌ হুইস্কি সাবড়ে দিয়েছিলেন। বন্ধুরা বললে, "হে নরপুঙ্গব, তুমি সত্যই বোতল-কতল-জান্‌।" সেই থেকে সংক্ষেপে সৈয়দ বোক্‌জা, খ্যাত বা অখ্যাত।

সাম্প্রতিক কবি, যাদের কাব্যে মিলের বালাই নেই, ভাবের বালাই নেই— ঠিক পুরোপুরি তেমন বালাইমুক্ত চারণ নন কবি আমাসা। আসল নাম আমাসাহ্‌। সুহৃদরা সংক্ষেপ করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। তবে অন্য লোকজন থাকলে ডাকে সাহ্‌-সম্বোধনে। শ্যাম-চেহ্‌রা ঈষৎ নাদুস-নুদুস। সৈয়দ বোক্‌জা যদি শারদীয় সকাল ত আর একজন দারুণ গ্রীষ্মে দুপুরের কাঁঠালকুঞ্জের তাপহর শ্যামচ্ছায়া— শীতলতা ও আবেশের ভণ্ডামি যা ঘুমের চেয়ে স্বপ্নের যাদু অনেক বেশি টেনে আনে।

সাহ্‌ সাহেব পাষণ্ডের পিঠে এক গুঁতা দিয়ে বললে, "এই সুবর্ণ বণিক! তোর কীর্তন্‌ রাখ, সোজা হ।"

হৃদ্যতার তোড়ে জুহার কামরা গম্‌গমে। শুধু গৃহস্বামীর মনে কিঞ্চিৎ অসোয়াস্তি। এদের বলা হয় নি।

সকলে যে-যার আসনে বসল।

সাহ্‌ সাহেব বললে, "ওরে সুবর্ণ বণিক, তুই কেন এখানে? আমরা ত দাওয়াত নিতে এসেছি।"

"দিতে নয়?"

"না।"

পাষণ্ড হাঁড়ি ভাঙলে। জুহা হাত কচলে দুঃখ প্রকাশ করবে কি তার আগেই সকলে রায় দিলে, "life's chance সারা জীবনে এই সুযোগ ক'টা আসে। আমরা শুধু অতিথি নই।"

সৈয়দ বোক্‌জা বললে, "আমরা সৎকারকও বটি। এখন কিং কর্তব্য?"

পাষণ্ড ফোড়ন দিলে, "Menu মেনু-সংহিতা রচনা কর। আমরা সবাই শরীক।"

"নিশ্চয়।" তিন জনে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"It must be a banquet— হ্যাঁ, একটা মোচ্ছব হওয়া চাই।" বললে, সৈয়দ বোক্‌জা।

"খেয়াল আছে মাসের শেষ। ব্যাটা, ঘুষ খাচ্ছিস নাকি আজকাল?" পাষণ্ডের মুখ থেকে তপ্ত হাসির ঠাণ্ডা লাভা বেরুল।

"তবে তুই ব্যাটা, সব টাকা দে।" গর্জে উঠল সৈয়দ বোক্‌জা।

"দেব। মাঝামাঝি কিছু কর। জানিস ত আমি মাথায় হাত বুলিয়ে খাই— underwriter।"

"আমরা তোর মাথায় হাত বুলাব।"

পাষণ্ডের মাথায় সামান্য টাক ধরেছিল। তাই বললে : নে। তুই সৈয়দ। তোর পাক্‌স্পর্শে যদি আবার চুল গজায়।

সাহ্ বললে, "শোন! আগে 'মেন্যু' ঠিক করে ফেলা যাক্।"

"আমিও আছি— " বলতে বলতে ঘরে ঢুকল মোয়ায়েদ বখ্‌ত। হাতে কাগজে মোড়া দুটি মোড়ক। বলে রাখা ভালো মোয়ায়েদ সাংবাদিক।

সকলের দৃষ্টি তার দিকে। এত জানাজানি, আর ত কিছু জানার নেই। পাষণ্ড জিজ্ঞেস করলে, "তোর হাতে কী?"

"কিছু না", মোড়ক দুটো সে কোণায় রাখা একটা টেবিলের উপর রেখে এসে বসল। কিন্তু উঠল পাষণ্ড। সে মোড়কের বোরখা তুলে, "স্কচ— হাইল্যান্ড-নন্দন" রবে প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠল। দুই বোতল হাতে সে নৃত্য শুরু করে আর কি; মুখে "হে হাইল্যান্ডার অমৃত"-রব।

উঠে এলো সৈয়দ বোক্‌জা! সে আর এক বোতলের ঘেরাটোপ খুলে ফেলল। ভালো উর্দু জানে সৈয়দ, আবৃত্তি করতে লাগল নিজের গমগম সুরেলা কণ্ঠে :

রাত পিতে হিগুজার যাতি হ্যায় মায়াখানু মে।
সুবেহ্ উঠ্‌কে মুঁহ দেখ্‌তা হুঁ পায়মানু মে॥

অপিচ বাংলায়—

সুরালয়ে সারা রাত্রি কেটে যায় পানে।
পানপাত্রে মুখ দেখি উঠিয়া বিহানে॥

পাষণ্ড মোয়ায়েদ বখ্‌তের দিকে আড়চোখে চেয়ে বললে, "তোর ভালো কাল-বোধ আর রস-জ্ঞান আছে দেখছি। এই মোয়াবক (মোয়ায়েদ বখ্‌ত সংক্ষেপে— পাষণ্ডের আবিষ্কার) আজ জমবে ভালো।"

মজ্‌কুর ব্যক্তি কিন্তু ধাঁ করে উঠে এসে দু' জনের হাত থেকে বোতল কেড়ে নিলে। মুখে রীতিমত ধমক, "এটা তোদের জন্য নয়।"

"আমাদের জন্য নয়?" হতাশাব্যঞ্জক দ্বৈত রব।

"না। অনেক কষ্টে যোগাড়। মাইকেল আর রমাঁ রলাঁ খাবে কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ বোক্‌জা তুপড়ি ছাড়লে, "আরে তাদের নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন?" রমাঁ রলাঁর জন্ম ফ্রান্সের বার্গান্ডি এলাকায়। 'বার্গান্ডি' বুঝেছিস? তুই ব্যাটা, তাকে হুইস্কি খাওয়াবি? তোর আবার রসবোধ কবে থেকে হলো রে। আমি যোগাড় করব বার্গান্ডি, বুঝেছিস মোয়াবক।

"সৈয়দনন্দন, কি যোগাড় করবে, আমার জানা আছে। চেন ত ধানেশ্বরী। মুখে বল শেরী— sherry।" মোয়াবক গুঁতোর ভঙ্গিতে পাষণ্ড এবং বোক্‌জার দিকে বোতল ঠেলা দিলে।

সাহ্ কবি চেয়ারে হেলান ও সামনে পা ছড়াতে ছড়াতে নিজস্ব অভ্যাসোচিত কায়দায় চোখ বুজে আবৃত্তি শুরু করলে :

শেরী মুখে, ছেড়ি বুকে,
দুবৃত্তেরা গান গায় সুখে।
আমাদের জীর্ণ দিন যায়
কুকুরের মত পথ শুঁকে শুঁকে॥
নিয়তি কিসমৎ তার নাম,
বলে গেল স্রষ্টার উল্লুকে॥

মোয়াবক তেতে উঠল, অন্যেরা হেসে উঠল। মোয়াবক বললে, "এখন কাব্যের সময় নয়, কাজের সময়।"

পাষণ্ড জবাব দিলে, শয়তানের পর আর যদি কেউ বহু-ব্যস্ত থাকে সে হচ্ছিস তুই। তোর তাড়া আছে বুঝি?"

"তাড়া হয়ত আছে। কিন্তু এখন আসল কাজের কথা হয়ে যাক। 'মেন্যু ঠিক কর।" তাড়া দিলে মোয়াবক।

সৈয়দ বোক্‌জা এগিয়ে এলো, "তা খুব সহজ কাজ। বেগম জাইদুন দেশী খানা বানাবেন। চচ্চড়ি ঝোল ভাজা শুক্তো অগয়রহ। আর আমরা বিদেশী খানা কোন চৈনিক হোটেল থেকে নিয়ে আসব।"

সমস্বরে কোরাস উঠল, "That's it।"

সাহ্ কবি এতক্ষণ নির্বিকার ছিল, সে বললে, "আমিও ভোজন-বিলাসী। কিন্তু এখানে ভোজনটা আসল কথা নয়। আসল কথা গুরু-দর্শন।"

"ভোজন আসল কথা নয়?—আচ্ছা—," পাষণ্ড প্রায় শাসানির ভঙ্গিতে কবির দিকে তাকালে।

"চুপ, চুপ", সৈয়দ বোক্‌জা সাদা নিশান উড়াতে চায়।

পাষণ্ড কিন্তু নিজের বন্দুক আর ছাড়তে চায় না। ফায়ার করলে, "ভোজন কিছু নয়? ভোজনই সব। এই যে-সব মহাপুরুষ দেখছ বা দেখবে— এরা ভোজন ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। ভোজন তারপর ভজন। যে ব্যাটারা ভোজন বাদ দিয়ে শুধু ভেজিনের কথা বলে, তারা সব বেঈমান, ভণ্ড, মানুষের দুষমন। তারা—।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধা দিলে মোয়াবক, "ওরে ব্যাটা সুবর্ণ-বণিক, তুই যে হঠাৎ মেসিয়া'র মত বাণী ছাড়ছিস। ক্ষেপে যাচ্ছিস কেন?"

"কবি আমাসা এমন বেফাস কথা বলবে কেন?"

"আরে এখানে কি আমরা ডিবেট করতে এসেছি? আসল কথায় আয়।"

সাহ কবি মৃদু হেসে পাষণ্ডের দিকে চোখ ঠেরে বললে, "তবু পেটে দু' ফোঁটা কারণ-বারি পড়ে নি।"

সৈয়দ বোক্‌জা : Order, order., gentlemen।

মোয়াবক : দ্যাখো, আমার সময়ের মূল্য আছে।

পাষণ্ড : তোর চুলোয় যে দশ ঘরের হাঁড়ি চড়ে।

মোয়াবক : তা চড়ে। বাজে কথা বন্ধ রাখ।

সৈয়দ বোক্‌জা : আমার কথাই রইল।

সাহ কবি : আমার একটা সংশোধনী আছে। চৈনিক 'ডিস'— দু-একটা।

মোয়াবক : সাংহাই না হংকং?

সাহ কবি : না, সেগুন বাগিচা।

পাষণ্ড : (তুমুল হাস্য) সেগুন বাগিচার চীনে হোটেল ছাড়া মোল্লা আর কত দূর দৌড়াবে?

সাহ কবি : ওরে সুবর্ণ বণিক, তুই কদ্দুর যাস সেদিন দেখা যাবে।

জুহা এতক্ষণে শব্দ-তরঙ্গে ওঠানামা করছিল, কতকটা "খাবি' খাওয়ার মত। সে এবার মুখ খুললে, "এদিককার বন্দোবস্ত জাইদুন পারবে। এখন তোমরা ঠিক কর। আর একটা কথা। তোমাদের বোতল-গণনা সেরে নাও।"

পাষণ্ড চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল, "ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, চাঁদ। আমি ত—।" জাইদুন ট্রে-ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে কামরায় ঢুকল। পাষণ্ডের উৎসাহে ছেদ পড়ল।

আদাব-আদাব রব চতুর্দিক থেকে।

"এখন জবাব দেওয়ার সময় নেই, ভাই। পাষণ্ড, তুমি এদের চা বানিয়ে—।"

"গেলাও", পাষণ্ড জাইদুনের বাক্য সমাপ্ত করল।

"তা করছি, ভাবী সাহেবা। কিন্তু আপনি, একটু সবুর করলে—।"

"মেওয়া ফলবে না— " কথা প্রায় শেষ না করেই জাইদুন বিদায় নিলে।

পাষণ্ড চা বানাতে বানাতে বললে, "বোতল-গণনার আগে আদম-শুমারি করতে হয়। প্রায় এক ডজন লোক। সুতরাং বার বোতল লাগবে কম-সে-কম।"

"সে তোমরা বন্দোবস্ত কর", জুহা চায়ের পেয়ালা হাতে নিতে নিতে বললে।

এবার চায়ের পেয়ালা প্রায় সকলের হাতে। পাষণ্ড কাপে চামচ নাড়ছিল।

"Yes, বার বোতল কম-সে-কম। মাইকেল, সৈয়দ বোক্‌জা সেদিন কী রকম ফর্মে থাকে আল্লা মালুম। সুতরাং আগে থেকে প্রস্তুত থাকাই ভালো। আর পাঁচ বোতল বাড়িয়ে দাও।" চায়ে চুমুক দিতে দিতে পাষণ্ড প্রসঙ্গে খোঁচা দিলে।

সাহ কবি : আমি মুসলমানের ছেলে। আমি (gin) জ্বীন ভক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাষণ্ড : আমি হিন্দুর সন্তান (rum) রাম-ভক্ত।

মোয়াবক : তৌবাস্তগফেরুল্লা.. তৌবাস্তাগফেরুল্লা...

জুহা : আমি কবি রসিক vermouth ভাঁড়মুৎ-পিয়াসী।

মোয়াবক : তৌবাস্তাগফের...

পাষণ্ড : ভাঁড়-মুতে শেষ পর্যন্ত?

সকলে একযোগে চাপা-হাসির ধাক্কায় নাক-মুখ দিয়ে কিছু চা ছড়ালে। অবিশ্যি কারো কাপড় নষ্ট হয় নি।

সৈয়দ বোক্‌জা হাসির তোড় থামাতে খুব গম্ভীরস্বরে বললে, "এই দেশে যে আড়াই ঘর সৈয়দ আছে আমি তাদেরই এক কুলের ঝাড়-প্রদীপ। সাগ্‌গা সৈয়দজাদা। এবম্বিধ বেসরা প্রস্তাবে আমার কদাচিৎ উৎসাহিত হওয়া উচিত।"

অন্যান্য সকলে হো হো শব্দে হেসে উঠল। পাষণ্ড খিক্‌খিক্ হাসি তুলে, চায়ের কাপ ফেলে, চেয়ার ছেড়ে অঙ্গভঙ্গি-সহকারে বারবার দোহা আওড়াতে লাগল :

সৈয়দ বোতল-কতল-জান্,
ছিন্ লিয়া মেরা প্রাণ
সৈয়দ বোতল-কতল-জান্...

সৈয়দ বোক্‌জা তখনও হিমালয়। মৌনতা ভাঙল, "order order gentlemen রবে।"

"চুপ, চুপ! দেখা যাক সৈয়দ কি হাদিস ছাড়ে", পাষণ্ড আলোড়ন থিতাতে হাত তুললে।

"না, এখানে মাইকেলকে কিছু কন্‌সেসান দিতে হয়! তা ছাড়া আর এমন বে-শরা কাজে কেউ এগোবে না। খোদ্ আলাওলের মত সাত্ত্বিক কবি থাকছেন আমাদের মধ্যে। তার সামনে বেয়াদপি শোভন হবে না!" সৈয়দ বোক্‌জা বেশ সুস্থ মুরুব্বির মত বললে।

পাষণ্ড আগে এক চোট হাসলে তারপর বললে, "হে বৃদ্ধা ডট-ডট তোমার তপস্বিনী-অভিনয় এবং অশোভনতার আশঙ্কা অমুলক! আলাওল আদৌ সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন না।"

"ছিলেন না?" চ্যালেঞ্জ করলে সৈয়দ বোক্‌জা।

"না।"

"প্রমাণ দাও।"

"তোকে আর কী প্রমাণ দেব। আগে ত ইংরেজি-সাহিত্য পড়াতিস। আর এদেশে যে 'গ্রেট'রা ইংরেজি লিটারেচার পড়ায়, তারা দেশের কিছুই খোঁজ রাখে না। ব্যাটাদের রস-বোধ কী আছে, খোদা জানে। আর ওরা জানে, বিদেশী সমালোচকদের মুখে ঝাল খেতে। কথায় কথায় দেখাবে— এ.সি.ওয়ার্ড, আই. এ. রিচার্ড, হার্বার্ট রীড, এডমন্ড উইলসন এট্‌সেটরা। ইউরোপের সার্টিফিকেট না পেলে, ওরা কাউকে কল্কে দেবে না। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-সচেতন হয়ে উঠল দেশের লোক। তবু হাজার ভালো ইংরেজি লিখলেও যদি না সাহিত্য-ইতিহাসের এক কোণায় 'এ্যাংলো

ইন্ডিয়ান' রাইটার বলে ওদের জায়গা দিত। ছোহ্।"

"ব্যাটা আন্ডার-রাইটার, আসল কথা বল। তোর বক্তৃতা শোনার সময় নেই", কোপ মারলে সাহ্ কবি।

সৈয়দ বোক্‌জার সেই দশা। আলাওল পড়েছ কিছু? ওরে সৈয়দজাদা, শোন—

কদাচিৎ একেবারে না খাইবে জল।
অল্পে অল্পে তিনবারে পিয়ন কুশল॥

সৈয়দ বোক্‌জা : লিখেছেন?

মোয়াবক : তোহ্‌ফা নামক গ্রন্থে।

সৈয়দ বোক্‌জা : কিন্তু সে ত জলের কথা। পানি কা বাৎ।

পাষণ্ড বোক্‌জার পিঠে এক থাপ্পড়যোগে বললে, "তোকে কলেজ থেকে বের করে দিয়েই ভালো করেছে সবাই। আ রে— ওখানে পানি মানে কোন পানি? জল আবার কেউ রসিয়ে রসিয়ে খায়? ওটার অর্থ সেই এক বিশেষ পানি।

"আচ্ছা, তা আমার জানা ছিল না।" বোকার ভান করে সৈয়দ বোক্‌জা জবাব দিলে।

"তোমার জানাটা আছে কী? তুমি শুধু চেন বোতলের গন্ধ। আর শোন যে-লোক পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় নিজের সমস্ত কাব্যশক্তি উজাড় করে দিয়েছেন, তিনি বুঝি সাধারণ পানিয় কথার কালি খরচ করবেন?" পাষণ্ড বগল-বাজানো কণ্ঠে বক্তব্য শেষ করে চেয়ারে বসল।

"তবু— তবু—" সৈয়দ বোক্‌জা আবার মচকাতে শুরু করলে।

এগিয়ে এল মলম দিতে সাহ্ কবি, "আহ্, সৈয়দ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছ। আব্বাসীর কবি আবু নওয়াস— মৃত্যু তারিখ মনে রাখিস— ১৯৮ হিজরি— লিখেছেন :

ফাল্‌খামারা ইয়াকুতন ওয়াল কা'স লুলুয়াতুন
মিন কাফে লুলুয়াতিন হামসুকাতুন আল্ কাদ্‌দী
তাস্‌কীকা মিন্ তারফেহা খামারান ও মিন ইয়াদেহা
খামারা ফা মা-লাকা মিন সোকরাইনে মিন বোদ্‌দী।

তুই ত নামে সৈয়দ আরবি জানিস নে। শেষ দুই ছত্রের বাংলা শোন, আব্বাসীর কবি সাকী প্রিয়তমার উদ্দেশে কী বলছেন :

শুধু হাত নয় তার, নয়নও
মদিরা বিলায়।
মোহ-পাশ থেকে তার, বন্ধু,
তোমার মুক্তি নাই॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পরেও তুই শরাবে-শরা উচ্চারণ করবি?"

"আমার ভয় হচ্ছে। আরো সাত্ত্বিক আছেন, যথা বার্নার্ড শ'।"

"এলেন টেরীর সঙ্গে শ'র প্রেম-পত্র বেরুনোর পরও তুই এই কথা বলছিস? সাত্ত্বিক মানে কী? সাহ্ কবি একদম ডুয়েলের ভঙ্গিতে বললে।"

মোয়াবক তার সুতো ধরে নিলে, "আরে তুই সৈয়দ আমিও সৈয়দ। শোন্। আব্বাসীয় যুগেই মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-শিল্প চরম শিখরে উঠেছিল। কারণ কী জানিস?" যারা ভোগ করে, তারা উপভোগ করা শিখতে পারে। যারা ভোগ করে না, তারা জানে শুধু দুর্ভোগ। আশা করি ভোগ-উপভোগের ফারাক তোকে শেখাতে হবে না।"

"কিন্তু ভোগ থেকে যে উপভোগের শিক্ষা আসে, তার ত সঠিক প্রমাণ নেই।"

"আছে। উপভোগ-শিক্ষা করতে গেলে ভোগ চাই। অবিশ্যি ভোগী যে উপভোগী হতে পারবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মানুষকে উপভোগ শেখাতে হলে ভোগের দরজা খুলে দিতে হবে। যদি না কর— তার পরিণতি দুর্ভোগ। বেনো জলে ডিম আসে। এখন মাছের ডিম চাইবে অথচ বেনো জল চাইবে না, তা হয় না। তবে দেখতে হবে কুমির না ঢুকে পড়ে। সুতরাং—" হঠাৎ হাত উঁচিয়ে আঙুল নেড়ে মোয়াবক প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠল, "আমি এসব গণ্ডগোলে নেই। মহাজ্ঞানী মহাজন সঙ্গে এক রাত্রি বাস। আমার পুরো এক বোতল হুইস্কি আর এক পাঁট চাই-ই। তা থেকে আমি সরতে পারব না।"

"তুই ব্যাটা যে এতক্ষণ তোবা-মন্ত্র জপ করছিলি", শুধালে পাষণ্ড।

"সে তোদের রকম দেখে। তোরা যে-সব কথা বলছিলি, তার চোটে ত শয়তানই ভেগে পালাবে। আমি তাই two negatives make one positive, দুই 'না'-দিয়ে 'হ্যাঁ' করাচ্ছিলাম", মোয়াবক জবাব দিলে।

সৈয়দ কোণঠাসা, কিন্তু সাহ্ কবি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "Bibacity is vivacity— সোমরসই প্রাণরস। র‍্যাবেলে ব্যাটা ঠিক ধরেছিল।"

সৈয়দ চুপ থাকতে পারল না। শেষ কোপ মারলে, "বেশ। আমার কিন্তু কোন limit নেই সেদিন। রাজি?"

সকলে : রাজি।

সৈয়দ : বেশ, সেইভাবে এন্তেজাম চালাও।

জুহা এই সময় দধিভাণ্ডে একটু চুনা ফেলে দিলে যেন, "তোমাদের যা কাণ্ড-কারখানা। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়ির আসল মালিক জাইদুনের মতটা নিতে হয়।'

"বেশ, বেশ। আমরা সুপারিশ ধরব। তুই ব্যাটা চুপ থাকিস।"

চা-পান সমাপ্ত। জাইদুনকে ডেকে নিয়ে এল জুহা। সে বসে না, হাতে কাজ আছে। শুধু ফরমান শুনতে চায়।

প্রথমে তাই সৈয়দ বোক্‌জা বিনীত কণ্ঠে দণ্ডায়মান অবস্থায়, কুর্ণিশ ভঙ্গির পর শুরু করলে, "ভাবী সাহেবা, আমরা অর্থাৎ এখানে যে ক'জন পামর আছি, সকলে মহাপুরুষের সঙ্গ ধরে মানব-জন্ম সফল করার জন্য অতীব ব্যগ্রতাসহ আকুল। তার

প্রথম সোপান কিঞ্চিৎ হৃদয়মঞ্জনার্থে আদিম বারি-পান। একুনে পনের-বিশ ভাণ্ড হতে পারে। কিন্তু সবই আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। যেহেতু আপনি এই গৃহের যাবতীয় চরেন্দা-পরেন্দার মালিক।"

"মানুষের আনন্দে আমি কোনো দিন পাকা মই দিতে অভ্যস্ত নই" জাইদুন উত্তর দিলে।

জুহা ছাড়া সমস্বর উঠল, "ব্র্যাভো, বহুৎ খুব।"

"আরে— আমি তেমন সঙ্কীর্ণমনা নই যে, মানুষের পানীয়ে কোন বাধা সৃষ্টি করব। যেহেতু ধর্মমতে তৃষ্ণার্তকে তৃষ্ণা নিবারণের কিছু দেওয়া বহু পুণ্যের কাজ। আমি সেই পুণ্য সঞ্চয় থেকে কখনই বঞ্চিত হতে পারি না।"

সমস্বর : ব্র্যাভো। জাইদুন বেগম জিন্দাবাদ...জিন্দাবাদ। পাষণ্ড বললে, "অপূর্ব ভাবী সাহেব।"

"তবে—"

"তবে— কী।" আবার সমস্বরে জিজ্ঞাসু।

"তোমাদের একটা Oath 'ওথ' বা শপথ নিতে হবে," জাইদুন শর্ত দিলে।

"বেশ, বেশ।"

"তাহলে সকলে দাঁড়াও। শপথ-উৎসবের পরিচালনা আমাকেই করতে হবে," জাইদুন কথা শেষ করল।

এবার মজলিস খাড়া। কাতার-বন্দি, যে যার চেয়ারের সম্মুখে।

"শপথ, আমার উচ্চারণের পর তোমরা তিন-তিন বার বলবে।" আদেশ দিলে যেন জাইদুন। সকলে সম্মতি জানায় সংআগ্রহে।

জাইদুন : আমরা সেদিন কুবাক্য বলিব না।

সমস্বর : আমরা সেদিন কুবাক্য বলিব না।

(তিনবার)

জাইদুন : আমরা সকলে নিজেদের পোশাক-সচেতন থাকিব!

সমস্বর : আমরা....(তিনবার)

জাইদুন : আমাদের প্যান্ট পাজামা ধুতি যে যাহা পরি খসিতে দিব না।

সমস্বর : আমাদের ...(তিনবার)

জাইদুন : আমরা কেহ ওয়াক ওয়াক শব্দে বমি করিব না।

সমস্বর : আমরা...(তিনবার)

"ব্যাস, এই পর্যায় খতম", বলার সঙ্গে সঙ্গে জাইদুন পালট মেরে কক্ষের বাইরে চলে গেল।

পাষণ্ড মুখ খুললে, "ওয়ান্ডারফুল ভাবী।"

সৈয়দ বোক্‌জা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, "এখন দরকার শুধু Bon apetite-এর ব্যবস্থা।"

AMARBOI.COM

মেঘনা নদী।
এই নামে সাহসী মাঝি মাল্লাদের বুকের পাটাও টলত। মিশকালো পানির দিকে তাকিয়ে বহুবার জন্মভূমি গ্রামের নাম স্মরণ করেছি। তীরভূমির সমস্ত গাছপালার মায়া আর হাতছানি উপলব্ধির একমাত্র জায়গা মেঘনার বুক। গোধূলির অন্ধকারে দিকচক্রবাল মুছে যায়। দু-একটি নক্ষত্র তখন প্রতিবেশীর মত শুধু সান্ত্বনা জানায়। উন্মত্ত ঢেউ বজরার চারপাশে আছড়ে পড়ে। মাল্লাগণ বদর-বদর রবে দাঁড় ফেলে। এই সময় ব্যক্তিগত চিন্তা দিগন্তরেখার মতই মুছে যায়, অথবা অন্ধকারে বিলীন কোন ভয়াবহতার অজানিত স্পর্শ অনুভব করে। দুনিয়ার সমস্ত কাব্য তখন প্রকৃতির সেই উদ্বেল ভ্রুকুটির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অন্তর্মুখর নিঃশব্দতায়।

আমি বজরার জানালা খুলে চেয়েছিলাম। চারদিকে আবছা। বাপজান আমার কামরায় শুয়েছিলেন। কিছুক্ষণ আগে একজন গোলাম শামাদান জ্বেলে দিতে এসেছিল। তিনি বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাইরে লস্করেরা দু-একটা বাতি জ্বেলে রেখেছিল। হয়ত নিজেদের দাঁড়, রশি অগয়রহ সামলাতে। সন্দীপ ছাড়িয়ে আমাদের বজ্‌রা তখন বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ কখন উঠবে, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত রাত্রি হয়ত অন্ধকারের পাড়ি। ভাবলাম, শামাদান জ্বেলে মালিক মহম্মদ জয়সীর পদুমাবৎ কাব্যখানা একবার পড়া যাক। অনেককাল আগে পড়া। ওস্‌তাদের কাছে তখন নতুন মাত্র হিন্দি জবান শিখছি। বেশ ভালো লেগেছিল। কিন্তু ভাষার উপর ত দখল ছিল না। উৎসাহের তলা বয়ে হয়ত আসল রস গড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাহিনীখানা বেশ মজাদার। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিস্মৃত হতে পারি নি। আশ্চর্য ক্ষমতা কবির।—

মনে এই জাতীয় জোয়ার-ভাটার খেলা। জনাব শামশের কুতুবের কাজে বাপজান বড় পেরেসান। তিনি অন্ধকারে হয়ত চিন্তামগ্ন বা ঈষৎ তন্দ্রা উপভোগ করছিলেন। সুমসাম অন্ধকার। শুধু দাঁড় আর ঢেউ মেঘনার কুটিল কালো বুকে বাক্য উচ্চারণের সাহস রাখে। ছলাৎছল শব্দে হঠাৎ লাচারী ভাটিয়াল রাগের কথা মনে হলো। গুনগুন শব্দে গান গাইতে লাগলাম। বাপজান এসব ব্যাপারে আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। সেইজন্য শেখ ইউসুফ দেহলভীর তোহফাতুল নেসায়েহ নামক কেতাব থেকে বয়েৎ আবৃত্তি করে শোনাতেন। তারি মধ্যে আছে দুই মেস্‌রা বাংলা তরজমায় দাঁড়ায় :

মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার।
মহৎ চরিত্র শুদ্ধ ভাব জন্মে যার ।।
হাদিসে খবর দিছে রসুল-ঈশ্বর।
তুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর ।।

আমার কণ্ঠস্বর বেশ মধুর ছিল। বাপজানের উৎসাহে তাই আদৌ ভাটা পড়ত না। তখন অভিজাত আমির-ওমরা মহলে গান বাজনার রেওয়াজ ছিল।গ্রাম এলাকায় নৃত্য-

গীতের স্রোত বইত বলা চলে। কারণ, কোন উপলক্ষ-অছিলা-পর্ব— গান ছাড়া জমত না। কেবলা সাহেব বলতেন যে-কওম গান-বাজনার কদর ভুলেছে, তাদের কেয়ামৎ নজদিগ। হাজী মোহসেন সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, আওরঙ্গজেব নামে এক মুঘল-বাদশা নাকি খুব কট্টরামি শুরু করেছিল গান-বাজনার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুঘল-বংশ ধ্বংস হতে কি তারপর বেশি দেরি হয়েছিল? তিনি জবাব দিলেন, মোটেই না। তারপরই 'নাসারা' আমল শুরু। হারাধনের দশটি ছেলের মত সব মুঘল নিপাত। আমির থেকে বনল গোলাম। তবে আওরঙ্গজেবের নাকি একটা খেরেস্তানি-নাসারা বেগম ছিল শোনা যায়। নাম মেরি। বিবির ভাইদের বাদশাহী ছেড়ে দেওয়ার পথ পরিষ্কার করেছিলেন তিনি। বিবির বেরাদর এক তরফ, সারা দুনিয়া আর এক তরফ। তা স্বাভাবিক। কী বলেন, হাজী সাহেব?

কবি আলাওল হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলে।

অকুস্থলের কিছু পরিচয় দিতে হয়।

সৈয়দ বোক্‌জা কথা ঠিক রেখেছিল। বাড়ির পেছনে ঘাসে ঢাকা লনের উপর শেষ পর্যন্ত আসর বসল। কারণ, এখানে সরঞ্জাম অনেকটা আগেই পাতা ছিল। প্রায় সাত-আট কাঠা জায়গা। গৃহশোভিনী লতাপাতা, ফুলের গাছ তার কিনারায় কিনারায়। মাঝখানে বিরাট চত্বর। কয়েক দিন আগে খোলা আকাশের নিচে একটা নাটক অভিনীত হয়। তার মঞ্চ পড়ে আছে। তা কাজে লাগানো গেল। মঞ্চ অবিশ্যি সাধারণ দেশলায়ের বাক্স-মার্কা নয়। চতুষ্কোণ জমির উপর কাঠ দিয়ে বানানো ধাপে ধাপে উঠে-যাওয়া চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ি যত উপরে উঠেছে, নিচের জমির পরিমাপ-অনুপাতে তার বেষ্টনী গেছে তত কমে। চতুর্দিকে একই ডিজাইন। একদম শীর্ষে একটা ক্রশ-চিহ্ন। নাটকটার বিষয়বস্তু মনে নেই। কিন্তু অভিনয়ের জন্য মঞ্চ প্রয়োজন ছিল।

সৈয়দ বোক্‌জা তা-ই কাজে লাগিয়ে দিলে। সে পাড়া থেকে কিছু ছোট-ছোট 'কুশন' চেয়ে এনে চতুর্দিকে সাজিয়ে ফেললে ধাপে ধাপে। ধাপের গায়ে অতিথিদের জন্য সুন্দর বসার ও হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা। খোলা আকাশ। তার উপর পূর্ণিমার ধবধবে জ্যোৎস্না। মহান অতিথিদের অভিনন্দন দিতে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কল্পনা করা যায় না।

মঞ্চের বাম দিকে একটা করবি গাছ ছিল। খুব ঝাঁকড়া নয়। সৈয়দ বোক্‌জা সেখানে পাড়া থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছিল একটা পিয়ানো। রলাঁ নিজেই ত জাঁ খ্রিস্তফ। সুতরাং পিয়ানোটা কাজে লাগবে না, সৈয়দ বোক্‌জা তা কল্পনাই করতে পারবে না। বিজলি বাতির বন্দোবস্ত ছিল প্রচুর। কিন্তু চাঁদের আলো উপভোগ করার জন্য অতিথিরা তা নিভিয়ে দিতে বলেছেন। অতিথিদের মধ্যে অসুস্থ সাহিত্যবিশারদ সদুঃখ সক্ষোভ জানিয়ে দিয়েছেন, আসতে পারবেন না। মাইকেল এখনও এসে পৌছান নি। গৃহস্বামী জুহা তাই বার বার বাড়ির প্রবেশ পথ পর্যন্ত ছোটাছুটি করছেন। বিদ্যাসাগরের আসতে ঈষৎ বিলম্ব হবে। কারণ দামোদর নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। যাতায়াত বড় কষ্টকর। এ-সব তিনি জানিয়েছেন আগে ভাগে।

উপস্থিত মেহ্‌মানদের মধ্যে রলাঁ বসে-বসে আলাওলের আত্মকাহিনী শুনছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর বসার জায়গা ঠিক মঞ্চের শীর্ষস্থান থেকে কয়েক ধাপ নিচে। একদম ক্রশের তলায়। সটান বসে আছেন তিনি আড়াআড়ি পায়ের উপর পা রেখে। জানু মুঠিবদ্ধ দুই হাতের তালুর মধ্যে। জ্যোৎস্না ঝরে পড়েছে অঝোর মুখের উপর। মঞ্চের নিচ থেকে দেখলে মনে হবে যীশুখ্রিস্ট যেন নবতর বেশে উপবিষ্ট। এই যুগে ইউরোপে যীশুখ্রিস্টের এত বড় উত্তর-সাধক ত আর কেউ জন্মায় নি। এই প্রতিভাস তাই তোমার আমার কাছে অসঙ্গতি নয়। গরম লাগছিল। তাই কোট খুলে একটা ড্রেসিং গাউন পরে নিয়েছিলেন রলাঁ। মুখের দিকে তাকাও। কপালে বিরাট টাক। কানের পাশে পাশে তুষার-ধবল শাদা চুল। খাড়া নাকের নিচে কালো গুম্ফরাজি। সৌম্য-শান্ত মুখ। কিন্তু চোখের সঙ্গে মিলিয়ে মনে হয় কেমন যেন জ্বালার দাবদাহ চলছে কোথাও। তাই আবার রুক্ষ ঠেকে মুখের আদল। আসন্ন ঝটিকার নকীব শান্ত-মৌন জলদের মধ্যে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-ঝিলিক। 'বলাহক মাঝে যথা অস্থির সৌদামিনী।' জলন্ত নগর-গ্রাম অগ্নিগিরি তুমি দেখে থাকবে। এমন জ্বলন্ত শিল্পী তুমি ত কোন দিন দ্যাখো নি। দেখবে না এমন মানব-শিল্পী। মানবতার শিল্পী মেলে, জীবন-শিল্পী পাওয়া যায়— কিন্তু মানব-শিল্পী পৃথিবীতে মাত্র একজন। রমাঁ রলাঁ অফ বার্গান্ডি। রবীন্দ্রনাথ বায়ু-বিষানেওয়ালা আলোনিভানেওয়ালা শত্রুদের তাঁর ভগবানের হাতে সোপর্দ করে স্থির হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখের আদল প্রশান্ত, দেবতাসুলভ। গোর্কি মূর্তিমান অগ্নিগিরি। জ্বালাবিতরক প্রমিথয়ুস সে— দেবতাদের সামিল। মানুষের মত ক্ষমা ঘৃণা শুধু রলাঁকে দিয়েই সম্ভব হয়েছে। যীশুখ্রিস্টের উত্তর-সাধক মাটির পৃথিবীর একান্ত একক নাগরিক। তাঁর তুলনা-উপমা তিনি স্বয়ং। মানসিক গঠনের দিক থেকে রলাঁ পৃথিবীর অবিনশ্বর সম্পদ। এসো কাছে থেকে দেখে নাও। এমন মওকা তোমার আর কোনো দিন না-ও জুটতে পারে।

মঞ্চের চারিদিকে বেতের চেয়ার। ছোট ছোট বেতের টেবিল। সেখানে বসে আছে সৈয়দ বোক্‌জা, জুহা ও অন্যান্যেরা। সবাই স্তব্ধ। সৈয়দ বোক্‌জা যে বাক্যহ্রদ-স্রোতে নূহের প্লাবন তুলতে পারে, সে-ও আজ স্তব্ধ। প্রাণ-শশী আঢ্য আকাশ-শশীর মতই মৌন। নির্বাক লিমারিক-স্রাবী সাহ্ কবি। মঞ্চের বাম দিক থেকে বিশ তিরিশ ফুট দূরে একটা বড় কাঠের টেবিলে নানা রকমের শরাবের বোতল, ডিকেন্টার ঠাসাঠাসি। আজ কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। নতুন নেশায় সৈয়দ বোক্‌জার সাবেক নেশা উবে গেছে। আর একজন নতুন বান্ধব উপস্থিত। মি. তেছোদীন। তার গৌর তনুর মত মনের রঙ। কিন্তু বেচারা দুনিয়াটা সোজা দেখতে পারে না। তাই তেরছা চোখ উদ্দীন। সংক্ষেপে তেছোদীন। সে-ও একদম চুপ। মোয়াবক বিলের ধারে ভরা-পেট বক পাখির মত নিঝ্‌ঝুম।

মঞ্চের বামদিকে উপবিষ্ট হাজী মহম্মদ মহ্‌সীন। পরনে তহ্‌বন আর গায়ে পিরহান, গলার কাছে একটি মাত্র ন্যাকড়া-তৈরি বোতাম লাগানো। মাথায় পাগড়ি বাঁধা। কবি আলাওল বসেছেন মঞ্চের ডান দিকে। পরিধানে পাজামা, সূতি কাপড়ের জোব্বা প্রায় পায়ের গাঁঠ পর্যন্ত ঝোলানো। তাঁর বিপুল দেহ, শ্মশ্রুল মুখাবয়ব। জুহা একটা লম্বা নলযুক্ত চাঁদির গড়গড়া যোগাড় করে, তামাক সেজে দিয়েছিল। কবি তা-ই টানছিলেন

আর কথা বলছিলেন। বেশ হেলান দিয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে বসেছেন তিনি কথকের মজলিসী কায়দায়। কথার বাঁক অনুযায়ী অবিশ্যি সটান হচ্ছেন কখনও কখনও। পিতামহোচিত গোষ্ঠি সুখ-বিলাসী হাওয়ায় যেন ভাসছেন কবি।

করবি-কুঞ্জের ছায়ায় পিয়ানো রাখা। সামনে ছোট টুল। তার ওপর সবে একজন বিটোফেনের সিম্ফনি থেকে "জলাশয়-তীরের গান" (Song by the brookside) এতক্ষণ বাজাচ্ছিলেন, মজলিসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। পিয়ানোর আওয়াজ অত্যন্ত অস্পষ্ট। আলাওলের কথার পটভূমি হিসেবেই যেন তার কদর। হঠাৎ পিয়ানো তারা গ্রামের দিকে এগোতে লাগল। ঝড়ের সূচনা শুরু হয়েছে। চাষীরা এতক্ষণ আনন্দে মেতেছিল। হঠাৎ দিগন্তে ঝড়ো হাওয়ার আনাগোনা পিয়ানোয় তার দুরন্ত চঞ্চলতা শব্দাকারে ছুটে বেরুচ্ছিল। ঝটিকা ক্রমশঃ নিকটতর গ্রামের বুকে চাষীদের উৎসবে ভেঙে পড়ছে, আকাশ বজ্রনাদে ডেকে উঠল...। বাদক কিন্তু হঠাৎ পিয়ানোর কয়েকটা রীড একসঙ্গে টিপে অদ্ভুত এক তাণ্ডবের রেশ রেখে সব থামিয়ে ফেললেন। তারপর টুলে বসে-বসে পেছনের দিকে মুখ ফেরালেন। শাদা দাড়ি, শাদা গোঁফ ছোট-ছোট করে ছাঁটা। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখাবয়বব্যাপী অদ্ভুত এক ব্যঙ্গের রেখা। তাঁর পরনে ধূসর রঙ টুইডের স্যুট। পায়ে সুঁচোলো-মুখ কালো জুতা।

রলাঁ এতক্ষণ দুই দিকে কান খোলা রেখেছিলেন। হঠাৎ পিয়ানোর সুরান্তরে চমক ভেঙে ডাক দিলেন বাদকের মুখ ফিরিয়ে, "Hey, Bernard Shaw!! বার্নার্ড শ!"

"Yes ইয়েস," বাদক পাকা জিমন্যাস্টের মত আবাউট-টার্ন মেরে টুলের ওপর বসলেন। সেই সময় পিয়ানোর রীডে আঙুল ছুঁইয়ে নিয়েছেন একবার। টুংটাঙে মজলিস ভরে উঠল।

শুধালেন রলাঁ, "Why did you stop থামালে কেন?"

শ' : I love laughter more than music. সঙ্গীতের চেয়ে হাসি আমি ঢের বেশি ভালবাসি।

রলাঁ : So throughout life you laughed at the world and the world laughed at you.

শ' : Yes. Appreciation, business, like adultery, are always an exchange-affair. হ্যাঁ। সমঝদারি, ব্যবসা সব সময়ই ব্যভিচারের মত একটা পারস্পরিক বিনিময়ের ব্যাপার কি না।

সৈয়দ বোক্‌জা হঠাৎ খিক-খিক শব্দ করে ওঠে রুমাল-মুখে। হাসি চাপা দেওয়ার ব্যর্থ পরিণতি। বার্নার্ড শ'র দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। আঙুল তুললেন তিনি বোক্‌জা অভিমুখে।

পরে বললেন, "তরুণ বন্ধুগণ, তোমরা চুপচাপ কেন?"

রলাঁ আরো কয়েক ধাপ নিচে নেমে এসে বসলেন। তাঁরও সম্বোধন : "তরুণ বন্ধুগণ, তোমরা চুপচাপ থাকলে ত আসর জমবে না। জায়গাটা ত সেমিনার নয়, বন্ধুবান্ধবের আসর।"

এগিয়ে এলো সৈয়দ বোক্‌জা নিজের চেয়ার ছেড়ে। রলাঁর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে, "যদি অভয় দেন।"

শ' জবাবটা লুফে নিয়ে বললেন, "আমার বন্ধু রলাঁর বাণী ত তোমাদের মুখস্থ থাকা উচিত।" তার পর বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতে লাগলেন :

You young men, you men of today, much over us, trample us under your feet, press onward. Be greater and happier than we.

For myself, I bid the soul that was mine farewell. I cast it from me like an empty shell. Life is succession of death and resurrection. We must die to be born again.

শ' তারপর যথারীতি বসে থেকেই ডান হাত পেছনে নিয়ে পিয়ানোর কয়েকটা টুংটাং শব্দ তুললেন আঙুল চালিয়ে।

আলাওল বললেন, "বৃদ্ধেরে যৌবনে কোথা খুঁজে যুবাজন?"

সৈয়দ বোক্‌জা কুর্নিশের ভঙ্গিতে সালাম জানিয়ে জবাব দিল, "অনেক পুণ্যের ফলে, আপনার মত কবির দর্শন ঘটেছে। আপনাকে কি আমরা বৃদ্ধ মনে করি? বেয়াদবি মাফ করবেন।"

"What is Punnya— পুণ্য কী?" বার্নার্ড শ' পিয়ানোর গায়ে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"Virtue মি. শ'," জবাব দিল সৈয়দ বোক্‌জা।

"Virtue? that's a medieval calculation. Church of England even has enlisted them for the sheeps of Jesus Christ— পুণ্য—ও ত একটা মধ্যযুগীয় হিসেব। ইংল্যান্ডের চার্চ ত যীশুখ্রিস্টের ভেড়াদের জন্য তার একটা লম্বা ফিরিস্তি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। Young-man, have you examined your balance sheet? তরুণ বন্ধু, তোমরা পুণ্যের লাভ-লোকসান কি খতিয়ান করে দেখেছো?"

"Shaw, you are incorrigible, incorrigible— শ' তোমাকে আর সংশোধন করা যাবে না," প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন রমাঁ রলাঁ, "Why with these young friends? এইসব তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে এসব কথা কেন?"

"না সে খতিয়ান করি নি, মি. শ'। আপনার জন্যে বাকি রেখেছি। Because you are the supreme examiner of world's virtue and vice— আপনিই পৃথিবীর পাপপুণ্যের শ্রেষ্ঠ হিসাবকার।" বেশ সপ্রতিভ সৈয়দ বোক্‌জা জবাব দিলে।

শ' টুল ছেড়ে উঠে এসে সৈয়দ বোক্‌জার পিঠ থাপড়ে বললেন, "তুমি আমাকে ঠিক-ঠিক বুঝে ফেলেছ। এই ত চাই।" জুহা ও অন্যান্যদের উদ্দেশে আবার উচ্চারণ করলেন, "young friends, come closer— কাছে এস সবাই জটল্লা করে বসা যাক। গপ্‌ না হলে জমবে কি করে? I am not an English man, to be introduced to my wife for a talk. আমি ত ইংরেজ নই যে কথা বলার জন্য নিজের বিবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।"

রলাঁ মুচকে হাসলেন। আর সকলে হো হো শব্দে কোরাস জুড়ল। শ' মঞ্চের ধাপে বসে পড়লেন। জুহা, প্রাণ-শশী আঢ্য, সাহ্‌ কবি, তেছোদীন সকলে মঞ্চের চত্বরে এসে বসল।

তারপর শ' হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, "Now gentlemen, should I play the part of a christian god? আমি কি এবার খ্রিস্টান বিধাতার ভূমিকায় অভিনয় করব?"

কথাটা সহজে কেউ ধরতে পারে না। রলাঁ ভাবলেন, একটা শেভিয়ান প্র্যাঙ্ক (কৌতুক) শুরু হবে বোধহয়। তিনি কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে শ'র দিকে তাকালেন মাত্র। আলাওল, হাজী মহ্সীন তদনুসারী। কিন্তু জমায়েত তরুণেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কেউ আর জবাব দেয় না।

শ' ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে সারা জমিন জরিপ করে নিলেন। তারপর মুচকে হাসলেন নিস্তব্ধতা আর বিস্ময়াক্রান্ত মুখ দেখে। তাঁর 'gentlemen' মহোদয় রবে তরুণেরা উৎকর্ণ।

"Gentlemen, I am serious, আমি গুরুত্ব দিয়েই বলছি। That's the easiest role for human being ওটা হচ্ছে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে সহজ ভূমিকা," শ' ক্ষিপ্রগতি একটা আঙুল বাড়িয়ে বললেন।

মোয়াবক বলতে যাচ্ছিল, Proof— প্রমাণ চাই, মি. শ'। কিন্তু চুপ করে গেল।

জলদগম্ভীর রবে শ' উচ্চারণ করলেন, "Let there be light," তারপর খুব অস্পষ্ট কণ্ঠে "মি. জুহা।"

সকলে হাসতে লাগল। জুহা কিন্তু তাড়াতাড়ি গিয়ে সত্যি সুইচ টিপে দিল। ক্রুশের উপরে 'হ্যালো'-কার একটা গোল বাতির বন্দোবস্ত ছিল। সেটা জ্বলে উঠল। অন্ধকারে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

"And there was light" বলে শ' বসে পড়লেন।

সাহ্ কবির হাসি এতক্ষণে থেমেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মি. শ' আপনি আগেই জেনেছেন আমি কবি। হঠাৎ একটা কবিতা মনে এল।"

"Recite— আবৃত্তি কর।" জবাব দিলেন বার্নার্ড শ'।

সাহ্ কবি গলা ঝেড়ে, আরম্ভ করে :

At last I went to Ireland, `T was raining cats and dogs,
I found no music in the glens, nor purple in the bogs;
And as for angel`s laughter in the smelly Liffey's tide!
Well, my Irish daddy said it, but the dear old humbug lied.

এবার তুমুল হাস্য-রোলে রলাঁ পর্যন্ত বাদ যান না। মোয়াবক ত সাহ্ কবির পিঠে আনন্দাতিশয্যে একটা থাপ্পড়ই কষিয়ে দিলে। পাষণ্ড প্যালা দিলে সাহ্ কবির দিকে চোখ ঠেরে ঠেরে।

কোণঠাসা মুহূর্তে শ' চেঁচিয়ে উঠলেন, "Order, order gentlemen!" তারপর আলাওলের দিকে চেয়ে বললেন, "Well poet; please continue your biography— কবি, এবার আপনার আত্মচরিত আবার শুরু করুন।"

তেছোদীন দাঁড়িয়ে পড়ল শ'র দিকে চেয়ে। বললেন, "মি. শ' আমি হাসির চেয়ে সঙ্গীত বেশি ভালবাসি। তাই আমাদের অনুরোধ আপনি জনাব আলাওলের কথার সঙ্গে যেমন পিয়ানোর রেশ টেনে যাচ্ছিলেন, তেমনই সুর-সঙ্গীত চলতে থাক।"

"O-K, dear friend", বলে, শ' আবার পিয়ানোর সামনে টুলে গিয়ে বসলেন। 'মুন-লাইট সোনাটা'র প্রথম অস্থায়ী বাজাতে শুরু করলেন তিনি। অবিশ্যি অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদে, যেন কবি-কণ্ঠ চাপা পড়ে না যায়।

আগেই বলে রাখা ভালো, আমাদের বজ্‌রা ঠিক বজরা নয়। কতকটা জাল্‌বা (ছোট রণতরী) আর রজ্‌রার সংমিশ্রণ। অর্থাৎ জাহাজই বলা চলে। এতে সারেং, মোয়াল্লেম (পানির মাপ, নক্ষত্রের অবস্থান বিশেষজ্ঞ) সুখান জিয়ার (বর্তমানে সুখানী), পাঞ্জেরি সবই আছে। কিন্তু বজ্‌রার আরাম-কামরা বাদ নেই। ঢাল-নেজা সড়কী-তলোয়ার বন্দুক— তার সঙ্গে মিশেছে ফুলদান। রজনীগন্ধা আমার প্রিয় ফুল। কামরায় কয়েক গোছা বেশ গন্ধ ছড়াচ্ছিল। খারওয়ারা (খালাসিগণ) পাঁচটা পাল তুলে দিয়েছিল অনুকূল বাতাস পেয়ে। আব্‌ছা দরিয়া।

লাচারী ভাটিয়ালি মনে-কানে গুঞ্জন তোলে!
সুখ ভোগে গোঁয়াইল কাল!
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল!!
আল সই কি আজি পোহাইল কাল নিশি।।

শেষ পঙ্‌ক্তিটি ধুয়া।

আমি বার বার দোহার দিয়ে গাইছি। বাইরের জগৎ তখন আমার অপেক্ষায় আছে যেন, আমি শুধু নির্বিকার। কানের পাশে দরিয়ার কলনাদ আর অস্তিত্ব জানান দিতে পারে না। শেষে সুরের তোড় চলে দুর্দম। কিন্তু কথা জোটে না সহজে। আমি জোটাতে পারি না। তাই সুরের অনুধাবন করি শুধুমাত্র অর্থহীন শব্দের সাহায্যে।

এই সময় বাপজান একবার উঠে বসলেন। পাজামা-পিরহান, পরে আছেন তিনি। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বার-দরিয়ার দিকে চেয়ে আমার গানই হয়ত শুনতে লাগলেন। আমি সুরের পাগলা, দূর আমাকে আহ্বান করেছে। আমার খেয়াল ছিল না।

বজরার কামরায় টোকা পড়ল।

আব্বা হাঁকলেন, "কে?"

"হুজুর, আঁই পাঞ্জেরি।"

আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম। বড় বিরক্তি ধরেছিল হঠাৎ এই অসুরের আবির্ভাবে।

বাপজানের সামনে সালাম দিয়ে পাঞ্জেরি মহাম্মদ খান বললে, "হুজুর, আধা-কোশ দূরে উগ্‌গা জাহাজ আর কাউগ্‌গা ছিপ দেখা যাদ্দে। আঁরার পেছন পেছনেই আইয়ের।"*

"তোমার কি মনে হয়, মহাম্মদ খান?" বাপজান আবার প্রশ্ন করলেন।

"হুজুর, হালারা হার্মাদ হৈত্ ফারে।"

বাপজান উঠে বসলেন। পাল টানানো জাল্‌বা দরিয়ার বুকে মৃদুগতিতে এগোচ্ছে। বাইরে অন্ধকার। কেব্‌লা সাহেব সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "পাঞ্জেরি, তুই উপরে যা। চারিদিকে খেয়াল রাখ। মসিবতের কোনো নিশানা দেখলে আমাকে খবর দিবি।"

* চাটগাঁ উপভাষায় উগ্‌গা— একটা, যাদ্দে— যাইতেছে, কাউগ্‌গা— কয়েকটা, হৈত্ ফারে— হইতে পারে, আঁরার— আমাদের, আঁই— আমি, আইয়ের— আসিতেছে।

"আচ্ছা হুজুর। কোন মসিবত ঠা'র ফাইলে অনারে জানাইয়ুম।" পাঞ্জেরি মহাম্মদ জবাব ও কুর্নিশ দিয়ে চলে গেল।

বাপজান জাহাজের মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আলিস ভাঙলেন। ওঁর খোয়ারি লেগেছিল, বোঝা গেল। তারপর হঠাৎ কাঠের দেওয়ালে ঝোলানো একটা তলওয়ার টেনে নিলেন; খাপ থেকে খুলে ধার পরীক্ষা করলেন। তলওয়ার আবার খাপের মধ্যে। কয়েকবার পুনরাবৃত্তি ঘটল এই কাজের। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি। গানের মেজাজ উবে গেছে। হার্মাদ-শব্দের সঙ্গে উপকূলস্থ বাংলার পল্লীজন তখন বেশ পরিচিত। ধনে-প্রাণে লুটের যত রকম অত্যাচার থাকতে পারে, তারই সম্মুখীন হত অসহায় নরনারী। কারণ, জালেমের কাছে উন্নততর অস্ত্র আছে। মুঘল আমলের বন্দুক অনেক সময় তার মোকাবিলা করতে পারত না। সামসুদ্দীন তা' লিসের ইতিহাস আপনারা পড়ে থাকবেন। তিনি লিখেছেন, "হার্মাদ দস্যুরা হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকে বন্দীর পর তাদের করতালু ছিদ্র করে নিত। তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত সরু বেত। তারপর তাদের এক জনের উপর এক জনকে চাপিয়ে দস্যুরা জাহাজের পাটাতনের নিচে ফেলে রাখত। লোকে যেমন পাখিকে আহার দেয়; তেমনই সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে কিছু চাউল ছড়িয়ে দিত আহার বাবদ।...এই দস্যুতার ফলে তাদের দেশ শ্রীসম্পন্ন হয়েছে। ওদের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রমশ জনশূন্য। দস্যুদের বাধা দেওয়ার শক্তিও কমে আসছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে এই দস্যুদলের যাতায়াতের উভয় পার্শ্বে একটা গৃহস্থও রইল না। তাদের সচরাচর যাতায়াতের পথে বাকলা অঞ্চল ও বাংলার অন্যান্য অংশ পূর্বে শস্যশালী এবং গৃহস্থের পল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। প্রতি বছর এই প্রদেশ থেকে বহু পরিমাণে সুপারির কর আদায়ে রাজকোষ পূর্ণ হত। কিন্তু দস্যুদল লুণ্ঠন ও নারী-হরণ দ্বারা— প্রদেশের এমন অবস্থা করে ফেলেছে যে সেখানে একটা বসত-বাটিও নেই, অথবা প্রদীপ জ্বালানোর লোক নেই...।" তা' লিসের এই বিবরণী থেকে বুঝতে পারবেন, হার্মাদের ভয়াবহতা।

বাপজান আমাকে বললেন, "তুমি তোমার তলওয়ারটা দেখে নাও।" আমার জন্য আর অপেক্ষা করেন না তিনি। দেওয়ালে লটকানো তলওয়ার নিজে আমার হাতে দিলেন। আমিও পিতার মত কয়েকবার ধার পরীক্ষা করে নিলাম। কিন্তু, কেন? বাপজানের মনে কি কোন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে?

এতটুকু ভাবার অবসর পাই নি। হঠাৎ বন্দুকের দ্রুম শব্দে দরিয়া যেন কেঁপে উঠল, আমাদের জাহাজের সঙ্গে। আমাদের জাহাজের বিপদসঙ্কেত ঘণ্টা ঢনঢন বেজে উঠল। বাপজান তাড়াতাড়ি বাইরে পাটাতনের উপর গেলেন সিপাহীদের সঙ্গে একত্রে হামলার মোকাবিলার জন্য। আমার কিন্তু বাইরে যাওয়া নিষেধ। মুরুব্বির হুকুম। অমান্য করতে পারলাম না।

দ্রুত সময়। তার চেয়ে দ্রুত ঘটনার পর্যায়। আমাদের জাহাজ থেকে বন্দুক ছোঁড়া হচ্ছে। নেজা-বল্লম-সড়কি হাতে সকলে মোতায়েন। ছোট ছোট আলোর সীমানা আর কত দূর। দূরে কিছু দেখা যায় না। আমার সীমানা ত পিতা আরো ছোট করে দিয়ে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ আর একটা জাহাজের নিকটতর হওয়ার শব্দ আমার কানে গেল। হার্মাদেরা আমাদের পাটাতনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিকট চিৎকার দিয়ে। আমাদের সিপাইরা 'নারা' তুলে লড়ছে। খট্‌খাট ফট্‌ফাট নানা শব্দ। হঠাৎ বাপজানের জলদ-গম্ভীর আওয়াজ কানে এল; "সৈন্যগণ, এই ফিরিঙ্গির বাচ্চাদের কাছে কোনো দিন মাথা নোয়াবে না। যতক্ষণ ধড়ে এতটুকু দম আছে, তোমরা লড়াই কর। বাহাদুরের মত শহীদ হও... ।" আর কিছু শোনা গেল না। অস্ত্রে অস্ত্রে ঝন্‌ঝনানি, আহতের গোঙানি, সমুদ্রের কল্লোল— আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তলওয়ার হাতে বাইরে এলাম।

আবছা আলোয় দেখতে পেলাম, লোহার টুপি মাথায় কয়েকজন সৈন্য পাটাতনের ওদিকে লড়ছে, আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাপজানকে দেখলাম, গলুয়ের মুখে আরো দশ হাত দূরে লড়ছেন একদম জাহাজের কিনারায়। আমি সেদিকে ছুটে যেতে চাইলাম। কিন্তু মাঝপথে আমাদের কয়েকজন সিপাহী লড়ছে হার্মাদের সঙ্গে। পায়ের তলায় লাশ কয়েকটা। আমার চোখ বাপজানের দিকে। তলওয়ার চালাচ্ছেন তিনি তিন-চার জন হার্মাদের সঙ্গে। হঠাৎ একটা সড়কি এসে লাগল তাঁর পাঁজরের দিকে। টাল সামলাতে না পেরে তিনি দরিয়ায় পড়ে গেলেন। আমি উন্মত্তের মত তলওয়ার ঘুরিয়ে সেইদিকে ছুটলাম। ইত্যবসরে কয়েকটা হার্মাদ আমাদের কামরায় ঢুকে পড়ল। বাপজানের মুখ আর দেখব না। আমি জানি না, আমি কী করছিলাম। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধে আমি তখন উন্মত্ত, হ্যাঁ উন্মত্ত। বন্দুকের আওয়াজ তখন আমার মনে কোন দহ্‌সৎ (ভয়) জাগাতে পারে নি। খুনের পিয়াস জেগে উঠেছিল, খুন করে চললাম... ।

তারপর আর কিছু জানি না। সুবেহ্ সাদেক। আমাদের জখম জাহাজ আরাকানের উপকূলে গিয়ে ঠেকেছে, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম। আমার পাশে বসেছিল ফরিদপুরে পাঁচ টাকায় কেনা এক দশ-বার বৎসর বয়সের নফর। আলি বখ্‌স। সে আমার মাথায় চোখে-মুখে ভিজে ন্যাকড়া বুলোচ্ছিল। চোখ মেলে চাইতে তার কি আনন্দ! বললে, "হুজুর—" তারপর কাঁদতে লাগল। পাঞ্জেরি মহাম্মদ খান আর দু-একজন লস্কর ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। হার্মাদেরা সব লুট করে নিয়ে গেছে। অদৃষ্ট আর 'বাহ্‌রে বাঙ্গালা'র বঙ্গোপসাগরের স্রোত শুধু আমাদের কয়েকজনকে টেনে নিয়ে এসেছে বিজন এই উপকূলে। শরীরের বহু জায়গায় জখমের জ্বালা, তবু উঠলাম। আলি বখ্‌স মহাম্মদ খান আমার দুই দিকের বাজু ধরতে চায়, পাছে পড়ে যাই। বললাম, "দরকার হবে না মহাম্মদ খান। আমি কবি। এই লড়াই আমাকে কাহিল করতে পারে নি।" ধীরে ধীরে জাহাজের কামরায় ঢুকলাম। দস্যুরা সব লুট করে নিয়ে গেছে। বাপজানের দামি-দামি রেশমি লেবাস, সোনাদানা— কিছু বাকি রাখে নি। তাঁর টুপিটা একদিকে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিলাম। আর জাহাজের মেঝের উপর ছড়ানো বইয়ের পাতা। বসে পড়ে, সেগুলো দেখতে লাগলাম। যুজ্‌দানে যত কেতাব ছিল, সব হার্মাদেরা নিচে ছড়িয়েছে। বুটের লাথালাথি, লুটপাটের চোটে পাতা খুলে গেছে। 'পদুমাবতের' পাতার সেই অবস্থা। মাথা টনটন করছে, তবু সেগুলো কুড়িয়ে গোছাতে লাগলাম। জানি হার্মাদদের কোন কালে কেতাবের প্রয়োজন হয় না। তাই এইগুলো ফেলে গেছে। 'পদুমাবৎ' সবই পাওয়া গেল। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানাপত্র কিছুই নেই। ভাবলাম, যার খাট ভেঙেছে, তার ভূমিশয্যা ত কেউ রোধ করতে পারে না। ঘাড়ের পাশে একটা জখম ছিল। তা থেকে রক্ত পড়তে লাগল হঠাৎ। আলি বখ্‌স নিজের তহবন্দ ছিঁড়ে ঘা-মুখে বসিয়ে দিলে।

কামরা থেকে বেরিয়ে পাটাতনের ওপর দাঁড়ালাম। পশ্চিম দিকে তাকাই। 'বাহ্‌রে বাঙ্গালা' আপন স্বভাবোচিত তরিকায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গর্জন করে উত্তর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্বে চেয়ে দেখি, ঘন বন সমন্বিত অচেনা রাজ্যের হাতছানি। তাই আমি আবার কা'বা-মুখী বাহ্‌রে বাঙ্গালার উত্তাল-শীতল বুকে জায়গা নিতে পারতাম, বাপজান যেখানে লবণ-শয্যায় চির-আশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু মন গর্জে উঠল : না। তুমি কবি। জীবনের লীলা তোমার চক্ষু তারকার আবেশ। তুমি মরতে পার না। একটি বারের মানব জন্ম। তার মধ্যে দেখার সাধ এখনই মিটতে পারে না। নিভতে পারে না তোমার কৌতূহল। তুমি জীবনের সঙ্গী, মৃত্যুর দুশমন। তোমার ও সঙ্গীদের জীবন ছিনিয়ে নিতে এসেছিল যারা, তাদের বিরুদ্ধে তুমি লড়েছ কবির স্বধর্ম বজায়ে। তুমি মরতে পার না...।

বঙ্গোপসাগর গাওয়া (সাক্ষী) রেখে হাঁক দিয়ে উঠলাম, "হে সমুদ্র তুমি সাক্ষী— মাটির কবি, মাটিতে পা রাখছে এবার। শপথ নিলাম যে-বেশেই আসুক না হার্মাদেরা— আর তারা শয়তানের মতই বেশ পরিবর্তন করতে সক্ষম, যা মানুষ পারে না— আমি তাদের মোকাবিলা করব।

আরাকানের মাটিতে পা রাখলাম।...

পৃথিবীর মাটিতে পা রাখলাম।...

আর সাক্ষী রইল, অঙ্গে অঙ্গে এই জখমের দাগ। কনুই ও কব্জির মাঝামাঝি এই গর্ত-দাগ আপনারা দেখতে পারেন, যা সারা জন্মেও মিলিয়ে গেল না।

কবি আলাওল জুব্বা খানিকটা তুলে ফেললেন, তেছোদীন ছুটে গেল। কবির চেয়ে এক ধাপ নিচে, ঠিক জানুর ওপর হাত রেখে বললে, "হে কবি, আপনার হাতের দাগে আমি চুমু খাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না।"

সে অপেক্ষা করে না কবির জবাবের জন্য। ওই হাত তখন তার কাছে প্রিয়তমার ঠোঁট। কবির চোখের দিকে একবার চেয়ে সে চুম্বনে মনোনিবেশ করলে। বেশ আবেশ-ভেজানো চুম্বন। তারপর বললে তেছোদীন, "কবি, আপনার এই দাগ আমাদের ঐতিহ্য। জীবন দরিয়ার দিক-শূল।"

— কেন, বন্ধু?

— আপনি জীবনের কবি, তাই আপনি সংগ্রাম-বিমুখ নন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার সেই হার্মাদেরা আজো মরে নি।

— মরে নি? শত শত বৎসরেও না?

— না। সেই হার্মাদদের দেখেছিলেন উপকূল-ভাগের পল্লী অঞ্চলে। তারপর তারা ওঁৎ পেতে রইল। দেড় শ' বছরে গেল না। সমস্ত দেশ তারা জয় করে নিলে। ছলে বলে কৌশলে। অতর্কিতে। আজ সমস্ত দুনিয়া জুড়ে তাদের রাজত্ব।

— তাজ্জব লাগাচ্ছ, বন্ধু।

AMARBOI.COM

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— না, তাজ্জবের কিছু নেই কবি। সত্যিকার ইতিহাস। সেদিনের দু-একটি প্রাণ-নিধনের কাছে আজকের হত্যাযজ্ঞ শিশুক্রীড়া মাত্র। আজকের হার্মাদেরা আরো জোরদার। সেদিন বন্দুকের মোকাবিলা করতে পারেন নি বলে আফসোস ছিল আপনার। তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হাতিয়ারের মালিক আজ তারা। এক লহ্‌মায় শহরের দু-চার লাখ মানুষ ধ্বংস করতে পারে— এমনি তাদের অস্ত্রবল। আপনি নিজের বসতঘর হারিয়েছেন। আজ হার্মাদের জুলুমে কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন।

আলাওল বিস্ময়ে স্থির-নেত্র। অজানিতে ধীরে ধীরে তেছোদীনের কাঁধে হাত রাখেন। আবার জিজ্ঞেস করেন : সত্যি, বন্ধু?

— সত্যি, কবি। মজ্‌কুর সকলেই জানে। তাই কেউ বিস্মিত নয়, আপনার মত।

— শত শত বৎসর। তোমাদের কবিরা কেউ লড়ে না।

— লড়ে না, তা নয়। তাদের সংখ্যা আর ক'জন। আর সকলে ত শুরুয়া-রুটির বিনিময়ে আত্মা বন্ধক দিয়ে আসে। কখনও সজ্ঞানে কখনও নাদানী ব-দৌলত।

— বন্ধু, তুমি আমাকে অবাক করলে।

— অবাক হওয়ার কিছু নেই, জনাব। আপনি লিখেছিলেন :

মহার্ঘের আশে কিনি বেচে যেই নর।
এসব সদা এ হয় পাপ গুরুতর।

AMARBOI.COM

"কিন্তু ওটাই এ যুগে ধর্ম। আপনার আমার মধ্যে ফারাক বেশি নয়। কিন্তু কালের ফারাক দুস্তর।" আলাওল নিজের হস্তস্থিত দাগের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বসে থাকতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কোথায় হার্মাদের দল? আমাকে দেখাও, আমি লড়ব। সৈয়দ আলাওল আজও মরে নি।"

"সৈয়দ আলাওল মরতে পারে না। আলাওলদের কাছে হার্মাদ ও আজরাইলেরা সব সময় হেরে যায়, গেছে— কিন্তু আপনি উত্তেজিত হবেন না।" তেছোদীন চিবুক উর্ধ্বে তুলে বললে।

"উত্তেজিত হব না? দেশে হার্মাদ আছে, আর আমি উত্তেজিত হব না?"

"কিন্তু সমস্ত দুনিয়া জুড়ে যে তাদের রাজত্ব, আর দেশে দেশে তাদের আওলাদ আছে।" উত্তেজিত কবির দিকে প্রশমনের পানি ছোঁড়ে তেছোদীন।

"তা থাক। আমি একাই লড়ব। ওদের আওলাদ আছে? ওরা কি দেশে দেশে উপপত্নী রাখে?"

"না! আপনি কি খ্রিস্টানদের Immaculate Conception বা রতি-ক্রিয়াহীন গর্ভধারণের কথা শোনেন নি? এটা সেই রকমই ব্যাপার। এখন ক্ষান্ত হন, দাদু!"

"না, না," কবি এবার মঞ্চের চতুর্দিকে পায়চারি করতে লাগলেন। মুখে 'না, না'-রব। তারপর এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আকাশমুখী আবৃত্তি করতে লাগলেন, "আমি কবি, বিশ্বের কণ্ঠস্বর, সম্মিলিত মানবের হৃদয়-স্পন্দন, আমি কবি— ধরিত্রীর আর্তনাদ আমার বীণায় মুখর। হায়েনার চিৎকার আমি শুনব না।" আবার পায়চারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু হয়।

বার্নার্ড শ'র কানে কানে সৈয়দ বোক্‌জা পরামর্শ দিলে, "প্রিয় শ', আপনি কবিকে থামান।"

রলাঁ ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে বললেন, "Surely. The artist is the voice of the earth— শিল্পী অবশ্যই পৃথিবীর কণ্ঠস্বর।"

আলাওল কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না। তাঁর জোব্বা-শোভিত বিরাট তেজোব্যঞ্জক মুখে জ্যোৎস্নার অক্লান্ত করুণা বর্ষিত। আলো-আঁধারির খেলায় রেমব্রাঁর তুলি যেন কাজ করছে। ঘৃণা, ভ্রূকুটি, অসহায়তা, না-জানার আকুলতা সব ফুটে উঠছে 'কোরিওস্‌ক্যুরোর' জোয়ার-ভাটায়।

রলাঁ ইশারায় সাহ্‌ কবিকে কাছে ডাকলেন। সে নিকটে যাওয়া মাত্র রলাঁ মৃদুকণ্ঠে বললেন, "There are, indeed great artists who express themselves, But greatest of them are those whose hearts beat for all men— সত্যিই অনেক মহৎ শিল্পী আছেন, যাঁরা নিজেদের যথারীতি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠতম যাঁর হৃদয় সমস্ত মানুষের জন্য স্পন্দিত হয়।"

"নিশ্চয়। কিন্তু মি. রলাঁ, এ ত আপনার জাঁ খ্রীস্তফের কথা।"

"হয়ত। আমার ঠিক মনে নেই," জবাব দিলেন রলাঁ।

ওদিকে বার্নার্ড শ' উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে।

পায়চারিরত আলাওলের কাছাকাছি এসে তিনি ডাক দিলেন, "Hey poet — ওহে কবি!" তারপর আলাওলের হাত ধরে জোব্বার কিয়দংশ তুলে চুম্বন দিয়ে বললেন, "Yes poet. A writer is a fighter. Against all sort of ugliness, I have fought, all thro' my life— হ্যাঁ, কবি। সত্যি বোদ্ধা মাত্রেই যোদ্ধা। নানা রকমের নোংরামির বিরুদ্ধে আমি লড়েছি। আমি তোমার পরে জন্মেছিলাম। তোমার কাজ আমি বাদ রাখি নি। I fought well against those bastards— যাদের মোকাবিলার জন্য তুমি এত উত্তেজিত।"

কবি থামলেন, শ'র দিকে তাকালেন। তারপর দুই হাত তুলে নিলেন তাঁর কাধে। একটু পরে মুখ খুললেন, "আমি খুশি। সত্যি খুশি। সাধে কি তুমি রলাঁর এমন বন্ধু?"

এবার শ' কপাল কুঁচকান, ঠোঁটে ভ্রূকুটি-মাখা সেই অপূর্ব হাসি হেসে জবাব দিলেন, "কিন্তু দোস্ত আরো এক-কাঠি সরেস। He is a guerilla, while I am a clown — তিনি হচ্ছেন গেরিলা-যোদ্ধা আর আমি সেখানে ভাঁড়। চলুন এখন বসে বসে আপনার বাকি কাহিনী শোনা যাক।"

আলাওল নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন, পিয়ানোর টুলে বার্নার্ড শ'। তেছোদীন তখনও নিজের জায়গায়, কবির পদতলে।

তার দিকে চেয়েই কবি মুখ খুললেন, 'মি. শ' এবং রলাঁ। আমাদের প্রাচ্যের মহৎ কবিরা আবার সৈনিকও বটে।'

"Is it?' জবাব দিলেন বার্নার্ড শ'।

"তবে আমার সমসাময়িক একজন ছিলেন, তাঁর তুলনা নেই।" তারপর তেছোদীনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃদু পিঠ থাপড়ে বললেন, "বুঝেছ বন্ধু?"

"Who is he?" জিজ্ঞেস করলেন বার্নার্ড শ'। কবির মুখের দিকে মনোযোগ সহকারে তাকালেন রমাঁ রলাঁ।

"তার নাম, খুশহাল খান খটক। তিনি পাঠান। আমি তাঁর কথাও বলব। তা হলে বুঝবেন প্রাচ্যদেশে কবির অর্থ কী।"

"But we had a poet— rather a donkey, who wrote : East is East and West is West, twain shall never meet," হো হো শব্দে শ' হেসে উঠলেন।

এবার এগিয়ে এল সৈয়দ বোক্‌জা। সে ফোড়ন দিলে, "Dear Shaw— you had another poet— he wrote : If I should die think this of me, there is a foreign corner which is for ever England. ঠিক ওই আগেকার কবির মতই। সাম্রাজ্যের কি ক্ষুধা! বিদেশে মরেও ব্যাটা মনে করবে সেটা বাপের রাজত্বের একটা টুকরো।"

"He is another bastard. Hence canonized. New Saint Rupert Brooke." আবার হাসলেন শ' সৈয়দ বোক্‌জার দিকে চেয়ে, তারপর কবি-অভিমুখে, এবং বললেন, "Now poet, let us hear that great Khatak— হ্যাঁ কবি, এবার সেই বিখ্যাত খটক কবির কথা শোনা যাক।"

কবি আলাওল হুঁকায় দু-তিন বার টান দিলেন। নেশার প্রয়োজন ছিল তাঁর উত্তেজনা আরো তলায় নিয়ে যেতে।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কবি শুরু করলেন, দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান মুল্লুক। নানা কৌমে বিভক্ত বড় সাহসী, মুক্তপ্রাণ এই পাঠানেরা। মুঘল শাসনের সময় কবি খুশ্‌ হালের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন খটক কৌমের সর্দার। আওরঙ্গজেব সম্রাট আলমগীর হওয়ার পর সিন্ধু নদীর পারাপার বাবদ একটা কর ধার্য করেন। পূর্বে তা ছিল না। খুশ্‌হাল খান বললেন, এ অন্যায়। সাধারণ মানুষের এতে কষ্ট বাড়বেই। আটক দুর্গের কাছে চাষবাসের জন্য বহুবার-ই পাঠানদের সিন্ধু পারাপার করতে হয়। সুতরাং এমন কর মানুষের অধিকারের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ। তার প্রতিবাদ জানালেন কবি। পেশোয়ারে এক সুবেদার ছিলেন সৈয়দ আমীর। তিনি কবিকে আলোচনার জন্য ডাকলেন। খুশ্‌হাল খান কওমের প্রতিনিধিরূপে পেশোয়ার পৌঁছলেন। কিন্তু সে যুগে বাদশার হুকুমই ছিল আইন— আজকের মত নয়। আলোচনা আর কী? পেশোয়ার পৌঁছানো মাত্র কবিকে বন্দি করা হল। হাতে পায়ে শিকল। এই অবস্থায় তাঁকে পাঠানো হল দিল্লী শহরে। খুশ্‌হাল খান সেইখানে গোয়ালিয়র দুর্গে দুই বৎসর কয়েদ রইলেন। পরে ছাড়া পেলেন, কিন্তু দিল্লীতেই নজর-বন্দি অবস্থায়। কৌমের কাছে কবির সম্মান খুব বেশি। তাই সাত-আট বৎসর পরে পেশোয়ারের নতুন সুবেদার মহব্বৎ খান আওরঙ্গজেবের কাছে তাঁর মুক্তির সুপারিশ করলেন। কারণ, কবির সহায়তায় এই এলাকার শাসন-পরিচালনা খুব সহজ হবে। কবি স্বদেশে ফিরে এলেন। তখন মহব্বৎ খান তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। খুশহাল খান জবাবে বললেন, "মুঘলদের মজ্জা যথারীতি চেখে দেখেছি— আর না।" তারপরই শুরু হল কবির বাঁধন-ছেড়া জীবন। আফ্রিদি কওমের সহায়তায় তিনি মুঘলদের নওশেরা দুর্গ অধিকার করে বসলেন।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় বৎসর থাপাক উপত্যকায় আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে মুঘলদের এক বিরাট শিক্ষা দিলেন কবি। স্বদেশের পরাধীনতা তাঁর সহ্যের বাইরে। বিরাট মুঘল শক্তি। কিন্তু কবির ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। পরবর্তীকালে তাই শুরু হল স্থিরতাহীন পলাতক জীবন। খাইবার কোহাট জমরুদ মালাকন্দ প্রভৃতি এলাকায়। পাহাড়ের কন্দরে, গুহায়— অশেষ কৃচ্ছ্রতার জীবন।

পশ্‌তু সৈনিক কবি লিখছেন :

রোখ্ না কর্দ্ মুল্‌ক্ পে খুনা কিস্ মারান দী।
চে মারান্ দখুনে যেতা খুর্বী গাদাম ॥
পর দেশলোভী যারা, তারা অহিপ্রায়।
সর্প-পূর্ণ গ্রহ-বাসে আরাম কোথায়?

খুশ্‌হাল খান মুঘলদের হাতে আর ধরা দিলেন না। পলাতক জীবনই শ্রেয়। গৃহ বাসের চেয়ে উন্মুক্ত আকাশই প্রিয়তর। স্বদেশ ত সর্পপূর্ণ। কবির পক্ষে বাস সেখানে অসম্ভব। নওশেরা দুর্গ বেশি দিন কবির করায়ত্ত ছিল না। তারপর শুরু হল খণ্ড-যুদ্ধ বিরাট মুঘল-সৈন্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে। অস্থির কবি স্থিরতাকে চিরজন্মের মত বিসর্জন দিলেন। কিন্তু কবি আসলে প্রেমিক। খুশ্‌হালের লেখা প্রেমের সঙ্গীতে আজও পাঠান পার্বত্য এলাকা গ্রীষ্মের দাবদাহে অতীতের অনুরণন তোলে। শান্তি-প্রিয় খুশ্‌হাল অশান্তির তরঙ্গে টাল-সামাল রত। কবি লিখছেন :

AMARBOI.COM

কুলো জান্নাক্ উতে হোস্ কা
চে আস্‌তি মুখী বাশীর ॥
কে পে সুল্‌হে কন্‌বন রোজ করসী।
চে হাজাৎ ওয়া তেগ্ ওয়া তীর ॥
সন্ধি হয় যদি— সেই শ্রেয়তর।
কেবা চায় যুদ্ধের রণন ॥
সন্ধি-সমঝোতা জীবনেরই কথা।
তেগ্-তীরে কিবা প্রয়োজন?

পরাধীন কবি শাসকদের ভণ্ডামি কোন দিন বরদাস্ত করেন নি। মুঘল সম্পর্কে তাঁর বহু শ্লেষাত্মক কবিতা আছে। আওরঙ্গজেব সম্পর্কে তিনি বলছেন— কথাগুলো শাদা গদ্যের তরজমায় দাঁড়ায় :

"চিনেছি আমি আওরঙ্গজেবের ইন্‌সাফ, নিরপেক্ষতা
চিনেছি তার ঈমানের গোঁড়ামি,
তার উপবাস,
আল্লার করুণা-ভিক্ষায় তার দৈহিক আত্মনিগ্রহের মর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের ভাইরা একে একে নির্দয়ভাবে তলওয়ারের তলায় প্রাণ হারালো,
তার বাপ সংগ্রামে পরাজিত, নিক্ষিপ্ত হল কারাগারে।
যদি মানুষ হাজার হাজার বার জমিনে মাথা পটকায়,
অথবা রোজা রেখে রেখে নাভি আর মেরুদণ্ড এক করে ফেলে,
যদি ঈমানের সঙ্গে সত্যি তার কাজ করার ইচ্ছা না থাকে,
তবে তার উপাসনা, ধর্ম-নিষ্ঠা সব ভণ্ডামি, সব ঝুট্।
যার জিহ্বার পথ এক, এবং হৃদয়ের পথ আর এক
তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলো।
বাইরে থেকে সাপ খুব সুন্দর ও সুগঠিত,
কিন্তু অভ্যন্তরে গলিজ এবং হলাহলে পূর্ণ।
সৎ লোকের কাজ অনেক, কথা স্বল্প,
মুনাফেকের কাজ স্বল্প, ক্ষতিকর বড়াই বেশি।
খুশহালের বাহু এই দুনিয়ায় জালেমের নাগাল পেল না,
কেয়ামতের দিনে আল্লার ক্ষমাভিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত হয় সেই জালেম।"

কবি আলাওল থামলেন। তারপর শ' ও রলাঁর দিকে বিশেষভাবে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "য়ুরোপের বন্ধু, এই হচ্ছে প্রাচ্যের কবি। দেহে মনে যোদ্ধা। এই টানা-পোড়েনের স্রোতে খটক-পাহাড়ের তরুচ্ছায়ায় একদিন কবি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। সমস্ত পার্বত্য এলাকায় খুশ্‌হাল খটক আজও রূপকথার নায়ক।"

"We are just trifle to such warrior— আমরা ত এমন যোদ্ধার কাছে মাছি," বার্নার্ড শ' জবাব দিলেন। তারপর আবার কী যেন বলতে তিনি মুখ ফেরান। আলাওল সুযোগ দিলেন না, বলে চললেন, "নবীন-প্রবীণ বন্ধুগণ, এই চমৎকার রাত্রি। হাম্‌পেয়ালা ইয়ারী মুহূর্তে আসুন আমরা কবি খুশহাল খান খটকের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁরই গজল গাই। এই ত সময়। মি. শ', আপনি সুরের সঙ্গত রেখে যান।"

দরাজ, সুমিষ্ট কবিকণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয় :

বীয়া লা কুমা রা পয়দা সুদা বাহার।
চে চে হার লুরী যে মুল্‌ক্ কারায়ুউ গুল্‌জার ॥
বীয়া লা কুমা রা পয়দা সুদা বাহার ॥*

গজল থেমে গেল। মজলিসে কেউ হাততালি দেয় না। হঠাৎ সকলের মুখের কথা কে যেন কেড়ে নিয়েছে। সঙ্গীতের ভাষা বিশ্বজনীন, আন্তর্জাতিক। শ' পিয়ানোর উপর আর আঙুল চালাচ্ছেন না।

* হে বসন্ত, হে বসন্ত, আমি তোমাকে ভালবাসি।
কখন এলে তুমি? আলোকে কুসুমে ঝলমল,
মাঠ আজ গোলাপ উদ্যান। হে বসন্ত কখন
এলে তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহ্ কবি নিজের খেয়ালে আবৃত্তি করতে লাগল :

Music, thou virgin mother, who in thy immaculate womb bearest the fruit of all passions, who in the lake of the eyes, where of the color is as color of the rushes, or as pale green glacier water, emboldest good and evil, thou art beyond evil, thou art beyond good; he that taketh refuge with these is raised above the passing time : the succession of day will be but one day : and death that devours everything on such as one will never close its jaw.

এবার শ' হাততালি দিয়ে উঠলেন : "Well timed, poet! ঠিক সময়ে ফোড়ন দিয়েছ।"

রলাঁ ইশারায় সাহ্ কবিকে কাছে ডাকলেন। কবি ত হুড়মুড় এগিয়ে যায়। আশেপাশে বন্ধুরা বসে আছে তার আর খেয়াল নেই।

শ' এই সময় কোপ মারলেন,—"প্রত্যেকেই নিজের গান শুনতে চায়।"

আপত্তি জানালে সাহ্ কবি রলাঁর পাশে বসে পড়ে : না, মি. শ'। জাঁ খ্রিস্তফের মত অত বড় বিরাট উপন্যাস থেকে দু-চার লাইন বললে কারো স্মরণ হওয়ার কথা নয়।

"কিন্তু এসব অপূর্ব কথা স্মৃতি থেকে লেখা হয় না, বিস্মৃতিই শুধু এখানে সাহায্য করতে পারে।" শ' জবাব দিলেন।

সৈয়দ বোক্‌জার মুখ নিসপিস করছিল। এমন সময় সে দু' চামচ ঝাল-মশালা না মিশিয়ে পারে না। বললেন, "মি. শ', মাফ করবেন। আপনার লাইফ-ফোর্স এখানে খাটাবেন না। আপনার লাইফের ফোর্স কতখানি, সে ত চুরানব্বই বৎসর বয়সেই জানা গেছে।"

সকলে হেসে উঠল। শ' তা মাখমের মত রুটির নয়, নিজের গায়ে মাখিয়ে জবাব দিলেন, "তরুণ বন্ধু, পদস্খলন ঘটেছিল কি না, তাই লাইফ-ফোর্স আর কাজ করল না।"

"পদস্খলন ঘটেছিল?" সৈয়দ বোক্‌জা এই প্রশ্ন করা মাত্র, সকলে আবার একচোট হেসে নিলে।

"হ্যাঁ, বাগানে আমার পা পিছলে গিয়েছিল। কারণ রাস্তায় জমেছিল শ্যাওলা।"

"তখন লাইফ-ফোর্স কোথায় ছিল?" সৈয়দ বোক্‌জা তলওয়ার ঘোরালে।

মোয়াবক এই কথাবার্তার মধ্যে থাকলেও গজল শোনার পর তার চোখ বারবার লনের কোণায় ঠাসাঠাসি ডিকেন্টার আর পানীয় বোতলের দিকে ধাওয়া করছিল। সে এলো ডুয়েলে শ'র সহকারী রূপে। বললে, "মি. শ', লন্ডনের রাস্তায় কলার খোসা ত কোন দিন দেখেন নি। কিন্তু আমাদের শহরে দু-চার দিন ঘুরে যান, রাস্তার ধুলোর মধ্যে পচা কদলি দেখবেন আর খোসাও দেখবেন।"

"What have I to do with that fruit—ঐ ফলের সঙ্গে আমার কী কারবার?" শুধান বার্নার্ড শ'।

"জনাব, কারবার নেই বলেই ত এখন জবাব দিতে পারছেন না।"

"What should I reply— কি জবাব দেব?"

"আপনি জবাব দেবেন, লাইফ-ফোর্স তখন কলা হয়ে গিয়েছিল। নচেৎ পদস্খলন হল কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার রলাঁর মুখে পর্যন্ত হাসি দেখা দেয়। অবিশ্যি সকলের তারাগ্রামে তিনি পৌছান না। শ' নিজেও তখন যোগ দিলেন।

তারপর সকলের হাসি ছাপিয়ে বেশ জোর গলায় বললেন, "Well Syed আচ্ছা সৈয়দ, তুমি কি ডারুইনিস্ট?"

সৈয়দ বোক্‌জা হাসিমুখেই মাথা নেড়ে নেড়ে আপত্তি জানালেন, "না, মি. শ', আমি আপনার মতই লেমার্কিস্ট। আমি কেন, এদেশের সবাই।"

"সে কী রকম?"

"লেমার্কের মতই আমরা মনে করি, খালি ইচ্ছার বদৌলত, আমরা যা ইচ্ছা করি— এক দিন তা-ই হয়ে যাব। লাইফ-ফোর্স আমাদের টেনে নিয়ে যাবে।"

"আহ্‌হা—", কিন্তু শ'কে সৈয়দ বোক্‌জা শেষ করতে দিলে না। নিশান ওড়ানোর সুযোগ পেলে সৈয়দ বোক্‌জাকে আর কে রোখে। বক্তৃতা শুরু করলে, "মি. শ', আমাদের কি দশা জানেন? আমাদের দশা হচ্ছে— আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা বিশ্বাস করি, We believe that we believe।"

শ' : ওতে কী হবে?

বোক্‌জা : ওতেই হয়ে যাবে! কারণ, লেমার্ক আর আপনার লাইফ-ফোর্স বাকিটা করে দেবে।

শ' : আমি কি তাই বলেছি?

বোক্‌জা : আমাদের দশা যে তাই। বুঝতে পারছেন না।

শ' : You talk like a mystic— তুমি মরমীবাদীর মত কথা বলছ।

বোক্‌জা : দুনিয়ার তামাম লোককে আপনি আক্কেল খয়রাৎ করলেন। শেষে এই বান্দার কথা বুঝতে পারছেন না? আফসোস। তা হলে আপনার কায়দায় বলতে হয়।"

শ' : কি, নাটক লিখবে?

বোক্‌জা : না, না। আপনাকে একটা গল্প শোনাই, নাটক যদিও আসলে গল্প।

এক ফকিরের তিনটে কুত্তা ছিল। ফকির মানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহা ব্যক্তি। তিনি রেসের ঘোড়ার নম্বর বলে দিতে পারেন, আপনার মুমূর্ষু বাচ্চা বাঁচিয়ে দিতে পারেন, আওরতের গর্ভে কি বাচ্চা হবে বলতে পারেন, চাকরির প্রমোশন কবে হবে তা আগে থেকে জানেন, ঘুষ খেলে কি করে শাস্তি থেকে বেঁচে যাবেন— এমন বহুৎ কিছু গায়েবি রহস্যের মালিক। হ্যাঁ, এই ফকিরের তিন কুত্তা। কুত্তাগুলো বেশ মোটাসোটা! কিন্তু পাড়ার কুকুর তাড়া করলে ফকিরের পাশে এসে হাঁপায়। পাড়ার ভক্তদের তা দেখে খুব কষ্ট। ফকিরের কুকুরের এমন অপমান! শেষে তারা এসে আরজ করলে, "জনাব, এ আপনার কুকুর। আর তাড়া খেয়ে পালায়। এ বেইজ্জতি আমরা সইতে পারি না। আপনি আজগুবি কাণ্ড করতে পারেন, অথচ কুকুরের বেলায় এমন বেখেয়াল?" ফকির জবাব দিলেন, "দ্যাখো, আমার কুকুর— মনে রেখো, ওটা আমার কুকুর। আগার মান্ করে তো শের মারে। (যদি ইচ্ছে করে, বাঘ মারে)। লেকিন, মরে তভি মান্ না করে। (কিন্তু মরে তবু ইচ্ছে করে না।)।

মজকুর সকলে হো হো শব্দে হেসে উঠল। রলাঁ চিরাচরিত নিজের মাত্রার মধ্যে।

AMARBOI.COM

পাষণ্ড এতক্ষণ মেঘে-ঢাকা শশীর মত আত্মগোপন করেছিল। সে আর চুপ থাকতে পারে না। ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। আর তা ছাড়া মোয়াবককে সে চেনে। আর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। সে শ'র সাফাই যেন কেড়ে নিলে, "শোনো, সৈয়দ। তুমি মি. শ'র উপর খামাখা দোষারোপ করছ। লেমার্কের কথাটা কী? Functional adaptation। প্রাণিজগতে জিরাফ বড় বড় বৃক্ষের মধ্যে থেকে আর গলায় থ' পায় না। এই পরিবেশে খাপ খাওয়াতে তার গলা লম্বা হতে লাগল। এর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হয়ত ভুল। কিন্তু বার্নার্ড শ' সেই অর্থে লেমার্ক-অনুসারী নন। তিনি মনে করতেন, সমগ্র মানব জীবনের সঙ্গে অন্যান্য জীবনের একটা ঐক্য আছে। আর এই জীবন অর্থহীন নয়। তার জন্য দরকার বাইরের এবং ভেতরের প্রবাহ-সম্পর্কে সচেতনতা। তা হলেই মানুষ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এটাই হবে আসল বিবর্তন। বাইরের বিবর্তনের উপর তিনি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। আর মনে রেখো; সৈয়দ বোক্জা, দৈবের হাত থেকে মানুষকে আত্মবিশ্বাসে এই পথে টেনে আনার জন্যে মি. শ' চিরদিন আমাদের নমস্য হয়ে থাকবেন। আর তাছাড়া, একটা জিনিস চেষ্টা করে শিখলে, তা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। মি. শ' সেই জন্য বলছেন, আজকে যা অভ্যাস, নিশ্চয়ই তার পেছনে চেষ্টা ছিল। অনেক জিনিস এমনি আপনাআপনি ঘটে প্রাণি-জগতে। প্রাণিতত্ত্ববিদদের কাছে তার ব্যাখ্যা একটা বড় সমস্যা। শ' তাই মনে করেছেন, নিশ্চয়ই এসবের পেছনে একটা ইতিহাস ছিল। তা ওই চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং সমস্ত পৃথিবীতে একটা "সচেতন ইচ্ছা" বিরাজমান। কিন্তু একটা জীবন্ত বস্তুর যে অচেতন এবং সচেতন দিক আছে, তা মি. শ'র চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু তার আসল কথাটা তোমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সমগ্র মনুষ্য-সমাজকে তিনি আহ্বান দিচ্ছেন : হে মানুষ, তুমি সচেতনভাবে বাঁচার চেষ্টা পাও। মানুষের বা দৈবের ক্রীড়নক হিসেবে নয়। তোমার সমস্ত জীবনের সার্থকতা সেইখানে।"

রলাঁ হাততালি দিয়ে উঠলেন। পাষণ্ড ত ভড়কে যায়। তখনই হাওয়ার আঁচ পেয়ে সে শ'কে সম্বোধন করে, "মি. শ', Am I correct— আমি ঠিক ধরেছি ত?"

"Come on, let me kiss you, my young friend— এস তরুণ বন্ধু, তোমাকে একটা চুমু খাই।" শ' হাত বাড়িয়ে জবাব দিলেন।

"That is not English— এটা ইংরেজের রীতি নয়?"

"But I am an Irish— কিন্তু আমি ত আইরিশ।"

পাষণ্ড হেসে হেসে জবাব দিলে, "মি. শ', আগে আমাকে একটা কথার উত্তর দিন, তারপর আপনার ঠোঁটের কাছে ধরা দেব।"

— Yes?

— সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল, আপনি একবার ফ্রান্সে যান। সেখানে মুগ্ধ আনাতোল ফ্রাঁস প্যারিসের রাস্তায় আপনাকে নাকি চুমু খেয়েছিল?

— হ্যাঁ, খেয়েছিল। ওটা ফরাসি রীতি।

— ফরাসি রীতি আপনি এখানে নাইবা চালু করলেন। আর আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি, তখন আপনার দাড়ি গজায় নি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— তুমি ঠিক ধরেছ। এসো, কাছে এসো।

তেছোদীন অনেকক্ষণ চুপচাপ। কারণ, মোয়াবকের মত সে-ও সব জিনিস তলিয়ে দেখার প্রয়াসী। বোতল দেখবে অথচ তার ভিতরে ঢুকবে না— এহেন কথা তার কোষ্ঠিতে লেখা নেই। তেছোদীন তাই এই প্রসঙ্গ এখনই ধামাচাপা দিতে পারলে খুশি।

সে বার্নার্ড শ'র মুরুব্বি সেজে বললে, "সৈয়দ, তুমি আসলে লড়াই-ক্ষ্যাপা। শ' মোটেই ডারুইন-বিরোধী নন। মোদ্দা কথা কি জান, ডারুইনের তত্ত্ব যখন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে লাগল তখনই ওঁর আপত্তি। জীব-জগৎ থেকে মনুষ্য-জগতের উপর এই হামলা শ'র পছন্দ নয়। Survival of the fittest মুখ্যমন্ত্র হলে ত দুনিয়া জঙ্গল হয়ে যায়। তা ছাড়া ইংরেজরা তরুণ যুবকদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে প্রমাণ করছিল Fittest রা আগেই খতম হয়ে যাচ্ছে আর কতগুলো বুড়ো-পঙ্গু বেঁচে থাকছে লন্ডন শহরে। অথচ যুদ্ধে পাঠানোর জন্য Survival of the fittest মন্ত্রটা আবার কাজে লাগে। তা ছাড়া ইংরেজরা চণ্ড জাতীয়তাবাদ আবার কী করে জাগিয়ে তুলবে? উপনিবেশের দিকেদিগন্তরে স্ত্রী-পুত্র-জননী গৃহসুখ ছেড়ে বেকার ইংরেজ যুবকরা নচেৎ কীভাবে ছুটে যাবে কালা আদমিদের সভ্য করে তুলতে? মি. শ'কে তুমি খামাখা ডারুইন-বিরোধী মনে করছ। মি. শ' মনুষ্যসভ্যতার চরম-বিকাশকে কীভাবে দেখছেন? তুমি ত ইংরেজির অধ্যাপক ছিলে। ব্যাক-টু-মেথুশালা পড়েছ। শ' বলছেন, মানুষই ভবিষ্যতে স্পিরিট, মর্মশক্তিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ শ' মনে করেন আমাদের চরম বিকাশের স্থান ভবিষ্যৎ। কিন্তু তার আগে, গ্রিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত মানুষ মনে করত, তাদের স্বর্ণময় যুগ অতীতে ছিল— Golden Past। মানুষ ছিল স্রষ্টারই অংশ। ক্রমশ মানুষ তার সেই ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলেছে, ফেলছে। মানুষ স্বর্গচ্যুত জীব। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দি এসে হাঁক দিলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা এক রকমের বানর ছিল।' পণ্ডিতরা তার কত রকম নাম দিয়েছেন পিথেকানথ পাস, নিয়ানডারথাল ইত্যাদি। অর্থাৎ জন্তু থেকে মানুষ এগোচ্ছে সামনের দিকে। Golden past এর জায়গায় Golden Future আশা করি, এই দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকটা, সৈয়দের আক্কেলেও নিশ্চয় ঢুকবে। ঊনবিংশ শতাব্দির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে বিত্তবান বার্নার্ড শ'র মত আর ক'টা মানুষ আছে পৃথিবীতে? আসলে মি. শ' একজন ডারুইনিস্ট, বিবর্তনে বিশ্বাসী। তোমার খোঁটা, সৈয়দ বোক্‌জা, ভুল। Am I right, Mr. Shaw— আমি ঠিক বলেছি?"

"You deserve another hot kiss— তোমার আর একটা তপ্ত চুমু পাওনা," বার্নার্ড শ' হাত নেড়ে হাসতে গিয়ে ঘাড় একটু কাৎ করে বললেন।

"No Mr. Shaw, I deserve another hot peg— আমার গরম পেগ্ প্রয়োজন।"

"By all means, নিশ্চয়," শ' সমর্থন করলেন। সকলে ত মুখিয়ে ছিল। আগেই মৌরলা মাছের মত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল মোয়াবক। তারপর প্রাণ-শশী আঢ্য অর্থাৎ পাষণ্ড, সৈয়দ বোক্‌জা এবং সাহ্ কবি দুই জনে চোখাচোখি করতে করতে বোতল সজ্জিত টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখন বোতলের পাগড়ি খোলার প্রতিযোগিতা লেগে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলের দৃষ্টি সেই দিকে।

শ' হাঁকলেন, "Young friends, give me three drops of Brandy and one full glass of water— আমাকে তিন ফোঁটা ব্র্যান্ডি আর এক গ্লাস পানি দাও।"

আলাওল বললেন, "আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ, এই সময় আবু সিনার একটা আরবি কবিতা আমার মনে পড়ছে। তিনি বলছেন, সুরা বুদ্ধিমানের বন্ধু, আহম্মকের শত্রু। যেমন মানুষ, তেমন ক্রিয়া। আরবি কবিতাটা আপনাদের শোনাতে পারলাম না, আফসোস। ভাষার উপর অত দখল ছিল না। তাই মুখস্থ নেই।"

হাজি মহ্সীন অনুযোগের সুরে নির্দেশ দিলেন, "মেহমান-নওয়াজী— অতিথি-সেবা আমার ধর্ম। আপনারা খান। আমাকে এক গ্লাস সরবৎ দেবেন।"

মোয়াবক জিজ্ঞেস করলে, "হাজি সাহেব, আপনাকে কমলা লেবুর রস দিই।"

"তাই দাও।" হাজি সাহেবের জবাবের পর মোয়াবক অরেঞ্জ স্কোয়াসের বোতল খুললে।

হঠাৎ জুহা-নন্দন ফুয়াকে দেখা গেল। ট্রে-ভর্তি কাটলেট আর চপ নিয়ে উপস্থিত। সৈয়দ বোক্‌জা তাকে প্রায় মাথায় নিয়ে নাচে। বললেন, "ব্যাটা আর কিছু আলুভাজা পাঠাতে বল। সবচেয়ে ভালো হয় পাঁপড় ভাজা।"

গুরুজনদের কাছ থেকে সে বিদায় নিতে পারলে বাঁচে।

তেছোদীন গ্লাস পূর্ণ করে প্রায় গিলতে যায় আর কি। ধমক দিলে পাষণ্ড, "আরে থাম থাম। আমরা কোন উপলক্ষ বা মহাপুরুষ স্মরণে 'টোস্ট' করব। সব ঠিক করে নিই। তুই ক'দিন চৈত্রের ফাটা জমিন হয়ে আছিস?"

মোয়াবক এই সময়ে বললে, "মি. শ' ভেজিটেবল্ চপে ত আপনার আপত্তি নেই।"

"না! দ্যাখো, আমার বড় বদনাম আছে খাওয়ার ব্যাপারে। সে-সম্পর্কে পরে কথা হবে। এখন তোমরা তৈরি হয়ে নাও।" শ'র জবাব এল।

তারপর শোনা গেল সৈয়দ বোক্‌জার উদাত্ত স্বর্ণস্বর। সে প্রস্তাব করলে, "মহান অতিথিগণ, আমি প্রস্তাব করছি, আপনারা সকলে এই জায়গায় এসে জমায়েত হন দেবী মিউজ আর দেবতা বেকাসের সৃষ্টিমুখর তপোবনে। আমরা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর উদ্দেশে কিছু 'টোস্ট' পান করব। আমাদের পরিচালনা-ভার মি. বার্নার্ড শ'র উপর। হাসির প্রতীক-রূপী আত্মা তিনিই একমাত্র পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন।"

লনের উপর টেবিল ঘিরে সকলে এসে দাঁড়াল। সকলের হাতে ডিকেন্টার। পানপাত্রে নানা পানীয়। কমলার রস থেকে 'কনিয়াক'। কিন্তু সবই রঙিন। এবার টোস্ট-প্রস্তাবনা শুধু বাকি। সৈয়দ বোক্‌জার হাত ঈষৎ কাঁপছে। কারণ, নাসিকা অস্থির। মোয়াবক আগেই ছলো-ছলো আঁখি। আঢ্য গ্লাসের উর্ধ্বে সমান্তরাল রেখায় শূন্য-দৃষ্টি। তেছোদীন ট্যারা চোখে বিশ্ব পর্যালোকনে ব্যস্ত, কিন্তু ভান— কিছুই দেখছে না। সাহ্ কবি ইহলোকে নেই।

বার্নার্ড শ' ডিকেন্টারসহ হাত তুললেন। সকলেই তাঁকে অনুসরণ করছে। এমন সময় লনের অন্যদিক থেকে প্রায় আর্ত চিৎকারের মত শোনা গেল, "Hey gentlemen! Hey gentlemen— তিষ্ঠ ক্ষণকাল— তিষ্ঠ ক্ষণকাল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলে চমকে ওঠে। প্রত্যেকের চোখ আওয়াজ-অভিমুখী। 'Hey gentlemen', 'তিষ্ঠ ক্ষণকাল।'

কিন্তু এই রব তখন অতি নিকটবর্তী। আবছা আলোয় দেখা গেল, একজন সাহেবি স্যুট-পরিহিত ব্যক্তি হন্তদন্ত এগিয়ে আসছেন। মাঝারি বিশাল দেহ। মুখে একরাশ কালো দাড়ি। পায়ে ডার্বি জুতা। তেজোব্যঞ্জক বিরাট মুখখানা। পূর্বোক্ত মঞ্চের কাছাকাছি এগোনোর সময়ও তিনি বলছেন, "সমাধিস্থল নয়, তবু তিষ্ঠ ক্ষণকাল... ।"

বিজলি আলোয় এবার মজকুর ব্যক্তিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

নিকটে এসে, কুর্নিশ-ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি বললেন, "Gentlemen, let me have the pleasure of being introduced to you : I am Michael Modhusudan Dutt of Sagardari on Kabadak, Jessore— ভদ্রোমহোদয়গণ, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আনন্দটুকু অধমকে দিন। আমি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মোকাম— কপোতাক্ষ তীরে সাগরদাড়ি গ্রাম, জেলা যশোহর।"

কিন্তু মাথা তুলতেই মধুসূদনের চোখ পড়ল বার্নার্ড শ'র উপর। তখন হাত বাড়িয়ে তিনি "Hey, George" রবে এগোতে লাগলেন। তারপর জোর ঝাঁকুনি করদর্মন আর সহজে থামতে চায় না।

শ' গ্লাস হাতে প্রায় বেসামাল, পাছে আধেয় পড়ে কাপড়চোপড় নষ্ট হয়। মধুসূদন একটু থামতেই তিনি বললেন, "ডাট, তুমি আমার এই নাম কী করে জানলে? ইংল্যান্ডে সবাই আমাকে ডাকে : শ'; আর আয়ার্ল্যান্ডে—আমার স্বদেশে— জর্জ।!

"Because I am an Irish— কারণ আমিও জাতে আইরিশ," হেসে হেসে জবাব দিলেন মধুসূদন।

জমায়েত একদম স্তব্ধ। সকলে দু' জনের কাণ্ড দেখছে, আর শুনছে।

শ' : তুমি আইরিশ?

মধুসূদন : Yes, Shaw.

শ' : But how?

মধুসূদন : Ireland was the first colony of the British Imperialist, They had begun by plundering their own neighbour long before my motherland, As such we know each other like our palm.

শ' : বহুৎ আচ্ছা।

সৈয়দ বোক্জা, মোয়াবক, তেছোদীন এতক্ষণ ডিকেন্টার হাতে থ'। সকলের চোখ মধুসূদনের উপর। একদিকে পানের নেশা অন্যদিকে মধুসূদনের উপস্থিতি— যেন উভয় সঙ্কট। কিন্তু সৈয়দ বোক্জা পরিস্থিতি সওয়ার হতে জানে। সে চট করে নিজের পানপাত্র টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলে। তা মধুসূদনের চোখে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, "জর্জ, তোমার সঙ্গে কথা হবে না কার সঙ্গে হবে। কিন্তু শুভ কাজে এত দেরি কেন?" পরে সৈয়দ বোক্জার দিকে আঙুল বাড়িয়ে, "ওহে চ্যাংড়া-বন্ধুগণ, Go on, but give me a double"।

সৈয়দ বোক্জা একটা ডিকেন্টারে বোতল থেকে পানীয় ঢেলে কিছু সোডা

মেশাতে গেল।

মধুসূদন তখন চিল-ছোঁ-মারা কায়দায় ডিকেন্টার হাতে তুলে নিয়ে কপট ভর্ৎসনা জুড়লেন, "আহ, তুমি ত সব ভেস্তে দিয়েছিলে, বন্ধু। আমার পানি সোডা কিছুই লাগে না। আমি অকৃত্রিম মানুষ। আমি সব জিনিস অকৃত্রিম পছন্দ করি।"

তারপর ডিকেন্টার একটু উর্ধ্বে তুলে, নিজেও উর্ধ্বমুখী বলে চললেন, "বুকে অনেক জ্বালা ছিল, বন্ধু। দেশবাসীর অজ্ঞতাপ্রসূত জ্বালা, পরাধীনতার জ্বালা, দারিদ্র্যের দাবদাহ— তাই মাইকেল কোন দিন স্থির হতে পারে নি। মদ্যপের মতই ডাইনে-বাঁয়ে ঝুঁকে ভারসাম্য রাখতে গিয়েছিল। অস্বাভাবিকতার আবরণে স্বাভাবিকতার সন্ধান। দেবতার পথেও যদি হোঁচট খেতে হয়, তখন শয়তানের পথই উত্তম— কারণ সেখানে অন্তত উন্মাদনা আছে। সেই দুর্দিনে এই পানীয় সত্যি আমার সহকারী ছিল। Oh! thou invisible sprit of wine. Let us call thee devil. If thou hast no name to be known by, দেবতার পথ ছেড়ে সেই জন্যেই শয়তানের আশ্রয় প্রার্থনা।"

এমন সময় শ' এগিয়ে এসে প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন কবির কনুয়ে টোকা মেরে বললেন, "So you became a christian।"

"Certainly, Certainly", ডিকেন্টার নামিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দিলেন মাইকেল। তারপরই, "কিন্তু শুভ কাজে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজকে ব্যাপারটা কী?"

নেপথ্যে কে একজন জবাব দিলে।

মধুসূদন সমস্ত মুখ অবলোকন করতে লাগলেন।

"মি. শ" সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে বোক্‌জা বার্নার্ড শ'র দিকে তাকালে।

টোস্ট-প্রস্তাবনায় তিনি এগিয়ে আসেন। আলাওল, মহসীন প্রায় সৈয়দ বোক্‌জার অনুকরণে হাত তোলেন। বার্নার্ড শ' অনেকখানি উঁচুতে শুধু গ্লাস তোলেন না, গলাও দূর-গ্রামে পৌঁছান। কিন্তু তার আগে মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ডাট, তোমার আগমনে আমরা প্রীত। কারণ এখনই বুঝতে পারবে।"

পাড়ার আর এক প্রান্ত থেকেও শোনা যেত বার্নার্ড শ'র দরাজ কণ্ঠ : To the dying soul of the world imperialists.

সকলেই তাঁর অনুকরণে জোরে জোরে উচ্চারণ করে : To the dying soul of the world imperialists.

এবার প্রত্যেকেই গ্লাসে চুমুক দিতে থাকে। হেন অবস্থায় শ' বললেন, "এখন যে যার জায়গায় বসে বসে পান উপভোগ করা যাক। পরবর্তী টোস্টের সময় আবার আসা যাবে।"

সকলে শ'র আদেশ পালন করে। তেছোদীন চত্বরে আসতে আসতে চাপা হাসির চোটে খিক্-খিক্ শব্দ তোলে। তা শ'র চোখ এড়ায় না। আসামি পাকড়াও হাতেনাতে।

শ' : What makes you laugh?

তেছোদিন : মি. শ', আপনার টোস্ট-প্রস্তাবনার ধরন দেখে হাসি পাচ্ছে।

শ' : What! Why laughter?

তেছোদিন : আপনি ত সাম্রাজ্যবাদীদের ঘোর শত্রু। ওদের মৃত্যু কামনাই ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক। আপনি ওদের মুমূর্ষু আত্মার উদ্দেশে এই আনন্দ প্রস্তাবনা করলেন কেন?

শ' : আহ্, তোমার ভাষায় তোমাকে বোঝাতে হয়। বড়শি ফেলেছ কোনো দিন?

তেছোদীন : তা ফেলেছি বৈকি!

শ' : মাছ ডাঙায় তোলায় বেশি আনন্দ নেই। আনন্দ হচ্ছে গেঁথে খেলানোর মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দির শেষ থেকে আমি এই Gold-digger swine-দের মৃত্যু কামনা করেছি। কিন্তু তখন ওরা মরে নি। আজ ওরা মরছে। তাই একটু লবণ ছিটিয়ে নিলাম।

"Excuse me, George" উচ্চারণের পর মধুসূদন সৈয়দ বোক্‌জার দিকে লক্ষ করে বললেন, "বন্ধু, তোমাদের পরবর্তী টোস্ট কখন আরম্ভ হবে, তা ত জানি নে। তুমি আমাকে আর এক পেগ দাও।"

সৈয়দ নিজের গ্লাস চত্বরে রেখে তাড়াতাড়ি মাইকেলের শূন্য গ্লাস পূর্ণ করে এনে দিলে। প্রথম চুমুকের পর মধুসূদন জিজ্ঞেস করেন, "জর্জ, তুমি ওদের মৃত্যু কামনা করছ কেন? আমি ত তা চাই নি। আমি চেয়েছিলাম, এই হারামজাদারা আমাদের দেশ ছেড়ে যাক। আর কিছু না।"

শ' হো-হো হেসে উঠলেন, "because you did not know them. You are talking of childhood"।

মধুসূদন একটু অপ্রস্তুতের মত তাকান। তখন সৈয়দ বোক্‌জা এগিয়ে আসে। আর বোক্‌জা ত শূন্য নয় যে শুধু পেছনে বসে কারো মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবে। সে আগেই বসবে এ-কার ই-কারের মত। সুযোগ পেলে তার মুখে তুফান ছোটে।

মধুসূদনকে সম্বোধন করে সে বললে, "কবি মাইকেল, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের পর আপনি আর দুনিয়ার খবর রাখেন নি। আর সেই সময় অসুখবিসুখ, পারিবারিক ঝামেলা, দেনাদারের ঠেলা— ইত্যাদির ফলে চারিদিকে আপনার নজর দেওয়ার মত অবকাশ ছিল না। ১৮৫০-৬০ এর পর থেকেই দুনিয়ায় অনেক কিছু ঘটতে লাগল। আপনি বর্বরদের মৃত্যু চান নি, কারণ তাদের বর্বরতা সম্পর্কে সভ্য দুনিয়া ওয়াকিবহাল ছিল না।"

বিস্ময়ে মাইকেল বোক্‌জার দিকে তাকায়। শ' ওদিকে মিটিমিটি হাসছেন।

"তারপর?" শুধান মধুসূদন।

সৈয়দ বোক্‌জা তখন স্রোতায়িত। আর কারণ-বারি ভেতরে ছিল। তাকে আর কে পায়।

সে বললে, "কবি মাইকেল, এই তথাকথিত সভ্য জাতের বর্বরতাপ্রসূত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যদি দুনিয়ার তাবৎ গীর্জায় সমস্ত মানুষ অনন্তকাল প্রার্থনা করে, তাহলেও ওদের পাপের সিকি অংশ ধোলাই হবে না।"

"That is not a good efficacy" হঠাৎ ফোড়ন দিলেন শ'।

সৈয়দ সেই দিকে আড়চোখে চেয়ে গোঁফে হাসি মাখিয়ে আবার তিক্ত সুরে আওড়াতে লাগল, "আপনি ত সিপাহী বিদ্রোহের দিকে অত নজর দেন নি। তার তিন বছর পরে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ আর ফরাসি দুই বরাহ মিলে চীনের "গ্রীষ্মপ্রাসাদ" ধ্বংস করল। বাড়ি ঘরদোর ত ধ্বংস ভূমিকম্পেও হয়। কিন্তু এখানে তারা ধ্বংস করল সুং আর মিঙ আমলের যত অমূল্য ছবি, মূর্তি, কারুকার্য-খচিত চীনামাটির বাসন, দুর্লভ

AMARBOI.COM

পাণ্ডুলিপি— এই শিল্পকলার জন্যে চীন হাজার হাজার বছর খ্যাত ছিল। সেই মানবিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এরা আগুন জ্বেলে পুড়িয়েছিল। হিটলারের পাপের চেয়ে এদের পাপ বিন্দুমাত্র কম নয়। প্রাসাদের নাম ছিল 'ইউয়েন-মিং-ইউয়েন।' মানুষের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি এই ইংরেজ আর ফরাসিরা ধ্বংস করেছিল দেশ জয়ের নামে, সভ্যতা গর্বের অভিমানে।"

"আশ্চর্য! তখন সংবাদপত্রের এত প্রচার ছিল না। তাই জানতে পারি নি। মধুসূদন বললেন।

"কবি মাইকেল, সংবাদপত্র থাকলেও সংবাদ পেতেন না। কারণ ও-খবর ত ওরা ছাপতে দিত না। আর ছাপলেও বিকৃত কিছু পেতেন। জালিয়ানওলাবাগের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কি ইংরেজদের সংবাদপত্র উপহাস করে নি?"

"এত বর্বর এরা?"

"এরা মানে— সাম্রাজ্যবাদীরা, ইংরেজ বা ফরাসি জনসাধারণের সঙ্গে তাদের আপনি ঘুলিয়ে ফেলবেন না।"

"তারপর?"

"কবি মধুসূদন, এদের সমস্ত পাপের বোঝা যদি গ্রন্থাকারে লিখতে হয়— হাজার বছর লাগবে। সে কথা যাক। আপনাকে সাম্রাজ্যবাদের মোটামুটি কয়েকটা তত্ত্ব বলব। তা বুঝলেই এদের বর্বরতার উৎসটা ধরতে পারবেন।"

"আমি ফরাসি দেশে যখন ছিলাম, তখন সীয়েন নদীর ধারে এদের সাম্যমৈত্রীর বাণির জন্যে কত গর্ব বোধ করেছি।"

"তা যাচাই করার জন্যে এবার আলজিরিয়ায় যান। নারীর অপমান কোনো শিম্পাঞ্জি-গরিলাও ওদের মত করতে সক্ষম হবে না। সে নারীর (নাম ধরুন জমিলা) অপরাধ কী? দেশ-প্রেম।" সৈয়দ বোক্‌জা এইটুকু উচ্চারণ মাত্র শ' চেঁচিয়ে উঠলেন, "Bokja do stop, I do not want to hear it again. Strange, that soil produced Voltaire, Hugo and Rolland." রমাঁ রলাঁর দিকে তখন শ'র চোখ স্বতঃস্ফূর্ত ছুটে যায়। তিনি আগেই লজ্জায় মাথা-হেঁট বসে আছেন।

মধুসূদনের হাতে গ্লাস, অনস্পৃষ্ট আধেয়। একটু মজলিসী অস্বোয়াস্তি কাটতে তিনি বললেন, "তুমি বলে যাও। আজ আসাটা সার্থক। অনেক কিছু শেখা গেল।"

সৈয়দ বোক্‌জা তখন তূরীয়লোকে। এমন মহৎ শ্রোতার কাছে কে আর বোবা থাকতে পারে? সামনে ডিকেন্টার পড়ে রইল। বোক্‌জা বলতে থাকে : কবি মধুসূদন। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ওদের পণ্ডিতরাই সংজ্ঞা দিয়েছেন। পৃথিবীর মঙ্গলকামী সৎ মানুষ প্রত্যেক দেশেই আছে। জে. এ. হবসন একজন অর্থনীতিবিদ। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখছেন : Imperialism is the endeavour of the great controller of industry to broaden the channel for the flow of their surplus wealth by seeking foreign markets and foreign investments to take off goods and capital they can not sell or use at home. সোজা ইংরেজি ভাষা। বোঝার কিছু অসুবিধা নেই। এদের বর্বরতার কলাপ? এরা কীভাবে ওই 'চ্যানেল' Broaden করে তার বহু নজির আছে। আবিসিনিয়ায় মুসোলিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণ হামলা নয়। ওটা হচ্ছে তারই ভাষায় Mission civilization অর্থাৎ অসভ্যদের সভ্যতার ইলেম দানের রীতি। চীনে জাপান ওই রকম একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তৃতীয় দশকে এগিয়েছিল। তা ছাড়া, এই Broaden-এর পেছনে কত রকম যে জালিয়াতি-চুরি-খুনের— যুদ্ধ ছাড়াই, নজির থাকে, তা এক দিনে বলা সম্ভব নয়। সকলেই নিজের বর্বরতার সাফাইয়ে অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক পাদ্রী ঠিক জড়ো করবে। সেসীল রোড্স একটা বিলাতি ঝানু সাম্রাজ্যবাদী ডালকুত্তা। সে বলছে, "I contend that we are the first race in the world, and that the more of the world we inhabit it is better for the human race...if there be a God, I think what He would like me to do in paint as much of Africa British red as possible."

লক্ষ করবেন, দস্যুও কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত থাকে। কিন্তু এই দস্যুর কাছে লজ্জাবস্তু অজ্ঞাত। সাম্রাজ্যবাদীদের এই সভ্যতা বিস্তারে মাত্র তিরিশ বছরে গোটা আফ্রিকা মহাদেশ ব্রিটিশ, ডাচ, বেলজিয়াম, ফরাসি, পর্তুগীজ, স্পেনীয়দের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। অবশ্য এখানে আবার Dog-eats-dog নীতি চালু। ফলে, কত যুদ্ধ আর নরহত্যা না ঘটেছে। এই সভ্য নেকড়েদের লোভেরও অন্ত নেই। পৃথিবী ভাগাভাগির পর তারা কী করবে? সেই দুঃখে পূর্বোক্ত সেসীল রোড্স বলছে, "The world is nearly all parcelled out, and what there is left of it is being divided up, conquered and colonised. To think of these stars that you see overhead at night these vast worlds which we can never reach, I would annex the planets if I could, I often think that. It makes me sad to see them so clear and get so far. সাম্রাজ্যবাদী লোভের এর চেয়ে নির্লজ্জ নমুনা আর নেই। মানবতার শত্রু এই জন্তুরা কিন্তু স্বদেশে পূজ্য ব্যক্তি।"

মধুসূদন হঠাৎ এক হাত তুলে সৈয়দ বোক্‌জা-কে থামতে ইশারা করলেন। পরে বললেন, "আমাকে ভাবতে দাও, বন্ধু। এই কী সভ্য পৃথিবীর চেহারা?"

"হ্যাঁ, কবি মাইকেল। আপনাদের যুগে তা চোখে পড়ে নি, যেমন বাল্যকালে বালক-কাল-কে বোঝা যায় না।" জবাব দিলে সৈয়দ বোক্‌জা।

"কিন্তু আমি ইংরেজ জাতের উপর সব সময় মহৎ আস্থা পোষণ করে এসেছি। তুমি জান দেনার দায়ে আমার লাউডন স্ট্রীটের বাড়ির সমস্ত জিনিস মহাজনেরা নিয়ে গেল। কিন্তু মিল্টনের স্ট্যাচু আমি সরাতে দিই নি।"

সৈয়দের সজীব চোখের দিকে তাকালেন মাইকেল। বার্নার্ড শ' বোক্‌জার পিঠ থাপড়ে মাইকেলকে জবাব দিলেন, "Dutt, so far civilization has existed with individuals only।"

বোক্‌জা টীকা করলে, "সত্যিই কবি মাইকেল, সভ্যতার ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয় নি এই সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে। ওদের কাছে ত যুক্তিনীতি বড় কথা নয়। ওরা বোঝে জঙ্গলের লজিক। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন ফয়সালা ওরা বোঝে না। জার্মান, ইংরেজ, ফরাসি এবং ওদের বিশ্বময় যত ভাই-বেরাদর আছে, তারা নিজেরাও পরস্পরের গলা কাটাকাটি করে। আর এদের জন্যই পৃথিবীর মানুষে মানুষে এত বিভেদ। এমন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি জন্তুরা শুধু রঙের জন্য মনুষ্যকে আসামির কাঠগড়ায় তোলে। নিগ্রোরা কালো। এই কালো রঙের জন্যই তাদের অবমাননার শেষ নেই।"

"তা আমি জানি। লন্ডনে আমার কালো চেহারা দেখে কতবার কত ধলা চামড়া না ঠোঁট কুঁচকেছে। অবিশ্যি সামনা-সামনি কিছু বলে নি। কারণ, ওরা জানত, আমার গায়ে জোর আছে। আর ওদেরই মাতৃভাষা আমি কারো চেয়ে খারাপ বলতাম না," সায় দিলেন মাইকেল।

"সে ত ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু জাতি হিসেবে আপনার দেশবাসীর কতটুকু মর্যাদা ছিল? সৈয়দ বোক্‌জার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।"

তেছোদীনের গল্প শেষ হয়ে গেছে। সে উসখুস করছিল। আর তা ছাড়া সে অতীতের দিকে বেশি তাকানোর পক্ষপাতী নয়। ভবিষ্যৎই তার কাছে অনেক বেশি লোভনীয়।

অপেক্ষায় ছিল, তেছোদীন এবার কোপ মারলে, "Bury the past, Syed।"

"ভবিষ্যতের কর্মপন্থার জন্যেই অতীতকে কবর খুঁড়ে তুলে দেখা উচিত।" প্রতিবাদ জানালে সৈয়দ বোক্‌জা।

"He is correct," শ' একটু ঘাড় কাৎ করে দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে সায় দিলেন।

"না, মি. শ'। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত। আমরা জানি ইংরেজ-ফরাসি-ডাচ এবং য়ুরোপের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরা একটা কুকুরের বেশি মর্যাদা দাবি করতে পারে না। কিন্তু তা নিয়ে ঝামেলা পাকানো উচিত নয়। এখন প্রয়োজন, কীভাবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে— তা-ই দেখা।"

তেছোদীন মুখে ফেনা তুলে ফেললে।

"Yes," শ' এই শব্দ উচ্চারণের পরই দাঁড়িয়ে পড়ে ফুকার দিলেন, "To the tables dear friends, for another toast।"

সৈয়দ বোক্‌জা এতক্ষণ কথার চোটে গ্লাসের দিকে নজর দিতে পারে নি। সে এক ঘোঁটে প্রায় পুরো গ্লাসটা শেষ করে দৌড়ে গেল টেবিলের কিনারায়। সে মজলিসের সাকী। একে একে সকলের গ্লাস পূর্ণ করে দিলে। মহসীনের লেবুর রস, বার্নার্ড শ'র সরবৎ— যার যা দাবি, যথারীতি প্রতিপালিত। শ' তখন গ্লাস সহ হাত শূন্যে তুললেন! কণ্ঠের স্বর ধীরে ধীরে উদাত্ত স্তরে বাজতে থাকে : "To the international brotherhood of mankind. To the international brotherhood of mankind." তারই প্রতিধ্বনি সকলের কণ্ঠে।

এই বাক্য উচ্চারণের সময় রলাঁর দিকে তাকাও। ক্রুশর দিকে দৃষ্টি যীশু, জ্বলন্ত কুণ্ডের অগ্নিশিখা সম্মুখে পদার্থবিদ ব্রুনো বোধহয় এমনই বিশ্বগ্রাসী, ক্ষমা-স্বর্গীয়-চোখে তাকিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজলিস ঈষৎ থিতিয়ে গেছে। কারণ বোঝা গেল না। হয়ত টোস্টের জের অথবা সৈয়দ বোক্‌জার সাকী-অভিনয়ের ফল।

আলাওল এবং মহসীন হঠাৎ লনে পায়চারি করতে লাগলেন। একের হাত অপরের কাঁধে। রলাঁ বোক্‌জাকে নিয়ে হাঁটছেন লনের আর এক সীমানায়। বাক্যালাপ হচ্ছে দু' জনের মধ্যে, কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মাইকেল বসেছেন বার্নার্ড শ'র পিয়ানোর এক কোণায়। তাঁর সামনে একটা ছোট টিপয় রেখে গেছে জুহা। শুধু টিপয় নয়, টিপয়ের উপর পুরো এক বোতল 'শ্বেত অশ্ব' এবং দু' বোতল সোডা। মাইকেল বুদ্বুদায়িত গ্লাসের দিকে চেয়ে বসে আছেন, পাশে বার্নার্ড শ' নিজের টুলের উপর, পেছনে পিয়ানো। থেকে থেকে তিনি পিয়ানোর উপর হেলান আর সেই মওকায় আঙুল চালিয়ে দিচ্ছেন শাদা রীডের উপর। টুংটাঙে ভরে উঠেছে সমস্ত চত্বর। সাহ্‌ কবি, তেছোদীন, পাষণ্ড—তিন জনে বড় টেবিল ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একদম চুপচাপ বলা চলে না। কারণ তারা চুমুক দিচ্ছে নিজেদের গ্লাসে। সেখানে শব্দ হয়ত নীরবতার কাছাকাছি।

জুহা গিয়েছে অন্দরে। সৈয়দ বোক্‌জার হঠাৎ আলু চিপস্‌ দরকার। জাইদুন-কে খবর দিতে হয়। এই বান্ধব-সমাগমে তার উপভোগ ফরসুৎ কম। ফাই-ফরমাস খাটার ভার প্রধানত সে-ই নিয়েছে। মহসীনের হঠাৎ মুখ-শুদ্ধি এলাচি দরকার, জুহা নিয়ে এসেছিল। আলাওলের হুঁকা-বরদারি সে সানন্দে গ্রহণ করেছে। ভৃত্য আলি যদিও পত্র বয়ে এনেছিল, সে অনুপস্থিত। জুহা তাকে এখানে ফরমাস খাটতে দেবে না। সে জাইদুনের কাছেই থাক।

মোয়াবকের কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল। নচেৎ সে এখানে অনুপস্থিত তা কেউ লক্ষ করে নি। মাইকেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পাছে অপদস্থ হয়, সেই ভয়ে বোধহয় কেটে পড়েছিল। কিন্তু একটা বোতলও টেবিল থেকে গায়েব। অবিশ্যি এ-সব কারো চোখে পড়ে নি। যে-যার তালে লয় ঠিক রাখছে। আকাশে ভরপুর জোছ্‌না। লনের শোভায় মানবিক শোভার দ্বিবেণী সঙ্গম। এখানে অপরের খোঁজ রাখা মুশকিল। লনের উত্তর-পশ্চিম কোণায় কয়েকটি করবির ঝোপ মাতাল বাতাসে দোল খাচ্ছে।

জুহা আলু-চিপ নিয়ে টেবিলে ফিরে এসেছে। তেছোদীন এক গাদা মুখে পুরে দিলে। জুহা প্লেট নিজের হাতে তুলে বললেন, "ব্রাদার, এটা বোক্‌জার 'ইসপিসিল' অর্ডার। তুমি গ্রোগ্রাস নিলে চলবে না।"

"তোমার বোক্‌জা ত ওদিকে ফরাসি ভাষায় সবক নিচ্ছে, ওকে ডাক," তেছোদীন আর এক খাবলা তুলে নিলে সেই সুযোগে। প্রাণ-শশী আঢ্য হাতিয়ে নিলে কিছু। অল্পই রইল প্লেটে!

অগত্যা কী করা যায়। প্লেট হাতেই জুহা লনের দিকে গেল, যেখানে রলাঁর সঙ্গে বোক্‌জা পায়চারি করছিল। অস্বোয়াস্তি বোধ করে জুহা। তবু ইশারায় কথা পাড়লে, "মাফ করবেন মঁসিয়ে রলাঁ। বোক্‌জাকে একটু টেবিলে দরকার।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়" রলাঁ বলে উঠলেন। সৌজন্যের মাত্রায় কণ্ঠ চড়ে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা টেবিলে ফিরে এল। জুহা জানিয়ে দিয়েছে, জাইদুনের ভাণ্ডার আজ দানসত্র। আরো নানা রকম ভোজ্যি আছে। কিন্তু বোক্‌জা আলুভাজায় গাল ঠেসে আর কথা বলতে পারছিল না। সাহ্ কবি বন্ধুর গ্লাসে "ভ্যাটিকান উনসত্তর' ঢেলে দিলে। চুমুক দেওয়ার পর তবে রক্ষা।

প্রাণ-শশী মন্তব্য করলে, "ওরে নরোত্তম বোক্‌জা, তুই বিষম খেয়ে মরবি কোন দিন।"

সৈয়দ বোক্‌জা খোঁচানো জবাব দিতে গেল। কিন্তু লনের দিকে চোখ পড়তেই সে থেমে যায়। করবিকুঞ্জের কোণা থেকে মোয়াবক দৌড়ে আসছে। একদম রাম-দৌড়।

বিস্ময়-নেত্রে সকলে সেদিকে তাকায়। মোয়াবক একটা খালি বোতল টেবিলে ঢপ্ শব্দে রেখেই বললেন, "জুহা, বিদ্যাসাগর।"

প্রাণ-শশী বলে উঠল, "তুই এতক্ষণ গায়েব ছিলি, ওরে হতভাগা?" কিন্তু আদ্যের মুখে হাত চাপা দিয়ে আবার মোয়াবক বললে, "বিদ্যাসাগর।"

জুহা শশব্যস্ত প্রশ্ন করে, "কোথায়, কী, তাড়াতাড়ি বল।"

"তোর বেড়ার ফটকে দাঁড়িয়ে আছেন। শিগগির নিয়ে আয়—," ঢোক-গেলা অবস্থায় মোয়াবক জবাব দিলে।

"দেখলি ত, তুই ওঁকে অভ্যর্থনা করে আনতে ছুটলি না কেন?" জুহা কৃত্রিম রাগ দেখায়।

"সাহস হল না। হাতে বোতল-গ্লাস আর এই গন্ধ-গোকুল মুখ। সাহস হল না।" অবনত-মস্তক মোয়াবক।—তারপর মাথা তুলেই সে ঠেলা দিলে, "যা যা উনি দাঁড়িয়ে আছেন।"

জুহা পথ ধরলে।

টেবিলের কাছে হঠাৎ আকস্মিক জট-পাকানো দেখে, কিছুটা কানের উপর আস্থা রেখেই মধুসূদন ডাক দিলেন, "young friends! বন্ধুগণ!"

বোক্‌কা, প্রাণ-শশী, মোয়াবক তিন জনেই কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আদেশ তালিমের অপেক্ষায়।

মাইকেল : ব্যাপার কী?

বোক্‌জা : উনি এসেছেন।

মাইকেল : (গ্লাসে চুমুক) উনি?

মোয়াবক : বিদ্যাসাগর।

"বিদ্যাসাগর!" মাইকেল অস্পষ্ট উচ্চারণের পরই উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসের আধেয় চট্ করে কণ্ঠের ওপারে পৌঁছে ত্রস্ত লনের দিকে পা ফেললেন।

"কী হল, কবি মাইকেল।" তিন জনে বিস্মিত।

"আমি চললাম।" মাইকেল লনের দিকে তখন জোর লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলছেন। বোক্‌জা, মোয়াবক দু' জনে প্রায় ছুটে গেল পেছনে পেছনে।

সমস্ত আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেছে এই আকস্মিক অস্বাভাবিকতায়।

লনের মাঝামাঝি মাইকেলকে পাকড়াও করে পথ রুখে দাঁড়িয়ে গেছে মোয়াবক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সৈয়দ বোক্‌জা। তাদের গলা শোনা যাচ্ছে।

"চলে যাচ্ছেন কেন?"

"আহা ছেড়ে দাও শিগগির। এখনই এসে পড়বে।"

"কিন্তু আপনি যাবেন কেন?"

"আহ্‌, তোমরা আচ্ছা নাছোড়বান্দা। বিদ্যাসাগর নয়— আমার পাওনাদার আসছে। ধারের অনেক টাকা পাবে। আজও পকেট খালি। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছিলাম। পাওনাদারদের পাল্লায় পড়ব, তার ত কথা ছিল না।"

মোয়াবকের হাসি আর গলার আওয়াজ শোনা গেল তখন। সে বেশ তারা-কণ্ঠেই বলছে, "হাসালেন কবি মাইকেল! সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী যাঁর কাছে ঋণী, আপনি ঋণের ক'টা টাকার কথা ভাবছেন সেই জায়গায়।"

সৈয়দ বোক্‌জা, মোয়াবক হাসছে। শেষের হুঁ-হুঁহ্‌ রীতিমত তাচ্ছিল্যের আমেজ। মাইকেল তখনও হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন। মুখের দাড়ি ভেদ করেও ছড়িয়ে পড়ছে অবর্ণনীয় অস্বোয়াস্তি।

এমন সময়, আহ্বানের স্বর নয় যেন প্রতিধ্বনি গমগম করে উঠল, "মধু—! মধু, তুমিও এখানে! ওখানে কী করছ?"

তিন জনে শব্দ-চকিত। সকলের চোখে পড়ে চত্বর থেকে সামান্য দূরে জুহা এবং বিদ্যাসাগর। মাইকেলের চোখ হয়ত দেখার কাজেই ক্ষ্যান্ত দিয়েছিল। শব্দ শব্দভেদী বাণ হয় কখনও কখনও। দু'হাতে দু'জনকে ঠেলে ফেলে আর্ত-চিৎকারে উদ্বাহু, "মাই ডীয়ার ভিড্‌" রবে মাইকেল কখন বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তিনি নিজেই জানতেন না। আলিঙ্গনমত্ত দত্ত-কবি আবৃত্তি করে যান :

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার যে সুখ-সদনে!...
দানে বারি নদী-রূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ শিরঃ তরুতল, দাস রূপ ধরি,
পরিমলে ফুলফল দশদিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী-ছায়া; বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকেল-কণ্ঠ থেমে যায়। তারপরই তিনি বিদ্যাসাগরের দুই বাজু ধরে ঝাঁকুনি সহযোগে বলতে থাকেন, "মাই ডিয়ার ভিড্, মাই ডিয়ার ভিড্,— ।" সে-রব শেষ হয় না। তার আগেই মাইকেল বিদ্যাসাগরের দুই গণ্ডদেশে, চুক-চুক-শব্দে দুই চুমু মারেন। অপরপক্ষ বিব্রত, অস্বোয়াস্তি-দাগা জনের মত লজ্জায় মুখ নামিয়ে হাত-ছাড়ানোর ভঙ্গিতে আঁকুপাকু করেন, "আহ্, মধু, তুমি যে কী কর— । তোমার উচ্ছ্বাস আর গেল না।"

মাইকেল তখন সোজা বিদ্যাসাগরের এক হাত বগলদাবা করে সামনে এগোতে থাকেন। কয়েদীকে আর কিছু বলার সুযোগ দেন না। "চল, চল— এখানে আরো মহারথী আছে তোমার মত, তাদের সঙ্গে আলাপ করবে।" আসামির মত বিদ্যাসাগরকে বানার্ড শ'র সামনে খাড়া করে দিয়ে মাইকেল সম্বোধন করলেন, "Hey! জর্জ! Meet my dear Vid— আমার ভিডের সঙ্গে মোলাকাত কর।"

সকলের চোখ এতক্ষণ দুই জনের উপর নিবদ্ধ ছিল। সাহেবী পোশাক পরিচ্ছদ ভূষিত এই লোকটা একটা চটি-পরা, কোন-রকমে হাঁটু-ঢাকা ধুতি-মোড়া ব্যক্তিকে নিয়ে এসব কি কাণ্ড করছে? একজন নিরাভরণ, আর একজন জৌলুষ-পরায়ণ। ব্যাপারটা কী? বার্নার্ড শ' বিস্ময়ে কৌতূহলে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। মাইকেল তখন বলেন, "ভিড্, এই হচ্ছে বার্নার্ড শ'। তোমারই জুড়িদার। তুমি যেমন সমস্ত ব্রাহ্মণ-কুলের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছিলে, এ তেমনি ইউরোপের তাবৎ শাসকগোষ্ঠীকে পাৎলুন খুলে চাবকেছে। One man against Europe। এ-কে কার-মোয়াটের বংশধর মনে করো না। এ জাতে আইরিশ।" বিদ্যাসাগর তখন করমর্দন শুরু করেন, মুখে হাসি-সহযোগে, "very glad to meet you."

বার্নার্ড শ' হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার পর মাইকেল বললেন, "জর্জ! আমার ভিড্, তার তুলনা সে নিজে। A great humanist, social reformer—a great swordsman"।

"I have never heard his name, strange! এঁর নাম কোনো দিন শুনি নি, আশ্চর্য!" হঠাৎ মনের কথাটা শ'র মুখ-পথে বেরিয়ে যায়।

"What— কী?" মাইকেল-নিঃসৃত এই শব্দে সমস্ত মজলিস চমকে ওঠে। বেশ তাতা-কণ্ঠে বার্নার্ড শ'র এক হাত ধরে তিনি বললেন, "এখানে নয়— এসো। ফয়সালা দরকার।" তারপর দু' জনকে বগলদাবা করে মাইকেল, টেনে নয়— হিঁচড়ে নিয়ে এলেন মঞ্চ-চত্বরে। উভয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে পড়ল। সামনে চওড়া ধাপের উপর দাঁড়ানো মাইকেল! তিনি যেন অভিনেতা, আর সকলে দর্শক।

ওদের বসানোর পর মাইকেল বার্নার্ড শ'র মুখের উপর তর্জনি তুলে সম্বোধন করলেন, "জর্জ! তুমি এর নাম শোন নি? আসলে ইংরেজদের সারা জীবন গাল দিলে কি হবে, থাকলে ত সারা জীবন লন্ডনে ইংরেজদের সঙ্গে। ওদের খসলৎ তোমার মধ্যেও ঢুকেছিল।"

"An English man`s habit? No. I have only one nature." জবাব দিলেন শ'।

মাইকেল বেশ চটে ওঠেন, "শোন জর্জ, কথার মারপ্যাঁচে তুমি দুনিয়া জয় করতে পার। কিন্তু আমার মত বঙ্গ-সন্তানকে হটাতে পারবে না। আমাদের কথায় আছে : হুজ্জতে বাঙাল। তুমি শেষ জীবনে ইংরেজ বনে গিয়েছিলে, তাই তোমার এই দশা। আমরা ইংরেজদের Fox, Hog, Dog— চুনোপুঁটি কত ইং-বাচ্চার খবর রাখি। ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের পর্যন্ত পাত্তা দেয় না। কলকাতা শহরে ওদের এক Hog-এর নামে বাজারের নাম রেখে দিয়েছি হগ্ মার্কেট— অর্থাৎ শূয়োরের বাজার। তার আগে অবিশ্যি নাইট উপাধিও আছে। তুমি ইংরেজদের মতই My dear Vid-এর খবর রাখ না? Shame!"

বিদ্যাসাগর এই সময় বাধা দেন, "আহ মধু, তুমি একটু থাম না।"

"থামব? মানুষ হিসাবে কত বার্নার্ড শ' তোমার চটির সুখতলায় ঢুকে যেতে পারে; excuse me, George!"

"Go on", বার্নার্ড শ' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন।

এই শেভীয়ান বৈরাগ্য ঠাণ্ডা পানি ঢালতে পারল না। বরং হল্কা আরো বেড়ে গেল।

"জান, জর্জ", পুনরায় সম্বোধন করেন মাইকেল, "তুমি সারাজীবন চটকদার বকর-বকর করেছ। তোমাকে কেউ সিরিয়াসলি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে মনে করো?"

বার্নার্ড শ' : "I think—", বাধা দিলেন তখনই মাইকেল, "তোমার ভাবার কিছু নেই, জর্জ। তোমার জীবদ্দশায় দু-দুটো আত্মঘাতী মহাযুদ্ধ হলো ইউরোপে। এর পরও তুমি মুখ নাড়তে চাও?"

"If nobody listens—", বার্নার্ড শ' আমতা আমতা করেন।

"Monsters who are all tongues and no hand— তুমি সেই Monster, George", বেশ উত্তাপ ছড়ায় মধুসূদনের কণ্ঠ। আবার তিনি শুরু করেন, "মানুষ হিসাবে আমার ভিতের সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না। তুমি 'এ্যান্ডোক্লিস এন্ড দি লায়ন' নাটকের ভূমিকায় লিখেছ, ইটালি না পোল্যান্ড কোথাকার যুবরাজ অভিনয় দেখতে দেখতে রাগে উঠে যায়। তুমি লিখেছ, he alone understood me properly। গুরুত্বের সঙ্গে নিলে তাই ঘটে। কিন্তু ইউরোপে কেউ তোমাকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেয় নি। যদি নিত, লন্ডনে বাঁচা তোমার পক্ষে দুষ্কর হত। বহু লোকে অর্থাৎ সমাজ শত্রুরা মুখে থুথু দিত। আমার ভিড—", এই সময় মধুসূদন বিদ্যাসাগরের দিকে তাকান, তিনি ইঙ্গিতে থামতে বলেন। হয়ত মাইকেল ক্ষান্ত দিতেন। কিন্তু হঠাৎ ছোঁ-মারা কায়দায় গ্লাস হাতেই চত্বরে মধুসূদনের পাশাপাশি এসে দাঁড়াল সৈয়দ বোক্‌জা। নেশা ছলোছলো চোখ, ঋজু কাঠামো, খাড়া নাক, গৌর তনু সৈয়দ বোক্‌জাকে আদৌ ম্লান মনে হয় না। গমগমে গলায় সে মাইকেলকে সম্বোধন করে, "আপনি ঠিকই বলেছেন, কবি মধুসূদন।"

"ঠিক?"

"ঠিক। তবে আমার আরো দু-চার কথা যোগ করার ইচ্ছা আছে। মি. শ'র অনুমতি চাই।" সৈয়দ বোক্‌জা শ'র দিকে তাকায়।

"Go on", শ' জবাব দিলেন।

"মাফ করবেন, মি. শ'। আপনাকে কেউ গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না। আপনি হচ্ছেন ইউরোপের একজন ফার্স্ট ক্লাস Clown শাদা বাংলায় ভাঁড়," সৈয়দ বোক্‌জা এবার সটান খাড়া। চোখ বার্নার্ড শ'র চোখে।

শ' : "Am I a clown? আমি একটা ভাঁড়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোক্‌জা : "Just that and nothing more, হ্যাঁ তাই। তার বেশি কিছু না।"

সমস্ত মজলিস স্তব্ধ। এই গৌরকান্তি তরুণ বলে কী? আস্পর্দ্ধার ত একটা সীমা আছে।

বার্নার্ড শ'র মুখ থমথমে। একটু থেমে সোজা জিজ্ঞেস করেন, "what do you mean? তুমি কী বলতে চাও?"

সৈয়দ বোক্‌জা হুইস্কির গ্লাসে ছোটা-সে-ছোটা চুমুক দিয়ে হো হো হেসে উঠল। মাইকেল ইতোমধ্যে বোক্‌জার এক হাত নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। হাসির ব্যঙ্গ-রেশ যথারীতি রেখেই সৈয়দ বোক্‌জা বললে, "Strange, the greatest of English prose-writers does not understand English sentence— শ্রেষ্ঠতম ইংরেজি গদ্য-লেখক সোজা ইংরেজি বাক্য বুঝছেন না"।

বার্নার্ড শ' এই সময় রীতিমত চটে ওঠেন, "you want to insult me— তুমি আমাকে অপমান করতে চাও?"

"মাফ করবেন, মি. বার্নার্ড শ'। আমার কথাটা খোলসা করতে দিন। তারপর চটুন।" সৈয়দ বোক্‌জার স্বর আর সমতা রাখতে পারে না, "আপনি একটা ভাঁড় ছাড়া আর কী? সারা জীবন শাসকগোষ্ঠীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। ওরা প্রথমে ভেবেছিল লোকটা বুঝি মারাত্মক কিছু। তারপর বুঝলে নেহায়েৎ ঢোঁড়া। ফোঁসফোঁস করে, কিন্তু ছোবলায় না, কামড়ায় না, আর বিষও নেই। তখন ওরা উল্টো শোধ নিলে। ওদের ত Court-jester প্রয়োজন, বললেন— 'একটা Super-clown— superman নয়— পাওয়া গেছে। রেখে দাও। দরবার অর্থাৎ ইউরোপের কাজে লাগবে।' আর—।" মাইকেল তখন এক হাতে সৈয়দ বোক্‌জার কোমর জড়িয়ে ধরেছেন গভীর আত্মীয়তায়। ঈষৎ বাধা পায় সে।

AMARBOI.COM

বার্নার্ড শ'র মুখ গম্ভীর। হঠাৎ উঠে পড়তে গেলে, মাইকেল বললেন, "তরুণ বন্ধুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে আরো কথা আছে। বস জর্জ।"

"আর সামান্য— শব্দ দু'টো উচ্চারণের পর শূন্য গ্লাস এক হাতে দোলাতে দোলাতে সৈয়দ বোক্‌জা বললে "মি. শ', আপনি ত ভেবে দেখেন নি। আপনি ভাঁড় না হলে কি ওরা আপনাকে সহ্য করত? আপনি বিংশ শতাব্দির গোড়া জুড়ে কত মারাত্মক মারাত্মক কথা বলছেন। ওরা আপনার কানও ধরে নি! আর সেই সময় আমার দেশের মানুষ সাধারণ কথা বলেছে আপনার মত চটকদার নয়। 'মানুষের মত আমাদের অধিকার দাও, আমাদের স্বাধীনতা দাও।' এই সামান্য অপরাধে তাদের গলা টিপে ধরেছে ইউরোপের সেই ব্যক্তিরা, যারা আপনার আরো বেশি মারাত্মক কথা সহ্য করেছে। তারাই এদেশের তরুণদের ঝুলিয়েছে ফাঁসি-কাঠে, বুটে চুরমার করেছে নর-নারীর স্বপ্নঘর, পাঁজর। আপনাকে তারা সহ্য করেছে— Because you are a court-jester, a super-clown—a residual product of your superman—। T. E. Lawrence এর মত সাম্রাজ্যবাদীদের দোসরের বইয়ের (Seven pillars of wisdom) উন্নতির পরামর্শ আপনি দেন নি?"

বাধা দিয়ে উঠলেন বার্নার্ড শ' "Do you think— do you—।" কিন্তু সৈয়দ বোক্‌জা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ'র কণ্ঠ ডুবিয়ে জোর গলায় বলে যায় "মি. শ', যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। সমস্ত ইউরোপীয়রা ভাবে Europe is the world, আপনি তার বাইরে যেতে পারেন নি। আপনি ওদের গোত্রীয়— তাই আপনাকে তারা এখন St. Barnard বানিয়ে দিয়েছে, অবিশ্যি ঐ নামে এক জাতের কুকুর আছে। The Arch-Bishop of England is your blood-brother now and was so— you did not realize, আর এই মুরোদ নিয়ে আপনি শেক্সপীয়রের সঙ্গে টেক্কা দিতে যান। As if 'dark lady of the sonnet' is your mother, শেক্সপীয়র আর্টিস্ট, আর আপনি হচ্ছেন স্রেফ একটা ভাঁড়, clown—।"

মধুসূদন সৈয়দ বোক্‌জার কোমর ছেড়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন, "encore my sweet young friend সাবাস!" শেষে মধুসূদন শ'র দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। মরিচ ছড়ানো মুচকি হাসি।

মজলিসের সমস্ত চোখ এইখানে নিবদ্ধ। রলাঁ তখনও লনে পায়চারি করছিলেন। কিন্তু তিনি সবকিছু ওয়াকিবহাল, তা বেশ বোঝা যায়। নচেৎ বার বার এইদিকে তাকাচ্ছিলেন কেন? আলাওল মহসীন-কাঁধে হাত রেখে হাঁটলেও মাঝে মাঝে থামছিলেন। উভয়েই রীতিমত উৎকর্ণ। শ' ঈষৎ উত্তেজিত, বাম হাতে কি যেন খুঁজছিলেন। সেটা তাঁর লাঠি। আজ সঙ্গে নিতে মনে ছিল না। যষ্ঠি হাতে থাকলে তিনি উঠে পড়তেন তা আন্দাজ করা চলে। কিন্তু মাইকেল ত আর উঠতে দেবে না। বিদ্যাসাগর বড় বিব্রত। কারণ উত্তেজনা তাঁকে নিয়েই সৃষ্টি। তিনি শ'র দিকে তাকাতে ত পারছিলেন না, তার উপর মাইকেলকে কিছু বলবেন সে যো পর্যন্ত উধাও হয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে তামাসা দেখছিল তেছোদীন, মোয়াবক অগয়রহ। একবার মন্তব্য করে নিয়েছে ইতোমধ্যে তেছোদীন, "সৈয়দ বোক্‌জা আজ ফর্মে আছে।" কিন্তু বন্ধুর সাফল্যে তার তেরছা নয়নে ঈষৎ ঈর্ষার ঝিলিক খেলে যায়। সে ভাবলে, বোক্‌জা একাই বাহাদুরি নেবে। Never, নৈব চ। সেও মরা ঘোড়া চাবকাতে দৌড়ে এল।

প্রথমেই মাইকেলকে সম্বোধন, "দত্ত-কবি, আমার একটা কথা আছে, বলার যদি অনুমতি দেন।"

কিন্তু জবাব শ' নিজেই দিলেন, "Go on"। এখানে ব্যঙ্গের চেয়ে ভ্রুকুটিই অনুপাতে অনেক বেশি। মাইকেলের যেন আত্মিক আনন্দ উথলে উঠল। ভাবলেন, "মাই ডিয়ার ভিড়ের" সামনেই ফয়সালা হয়ে যাক।

তেছোদীন কথা বলার আগে মৃদু হাসে। ওর মুখ ঈষৎ লম্বাটে। সেই জন্য সব হাসিই ব্যঙ্গের মত হয়। কিন্তু আসলে সাধারণ হাসি হেসে খুব নম্র কণ্ঠেই সে বললে, "মি. শ', আপনার 'মেজর Barbara' নাটকের ভূমিকাতে ত আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন— 'I who have Preached and Pamphlateered like any Encyclopaedist, have to confess that my methods are of no use.' সুতরাং মি. শ', এরা যা' বলে বলুক, আপনার চটার কিছু নেই।"

শিকার শিকারীদের চোখের দিকে একবার অসহায়ভাবে তাকিয়ে নিলে। ব্যূহ-মধ্যে অভিমন্যু। এমন সময় মোয়াবক মাইকেলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "দত্ত-কবি, আপনারা আর যাই বলুন, আমি শ' সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে একমত : One

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

of the most courageous thinkers of Europe."

মাইকেল মোয়াবকের সর্বাঙ্গ একবার চোখে জরিপ করে নিলেন, তারপর তাচ্ছিল্যের সুরেই শ'কে বললেন, "কিন্তু জানো, মাই ডিয়ার ভিডের বুকের পাটা কতখানি? ভিড বলে, 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নেই যার নাকে এই চটিজুতা সুদ্ধ পায়ে টক করে লাথি মারতে না পারি।' (মোয়াবকের দিকে) তরুণ বন্ধু, courage-এর কথা আর বলো না।"

"আহ, মধু—," বিদ্যাসাগর অস্বোয়াস্তি কাটিয়ে মজলিস যেন হাতে নিতে পেরেছেন। সেই ওজনেই বললেন, "মদু, তুমি থাম ত। তোমার জিদ বড় বেশি। এই জিদের সামান্য দেখালে ত খিদিরপুরের বাড়িটা যেত না।"

মধুসূদন প্রায় শিশুর আবদার-জাত কণ্ঠেই জবাব দিলেন, "ডিয়ার ভিড, তুমিও বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জিদ দেখাতে বলো? আশয়ের কথা হয়— সে আমি বুঝতে পারি। আর থামব? তোমাকে চেনে না, আমার ত রাগ এম্নি উঠে যায়।"

"তুমি শান্ত হও। দুনিয়ার সবাই সবাইকে চেনে নাকি? না চেনা সম্ভব?" বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর।

সৈয়দ বোক্‌জা এতক্ষণ চুপচাপ সকলের গতিবিধি লক্ষ করছিল। হয়ত নেশায় বিজ্ঞতা বেড়ে গিয়েছিল। সে খুব শান্ত কণ্ঠে বিজ্ঞের মত মন্তব্য করলে, 'A clown may not know a noble man— ভাঁড় মহৎ ব্যক্তিকে চিনতে নাও পারে।"

মাইকেল সৈয়দ বোক্‌জার কোমর-বেষ্টনী আরো সংকীর্ণ করে আনেন।

কিন্তু শ' বোধহয় এতক্ষণ ভেতরে পক্ক হচ্ছিলেন। এবার ফেটে পড়লেন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, "withdraw the words, my friend— কথা তুলে নাও, বন্ধু।"

সৈয়দ বোক্‌জা আরো শান্ত গলায় জবাব দিলে, "চটবেন না মি. শ'। আপনার আদেশ ত আর উপেক্ষা করতে পারি নে, কথা তুলে নিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে আমার বাক্যের প্রমাণ দিচ্ছি! আর তা হাতে-হাতেই।"

অকুস্থল ছেড়ে চলল, লনের দিকে সৈয়দ বোক্‌জা। সমস্ত মজলিসে পিন্‌-পাতনিক নীরবতা। দৃষ্টি বোক্‌জা-অনুসারী।

রলাঁ একা একা লনে পায়চারি করছিলেন। চাঁদের আলোয় গৌড়ীয় দেশের নিসর্গ-শোভা হয়ত তাঁকে টানছিল। কিন্তু ছোট লনের হদিস ত সবই কানে পৌঁছায়। সৈয়দ বোক্‌জা রলাঁর কাছে এসে কুর্নিশ-ভঙ্গিতে কী যেন বললে। রলাঁ তখন বোকজা অনুসারী। উভয়েই মঞ্চ-চত্বরে এসে দাঁড়ালেন।

এবার বোক্‌জা মুখ খুললে, "মি. শ' আপনি ইউরোপের ক্লাউন— Clown of Europe, কিন্তু আমাদের মধ্যেই কেন, পাশে রয়েছে Soul of Europe 'ইউরোপের আত্মা।' মঁসিয়ো রমাঁ রলাঁ।"

রলাঁ বাধা দিতে গেলে সৈয়দ বোক্‌জা পাল্টা দিলে, "মঁসিয়ো রলাঁ, ফরাসি ভদ্রতার পৃথিবী জোড়া নাম আছে— আমি তাই আশা করি, আপনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবেন।"

রলাঁ নিরস্ত্র। নিরস্ত। সৈয়দ বোক্‌জা তখন শ'কে সম্বোধন করলে, "মি. শ' আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।" তারপরই সৈয়দ বোক্‌জা ঈশ্বরচন্দ্রকে লক্ষ করে বললে, "মাননীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাসাগর, আপনি আর একজন মহামানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।" বিদ্যাসাগর তখন উঠে দাঁড়ালেন।

সৈয়দ বোক্‌জা এবার রলাঁকে বললে, "মঁসিয়ো, ইনি সেই মহান বিদ্যাসাগর, কবি মাইকেলের ভাষায়— My dear Vid।"

রলাঁ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে বুকে জড়িয়ে ধরেন আর বলতে থাকেন, "মি. ভিড, যখন বিবেকানন্দ আর রামকৃষ্ণের জীবন-চরিত লিখছিলাম, তখনই জেনেছিলাম আপনাকে। জেনেছিলাম আপনার বীরোচিত সমাজ-সংস্কার অভিযানের কথা। কী সৌভাগ্য আজ সেই মহৎ চরিত্রকে বুকে পেলাম।"

উভয়ের আলিঙ্গন আর শেষ হয় না। তখনই এই বক্ষযোগের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সৈয়দ বোক্‌জা শ'কে বলে, "মি. শ', আপনারা উভয়ে ইউরোপবাসী। কিন্তু কত তফাৎ। একজন আত্ম-সন্ধানে অতৃপ্ত— I will not rest— বিশ্ববিহারী। আর আপনি সেই জায়গায় কাল্পনিক মেথুশালার গর্তকে সব-পেয়েছি-র পৃথিবী মনে করে অট্টউল্লাসী।"

বিদ্যাসাগর ও রলাঁ আলিঙ্গন শেষেও পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকেন। এই স্তম্ভিত মুহূর্তে সৈয়দ বোক্‌জা বার্নার্ড শ'কে আবার কী যেন বলার জন্য মুখ খুললে, তখন তড়িৎগতিতে ছুটে এলেন বিদ্যাসাগর। সৈয়দ সাহেব থতমত খেয়ে যায়।

"No more— আর না," বিদ্যাসাগর সৈয়দ বোক্‌জার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর শ'র দিকে চেয়ে বললেন, "মি. জর্জ বার্নার্ড শ', আমি সত্যি খুশি হলুম আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে। এই তরুণ বন্ধুদের কথা বাদ দিন।"

মিটিমিটি চতুর-দৃষ্টি শ', ঈষৎ ভ্রুকুটি মেরেই জবাব দিলেন, "Kids are kids, kid-bag of air— ছেলেপিলেরা ছেলেপিলেই, বাতাসের থলি ছাড়া আর কি?"

সৈয়দ বোক্‌জার তাত তখনও কাটে নি। সে আবার আস্তিন গুটায় আর কি। বিদ্যাসাগর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "বন্ধু, তোমাদের পানীয়ের ব্যবস্থা ত বেশ আছে। আমার ডাব কোথায়?"

"জুহা, জুহা," সৈয়দ বোক্‌জা তখনই চিৎকার দিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। "জুহা ডাব আন শিগগির।"

জুহা আর বিলম্ব করে না। অন্দর থেকে প্রায় লাফ দিয়ে ফিরে এল অকুস্থলে। হাতে ডাব।

সৈয়দ বোক্‌জা লুফে নিলে। খাতিরদারির সম্পূর্ণ ভার সে বহন করবে, শরিক রাখবে না। বিদ্যাসাগরের কাছে ডাব নিয়ে আসা মাত্র তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঢক ঢক একপ্রস্থ পান করলেন। আধেয় আরো থেকে গেছে।

তিনি বললেন, "তরুণ বন্ধু, তুমি তো বেশ গরম হতে পার।"

লজ্জায় সৈয়দ বোক্‌জার রাঙা মুখ আরো রক্তিম হয়। বিনয়ে সে মুখ নিচু করে।

"শোন, মুখ তোল। এমন বাসর-বধূ হলে ত চলবে না, বন্ধু।" বিদ্যাসাগর তারপর হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। সেই হাসি সংক্রামক। সৈয়দ বোক্‌জা আরও লজ্জা পায়।

আরো কয়েক ঢোকে পান সমাপন শেষে বিদ্যাসাগর শ'কে সম্বোধন করলেন, "মি. শ', আপনি এই ছেলে-ছোকরাদের মুখের কাছে থ' পেলেন না। আমি আপনার হয়ে

জবাব দিচ্ছি। মধু—” বিদ্যাসাগর আশেপাশে তাকান। ইত্যবসরে মাইকেল পান-সজ্জিত টেবিলের ধারে নিঃশব্দে হুইস্কি-অবগাহন-মত্ত। বেশ ভাবলোকে উত্তীর্ণ। চুমুক দেওয়ার পর কাঁঠাল গাছের পত্র-লগ্ন অন্ধকারের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। বিদ্যাসাগরের চোখ সেই দিকে ধাওয়া করে।

— মধু। তিনি আবার ডাক দিলেন।

অপর পক্ষ তখনও নীরব।

— মধু, ওখানে কী করছ?

সৈয়দ বোক্জা এত্তেলা দিতে এগোয়। বিদ্যাসাগর বারণ করলেন, “তুমি যেও না, আমি যাচ্ছি।”

বিদ্যাসাগর এগিয়ে যান। শ' চত্বরে হেলান দিয়ে বিদ্যাসাগরের গতিবিধি অনুযায়ী ঘাড় ঘোরান আর ভাবেন ধুতি-পরা লোকটার বন্ধুত্বের নমুনা দেখো। পাৎলুনের প্রতি কি স্নেহ আর উচ্ছলতা। রলাঁ চত্বরে বসে গেছেন। সৌম্য মুখে কৌতূহলের হাসি। কিছুটা বিস্ময়। কী আজব দেশে না এসে পড়েছেন! এই বেঁটে-খাটো ব্রাহ্মণ-সন্তানের ভেতর এত তেজ। এই গৌড়-মুল্লুকে যে অসম্ভব-ঝাল লাল ধানী লঙ্কা জন্মায় তার হদিস তিনি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়। সকলের দৃষ্টি বিদ্যাসাগরের উপর।

মাইকেলের নিকটে এসে তিনিও থমকে যান। আধ-খালি গ্লাস হাতে মধুসূদন চেয়ে আছেন। ঊর্ধ্ব-মুখ। দুই নেত্রে আবেগের ঘনীভূত রূপ স্তরায়িত।

বিদ্যাসাগর মাইকেলের কাঁধে আলগোছে হাত রেখে মৃদু স্বরে ডাকেন, মধু!

অবিচল যথাস্থানে, তেমনই ঊর্ধ্ব-নেত্র, জবাব আসে আরো মৃদুস্বরা : ভিড়্, ডিয়ার ভিড়্।

বিদ্যাসাগর আবার ডাক দেন, মধু।

কিন্তু সম্বোধিত জন সে আহ্বান হয়ত শোনে না। গ্লাসে চুমুক দেওয়ার পর উত্তোলিত-স্বরে মাইকেল উচ্চারণ করতে থাকেন :

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলধিপতি।
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ দেব শুনি
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন বৈরী তুমি; প্রভঞ্জন সম
ভীম পরাক্রমে। কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিত যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,

AMARBOI.COM

শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বু-স্বামী,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি, বীর বলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা।

সমস্ত মজলিসে অসম্ভব নির্জনতা এবং স্তব্ধতা। এক চুমুকের পর উত্তোলিত গ্লাসের দিকে চেয়েই মধুসূদন আবার আবৃত্তি করেন :

হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকতে পারেন না। মাইকেলের কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলেন, "মধু, তোমার বারি-ইন্দ্র শেষে এই গ্লাসে ঢুকেছে?" তারপর নিজের রসিকতায় ঈশ্বরচন্দ্র হো হো হাসতে থাকেন।

মাইকেল এবার ঘুরে দাঁড়ান গ্লাস টেবিলের উপরে রেখে। তাঁর দুই হাত বিদ্যাসাগরের কাঁধে। উভয়ের চার চক্ষু এক রেখায়।

হঠাৎ বলে ওঠেন মাইকেল সেই অবস্থায়, "ডিয়ার ভিড, তুমিও এমন ঠাট্টা করবে?"

বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন মধুসূদন আহত। তাই ক্ষমার্হ স্বরে বলেন, "কী হল মধু?"

বিদ্যাসাগরের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে মধুসূদন বললেন, "ডিয়ার ভিড, এই গৌড়-জনপদে আমাকে দু' জন ভালবেসে ছিল।"

বিদ্যা : দু-জন।

মধু : হ্যাঁ। দু-জন। একজন নারী আর অন্যজন নর। পুরুষ নারী-প্রেমে উল্লসিত, জীবন ধন্য মনে করে। আমার পুরুষের প্রেম পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল। আমার অস্তিত্ব-উপলব্ধির পথে তাদের সংস্পর্শ না পেলে মরুভূমি হয়ে যেতাম। একজন নারী। তাকে তুমি চেন।

বিদ্যা : চিনি বৈকি।

মধু : তার নাম না বললেও চলে। সে হেনরিয়েটা। সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সে আমার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের তাণ্ডব সহ্য করত, আমার কাব্যকে সে ভালবাসত। নিষ্ঠুরের মতই তার চোখের পানির দাম দিই নি, এমন-কি উত্তর-পাড়ায় মৃত্যুশয্যায় সে যখন শায়িতা। আমার কাব্য আর নিষ্ঠুরতা সমান জল্লাদের মত তার শ্বাস রোধ করেছে মুহূর্তের রগড়ানি দিয়ে।

মাইকেল হঠাৎ থেমে যান। এই স্তব্ধতা ভাঙতে কেউ সাহস করে না। ভাব-বিহ্বল কণ্ঠেই তিনি আবৃত্তি করে যান :

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

স্তব্ধতা নিরবচ্ছিন্ন।

তারি মধ্যে মাইকেল এগিয়ে আসেন, "ডিয়ার ভিড্, এই স্তম্ভলিপি আমি তার হাতে পড়ার ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তারই হাতে প্রথমে গেল। মনু (মনমোহন ঘোষ) তা জানে...তার সামনেই কেঁদেছিল আমার এই কাব্যপিণ্ড বুকে চেপে। আমার কাব্যের সে অপমান করে নি, সে আমাকে ভালবেসেছিল। হয়ত তাই।"

বিদ্যা : সে কথা ত, এখন জন-কাহিনী. মধু।

মধু : তা নারী কাহিনী। আর একজন আমাকে ভালবেসেছিল। (ঈষৎ বিরতির পর) তার নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

বিদ্যা : (বুকে জড়াইয়া) মধু—

মধু : (আলিঙ্গন ছাড়াইয়া, অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন।

বিদ্যা : মধু, তোমার ছেলেমানুষি গেল না। তুমি eternal child রয়ে গেলে।

মধু : ডিয়ার ভিড্, তুমি জান, কাব্যের উৎপত্তিস্থল কোথায়?

বিদ্যা : তুমি কবি, তুমিই তো সবচেয়ে তা ভাল জান, আর বলতে পারবে।

এই সময় শ', রলাঁ, আলাওল সকলে চত্বর ছেড়ে টেবিলের আশপাশে দাঁড়িয়ে যান। এগিয়ে আসে তেছোদীন, মোয়াবক অগয়রহ।

মধু : ডিয়ার ভিড্, জীবন আর পরিবেশ— এই দু'য়ের বিপরীতমুখী টেনশান, কঠিন টান-পড়া অবস্থাই কাব্যের জন্মভূমি। দুই বিপরীতমুখী তরঙ্গের কল্পনা কর। তার মাঝখানে যুযুধান যোঝাযুঝিরত পৃথিবীর তাবৎ কবি-শিল্পী সমাজ-সংস্কারক। এমন-কি পৃথিবীর যত পাগল নিউরোটিকদেরও জায়গা সেই খানে। এই বিপরীত-আকর্ষণের মাঝখানে আবেগের স্থৈর্য হারিয়ে পাগল পাগল বনে যায়। কিন্তু কবি খুঁজে পায় বাঁচবার প্রেরণা। কবি অপরকে শরিক করে সেই চেতনার ভাগ-বাঁটোয়ারায়। চেতনার খোঁজে সে ঢেউয়ের ঝাপ্টায় মাথা ঘুলিয়ে ফেলে না। সত্যিকার কবি তাই পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান আর ঐতিহ্যের খোঁজ-খবর রাখে। কারণ, এই তরঙ্গে সাঁতারের কায়দা কখনও এক থাকে না। পূর্ববর্তীদের ইলেম এখানে অচল। কিন্তু তাদের ভুল-চুক শুধরানোর অভিজ্ঞতাটা বড় কথা। তবে পৃথিবীতে কিছু নির্বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি যে থাকে না, তা নয়। সৌন্দর্যের সন্ধানে তারা পঙ্কিলতাই টেনে আনে। এরা জ্ঞান-বিরোধী, বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের ভাশুর ভাতৃবধূ সম্পর্ক। এদের কথা বাদ দাও। আমার আপাত-ভাসমান উচ্ছৃঙ্খলতার নিচে কি ধৈর্য-সমুদ্র কম্পমান, তা তুমিই আগে জেনেছিলে। আর আমাকে চিনত আমার রাবণ Ram and his rabble এরা আমাক কোনো দিন বুঝতে পারে নি, পারবেও না। ...চেতন-সাগরের আমি সাঁতারু, ডিয়ার ভিড্। আমার কাব্যই আমার জীবন। অথচ তুমি—

বিদ্যা : তুমি ভুল বুঝেছ।

মধু : ডিয়ার ভিড্, কবি হওয়া কি এত সহজ? কত খেসারত দিতে হয়। অনেকের ত পরিবেশ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই থাকে না। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগুলোর মধ্যে অনেক কবি টিকির ভেতরে বিদ্যুৎ খুঁজে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা ছিল। তুমি কি মনে কর, আমি সেই রকম কবি?

বিদ্যা : মধু, তুমি তেমন কবি হতে যাবে কেন? তুমি গৌড়-জনের নিরবধি আনন্দ-সুধা।

মধু : তুমি আমাকে মনে কর ভাট্পাড়ার পণ্ডিত।

বিদ্যা : না, মোটেই না। তুমি খামখা চেতে উঠছ। মধু—।

মধু : (নির্লিপ্ত) ডিয়ার ভিড্ (গ্লাসে চুমুক দানের পর) আমি ভাট্পাড়ার কবি নই। ওদের সুরৎ দেখলেই চেনা যায়। তুমি এক এক করে আঙুলে গুণে যেতে পার। প্রথমেই— ওরা গ্রন্থকীট। কিন্তু কীটের ত শ্রেণী-বিশেষ আছে। দধিতেও পোকা হয়। ওরা কৃমি, কৃমি— সেই কীট। ওরা মনে করে, ওদের গ্রন্থে যা আছে, তার বাইরে আর কোন সত্য নেই। There are more things in Heaven and Earth তা কোনো দিন ওদের মগজে ঢোকে না। দুই— ওদের মুখ ভূতের মত পেছন দিকে। নিজেদের কল্পনার রঙে শত শত বৎসর আগে কী ঘটেছিল, তার একটা ফিরিস্তি ওরা দিতে পারে। সেখানেই ওরা বুঁদ। কিন্তু দুনিয়া যে ঘোরে চলে হাঁটে, তা ওরা বোঝে না। ওরা সেই নির্বোধ নাবালক যে জননীর জরায়ুগর্ভে আবার প্রত্যাগমন-প্রার্থী। (হাস্য) নব জন্মলাভের একটা মজার কায়দা কিন্তু। তিন— ওরা কালপুত্র— time-sever— তাই কাল-জ্ঞান বিরহিত। তথৈবচ স্থান-জ্ঞান। যেখানে সহজে ওল জন্মায়, সেখানে ওরা বিরাট পণ্ডশ্রম সহকারে লাগাবে ওক। অবিশ্যি ওরা দিকশূন্য নয়। দশ দিকের জায়গায় ওদের মাত্র এক দিক থাকে। চার— সকলেই অঙ্গুলি-ঘ্রাতা অর্থাৎ আঙুলের ঘ্রাণ গ্রহণকারী। চৌদ্দপুরুষে বা শতকে কে কবে ঘৃত পান করেছিল, ওরা আঙুল শুঁকেই এখন গর্ভ-বিদারী হুঙ্কার ছাড়ে। অথচ নিজেদের সুরতের দিকে ভ্রুক্ষেপ রাখে না। পাঁচ— ভাটপাড়া নিবাসীরা সেই প্রাবাদিক রাখাল—পালে বাঘ পড়ার আতঙ্ক বিস্তারে সিদ্ধহস্ত। ছয়— এরা প্রতিমা-পূজক, প্রাণ-আরাধক নয়। এ এক নতুন ব্যাধি, পণ্ডিত—প্রাণবিকাশাতঙ্ক রোগ (হাস্য); অবিশ্যি

এরা যাদের দংশন করে, তাদের জলাতঙ্ক রোগ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।...পুতুলের মত অনড় স্থানু চেতনার ব্যাপারি, স্থান-কাল জ্ঞান-বিরহিত। পুরাতন চেতনার একঘেয়ে আবর্তন বিকাশে শব্দের একই দ্যোতনার ব্যবহারকারী অথবা শুধু শব্দের মারপ্যাঁচে চেতনার স্থূলতা ঢাকা দেওয়ার পণ্ডশ্রম-প্রয়াসী— এই ভাটপাড়া নিবাসীদের কাব্য-জঞ্জালে তুমি ওদের খসৃলতের পুরো ষোল আনাই দেখতে পাবে। তুমি মনে কর, আমি সেই রকম কবি?

বিদ্যা : ম—

মধু : ভিড়্। সাত—

বিদ্যা : মধু!

মধু : সাত— ওরা বদ্ধ জলাশয়ের ভেক। তাই ভেক্‌ধারী। (আত্ম-নিমগ্ন) পণ্ডিত, কবিতা অস্তিত্বে বিধৃত নিজের দেশ, মানুষ— সমগ্র পৃথিবীর তরঙ্গ-কম্পন। যুগের যা-কিছু জ্ঞাতব্য; কবি জানবে। যুগের যা-কিছু কর্তব্য, কবি জানবে। জানবে, মনুষ্যত্বের বিকাশ-পথে তামাম পৃথিবীর সাফল্য— দ্বন্দ্ব-পরাজয়ের ইতিহাস। এই মন্থন-আবর্তে চেতনার বন্ধুদেরা আগেই খবর দিয়ে যায় কবির কাছে। কবি তাই নবী। আগমনীর গান সকলের আগে তার কানে পৌঁছায়। পেছনে কি সাধনা থাকে না, ডিয়ার ভিড়্? এখানে অলৌকিক কিছু নেই। সাধনা আর একাগ্রতায় দিব্য-দৃষ্টির উত্তরাধিকার এসে জোটে। দুই চক্ষু সহস্র চক্ষু হয়। কিন্তু ডিয়ার ভিড়্... মন্থন-আবর্তে কত নীল বিষ ওঠে, যে-খোঁজ সুধাপানকারীরা রাখে না। তার শরিক স্বার্থপরের মত কবি স্বয়ং। সত্যিকার কবি তাই নীলকণ্ঠ।... যৌবনে জেগে দেখলাম, স্বর্ণলঙ্কা আমার স্বদেশ পরপদানত। তার আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খল। দেখলাম, প্রাণপ্রিয় দেশবাসীদের...জগদ্দলের চাপে প্রাক-ভেক্ জন্ম দলা-পাকানো এক রকমের জেলী-বিশেষ। তা থেকে ব্যাঙাচি বেরুতে পারে, মানুষ জন্মায় না। হৃৎ-সর্বস্ব, লুণ্ঠিত কঙ্কাল-প্রধান, বাঁকা শিরদাঁড়া, জীবনাস্বাদ-বঞ্চিত, থুকা-রক্ত, পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর ভারে ন্যুব্জদেহ আমার স্বদেশবাসী... দেখলাম, ওরা যাকে ধর্ম বলে তা মনুষ্য-ধর্ম নয়। সতীদাহ প্রথার মধ্যে দেখলাম ওদের ধর্মের গলিত কুষ্ঠ রূপের প্রতীক। কামান্ধ, নারীনিগ্রহীর দল পরকালকে ইহকালের সম্প্রসারণ ঠাউরে তার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চতুর্দশ লুইয়ের কথাটা উল্টে নিলে : After me the wild-fire. জল-প্লাবনের জায়গায় অগ্নিপ্লাবন। ধর্মের নিগড়, অত্যাচারের নিগড়, দেখলাম এক সূত্রে গাঁথা। হিন্দু-ধর্ম থেকে আমি খারিজ হতে চাই, মন আর্তনাদ করে উঠল। "জীবনের শাখা-প্রশাখাকে ইঁটের ভারে ঝুলিয়ে তাদের আকাশ-তৃষ্ণা লুপ্ত করে দেবে— এ আমি সইতে পারব না।" নারাজ একাকিত্ব প্রতিধ্বনি তুললে।... আমার যন্ত্রণার আঁচ পেয়েছিল গৌর-ভূদেব...

বিদ্যা : আর তুমি তখন ভেক্ নিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধু : (স-চিৎকার, পণ্ডিত— (পরে মৃদু ব্যঙ্গস্বরে) আমি কেষ্ট ছেড়ে খেষ্ট ধরেছিলাম সত্য, কিন্তু তুমি তা-কে ভেক বলতে পার না, ভিড্। কৃষ্ট-খ্রিস্ট দুই-ই আমার কাছে মুড়ি মিছ্‌রি। (গম্ভীর) আমি শুধু স্বধর্মে নিহত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না! I did not want to get myself spiritually murdered— জীবন-প্রবাহ আমার অন্বিষ্ট। তা কালসিন্ধু পানে ধায় না-কি, তা আমার দেখার কথা নয়। আমি সেই গন্তব্য-বিস্মৃত নদী, চলমান তাই যার মুখ্য লক্ষ্য— আর কিছু না।

বিদ্যা : কিন্তু মধু, আমি ত ভেক্ বদলাই নি।

মধু : (একবার ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ, পরে ঊর্ধ্ব-নেত্র) ডিয়ার ভিড্, স্রষ্টা পৃথিবীতে একটা সূর্য দুটো চাঁদ সৃষ্টি করলেন।

শ' He has gone tipsy মাতাল হয়ে গেছে। দু'টো চাঁদ। বোধহয় নতুন বিজ্ঞান New Oriental Science?

মধু (নির্বিকার) তোমার কথা আলাদা, পণ্ডিত। তুমিও ঈশ্বরের চন্দ্র— যদিও মর্ত-বিহারী, তোমার কথা আলাদা। আকাশচারী চন্দ্রের চেয়েও তুমি ঢের বেশি উজ্জ্বল... তোমার সঙ্গে আমাকে তুলনা করা অন্যায়। শ্বাসরোধকারী তোমাদের ধর্ম। তোমাদের ধর্ম-পালন আর মনুষ্যত্ব-বর্জন একই কথা। পৃথিবীর দিকে তাকাও, ক'টা বিশ্বখ্যাত মানুষ তৈরি করতে পেরেছ? ক'টা শিল্পী, সুরকার, কবি, স্থপতি, সমাজ-সংস্কারক বৈজ্ঞানিক জন্মে বিকশিত হতে পায় তোমাদের সমাজে? ...প্রতারণার জাল, কপটতার খোলস, সর্পমন্ত্রসম নিরাময়-অক্ষম কতগুলো শাস্ত্রমন্ত্র— এই তো সম্বল, ডিয়ার ভিড্। জ্বালায় যন্ত্রণায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। শপথ নিলাম : আমি চেতন-স্বর্ণকার আমি চেতনা গড়ব— তার নক্‌শা আলাদা, মীনা স্বতন্ত্র। প্রাণ-প্রবাহ আমাকে টেনে নিয়ে গেল। কৃষ্ট অবান্তর, খ্রিস্ট আমার কাছে অপাংক্তেয়। আমার আশ্রয় প্রয়োজন। কূলধ্বংসী নদীর কি জমিন দরকার হয় না, ডিয়ার ভিড্?...

বিদ্যা (অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে) মধু, আমি একদিকে ধাই তো তুমি আর একদিকে ধাইছ। এমনি ঠাট্টা করে বললাম—

মধু : আমিও ঠাট্টা করে বলছি। ডিয়ার ভিড্, তুমি পদ্যখোঁচা পাখি দেখেছ?

বিদ্যা : পদ্যখোঁচা পাখি— পদ্যখোঁচা পাখি!

মধু : আচ্ছা, কাদাখোঁচা পাখি দেখেছ?

বার্নার্ড শ' হঠাৎ বলে উঠলেন, "He has gone tipsy. Full out." আর সকলে স্তব্ধ। কথার কোন প্রতিক্রিয়া হল না দেখে শ' ঠোঁট বাঁকিয়ে একবার ঘাড় নাড়া দিলেন।

বিদ্যা : কাদাখোঁচা পাখি তো, দেখেছি।

মধু : (পুনরায় গ্লাস ভর্তির পর জোর হাস্যে) কাদাখোঁচা পাখি দেখেছ আর পদ্যখোঁচা পাখি দেখোনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যা : তুমি সজ্ঞানে আছো তো মধু?

মধু : (গ্লাসে চুমুক) তুমি হাসালে, পণ্ডিত। ডিয়ার ভিড়্, তোমার ভাট্পাড়ার কবিরা সেই পদ্যখোঁচা পাখি— আমাকে তুমি যা মনে কর।

বিদ্যা মধুসূদন গায়ে পড়ে প্রেমও করে না। (হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ স্বরে) ডিয়ার ভিড়্, তোমার ভট্টপল্লী-নিবাসী কবিকুল সেই পদ্যখোঁচা পাখি— কাদাখোঁচা পাখির যমজ মামাতো-ভাই। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় 'ছন্দ' এবং 'দুর্গন্ধ' মেলাতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ওরা কাদার ব্যাপারি, তা তারা বোঝে না। চেতনা প্রবহমানতা হারিয়ে ফেললে তখন তা শৈবাল-পরিপূর্ণ কাদায় পরিণত হয়। এই কাদাখোঁচা পাখির স্বর্গ। তোমার ভাটপাড়ার কবি কিন্তু এই স্বর্গ পরিত্যাগ আর করতে পারে না। অঙ্গভঙ্গি অথবা জোর গলায় কবিতা আবৃত্তি করে তারা ভাবে, মজা পাঁকে বুঝি জোয়ার এল, সঞ্চরণ শুরু হয়েছে। কিন্তু সে তাদের অঙ্গ আর কণ্ঠ-সঞ্চালন মাত্র। বোধশক্তি ওদের ছেড়ে যায়। তাই নিজের সুরৎ দেখে আর কিছু ঠাওর করতে পারে না। কারণ, নিজেকে জানা আর নিজের ভুলত্রুটি শোধরানোর বিশেষ উপায় হচ্ছে, পরিবেশের দিকে তাকানো। কিন্তু ওরা ওই পথ ছেড়ে নিজেদের খোলসে গুটোয়, ফলে আর নিজেদেরও দেখে না। পৃথিবীর আবহাওয়ার মত মনের আবহাওয়া বদলায়; বায়ু পরিবর্তন উচিত স্রেফ বাঁচার জন্যে— তা কী করে ওরা জানবে? ভাটপাড়ার কবিরা তাই ঘোলাটে কাদা আরো ঘোলায়; পৃথিবীকে আর দেখে না। তাতে আপত্তি ছিল না। ওরা চায়, পৃথিবীকে আর কেউ না দেখুক। তখন ওরা ধোঁয়ার জাল বোনে। পুরাতন আধিদৈবিক শব্দ যোগাড় করে নতুন চেতনাকে বাঁধতে দৌড়ায়। কিন্তু ডিয়ার ভিড়্, তুমি আমাদের গদ্য লিখতে শিখিয়েছ...তুমি জান, নতুন চেতনাকে পুরাতন কিছু— এমন-কি পুরাতন শব্দ দিয়ে বাঁধাও কঠিন। আর পুরাতন শব্দ ব্যবহার করলে তার ব্যঞ্জনা নতুন করে তুলতে হবে। কিন্তু ভাটপাড়ার কবিরা এত পরিশ্রমের ধার ধারে না। তারা কবি, সুতরাং আবেগ যা বলে, তা ছন্দোবদ্ধ করতে পারলেই খুশি। আহ, ডিয়ার ভিড়্..., এই সহজিয়া সাধকেরা কি জানে, আমি কত বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি ভাষা রপ্ত করার ব্যাপারে। শুধু কি শব্দ? ইউরোপের মন পৃথিবীর মনকে জানতে— আমার কি কোন মেহনত হয় নি? অথচ তোমার ভট্টপল্লীর বানরেরা নিজেদের শাখায় শুধু ঝম্প প্রদান করবে। বিশাল পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, অরণ্যানী তাদের কাছে নিরর্থক। অবিশ্যি আমিও তোমার কাছে তেমন মর্কট কবি।

বিদ্যা (জোর প্রতিবাদ) মধু, তোমার যা ব্যবহার, আমাকে এবার এই স্থান পরিত্যাগ করতে হয়।

মধু (আকস্মিক আবেগে ঈশ্বরচন্দ্রের হস্ত ধারণ) শোন পণ্ডিত...শোন ডিয়ার ভিড়্...রাগ করো না। আজ মুখ যখন খুলেছি, একবার বলে নিই, তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলে আমার কাব্যের প্রথম সমঝদার; মনের কথা তোমার চেয়ে আর কে ভালো করে বুঝবে? ভট্টপল্লী না হোক, বটতলার কবি হিসাবে ভালই চেন।

বিদ্যা (হাত ছাড়াইতে চেষ্টা, কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত) মধু, এইজন্যে আমি মদ ছুঁতে পারি নি। নচেৎ কোনো পানীয়ের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই।

মধু (নির্বিকার) অবিশ্যি, জান পণ্ডিত, ভট্টপল্লী আর বটতলার তফাৎ বেশি নেই। পশ্চিমের স্বর্ণস্রোত এসে আছড়ে পড়ল। সব তছনছ হয়ে গেল, প্রাচীন ব্যবস্থা— অবিশ্যি জরাজীর্ণ বলেই তা ভেঙে গেল। কিন্তু নতুনকে অনেকে গ্রহণ করতে পারল না, বিশ্বাস হারাল তার আজন্ম বিশ্বাসে। ফলে বটতলার কবিরা দিশেহারা হয়ে আরো আরো অতীতের দিকে ছুটল। মধ্যযুগের অমর কবিদের অক্ষম অনুকরণ—গ্রাম্য জীবনে যা ছিল, প্রাচীন কবিদের কাছে সহজাত ব্যাপার। বটতলার কবিরা কৃত্রিম এক জগৎ গড়ে তুললে। কিন্তু জীবনবোধ তার মধ্যে কতটুকু? আর কবিত্বশক্তি নাম মাত্র। পণ্ডিত, তুমি হয়ত বলবে, গ্রামের বহু মানুষের মানসিক ক্ষুধা তো মিটিয়েছে তারা। কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ঘাস-শাক, পাট খেয়ে জীবন কাটায় না? দেশে চাল না থাকলে কি শূকরভুজ্যি আমদানি চাল খেতে হয় না? সে তো ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র— তাতে সৌন্দর্য কোথায়? বর্তমান নিরাপত্তাহীন, ভবিষ্যৎ চোখে পড়ে না যা অন্ধকার— বটতলার কবিরা তাই নিছক কল্পনা-প্রসূত এক কল্পরাজ্যে ছুটে গেল। এই অবস্থায় আর যা-ই হোক কোন মহৎ কেন, কোন ভালো কাব্যই আর বিকাশ লাভ করে না। এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটা কারিগরি তুমি হয়তো পেয়ে যেতেও পার। কিন্তু তা পানির ঝিরঝিরানি— স্রোত নয়। আর মজা কি জান, পণ্ডিত, —এই ভাটপাড়া আবার বটতলার সমর্থক। যদিও একে অপরকে ভেতরে ভেতরে ভালবাসে না। কিন্তু জীবনের কাছে উভয়ে পরাজিত, পিছু হটছিল— তাই একে অপরকে দোসর মনে করত। যুগে যুগে এটা ঘটেছে। সত্যিকার কাব্য জীবন থেকে পলায়ন নয়, বরং জীবন-শরণ। বহমান যুগকে সুরে কাব্যে নাটকে কাহিনীতে রঙে যদি মানুষ বাঁধতে না শিখত, এ পৃথিবীতে বাঁচার কোন সার্থকতা থাকত না, সভ্যতার বিচিত্রতর বিকাশ কি সম্ভব হত? আদৌ না। মানুষ যুগকে বাঁধে না শুধু, নিজের আবেগে পরিখায়িত করে সংসার আবাসভূমি দেশ সমাজকে রসে ডুবিয়ে বাঁচার ফসল শোভা দেখত। যদিও জীবন প্রবহমান, তবু এক যুগের সার্থক শিল্পী কালস্রোতে অস্তিত্ব বজায় রেখে মাথা তুলে থাকে, বিলুপ্ত হয়ে যায় না। ডিয়ার ভিড, কীর্তন গান শুনে আমি কত দিন না কেঁদেছি— যদিও কেষ্টয় বা খেষ্টয় আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ইউরোপের মত এই দেশের মাটিতেও কি মানুষের স্বাধিকারের দাবি, সেই অতীতের অন্ধকারে গর্জে ওঠে নি? কলসীর কানা প্রেমের মাল্যস্তূপে ডুবে যায় নি? কীর্তন গানের হয়ত একমাত্র কাঠামোর মধ্যে পদকর্তা কবি জীবনকে ধরেছিলেন। তাই ত আমি তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। চেতনার পারম্পর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীর বাঁকের মত নানা শোভা বক্র তীর সত্ত্বেও জলস্রোতের ব্যাঘাত ঘটায় না। নচেৎ নদী ত আর নদী থাকে না। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন লালন ফকির। তিনি পুঁথি লিখতে যান নি। বাউলের মাধ্যমে তিনি প্রাণস্রোত বহমান রেখেছিলেন। তার সুরেই আমি এই যুগকে পাই! কিন্তু ডিয়ার ভিড, তোমার ভট্টপল্লী আর বটতলা...

বিদ্যা মধু, কিন্তু মরা ঘোড়া চাবকে লাভ? ওদের কি কাণ্ডজ্ঞান ছিল?

মধু (হঠাৎ বিদ্যাসাগরের দুই দিকের কোমর ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে) ডিয়ার ভিড, You talk like Socrates— তুমি একদম সক্রেটিসের মত কথা বলছ?

বিদ্যা : কি যে তুলনা কর। কোথায় সমুদ্র আর কোথায় মজা খাল!

মধু : ডিয়ার ভিড, ওই তোমার এক স্বভাব। নিজেকে ছোট করতে পারলে তুমি যেন খুব খুশি। সাধে কি চাদর-চটি দেখে জান্-বাজারে তোমাকে কে উড়ে-ঠাকুর মনে করেছিল। শোন, ভিড। সক্রেটিস চারণ-কবি আয়োন Ion-কে বলছেন : For whilst a man retains any portion of the thing called reason, he is utterly incompetent to produce poetry or to vaticinate.

বিদ্যা (হাসিয়া) এ-সব কোথা পেলে?

মধু প্লেটোর রিপাব্লিকে আছে। আর জানই তো, প্লেটো আমার মত কবিদের উপর খুব সদয় ছিলেন না। তাঁর স্বর্গরাজ্য বারেক আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। তাই রক্ষা!

বিদ্যা তুমি ত আর ভাটপাড়ার কবি নও।

মধু (বিদ্যাসাগরের পাঁজরে আঙুল নাচাইয়া ওঠানো এবং নামানোর সময়) ডিয়ার ভিড, আরো শোন...সক্রেটিস বলছেন, The God seems purposely to have deprived all poets, prophets and soothsayers of every particle of reason and understanding, the better to adapt them to their employment as his minister and interpreters...

বিদ্যাসাগর হো হো শব্দে হেসে ওঠামাত্র সমস্ত মজলিসে এই মড়ক ছড়িয়ে পড়ে। বার্নার্ড শ' রলাঁ, আলাওল— প্রত্যেকেই এই উচ্ছলতার শরিক। মধুসূদন তখন গ্লাস টেবিলের উপর রেখে বিদ্যাসাগরের দিকে মুচকি হেসে তাকান।

আবহাওয়া ফিরে গেছে।

মাইকেল বিদ্যাসাগরকে আবার সম্বোধন করেন, "জান ভিড, মজা কি জান— অথচ প্লেটোর আয়োন-গ্রন্থ অনুবাদ করেছে—।"

বিদ্যা : কে?

মধু : (হাসিয়া) আর এক—

বিদ্যা : (তুমুল হাসির মধ্যে) আর এক কবি।

বিদ্যা : আর এক কবি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধু : ইংল্যান্ড-সন্তান পার্শি বিশী শেলী।

বিদ্যা : তোমরা কবিরা নমস্য, মধু। নিজেদের গালে নিজেরাই চুন-কালি মাখতে পারো (হাস্য)।

মধুসূদনের ঠোঁটে হাসির ছোঁয়াচ দেখা যায়। তিনি আবার নিজের গ্লাস পূর্ণ করতে নতমুখ হন। অন্যান্যের চোখ তখন আর এক দিকে।

জাইদুন উপস্থিত। একা নয়। পুরা একটা বড় ট্রে দুই হাতে ধরা! আধেয় নানা রকম নিমকি জিনিসে বোঝাই। পাঁপড় ভাজা, লবণ-সিদ্ধ মটরশুটি, টমেটো, সিঙাড়া, সেদ্ধ ফুলকপি প্রভৃতি। পাশে চাটনি। কুল, তেঁতুল, পুদিনা, আমের ঝাল আচার। এত জাতীয় হরেক রকম জিহ্বা-রসক সামগ্রী।

জাইদুনকে গৃহিনী-সজ্জায় আরো ভালো দেখায়। আঁচল মাথায় নেই, বরং কোমরে জড়ানো। দুই চোখ সপ্রতিভ। এত গুণীজনের ভারে সঙ্কুচিত নয়। পেছনে ফুয়া আছে। সে স্বভাবতই লাজুক। তার হাতে একটা ছোট গোল গামলা। সেদ্ধ আলু, সাল্যাদ বীট পূর্ণ।

জাইদুন কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। যেন কথার কোনো খেই দিয়েই তার আতিথেয়তার বন্ধ দ্বার উদঘাটিত হতে পারে। কিন্তু সকলেই চুপচাপ। পাষণ্ড সৈয়দ বোক্‌জারা তখন তুরীয় লোক, হয়ত সমস্ত আসমানে হুরী দেখছিল। তাই জাইদুনকে চিনতে পারল না। সাহ্‌ কবি মধুসূদনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এখন টলোমলো চরণ। জিহ্বা ত পিছলে যাচ্ছে। কাজেই চুপ করে রইল। হুঁশ সামান্য সামলে নিতে চায় সে। রলাঁ, শ', দু' জনেই এদিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু নির্বাক। বিদ্যাসাগর হঠাৎ অচেনা রমণী দেখে চোখ নামিয়ে নিয়েছেন প্রাচীন অভ্যাস মোতাবেক। তেছোদীন ত এমনি তীর্যক-নয়ন। শরাবের কল্যাণে তার দুই চোখের দৃষ্টি ফ্লাশ্‌ কাট বেরিয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় মেশার সুযোগ পাচ্ছে না। সে আর দেখবে কী? সামনে সরষে ফুল নাড়লে হয়ত কিছু হদিস করতে পারত।

AMARBOI.COM

সভাময় অস্বস্তিকর নীরবতা। মধূসূদন তখন 'পাঞ্চ' করছেন আপন মনে। শুধু হুইস্কিতে নেশা ধরছে না। তাঁর কাছে এই মুহূর্তে পৃথিবী অস্তিত্বহীন।

এতক্ষণ মধুসূদন-বিদ্যাসাগর অভিনীত নাটকের শরিক ছিলেন সবাই। মজলিস গমগম করছিল। নির্জনতা সুতরাং এখন অস্বস্তিকর। জাইদুন নিজে ঘেমে উঠছিল। এত চাটনি জাতীয় খাবার! কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে। এই প্রত্যাশা স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেই ঠাঁয়ে যেন স্তম্ভিত!

প্রথম কায়িক আলোড়ন তুললেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি মাইকেলের কাছে ফিরে গেলেন, হয়ত আবার কোন প্রসঙ্গ-বিচারে অথবা কুশলাদি শুধাতে। মধুসূদন তখন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে খুব মৃদুরবে কী যেন বাক্যালাপ শুরু করলেন।

বিদ্যাসাগরীয় চাঞ্চল্যের ঢেউ মুমূর্ষু রোগির মতই দুর্বল। কিন্তু এতে কাজ হয়ে গেল। পরমুহূর্তের গতিবিধি দেখেই তা বোঝা যায়।

প্রথমেই আলাওল জাইদুনের গৃহিণী-পরায়ণ ব্যক্তিত্বের দিকে চেয়ে মনে মনে মৃদু হাসলেন। ঠোঁটে তার ছোঁয়াচ পড়ল। স্বভাবত একটা মিষ্টত্ব আছে জাইদুনের ব্যক্তিত্বে। মাথায় ঘোমটা নেই। তখন ত সে কিশোরী বনে যায়। এগিয়ে এলেন আলাওল।

তারপরই সম্ভাষণ, "ঘরের ঘরণী, জগৎমোহিনী— কে তুমি?"

জাইদুন প্রশংসায় শরম-কাতর নয়। ট্রে-হাতেই মাথা ঝুঁকিয়ে জবাব দিলে, "মহামান্য কবি, আমি ত আপনার পদ্মাবতী নই। উলুবনে মুক্তা ছড়াবেন না। আমি এই ঘরের ঘরণী মাত্র। জগৎমোহিনী নই।"

বাক-পরিস্থিতি এবার ভাঙা বাঁধ; শ্রোতার দল চেতে উঠল।

বার্নার্ড শ' নিজাসন, তাড়াতাড়ি পিয়ানোর সম্মুখস্থ টুলটা নিয়ে এলেন, জাইদুনের সামনেই রাখেন। তারপর বিনীত কণ্ঠে, "Madam, keep the tray here please— মহাশয়া ট্রে এর উপরে রাখুন।" জাইদুনের দুই গণ্ডে তখন শরমাক্ত হাসি জোয়ারভাটার কোলাকুলি শুরু করে দেয়। স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকে সে।

কবি আরো এগিয়ে আসেন। তারপর জাইদুনের চোখে চোখ পড়ামাত্র সে নত-নেত্রা হলেও আলাওল আবৃত্তি করে যান :

রসনা কমল পত্র কোমল বচন।
ঈষৎ হাসিতে করে সুধা বরিষণ॥
সুরঙ্গ কপোল বর্ণ চারু সুললিত।
জিনিয়া কোমল পত্র অতি সুশোভিত॥
তার বাম পাশে এক তিল মনোহর।
পুতুলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর॥
যেই তিল সেই তিলে হয় দরশন।
তিলে তিলে করে অঙ্গ করয় দাহন॥
নয়ান খঞ্জন কর্ণ হৈতে রেখা শোভে।
চঞ্চু মেলি কন্দরে রহিছে তিল লোভে॥

সৈয়দ বোক্‌জা তখন শ'-রলাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। তার উজ্‌-গুজানি দেখে মনে হয় মৃদুভাষে সে দোভাষীর কাজে লেগেছে।

বিদ্যাসাগর-মাইকেল তখনও অকুস্থল থেকে ঈষৎ দূরে। তাঁদের কথোপকথন স্পষ্ট কারো কানে আসে না। হয়ত দেনা-পাওনার কথা হচ্ছে বা আর কিছু। অন্তত মজলিশে তার কেউ কিছু জানছে না।

জাইদুন চোখ তুলে সোজাসুজি আলাওলকে রোখার উদ্দেশে মুখ খোলে, "জনাব আলাওল, আপনি ভুল করছেন। আপনার নায়িকা বাঙালি রমণী ছিলেন না। আমাকে দেখে ত—।"

কিন্তু কবির কানে তার কোন দাগ পড়ে না; আবৃত্তির বহরই প্রমাণ।

জিনিয়া কমল দণ্ড ভুজ মনোহর।
নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর॥
যতেক বাখান করি ততোধিক চারু—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাওল এইটুকু উচ্চারণ করা মাত্র জাইদুন বেশ জোরেই চেঁচিয়ে উঠল, "মহামান্য কবি।"

শব্দের তারতম্যে অনেক সময় ফলাফলের পার্থক্য ঘটে। জাইদুনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ করতে হয়।

কবির ভাব-ডগমগ মানসিক কারাগারে এবার সত্যি বাতাস ঢোকে। বরং একটু থমমত খেয়ে যান। তা সামলে নিয়ে হাসি ছড়িয়ে আলাওল শুধান, "কুলের কামিনী ফুলের নিছনি!! বাগযন্ত্র এবম্বিধ পর্বতউত্তুঙ্গ করণের উদ্দেশ্য কী?"

বিগলিত-হাস্যমগ্ন জাইদুন। যথা সুর বজায় রেখেই বলে যায়, "জনাব, কবিদের চোখ সব সময় উর্ধ্বলোকে থাকে অন্তত আমার মত আ'ম মানুষের তাই ধারণা। কিন্তু আপনি দু'টো ভুল করেছেন। প্রথম, আমি আপনার নায়িকা হওয়ার অযোগ্য। দ্বিতীয়, আপনি কপোল থেকে ক্রমশ নিচে কটিদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছেন— ।"

পাষণ্ড অর্থাৎ প্রাণ-শশী আঢ্য হঠাৎ কোন অমাবস্যায় ওঁৎ পেতে ছিল, খোদা জানে। সে প্রায় লম্ফযোগে জাইদুনের পেছনে এসে পৌঁছল। তারপর বেশ জোর কণ্ঠেই বললে, "কবি, আর অগ্রসর হবেন না। আমার এই শ্রদ্ধেয়া ভ্রাতৃজায়া ঘর্মাক্ত কলেবর হচ্ছেন।"

জাইদুন যথাস্থানে দাঁড়িয়ে কনু'য়ের ঠেলা দিলে পাষণ্ডের গায়ে মুখ ফিরিয়ে তার উপর ভাঙা-চোরা ঠোঁটে ধমক ছাড়লে। অবিশ্যি নীরবে। আবার আলাওলের মুখোমুখি গৃহকর্ত্রী।

"আর্যকন্যে! মাভৈঃ! মাভৈঃ! কবিকুল সম্পর্কে আপনার প্রলেপিত কলঙ্ক অপনোদনার্থ আমার ঈষৎ সামান্য বাক্য-নিবেদন আছে। অপিচ, মহোদয়ার জ্ঞাতার্থ সবিনয় ভাষণ পূর্বক বশংবদ আলাওল কিঞ্চিৎ বক্ষোদাবাগ্নি প্রশমিত করিবেক। অধীনের যাঞ্চা-প্রার্থনায় আপনি সদয় হউন।" আলাওল কুর্ণিশ-সহকারে মাথা ঝুঁকিয়ে একটু থামার পর জাইদুনের দিকে তাকান।

"তথাস্তু", জাইদুনের মুখ থেকে কথা অনিচ্ছায় বেরিয়ে যায়।

"হে পুরাঙ্গনে, শৃন্বন্তু— শ্রবণ কর। তাবৎ কবিবৃন্দ আপনার কলঙ্ক কর্দম যথা-সমাদরে গ্রহণ করিবেক। যেহেতু, 'তীক্ষ্ণ খড়গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়'? কবিবৃন্দ রূপ-তাপস্যায় পর্বত শিখরে, অগ্নিগিরিকন্দরে— পার্থিব চরাচর এবং অপার্থিব কল্পনা-রাজ্যে শুধুমাত্র একক আশ্রয়-নির্ভর। স্মর্তব্য, একক আশ্রয়-নির্ভর। তাহা রমণীর রূপ। দেহ হইতে বিদেহী-লোকে যাত্রার দুর্গম বর্ত্ম-রেখায়—," আলাওল বক্তব্য গুছিয়ে নিতে একটু থামেন। কিন্তু জাইদুন তখনই ছেদ টানলে, "মহামান্য কবি!"

"কহ, বরাঙ্গণে!"

জাইদুন হঠাৎ খিলখিল হাসির মধ্যে জবাব দেয়, "কিন্তু কবি, আপনি যে বিদ্যাসাগর ম'শায়ের পিতামহের মত বাংলা বলছেন। এ ত আমার বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।"

"বিদ্যাসাগর"। এদিকে মাইকেলের কানে শব্দ পৌঁছেছে। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বাদ যান নি। দুই জনে হন্‌হন্ এসে উপস্থিত হলেন একদম অকুস্থলে।

কৌতূহলী বিদ্যাসাগর মুখ খোলেন, "কী ব্যাপার, আমি এই নারী-ঘটিত ব্যাপারে?" জাইদুন তখন মৃদু হেসে মুখ নিচু করতে গেলে ঈশ্বরচন্দ্র তর্জনি-গাঁথা জাইদুনকে বলেন, "গিন্নী, কী খবর?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোমরের আঁচল এবার জাইদুনের মুখে। লজ্জা আর প্রবল হাসি দু-ই চাপতে হয়।

"তবু কী ব্যাপার?"

"কবি আলাওল আপনার চেয়েও কড়া বাংলা বলছিলেন। তা-ই", জাইদুন সহজ কণ্ঠে জবাব দিলে।

"বাংলা আবার কড়া হয় নাকি?" বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন।

জাইদুন কী যেন জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। আর কোন উত্তর আসছে না দেখে বিদ্যাসাগর বললেন, "বাংলা কড়া বা সহজ হয় না। চিন্তা কড়া জটিল বা সহজ হয়। এ নিয়ে খামাখা বচসা। আমি ত মথুরা-বৃন্দাবন দু-ই চালিয়েছি বাংলা ভাষায়। পড়ো আমার 'ভ্রান্তি-বিলাস' সেখানে এক স্বাদ। আবার খুড়ো-ভাইপোর ব্যাপার? সে মজা আলাদা। ও নিয়ে তোমাদের কলেজের মাস্টারগুলো আজকাল খামাখা ঘ্যান্‌ঘ্যানায়।"

বিরক্তি সহকারে বিদ্যাসাগর মুখ কুঁচকান।

"কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান ত হচ্ছে না।" জাইদুন অভিযোগমাখা সুরে বললে।

বিদ্যাসাগর : কী সমস্যা গিন্নী?

জাইদুন : মাফ করবেন, মাননীয় বিদ্যাসাগর। আপনারা যাঁরা আমার অতিথি তাঁরা সকলেই বাক্য-বিলাসী।

বিদ্যাসাগর : বাক্য-ব্যবসায়ীও বলতে পার।

জাইদুন : হ্যাঁ, তা-ই। এই দেখুন না, আমি খাবার আনলাম। অথচ কারো আগ্রহ নেই। কথায় কি পেট ভরে? (ট্রের দিকে অঙ্গুলিক্ষেপ) আসুন—

বিদ্যাসাগর : আমি ত ডাব খেয়েছি। এখন— এখন—

জাইদুন : কথার ডাব-ও আপনারা অজস্র দিতে পারেন।

বিদ্যাসাগর : তুমিও কম যাও না, গিন্নী।

তারপর ঈশ্বরচন্দ্র এজমালী সম্বোধন করেন, "এসে হে, গিন্নীকে সন্তুষ্ট করা যাক।"

কিন্তু কেউ জবাব দেয় না। তখন বিদ্যাসগর শ'র দিকে আঙুল বাড়ান, "Come on, Shaw।"

"No thanks" মৃদু জবাব এল। তারপর আলাওলের পালা। তিনিও এখন খেতে রাজি নন। বিদ্যাসাগর পিঠ-পর খাড়া দেখে, জাইদুন বেশ সাহস পায়। সে আলাওলের উপর হামলা চালায়, "মাননীয় কবি, খাওয়ার উপর আপনার এমন অনীহা কেন?"

"এই—" আলাওলের আমতা আমতা ভাব।

"অথচ কবি মহাশয়, আপনি আমাদের জন্যে লম্বা লম্বা উপদেশ বেড়েছেন ঠিক।" জাইদুন গ্রীবা বাঁকিয়ে কবির দিকে দৃষ্টি ছোঁড়ে।

"আমি?"

"হ্যাঁ, জনাব। ছোটগ্রাসে ভক্ষিবেক বহুল চবণে।
আগে পাছে দুই হস্ত ধুইব সাবধানে ॥

আরো আছে—

আরম্ভে নিমক শেষে মিষ্ঠ দ্রব্য খায়
যে খায় সে জীর্ণ হয় ব্যাধি যে পলায় ॥"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শেষ করে জাইদুন কবির দিকে আবার তাকায়। তাঁর জবাবের আগেই ফের মুখ খোলে, "মহামান্য আলাওল আসলে মেয়েদের উপর কখনও সদয় ছিলেন না। তাই আমার তৈরি জিনিসে এমন অনাগ্রহ।"

হেসে উঠলেন আলাওল, হো হো শব্দে, "আমি মেয়েদের উপর মেহেরবান নই? তুমি নতুন কথা শোনালে, সখি! রূপ-বর্ণনায় আমার তাবৎ কাব্যশক্তি উজাড় করে দিয়েছি। মনে রেখো, সে-রূপ রমণীর রূপ।"

"কিন্তু নারীর মর্যাদা আপনি ত স্বীকার করেন নি?" জাইদুনের চোখে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছায়া।

"বাজে কথা," আলাওল জবাব দিলেন।

"আমি প্রমাণ দিতে পারি। আপনি লিখেছেন :

— যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন জন।
ত্বরা মাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন।
উদর পবিত্র আগে বুঝিয়া মরম।
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম।"

জাইদুন ঈষৎ লজ্জিত হয়। কিন্তু তা কাটিয়ে উঠতে আরও বলে, "নারী ত আপনার কাছেও দাসী, যদিও দাসী নয়। সে পণ্য, তাকে কেনা-বেচা চলে।" আপনি আরো লিখেছেন :

সপ্ত দিবসে শির-কেশ ফেলিবেক।
পুত্র হৈলে দুই অজা সুতা হৈলে এক ॥
আকিকা দিবেক তার গায়ের বদল।
সর্ব বিঘ্ন নাশ হয় বাড়ে আয়ু বল ॥

কবি আলাওল, আপনি নিজেই বলুন, ছেলেদের দু'টো ছাগল আর মেয়েদের একটা ছাগল। মেয়েদের— আর কি মর্যাদা থাকল? আজ এই জন্যে আমার রান্নার দিকে অবজ্ঞা।"

আলাওল জবাব দেয়ার আগে বিদ্যাসাগর বার্নার্ড শ'কে বললেন, "আসুন—।"

"I am not so much interested in eating— খাওয়ার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই।" বার্নার্ড শ' জবাব দিলেন।

"জর্জ, তুমি বলছ কি," মাইকেলের কণ্ঠ ঈষৎ তপ্ত।

"Simple English— সোজা ইংরেজি," তারপর বার্নার্ড শ' মৃদু হাসলেন।

মাইকেল কিন্তু ইতোমধ্যে তেতে উঠেছেন। "জর্জ, তুমি বলছ এই কথা? যারা খাওয়া ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু বোঝে না— সেই জানোয়ারদের মুখেই একথা শোনা যায়। অথচ— তুমি? যারা অপরের গ্রাস কেড়ে খেতে অভ্যস্ত, তারাই খাওয়াটাকে জানোয়ারের কাজ মনে করে— যেহেতু তারা নিজেরাই জানোয়ার। এর জন্যে কত

রকম ফাঁদ যে তারা পাতে। ফাঁদ অথচ উপরে নানা আধ্যাত্মিক লেবাস চাপানো। ওদের বেঈমানি সহজে ঢাকা পড়ে তার নিচে।"

বার্নার্ড শ' প্রতিবাদ জানালেন না, মৃদু মৃদু হাসলেন মাত্র। মাইকেল তাই আরো রেগে যান। পরিস্থিতি খুব বিশদ লক্ষ করছিল মোয়াবক। সে নীরব কর্মী। মাইকেলের পিছুপিছুই ছিল সে। কারণ, বোতলিক আগ্রহ তার মোটেই কম নয়। কিন্তু বহুক্ষণ পরে মজলিস বেশ ইয়ারিভাবে জমে উঠেছে, এখন আর মোড় ফিরতে দেওয়া উচিত নয়। তাই সে হাসতে হাসতে মাইকেলের সামনে দাঁড়ালে।

"কী সংবাদ, বন্ধু?" মাইকেল মোয়াবকের কাঁধে এক হাত রাখেন।

মোয়াবক : আপনি শ' সম্পর্কে বোধ হয় সব খোঁজ রাখেন না। মাঝে মাঝে এমন ভোল পাল্টান। আমি আপনাকে একটা সংবাদ দিচ্ছি। অনেক দিন আগেকার কথা। জর্জ একবার মেক্সিকো বেড়াতে যান। আমিও সেই জাহাজে ছিলাম। জাহাজের নাম S. S. Arandara. অবিশ্যি তখন ত জানাশোনা ছিল না। জাহাজের ডাইনিং রুমে শ'র সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত একটা বুলেটিন দেখলাম।

মাইকেল : আচ্ছা।

মোয়াবক : কপাল ভালো ও-টা আমার পকেটে আছে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই নিন পড়ে দেখুন।

AMARBOI.COM

বুলেটিন

Mr. Bernard shaw does not eat meat, game, fowl or fish or take tea or coffee. Instead he will want undermentioned dishes at lunch and dinner. He will eat green vegetables, puddings, pastry etc. cheese and dessert like other people. He likes oranges and salads and nuts—especially walnuts.

For Breakfast : Oatmeal porridge or other cereals and always grape-fruit. For drink "instant possum."

Other meals : One of the following dishes at lunch and dinner.

(Haricot Beause May be plain boiled, with a sauce; dry, white), or curried or formed into cutlets.

(Butter Beans) (as above)

Lentils Macaroni And grotin : or with tomato, cheese or other sauce or curried.

Spaghetti (as above)

Welsh Rarebit

Yorkshire pudding

Rice Savoury : or Milanese (no ham) : or curried with haricots of egg or nuts or raisins etc.

Pease pudding

Egg (not too often) Curried : Cutlets : Mayonnaise Eshagusli: en Cocote a' la creme : Omelett etc.

Guocchi

Sweet corn

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Curried Chestnuts
Minced walnuts

Soups	Any thick vegetable soup as Lentil Haricot, Pea. (st. germain), Barley (creme d' orge) Rice (creme d' riz), Artichoke (palestine) Celery, Onion Tomato.

বুলেটিন পাঠ শেষে মোয়াবক এবং মাইকেল একে অপরের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে। মোয়াবক অবিশ্যি স্মিতদৃষ্টি। কিন্তু মধুসূদন ওদিকে বার্নার্ড শ'র পিঠে এক থাপ্পড় যোগেই বলে, "হে জর্জ, তোমার কাছে ত যে-কোনো মোগল নবাব খাওয়ার ব্যাপারে এক চিমটি নস্যি। অথচ তুমি খামাখা আমাদের চেতিয়ে তুলছিলে।"

শ' হঠাৎ পিঠে আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তা সামলিয়ে নিয়ে তিনি গুঁপো হাসি হাসতে থাকেন। ভাবটা, আমি অনেক কিছু, তোমরা কিছু বোঝ না।

রলাঁ ও অন্যান্য সকলে এই রঙ্গ-রস উপভোগ করছিলেন। রলাঁই মৃদু হেসে বললেন, "A nation without food is bound to be crude"। "যে দেশের ভাত নেই, সে দেশের জাত নেই।"

"They cannot have secure solitude either," যোগ দিলেন শ'।

"মন্দাকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ," আলাওল হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবৃত্তি করেন।

"হে মহামান্য কবি, এতক্ষণে আপনি কাছে এলেন," উচ্চারণ করলে জাইদুন। তারপর খিলখিল হাসি আরম্ভ হয় পটভূমি রূপে।

বিদ্যাসাগর তার মধ্যে ছেদ কাটলেন, "থাম গিন্নী। শেষে সর্বক্ষেত্রেই তোমাদের জয়। তোমরা নিজেরাই কাব্য। তাই আর কোন কবি তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে পারে?"

বিজয়িনী-মূর্তি জাইদুন। পেছনে পাষণ্ড এবং ফুয়া দাঁড়িয়েছিল। তারা কখন সরে গেছে, খেয়াল নেই। এই বাক্য-তোড়ে কিশোর বালক আর কতক্ষণ টিকবে। বিদ্যাসাগরের বলেই বল। এইবার জাইদুন তাঁর দিকে ষোলআনা দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, খাওয়ার ব্যাপারে আপনার কী মত?"

"গৃহিণী, সভয়ে না নির্ভয়ে বলব?"

বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বরে জাইদুন আবার হাস্যোৎফুল্ল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে ফেলে, "নির্ভয়ে।"

"মতামত আর কী বলব। তার চেয়ে একটা গল্প শোন। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে একবার একটা সমিতি বানিয়েছিলাম। নাম— Gastronomy গ্যাসট্রোনমি ক্লাব। নাম থেকেই বুঝতে পারছ, কামটা কী? খাওয়া, স্রেফ খাওয়া। আমরা সভ্য ছিলাম আট-দশ জন। কাজ হচ্ছে, অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে নেমন্তন্ন আদায় আর তারপর জোর ভুড়িভোজন। বরং বলতে পার ভুঁড়িবর্ধন। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলল। ভোজনের প্রতিযোগিতা বেড়ে গেল। এইভাবে কিছুদিন চলা মানে বোঝ— একজন ত পেটের অসুখে পড়ল। কিন্তু সে সভ্যপদ থেকে ইস্তফা দিতে নারাজ। অন্যান্য সদস্য বললে, না, ওকে আর সমিতিতে রাখা চলে না। একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভা বসল। সকলেই তাকে খারিজ করবে।

কিন্তু প্রতিবাদ করলাম আমি। বললাম, "না, তা হওয়া উচিত নয়। ওকে খারিজ করলে অধর্ম হবে। ও ত Martyr to the cause—মন্ত্র-সাধনে শহীদ।"

বিদ্যাসাগর আর বাক্য সমাপ্তির ফুরসৎ পান না। মজকুর সকলে হো হো শব্দে হেসে উঠল। রলাঁ হাসির চোটে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে তাঁর পিঠ মৃদু মৃদু থাপড়াতে লাগলেন। মাইকেল ত গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেয়ে অস্থির। সৈয়দ বোক্‌জার হাতে গ্লাস সঁপে তিনি বুকের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলেন। তবু মুখে নিঃশব্দ হাসি বিচ্ছুরিত রইল।

জাইদুন হেসে গড়িয়ে পড়ত এতক্ষণে, কিন্তু বেচারা নিরুপায়। তার হাতে আধেয়সহ গোটা ট্রে। বেশি রসময় হতে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। তাই পেট ফাটলেও সে ক্রমশ গাম্ভীর্য হেফ্‌জ করতে লাগল। অচিরে সে আর এক মূর্তি।

অনেকক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা, ব্যাপারটা হাজী মহসীনের চোখ এড়ায় নি। তিনি হাসি থামিয়ে এগিয়ে এলেন, সোজা জাইদুনের সামনে খাড়া। তারপর আদাবের ভঙ্গিতে একটু ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, "জনাবা, আমি কি আপনার কোনো খেদমতে আসতে পারি? আপাতত আপনার ভার-গ্রহণ করতে পারলে জীবন ধন্য মনে করতাম।"

"আমার ভার গ্রহণ করবেন। এ ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমার শওহর বেচারার অনুমতি নিন।" জাইদুন কপট গাম্ভীর্য বজায় রেখে জবাব দিলে।

হাজী সাহেব একটু থতমত খেয়ে যান। হঠাৎ স্বামী আমদানি কেন? পাষণ্ড এই সময় একদিক থেকে ছুটে আসে হাজী-উদ্ধারে।

"হাজী সাহেব, আপনি আমার এই ভাবী সাহেবাকে চেনেন না। কবি আলাওল এই নায়িকা মডেল পেলে আর পদ্মাবতীর পেছনে ছুটতেন না। আপনি কোন ভারের কথা বলেছেন? ওর ভার, না ট্রের?" প্রাণ-শশী তারপর একটু গলা খাঁকারিসহ যোগ করে, "তা পষ্ট করে বলুন।"

"ওঁর নয়, ট্রের।"

"তা আমি আপনাকে দেব না।" প্রতিবাদ জানায় জাইদুন।

"কেন?" জানতে চান হাজী মহসীন।

"যে বা যিনি আওরতের ভার নিতে পারেন না, তারা যে-কোনো ভার বহনের অযোগ্য। মনে রাখবেন, হাজী সাহেব আপনি চিরকুমার ছিলেন।"

"আমি ইনসানকে ভালবেসেছিলাম।"

"সে কথা রাখুন। এখন কিঞ্চিত আহারে মরজি হোক।" জাইদুন সুর নরম করে জবাব দিলে।

"আহারে আমার রুচি কম।"

পাল্টা দিলে জাইদুন, "যার আওরতে অরুচি, তার আহারেও অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয়।"

পাষণ্ড বেশ মজা দেখছিল। আর সকলের দৃষ্টি তখন এই নরনারীর ডুয়েলের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু সাহ্ কবি এবং সৈয়দ বোক্‌জা পানীয় ভাণ্ডারের কাছে চুপচাপ মৌতাতী সাধনায় মগ্ন ছিল। কান যে উভয়ের এদিকে পড়েছিল, তা বোঝা যায় যখন দেখা গেল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্লাস হাতে উভয়ে এখানে সামিল হল না শুধু, সাহ্ কবি আবৃত্তি করতে লাগল,

“যে করেছে কোনদিন অবলা-হরণ
সে জানে পৃথিবী শোভা বিচিত্র কেমন।”

কিন্তু সাহ্ কবি খারাপ আবৃত্তির রাজা। উচ্চারণে এমন গোলমাল থেকে যায় যে কথাগুলো কেউ ঠিক অনুধাবন করতে পারলে না। ওদিকে বহস অব্যাহত থাকে।

হাজী সাহেব বললেন, “গোটা ইনসানের মধ্যে কি নারীজাতি পড়ে না?”

“আপনার জবাব দেব, চলেন আগে নিজের বোঝা নিজে নামিয়ে রাখি।” কথাটুকু শেষ করে জাইদুন ট্রে নিয়ে মঞ্চের এক চত্বরের উপর রাখলে। সকলে সেখানে জড়ো হয়। তখন জাইদুন সম্রাজ্ঞীর মত সুললিত আদেশের আওয়াজ তোলে, “মাননীয় অতিথিগণ, আসুন, আমার আরো কাজ পড়ে আছে। আপাতত আমার মেহনতের এই ফসল কিছু রসনা-নির্ভর করুন। দাসী ধন্য হয়।”

সকলে রুচিমত আহার্য নিজের প্লেটে তুলে নিতে থাকেন। সাহ্ কবি ও সৈয়দ বোক্‌জা মনের দুঃখে বনে না গিয়ে একদিকে কেন জানি সরে পড়ল।

হাজী মহসীন এখনও মার ভুলতে পারেন নি, অনুমান করা যায়, একটা সিঙাড়া ও কিছু চাটনি নিতে নিতে তিনি বললেন, “বেগম সাহেবা, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।”

“আমি?”

“হ্যাঁ।”

“মাফ করবেন, হাজী সাহেব, আমি আবার বলছি, যার আওরতে অরুচি তার আহারেও অরুচি স্বাভাবিক।”

হাজী মহসীন সিঙাড়ায় ঈষৎ কামড় দিয়ে বিপদে পড়েছেন। জবাব দিতে পারেন না সহসা। একটু সামলে তিনি মুখ খোলেন, “বেগম সাহেবা, আপনি আমাকে বুঝতে পারেন নি। যখন জ্ঞান হল, দেখলাম, মানুষের দুঃখের ইতি নেই। আমার দেশবাসী এত গরিব, তারা কুকুরকে পর্যন্ত হিংসে করে। অহরহ এই জ্বালা আমাকে পাগল করে তুলল। মুসাফিরের মত কত দেশ ঘুরে বেড়ালাম মনের অস্থিরতা দূর করার জন্যে। ওই বিভীষিকা আমার কাছছাড়া হয় না কোনো মতে। তাই হজ্বে দৌড়ালাম যদি মন শান্ত হয়। কিছুতেই মনের ভার যায় না। শেষে পথ খুঁজে পেলাম। মানব-সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মন ফুকার দিয়ে উঠলে। আমি সেই পথ ধরলাম। ফলে আওরত-মরদ আমার কাছে এক হয়ে গেল।”

জাইদুন তখন একটা সিঙাড়া নিয়ে এক কোণা দাঁতে কাটতে কাটতে মহসীনের দিকে অপূর্ব এক চাউনি মেলে ধরে। হাজী সাহেব পর্যন্ত থমকে যান। হয়ত তাঁর মনে হয়, নারীসুধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে সারা জীবন ভুলই করেছেন। এই অস্বোয়াস্তি কাটিয়ে তুলতেই বোধ হয়, জাইদুন মুখ খোলে, “দুধের সাধ রাবড়িতে মেটে না, হাজী সাহেব, যদিও রাবড়ি দুধেরই নির্যাস। আপনি নিবৃত্তির পথ ধরলেন। তা বিবেককে চোখঠারা ছাড়া আর কিছু নয়।”

AMARBOI.COM

"তবে কি প্রবৃত্তির লেজ ধরে ছোটাই ভালো ছিল?"

"আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, জনাব। নিবৃত্তি আর যাই হোক পুণ্যের পথ নয়।"

"কে বলেছে?"

"আপাতত আমি বলছি। তা ছাড়া এখানে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে-ই আমার কথায় সায় দেবে।"

"নিবৃত্তিই পুণ্যের পথ।"

"ভুল, জনাব। প্রবৃত্তির সঙ্গে যদি নিবৃত্তিকে না মেলাতে পারেন, আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আপনি কি দেশবাসীর দুঃখ দূর করতে পেরেছিলেন?"

"কিছুটা ত পেরেছি।"

"অথচ আপনার ব্রত কী ছিল?"

"সকলের দুঃখ মুছানো।"

"তা পারেন নি! কেন?"

"একটা মানুষ কী করতে পারে?"

"তা হলে বুঝতে পারছেন সকলকে দরকার।"

"তা দরকার।"

"সকলে এল না কেন?"

"না এলে কী করা যাবে।"

"এই জন্যে দরকার এমন ব্যবস্থা যেন সকলকে আসতে হয়, সকলে আসতে বাধ্য থাকে।"

"সকলের আসার দরকার কী? যারা দান-খয়রাত করতে পারে শুধু তারা এলেই হল।"

জাইদুন তখন হো হো হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয় এবং তারপর বলে, "এখন নিজের ভুল বুঝতে পারছেন। আসলে আপনারা দারিদ্র্য পুষে রাখতে চান। আর তার জোরে দানবীর, দাতা ইত্যাদি নাম কেনার পক্ষপাতী। আপনারা আসলে মানবপ্রেমিক নন।"

"কী বলছেন, বেগম সাহেবা?"

সকলেই প্রায় নিজ নিজ আহারে কিঞ্চিত মগ্ন থাকলেও কান বহসের দিকে খোলা ছিল।

বার্নার্ড শ' এগিয়ে এলেন নিজের জায়গা ছেড়ে। গোঁফে একটু চাটনি লেগে গিয়েছিল তা মুছতে মুছতে, বহসীদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ফিলান্থ্রফি ইজ এ বাংকাম— Philanthrophy is a bunkum."

জাইদুন জোর পেয়ে এবার আরো সরব উচ্চারণ করলে, "আপনি দুঃখ-দারিদ্র্য যেমন দেখে গেছেন, জনাব মহসীন, তার চেয়ে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। কারণ, আপনাদের গোড়াটাই ছিল ভুল। দস্যুরাই এখনও দানবীর। প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে যে ভুল করেছিলেন, এখনও সেই ভুল থেকে গেছে। তার জের চলছে। কত দিন চলবে খোদা জানেন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহসীনের মুখে বিরাট কালো ছায়ার রেশ দেখে জাইদুন ব্যথিত। আবহাওয়া ফিরিয়ে ফেলতে সে চোখে এক নতুন মায়া আঁকে যেন, তারপর বললে, "জনাব, আপনারা সবাই বাক-নায়ক, আপনাদের সঙ্গ এক দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এখানে আমিও বাক্য ব্যয় করলে ওদিকে পোলাও কি অন্যান্য মজা ত আর পাবেন না। আমাকে বিদায় দিন।"

'পিলাউ,' এই শব্দ উচ্চারণ করে, বার্নার্ড শ' জিভে এক চটাস শব্দ তুললেন। তখন হাজির সকলের মুখে হাসি খেলে যায়। সেই সুযোগে জাইদুন মুখে কাপড়গোঁজা এক ধরনের হাসি তুলে ট্রে হাতে সরে পড়ে। ভঙ্গিটুকু দেখার মত।

জাইদুনের গমনপথের দিকে চেয়ে আলাওল নিজের মনে গুনগুন গেয়ে চলেন, "ননদিনী রস বিনোদিনী তোর কুবোল সহিতাম নারি।"

বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে মহসীনের কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলেন, "হাজী সাহেব, আমি বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য কত কাঠ-খড় পোড়ালাম। এ রমণী চিরকুমারের বিয়ে দিয়ে গেল নাকি?"

॥ ৪র্থ পালা ॥

AMARBOI.COM

তেছোদীন কোথায়?

সাহ্ কবির চোখেই ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়েছিল।

সৈয়দ বোক্‌জা বললে, "গেল কোথায়? তুই কিছু ওকে বলেছিস নাকি?"

পার্টিতে তেছোদীন এবং সাহ্ কবিতে আক্‌সার ঝগড়া বেধে যায়। বোক্‌জার তাই হেন প্রশ্ন।

জবাব দিলে সাহ্ কবি, "না। আজ আমরা এখানে কথা বলতে এসেছি নাকি? ওর সঙ্গে আমার আধখানা কথাও আজ হয় নি।"

পাষণ্ড, মোয়াবক এগিয়ে এল তদারকে। অন্যান্য অতিথিগণ অবিশ্যি জোড়া কোণ বা ত্রিকোণ আলাপে রত ছিলেন। তেছোদীনের জন্যে কার এত মাথাব্যথা।

সুতরাং খানাতালাসীর ভার তিন বন্ধুর উপরেই পড়ল। জুহা অন্দর-মহলে গেছে এখনও ফেরে নি।

অনেক গবেষণার পর প্রাণ-শশীর প্রস্তাব মেনে নেওয়া হল। আগে লন্ ঠিকমত দেখে নেওয়া যাক।

দুটো করবি গছের মধ্যে ত একটা লোক সেঁধিয়ে থাকতে পারে না। আর ফুলগাছগুলো ত ন্যাড়া-ন্যাড়া। তার মধ্যে মানুষের গুজরান অসম্ভব। আর কোথায় থাকতে পারে? কোথাও না। ব্যাটা পালিয়েছে। তাও অসম্ভব। তেছোদীন সুহৃদ ছাড়া স্বর্গেও যেতে রাজি নয়। অতএব খোঁজ, খোঁজ।

শেষে দেখা গেল, লনের উত্তর দিকে একটা কাঁঠাল গাছ আছে, তার গুঁড়ির উপর সটান লম্বা মিয়া সাহেব দেহ রক্ষা করছেন। দুই হাত দুই দিকে ছড়ানো।

পাষণ্ড হেঁকে উঠল, "ব্যাটা নেড়ে, পয়পয় বলি এত খাস নে। মদ কি সবাই হজম করতে পারে? কত মাননীয় অতিথির সামনে এখন কেত্তন হবে। ছিঃ ছিঃ।"

"চ্যাংদোলা ধর সবাই। ওকে একদম বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসি।" প্রস্তাব দিলে মোয়াবক।

"না, না। আমি মত দিতে পারব না", নাটকীয় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে সৈয়দ বোক্‌জা, "না না, বাপের একমাত্র নয়নের মণি, একমাত্র পুত্রধন।" বোক্‌জা শেষে রুমাল দিয়ে চোখ পর্যন্ত মুছলে।

আলোচ্য পদার্থটি এবার কিন্তু একটু নড়ল না, শুধু একদিকের হাত চটাস শব্দে বুকের উপর নিয়ে এল। তারপর রাঙা ঠোঁট নেড়ে নেড়ে আওড়ে যায় :

"আমি দুর্যোধন ভগ্ন উরু দ্বৈপায়ন তীরে
আর হাহাকার উঠবে না, কৌরব শিবিরে,
আর—"

এমন সময় মোয়াবক এক ধাক্কা দিলে তেছোদীনের গায়ে। সে আবার করোট ফিরে শুতে গেল।

চটে উঠল বোক্‌জা মোয়াবকের উপর, "আহা, বহু দিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে, আজ আবার শুরু করছিল, তুই সব মাটি করে দিলি।"

পাষণ্ড দু'জনের মাঝখানে থামের মত দাঁড়ালে, পাছে আবার এই দুই ষাঁড়ে না লড়াই বেধে যায়। একটা জবাই বলীবর্দ সামনে রেখে কি আবার দুই বলীবর্দের গুঁতোগুতি দেখতে হবে?

এই মাল এখন কোথায় খালাস করা যায়, তা নিয়ে অনেক তজ্‌বীজের পর ঠিক হল, একে মজলিসেই নিয়ে মঞ্চের একদিকে শুইয়ে রাখলে চলবে। একটা সমস্যা, কেলেঙ্কারির ভয়। তার ভার নিলে সৈয়দ বোক্‌জা। অভয় দিলে কেলেঙ্কারি ত হবেই না, বরং এক জম্‌জমাট ব্যাপার হবে, অতিথিরা টেরই পাবেন না।

তেছোদীনকে চ্যাংদোলা করে মঞ্চের নিকটে যখন আনা হল, অতিথিদের মধ্যে একটা উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়।

"ইজ হি আউট।"

"কি মাতাল নাকি?"

"অসুখ?"

"হঠাৎ—।"

চ্যাংদোলা তেছোদীনকে মঞ্চের উপর শুইয়ে সাদা চাদরে ঢেকে দেওয়া হল।

তারপর তার দিকে চেয়ে সৈয়দ বোক্‌জা অতিথিদের সম্বোধন করে বলে, "জগৎ-পূজ্যগণ, Lend me thy ears, আমাদের এই সাথী পরলোকগমন করেছেন— কিছুক্ষণের জন্য। তার আগে তিনি প্রস্তাব দিয়ে গেছেন, তিনি যেন মৃত সৈনিক। তাঁকে ঘিরে এক্সটেম্‌পোর গল্পের মত বা ক্ষণোক্ত গল্পের মত ক্ষণোক্ত নাটক অভিনীত হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনারা সকলেই পৃথিবীর সম্পদ। এ কাজ এমন কিছু কঠিন নয় আপনাদের জন্য। মাইকেল, শ' দুই জনেই নাট্যকার। মঁসিয়ে রলাঁও নাটক লিখেছেন। বিদ্যাসাগর Comedy of errors এর অনুবাদক। তা ছাড়া সাহিত্যের এমন দিকপাল আপনারা যে আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কাজ খুব অনায়াসেই সম্পন্ন করতে পারেন। নিজেকে কৃতার্থ মনে করব যদি আপনারা রাজি হন।"

"May I quote from my works?" জিজ্ঞেস করলেন জর্জ বার্নার্ড শ'।

"নিশ্চয় নিশ্চয়।"

"Then I am ready," শ'র জবাব।

হাজী মহসীন অবিশ্যি নাট্যকার নন। তিনিও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, "আমার জন্যে কোন খুঁৎ রাখবেন না মনে। এক চোরের সঙ্গে আমার একবার অভিনয় করতে হয়েছিল, আজ মহড়া ঠিক দিতে পারব।"

মঁসিয়ে রলাঁ প্রস্তাব দিলেন, তিনি পিয়ানোর সাহায্যে আবহসংগীত দিয়ে যাবেন। তখন শ'র উৎসাহ দেখার মত। এমন সুবর্ণ সুযোগ। জাঁ ক্রিস্তফের রচয়িতা যখন নিজে সংগীতসহ আসরে নামছেন তখন নাটক একটা কিছু না হয়ে যায় না।

রলাঁ পিয়ানোয় গিয়ে বসলেন। সব প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করেন না।

মাইকেল শরাবের গ্লাস হাতে নেশা ছলোছলো চোখে 'কৃষ্ণকুমারী'র আদল আবার অবলোকন করতে লাগলেন।

AMARBOI.COM

আয়োজন চলছে এদিকে। ঈশ্বরচন্দ্র এবং আলিওল ভাবছেন, দুনিয়ার সেরা রচয়িতাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে, কাজেই কোমর বাঁধতে হয়।

তখন খুব চুপিচুপি পাষণ্ড সাহু কবির কানে কানে বলে, "বোক্‌জা ত এক চাল চাললে। ওদিকে মৃত সৈনিক পড়ে আছে। ব্যাটা সত্যি মরে গেল না ত?"

"মরবে কেন?"

"পেগের পর পেগ যে হারে টানছিল, তা ত পেটে তেগ হয়ে ঢুকেছে। তাই ভাবনার কথা।"

"তুমি ভেবো না কিছুই। আমার সঙ্গে ঝগড়া না করে ও মরতেই পারে না। আজ কোন কথাই হয় নি ওর সঙ্গে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"অল রাইট, মাই লর্ড।"

একটা ছোট কুর্ণিশ মেরে প্রাণ-শশী একদিকে কেটে পড়ল। অনেক বুকের বোঝা নেমে গেছে, ভাবখানা এমনই।

মাইকেল এবার তাড়া দিলেন, "স্টেজের একটু অদল-বদল দরকার।"

"যথা—।" টীকা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের।

"চাঁদের আবছা আলো আছে, তার মধ্যে আমাদের ঘোরাফেরা মানানসই হবে। কারণ মৃত্যুকে ঘিরে আমাদের অভিনয়। কেবল লাশের উপর একটা লাইট থাকলে সব তোফা হয়ে যায়।"

কথা শেষ করে মাইকেল রলাঁর উদ্দেশে বলেন, "হে মঁসিয়ে, তুমি বিটোফেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফিউনারাল মার্চ' বাজিয়ে যাও।"

"Oui, বঁ বঁ।" ফরাসি মনীষী মৃদু হেসে খুব নিচু আওয়াজে পিয়ানো বাজিয়ে চলেন।

সৈয়দ বোক্‌জা, মোয়াবক, পাষণ্ড তিন জনে শশব্যস্ত মাইকেলের নির্দেশ পালনে লেগে গেল। একটা হাই পাওয়ারের বাল্‌ব তার জুড়ে আনলে এবং একদিকে লাগিয়ে দিলে। মৃত সৈনিকের উপর রাজ্যের আলো। চারদিক সেই তুলনায় সিলুয়েট।

মঞ্চ প্রস্তুত

এবার অভিনয় শুরু করলেই চলে। সুরের আবেশ রলাঁ এমন আগেই ছড়িয়ে বসে আছেন যে নাটক জমানো মুশকিল, এই ধারণা মনে আসা স্বাভাবিক।

সাহ্ কবি এই সময় বললে, "মি. শ', আমরা কি এই অভিনয়ে যোগ দিতে পারব?"

"By all means. নাট্যকারের সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ না ঘটলে আর ও ছাই-ভস্ম লিখে লাভ কী?" সঙ্গে সঙ্গে রসিক চূড়ামণি জবাব দিলেন।

সৈয়দ বোক্‌জার মুখে অবর্ণনীয় এক সুখানুবেশ দোল খেয়ে গেল। মোয়াবক তার চেয়ে খুশি। আলাওলের উপর তার একটা নাটক লেখার বাসনা বহু দিন থেকে। আজ অনুমতি সহজেই নিতে পারবে। এই আশায় তার মুখ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তা ছাড়া চাক্ষুষ তথ্য, কম কথা নয়।

হাজী মহসীন প্রস্তাব তুললেন, "এই নাটকের একটা নাম থাকা উচিত।"

কিছু কথা-কাটাকাটি শেষে শ'র নামকরণ সবাই মেনে নিলে, "ক্ষণোক্ত নাটক।" এই হল নতুন নাটকের নাম। আর ঠিক হল যেহেতু ক্ষণোক্ত বা এক্সটেম্‌পোর নাটক, মঞ্চে চরিত্রোদয়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকবে না। যখন যার খুশি মঞ্চে অবতীর্ণ হবে। শুধু দৃষ্টি থাকবে নাটক যেন এগিয়ে যায়। দক্ষ নাট্যকারদের তা বলে দিতে হয় না।

তারপর অভিনয় শুরু হয়ে গেল।

ক্ষণোক্ত নাটক

*

কুশীলবগণ : মৃত সৈনিক, শ', আলাওল, মাইকেল ইত্যাদি।

১ম দৃশ্য

মঞ্চে সাদা চাদরে ঢাকা সৈনিকের লাশ। শাদা বিজলি আলোয় ঝলমল। আশেপাশে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সবাই ঘোরাফেরা রত। রলাঁ এক মনে বিটোফেন বাজিয়ে চলেছেন। লাশের দিকে এগিয়ে এলেন মাইকেল। এখন বিজলি আলোয় তাঁর দাড়িশোভিত তেজোময় মুখ দেখা যায়॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকেল : যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শতধিক তারে।

শ' : আপনি দেখি জাতীয়তাবাদ, ন্যাশনালিজমের কথা শুরু করেছেন। তারই শিকার এই তরুণ যুবক। তার কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, সব বুলেটের মুখে নিভে গেল। কীসের জন্য এই তরুণের মৃত্যু? জন্মভূমির জন্যে? তা একটা ডাহা ঝুট্ ছাড়া আর কিছু নয়। জন্মভূমি? (ব্যঙ্গ) জন্মভূমি। জিজ্ঞেস করুন ওকে। হয়ত ওর এক কাঠা জমিনও ছিল না নিজের বলতে। তবু জন্মভূমি। হয়ত বেকারির জ্বালায়, ক্ষুধার্ত মা-বোন কি সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে সে সিপায়ের খাতায় নাম লিখিয়েছিল। Nine soldiers out of ten are born fools. দশ জন সিপায়ের মধ্যে নয় জন জন্ম-নাদান।

॥ কবি শ'র পেছনে এসে চাপাস্বরে ॥

সাহ্ : এ আপনার 'আর্মস্ এন্ড দি ম্যান' বই থেকে না?

শ' : (ঘাড় ঘুরাইয়া) ইয়েস। (আবার মাইকেলের দিকে) জাতীয়তাবাদের জন্ম ব্যক্তিতান্ত্রিকতা থেকে। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি সাম্রাজ্যবাদ। তার পরিণতি যুদ্ধ। মনে রাখবেন, মি. ডাট্।

AMARBOI.COM

মাইকেল : কিন্তু আমার জন্মভূমিকে ভালবাসব না?

শ' : কিন্তু অন্ধের মত নয়। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন লাগল, ইংরেজ জনসাধারণ ভাবলে, তার দেশের নেতারা ইংল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে। কিন্তু তারা যে নিজেদের শোষণের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে তা আর দেশবাসীকে বুঝিয়ে দেয় নি। জার্মান আর ইংরেজ দস্যুর স্বার্থের লড়াই বেধেছিল তা আর বুঝতে দেয় নি। মানবতা, স্বাধীনতার বুলির আড়ালে ছিল তাদের জঘন্য লালাসিক্ত লোভের লেলিহান জিহ্বা। তা মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দিতে উভয়ের প্রচার বিভাগ, রেডিও খুবই কার্যকরী হয়। অসহায় অশিক্ষিত সরল সাধারণ মানুষ কি তাদের অত ছল-চাতুরি বোঝে? নচেৎ যুদ্ধ কে চায়? ইরাস্মাস আমার বহু আগে লিখে গেছেন, "A small number, whose accursed happiness always depends upon the misfortune of common people, want war."

মাইকেল : সভ্য ইংরেজকে যখন দেখেছি এক এক করে আমার দেশ গ্রাস করতে, তখন সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ধরে গিয়েছিল।

শ' : তখন আপনার অস্ত্রগ্রহণ বা ধারণ উচিত। কিন্তু যখন লড়াই চোরে চোরে তখন চুপ থাকাই মঙ্গল। এই দস্যুদের পাল্লায় পড়ে কত তরুণ অকালে প্রাণ হারায়।

সাহ্ : (এক পাশ হইতে দুই জনের সম্মুখে দাঁড়ায়, তারপর আবৃত্তি করে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে পাঠাই বন্ধু সম্মুখ সমরে,
বীরবাহু, নালা খাল, কাঁটা গুল্ম-স্নান
শত ঝুঁকি গিরি খাদ মরুর ভিতরে,
তোমাকে পাঠাই যেথা ক্ষুধার্ত কামান।

গদীগর্ভ কেদারায়, মানচিত্র করে,
দেখি তব জয়চিহ্ন : সাবাস সাবাস!
অনেকেই জানি আর ফিরবে না ঘরে
নীরবে দোলাই স্মৃতি ব্র্যান্ডির গেলাস।

পীড়িত অনিশ্চয়তায় হৃদয় অস্থির।
টার্কি-রোস্ট মাঝে মাঝে অন্যমনা করে
কিছুই ভেবো না তুমি। বীমা কোম্পানির
যত চিন্তা। বড় শীত লেপের ভিতরে ॥

হত বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ সে মহীম্
হত হলে স্বর্গ পাবে জয়ী হলে ভুঞ্জিবে ভুবন,
সুদৃঢ় সংকল্প সহ করো, বন্ধু, রণ।

শ' : (কবির পিঠে মৃদু থাপ্পড় যোগে) সাবাস, ইয়ং ফ্রেন্ড, বন্ধু।

সাহ্ : আমাকে কি সম্মুখ সমরে পাঠাতে চান নাকি?

শ' : মিলিটারিজম... Militarism is fetish worship. It is the prostration of men's souls and the laceration of their bodies to appease an idol.

রলাঁ : (পিয়ানোর একটা ভ্যাম্প দিয়া— পরে নতুন সুরে গাহিতে থাকেন)
Kommt Lin krieg ins land
Gibt es Luegen wie sand.

বিদ্যা : মধু, কী গান গাইছেন? ভাষাটা যেন জর্মান জর্মান ঠেকে। অনুবাদ করে দাও না।

মধু : ইয়েস, ডিয়ার ভিড, জর্মান।

দেখ যখন যুদ্ধ-রত
তখন ঝুটের সংখ্যা
দেশে বালু আছে যত।

বিদ্যা : (হাততালি দিয়া) যা সত্যের বিরোধী, আমি তার বিরোধী, তাই যুদ্ধ বিরোধী। সব অশান্তির গোড়া এই যুদ্ধ।

মহসীন : আমি ভেতরে বাইরে শান্তি খুঁজেছিলাম। বাইরের অশান্তি দেখে শেষে ভেতরে তার সন্ধান করতে লাগলাম। কোনো রকম জোড়াতালি। শেষ পথ ধরলাম : মানবসেবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ' : কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়। বাইরের শান্তি ব্যতিরেকে ভেতরে শান্তি অসম্ভব।

মহসীন : মানুষ সেই পথ ধরে না কেন?

শ' : তা অত সহজ নয় ওদের বোঝানো। জীবন অনেক জটিল, মি. হাজী। ম্যাডাম জাইদুন ঠিক বলে গেলেন, একদম আমার কথা। আপনি ধার্মিক মানুষ, আপনাকে এসব বোঝানোও শক্ত।

মহসীন : কেন?

শ' : কেন? ধার্মিকদের মন হয় একরোখা। ওরা নিজেদের নাক বরাবর যা দেখে তার বেশি আর কিছু চোখে নিতে পারে না। এই জন্যে একই ধর্মের মধ্যে কত উপদল দেখেন না? নিছক শাস্ত্রের বুলি তাই এ যুগে অচল! কারণ, তার প্রয়োগ-ক্ষমতা কবেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। ধর্মের নামে অধর্মের খেলাই তাই এত বেশি। But religion, once the greatest social force, had become a thing as private and individual as the estate of the squire or the working clothes of the labourer.

মহসীন : আমি কি তবে ভুল করেছিলাম?

শ' : নট এ্যাট অল। আপনার আদর্শ সত্যিকার মানুষের গন্তব্য। কিন্তু আপনার পথ আজ অচল। দুনিয়ার এই চলমানতাটুকু যদি মানুষ বুঝত তা হলে দুনিয়ার মানুষ বিবর্তনের আরও এক উঁচু ধাপে উঠে যেত।

মাইকেল : জর্জ, আমি বহু দিন ভেবেছি, এই অমঙ্গল আসে কোথা থেকে? কেন মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর জানোয়ার জন্মায়, আর তারা হঠাৎ কত প্রাণ ঘরবাড়ি ধ্বংস করে চলে যায়?

শ' : ব্যাপারটা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য হয় না। সমাজের কলকব্জা ঠিকমত চালাতে না জানলে সমাজও তখন প্রকৃতির মত প্রতিশোধ নেয়। অজ্ঞতা থেকেই অমঙ্গলের সুখ-সুবিধা যখন সীমিত থাকে, তখন একদল লোক আবার এই অজ্ঞতা থেকেই মুনাফা ওঠায়। তাই তারা অজ্ঞতা শিকারী কুকুরের মত পুষে রাখতে চায়। তখন বাধে বিরোধ। অমঙ্গল ছাড়া আর কী? মানুষের তাই আর এক ধাপ বিবর্তনের প্রয়োজন আছে। এই পথেই তার মুক্তি। কিন্তু সংগ্রাম ব্যতিরেকে তার সুযোগ কোথায়? আমিও তাই ঘাবড়ে যাই।

মহসীন : পৃথিবীর রূপ এত পাল্টায়, আমার জানা ছিল না।

শ' : মি. হাজী, ধর্মের ক্ষেত্রে আরো মুশকিল। বিজ্ঞানে হয়ত একই সময়ে দুই থিয়োরি চালু থাকে, যত দিন তার চেয়ে ভালো তত্ত্ব না পাওয়া যায়। অর্থাৎ দুইয়ের ফসল ফলতে দেওয়া হয়, তারপর ফসল দেখে বিচার। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে তা হয় না। সেখানে এক জঙ্গলে এক বাঘ— এই নীতি চালু। ফলে, ধর্মের ক্ষেত্রে হিংস্রতা আরো ভয়ানকভাবে দেখা দেয়। কারণ সেখানে সহনশীলতার কোনো জায়গা নেই, যদিও কেতাবে থাকে। একটি

ধর্মের দুই সম্প্রদায়ের কোন্দল থেকে তা বুঝতে পারবেন। বার্থেলোমিউয়ের রাত্রির কথা মনে করুন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ হাজার প্রটেস্টান্টের প্রাণ চলে গেল। অথচ ধর্মের নামে।

মহসীন : আমি নিজে শিয়া। শিয়া-সুন্নীর হত্যাকাণ্ড থেকে তা আর আমার বুঝতে বাকি নেই।

শ' : তাই লড়াই ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। রোঁদা— ফরাসি ভাস্কর রোঁদা আমাকে ঠিক চিনেছিল। আমার যে মূর্তি সে গড়েছিল, শুধু পেশী-মাহাত্ম্য দেখিয়ে, তাই আমার সত্যিকার স্বরূপ।

॥ সৈয়দ বোক্‌জা এগিয়ে আসে মাথা ঝুঁকিয়ে ॥

বোক্‌জা : মি. শ'।

শ' : ইয়েস, মাই চাম্‌।

বোক্‌জা : সব জায়গায় শেভিয়ান কায়দা না খাটালে কি আপনার ঘুম হয় না? মাফ করবেন, যদি বেয়াদবি করে থাকি।

শ' : হোয়াট শেভিয়ান কায়দা?

বোক্‌জা : মাফ করবেন, এখানে আমরা কী করতে শুরু করেছিলাম?

শ' : ড্রামা।

বোক্‌জা : এখন কী চলছে?

শ' : কী চলছে?

বোক্‌জা : ডিবেট। আপনার সমস্ত নাটক যা। সেগুলো ড্রামা নয়, ডিবেট।

শ' : হোয়া, হোয়াট...?

বোক্‌জা : ড্রামা নয়, ডিবেট।

শ' : ননসেন্স।

বোক্‌জা : চটে যাবেন না। সত্যিকার শিল্পী জীবনকে বুদ্ধি আর সংবেদনশীলতা এই দুই হাত দিয়ে আলিঙ্গন করতে পারে। আপনি রসিকতার চোটে চটকদার বুদ্ধির খেল দেখিয়ে, ভাবলেন, দুনিয়া মাৎ করে ফেললেন। তা হয় না। আপনি আর যাই হন শেক্‌সপীয়ারের জুতো সাফ করারও যোগ্য নন। তাই আপনার নাটক ড্রামা শেষ পর্যন্ত ডিবেট ছাড়া আর কিছু নয়। আগেই বলেছি ভাঁড় সাজতে গিয়ে আপনি যাদের গাল দিলেন, তাদেরই দলে মিশে গেলেন।

শ' : হোয়াট নুইসেন্স। পড়েছ তুমি আমার 'সেন্ট জোন্,' 'এ্যান্ডড্রোকিলিস এন্ড দি লায়ন?' সেগুলো ডিবেট?

বোক্‌জা : ঝুড়ির এক কুড়ি ডিমের ঊনিশটা পচা। ঝুড়িটাকে আপনি কী বলবেন?

শ' : এই জন্যে তোমাদের বলে, হুজ্জতে বাঙ্গাল।

॥ জাইদুনের প্রবেশ। মুখের ভঙ্গি জানান দেয়, দেখি পাগলেরা কী করছে। মুচকি হাসি খানিকটা দেমাগে রঞ্জিত ॥

জাইদুন : মজলিস ত বেশ গরম দেখছি। বোক্‌জা ক' পেগ টেনেছ শুনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাষণ্ড : বৌদি, কেউ গনে নি। তবে কমসেকম দশ।

জাইদুন : তার পরেও এই ইংরেজ ঋষির সঙ্গে, তলওয়ার আক্কেল— আরে কি বলে সাহিত্যিকরা, শাণিত বুদ্ধি—

শ' : আমি ইংরেজও নই ঋষিও নই, মাডাম।

জাইদুন : মাফ করবেন (বোক্‌জার দিকে) এই শাণিতবুদ্ধি আইরিশ ঋষি তথা বাক্য-ফোড়নদাজ ইউরোপীয় বীরের সঙ্গে এখনও পাল্লা দিচ্ছ? মাই গড! তুমি পানি খাও না শরাব খাও, সৈয়দজাদা?

বোক্‌জা : দুই বিধাতার সৃষ্টি। মানে, পানি ত তিনি সৃষ্টি করেছেন। শরাবের উপাদান তাঁর দান। শরাব তৈরির আক্কেলও তাঁর দেওয়া। বিধাতার সকল সৃষ্টির প্রতি আমার আসক্তি সমান। তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নারী, সেখানেও আমার অনুরাগ কিছু কম দেখবেন না।

জাইদুন : বাজে কথা রাখ। কী নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা শুনি?

শ' : আমার ড্রামাগুলো নাকি ডিবেট।

জাইদুন : মি. শ', আমার এই দেবর একটু বাচাল বেশি। আপনি ড্রামা না ডিবেট লিখেছেন তা ওর দেখার কী দরকার। ভেক বা খোলস দেখে বিচার যুক্তির পর্যায়ে পড়ে না। এই ত আপনি দাড়িধারী আর হাজী সাহেব দাড়িহীন। তার মানে এই নয় যে আপনি মুসলমান আর মহসীন সাহেব অ-মুসলমান। আপনার উদ্দেশ্যই প্রথমে দেখা দরকার। য়ুরোপে আপনার মত সাহসী চিন্তাবিদ ক'টাই বা ছিল? আপনার রচনার বিচার সেই দিক থেকে প্রথমে হওয়া উচিত।

হাজী : মাফ করবেন কথার মধ্যে কথা। আমার যশোহর-নিবাসী এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। খুব সুন্দর গান করতেন। নাম ভোলানাথ সিংহ। আমি কখনও দাড়ি রাখি নি। কারণ, দেহের একটা অংশ দিয়ে কি গোটা মানুষের বিচার উচিত? তাও আবার নেহাৎ উপরের দিক। ভোলানাথকে সেকথা আমি বহুবার বলেছি। বেগম সাহেবার কথা সাচা কথা। এবার আপনাদের কথা চলুক।

বোক্‌জা : উদ্দেশ্যের উপর এত জোর দিলে আর আর্ট থাকে না।

জাইদুন : কোন স্কুলে পড়েছ?

বোক্‌জা : আর্ট উদ্দেশ্যহীন।

জাইদুন : তবে লেখক কেন লেখে? শিল্পী কেন আঁকে? কেন ভাস্কর মূর্তি গড়ে?

বোক্‌জা : কেউ জানে না। উদ্দেশ্যহীন।

জাইদুন : শোন বোক্‌জা। জানোয়ার যে উপজ্ঞার চালনায় চলে সেও উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু করতে পারে না। উদ্দেশ্যহীন কর্ম অসম্ভব।

বোক্‌জা : আমি যখন হাই তুলি তার পেছনে কী উদ্দেশ্য আছে?

জাইদুন : এখানে মোটিভ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ভিতর থেকে আছে। তোমার আরাম তার প্রমাণ। আরাম অর্থাৎ হাই-জাত আরাম। আচ্ছা বোক্‌জা, কাঁচুলি ঢাকা স্তন আর খোলা স্তনের তফাৎ বোঝ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোক্‌জা : মানে?

জাইদুন : অল্প বয়সে বিয়ে করেছ, এসব আর কী বুঝবে। শোন, ব্রেসিয়ার-ঢাকা স্তন তৃষ্ণা জাগায়। খোলা স্তন তৃষ্ণা মেটায়। শিল্প আর উদ্দেশ্যের সম্পর্ক স্তন আর কাঁচুলির সম্পর্ক। কিন্তু এখানে স্তন কোন সময়ে এককভাবে খোলা বা ঢাকা রাখা চলবে না।

শ' : ব্র্যাভো, ব্র্যাভো মাডাম। ইউ ডিজার্ভ এ হট kiss।

জাইদুন : ফ্রম এ ইয়ং অর ওল্ড ম্যান, স্যার?

॥ সকলে হাস্য ॥

শোনেন। আর বচসা নয়। আপনাদের আলোচনা শুনে আমি ভাবতেই পারি নি এখানে নাটক অভিনয় চলছিল। আসুন আবার নাটক হোক। আমিও অভিনয় করতে চাই।

শ' : By all means.

বোক্‌জা : কিন্তু এখানে ক্ষণোক্ত নাটক হচ্ছে।

জাইদুন : হোক না আমি কি পিছিয়ে পড়ে থাকব? বোক্‌জা, তোমার চেহারাটি সুন্দর। কিন্তু মেয়েমানুষ সম্বন্ধে তোমার আক্কেল আর ইহকালে হবে না।

শ' : ইয়েস, থ্যাংক ইউ ইয়ংম্যান। নো মোর ডিবেট। নাউ লেট আস্‌ বিগিন দি ড্রামা এ্যাফ্রেশ। নতুন শুরু করা যাক।

AMARBOI.COM

॥ প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

॥ তেছোদীন এখনও তেমনই লাশ। বাল্‌বের আলোয় সটান শায়িত। জাইদুন মঞ্চের উপর লুটিয়ে পড়ছে, দুই কনুয়ের উপর ভর, উন্নত-গ্রীবা, ঊর্ধ্বমুখী। চুল আলুথালু। যেন উন্মাদিনী। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্যাসাগর। বিষাদক্লিষ্ট অবয়ব ॥

জাইদুন : কঠিন প্রস্তর শয্যা, নিঃস্তব্ধ নির্বাক
সীসকের কয়েকটা কুঁচি, এই ধবল আস্তরণ,
হে প্রাণ দীর্ণ হও, হে আকাশ চূর্ণ হও,
রেখে যাও জিজ্ঞাসার দাবানল, দাও
শজারু নখর, পাথর-কাঠিন্য, জ্বালা
আরো জ্বালা, চিত্ত-মথিত পণ, জনপদ-প্লাবী
প্রাণবন্যা। প্রতিকার, প্রতিকারের ড্র্যাগন-নিঃশ্বাস।

(পিতার দিকে)

অনিষ্টকারীর অনিষ্ট সাধনের নেই কোন উপায়, পিতা?

বিদ্যা : চলো ঘরে ফিরে যাই, জননী-দুহিতা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরুক্ষেত্রে হাহাকার বৃথা। বর্বর সৈন্যদল
তোমার নারীত্বের কোন সম্মান রাখবে না,
মাগো, অজ জানে অজাচার। জন্তুর স্বভাব
লোভ আর অসত্যের মাধ্যমে অর্জিত, সহযোগী
তার যুগযুগান্তরের জ্ঞানৈশ্বর্য। চলো, ঘরে ফিরে যাই।

জাইদুন : না, না। জন্তুর মোকাবিলা হোক। কী হবে
সতীত্বের ধুয়া, প্রাণ যদি বিকাশের মূল
সহ উৎপাটিত, প্রিয়তম-হীন যদি হয় এ পৃথিবী,
বাঁচার অভীপ্সা কোথায়, জনক?

বিদ্যা : চলো ঘরে ফিরে যাই। এই রামরাজ্যে
মাংসপেশী রাজা, মস্তিষ্ক হুকুম-বরদার।
অন্যায় এ জিদ তোমার।

জাইদুন : সর্বস্ব পণ। তবু মোকাবিলা করে যেতে চাই।
হয়ত অসমান এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তবু
চিরধূমায়িত অস্তিত্ব অপেক্ষা মুহূর্ত দাহন শ্রেয়।
হোক অস্তিত্বের ক্ষয় বা নব-জন্ম। হোক মোকাবিলা।
পশুশালে দেখেছি জন্তু আজ তার পরিচয় চাই
অরণ্য-চত্বরে। শক্তি দাও, পিতা।

বিদ্যা : নিছক দুঃসাহস, মাতা। শিশ্ন আর উদরের সমাহার
এই সৈন্য-জন্তু দল।
এত পরিচিত বিপদের মুখোমুখি হওয়ার আবার বাসনা
শুধু মূর্খে সাজে।

জাইদুন : হত্যাকারীর রক্ত চাই, পিতা।

বিদ্যা : এত কি সহজ, জননী। দেহরক্ষী, কত ব্যূহঘেরা তাদের
জীবন কী দিয়ে স্পর্শ করবি তাদের?

জাইদুন : রেখে যাব প্রতিবাদ, প্রাণ বিনিময়ে।

বিদ্যা : মানুষের রাজ্যে তার কিছু দাম
হয়ত বা আছে। এখানে অধিকাংশ চতুষ্পদ।

জাইদুন : হত্যাকারীর মোকাবিলা হোক
আমার সবকিছু বিনিময়ে। পিতা, পিতা।

বিদ্যা : জিদ্দী জননী। তা-ই হোক। তার আগে
তোর এই সুন্দর মোহন মুখে
কিছু চুলিবালি চুনকালি লেপে দিই, যেন
জন্তুদের মাংসাশী দুই চোখ
লুব্ধতার সুযোগ না পায়।

জাইদুন : না, পিতা। স্বরূপে প্রকাশ, অন্যথায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরনির্মিত এই মুখ শঠ কি ভণ্ডের মত
পুনর্নির্মাণের দেখি না প্রয়োজন।

বিদ্যা : তাই হোক। তবু অনুরোধ, চল
ঘরে ফিরে যাই। এই রাজ্যে সেনাধ্যক্ষ
নিষ্ঠুর জল্লাদ, হিংস্র জীবের অধম।

॥ বেগে আলাওলের প্রবেশ ॥

আলাওল : আমি রাজ-আসোয়ার
মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন স্বর্গীয় জনক আমার।
কে তুমি ধৃষ্ট নর, ইতর জিহ্বায় করো
এই পরগণার অধিপতির এই নিন্দা, প্রতিবাদ।
শাস্তি জান, মূর্খ?

বিদ্যা : আমি এক ভাগ্যাহত, শোকসন্তপ্ত দীন প্রজা।

আলাওল : দীন প্রজা, জিহ্বা কিন্তু দীর্ঘ। মূর্খ,
শাস্তি জান, রাজ-নিন্দার? তোমার
ওই ইতর জিহ্বা এখনই কুকুরের ভোজ্যি হতে পারে,
নাদান জান না বুঝিবা তা?

বিদ্যা : জানি। (লাশের দিকে ইঙ্গিত)
কে ফিরিয়ে দেবে ওই হৃৎপিণ্ড আমার আবার?

আলাওল : মৃত: মৃতু, কিসে মৃত?

বিদ্যা : অজ্ঞতার ভান শঠের আননেই শোভা পায়।
জিজ্ঞাসো কীসে মৃত? এই নরঘাতী যুদ্ধের দাবানল
জ্বেলে, প্রজ্বলিত গৃহ শোকাচ্ছন্ন মাতাপিতাজায়া
দেখে, তোমাদেরই অজ্ঞতা সাজে।

আলাওল : মূর্খ, দেশের গৌরব, বংশের সৌরভ
এই সব স্বর্গীয় তরুণ।
বৃথা যায় না কভু মানুষের খুন।

বিদ্যা : আপনি মরলেন না কেন সেই গৌরব অর্জনে?

আলাওল : স্রষ্টার হুকুম।

॥ এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিল ॥

জাইদুন : স্রষ্টা যেন আমাদের সৃষ্টি
তোমাদের হুকুমমাফিক চলে
তোমাদের যশ বাড়ে, রাজ্য বাড়ে,
লুটের সম্পদে বিত্তবান
আমরা ডুবি অশ্রুর অতলে।

আলাওল : (সচকিত) কে তুমি?

জাইদুন : রমণী।

AMARBOI.COM

আলাওল : সুন্দরীও বটে।
জাইদুন : (সচিৎকার) মূর্খ নাদান, রাখ তোমার রসিকতা
লাশের সম্মুখে রসিকতা তোমাদেরই সাজে,
তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রসিক, বৈহাসিক।
লাশের সংখ্যা যত বাড়ে হাজার লক্ষ কোটি
তোমাদের রসিকতা তত বৃদ্ধি পায়।
নরাধম, চুপ করো।
আলাওল : মাণিক অধর দশন জনু হীরা
সেইখানে হেন কর্কশ কটুবাক্য, ধৃষ্ট নারী
তুমিও তোমার পিতার মত মূর্খ
বৃক্ষ গুণে ফল। শাস্তি জানো?
জাইদুন : যারা ভীরু, ভয়ের বেসাতি করে
তারাই বাইরে দুর্দম সাহস দেখায়।
অস্ত্র তোমার পৌরুষের শোভা নয়।
ভয় দেখিও না। হৃত-মনুষ্যত্ব তুমি
একদা মানুষ ছিলে, তাও বিস্মৃত। তোমার দম্ভ
মনুষ্যত্বের নয়, পাশবতার।
কী দেখাও ভয়? ওইখানে আমার জীবন শায়িত
চিরনিদ্রায়, আমার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত,
আমিও মৃত মৃতের সহিত। শুধু জন্তু দর্শনের জন্য
কণ্ঠটুকু রেখেছি অবশেষ।
আলাওল : বাকি অর্ধমাংস?
জাইদুন : যেই যোনি-জাত, যৌবনে আবার
সেই যোনি পানে ধায়, কারা জান?
আলাওল : শৃগাল, শূকর, কুক্কুর।
জাইদুন : তাদের গোত্র থেকে তোমাদের ব্যবধান কত দূর?
আলাওল : (গোস্বায়) খামুশ। তুমি নারী
নতুবা এখনই দণ্ড পেতে সমুচিত।
গর্দান থেকে শির লুটাত ধূলায়। তবে
শাস্তি তুমি এড়াতে পারবে না, আরো কঠিন তার রূপ,
আস্পর্ধার কত দাম বুঝবে তখন।
জাইদুন : জলের খড়্গো কিবা ভয়?
আলাওল : এক নিমেষে তেগ হরে প্রাণ
নিমেষে যন্ত্রণাও শেষ।
তোমার দণ্ড ধিকিধিকি তুষাগ্নির মত
রেখে যাবে অনির্বাণ দহন, পাঁজরে পাঁজরে জ্বালা

AMARBOI.COM

অহোরাত্র। মানস-কুঞ্জের তাপে চিরসিদ্ধ
বুঝবে ধৃষ্টতার সীমা আছে।

জাইদুন : বেহদ আনাড়ি, ওই শবের সঙ্গে আমিও শব
মৃতদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি ভাগাড়-চত্বরে
শিবা শকুন অথবা শিপাই— কী আসে যায়,
আজ আমি শঙ্কাহীন ত্রাস-মুক্ত উন্মাদিনী।

আলাওল : বৃদ্ধ, বিকৃতমস্তিষ্ক তোমার দুহিতা
ঘরে ফিরে যাও। ক্ষমা করলাম তোমাদের।

জাইদুন : মৃত্যুর খেসারৎ চাই। তারপর
ফিরে যাব ঘরে।

আলাওল : মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

॥ শ'র প্রবেশ। তাকে দেখিয়ে ॥

শুধাও চন্দ্রনাথ মন্দিরের
এই পুরোহিত জনে।

শ' : ওঁম তৎ সৎ।
ওঁম তৎ সৎ
কী প্রশ্ন বৎস?

আলাওল : মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

শ' : কোথায়?

আলাওল : মৃত্যুর জন্য, সকল মৃত্যুর জন্য।

শ' : স্থানভেদ কালভেদ আছে, পুত্র! শয্যা, সমুদ্র
মাঠঘাট, অপঘাত, বজ্রাঘাত, অনাহার, অতি-আহার,
ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিঝড়, পাদুকা-ভক্ষণ, ব্যাধি, অজ্ঞতা, মহামারী—
মৃত্যুর অসংখ্য রূপ।

আলাওল : দার্শনিক তথ্যের স্থান এই নয়,
সমরনিধন মৃত্যুর জন্য কে দায়ী?

শ' : রাজ্যাধিপতি বলেন—

জাইদুন : আপনি কী বলেন?

শ' : ওঁম তৎ সৎ
ফর দাইন ইজ দি কিংডম

আলাওল : কে দায়ী পুরোহিত প্রবর?

শ' : রাজ্যাধিপতি বলেন, আমিও বলি,
সব তার ইচ্ছা।

আলাওল : কার?

শ' : বিধাতার।

আলাওল : শোন, ধৃষ্ট নারী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাইদুন : পুরোহিত প্রধান, নিমক-হারামি ঘোর পাপ,
সে-পাপে পাপী নন, মহৎ আপনি। ধন্যবাদ।
জান্‌লাম পাকস্থলী পুণ্য-সঞ্চয়ের পুণ্য উৎস।
ধন্যবাদ।

॥ মাইকেলের প্রবেশ ॥

মাইকেল : কার সুমধুর বাণী এইমাত্র
কর্ণপটে ধায়?

আলাওল : এই রমণীর, ধৃষ্ট রমণীর।

মাইকেল : আমি বণিক চম্পক নগরীর
বাহিনীতে রসদ যোগাই।
বহু দিন হেন বাণী শুনি নাই।

আলাওল : যাও, নারী, এইবার ঘরে ফিরে যাও
নচেৎ নারকীয় শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হও।

মাইকেল : কী অপরাধ ওর?

আলাওল : বিদ্রোহিনী, অকথ্য-ভাষিণী।

মাইকেল : নারী, অবলা অবোধ ক্ষমা করো,
রাজ-আসোয়ার। নারী ছাড়া কে প্রসব করবে
বাহিনীতে সৈন্য তোমার? বহু জন মৃত।
বাহিনী-বহর যত বাড়ে, আমারি ভাগ্যলক্ষী তত সুপ্রসন্ন
ভুলো না সুহৃদ, রাজ আসোয়ার।

আলাওল : অথচ এই কাল-সমরের প্রাক্কালে
আপনার ঢ্যাঁড়াদার ঢোল শহরৎ
বলে গেছে : নিঃশেষে প্রাণ
যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

মাইকেল : সব ইচ্ছা বিধাতার।
আমরা নিমিত্ত। দূরদৃষ্টিহীন,
তাই অবস্থা পরিবেশের শিকার।

শ' : ওঁম তৎ সৎ
ফর দাইন ইজ দি কিংডম

বিদ্যা : চলো ঘরে যাই, জনন্নী দুহিতা।

জাইদুন : তাই হোক। মৃত্যুর স্বরূপ-দর্শন সমাপ্ত,
পিতা। এই পাঁজর দুমড়ে বসে থাকা
আর নয়। (দীর্ঘশ্বাস) বিদায়, প্রিয়তম। তোমার
নিঃসাড় অবয়বের ছবি যেন অহরহ
আমার দৃষ্টির প্রসার অনাবিল রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদায়, বিদায়, প্রিয়তম।

॥ বিদ্যাসাগর ও জাইদুনের প্রস্থান ॥

আলাওল : চম্পক নগরীর বণিক, সব মাটি করে দিলে,
আমার ভবিষ্যৎ উত্থানের একটি সোপান
ধ্বসে গেল। অশুভ উপস্থিতি তুমি।

মাইকেল : কী অপরাধ, রাজ-আসোয়ার?

আলাওল : এমন রমণী রতন সেনাপতি
উপহার পেলে, শয্যা-কর্দমে
প্রস্ফুটিত হত আমার সৌভাগ্য-পঙ্কজ।

মাইকেল : খেসারত দিতে প্রস্তুত অধম।

আলাওল : এই রমণী এসেছিল খেসারত নিতে
তুমি তার বিপরীত।

মাইকেল : ঋজু বক্র, সৎ অসৎ শ্বেত কৃষ্ণ
দুই হাতে কালের মন্দিরা বাজে।
কী বলেন, পুরোহিত প্রবর?

শ' : বিলক্ষণ সত্য। ইথে নাহিক সন্দেহ।

আলাওল : পুরোহিত প্রভু, কী উদ্দেশে
আপনার আগমন এই যুদ্ধক্ষেত্রে?

শ' : রাজ্যাধিপতির হুকুম, যারা
জন্মভূমির জন্য উৎসর্গ দিয়েছে প্রাণ;
তাদের আত্মার মঙ্গল হেতু
কিঞ্চিৎ প্রার্থনা।

আলাওল : পারিশ্রমিক কত, জানার বাসনা,
যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন।

শ' : রাজ-আজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা।

আলাওল : কোনও পার্থক্য নাই?

শ' : মূলতঃ নাই। দৃশ্যত আছে।

আলাওল : যথা—

শ' : একটি নীরব, অপরটি সরব।

আলাওল : কিছু টীকা প্রার্থনা।

শ' : একটি দৃশ্য, অপরটি অদৃশ্য।

আলাওল : ভূতপ্রেত নিশ্চয় চেনেন?

শ' : (হাস্য) বাল্যকাল থেকে।

আলাওল : দৃশ্যমান ভূত, অদৃশ্য ভূত
— এ দুয়ের মধ্যে কোনটি বেশি ভয়ঙ্কর?

শ' : অবশ্যই দৃশ্যমান ভূত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাওল : রাজ-আজ্ঞা, ঈশ্বর-আজ্ঞা
কোনটি পালনের দিকে মানুষের বেশি ঝোঁক?

শ' : অবশ্যই রাজ-আজ্ঞা।

আলাওল : হেতু?

শ' : একটির দণ্ড ঝোলে দূর ভবিষ্যতে
অপরটি সন্নিকট, মাথার উপর। বুদ্ধিমান নর
বোঝে তাহা।

আলাওল : ধার্মিক কী বুদ্ধিমান?

শ' : বলা মুশকিল। ধার্মিক—

আলাওল : অসোয়াস্তির কোন হেতু নাই, পুরোহিত প্রবর,
এখানে আমরা সবাই রাজকৃপার ছায়াপুষ্ট,
চম্পক নগরীর বণিক ঠিকাদারি প্রার্থী,
আমি পদোন্নতি, আপনি সুখময় দিনগুজরান,
সবই রাজার করুণা-নির্ভর।
অসোয়াস্তির হেতু কোথায়?

শ' : বুদ্ধিমান ধার্মিক কি না কথন কঠিন,
তবে মূর্খেরা ধার্মিক— ঘোষণা করা চলে, যেহেতু
বোঝে না তারা কী পার্থক্য দুই শ্রেণীর দণ্ডের ভিতর।

আলাওল : ধন্যবাদ, রাজগুরু। চম্পক নগরীর বণিক,
খেসারৎ সম্পর্কীয় বার্তা ধরে।
কী হেতু এই যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন?

মাইকেল : যুদ্ধক্ষেত্র উত্তম শস্যক্ষেত্র,
মানুষের রক্তে আর হাড়ে উর্বর,
আমার ইজারা চাই এই গোটা রণক্ষেত্র,
রাজগুরু, রাজ-আসোয়ার, সহায়তা-প্রার্থী,
এই জোড় কর।

শ' : উত্তম দূরদৃষ্টি, বৎস,
মঙ্গল হোক, ঈশ্বর সহায়।
ওঁম তৎ, ওঁম তৎ সৎ।

আলাওল : অবশ্য অবশ্য।
॥ খাঞ্চা ভরা ভাপ-ওড়া পোলাওসহ জাইদুনের প্রবেশ।
সঙ্গে জুহা, ফুয়া, ভৃত্য ইত্যাদি প্লেট ও অন্যান্য আহার্যসহ পেছনে ॥

জাইদুন : মাননীয় অতিথিগণ, মাফ করবেন। দি ডিনার ইজ রেডি।

শ' : দি বেস্ট ড্রামা অব দি ওয়ার্লড ইজ বিফোর আস,
উই মাস্ট স্টপ নাউ। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নাটক সামনে।
এই নাটক বন্ধ করা উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যা : হোয়াট ইজ দি বেস্ট ড্রামা? শ্রেষ্ঠ নাটক কী?
শ' : ফুড, ফুড (আরো জোরে) ফুড, খাদ্য খাদ্য, মাই ডিয়ার স্যার।
বিদ্যা : নিশ্চয়, নিশ্চয়।
মাইকেল : (মঞ্চ ত্যাগের সময়) নিশ্চয়, নিশ্চয়। সব নাটকের গোড়া খাদ্য, খাদ্য। হে জর্জ, কাম অন। মঁসিয়ে রোলাঁ, প্লিজ লিভ দি পিয়ানো।

* * *

সৈয়দ বোক্‌জা 'ধ্যুৎ' শব্দে প্রায় চিৎকার দিয়ে ওঠে আর কি, "আহা, নাটক জমে উঠেছিল, এমন সময় সব মাটি হয়ে গেল। এদের আমরা রোজ পাচ্ছি নাকি?"

"চটো না বাছাধন, ক'টা বেজেছে সে খেয়াল আছে? ভাসছ ত পানির উপর", মোয়াবক ফোড়ন দিলে ঈষৎ বিরক্তির ঝাঁঝসহ।

* .

ওদিকে তেছোদীন তখন চাদর ঠেলে আড়মোড়া দিয়ে উঠছে দেখে মজলিসে একটু চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়।

মোয়াবক, পাষণ্ড, বোক্‌জা, সাহ্‌ কবি সবাই ধেয়ে আসে। তেছোদীন তখন পায়ের উপর খাড়া, মুখ সরব : টু বি অর নট টু বি। আউড়ে চলে।

সাহ্‌ কবি তাকে বুকে জড়িয়ে শুধায়, "কেমন ছিলে পরলোকে, বন্ধু?"

"ইহকালে অনেক আগে ফিরে আসতে চেয়েছিলাম। দেখা গেল নাটক চলছে। ওদিকে ক্ষিদেও লেগেছে বেজায়। কোন দিকে যাই। টু বি অর নট টু বি।...চলো, বাজে কথা রাখ। পোলাওয়ের বাসে জান যাচ্ছে।" আলিঙ্গন ছাড়িয়ে তেছোদীন সোজা শ'র কাছে হাজির হয় আর বলে, "স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমাকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।"

শ' পোলাও উঠিয়ে নিচ্ছিলেন খাঞ্চা থেকে, তা থামিয়ে জবাব দেন, "দুনিয়া-কে আমি ক্ষুধা আর ঈশ্বরের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মূর্খ পৃথিবী আমার কথা শুনলে কই।"

"আপাতত আমি ত ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচলাম। ধন্যবাদ।"

তেছোদীন 'বাউ' করে সরে গেল। সকলেই একে একে আহার্যে মত্ত হয়ে পড়ে। ফলের গন্ধ, অতি উত্তম ঘিয়ের সুবাস, নানা ব্যঞ্জনের সৌরভ চারদিকে আমোদিত, উৎফুল্ল করে তুলছিল। প্রথম কয়েক মিনিট কারো মুখে কথা নেই। জাইদুনের দক্ষতার পরিচয় এখানে স্পষ্ট।

চত্বরে এইভাবে সবাই বসেছেন। শ' একটু উপরে। তার এক ধাপ নিচে রোলাঁ, পাশে মধুসূদন। কাছেই হাজী মহসীন। বিদ্যাসাগর, শ'র সোজাসুজি আর একদিকে। তার পাশে আলাওল। অন্যান্যেরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে। বোক্‌জা এবং মোয়াবক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে, আর কী যেন গুজ্‌ গুজ্‌ করছে। এটা ওদের বহু দিনের অভ্যেস।

মাইকেল হঠাৎ এই ঈষৎ ঝিমানো ভাব কাটিয়ে তুললেন এক হাঁক দিয়ে, "একটা বড় হুইস্কি, প্লিজ।"

সাহ্‌ কবি এবং তেছোদীনের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেল, কে এই হুকুম আগে তামিল করবে। দু' জনেই থালা ফেলে যেখানে শরাব ভাণ্ডার মজুদ সেদিকে দৌড় মারলে। রফা হল সহজেই। সাহ্‌ কবি ধরেছে গ্লাস, তেছোদীন বোতল। হয়ত এখনই একটা কিছু বেধে না যায়। কিন্তু আজ দু' জনেই সুশীল বালক। সাহ্‌ কবি মাইকেলের সামনে গ্লাস রাখলে। তেছোদীন পানীয় ঢালতে লাগল। তার হাত ঈষৎ কাঁপে।

অভয় দিলেন মাইকেল, "সাকী, ঢেলে যাও। এক আধ পেগ এদিক ওদিক হলে, মধু শুয়ে পড়বে না।"

তেছোদীন ভাবে, ঠেসটা তার উপর দিয়ে গেল নাকি কে জানে। সামান্য শরমের লালিমা তার লাল মুখ আরো রক্তিম করে তুলল। তারপর কোন রকমে নিজের জায়গায় এসে সে খাওয়ায় মন দিলে। সাহ্‌ কবির মেজাজ খাটা বা টক, মেহমানদারির এমন সুযোগ শেষে এই চুর-মাতাল ট্যারা চোখটা নিয়ে গেল।

জাইদুন মজলিসে নেই। এতক্ষণে ধরা পড়ল প্রাণ-শশীর চোখে। কিন্তু অন্দর মহল থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড বেজে উঠতেই সে বুঝল, দ্রৌপদী কেন সরে গেছে। সঙ্গীত ছাড়া কি আহার জমে?

নেপথ্যে গানের আওয়াজ ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। রাত্রির মাদকতা আরো উছলে ওঠে। মৃদুতালে বেজে যায় :

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ-গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর।
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করে লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।

মাইকেলকে রোলাঁ মৃদুভাষে কী যেন বললেন। প্লেটে হাত, আহার একটু স্থগিত।

গানের সুরে রোলাঁ তন্ময়, মাইকেলের জবাবে মাথা নাড়েন আর তার কথা শুনে যান। ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া।

হঠাৎ রোলাঁ বেশ জোরেই বলে ওঠেন, "সত্যি সত্যি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইয়েস ইট ইজ ফ্রম টাগোর।"

"ওয়ান্ডারফুল...মাই ফ্রেন্ড টাগোর?"

"ইয়েস, ইয়েস।" মাইকেল গ্লাসে চুমুক মারার আগে জবাব দিলেন।

রোলাঁর অনুরোধ এই গান যেন বার বার রেকর্ডে বাদিত হয়। আর অন্য গানের প্রয়োজন নেই। মাইকেল ইতোমধ্যে বোধহয় সব কথা তর্জমা করে দিয়েছিলেন। তারই ফল।

প্রাণ-শশী ছুটল ভেতরে খবর দিতে। সাহ্ কবির কথায় জড়িমা শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং সে আর কোথাও খুব সহজ সচল মাল নয়।

বিদ্যাসাগর একটা চাটনির এমন ভক্ত হয়ে উঠলেন যে গৃহকর্ত্রীকে এখনই সাধুবাদ না দিলে তাঁর চলছে না।

অকুস্থলে আবার জাইদুন হাজির। তার ধনে পাতার চাটনি ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ করতে চলল।

বিদ্যাসাগর আর আহার-নিমগ্ন নন। জোয়ার গেছে, এখন ভাটার টানে। কিন্তু এখনও চড়া পড়তে বহুৎ দেরি আস্ত। জাইদুন আদাব দিয়ে সামনে দাঁড়ানো মাত্র বিদ্যাসাগর নিজের প্লেট চত্বরের উপর রেখে বাম হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "গৃহিনী সচিব সখি, তুমি নিজে যে একটি চাটনি বিশেষ সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো।"

"মাননীয় মহাশয়, আপনি যে গ্যাসট্রনমি ক্লাব করেছিলেন, তাতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু আপনার এই আদর্শে সন্দেহ জাগায় বিধবা-বিবাহ প্রচলন আপনি করেছিলেন কি না।" বড় সপ্রতিভ জাইদুন তড়িঘড়ি জবাব দিলে।

"কেন, কেন?" বিদ্যাসাগর কিছুটা অসোয়াস্তির পরিচয় আশেপাশে ছড়িয়ে রাখেন।

"যদি ধরে নেওয়া হয় নারী চাটনি বিশেষ, তা হলে একবার আস্বাদিত চাটনিকে আবার পরের জিভে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন কোথায়? স্বাস্থ্যের দিকও ত দেখা উচিত।"

"ও গৃহিনী, তোমার সঙ্গে এখানে কেউ কথায় পারবে না, আমি সার্টিফিকেট দিতে পারি। ওই আইরিশ জর্জ বসে আছে, ও পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে সবক নিতে পারে। বাজে কথা থাক। তোমার চাটনি সত্যি চমৎকার— অমৃত, অমৃত।"

"অশেষ ধন্যবাদ, পূজ্যজন। কিন্তু আমি আপনাদের মনমত আপ্যায়ন করতে পারলাম না। তার জন্যে আমার দুঃখ কত আপনাদের জানাতে পারব না।" জাইদুনের গলা সত্যি ধরা-ধরা।

বিস্মিত বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য অতিথিগণ। গৃহকর্ত্রীর মনোবিনোদনে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে আসেন, "কী যে বল, তুমি? কত রকম খাবার পরিবেশন করেছ। তার পর এই বিনয় কেন? তুমি মুসলমানের মেয়ে, বৈষ্ণব নও।"

"শাক দিয়ে মাছ চাপা দেওয়া লেখক বা শিল্পী মাত্রেরই অভ্যেস। নচেৎ আর্ট ক্ষুণ্ন হয়। আপনি আর তা চেষ্টা পাবেন না, মাননীয় অতিথি। আমরা সত্যিই দরিদ্র। আরো ক্রমশ দরিদ্র হতে চলেছি। কারণ, জিনিসের দাম আমাদের সঙ্গে দৌড়ের বাজি ধরে সর্বদা এগিয়ে চলেছে ত চলেছেই। পেট যত ছোট করি সন্যাসীদের মত, উনি ততই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধেয়ে চলেন। ফলে, অতিথিদের কাছে একটু হাত দেখিয়ে নাম নেব আর তার উপায় নেই। আপনাদের লেখার হাত আছে সেই হাত দেখিয়ে আপনাদের পরিতৃপ্তি, আমাদের সেই হাত দেখানোর সুযোগ নেই। গৃহিনীদের আর রইল কী? আমার আদিখ্যেতা আপনি বিনয় ঠাউরে ভুল করবেন না। জিনিসের দাম যত বাড়ে আমাদের দাম তত কমে।" জাইদুন এত দ্রুত কথাগুলো বলে যে সে হাঁপাতে লাগল।

"সত্যি তাই নাকি?"

সাহ্ কবি একদিকে তখন মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছিল, সে তা ফেলে নিজের ঠ্যাং নিয়ে বিদ্যাসাগরের সামনে এসে জবাব দিলে, "পূজ্যপদ, এই নিয়ে আমার একটা ছোট কবিতা লেখা আছে শুনুন। কোন অতিরঞ্জন নেই। গৃহিণী কেন, অপরের কথাও শুনুন।"

সাহ্ কবি পকেট থেকে চিরকুট বের করল। চাপা স্বরে তখন মোয়াবক বোক্‌জাকে বলে, "জিভ ত হোচট খাচ্ছে সেই রাত বারটা থেকে, সাত পেগের পর। দ্যাখো কী কেলেঙ্কারি না করে বসে।"

"এই সব গণ্যমান্য লোকেদের ভিড়ে—"

"দেখা যাক। না হলে সামলে নেবার একটা উপায় বের করতে হবে। ওটা আমারই কাজ। রাত চৌদ্দটায় সবাইকে বিবির কাছে পৌছে দেওয়ার ভার আমার ত বাঁধা চাকরি।"

সাহ্ কবি ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করে দিয়েছে :

জিনিসের দাম বাড়ে মানুষের দাম কমে
আস্কারা পায় চারিদিকে চোর আর যমে।
এই জীবনের যত স্বাদ ক্রমে হয় ফিকে
সিংহের আসন পায় ভেড়া, ফেরু, চামচিকে
ফুটন্ত কড়ার মধ্যে গন্ধ পচা পানি যত
ঊর্ধ্বে সর্বেসর্বা, শুদ্ধ পানি তলায় আহত।
দাম লোকে বলে দ্রব্যমূল্য, দ্রব্যগুণও বটে
স্বর্ণ হয় লৌহ-দর, লৌহ স্বর্ণ নামে রটে।
গৃহিনীর হস্ত খর্ব, ছোট, ক্রমে ক্রমে ঠুটো
দড়ি ছোট হয় ওদিকেতে শক্ত কিন্তু খুঁটো।
আজব আজব ভাই এই দরের প্রতাপ
উচ্চে তোলে আছাড়ে পাহাড়ে হেন কাল-সাপ

জিনিসের মূল্য কমে বাড়ে মানুষের দাম
যোগ্য ব্যক্তি পায় তবে যথাযোগ্য স্থান।

পাঠ শেষ মাত্র জাইদুন হাততালি দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে। সাহ্ কবি পড়েছিল চমৎকার। এতটুকু জড়তা কোথাও দেখা যায় নি। মোয়াবক এবং বোক্‌জা অবিশ্যি তৈরি ছিল যদি বন্ধু-উদ্ধার প্রয়োজন হয়।

মঁসিয়ে রোলাঁ বোঝা যায়, স্বল্পাহারী। তিনি সকলের আগে আহার ছেড়ে গিয়ে

AMARBOI.COM

বসেন পিয়ানোয় এবং রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতে লাগলেন খুব মৃদু স্বরে। কারণ, সুর ত জানা নেই। ধীরে ধীরে রপ্ত করতে হচ্ছে।

জাইদুন অনুমতি নিয়ে ফিরে গেছে নিজের রাজ্যে। পরে সকলে কফি খাবেন। তার ইন্তেজাম তাকেই করতে হবে। জুহা, জাইদুনের ভাষায়, এক বাচ্চা পয়দা করা ছাড়া আর সাংসারিক কোন কাজ জানে না। সুতরাং সব হাল তাকেই ধরতে হয়।

ভোজন-পর্ব কতকটা নিঃশব্দে হল বলা চলে। যদিও সকলে ভোজন সম্পর্কে অনুরাগী, কিন্তু বেশিক্ষণ গেল না আর। সবশেষে উঠলেন বিদ্যাসাগর। একটা কৈফিয়ৎ দিলেন : ব্রাহ্মণ সন্তান ভজন অপেক্ষা ভোজনে বেশি দড়। কিন্তু তা কেউ গায়ে মেখে নিলে না।

বার্নার্ড শ' কেবল এক লিমারিক আউড়ালেন :

ইউ এন্ড ইউর কুক্
শুড হ্যাভ এ লুক্
ইনটু মাই বুক।

এই লিমারিকও মাঠে মারা গেল।

আলাওল বেশ তরীবতের সঙ্গে চত্বরের গায়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই রজনী-সুধা তার অঙ্গে সুদূরের স্পর্শ বুলিয়ে গেছে। তিনি যেন আর কথা বলতে নারাজ। চোখ বুঁজে নেপথ্য-সঙ্গীতে মৃদু তাল দিতে লাগলেন যেন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

মধুসূদন খাওয়ার পর একটু পায়চারি করতে লাগলেন লনের উপর সৈয়দ বোক্‌জার কাঁধের উপর হাত রেখে। তার আগে তিনি শ'র কাছে, তথা গোটা মজলিসের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে গেছেন। আহারের পর এই তাঁর অভ্যেস। লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে তিনি সব সময় এই রুটিন বহাল রেখেছিলেন।

হাজী মহসীন একান্তই নীরব। ইমামবাড়ার কথা একবার মনে ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল, হয়ত সেই খোয়াবে বুঁদ আছেন।

এক কথায় মজলিস ঝিমিয়ে পড়েছে। তেছোদীন ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি, কিন্তু সাধনা করছে বার বার মাথা তুলে নিজেকে সজাগ রাখতে। সাহ্ কবির মুখ এবার সত্যিই অচল। তবু একবার মুখ খুলতে গেলে মোয়াবক তা চাপা দিয়ে ধরলে। ভেতরে ধস্তাধস্তি চলছে, বোঝা গেল, যখন সে রুষ্ট দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালে।

সৈয়দ বোক্‌জা এবং মাইকেল আবার শরাব-ভাঁড়ারের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ব্রান্ডি পান শুরু হয়েছে। মোয়াবক আর স্থির থাকতে পারে না। সেও গিয়ে জুটল। তেছোদীন অর্ধনিমীলিত নয়নে দেখামাত্র, হিংসুটের মত যথাস্থানে পৌছল। সাহ্ কবি ভাবলে, এবার যদি ভিজে গিয়ে, বেয়াড়া ঠোঁট আবার সচল হয়।

এখন মাইকেল সকলের সাকী। তিনিই পরিবেশন করতে লেগে গেছেন। বিদ্যাসাগর একটু খোঁয়ারির কোলে ঢুলেছেন। তবু মধুর কাণ্ড দেখে না মুচকি হেসে পারলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ বোক্‌জা হঠাৎ খুব ভাব-প্রবণ গলায় বলে উঠল, “মাননীয় মাইকেল, আজ সত্যিই আপনি আমাদের নিরবধি সুধা দান করে গেলেন।”

“বাচাল বন্ধু, কথা বলো না। সুধা নীরবে পান করতে হয়।” তারপর তিনি সাহ্ কবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, “দ্যাখো, ও কথা বলছে না, সুধা পান করছে।”

মোয়াবক তখন হাসতে গিয়ে বিষম খায় আর কি। কথা না-বলার রহস্য ত সে-ই ভালো করে জানে।

কিছুক্ষণ পরে কিন্তু জাইদুন কফি নিয়ে আসতে সকলেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। সুড়সুড় সকলে এমন কি মাইকেলও গৃহকর্ত্রীকে ঘিরে দাঁড়ালেন। তিনিই প্রথমে আবার মজলিসের ঢিমে ভাব কাটিয়ে তুললেন এক হাঁকে, “মঁসিয়ে রোলাঁ, আসুন বাজনা থামিয়ে। কফি খেয়ে নিন। দেশী বাজনা ত এরা রোজ শোনে! কফিপানের পরে আপনি আমাদের শোপ্যাঁর নৈশ-সংগীত পরিবেশন করবেন।”

উঠে এলেন রোলাঁ; কিন্তু বেশিক্ষণ থাকার জন্যে নয়। জাইদুন কফি বানিয়ে দেওয়া মাত্র তিনি নিজের পেয়ালাসহ আবার পিয়ানোর টুলে গিয়ে বসলেন। কয়েক চুমুকে কফি শেষ। আবার তিনি শোপ্যাঁ বাজাতে শুরু করলেন।

আর কোন কথা হয় না।

কত রাত্রি?

কে তার পরিমাপ করবে?

সঙ্গীতনিমগ্ন ধরিত্রীর কাছে স্বয়ং মহাকাল রেহেনী খৎ লিখে দিয়ে উধাও। অতিথিরা বুঁদ। সকল নেশার পরপারে এক স্বয়ম্ভু চেতনার অধিকারী। লহরির পর লহরিতে সুরের ঝর্নাজাল ছড়িয়ে পড়ছে। চাঁদের আলো থমকে গেছে অনেকক্ষণ। গগনে নক্ষত্ররাজি স্তব্ধতার সাধনায় মূর্ছিত। এই নৈশরাগে তন্দ্রা-বিলোল ঝিরিঝিরি পিচকারি সিঞ্চনের মত শুরু হয়, তারপর রক্তের শিকড় ধরে টান দেয় যেন আত্মার সমস্ত দল এই সুড়সুড়ির সোহাগে অবশ হয়ে আসে ধীরে ধীরে যখন চোখের পাতায় ঘুম স্নিগ্ধ-চরণ অনিশ্চয়তার দর্পণ খোঁজে গোটা পৃথিবীকে প্রতিফলিত দেখার অহেতুক বাসনায়। তোমার অস্তিত্ব চিরন্তনতার স্বরূপ সেজে অমৃতের পাত্র আছড়ে ফেলে দেয়, সকল-আকার নাদকুসুমের সৌরভ-বিহারে। কর্ণপট তখন বিশ্বপট। সবই সেখানে অঙ্কিত, শুধু ছুঁয়ে যাও। নেশায় জঙ্গম চোখ খোলার প্রয়োজন কী? উপলব্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। তাই ত আকাশ উপুড় হয়ে আছে মর্তের স্পন্দনে কান পেতে দিতে।

কখন মসিয়ে রোলাঁ থেমেছিলেন কেউ বলতে পারবে না। সহজে আত্মস্থ হওয়ার প্রশ্ন ছিল বৈকি।

ঝাঁকুনি দিলেন রোলাঁ, “Ich habe genug, Bruder : rette dich” আমার তৃষ্ণা মিটছে, ভ্রাতৃ : এবার আপনারা নিজেদের রক্ষা করুন।”

সরে এসে তেহাই মারলেন আলাওল, “বন্ধুগণ, আদম সুরাৎ দিগন্তের কোণে, শুকতারা কখন উঠে গেছে। এবার আমাদের বিদায়ের পালা। আর বেশি দেরি করা চলে না।”

— তাই ত। বললেন বিদ্যাসাগর।

AMARBOI.COM

মদুসূদন আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন। তখন সৈয়দ বোক্‌জা প্রস্তাব করে, "মাননীয় অতিথিগণ, আপনাদের ধরে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। যাওয়ার আগে তাই একসঙ্গে আপনাদের কিছু স্বাস্থ্য-কামনার অনুমতি চাই।"

টোস্টের প্রস্তাবমাত্র শ' জোরে উচ্চারণ করলেন, "By all means."

"অবশ্যই অবশ্য"। মাইকেলের সায়।

সৈয়দ বোক্‌জা এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এল। নেপথ্যে আবার 'সুন্দর হে সুন্দর' গানটা সরব। জাইদুন গ্লাস আনার জন্য ঘরে গিয়েছিল।

মাইকেল অনুরোধ করেন, "ডিয়ার ভিড্‌, এবার তোমায় ছাড়ব না। শ্যাম্পেন কোন মদ নয়।"

"মধু, তুমি নাছোড়বান্দা, বেশ রাজি।"

সন্ধ্যায় যারা লেবু পানি খেয়েছিলেন, তারা এখন কেউ শ্যাম্পেনে অরুচি দেখলেন না। একেই বলে সঙ্গদোষ।

সবাই পানপাত্র হাতে দাঁড়িয়েছে। সৈয়দ বোক্‌জা সাকী। সাহ্ কবি বিদায়ের আঘাতে চঞ্চল। এতক্ষণ হাজার চেষ্টায় যে জিভ বাগে আসে নি, তা রীতিমত সচল। তেছোদীন আবার বিনিদ্র কুম্ভকর্ণ। মোয়াবক ভোরের হাওয়ায় এতক্ষণে একটু গোলাপি মৌতাত উপভোগ-রত। এমন-কি এ বাড়ির কিশোর ফুয়া পর্যন্ত জেগে আছে। মাইকেল তার হাতে নিজে ডিকেন্টার তুলে দিয়েছেন। সাফাই দিয়েছেন, মানুষ মদ খেলে কিছু আসে যায় না। দওলতের মোড়কে মোড়া জানোয়ারগুলো খায়, সেখানেই যত আপত্তি।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। প্রথম টোস্টের প্রস্তাবনা করবে বোক্‌জা। সে হাত শূন্যে তুলেছে।

এমন সময় দেখা গেল ফুয়া অস্বোয়াস্তি দেখিয়ে মায়ের আঁচল ধরে টানছে।

"কী রে", জাইদুনের প্রশ্ন।

উসখুস-রত ফুয়া ফিসফিস গলায় বলে, "মা, রবীন্দ্রনাথ।"

"কোথায় রবীন্দ্রনাথ?"

সে বেড়ার দিকে আঙুল বাড়ায়। জাইদুন সীমানার বেড়ার দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

সত্যি কবিগুরু এগিয়ে আসছেন। সঙ্গে আর একজন কে?

এইক্ষেত্রে চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। টোস্ট পিছিয়ে যায়। সকলের দৃষ্টি বেড়ার দিকে।

শ' ডিকেন্টার হাতে ছুটে গেলেন। সৈয়দ বোক্‌জা, যে স্থানে অস্থানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভেনে বেড়ায় সে ত আর নড়তে পারে না। তার বন্ধুদেরও সেই অবস্থা।

প্রথম শ'র উত্তেজিত রব শোনা গেল। "হে টাগোর, হ্যালো লিও।" সঙ্গে লিও টলস্টয়। সকলে আরো বিস্মিত।

আগ বাড়িয়ে শ' তাঁদের মজলিসে আনেন। তারপর কুশল জিজ্ঞাসা।

"Where are you from Leo?"

"ফ্রম হেভেন।"

"That's a dull place ment for lazy people."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইউ incorrigible athiest."

"ইউ incorrigible theist."

মাঝখানে কবিগুরু সালিশ সাজেন যেন। চিকন গলা ছড়িয়ে দেন :

থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে— করো সুধাপান,
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—

রবীন্দ্রনাথকে শেষ করতে দেন না বার্নার্ড শ', "হে টাগোর, মনে আছে?"

"কী মনে আছে?"

লন্ডনে ক্যাক্স্টন হলে তুমি যে লেকচার দিয়েছিলে? তুমি বললে, "দুনিয়ার যত দস্যু আছে, লীগ অফ নেশন হচ্ছে সেসব দস্যুদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আমি হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। বসেছিলাম একদম পেছনে। সবাই তখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। মনে আছে তোমার?"

"খুব মনে আছে। ওরা আর একটা ওই রকম চিজ বানিয়েছে শুনি। সেটা কী রকম?"

"মূলে তাই আছে। কেবল সংস্করণটা নতুন।" শ' জবাব দিলেন।

এই সময় সৈয়দ বোক্‌জা যেন সম্বিতে ফিরে এসেছে। সে কুর্ণিশ ভঙ্গির পর কবিগুরুকে বলে,"মাননীয় কবিগুরু, ওটা আগের মতই lique of nations।"

তখন ডিকেন্টার নামিয়ে শ', রোলাঁ হাততালি দিয়ে উঠলেন।

আর দেরি সম্ভব নয়। রাত শেষ কিনারায়।

মাইকেল-বিদ্যাসাগর কবিগুরুর উপর এক হাত নিলেন তাঁদের বিলম্বতার জন্যে।

তারপর টোস্ট শুরু হয়ে গেল।

সবাই গোল হয়ে আবার দাঁড়িয়েছে। হাতে ডিকেন্টার।

সৈয়দ বোক্‌জা প্রথমে হাত তোলা মাত্র সবাই পানপাত্র উঁচিয়ে ধরলেন।

তারপর তারস্বরে ফেটে পড়ল বোকজার গলা :

To the international brotherhood of mankind.

"মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক।"

একটু পরেই এগিয়ে আসেন শ', গ্লাস দুলিয়ে হেঁকে উঠেন :

Down with the imperialists and their stooges—
ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনুচরেরা ধ্বংস হোক।"

তারপর টলস্টয়ের পালা।

তিনি আহ্বান করেন :

Down with war— the most stupid institution of mankind.

"মানুষের নির্বোধতম সংগঠন হিসাবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ।"

এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ। সুললিত রাগের মত শোনায় তাঁর আবেদন-মুখর কণ্ঠস্বর:

For a happier and prosperous world.

"সুখীতর, আরো সমৃদ্ধতর হোক আগামী দিনের পৃথিবী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*　*　*

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। বিদায়ের ব্যথা এই প্রাঙ্গণের চারদিকে সহজেই নুলো বাড়িয়ে বসে গেছে। জুহা এবং ফুয়া ছাড়া এখানে কেউই কম বাকপটু নয়। তেছোদীন, সাহ্ কবি, প্রাণ-শশী, এবং জাইদুন, সৈয়দ বোক্‌জা ত আছেই, কেউ কারো বাঁয়ে বয় না। সবাই চুপ। কেবল সরব সেই গানখানা, যা এখনও বেজে চলছে। জাইদুন টেপ রেকর্ডে তুলে এমন অবিচ্ছিন্নতার ব্যবস্থা করে ফেলেছে, মাননীয় অতিথিদের আপ্যায়নে।

তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করে লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর॥

সবাই বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। মর্তবাসীগণ। করমর্দনের পালা পূর্বেই সমাপ্ত। ক্রটির জন্য ক্ষমা চাইতে ভোলে নি জাইদুন।

আকাশের শুকতারা নিভে গেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তের আলো ভেসে আসছে ধীর স্রোতের মত।

*　*　*

শূন্যে হেঁটে চলেছেন তাঁরা একটু আগে যাঁরা ছিলেন এখানে মাটির মানব-রূপে। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় পাশাপাশি, পেছনে শশী ও অন্যান্যেরা।

নিচে বেড়ার ধারে স্তম্ভিত, স্থানুমূর্তি কয়েকটি মানব-সন্তান।

মোয়াবকের নেশার খোঁয়ারি আসে ভোরের হাওয়ায়। তার নেশা কবেই ছুটে গেছে। হঠাৎ নাটকীয় স্বরে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলে যেতে লাগল : "এই সব মানুষেরা পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গেছে। বাসযোগ্য আর মোহনীয়। These are the people Who vindicate the species."

তারা এগিয়ে চলেছেন অসীম শূন্যের দিকে।

সৈয়দ বোক্‌জা উর্ধ্বমুখ, প্রার্থনার ভঙ্গিতে ভাব-গদগদ কণ্ঠে হেঁকে উঠল,

Oh God that maddest this beautiful earth, when will it be ready to receive thy saints? How long, O Lord, how long?

সিন্দুর-রঞ্জিত নবারুণ।
নিমেষে আলোর যাত্রীরা আলোয় মিশে গেল।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

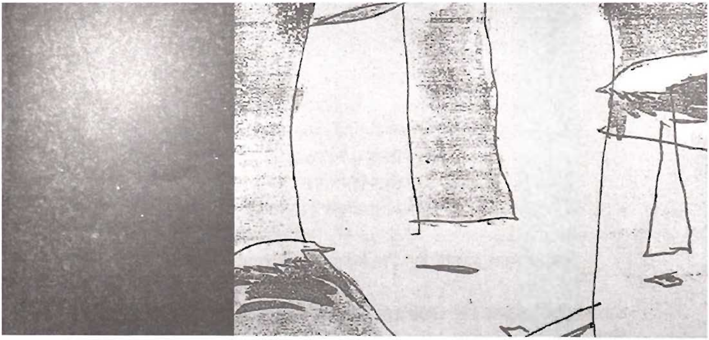

রাজা উপাখ্যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

পাঁচ ছ'জন শান্ত্রী এক দল কয়েদিকে পাহারা দিয়ে এগোচ্ছিল। একুনে বন্দীরা বিশ কি বাইশ জন। জায়গাটা পাহাড়ের পাদদেশ। রাস্তা যথেষ্ট চওড়া। আর প্রশস্ত না হলেই বা কী। কয়েদিদের কোমরে দড়ি, পায়ে বেড়ি, তার উপর সারি সারি বাঁধা এক কাতারে। সুতরাং ছত্রভঙ্গ বা পলায়নের কোন আশঙ্কা নেই। আর এমন ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততা অবান্তর।

দূরে আলবুরুজ পাহাড়ের মাথায় বরফ লেগে থাকলেও বসন্ত সমাগমে তেমন শীত ছিল না। পথ অতিক্রম তেমন ক্লান্তিকর নয়। তবু সবাই হাঁপিয়ে উঠেছিল। এমন কি শান্ত্রীদের রেহাই ছিল না পর্যন্ত। বোঝা যায়, যোজন-যোজন রাস্তা এদের অতিক্রম করতে হয়েছে।

এক শান্ত্রী তার কোমরবন্দ্ ঢিলা করতে করতে বেশ চিৎকার দিয়ে উঠল, "শালা যেন এক দিগ্‌দারি। এই কোমরবন্দ্, এই তলওয়ার, এই কিরিচ, হাতে ডাণ্ডা— সব মিলে অন্ততঃ দশ সের ভারি। তা সামলাও আবার হাঁটো।"

"চাকরি ছেড়ে দে তবে।" সঙ্গী শান্ত্রীর কানে মন্তব্য ভাল লাগেনি তাই সে একটু বাঁকা মন্তব্য করলে।

"স্যাঙাৎ," আহ্বান থেকে আন্দাজ করা যায় ওই শান্ত্রীর সঙ্গে তার হৃদ্যতা যথেষ্ট আছে। তারপর সে যোগ করে, "নওকরী ছাড়লে শালা খাব কী? তার উপর বালবাচ্চা আছে।"

"তবে শালা চুপ করে থাক।" অন্যান্য শান্ত্রীরা দু-জনের সংলাপ শুনছিল। এবার আর একজন বহসে যোগ দিলে।

"চুপ ত করে থাকি। কিন্তু এই ধড়াচূড়ার ওজন হাল্কা হয় না।"

"বেরাদর, মনে রাখ বাদ্‌শাহী লেবাস। ইজ্জৎ কতো।"

"ইজ্জতের বেটি-কে— ," ব'লে এই শান্ত্রী একটা খিস্তি জুড়ে দিলে। তবে কথা বন্ধ হয় না, "কিন্তু দশ দিন হেঁটে শিকার পাওয়া গেল কৈ?"

"যা হয়েছে ঢের। দেশে কী জওয়ান ছোকরা রোজ রোজ গজাবে নাকি?"

অন্য এক শান্ত্রী যে এতক্ষণ নির্বাক ছিল, হঠাৎ আপন মনে খিক্-খিক্ হাসতে লাগল।

হাঁটায় বিরতি নেই কারো। তাই চল্‌তে চল্‌তে এক শান্ত্রী তাকে সম্বোধন করে, "এই সমুন্ধি, হঠাৎ তোর আবার হাসি এল কেন?"

AMARBOI.COM

"আমি ভাবছি—।" সে আর কথা শেষ করতে পারে না, বরং জোরে জোরে হাসতে থাকে।

"আরে শালা, কথাটা শেষ করে যত পারিস হাস্ না।"

হাস্যক্ষান্ত ওই শান্ত্রী তখন বললে, "আমি ভাবছি, জওয়ান জওয়ান ছেলে যদি মাগীদের পেট থেকে প্রথম দিনেই বেরুত, আমাদের এত তক্‌লিফ করতে হত না।"

"ওরে, শালা। বাদ্‌শার হেকিমদের তেমন দাওয়াই বের করতে বলিস।" পরে সেও হাসতে লাগল। শান্ত্রীদের ঠোঁটে এই সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তারা সকলেই হাসতে থাকে। কিন্তু ক্লান্তির চোটে জোস্ সহজে মিইয়ে যায়।

বন্দীদল এতক্ষণ নীরবে হাঁটছিল। সকলেই জওয়ান। কয়েকজন অবয়বে রীতিমত সুন্দর। ক্লান্তি তাদের জৌলুষ নিভিয়ে দিতে পারেনি, যদিও ছটা কিছু নিষ্প্রভ।

কাতারের সপ্তম ক্রমিকতায় বাঁধা এক কয়েদির কিন্তু পথের উপর দৃষ্টি ছিল না। সে আন্‌মনা হাঁটছিল। দূর আকাশের সঙ্গে যেন তার চোখ দিয়ে বোঝাপড়া চলছে। তার অগোছাল চুল গৌর মুখে বার বার বাতাসের ধাক্কায় এসে পড়ে। বিরক্তিকর ব্যাপার। কিন্তু বন্দী নওজওয়ান এমন চিন্তানিবিষ্ট যে সেদিকে খেয়াল রাখে না। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে। তার সম্মুখবর্তী বন্দীর গায়ে এই উত্তাপ গেছে কি যায়নি, কিন্তু কান ত খোলা ছিল। শ্বাসরব তার কান এড়ায়নি। পেছনে ঘাড় কাৎ করে মুখ ফিরিয়ে তখন সে সঙ্গীকে কয়েক পলকের জন্য দেখে নেয়। বেশি সময় ত দেওয়া চলে না। ওদিকে পা ঠিক রাখতে হচ্ছে। নচেৎ শান্ত্রীগুলো শুধু নোংরা গাল দেবে না, পাছায় এসে জুতা সুদ্ধ ঠোক্কর মারবে।

কিন্তু সঙ্গীর মুখাবয়ব দেখার পর বুঝি তার করুণা হয়, অথবা স্বভাবত সে কোমল প্রাণের মানুষ, তাই তখনই জিজ্ঞেস করে বসে, "তুমি কোথা থেকে এসেছ, ভাই?"

"কেরমান। আর তুমি?"

"খোরাসান।"

খুব অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। কারণ, বন্দীদের মধ্যে কথাবার্তা নিষেধ। হঠাৎ শান্ত্রীদের কানে গেলে, যা-খুশি করতে পারে। এখানে বাধা দেবে কে? তবু সংলাপের রেশ থামে না।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"তা জানি নে।"

"শুধু শুনেছি, বাদশার হুকুম।"

কিছুক্ষণ তারা চুপ করে থাকে। আবার বাক্যালাপ শুরু হয়। সবই অতি অনুচ্চ আওয়াজে। পেছনের বন্দী মুখ খোলে ঃ

— তোমার নাম কী?

— কুবাদ।

— আমার নাম হরমুজ। আজ দু-হপ্তা কত শহর ছেড়ে এলাম।

— আমি আমার গাঁ ছেড়ে এসেছি। কিন্তু না, আর কিছু ভাবব না। খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

— সে ত মন্দ ছিল না। এখন ত এই সব জন্তুদের হাতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— নসিবই বলতে হয়।

— কেন?

— আমার মা ছিল, বাপ ছিল, আঙুরের ক্ষেত ছিল— আর এখন এই অবস্থা।

— তুমি কী করে ধরা পড়লে?

— গাছের ছায়ায় দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলাম বনের ধারে। হঠাৎ এরা আমাকে কয়েদ করলে।

— আশ্চর্য। আমারও সে-ই দশা।

— তুমি চিৎকার দাও নি?

— আমার মুখ এরা বেঁধে ফেলেছিল।

— আমারও সে-ই দশা।

— কিন্তু আমি কোন কসুর করিনি। তবু বাদশার লোক কেন ধরবে?

— সে জিজ্ঞাসায় আর লাভ নেই। বহু দূর চলে এসেছি। শহরের সরাইখানায় এরা ঘোষণা করছে, আমরা ডাকু, ডাকাত।

"আজ কেউ আমাদের বিশ্বাস করবে না।" এমন সময় শান্ত্রীদের কানে হয়ত কিছু পৌছায়। একজন ছুটে এসে বললে, "এই খান্‌কির পুত, আমাদের চাকরি খাবি?"

"না, শান্ত্রী বাহাদুর। একটু জিরোতে চাই। অনেক দূর হেঁটেছি।"

"চুপ কর। আচ্ছা, ওইখানে পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়। খবরদার কথা বলবি নে। বাদশার হুকুম।"

কুবাদ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল শান্ত্রীর চাঞ্চল্যের প্রারম্ভে। তার ঠোঁট স্তব্ধ হয়ে গেছে যথাসময়ে। শ্রোতার বিশেষ বিপদ থাকে না। ঝুঁকি সবই বক্তার।

শান্ত্রী কথা খেলাফ করেনি। কিন্তু বিশ্রাম নিতে গিয়ে হরমুজ তার চিরাচরিত অভ্যাস যেন হারিয়ে বসে। দু' সপ্তাহে বন্দিত্বের ধাক্কা সে বোধহয় কাটিয়ে উঠেছে। এবার মোকাবিলার জন্য সে তৈরি, নচেৎ হঠাৎ প্রহরিকে ডেকে সে জেরা শুরু করবে কেন?

ঝর্ণার পানি খেয়ে এক টিলার গায়ে হেলান দিয়ে বন্দীদল বসে পড়েছিল। বাতাস ওঁৎ পেতে ছিল এই মওকার জন্য। সব কয়েদিদের চোখে মুখে মায়ের হাতের মত তার গতায়তি। হরমুজ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেও প্রশ্বাস ধীরে ধীরে ফেলে। তারপর সে ডাকে : শান্ত্রী।

ওরা তখন মওজে বসেছিল। তারা শুধু পানি খায়নি। মিষ্টি হালুয়া যোগ ছিল। সুতরাং বিশ্রামের সঙ্গে মশ্‌করা সহজে এসে পড়ে।

একজন বলছিল, "আমার গোঁপে এত ধুলো জমেছে, হাঁ করার উপায় নেই। বাতাস আর ধুলো এক ছ্যাঁদা দিয়েই পেটে ঢুকতে চায়।"

"আগে বাড়ি যাই। কেউ চুমু খেলে গোঁপের ধুলোও যাবে, শালা হাল্লাকিও যাবে।" অন্যজন মন্তব্য করলে।

"কিন্তু আমার বিবি যে বুড়ি রে।" তৃতীয় জন আদিখ্যেতা জোড়ে।

"বিবি আবার বুড়ি হয় নাকি?" পঞ্চম শান্ত্রী দার্শনিক প্রশ্ন তুললে।

"ওরে হতভাগা, বুড়ি হওয়া ঢের ভালো। যা জমানা। আমার মাকানের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরবারের এক পাহারাদার থাকে। তার কাছে যা শুনেছি—।"

"কি শুনেছিস?" সকলে তখন খুব কৌতূহলী।

"সে পরে বলব। তবে বিবি কখনও বুড়ি হয় না।" সে জবাব দিয়েছে, তখন হরমুজের ডাক শুনতে পায়।

প্রৌঢ় শান্ত্রীর মেজাজ ভালই ছিল বলতে হয়। অন্ততঃ হরমুজকে কোন গালাগাল দিলে না।

— কয়েদি, কি বলতে চাস? পেসাব লেগেছে?

— না শান্ত্রী।

— তবে?

— আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

— বলে ফ্যাল জল্‌দি।

— আমাদের কেন কয়েদ করেছেন?

— তা কী আমি জানি?

— কয়েদ করেছেন, আর জানেন না?

শান্ত্রী এই সময় হাসতে লাগল। তার হাসি শুনে আরো তিনজন রক্ষী এসে যোগ দিলে। তারাও কৌতূহলী। আর বিশ্রাম মন্দ হচ্ছে না। এখন একটু মজা সবাই চাখতে চায়।

শান্ত্রীর জমায়েৎ এক সঙ্গী জিজ্ঞেস করলে, "কি ব্যাপার, মাবুদ?"

"এই ছোকরা জিজ্ঞেস করছে, আমরা কেন ওদের ধরলাম?"

হরমুজ ঘাবড়ে যায় না, স্বাভাবিকভাবেই শুধায়, "আপনারা জানবেন না ত কে জানবে?"

কথাটা তাদের কাছে চাটুকারিতার উপাদেয় পর্যায় ঠেকে। তাই কেউ গোস্বা হয় না।

প্রৌঢ় শান্ত্রী জবাব দেয়, "আমরা জান্‌লে ত উজির নাজির ব'নে যেতাম।"

হরমুজের সাহস সঞ্চয় করতে হয় না। তার পেশল হাতের নাড়ায় শিকলের ঝনঝনা-সহ সে বলে চলে, "এ ত আজব ব্যাপার। একটা কাজ আপনারা করছেন, অথচ জানবেন না, কেন করছেন?"

সকল শান্ত্রী হঠাৎ চুপ করে যায়। তারা ভেবে দেখে। কথাটা ছোক্‌রা মিথ্যে বলেনি। এতদিন এমন সমস্যা কেউ তাদের সামনে তুলে ধরলে জবাব দিতে পারত বৈকি। আজ চুপই থাকতে হয়। প্রৌঢ় তবু মুখ খুললে, "আমরা কিছুই জানি নে। জাহুক বাদশার হুকুম।"

"বাদ্‌শা জাহুকের হুকুম?" জিজ্ঞেস করলে হরমুজ।

"হ্যাঁ। আমরা হুকুমের গোলাম।" প্রৌঢ় কয়েদি জবাব দিয়েই কিন্তু অসোয়াস্তি অনুভব করে। তার আফশোস হয় সত্যি যে কয়েদিদের গ্রেফতারের একটা কারণ থাকতে পারে, তা জানতে চায়নি কেন?

শান্ত্রীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। আজব এক ধাঁধায় তাদের ফেলে দিয়েছে ত এই কেরমানী নওজোয়ান। বিশেষত প্রৌঢ়জন ভাবে, দশ বছর ধরে সে কত কয়েদিকে ধরে বা গ্রেফতার করে এনেছে, কিন্তু তার মনে এই প্রশ্ন ওঠেনি কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কাফেলা চলতে শুরু করে। কিন্তু এবার সকলের পদক্ষেপে একটা সমতা এসেছে। শান্ত্রী এবং কয়েদি উভয় দলই চুপচাপ। আর প্রত্যেকে যে-যার চিন্তায় মগ্ন। শান্ত্রীদলের চোখের সামনে কেরমানি যুবকের প্রশ্নটা বার বার ভেসে উঠছে। তাই যখন কয়েদিদের মধ্যে ফিস্‌ফিস কথা শুরু হয় তারা না-শোনার ভান করে। অন্যসময় এতক্ষণে নির্যাতন শুরু হয়ে যেত।

মাজেন্দারানের পার্বত্য এলাকায় তারা হাঁটছে। সন্ধ্যার আগেই কোন সরাইখানার আশ্রয় নিতে হবে। আরো দু'দিন পরে হয়ত পৌছতে পারবে শহরে।

বন্দীদল শুধু পেছনের লোকের সঙ্গে কথা বলে না। ঘাড় ফিরিয়ে দুইজনের ব্যবধান ডিঙিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গেও বাক্য বিনিময় চলে। প্রহরীরা হয়ত ক্লান্ত তাই শাস্তি দেওয়ার কথা কেউ ভাবছে না এই অপরাধের জন্য। বন্দীরা বেশ অবাক হয়। কিন্তু লোকগুলো ত মানুষ। ওদের যদি পরিবর্তন ঘটে, বিস্ময়ের কী আছে।

হরমুজের মনে কথাটা উঠেছিল। কেরমানের গাঁয়ে মানুষ হলেও তার বালককালের ওস্তাদ ছিলেন এক সাধু ব্যক্তি। মিষ্টভাষী এমন স্নেহপরায়ণ মানুষ হরমুজ আর কোন দিন দেখেনি। শিক্ষকের কথা মনে উঠলে তার স্মৃতি রীতিমত জুলুমের মত উপস্থিত হয়। চোখ না ভিজে পারে না। কিন্তু তিনিও হঠাৎ গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দরবারে তার ডাক এসেছে। কিন্তু জনরব, সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য তার গর্দান গেছে, রাজসভায় কিছু দিন অবস্থানের পর। হরমুজের লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। পিতাকে তার অল্প বয়সেই সাহায্য করতে হত। কারণ, তার এক অগ্রজের মৃত্যুর পর পিতার শরীর ভেঙে যায়, চাষে আর তেমন খাটতে পারতেন না। ওস্তাদের আবছা আদলের সঙ্গে এবার পিতার মুখের বিনিময় ঘটে। হয়ত তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন তার অভাবে। অথবা, গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তার দিকে চেয়ে অছেন তার প্রতীক্ষায়, অন্দরে মা'র আর্ত চিৎকারে মহাকাশের জ্যোতিষ্কখণ্ড খসে খসে পড়ছে। হরমুজের বুকের মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু সে মেহনতী যুবক। অত সহজে কাবু হয়না। নিঃশ্বাস কয়েক মুহূর্ত বন্ধ, সে গুন্‌গুন করে ওঠে।

আন্‌মনা গান ধরেছিল সে। কণ্ঠের মিষ্ঠতা হয়ত শান্ত্রীদের নিরস্ত রেখেছিল। কিন্তু সুরের রেশ কোথাও ব্যাহত হয় না। সব কয়েদির কণ্ঠেই তখন গুঞ্জন ওঠে। গুঞ্জন শেষে যৌথতায়, ক্রমশঃ পঞ্চমের পর্যায়ে মোচড় মেরে বিভিন্ন শব্দ-স্তরে আছাড় খায়। প্রহরিবৃন্দ পর্যন্ত এই আসরে অনুপস্থিত নয়। উৎরাই পথে সকলে গোধূলির নিষ্প্রভ আলোক-স্পর্শে আপন অবয়বের রেখা মাত্র। ক্লান্তি ঝেঁটিয়ে ফেলছে প্রত্যেকে এই সুরের আওতায় ওঁৎ পেতে।

প্রৌঢ় শান্ত্রী মাবুদের খেয়াল হয়, তারা এক সঙ্গে মিশে গেছে। নির্যাতক, নির্যাতিতের সম্পর্ক ঘুচল কী ভাবে? তখনও কোরাস অব্যাহত আছে । শুধু মাবুদ কিছু চিন্তা করতে গলা সরিয়ে নিয়েছে। এমন ত হওয়া উচিত নয়। হৃদয়ের কাঠিন্যই তার রোজগারের পথ। প্রধান শান্ত্রী কত বার বলেছে, মায়া-মহব্বৎ নিয়ে বাদশার হুকুম পালন চলে না। যদি আওরত-দীল হও আমার দল ছাড়ো। কিন্তু আর সকলেই ত এখন গান গাইছে ? হল কী?

সঙ্গীদের এত্তেলা দিতেই মাবুদ গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, "খামুশ।"

গানে মত্ত কিন্নরের কণ্ঠতন্ত্রী যেন অকস্মাৎ ছিঁড়ে গেল।

কিন্তু রেশ ত যায় না। সঙ্গীরা বিরক্ত হয়ে ওঠে। বেশ মওজ পাচ্ছিল তারা, এই আধ-বুড়োটা একদম বেরসিক।

একজন খেঁকিয়ে উঠল, "তোমার হল কী?"

"মুণ্ডু।"

মাবুদ তারপর বেশ স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয়, "খেয়াল আছে কোথায় আছি? হুজুরদের কানে গেলে গর্দান থাকবে না।"

"আমরা এখনও আলাম কোহের নিচেকার গাঁয়েই পৌঁছাইনি। এ ত বিরান জায়গা। কে দেখছে, আর কে চুক্‌লি কাটছে।"

অন্যান্য সঙ্গীরা বক্তার সমর্থনে নানা মন্তব্য করে।

মাবুদের মনে হয়, তার অপরাধ সত্যি গুরুতর। তাই সে-ই আবার হরমুজকে সম্বোধন করে, "কেরমানি নওজওয়ান, তোমার গান ধরো ত, ভাই।"

উপত্যকা আবার ভরে উঠতে লাগল পূর্বের মত, প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, অতঃপর বন্যার তোড়ে।

শান্ত্রী মাবুদ কিন্তু গলা মিলিয়েও শান্তি পায় না। তার প্রশ্ন থেকে যায়, কেন এদের ধরে নিয়ে যাচ্ছি?

দুই

AMARBOI.COM

সম্রাট জাহুকের বিরাট প্রাসাদ-শীর্ষে বাদ্‌শাজাদি গুলশান একা একা অনেকক্ষণ সন্ধ্যাগমের আলো-আঁধারির খেলা দেখছিল। কালক্ষেপের একটা বাহানা মাত্র। প্রাসাদে সে বিশেষভাবে একা। বাল্যে জননী মৃতা। আর এক জেষ্ঠ্য সহোদর ছিল, সে অপঘাতে প্রাণ হারায়। সুদর্শন যুবক। শিকারে গিয়েছিল আরো সঙ্গীদের জটল্লায়। এক হরিণের পেছন ধাওয়া করতে গিয়ে তার ঘোড়ার পা পিছলে যায়। অনেক নিচে খাদে বাহন ও আরোহীর পরে দেখা মেলে। বাহন কোন রকম জীবিত ছিল। কিন্তু আরোহীর মাথার খুলি পাথরে পাথরে ঘষড়ানির চোটে ফেটে যায়। গুলশানের শোকের সীমানা ছিল না তখন। কিন্তু বিদায়ের পূর্বে ভ্রাতার শেষ মুখদর্শনের পর সে মূর্ছা যায়। ফাটলের মুখ-পথে ঘিলু বেরিয়ে এসেছে, রক্তের চিড়-রেখা সহ। এই মৃত্যুর পর পিতাই একমাত্র আশ্রয়। তিনি সম্রাট। নানা কাজে ব্যস্ত। সুতরাং তেমন নৈকট্যের সুযোগ ছিল না। তার এক সেহেলী ছিল, নামেও সেহেলী, অতি নিকটজন। উভয়ে সমবয়সী। নচেৎ বাদ্‌শাজাদির নিঃসঙ্গতার পরিমাপ ছিল না। আজ আন্‌মনা সে প্রাসাদের ছাদে ওঠে চোখ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যার পরও সে অনেকক্ষণ এখানে চিন্তাবিষ্ট, উপবিষ্ট। সেহেলী ইতিমধ্যে কাছে এসে জুটত। কিন্তু বাদ্‌শাজাদির বারণ সে অমান্য করতে পারে না। লতেব কাঠামো রাজনন্দিনীর। মুখের কাঠামো তারই সঙ্গে মানান-সই। কিন্তু চোখেই যেন সমস্ত কোমলতা উপছে উঠছে। এমন মুখ দয়াময়ী হৃদয় ব্যতিরেকে যেন আর কোথাও সংস্থান-সৌষ্ঠব পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ কোন দুর্ভাবনায় বাদ্‌শাজাদি বিষণ্ন বসে ছিল কী? না। বরং প্রকৃতির সুষমা তার কাছে সান্ত্বনার প্রলেপরূপে দেখা দিয়েছিল। একান্ত আনাগোনার দুই সঙ্গী। বেশ সুখময় একটা আবেশ উপভোগ করছিল গুল্‌শান।

কিন্তু বেশিক্ষণ এই মুহূর্ত তার কাছে আটক থাকল না। বাদশাজাদির কানে পড়ল, অনেক মেয়েলি কণ্ঠস্বরের যৌথ গান। দূরে পাহাড়িগ্রাম এলাকা থেকে এই শব্দ এদিকে আসছে ক্রমশঃ। বাদশাজাদির মন যন্ত্রণায় পূর্ণ হতে থাকে তখন। মৃত ভ্রাতার মুখ আর মাথা বার বার চোখে ভেসে উঠতে থাকে। কয়েক বছর হয়ে গেছে। শোকের দাগ ত একদম মিলিয়ে যায়নি, মিলিয়ে যেতে পারে না, তবে আর টাট্‌কা নয়, কিন্তু এবার সদ্য-সজীবতায় তাকে আক্রমণ করল। অজানিতে দূরাগত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার চোখের পানির, বোধ হয়, আত্মীয়তা আছে। বাদ্‌শাজাদি অশ্রু-প্রবাহ মুছতে এতটুকু তৎপর নয়। কিন্তু এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা অসম্ভব। দেরি করলে হয়ত ছাদ থেকে লাফ দিয়ে বসবে, এমন আশঙ্কা একবার ধাক্কা মেরে গেল। বাদশাজাদি তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আরো এক সংকল্পসহ, আজ পিতার সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করবেই। প্রায় সাত-আট বৎসর এই বিচ্ছেদ চলছে। দূরাগত নারী-কণ্ঠ তাকে আরো ত্বরান্বিত-তাগিদে অস্থির করে তুলল। বাদ্‌শাজাদি জানে, এই কণ্ঠস্বর কোন রমণীদের কণ্ঠ-নিসৃত।

গুলশান তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

প্রাসাদের আয়তন কয়েক শত বিঘা টিলাসংকুল জমিন জুড়ে। তাই সমতল এবং অসমতল জায়গা স্থাপত্যের সৌষ্ঠব অনুযায়ী নানা সিঁড়ি খিলান এবং স্তম্ভের সমাহার সজ্জিত। বহু শতাব্দী পরে সম্রাট দারিয়ুস নাকি এই জায়গায় ধ্বংসাবশেষের উপর নিজের বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন, শুধু সমতল জমিনে নয়, টিলার গায়ে গায়েও উদ্যানের স্পর্শ নানা তরু-লতায় সমন্বিত। কিন্তু এই প্রাসাদের খাড়াই এত উঁচু, ফলে স্তম্ভের উচ্চতা আর কম হয় কী ভাবে। তদুপরি সেগুলো এতই নিরেট কালো পাথরে গড়া যে অন্ধকারে ভীম সদৃশ ঠেকে।

বাদশাজাদির এই প্রাসাদের অলিগলি চেনা। কোথায় প্রহরির শাসন আছে আর কোথায় নেই তার অজ্ঞাত নয়। পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এত বাধাবিপত্তি এড়িয়ে যাওয়ার হেতু ছিল। বিগত দু'মাস তার সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। দরবারে খুব কমই যান। প্রাসাদের শেষ প্রান্তে কৃত্রিম গড়খাই পরিবেষ্টিত যে কক্ষ-সারি, তারই মধ্যে সম্রাট জাহ্‌ক অবস্থান-রত। অবিশ্যি প্রহরিদের ভয় নেই। কারণ, ছেলেবেলায় গুলশান সেখানে কাটিয়েছে মার সঙ্গে। কিন্তু নানা চত্বর, সিঁড়ি পার হয়ে যাওয়াই বিপদ। প্রহরিদের হাতে পড়লে বাদশার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ ঘটবে না। কারণ, সম্রাটের কড়া হুকুম, কন্যা বা কোন আত্মীয়ের সঙ্গে তাঁর বর্তমানে দেখাশোনার কোন আগ্রহ নেই। কেউ যেন তাকে বিরক্ত করতে না যায়। পিতার হুকুম। নিরবেই বাদ্‌শাজাদিকে মেনে নিতে হয়েছে। মুখোমুখি সাক্ষাতেই না পিতার কাছে আব্‌দার অভিমান সহযোগে তা রদ হতে পারে। আজ প্রাসাদশীর্ষে মনে মনে জনকের সঙ্গে সাক্ষাতের সে শপথ নিয়েছে। পৃথিবীতে একমাত্র স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হলে তার বাঁচার কী অর্থ থাকবে?

তাই মরিয়া বাদ্‌শাজাদি এগোতে লাগল তার চেনা ও আবিষ্কৃত পথ ধরে। বাগানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনজ গন্ধ অন্য সময় গুলশানের যুবতী চিত্তে জায়গা করে নিত। কিন্তু এখন সন্তর্পণতা, উৎকর্ণ পদক্ষেপের নিকট সব অবান্তর। সংকল্প দৃঢ়। তবু সন্দেহ হয় বাদ্‌শাজাদির, যদি তিনি দেখা না দেন। বিচ্ছেদ তবু মিলনের আশা জাগিয়ে রাখে। সেখানে বিলুপ্তি ঘটলে যন্ত্রণার সীমা থাকবে না। নিজের আন্দোলিত চিত্তের প্রতি সামান্য অবহেলা দেখিয়েই বাদ্‌শাজাদি সামনের দিকে এগোয়। বাতাসে হিমেল স্পর্শ তার কপালের ঘাম রোধে অপারগ। জীবনের এক মহা পরীক্ষা যেন সম্মুখে উপস্থিত। তার মোকাবিলা করতেই হবে। সম্রাট-নন্দিনী জানে বৈকি কেন তার পিতা আর জন-সমক্ষে বেরোয় না। এই চিন্তা মনে জাগামাত্র গুল্‌শান একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিভীষিকার ছবি যেমন হঠাৎ সব নিঃসাড় করে ফেলে, বাদ্‌শাজাদি তেমনই অমঙ্গলবাহী আশঙ্কায় নিজের শক্তি সম্পর্কে আর সচেতন থাকে না।

সে জানে বৈকি, তার পিতা অভিশপ্ত। কিন্তু এমন দুর্বিপাকে পড়ার পর আর সম্রাটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

সাবেক দৈববাণী বাদ্‌শাজাদির কর্ণপট ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ঃ "শোনো জাহুক, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার দুই কাঁধ আজ থেকে দুই কৃষ্ণ-গোক্ষুর পেঁচিয়ে বসে থাকবে। তোমাকে সর্পদ্বয় দংশন করবে না। কিন্তু প্রতিদিন তাদের আহার তোমাকে যোগাতে হবে। আর সেই রসদ কী জানো? বিশ-তিরিশ জন তরুণ, তরুণী অথবা জ্ঞানের আলোকে সরস বৃদ্ধের মগজ, তরুণের মগজ অপেক্ষা তা টাট্‌কা— এমন মগজ। যতদিন এই রসদ যোগাতে পারবে, ততদিন তুমি বাঁচবে। নচেৎ যেদিন খোরাকের অভাব ঘটবে, সেদিনই গোক্ষুরদ্বয় তোমার মাথার খুলি ভেঙে তার ঘিলু আহার করবে। সেদিনই তোমার মৃত্যু। মনে রেখো।"

গুল্‌শান আর কিছু যেন শুনতে পায় না। হঠাৎ বধির হয়ে গেছে সে। কেবল স্তম্ভ আরো জোরে চেপে ধরতে গিয়ে সে উপলব্ধি করলে, পায়ের তলায় চত্বর এখনই সরে যাবে, যদি না সে আরো এগিয়ে যায়।

তাই বাদ্‌শাজাদি এক থাম থেকে আর এক থামে হেলান দিয়ে কিছু বিশ্রাম গ্রহণ করে আকাশের দিকে মুখ তুলে না। সেখানে সন্ধ্যার পর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অতিথি-সমাগম ঘটেছে। কিন্তু গুলশান কিছু অবলোকন করছিল, মনে হয় না। দৈববাণীর সশব্দ চিত্র তার চোখে বার বার হানা দেয়। অজানিতে নিজের কণ্ঠদেশে হাত দিয়ে দেখে বাদ্‌শাজাদি। নরম ত্বক সাপের ঠাণ্ডা শরীরের মত ঠেকে। নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে পারলেই এই সময় মঙ্গল। কিন্তু সে পালাবে কোথায়? রাত্রির অন্ধকারে বিশালকায় স্তম্ভরাজি নরকের জল্লাদের মত ভীষণ খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্রূকুটি ভয়াল পৃথিবী তার ঘূর্ণন রোধ করে শুধু রাজকুমারির গোটা দেহ ঘিরে বজায় রাখছে প্রাকৃতিক ধর্ম। যুবতী রমণী। এমন অন্ধকারে কিন্তু অভিসারিণী নয় সে, পিতার কুশল-সন্ধানী কন্যা। হয়ত সেই জন্যেই গড়খায়ের প্রহরিরা তাকে রোধ করতে পারেনি। বরং পথ ছেড়ে দিয়েছিল। স্বয়ং বাদ্‌শাজাদি যখন তাদের প্রাণের জন্য অভয় দিয়েছে, তখন আদেশ-অমান্য কোন অপরাধ নয়।

বাদ্‌শার কক্ষের সামনে গুলশান দাঁড়ানো মাত্র আর এক প্রহরি হতচকিত কুর্নিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে জিজ্ঞেস করলে, "বাদ্‌শাজাদি, আপনি এখানে?"

"বাবার সঙ্গে দেখা করব।"

"তার কড়া হুকুম, আপনাকে যেতে দিতে পারব না।"

গুল্‌শান প্রহরির দিকে চেয়ে আবার শুধায়, "আমি এত দূর এসেছি। আমি ওয়াদা করছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না, আমাকে যেতে দাও।"

"আমার গর্দান যাবে, বাদ্‌শাজাদি।"

গুলশান হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। মুখ থমথম করে ওঠে। রোষ কষায়িত লোচনেই সে বলে যায়, "আমার হুকুম অমান্য করলে, তুমি ভাবো, তোমার কিছু হবে না?"

অপূর্ব সুন্দরীর গোস্বা কাউকে উত্তেজিত করে না, বরং সন্দেহের দোলায় টেনে নিয়ে যায়।

প্রহরি কুসুম-সদৃশ মুখের দিকে চেয়ে কি যেন উচ্চারণ করে, "কুসুর মাফ করবেন। কিন্তু বান্দার যেন গর্দান না যায়।"

"যাবে না— ", এমনই স্বরে কথাগুলো বাদ্‌শাজাদি বলে ফেলে, প্রহরিরা আর মাথা তুলে না, বরং ঝুঁকিয়ে নেয় পুনরায় কুর্নিশে।

এই সব মহল গুলশানের পরিচিত। কিন্তু কক্ষে প্রবেশের পর সে চোখে আর কিছু দেখে না। চারিদিকে সব যেন অন্ধকার। এই প্রাসাদ কক্ষে আলো আছে পরে বাদ্‌শাজাদি বুঝতে পারে। কিন্তু তা এত অস্পষ্ট যে দৃষ্টির সামঞ্জস্য লাভে বিলম্ব ঘটে। চোখ তেড়ে তেড়ে বাদ্‌শাজাদি চারিদিক দেখতে চায়। এই ভাবে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর সে আঁৎকে ওঠে এমন, নিজের মধ্যে গুটিয়েই তখন সব শান্তি।

তার চোখে পড়ে : জানালার পর্দা ঈষৎ খোলা। তারি পাশে এক রাজশয্যা। বাদ্‌শাকে চোখে পড়ে না। কিন্তু দুই সাপের চোখ জ্বল-জ্বল করছে।

স্তব্ধ রাজকুমারি। তার আর কোন কথা মুখে যোগায় না। হঠাৎ সাপ দুটো হিস্‌হিস্‌ গর্জন করে উঠল।

হয়ত ছুটে আবার দরজা দিয়ে গুলশান বেরিয়ে আসত। কিন্তু ভয়ার্ত, সে কী করবে ভেবে উঠতে পারে না। সাপের গর্জন তাকে এই অবস্থা থেকে রেহাই দিলে।

ভীতিক্লিষ্ট গুলশান চিৎকার দিয়ে ওঠে তখনই, "কোথা তুমি পিতা? পিতা, তুমি কোথা?"

আর্তনাদের মত বাদ্‌শাজাদির কাতর কণ্ঠস্বর।

"কে? কে?" তখন আবছা আলোর ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা আছড়ে পড়ে। এই কণ্ঠস্বর বাদ্‌শাজাদির পূর্বোক্ত আওয়াজের অনুরূপ। আশঙ্কা আর্তনাদ একই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত।

এতক্ষণে গুলশান দেখতে পায়, তার পিতা জানালার পর্দার সঙ্গে মিশে বসে আছে। সেখানে অপেক্ষাকৃত আলো এত কম যে প্রায় অন্ধকার বলা চলে।

পিতৃস্বর শোনামাত্র গুলশান দৌড়ের প্রস্তুতি নেয় এক মুহূর্তে। ওই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু দিনের সঞ্চিত অভিমান নিঃশেষ না করতে পারলে বহু ক্ষোভ থেকে যাবে। তখনই কিন্তু সতর্কবাণি তীরের মত ছুটে আসে।

"মা, তুমি! ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আর এগোসনি। খবরদার, না...।"

নিমেষে স্তব্ধ গুলশান।

আবার পিতার সতর্ক-বাণি শোনা যায়, "গুলশান, আমি আর তোমার পিতা নই। আমার দুই কাঁধে দুই আজরাইল সাপ বসে আছে। কাছে এসো না, মা।"

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে গুলশান। আর জবাব দেয় না। দুই বিরাট কালী-গোক্ষুর তখন গর্জন করতে থাকে সম্রাটের কণ্ঠদেশ বেড় দিয়ে।

জাহুক অনুরোধ করে, "মা তুমি ফিরে যাও। কি করে এলে তুমি?"

"পিতা, তোমাকে কত দিন দেখিনি। তাই প্রহরিদের কাছে মিনতি জানিয়ে এসেছি। ওদের যেন গর্দান নিও না।"

অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে সম্রাট হেসে উঠলেন। অট্টহাসি বোধহয় এমন পরিবেশেই হঠাৎ কণ্ঠ-নিঃসারিত হয়।

একটু থেমে তিনি বলেন, "আমি সম্রাট, কিন্তু মানুষ। এই কথাটা তোমার ত ভোলা উচিত নয়। আমার গুলশান মা-কে কেউ বাধা দিলে আমি তার বরং গর্দান নিতাম।"

"আমি তোমার কাছে যেতে চাই, বাবা।"

"না, এই সরীসৃপ আততায়ীদের বিশ্বাস নেই।"

"তুমি আর আমাকে কন্যা বলে মনে করো না, বাবা।"

দুহিতার সরল প্রাণের প্রতিধ্বনি সম্রাটকে অস্থির করে তোলে। কিছুক্ষণ তিনি জবাব দিতে পারেন না। সাপের দুরন্ত গর্জনে তাঁর মুখের বিড়বিড়ানি চাপা পড়ে যায়। তবু সম্রাটকে মুখ খুলতে হয়। সাপের সঙ্গে বাজি ধরে তখন গলার আওয়াজ বুলন্দ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

জাহুক : মা, আমি সম্রাট। কিন্তু আর মানুষ নই। আমার গুলশান জননী আছে। কিন্তু তার সন্তান অভিশপ্ত জানোয়ার।

গুলশান : না, বাবা।

জাহুক : এই জানালায় বসে থাকি। এই ভাবে দরবার চলে। নিচে আমির ওমরা জমা হয়। তা-ও মাসে হয়ত একবার। আমি সম্রাট; তাই মানুষ নই আর।

গুলশান : পিতা, তুমি দূরে থেকে আমাকে যে যন্ত্রণা দিচ্ছ আমি আর সহ্য করতে পারব না।

জাহুক আমার যন্ত্রণা আর বাড়িয়ো না, মা। বরং আমার মৃত্যু হোক। কাল থেকে প্রহরিকে ঘিলু দিতে বারণ করো।

গুলশান : তোমার জীবন কত অমূল্য। তা কী হয়, পিতা? আর এই অভিশাপ একদিন কেটে যাবে বৈকি।

জাহুক : কে জানে। কবে, কবে! কিন্তু প্রতিদিন কত প্রাণ নিঃশেষ হচ্ছে।

গুলশান : বাদ্‌শার প্রাণের দাম দিতে হয়।

জাহুক : কিন্তু আর না। তুমি ভুলেও আমার কাছে এসো না।

গুলশানের মুখে কথা আট্‌কে যায়। এতক্ষণে সে কিছু সাহস ফিরে পায়। এবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণতর করে এবং চেয়ে চেয়ে দেখে সাপের অবস্থান। সম্রাটের গলা জড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন চলাফেরা করছে। তাদের কালো দেহ অন্ধকার আরো ঘন করে তুলছে। আলোর অস্পষ্টতায় মোটা দেখায় হিংস্র সরীসৃপ দুটো। বেশ ভয় পায় বাদ্‌শাজাদি। কিন্তু স্নেহের আকর্ষণে সে যেন নড়তে পারে না। তাই পিতাকে শুধায় ঃ

— তুমি কী ঘুমাও না, বাবা?

— কাঁধে দুই আজ্‌রাইল নিয়ে ঘুম? (অট্টহাস্য। থামিয়ে) তবে ঘুমাই বৈকি। ক্লান্তির চোটে যখন দেহ-মন বিকল তখন ঘুম আসে। কিন্তু স্বপ্ন দেখি, আমাকে ছোবল দিয়ে এরা সব শরীরে জ্বালা আর বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তখন চিৎকার দিয়ে উঠি।

— আহ, পিতা...পিতা।

— ফিরে যা, মা।

— না তা হয় না। আমি তোমার কাছে যেতে চাই।

সম্রাটের নিষেধ অমান্য করে কন্যা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, তখনই জাহ্‌হুক চিৎকার দিয়ে বলে, "যদি আর এক পা এগিয়ে এসো, পাথরে মাথা কুটে কুটে নিজের মগজ দিয়ে শেষ সৎকার করে যাব।"

রাজকুমারি থামতে বাধ্য হয়। একটা সাপ তখন গলার প্যাঁচ কিছুটা খুলে ফেলে গর্জন দিতে দিতে সামনের দিকে ফণা বাড়ায়। রাজকুমারি ভয়ে পেছিয়ে আসে।

দুই দিক তখন নীরব।

কন্যা কিছুক্ষণ পর এক যুক্তি প্রয়োগ করে। সে বলে, "বাবা, জল্লাদ ত ঘিলু পরিবেশনে আসে, সাপ ত তাকে ছোবল দেয় না। আমাকে দংশন করবে কেন?"

"মা, জল্লাদের প্রাণ। তার বুকের পাটা তুমি কোথায় পাবে? আর সে ত গোলাম। তার জীবিকা এরি উপর নির্ভরশীল। তা-কে আসতেই হয়। তুমি কোন্ দুঃখে এই ঝুঁকি নেবে? আমার একমাত্র স্নেহধনকে আমি বেঁচে থাকতে এমন দুঃসাহসে উৎসাহ দিতে পারব না।"

এক নিঃশ্বাসে প্রায় কথা শেষ করে, কন্যার দিকে বাদ্‌শা তাকিয়ে থাকেন। অস্পষ্ট আলোর জন্যে দৃষ্টি-বিনিময়ের কোন সুযোগ নেই, তবু সম্রাট অপলক দৃষ্টি। সাপ দুটো তখন তার মাথার চুলের উপর মুখ রেখে একটু যেন ঝিমোয়। কিন্তু রাজকুমারির পুনরায় ডাকে দুই সাপই এক সঙ্গে গর্জন করে উঠে না শুধু, একটা গলায় লেজের সামান্য বেড় রেখে মেঝের দিকে ছুটে যাবে, এমন ভাব দেখায়।

তখন জাহ্‌হুক স-চিৎকার সতর্কতার বান ছোঁড়েন, "ফিরে যা, মা। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ। ফিরে যা, য়া...।"

গুলশানের আর কোন উপায় থাকে না। দ্রুতপদে সে প্রাসাদ কক্ষের বাইরে এলো। দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা মোচনের জন্য বাদ্‌শাজাদির বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

বাইরে প্রহরিরা আবার গুলশানের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে। সম্রাটের আদেশ-অমান্য-ভয়ে ভীত এক প্রহরি পর্যন্ত নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে এসে চুপ করে গেল বাদ্‌শাজাদির মুখাবয়বের দিকে চেয়ে।

AMARBOI.COM

তিন

বাজারের দিন।

দামগান গ্রামের লোকজন সকলে শশব্যস্ত। সওদা বেচাকেনা মারফৎ যার যা প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করতে হয়। কাজেই প্রত্যেকে এই দিনের মাহাত্ম্য বোঝে।

কয়েকজন নিজের পশরা নিয়ে বাজার অভিমুখে হাঁটছিল। তামাক, আঙুর এবং শাকসব্জি সকলের মাথায় হাতে কাঁধে— বোঝার ভারের উপর অঙ্গ-স্থান নির্দিষ্ট। বাজার আরো আধ-ক্রোশের পথ। পাহাড়ের টিলা-সংলগ্ন এক সমতল-ভূমির উপর ওই বেচা-কেনার তীর্থ।

কয়েকজন পশারিণী পর্যন্ত আছে। বিভিন্ন বয়সের। এক বৃদ্ধা ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। প্রাণী বেচে পানাহারের রসদ জোগাড়। এক তরুণীর কাঁধে আঙুরের ঝুঁড়ি। তা-ছাড়া অন্যান্য রমণীরা মাঝ-বয়সী।

হঠাৎ সকলে সচকিত হয়ে উঠল। পেছন থেকে এক কিশোর বালক চিৎকার দিতে দিতে ছুটে আসছে। "আমার মা কোথায়? আমার মা কোথায়?" আর কোন বুলি নেই কিশোরের মুখে।

তখন বালক অনেক পেছনে রয়েছে, কিন্তু তার ডাক ত আগেই এসে পৌঁছায়।

ছাগ-তাড়ুয়ে বৃদ্ধা বেশ রসিকা। সে তার প্রৌঢ়া এক সঙ্গিনীকে বলে, "এই রুফা, তোর ত ছেলেমেয়ে নেই। দ্যাখ, একটা ছেলে পেয়ে যেতে পারিস।"

সঙ্গিনী মুখ বাঁকিয়ে জবাব দিলে, "পরের ছেলে পোষার তাকদ আমার নেই।"

"বিয়োনের ঢের কষ্ট। দ্যাখ ভেবে। ছেলেটা আসার আগেই ভেবে দ্যাখ।" বৃদ্ধা ফোড়ন দিলে।

এই রমণি কম যায় না, সে তার সঙ্গিনীকে সম্বোধন করে, "ওলো, তোর ত শাদিই হয়নি। সে ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে হবে না। তুই-ই নে ছেলেটাকে।"

মেয়েটি এই রসিকতায় বেশ বিরক্ত হয়ে, বিকৃত মুখে সঙ্গিনীর দিকে তাকালে। তা দেখে আর কারো কথা বলার উৎসাহ হয় না।

ছেলেটা তখন কাছে এসে গেছে। সবাই তা-কে চেনে। জঙ্গলে তাকে সাপে খেয়ে ফেলেছিল। পশারিণীদের মুখে তাই আর রসিকতা যোগায় না।

আমার মা কোথায়? এই চিৎকার-প্রশ্নের জবাবে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাহারের মা স্থির-যৌবনা কোথাও পালিয়েছে, না আর কিছু। বাহার ইতিমধ্যে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েছে। তার অন্বিষ্ট রমণি এখানে কেউ নেই। তাই অপরের মুখ খোলার আগে সে আরো জোরে দৌড় মারে। চিৎকার অবিশ্যি বহাল থাকে।

সরু পাহাড়ি পথ। দু-পাশে টিলা উঠে গেছে ক্রমশঃ শৈলস্তরের সঙ্গে মিশ্‌তে। সবুজ বনজ বেষ্টনীর মধ্যে কিশোরের সহজাত চঞ্চল চোখ কিন্তু পথ ছাড়া আর কোন দিকে নেই। চিৎকার সংযোগে সে শুধু তার ব্যাকুলতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখে।

আরো কতগুলো হাট-যাত্রী পথিকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। এখানে পুরুষের মধ্যে ত মার দেখা পাওয়া যাবে না। তাই হঠাৎ চিৎকার থামিয়ে দিয়েছিল সে দৌড়ের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতি আরো বাড়িয়ে। কিন্তু পথিকের কানে তার কাতর আহ্বান কবে সেঁধিয়েছে। তাই একজন হঠাৎ বাহারকে থামায়। উদ্দেশ্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদের।

এক হাটুরে অভয় দিয়ে বললে, "খোকা, তোমার মা কোথাও না কোথাও আছে। ভয় নেই।"

"ভয় নেই?" অস্থির কিশোর প্রশ্ন করে বসে, কিন্তু তার মূলে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না।

"না, ভয় নেই।" পাল্টা জবাব আসে।

মাঝবয়সী এক পথিক যোগ দিলে, "ভয় আছে।"

"ভয় আছে?" আবার বাহার বেশ ধীরে কথাটা উচ্চারণ করে বসে।

"আছে। ছুক্‌রি হলেই ভয়। তোমার মা ত আর ছুক্‌রি নয়। তোমার মার বয়স কত?

"বারো।"

"তোমার মায়ের বয়স অন্ততঃ পঁচিশ-ছাব্বিশ। আর বিইয়ে বসলে তরুণি থাকে না।" অভয় দিলে এই পথিক।

"কিন্তু আমার মা যে চির-তরুণি, চিরসুন্দরী।" বাহারের মন্তব্যে সমস্ত হাটুরে একযোগে হেসে উঠল।

একজন হাসি থামিয়ে সঙ্গীদের সম্বোধন করে, "শোনো, শোনো, ব্যাটা বলে কী?"

বাহার রসিকতার টের ধরতে পারে না, বরং পূর্বোক্ত সমতায় উচ্চারণ করে বসে, "হ্যাঁগো, আমার মা চির-তরুণি।"

জনৈক পথিক সঙ্গীদের আবার ডেকে বলে, "আরে ভাই, শোন্ ব্যাটা বলে কী?"

বাহার নিজের ঘাঁটিতে যথা-মোতায়েন। আর মন্তব্য টলে না, "হ্যাঁ গো শস্য-শ্যামলা মাঠের মত আমার মা চির-সুন্দরী, চির তরুণি।"

"ছেলেটা কবি-কবি ঠেকছে।"

"কারো কাছে গজল শুনেছে, বোধহয়।"

পথিকদের মন্তব্য শেষমাত্র বাহার আবার আত্মবিশ্বাসের হাওয়া ছড়ায়, "হ্যাঁ গো পথিক-ভাই আমার মা খুব সুন্দর।"

১ম পথিক : তা হোক। না বিয়োলেই ভয় ছিল।

বাহার : কেন?

২য় পথিক : সে তুমি বুঝবে না।

পথিকেরা চোখ ঠারাঠারি করে। বাহার হাবার মত বার বার মুখ থেকে মুখান্তরে দৃষ্টি চরিয়ে বেড়ায়।

পথের দূরত্ব হ্রাসে কারো কোন গড়িমসি সেই।

সেই অবস্থায় এক পথিক শুধায়, "তোমার মা বিধবা না সধবা?"

কথার মর্মোদ্ধারে অপারগ কিশোর।

আর এক পথিক তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, "তোমার বাপ আছে না নেই?"

বাহার : আমার খালি মা আছে।

১ম পথিক : বাপ?

বালক : আমার খালি মা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২য় পথিক : এ ব্যাটা হারামজাদা, যা ভাগ্ ভাগ্... এই ভর্ৎসনার পূর্বেই কিশোর সকলকে ছাড়িয়ে দ্রুত সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। মুখে আর্তনাদ, "আমার মা কোথায়?"

এবার গ্রাম মাঠ বন্দর নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সব ঘোরপাক খেতে লাগল।

বালককে আর দেখা যায় না। কিন্তু তার আর্তরব চারিদিকে তীক্ষ্ণ রণন তোলে। তার সঙ্গে যেন আরো এসে মেশে সহস্র সহস্র পঞ্জর বিদার আর্তনাদ, "আমার পুত্র, আমার ভগ্নী...আমার প্রিয়তমা...আমার বন্ধু...সুহৃদ...তারা কোথায়?...তারা কোথায়....?"

চার

এই বাদ্শাহী প্রাসাদেরই এক কোণে কারাগার ছিল। গুলশানের তা জানা। রাজ্যের আমির-ওমরা বা ঐ জাতীয় কেউ কোন বিরোধিতা করলে তাদের এখানে বন্দী করে রাখা হত। শিশুকালে একবার গুলশানের এমন কারাগার দেখার কৌতূহল দেখা দিয়েছিল। মার কল্যাণে সেই সাধ মেটে। কিন্তু তখন বিশেষ কোন বন্দী ছিল না। একজন মাত্র ব্যক্তি। কোন এক এলাকার সেনাপতি, মার মুখে শোনা। প্রহরিদের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়িয়েছিল তখন। কিন্তু আজো গুলশানের সমস্ত কয়েদখানার দৃশ্য মনে আছে। বন্দী সেনাপতি মেঝের উপর বসেছিল হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। তার মুখ গুলশান দেখতে পায়নি। জায়গাটা অস্পষ্ট অন্ধকারে ছাওয়া। অনেক নিচে একদম টিলার পাদদেশে। অনেকখানি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। কিন্তু সেদিন গুলশান গিয়েছিল এক প্রহরির কোলে চড়ে। আনন্দ ছিল কেবল এমন আরোহণের মধ্যে। নচেৎ কয়েদখানার মধ্যে তার বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছা হয়নি। দম বন্ধ হয়ে আসে, যেদিকে তাকাও। অনেক উপরে একটিমাত্র জানালা। তাছাড়া কত ফটক পার হতে হয়। মোটা লোহার গরাদে বিরাট বিরাট তালা ঝুলছে। সামনেই প্রহরি। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা-রত। আরো কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সে কেঁদে ফেলত। মা তার উস্‌খুসোনি দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিল। আরো বিরাট বিরাট কয়েকটা কামরা আছে। সেখানেই অসহায় বন্দীদের স্নানাহার ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। মার মুখে শোনা, এক কামরায় নাকি সাপ বিচ্ছু পুষে রাখা হয়। এসব শুনে বাদ্শাজাদির এমনই ভয় পেয়েছিল যে আর দেখার সাধ হয়নি। তখন মা বলতেন, সে নাকি কোমলপ্রাণ ভীরু মেয়ে। বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রাসাদের পাশ দিয়ে এক এক রাস্তা আছে, তা ক্রমশঃ মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। কোন এক জায়গায় প্রাসাদের দেয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। বন্দীদের দেখা যায় প্রাসাদ থেকে। তবে তাদের যাতায়াতের খবর অন্যভাবে টের পাওয়া যায়।

কিন্তু বাদ্শাজাদি সব বন্দীদের দেখার আর এক নতুন উপায় বের করেছে। আশ্চর্য, প্রহরিদের নাকি মানা শোনে না তারা। সবাই যৌথ কণ্ঠ মিলিয়ে গান গেয়ে গেয়ে প্রাসাদের পাশ দিয়ে যায়। তখন বাদ্শাজাদি মহলের ছাদে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। গোটা কাতার তার চোখে পড়ে। এমন কি বেশ নিরীক্ষণ করে মনোযোগসহ দেখলে সকলকে দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন আগে সন্ধ্যাকালে গুলশানের কানে আসে একদল নারীর যৌথকণ্ঠ। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। কারো মুখ দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সঙ্গীতের ধূয়া-দাত্রীর গলায় এমন আবেদনমাখা সুর ছিল, রাজকন্যা চঞ্চল না হয়ে পারে নি। সে ত জানে, এই হতভাগিনীদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এক পলকে গুলশানের মেরুদণ্ডকে যেন হেঁচকা টান দিয়েছিল। কল্পনা-নেত্রে সে দেখতে পায়, সুগঠিত যুবতী নারীর দেহ লুটিয়ে পড়ছে জল্লাদের খাঁড়ায়। তারপর মাথার খুলি লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হচ্ছে। ঠক্ ঠক্ শক্ত ধাতব এক রকম শব্দ হয় বৈকি। আহা, মানুষের মগজ দেখতে কেমন? বাদ্‌শা-দুহিতা আর ভাবতে চায়নি। কিন্তু তাকে রেহাই দিচ্ছে কে? মানব-মানবীর এমন অপূর্ব দেহ-গঠন। তাদের মস্তিষ্ক উজ্জ্বল বৈকি। পার্থিব সব উজ্জ্বলতার উৎস ত সেইখানে। কালো লোমশ হাত পাত্র বাড়িয়ে দিচ্ছে কালো সরীসৃপের মুখে। গুলশান এই সময় চিৎকার করে উঠেছিল। নিচে থেকে ছুটে এসেছিল পরিচারিকা সেহেলী। তখন বাদ্‌শাজাদি দেওয়ালে মাথা রেখে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছিল, আকাশের নৈশ পটে চোখ ছড়িয়ে। পা ঘষছিল সে লাল পাথরের ছাদের উপর, সব অস্থিরতার উপশম আশায়।

"বাদ্‌শাজাদি!"

সেহেলী ডাক দেয়। কিন্তু গুলশান কোন জবাব দেয় না। ধরা পড়ার বান্দা সে নয়। নিঃসঙ্গ জীবনে বিশেষতঃ পিতৃবিচ্ছেদের পর সে শিখেছে, সব অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতে নেই, অন্ততঃ প্রকাশের লজ্জা থেকে রেহাই দেওয়া উচিত। তাই পা ঘষ্‌ছিল সে, পা-ই ঘষতে লাগল।

"বাদ্‌শাজাদী।"

আবার সেহেলীর ডাক। এবার দেরি করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাই গুলশান পা-ঘষা অব্যাহত রেখেই শুধু উচ্চারণ করে, "সেহেলী।"

"চিৎকার শুনলাম আপনার?"

"তা শুনবে বৈকি। আমার গলা নেই?"

সেহেলী তখন হাসতে থাকে। তারপর হাসি থামিয়েই জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু আপনার গলা ত জিরাফের মত দরাজ নয়।"

সেহেলীর পাল্টায় বাদ্‌শাজাদির যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। সে সঙ্গিনীর হাত ধরে তাকে নিজের পাশে বসায়। দুইজনে সমবয়সী। তাই মনিব-বান্দীর ব্যবধান অত বেশি নয়। সেহেলী বিনা সঙ্কোচে পাশে বসে না শুধু, বাদ্‌শাজাদির কোমর জড়িয়ে ধরে দুই হাতে।

"আহ্ সেহেলী, দেড়ে দে।" কৃত্রিম-ক্রোধে প্রকাশ করলে বাদ্‌শাজাদি।

সেহেলী স্বভাবত মুখরা। সে সহজে বাঁয়ে বয় না। ফোড়ন দিলে, "আমার হাত দু'টো মেয়েলী হাত, কোন নওজওয়ানের নয়। ভয় পাবেন না।"

"মর, হতভাগী," উচ্চারণের পর গুলশান সেহেলীর হাত ছাড়িয়ে দ্রুত ঘুরে পড়ে এবার নিজের দুই হাত সঙ্গিনীর কাঁধে তুলে দিয়ে বলে, "সেহেলী, আমার একটা কাজ করতে পারবি?"

"একটা?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে পারব না।"

"ক'টা পারবি?"

"হাজারটা।"

সেহেলী জবাব দিলে দুইজনে হাসতে থাকে। রেশ থেমে গেলে মুখ খোলে গুলশান, "শোন্ ফাজ্‌লেমি নয়। আমার একটা কাজ তোকে করতে হবে।"

"একটা কেন? হাজারটা বলেন।"

"তোমাকেই শুধু বলা যায়।"

"কিন্তু আপনি কেন চিৎকার দিলেন?"

"ভয়ে—।"

"কিসের ভয়?"

"দানবের।"

"তাহলে হাকিমের কাছে এলাজ করান।"

"আরে না, সে কথা যেতে দে।"

"কেন?"

"আমার একটা কাজে তোকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে হবে।"

"আলবৎ করব।"

"তবে শোন্—।"

কিন্তু যৌথ নারীকণ্ঠের সঙ্গীত তখনও যেন বাতাসে লেপ্টে রয়েছে। হঠাৎ উৎকর্ণ বাদশাজাদি দ্রুত উঠে পড়ে হুকুম দিলে, বেশ গম্ভীর রব তুলে, "সেহেলী নিচে চল্। পরে বলব।"

AMARBOI.COM

পাঁচ

হরমুজ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝে। তার উপর নিদ্রাসুখ আর কতটুকু হতে পারে? তবু শরীরের চাহিদা অনেক সময় অভ্যস্ত বিধি মানতে নারাজ।

দু'দিনে এই জগতের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ ঘটেছে। প্রায় এক শ'জন মেয়ে-পুরুষ বন্দী থাকে দুই খাটালে। নারী-পুরুষের কথাবার্তা বা পারস্পরিক সাহায্যে প্রহরিরা বাধা দেয় না। তাছাড়া, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান ত। প্রতিদিন বিশ-পঁচিশ জন আসে, আবার কোথায় চলে যায়, কেউ জানে না। প্রহরিদের জিজ্ঞেস করে দেখেছে হরমুজ, তাদের কাছেও সব হদিস অজ্ঞাত। তারা কর্তব্য সমাধা করে মাত্র। আইনও বাঁধা আছে উপরওয়ালাদের কাছ থেকে। কয়েদিদের স্নানের কোন দরকার নেই। যে যে কাপড়ে আসে, সেই কাপড়েই চলে যায়। চার-পাঁচ দিন থেকে গেছে এমন কিছু থাকে। কিন্তু লেবাসের ক্ষেত্রে তাদের সম্বল বাড়ে না। শারীরিক দু'একটি নিয়ম যা অবশ্যপালনীয় তার বন্দোবস্ত অবিশ্যি আছে। পেসাবের জায়গা আছে, পায়খানা ফিরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারো। কিন্তু পানি মাপা, যেমন আহারের পানি। খাদ্য এমনই পর্যায়ে পড়ে।

হরমুজের কিন্তু কোন দিকে লক্ষ ছিল না। দুঃস্বপ্নের ঘোর তখনও তার চোখে। সে ভাবত, যে কোন মাদক দাওয়াই খেয়ে কি যেন সব দেখছে। কিশোর বন্ধুদের সঙ্গে হাশিষ খেয়ে একবার সে আজব আজব ছবি দেখেছিল ঘুমের ঘোরে। তারই জের চলছে যেন সেই অবধি।

কিন্তু একটা উপলব্ধি হরমুজের কাছে পাথুরে মেঝের মতই সত্য। বাদশা বা তার ডালপালা কার হুকুমেই সে এখানে নীত, কী তাদের উদ্দেশ্য, সে জানে না। মাঝে মাঝে এখানে তরুণ-তরুণীর সংখ্যা কমে যায়। তাই হরমুজ কোথাও মায়া-মমতার জাল ছড়াতে এগোয় না। দরকার কী? কারো সঙ্গে আলাপের যেন আগ্রহ জাগে না। খোরাসানি যুবক কুবাদের মুখ ভেসে উঠল। সে আসার পরদিনই এখান থেকে চলে গেছে। আহা, বেচারা, একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে হরমুজ। সে যেখানেই যাক, অন্ততঃ এখানকার অনিশ্চয়তা থেকে ত রেহাই পেয়েছে। সজ্জন মানুষ। তার সঙ্গে অল্প কথা। কিন্তু সেই মানুষকে চিনতে দেরি হয়নি। হরমুজ ভাবে, হয়ত সাধু লোকের কষ্ট কম। দেবতারা তাড়াতাড়ি সব লাঘব করে বা মুছে নেয় শতেক রকমের তক্‌লিফ। বাদশার বিরোধিতা করলে নানা শাস্তি-সাজার গল্প সে বাপের মুখে শুনেছে। কিন্তু সে ত অত সব বোঝে না। আর গ্রামের একটা প্রায়-অশিক্ষিত ছোকরা সে, তার পক্ষে কী-ই বা করা সম্ভব? দুনিয়ায় দেবতারা গজব পাঠায় মানুষের নৈতিক দিক সংশোধনে। তেমনই অভিশাপ কী নাজেল হল পারস্যের ভূখণ্ড জুড়ে। কিন্তু বাদশা কে? বাদশা-কে সে ত কখনও দেখেনি। তার কি ক্ষতি সাধন করতে পারে সে? চোখাচোখি কোন ব্যাপারে, সমঝোতায় স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া বাধে। তেমন কি বাধবে তার সঙ্গে, যাকে সে কখনও চোখেই দেখেনি। তবে কী বাদশা ফেরেস্তাদের মত নিরাকার কিছু? শরীরহীনের সে কী ক্ষতি করতে পারে? বাদ্‌শা অন্ততঃ মানুষ নয়। তবু বাবা কেন বলতেন তার সিংহাসন আছে, উজির আছে, পাইক সৈন্যসামন্ত আছে। এই সব বাদশা-বেষ্টন উপাদান— তারা ও কী নিরাকার? শোনা যায়, লড়াই বাধে রাজ্য নিয়ে। সে কেমনধারা লড়াই? আসমানে ফেরেস্তাদের যুদ্ধের মত কিছু হবে। এই সিপাই শান্ত্রীরা কিন্তু দেহধারী। সব গোলমাল ঠেকে হরমুজের কাছে। বাইরে গেলে, সে তার পুরাতন আলেম ওস্তাদ্‌কে জিজ্ঞেস করবে। বাদ্‌শা যদি মানুষ হয়, তার ভুলচুক নিশ্চয় ঘটে। তখন তার কোন শাস্তি হয় কী? কে দেয়? বাদ্‌শা ত মানুষ, তা নিয়ে কোন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। খামখা কল্পনা করে লাভ কী? সবাই জানে, বাদ্‌শা মানুষ। বাদ্‌শার অসুখ করে। তবে সে মানুষের ধর্ম জানে না কেন? হুকুম দিতে তার ত ভাবা উচিত, তার ভুলচুক আছে। সুতরাং কারো প্রাণ নিয়ে টানাটানি করা উচিত নয়। নিজের ভুলের সংশোধন আবার সম্ভব। কিন্তু মরা মানুষকে প্রাণ দিয়ে কে আবার চাঙ্গা করে তুলবে? তেমন হাকিম ত দুনিয়ায় এখনও জন্মায়নি। আর শুধু একটি জীবন? জীবন কী পাথরের কোন লম্বা ত্রিশূল। ত্রিশূল গড়তেও লোহা লাগে। নিরেট লোহা আবার লৌহের অজস্র পিণ্ড। জীবন ত তেমনই। একা হলেও একা নয়। মা-বাপ ছাড়া জন্ম হয় দেবতাদের। মানুষের মা-বাপের দরকার। একটি মানুষের প্রাণ-লতা ছিঁড়ে গেলে তার আশপাশের লতায় টান পড়তে বাধ্য। গুণী জ্ঞানী লোকই ত বাদশা হয়। তারা এই সহজ কথা বোঝে না, নিশ্চয়ই বোঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। না-হলে এমন টানা-হেঁচড়া চলে কেন প্রাণ নিয়ে? অথবা বাদ্‌শা গোটা আলবুরুজে পাহাড়ের মত আর একটা কিছু। বিরাট কিন্তু স্পন্দনহীন। পাথরে স্পন্দন নেই, তাও জোর করে বলা যায় না। কারণ কেউ ত পাহাড় হয়ে দেখেনি। পাহাড় হয়ে গেলে আগেকার কথা কি-ভাবে মনে রাখবে— সে মানুষ ছিল? খোরাসান-কেরমানের বিশাল প্রান্তর ঘিরে কত পাথর আছে। ধরে নেওয়া যাক, সেগুলো নিষ্প্রাণ। বাদ্‌শা তেমনই একটা কিছু। এমন কথা বাদ্‌শাদের কেউ কোনদিন বলেনি, বলা উচিত। জননী কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবেন। আঁধারের মত সব দিক থেকে ঘৃণিমা তাকে চেপে পিষে ফেলবে। দেহ যাওয়ার আগে চিন্তার কলকজাগুলো মাথায় বুকে ঠক্‌ঠক্‌ আঘাত করবে এমন জোরে যে কানে আর কিছু শুনবেন না পিতা। আঙুরের ক্ষেতে পাকা ফলের গন্ধে পাখিগুলো যেমন ঠোকর দেওয়ার আগেই চঞ্চুদেশে সুড়সুড়ি অনুভব করে, মৃত্যুর নির্দয়তা তেমনই আগেভাগেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে জানান দিয়ে যাবে। বাদ্‌শাকে এসব বলা যেত। কিন্তু তিনি ত নিরাবয়ব, অন্ততঃ সাধারণ মানুষের কাছে। কুবাদের গ্রামের নাম আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। ভালই হয়েছে। পাঁজরের লতাগুলো চারিদিকে ছড়ালে অনর্থ বাঁধে। অথচ পাঁজর শক্ত হাড়। সেখানে নরমের আনাগোনা হয় কেন? রক্ত আছে বলে, বোধহয়। বন্দীদের এখানে রক্ত দিতে হচ্ছে হয়ত। কিন্তু কেউ জানে না, কেন কিছুই জানে না কেউ? আমরা ভয় পাব বলে কী বাদ্‌শার এমন করুণা? কারণ জানা থাকলে ভয় পালিয়ে যায়, তা দুনিয়ার বাদ্‌শারা জানে না। আয়ুর মেয়াদ কমে যায় সত্য। কিন্তু সময়কে মাপার জন্যে যে-যার তুলাদণ্ড ব্যবহার করে। কুমির দু'শ বছর বাঁচে। কুমির হয়ে কে বাঁচতে চায়, এক কুমির ছাড়া?...

খোঁয়ারি হরমুজের দুই চোখ ধরে ক্রমশঃ টান দিতে থাকে। ঘুমানোর আর কোন ইচ্ছা নেই তার। চোখ খুলে খুলে সে কারাগারের মেঝের উপর শায়িত আলোছায়ায় স্পষ্ট মুখগুলো দেখতে চায়। কিন্তু রেহাই পায় না। আবার অকস্মাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে, পরিচয়ের রশি আরো লম্বা করে লাভ কী?

ছয়

জম্‌শেদ দারিয়ুস পারস্যের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। নানা ব্যবসায় লিপ্ত। তা-ছাড়া, তার বাগ্‌বাগিচা এবং ক্ষেত-খামারের তায়দাদ প্রচুর। তাঁবেদার গোলামের সংখ্যা এক হাজারের কম নয়। তদুপরি প্রজা-বল আছে। প্রয়োজনে হাঁকডাক দিলে দলে দলে হাজির হয়।

সেদিন বিকালে তিনি নিজের বাগানে পায়চারি করছিলেন। কি এক চিন্তায় রীতিমত নিবিষ্ট। পণ্ডিত হিসেবেও তাঁর নাম আছে। রাজদরবারে ত বটেই, গোটা এলাকায়। এতক্ষণ প্যাপিরাসের এক কেতাব দেখছিলেন তিনি। কিন্তু এসব আঁকিবুকির মধ্যে তার দৃষ্টি হয়ত ছিল, মন ছিল না।

বাগানের চত্বরে লাল পাথরের এক গোলাকার টেবিল। উপরে শরাবের কুঁজো, কিছু কাবাব এবং প্রজাদের পাঠানো সবুজ কয়েক গোছা আঙুর তস্তরির উপর রক্ষিত। এদিকে তাকালে বোঝা যায়, এতক্ষণ কিছুই স্পর্শ করেননি তিনি। অন্ততঃ কয়েকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঙুর হয়ত এতক্ষণ মুখে দিতে পারতেন, তারও কোন লক্ষণ নেই কোথাও।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে গেল। এক গোলাম বাতি এনেছিল কিন্তু তিনি তখনই তা ফেরৎ নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। হাল্কা অন্ধকারের মধ্যে অনেক সময় চোখ ঘোরাফেরা করতে সোয়াস্তি পায়। কারণ, সেখানে কোন দেখাই স্পষ্ট নয়। বহুতর ব্যঞ্জনা বিধায় অস্থিরচিত্ত বাইরেও তেমন প্রবাহ দেখে সান্ত্বনা লাভ করে। স্পষ্টতা আর অস্পষ্টতার হেঁচকা টানে কোথাও বিব্রতবোধের সম্ভাবনা থাকে না।

বান্দা চলে গেল।

মনিবের হুকুম, তার বলার কিছু থাকে না। তাছাড়া সে দেখে নিয়েছিল প্রভুর মুখাবয়বে অশেষ অপ্রসন্নতার আদল। শুধু আজ নয়। বেশ কিছুদিন থেকে এই ব্যাপার চলছে। খানাপিনার সরঞ্জাম কিছু কম হয় না। কিন্তু খাবার প্রায় পড়েই থাকে। অবিশ্যি বান্দার সেজন্যে দুঃখ নেই। কারণ, ভাল খাবার পাওয়ার আর ত কোন উপায় নেই। উচ্ছিষ্ট অন্ন একমাত্র তার সৌভাগ্যের সোপান। অন্ততঃ দেহটা ঠিক রাখে। বান্দা বুদ্ধিমান যুবক। সে চুপিচুপি চলে গেল।

জম্‌শেদ দারিয়ুস একা বাগানে অনেকক্ষণ হাঁটলেন। তারপর যখন ক্লান্তির চোটে পা প্রায় আর ওঠে না, তখন পাথরের টেবিলের উপর এক বেদীর উপর বসলেন কয়েকবার ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। বাতাসে ঘাম শুকিয়ে এলো সামান্য। তখন তিনি জামে শরাব ঢালতে লাগলেন। প্রথমে এক দীর্ঘ চুমুক শেষে ধীরে ধীরে জাম টেবিলের উপর রেখে স্বস্তির আমেজ পেলেন যেন। একটা ছোট ঢেকুর পর্যন্ত উঠল। তখন আঙুল আন্‌মনা কাবাবের এক প্রান্তে গিয়ে থামে। এক টুকরা শূল্য-মাংস মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে দারিয়ুস ভাবলেন, এখন কোন সঙ্গী থাকলে মন যেন হাল্কা হয়ে যেত। তখন এক এক মুখ যাচাই চলে। পত্নী অচল। খামখা একঘেয়ে বিরক্তির চোটে জান্ যাওয়ার উপক্রম হবে। দাস-মহলে কোন তরুণীকে ডাকলে মন্দ হয় না। কিন্তু সবাই জানে দারিয়ুসের আবাসে কম-বয়সী কোন নারী নেই। দু-এক জনকে তিনি রেখেছেন চোখের আড়াল করে। মাঝে মাঝে পুরুষালী শখ মিটাতে উপযুক্ত পাত্রী না থাকলে চলে না। আরো ব্যবসায়ী সঙ্গীদের মুখ তিনি যাচাই করলেন। একদল গাধা। আহার বোঝে, শয়ন বোঝে, লেবাস বোঝে। কিন্তু রুচিহীন। মিহি কিছু হলেই সব কুকুরের মত, চন্দ্রোদয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। না জানে সংগীতের কদর, না বোঝে গজলের ঐশ্বর্য। যৌথ একটা প্রশংসা-ধুয়া হয়ত পাওয়া যাবে। তখন ও-গুলো ষাঁড়, চুপ করে থাকার জায়গায় চিৎকার দেবে অথবা তারপর চেয়ে বসবে অন্ধকারে কোন নারী ওঁৎ পেতে আছে নাকি, নচেৎ এন্তেজাম করো। স্তব্ধতার কূপে ডুব দিতে পারে কেবল রসিক ব্যক্তি। এমন পরিচিত বহু মুখ খারিজের পর আর কোন মুখ দারিয়ুস কল্পনা করতে পারছিল না, যে বা যারা এই মুহূর্তে তার সর্ব শূন্যতা ভরাট করে তুল্‌বে নিজ নিজ অন্তর-গুহার দৌলত সম্ভার ছিটিয়ে ছিটিয়ে, বালক যেমন সূর্যের চমক বালুকণায় উজ্জ্বলতর করে তোলে ক্রীড়াকালে মুঠি মুঠি ছড়ানোর ভঙ্গিতে। যখন খা খা প্রান্তর গোটা পৃথিবী, তখন যে-কোন বিলাস-সম্ভার তুচ্ছ হয়ে যায়।

আরো মুখ এবং জায়গার জরিপ গ্রহণ করলেন দারিয়ুস। কোথাও অস্থিরতা থামতে চায় না। একবার তাঁর মনে হল, ঠাণ্ডা পাথরে মাথা রাখলে বোধহয় দেহজ আরাম থেকে

প্রশান্তির রাস্তা খুঁজে পাবে। শীতকালে স্নানের সময় গায়ে গরম পানির স্পর্শ এমনই চিজ। কিন্তু শরাবে ত মাথা গরম হয়ে আছে। শিথিল স্নায়ুরা পাথর বমি করবে তখন। তাই দারিয়ুস আরো কয়েক ঢোক মদ্য গলায় ঢেলে দিলেন। তারপর আনমনা আঙুর কয়েকটা জিভে লাগান। নির্যাস ভেতরে। জিভে নির্যাসের উপাদান, কিন্তু কাঁচা। আরো কিছু আঙুরের রস জিভে লাগল। কাঁচা-পাকা আলো-আঁধারি যেন তাকে অনেকখানি স্বস্তি দিলে।

এই সময় এলো ভৃত্য। এবার অন্ধকার থেকেই সে ডাকে, "মহান গৃহস্বামী।"

— কি রে?

— অতিথি এসেছে। সাক্ষাৎপ্রার্থী।

— কে?

— দক্ষিণ মাজেন্দারানের শাহ্ জার্জিস।

— ডেকে নিয়ে আয়। মোমের বাতি নিয়ে যাস একটা। আর একটা 'জাম'।

— যথা আজ্ঞা।

জার্জিসের মুখ এবার ব্যবচ্ছেদের পাটায়। নানা ব্যবসার দুই জনে শরিক। লোকটা অতি নির্বোধ। কিন্তু ব্যবসায়ে কোহিনুর মণি। আশ্চর্য তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। লম্বাটে মুখ এবং নাকের সঙ্গে দীর্ঘ ভুরুর মধ্যে তার দুই চোখ সব সময় সজীব। যখন তাকায়, মনে হবে, তোমাকে বিঁধ করছে। অথচ আক্কেল এতদূর বিস্তৃত যে নির্বোধ— হ্যাঁ, নির্বোধ বলা চলে। হঠাৎ-হঠাৎ সে কাজ করে বসে, খেয়াল যদ্দুর নিয়ে যায়। অথচ জাহুকের দরবারে সেই সবচেয়ে প্রতিপত্তি-শালী।

"জানোয়ারটা এসে গেছে।" অস্পষ্ট উচ্চারণ করে বসলেন দারিয়ুস। তার পর আরো ফিসফিসের জের টানলেন, "তবু কিছু সময় কাটবে। আরও কী ভাবছে, দেখা যাক।"

ভৃত্যের সঙ্গে জার্জিস এসে পৌঁছল। দারিয়ুস উঠে তাকে আলিঙ্গন করলেন। করমর্দন চলল অনেকক্ষণ। উভয়ের ঠোঁটে হাসি মোমের আলোয় দেখা যায়। ভৃত্য আগেই সরে পড়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রভুর আইন-কানুন সে ভালমত জানে।

প্রথমে মুখ খুললে জার্জিস, "দারিয়ুস, তোমার হয়েছে কী? বাগানে অন্ধকারে বসে আছো। ফূর্তিফার্তা নেই?"

"বয়সটা দেখবে না?"

"চল্লিশ বিয়াল্লিশ আবার বয়স নাকি?"

"আমার এখনও প্রতি রাত্রে—" তারপর জার্জিস হো হো হেসে নিজের কথা চাপা দিলে।

"তোমার কথা আলাদা। তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি।"

"আর তুমি?"

"হতভাগা— হতভাগা— ।" দারিয়ুস শুধু উচ্চারণ করলেন না, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন, যার মধ্যে কথাগুলো লেপ্টে রইল।

"এলাম সন্ধ্যায়, তুমি আদিখ্যেতা জুড়ে দিলে। এই জন্যে তোমাদের মত লোক থেকে দূরে থাকি। শত হস্তেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

"কেন আবার কী? ওই জন্যে আমি লেখাপড়ার ধার ধারি নে। লাভ কী? দু'দিন দুনিয়ায় এসেছো, মজা করো।"

"বড় মেজাজে আছো।"

"আমি সব সময় মেজাজে থাকি। ভেবে কোন ফায়দা নেই।"

দারিয়ুস 'জামে' শরাব ঢেলে সহচরকে এগিয়ে দেন।

জার্জিস ঘট্‌ঘট্‌ এক প্রস্থ উজাড় করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে, "সত্যি তোমরা সবাই আমাকে বোকা মনে করো, তা আমি জানি। কিন্তু আমি সুখে আছি, বাদশার চেয়ে।"

"কী ভাবে?"

"আমি একটা কথা স্রেফ বুঝি। এই এদিক ওদিক করে লাভ নেই। সোজা কথা। পেট আর তার নিচের এলাকাটুকু যদি ঠাণ্ডা থাকে দুনিয়া ঠাণ্ডা। মাথা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।"

" ওই এলাকা তোমার সব সময় ঠাণ্ডাই থাকে?" জিজ্ঞেস করে বসলেন দারিয়ুস।

শরাবের মৌতাত এতক্ষণে তাকে চাংগা করে তুলেছে। রসিকতা উপভোগের শক্তিটুকু যেন মেধায় প্রত্যাগত। তিনিও হো হো হেসে উঠলেন, জার্জিস যখন তার মন্তব্যে জায়গা মাৎ করে তুলছে কণ্ঠরব এবং দু পাটি দন্তরাজি সহযোগে।

আরো অনুপান জুটল। সুখও দুঃখের মত একা একা আসে না।

বুলবুলি ডাকছে কোথাও বাগানের অন্ধকারে।

জার্জিস শিষ দিতে লাগল।

পায়চারি শুরু করলেন দারিয়ুস। মনের গুমোট কেটে গেছে তার। এতক্ষণ তিনি সঙ্গীকে ভেবেছিলেন ছাগল। এখন মনে হয় যেন ছাগ-দেবতা। না, লোকটার বেশ ভূমিকা আছে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সে হাওয়া বদলে দিতে পারে। বিচিত্র সংসারে নানা ধরনের লোক না থাকলে তার ছলনাময়ী নাম বৃথা যেত।

দারিয়ুসের ঠোঁটে হাসি লেগে আছে, যখন তিনি উপবেশনের পর আবার জাম পূর্ণ করে দিলেন নিজের ও বন্ধুর জন্যে।

জার্জিস তখন প্রস্তাব করলে, আর এক সভাসদের বাগানবাড়িতে হানা দিলে কেমন হয়? দারিয়ুস কথায় কানই দিলেন না। বরং শরাব-বুঁদ কণ্ঠে একটা গজল গাইলেন। তখন তাঁর মনে হল, পৃথিবীতে কোন দুঃখ নেই।

জার্জিসের মৌতাত তখনও নিম-মাত্রায় অস্থির। এগোতেও পারে, পেছানোর সম্ভাবনাও যথারীতি আছে।

স্বাভাবিক কণ্ঠেই সে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা দারিয়ুস, কী সমস্যায় তুমি প্রপীড়িত ছিলে?"

— কিছু না।

— নিশ্চয়ই কিছু। নচেৎ তুমি আমার প্রস্তাব এই মাত্র ঠেলে দিলে।

দারিয়ুসের আত্মস্থ হতে একটু সময় লাগে। শরাবের ধোঁয়া অবিশ্যি কয়েক বার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃশ্বাস টানার ফলে এক দিকে সরে গেল। তখন দারিয়ুস রাস্তা পান। কী জবাব দেবে, তার চিন্তা তিনি বেশিক্ষণ করেন না। কিন্তু মুখ খুলতে তবু দেরি হয়।

এত্তেলা দিলে জার্জিস, "বয়স্য, সমস্যা কি শুনতে পারি।"

দারিয়ুস তখন বেশ গম্ভীর হয়ে ওঠেন। মোমের আলোয় সঙ্গীর মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু সেদিকে তাকান তিনি। কণ্ঠের শিরা বেশ টান্‌টান হয়ে ওঠে। কারণ, স্বর যথা-সম্ভব গম্ভীর করতে চান।

শেষে তিনি বলেন, "এই সমস্যা তোমারও। কিন্তু দেখছি, কিছুই তোমাকে স্পর্শ করেনি।"

— স্পর্শ করে নি? জার্জিস তখন বেশ কৌতূহলী হয়েই শুধায়।

— না।

— সমস্যাটা কি বলো, শুনি।

— আর ত যোগান দিতে পারছি না।

জার্জিস তখন হেসে উঠল। দারিয়ুস বিরক্তির সঙ্গে মুখ কুঞ্চন করেন। ছাগ-দেবতা আবার ছাগলে পরিণত হয়েছে। খামাখা হাসছে সে। আরো বিরক্তি দেখায় দারিয়ুস তার প্রশ্নে।

— খামখা হাসছো কেন?

— তোমার কথায়।

— কি বুঝলে?

তোমার অঢেল দৌলত। তোমার আবার কোন জিনিস যোগান দিতে অসুবিধা হবে।

— তুমি সত্যি একটা আহম্মক। জার্জিস কথাটা গায়ে মাখে না। সে বরং তার হাসির রেশ টেনে জবাব দেয়,"তা হয়ত। কিন্তু তোমার মত নই।"

দারিয়ুস এবার আর নেশার খোঁয়ারিতে নেই। সোজা চাঁচাছোলা আওয়াজে গলা থেকে বের করেন, "তুমি একটা উল্লুক। দশ বছর ধরে ছোঁড়াছুড়ি চালান দিয়েছ প্রতিদিন। কিছু প্রৌঢ় বৃদ্ধও আমার মত গেছে। তুমি নিরেট মূর্খ। নচেৎ তোমাকেও পাঠিয়ে দিতাম।"

জার্জিস আদৌ চেতে না, বরং হেসে হেসে বলে, "এই দশ বছর হচ্ছে আমার বারো পোয়া। বহুত কামিয়েছি। বহুত লুটেছি। ফারেস প্রদেশে লড়াই বেধেছিল। সেখান থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে কত মেয়ে-মরদ মাজেন্দারানে পালিয়ে আসে। এখন সস্তায় বান্দ-বাঁদী পাওয়া যায়। গোলাম-বাজারে গিয়ে দেখেছো? তোফা-তোফা বাঁদী। ঘরের কাজে, বিছানায়, বাগানে সব জায়গায় তোফা কাজ করে...সমস্যা কী?"

"সমস্যা ত ওইখানে। এদের যোগান দেওয়ার ভার নিয়েছিলাম। আমার আড়কাঠি রয়েছে খুজিস্তান, আজারবাইজান— কোথাও বাদ নেই। কিন্তু আর ত পাওয়া যায় না। মানুষ ধরা বড় মেহনত। আর ভাবছি, এসব নিয়ে ওরা করে কী?"

জার্জিস আবার হাসতে লাগল। দারিয়ুস তখন বিরক্ত হন না, কিন্তু হতাশায় সঙ্গীর কাছে নিজেকে সোপর্দ করেন।

জার্জিস ফোড়ন কাটে, "কী করে তা আমাদের দেখার দরকার কী? আমার দরকার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিরহাম। তা পেলেই হল।" তারপর সভাসদ আর এক চোট হেসে নিলে, তারি ফাঁকে ফাঁকে বললে, "জানো ত দরবারী গোপন-কথা সবাই জানে, অথচ গুপ্ত থাকে। এ এক মজার ব্যাপার। সবাই জানে অথচ কেউ জানে না। আমি বলছি—," জার্জিস তখন তর্জনি বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে একদম গেঁথে ফেলার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে, "তুমিও জানো, দারিয়ুস।"

নিজের কাটা ঘায়ে কেউ যেন খোঁচা যোগে নেড়ে দিচ্ছে, দারিয়ুসের তেমন অবস্থা। তখন এক ভরা জাম গলায় ঢালতে ঢালতে খুব ভেজানো স্বরে দারিয়ুস জিজ্ঞেস করলেন, "শোনো, জার্জিস, সরবরাহ এত কম, আর ত পারা যায় না। চুক্তি পালন না করতে পারলে, গর্দান যাবে। নির্ঘাৎ যাবে।"

— এ একটা সমস্যা বটে। তার উপায় নিশ্চয় আছে।

জার্জিসের জবাবে দারিয়ুস আর কিছু যোগ করেন না। মনে মনে ঠাওরান, জানার কৌতূহল থেকে মনের কি অস্থিরতা আসে তা এই দুম্বাকে জানিয়ে কোন লাভ নেই। বরং অন্য কিছু খোঁজ নেওয়া যাক্। তখন জার্জিসের কথা লুফে নেওয়ার ভঙ্গিতে তার দিকে তিনি মুখ ফেরান।

জার্জিসের বিলম্ব ঘটে না উপায় বাৎলে দিতে।

জার্জিস : ফাঁদ পাতো।

দারিয়ুস : ফাঁদ?

জার্জিস : হ্যাঁ, প্রলোভনের ফাঁদ।

দারিয়ুস : খোলাসা কর।

জার্জিস : শহরে শহরে এলাকায় এলাকায় তামাসা লাগাও।

দারিয়ুস : তামাসা?

জার্জিস : হ্যাঁ। শহরে নতুন নতুন উত্তেজনা বসাও। তরুণ বয়সে সবাই কৌতূহলী থাকে, হুজুগে মাতে। তখন কেল্লা ফতে।

দারিয়ুস : সে কেমন?

জার্জিস : বহত তরুণ-তরুণীর সন্ধান পাবে। আমি ত এইভাবে কত যোগাড় করলাম। আড়কাঠি তোমার লোক। তা-কে সাহায্য কর।

দারিয়ুস : আচ্ছা।

জার্জিস : মেলা বসাও। কুস্তি লড়াও। ওই ধরনের নানা তামাসা। ব্যস, আর কোন অসুবিধা হবে না।

দুইজনে রাত্রির আহার এই বাগানেই সমাধা করল। কথায় কথায় নানা ব্যবসার ঘের জানা হয়ে গেল দারিয়ুসের। কিন্তু জার্জিসের বিদায়ের পর আবার সব গোলতাল পাকিয়ে যায়। তার মনে হয়, দশ বছরে এত তরুণ-তরুণীর সরবরাহক হিসেবে তার কি জানার কোন অধিকার নেই, কেন এমন পেশায় তার জীবিকা জড়িত। দিরহাম অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এতটু স্থির মনে কবিতার রস আস্বাদানের উপায় থাকবে না তার? জার্জিসের মত হতে পারলেই সব সমস্যা উবে যেত।

দারিয়ুস ভাবলেন, কাল আড়কাঠিদের খবর দিতে হয়। জার্জিসের ফাঁদ কিন্তু বেশ তোফা। সহজ অথচ কার্যকরী। হাই উঠতে লাগল দারিয়ুসের। তিনি বাগানেই ঘুমিয়ে পড়লেন, অবিশ্যি বেমালুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

প্রাসাদ-কক্ষ।

দেওয়ালের জালির ভেতর দিয়ে বিকালের আলো এসে পড়ছিল।

গুল্‌শান এবং সেহেলী চুপ্‌চাপ বসেছিল। উভয়ের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। সেহেলীর চোখ মেঝের উপর। বাদ্‌শাজাদি বাইরে আলোর দিকে তাকিয়েছিল। ঝরোকার জালির ভেতরে ভেতরে কালো রঙ লেগে রয়েছে। কারণ, সব জায়গায় ত আলো পৌঁছোয় না। এই নক্‌শার ভেতর গুল্‌শান কী যেন দেখছিল। মনের আবেগ এমন রঙ ও রেখায় অনেক সময় সোয়াস্তি পায়।

স্তব্ধতা ক্রমশঃ ভারি হয়ে আসে।

দুই প্রাণী একটু নড়ে না মাত্র।

সেহেলী একবার আড়চোখে সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে নিলে। রাজকুমারি সত্যি সুন্দরী। তার কচি-কোমল মুখ সব রঙ মুছে দেওয়ার চেষ্টায় যেন অপারগ। সেহেলীর মায়া হয়। এখনই আদর জানাতে পারত সে। বাঁদী থেকে তার এই মর্যাদা পাওয়া। তাই সীমা ছাড়িয়ে যেতে এখনও বাধা পায় সেহেলী ভেতর থেকে । নচেৎ এখনই সে বান্ধবীকে চুমু খেয়ে বসত। অতদূর এগোতে না পেরে সে অপলক চেয়ে রইল বাদ্‌শাজাদির দিকে যদি এই গুমোট কাটে। আর বেশিক্ষণ এমন পরিবেশ অসহ্য। কিন্তু বাদশাজাদির নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

সেহেলী নিরুপায় এবং শেষে মরীয়া, মুখ খুললে, "বাদশাজাদি আপনার হুকুমে আমি মরতে পারি। আর খুব সহজে। কিন্তু—।"

গুল্‌শান সুপ্তোত্থিতের মত ধীরে ধীরে সচেতন হয়। কথা বলে না সে। সঙ্গিনীর হাত নিজের কোমল হাতে নিয়ে চাপ দিতে থাকে। বাঁদীর গা-ছোঁয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু নিজের ক্ষিপ্রবুদ্ধি এবং আন্তরিকতায় সেহেলী সকলকে জয় করে ফেলেছিল। গুল্‌শানের স্বর্গীয় জননী তাকে মেয়ের সঙ্গে ফারাক করত না। সেহেলী অকারণ আদরে বিগলিত হয়ে পড়ে। আর সে গুল্‌শানের হৃদয়ের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত।

নিজের মনেই সেহেলী আবার জের টানে, "কিন্তু, প্রহরিরা যদি রাজি না হয়। আর সেনাপতি বা বাদশার কানে গেলে তখন কী দশা হবে?"

গুল্‌শান এবার পুরোপুরি সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে আছে। সেহেলী আরো উৎসাহিত হয়ে ওঠে আর বলে, "আমার যা হয় হোক। কিন্তু আমি ভাবছি আপনার কথা। আমার প্রাণের কী দাম আছে। কিন্তু আপনার?"

"সকলের প্রাণের দাম আছে। সেখানে তোর-আমার ফারাক নেই।"

এতক্ষণে গুল্‌শান মুখ খুললে। তার কণ্ঠও স্বাভাবিক। গণ্ডদেশে বিকালের আলোর সঙ্গে আরো রঙ খেলা করছে।

"বাদ্‌শাজাদি, আপনি দেবতা। আপনার কথা আলাদা। আমি মানুষের কথা ভাবছি।"

সেহেলী আরো গম্ভীর মুখে উচ্চারণ করলে।

তখনও বাঁদী ও বাদ্‌শাজাদির হাত এক ঠাঁয় লেগে আছে। সেহেলীর তালুর উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপ দিতে দিতে বললে গুল্‌শান, “কিন্তু আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কতো মুখ যায় প্রাসাদের পাশ দিয়ে সুড়ং পথে, সে মুখ আর ফিরে আসে না। অন্ততঃ আর একবার সেই মুখ আমি যেন দেখতে পাই।”

“কিন্তু বাদ্‌শাজাদি, প্রহরিদের কাছে মুখ-খোলা—,” সেহেলী ইতস্ততঃ করে।

তার বাক্য পূর্ণ করলে গুল্‌শান, “তুই মুখ খুল্‌বি, আমি প্রহরিদের মুখ বন্ধের বন্দোবস্ত করব।”

“কি দিয়ে?

বাদ্‌শাজাদি এবার হাসতে হাসতে বললে, “পাথর দিয়ে।”

গুমোট স্তব্ধতা থেকে আবার বিহগ-গুঞ্জিত সকালের কোলাহলের মধ্যে তারা হাঁটছে, সেহেলীর মনে হয়। গুল্‌শানের রসিকতা আচম্‌কা, তাই ধরতে পারে না সে। বোকার মতই জিজ্ঞেস করে বসে,“ পাথর দিয়ে?”

“হ্যাঁ। কেন পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করা যায় না?”

“কাঠ দিয়েও পারা যায়, পাথর কেন?” সেহেলী জবাব দিলে, কিন্তু ঈষৎ ক্ষোভ ও বিরক্তি গলার আওয়াজ থেকে বেরিয়ে আসে।

গুল্‌শান তখন সহজভাবেই বললে, “তুই মূর্খ, শোন। এই রাজ্যে ঘুষই ত লোকে খায়। আর নাকি রুটি খায় না, আমি আমার শিক্ষকের কাছে শুনেছি। তাই তোকে বললাম, পাথর দিয়ে।”

তারপর বাদ্‌শাজাদি নিজের পাথর বসানো একটা আংটি অনামিকা থেকে তাড়াতাড়ি খুলে সেহেলীর চোখের সামনে ঈষৎ দোলা আর ঝোলা একত্রে মিশিয়ে হাত নাড়তে লাগল।

এবার সেহেলীর ঠোঁটেও হাসির রেখা দেখা যায়। তারপর হঠাৎ দীপ্ত হয়ে সে বলে. “বাদ্‌শাজাদি, আপনার পুরুষ হওয়া উচিত ছিল।”

“কেন?”

“আপনার এত বুদ্ধি। আপনি বহু দেশ জয় করতে পারতেন।”

“তা আমার বুদ্ধিতে কুলাত না। খুনোখুনি জানোয়ারেই পছন্দ করে।”

সেহেলী কৃতজ্ঞ নয়নে রাজকন্যার দিকে তাকায়। শ্রদ্ধায় তার বুক ভরে ওঠে। কী ভাবে আর তা নিবেদন করবে। হঠাৎ গুল্‌শানের পা ছুঁতে ছুঁতে বলে, “বাদ্‌শাজাদি, আমার নাসিব। নচেৎ কত ছোট হয়ে জন্মে আপনার কাছে থাকতে পেলাম।”

কৃত্রিম ক্রোধে গুলশান সেহেলীর পিঠে এক চপেটাঘাত লাগিয়ে মুখ খোলে, “হাত সরিয়ে নে।”

কণ্ঠ বাদ্‌শাজাদির গম্ভীর।

আরো স্বর আদেশ-দীপ্ত করে গুলশান বলে, “আমি যা হুকুম করব, করবি?”

“করব।”

খুব নম্র গলায় সেহেলী উত্তর দিলে। হঠাৎ এমন বায়ু পরিবর্তনের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। মনে মনে ভাবে, রাজার দুলালিরা এমনই হয়। তখনও সঙ্গিনীর চোখের দিকে তাকায়নি সেহেলী।

AMARBOI.COM

হঠাৎ তার দৃষ্টি ফিরল।

হাসি গুলশানের চোখে জাপ্টে ধরে রয়েছে। সেহেলী তখন সহসা হাসতে পারে না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-কৃপার জের বয়ে যায়। সত্যি সে বোকা। রাজকুমারিকে চিনতে তার ঢের বাকি।

সামান্য সময়ের ব্যবধান।

তারপর সেহেলীও হাসে এবং এবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, "সত্যি দিদি, আমি একটা আহম্মক।"

এতক্ষণ মনের জোর ছিল না। তাই ভাবনাই তাদের ঘিরে রেখেছিল। এবার কিন্তু দুই জনে সোজাসুজি কথা হয়। মানুষের মুখ একবার দেখার পর আর দেখা যাবে না, এমন বিধি মানা উচিত নয়। সব বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা যে-কোন প্রকারে করতেই হবে। প্রাসাদশীর্ষ থেকে একবার ত দেখা যায়। কিন্তু এই ঝলক যথেষ্ট নয়। সেহেলী প্রহরিদের সঙ্গে ব্যবস্থার ঝুঁকি নিলে। রাজকন্যার ত পাথরের অভাব নেই। সুতরাং মুখ বন্ধ করা কী তবুও কঠিন কাজ হবে?

সেহেলী শলা-পরামর্শের শেষে জিজ্ঞেস করলে, "কিন্তু বাদ্‌শাজাদি, এরা যায় কোথায়?"

গুল্‌শানের মুখ সহসা কালো তবু কপট অভিনয় মারফৎ হাওয়া যথারীতি বজায় রাখতে জবাব দিলে, "তোকে আর একদিন বলব।"

AMARBOI.COM

আট

চোখ খুললে হরমুজ।

সে কিছুই যে দেখতে পাচ্ছে না। দু'দিন থেকে তার শরীর ভাল ছিল না। একদিন ত সে প্রহরি-প্রদত্ত আহার ছোঁয়নি মাত্র। কিন্তু আজ কখন সে খেয়েছে তা-ও মনে নেই। একটি উপলব্ধি মাত্র তা-কে পেয়ে বসে। সে কেন এত দিনের মেয়াদ পেল এখানে? সকলে ত দুই-তিন, জোর চারদিনের অতিথি এই জায়গায়। অসহ্য এই পরিবেশের ভেতর থেকে আর কোথাও যেতে পারলেই যেন সকল শান্তি, যদিও গন্তব্য হয়ত আরো বিভীষিকাময় যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করছে। তবু এক জায়গায় আটক থাকা এবং অনিশ্চয়তার জাঁতাকলে পেষাই হওয়ার চেয়ে তা-ই যে মঙ্গলময়। কিন্তু চোখের দৃষ্টি উবে গেছে কেন? শরীরের উত্তাপে তখন হরমুজ বুঝতে পারে, তার অসুস্থতা আর সাধারণ পর্যায়ে নেই। মাথার ভেতর মগজের কোষে কোষে আওয়াজ হচ্ছে যার ফলে কানেও কী রকম যেন হট্টগোল। চারিদিক ঝাপ্সা থাকার ফলে কোন কিছু হদিস করা আর হরমুজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না। চোখ বুঁজল তখন সে। বন্দীদশার পীড়ন তাকে তত অস্থির করে তোলে না, যত স্মৃতির থাবা তার গোটা পাঁজর ধরে টান দেয়। বুঁদ হয়ে যায় এক এক সময় হরমুজ। কোন কিছু আর চিন্তার সমুদ্রে সে ভাসতে দেবে না। কিন্তু কাজ কী অত সহজে কর্মীর কুক্ষিগত হয়? একবার আর্তনাদ করে ওঠার প্রবল ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু হরমুজ ভুলে যায় না, এই বিরাট চত্বরে তার মত বহু হতভাগা-হতভাগিনী আছে যারা এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈশ চাদরের নিচেই কিছু আরাম উপভোগ করে, দিনের আলোর গ্লানি-কুটিল ভ্রূভঙ্গির অনুপস্থিতিতে। তাই সে সংযত হয়। কিন্তু পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। প্রহরিদের ডাক দিলে কিছু শাস্তি, ধমক এবং পানি পাওয়া যেতে পারে। সেখানেও বাধা। বহু জনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। এমন বিবেচনা ত নতুন কথা নয়। ওস্তাদের কাছে সে শিখেছিল। কিন্তু অতি সৎ জীবন-যাপনের পরিণাম এমন হয় কেন? মাথার দপ্‌দপানির ভেতর দিয়ে হরমুজ চিন্তার সূত্র সতেজ রাখতে চায়। কিন্তু আবার যন্ত্রণার কাছে সে পরাজিত। তখন মৃদু গঁ গঁ শব্দ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কয়েক পলকের জন্য মাত্র। নিজের কাছে হরমুজ-কে অকস্মাৎ নতুন ঠেকে। মেহনতের সঙ্গে সে আবাল্য পরিচিত। কিন্তু এখন যে পরিশ্রম করতে হচ্ছে তা-কে প্রতিটি মুহূর্ত সজাগ থাকার জন্যে তার কাছে কোন শারীরিক ধকলের কোন তুলনা করা চলে না। যন্ত্রণার তীব্রতাই যন্ত্রণার উপশম। আচ্ছন্নতার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে হরমুজ নিস্তেজ হয়ে গেল ধীরে ধীরে। শুধু তার একটা হাত প্রসারিত, এদিক-ওদিক প্রসারিত হতে লাগল, সমস্ত আঙুলে যেখানে ভাষা জমাট বেঁধে নানা ছন্দরচনায় তৎপর।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছে সে জানে না। যখন ঘুম ভাঙল, তখন হরমুজ দেখে তার ঠোঁটের নিচে পেয়ালা, পানি বোঝাই। সে ধীরে ধীরে ঠোঁটে নিচ্ছে। কয়েক বিন্দু চাতির মধ্যে প্রবেশের পর সে চোখ খোলে। প্রহরি নয়। এক রমণী তার পাশে বসে আছে। নিমেষে বিস্ময়ের ধাক্কায় হরমুজ যেন সব দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পায়।

জলদাত্রীর মুখ দেখতে সে একটুকু বিলম্ব করে না। রমণী যুবতী। আর আর পারশীদের মতই সে গৌরাঙ্গী। মুখ বৃত্তাকার, তার ডাগর চোখের সংগতি বজায়ে থুৎনির দিকে ঈষৎ চওড়া। করুণা যেন ছল্‌ছল করছে চোখের পাতায়।

হরমুজ উঠে বসতে চায়, তখন যুবতী পেয়ালা সরিয়ে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বারণ করে, "আপনি উঠবেন না। আপনার এখনও অনেক জ্বর।"

"আপনি কে?" হরমুজ আচ্ছন্ন কণ্ঠেই শুধায়।

"আমি। আপনার মতই এখানকার একজন। তিনদিন এসেছি।"

"কেন এসেছেন?"

"তা কী আমি জানি?"

"জানেন না?"

"না।"

হরমুজ এই সময় একটানা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বেশ কয়েক পলের মত। তারপর নিজের মনেই বলে গেল, যেন কাউকে শোনানোর উদ্দেশ্য ছিল না, "আমিও জানি না।"

"আশ্চর্য, কেউ জানে না।" যুবতী পেয়ালা হরমুজের ঠোঁটে এগিয়ে দিতে দিতে বললে।

বন্দীশালে বেশির ভাগ কয়েদি তখন শুয়ে আছে। হয়ত অনেকের চোখে ঘুম নেই। মৃদুভাষে দু'জনে কথাবার্তা চলে।

রমণীই বললে, হরমুজ বেশ গোঁঙাচ্ছিল। সে মেয়েদের কেতা থেকে চলে আসে। অকুস্থলে তার বুঝতে দেরি হয়নি, হরমুজের পানি দরকার।

কৃতজ্ঞতা-ভরা চোখে তাকায় হরমুজ। সমস্ত বন্দীজীবনের নিগড় যেন খসে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনই উঠে বসতে পারত সে। এই করুণাময়ীকে দুই চোখ দিয়ে দেখার তাড়নায় অস্থির। সে দেখছে কিন্তু তৃপ্তি পায় না।

"আপনার নাম।"

"রুদ।"

"মোকাম?"

"কেরমানের এক গ্রাম।"

"মা-বাপ আছে?"

যুবতী তখন নিরুত্তর, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলে। তারা শৈশবে মৃত। নিঃসন্তান পিতৃব্যের নিকট প্রতিপালিত। বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির ছিল। ঝর্ণা থেকে পানি আনতে গিয়েছিল সন্ধ্যার সময়। আর বাড়ি ফিরতে পারেনি।

হরমুজ আর বারণ শোনে না, উঠে বসল। তার প্রাণদাত্রীকে সে একবার ভাল করে দেখার প্রার্থী।

যুগযুগান্ত নিমেষ হয়, হয়ত এমনই পরিবেশে। হরমুজের কাছে এই রমণী যেন কত কালের পরিচিত। মুখটি শীর্ণ হয়ে গেছে অনিয়মের অনাচারে। তবু এই রমণীকে দেখা যায় তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে, অঙ্গ-ভঙ্গির মৃদুতম ছন্দে।

"আমাকে আপনি রুদ বলবেন।"

"নিশ্চয়।"

রুদ তখন মৃদু হাসে, এমন দুঃসহ পরিবেশের মধ্যে। হরমুজের তা চোখ এড়ায় না। দেহের সকল বিশ্রান্তি কে ঘুচিয়ে দিলে এত দ্রুত? মন থেকে জগদ্দল কে কেড়ে নিলে? পরম প্রশান্তি বুকের মধ্যে অনুভব করে হরমুজ। প্রথমে তার মনে হয়, এখনই আলিঙ্গনে জড়িয়ে এই রমণীকে সে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারত। একদম অপরিচিত যুবতী। কত মানুষ চারপাশে। তাই হরমুজ ভাবে, তার গৌর পায়ে লুটিয়ে এতটুকু কৃতজ্ঞতা কী জানাতে পারে না, দুঃসহ পিপাসা-কালে যে তার ঠোঁটে অজানিতে পানি এনে যুগিয়েছে?

কিন্তু সে অনড় বসে থাকে। আর আড়চোখে বার বার রুদের দিকে তাকায়, মাঝে মাঝে চোখের উপর চোখ ফেলে। কিন্তু অসীম লজ্জায় আঁখি-পল্লব স্বতঃই নেমে আসে। হরমুজ হঠাৎ করস্পর্শের লোভ ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু হাত বাড়িয়েও পেছিয়ে নেয়। অনড়তার মধ্যে চাঞ্চল্যের বেদনা এবার অনুভব করে সে।

পানির পিপাসা ছিল, কিন্তু সবটুক হরমুজ শেষ করতে পারল না। তার বুক অনেক আগেই ভরে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলে সে। এমন পরম স্বস্তি যেন জীবনে আর কোনদিন সে পায়নি।

রুদের সেবাকার্য শেষ। এবার বিদায় দিতে সে বলে, "আবার আসব। যখন দরকার পড়ে, কাউকে ডেকে নিতে বলবেন। আমি মেয়েদের ওই কেতায় দক্ষিণ দিকের কোণায় থাকি। ভুলবেন না, আমার নাম রুদ।"

"ভুলে যাব?!" কথার খেই ধরে হরমুজ এবার রুদের দিকে চোখ ফেলে একদম সোজাসুজি। সঙ্গিনী নিজের চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। লজ্জা অথবা অসোয়াস্তিকর চাঞ্চল্য, বোঝা গেল না, তার হাতের পেয়ালা বেশ খানিকটা নড়ে উঠল।

AMARBOI.COM

আর কোন কথা হয় না। মাথা নিচু করে রুদ আবার প্রায় ফিসফিস কণ্ঠে বললে, "আবার আসব।"

হরমুজ বসে থাকল না। শুয়ে পড়ে কনুয়ের উপর মাথা রেখে চেয়ে রইল রুদের গমন-পথের দিকে। তার গোটা শরীরের আকার নিরাকার আনন্দ ও বেদনার মিশ্র রাগিণী-রূপে মূর্ছনা রেখে যায়। হরমুজ চেয়েই থাকে।

দেখতে পায় সে, রুদ পেয়ালা তুলে দিচ্ছে গমন-পথে শায়িত আর এক রুগ্ন কয়েদির ঠোঁটে, হঠাৎ উবু বসে পড়ে। এক রকমের কাৎরানি চেপে বসে হরমুজের বুকে, চোখ বন্ধ থাকে না। কিন্তু নিজের কাছে নিজে তখন প্রশ্ন তোলে সে, এই রমণী আর কারো সেবায় নিয়োজিত দেখে তার এই ঈর্ষা কেন? কয়েক মুহূর্ত মাত্র চেনা। এমন অশোভন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কিন্তু অক্ষম, অসহায়। অজানিতে তার হাত নড়ে উঠল জমিন পাক্‌ড়ে নিজের মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে। তার চোখ খোলাই থাকে রুদ অনুসরণে। বেশি বিলম্ব হয় না ওই রোগির নিকট। তারপর সে এগিয়ে যায়, পেছনে একরাশ কালো চুলের সাপ ঝুলিয়ে। হরমুজ চোখ বুজল। আবার তার দৈহিক সমস্ত যন্ত্রণা প্রত্যাগত। কিন্তু আর্তনাদে কোন দুরন্ত বাসনা মাথাছাড়া দেয় না।

রুদ শুধু পরদিন সকালে নয়, আরো বহুবার এলো তার নৈশ সেবার অনুসরণ অকুস্থলে। বন্দীজীবনের দুর্ভার লাঘবের নানা পথ সকলকে আবিষ্কার করতে হয়। দু'জনেই কিন্তু এমন কোন তাগিদে পরস্পরের নৈকট্য লাভ করেনি। দুইজন পরস্পরকে হয়ত চিনে ফেলেছিল। তাই রুদ আসত। হরমুজ তখনও শয্যাশায়ী। তবে চাঙ্গা হয়ে উঠতে বিলম্ব নেই। আর আওরত কেতায় সাধারণতঃ মরদেরা যায় না। মেয়েরা আসে, সেবার ভার ত তাদেরই। একটা সম্পর্কও গড়ে উঠে ওই তিন-চার দিনের মধ্যে। ভাই-বোন কি আর কোন রেস্তা পাতিয়ে নেয়। কারণ, বেশি দিনের মেয়াদ এখানে ভোগ করতে হয় না। শুধু রুদ আর হরমুজ এখানে বেশ কিছু দিন আছে। তারাই পুরাতন বাসিন্দা বলা চলে এই গুহা-গর্তে।

একদিন রুদ বললে, "আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কী?"

হরমুজ প্রশ্নকর্ত্রীর হাত তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে জবাব দেওয়ার পূর্বে। বহু দিনের সংযম তার পক্ষে রোধ করা সম্ভব হয়নি। কোমল হস্তের অধিকারিণী তার অঙ্গ-সম্পদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকল না, বরং তার সব আঙুল চঞ্চল হয়ে উঠল। এমন সময় কথা অবান্তর পর্যায়ে পড়ে। নিস্তব্ধতা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত হতে পারে তা অনেকে জানে না। মুহূর্ত অর্বুদ, শতাব্দী পরিভ্রমণ করে এলো।

এক সময় হরমুজ মুখ খুললে, 'অনুরোধ কি? কোন আদেশ রেখে যান।"

"না, অনুরোধ।" ঠোঁটে অতি সূক্ষ্ম রেখার হাসি বিস্তারমান রেখে মৃদু ভাবে মাথা নাড়লে রুদ।

"কি অনুরোধ শুনি।"

"আপনার সঙ্গে এই অল্প দিনের চেনা। আবার যদি দেখা হয়— কি জানি কী আছে নসিবে— আমাকে চিনতে পারবেন?"

"কোটি জনতার মধ্যে কোটি বৎসর পর দেখা হলেও আমার চোখ আপনাকে খুঁজে

বের করবে। আর সেই সন্ধানে এতটুকু দেরি হবে না। মনে রাখবেন।"

কৃতজ্ঞতায় রুদের মাথা ঝুঁকে পড়ে তার নিজের বুকের উপর।

স্তব্ধতা অটুট থাকে কিছুক্ষণ। তারপর তেমনই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই রুদ বলে যায়, "সেদিন আপনার পানির দরকার আছে, কী করে বুঝলাম? নিজেকে বার বার জিজ্ঞেস করে জবাব পাইনি।"

হরমুজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারও সকল জিজ্ঞাসা ফুরিয়ে গেছে। দুই জোড়া চক্ষু তখন অধরে পরিণত।

নয়

প্রাসাদ কেন কুটিরের জানালা যদি খোলা আকাশ কী মাঠের মুখোমুখি হয়, চিন্তার যন্ত্রণা তখন তীব্রতা হারিয়ে ফেলে।

তারা দুই জনে অবেলায় বসেছিল। প্রাসাদের এই বিশেষ বাতায়ন গুল্‌শানের বড় প্রিয়। হাজার ভাব থাকুক বুকে, এমন উন্মুক্ত শূন্যতার কাছে এলে, যেহেতু বহু দূর দূর এখানে কোন তরুরাজির বাধা পর্যন্ত নেই, মগজের সব জট যেন অনেকটা শিথিল হয়।

সেহেলী চিরকালীন ছায়ার মত ত আছেই পাশে। আজ কোন ব্যতিক্রম নেই।

বাদ্‌শাজাদি বললে, "সেহেলী, সৎ মানুষের বুকে বোধহয় দুনিয়ার সব ঢেউ এসে লাগে।"

"আপনার কথা ঠিক বুঝি নে, বাদ্‌শাজাদি। তবে এটা জানি, আপনি সৎ হন অনেক কষ্ট পাবেন।" সঙ্গিনী জবাব দিয়ে গুল্‌শানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

মাথা দোলায় বাদ্‌শাজাদি।

সেহেলী আশ্বাস পায়, সেও এমন সব জটিল ব্যাপার তার নিজের মত করে বুঝলেও অপর জ্ঞানী ব্যক্তির চেয়ে কিছু ফারাক নয়।

তৃপ্তিতে তার ভরাট বুক মুখে উচ্ছলতা লাভ করে।

গুল্‌শান তখনই বলে, "কত কী যে বুকে এসে ধাক্কা দেয়। ঘটনা, শব্দ, হাসি কান্না—।"

বাদ্‌শাজাদির প্রলম্বিত স্বরে পূর্ণ মাত্রা দিলে সেহেলী, যখন আস্তে আস্তে যোগ করলে "রূপ।"

নিমেষে কৃত্রিম ক্রোধ, তারপর আড়চোখে গণ্ডদেশে হাসির টোল ফেলে গুল্‌শান পাল্টা দিলে, "তোর এবার শাদি দিতে হবে।"

এবার দৃষ্টি বিনিময়ের সময় দুই জনে হেসে উঠে। উভয়েই যেন বিভিন্ন রহস্য-উদ্ধারে বেরিয়ে একই জায়গায় সমাধান পেয়ে গেছে।

আবহাওয়া কিছু হাল্কা হয়ে যায়। এমন-কি গুল্‌শান যখন আঙুলের খোঁচা দিলে সেহেলীর পাঁজরের এক পাশে, তখন সেও ব্যবধান ভুলে প্রায় আঙুল তুলে ফেলেছিল। রাজকন্যার সঙ্গে ত অত দূর আদবের মাত্রা অতিক্রম করা যায় না। তাই সে থেমে গেল। কিন্তু মুখের হাসি থামল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুল্‌শান সেহেলীর মুখ চাপা দিতে যায় করতালুর সাহায্যে, এক দিকে মুখ ঘুরিয়ে তবু সে হাসে।

তখন বেশ ক্রোধান্বিত কণ্ঠেই বাদ্‌শাজাদি উচ্চারণ করে, "এই হাসছিস কেন?"

— খামখা।

— না। খামখা না।

তখন সেহেলী অভয় প্রার্থনা করলে। বাদ্‌শাকন্যা সঙ্গিনীর কাছে প্রায় শপথ করে বসে, সে নিঃশঙ্ক থাকতে পারে।

সংলাপ শেষে তাদের নৈশ অভিযানের কাহিনীতে গিয়ে ঠেকে। সমস্ত বন্দীদের রাজকন্যার দেখা। কিন্তু হরমুজ আজো বেঁচে আছে, কারণ প্রহরিদের নিকট নির্দেশ। এক দিন রাত্রে উভয়েই বন্দীশালা বিচরণ করে এসেছে। আর রুদ মেয়েটিও গুল্‌শানের চোখে পড়েছিল। তার করুণা-আদল মুখের দিকে তাকালে কেউ চাইবে না অপমৃত্যু তা-কে টেনে নিয়ে যাক্।

আজো তেমন নৈশ অভিযানের মতলব রাজকুমারিকে পেয়ে বসেছিল। সেহেলী কিন্তু রাজি নয়। বার বার গেলে প্রহরিদের সন্দেহ হতে পারে।

— কিন্তু কী সন্দেহ করবে?

বাদ্‌শাজাদি কোপনকণ্ঠ গোপন রাখলে না।

— হয়ত মনে করবে—

— কী মনে করবে?

গুল্‌শান তখন বড় নম্র কণ্ঠ এবং সেহেলীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "তুই, এখনও ফাঁকে ফাঁকে রইলি, আমাকে নিজের মনে করে সহজভাবে কথা বলিস নে কেন?"

বাদ্‌শাজাদির এই ভাব-বিহ্বল সিক্ততায় সেহেলী সাহস সঞ্চয় করেই হঠাৎ মুখ থেকে বের করে দেয়, "বাদ্‌শাজাদি রূপে মজেছে—।"

মুখ টিপে টিপে হাসে তখন সঙ্গিনী।

এই হাসি ছোঁয়াচে। বাদ্‌শাজাদি লজ্জা পায় না যোগদানে। তারপর নিজের মনেই বলে, "মানুষকে মানুষের ভাল লাগা অস্বাভাবিক কী?"

"কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন বাদ্‌শাজাদি, আপনি সম্রাট জাহুকের কন্যা আর কয়েদী হয়ত কোন গাঁয়ের গোলাম কী চাষী কি আর কিছু।"

"কিন্তু মেয়েটা কত সুন্দর। মন টেনে নেয়। আমি ত তাকেও দেখতে যেতে পারি।"

"এসব ছলনা কে বিশ্বাস করবে?"

"আমার কিন্তু রোজ ওদের দেখতে ইচ্ছে করে।"

"এমন ইচ্ছার গলা টিপে রাখুন।"

"আর তোর গলা—।"

সেহেলী তখন খিল খিল হেসে উঠে। নিজের গলা অতঃপর বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আহ্, আমার এমন মৃত্যু হলে ত আমি ত স্বর্গ পাই। তবে আপনি আগুন নিয়ে খেলা করবেন না।"

"যদি বলি, আমি আগেই পুড়ে গেছি। আগুনে আমার ভয় নেই।"

AMARBOI.COM

বাদ্‌শাজাদির কণ্ঠে কোন খাদ ছিল না। সেহেলী রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। কামিনীর মহানুভবতায় সে এমন কৃতজ্ঞ যে তার সুখ-দুঃখের শরিক হওয়ার মধ্যেই সব সার্থকতার ঠিকানা মেলে তার। তাই বেশ স্তব্ধ হয়ে যায় সে। হাল্কা হাওয়া আবার ঝড়ের পূর্বাভাসে পরিণত।

সেহেলী ভাবে, বাদ্‌শা অসুস্থ। তিনি আর মহলে আসেন না। তাই এই ভাবে তাদের দিন কাটতে পারে। আর ঘুণাক্ষরে কেউ কিছু টের পাচ্ছে না। প্রহরিরা এমন পরিমাণ উৎকোচ পেয়েছে তারা আত্মার সঙ্গে বাকশক্তি পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সেদিকে নির্ভয়। সেনাপতির এক পুত্র আসত। সে দূর দেশে কোথায় যুদ্ধে চলে গেছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা বেশি দিন টিকবে না। গুল্‌শানের স্বীকারোক্তি মিথ্যে হয়ে যাক। আর কোন ফ্যাসাদের ভয় নেই। কিন্তু রাজকুমারী এত সরল, আত্মগোপনের ক্ষমতা তার অতি কম। এই ক্ষেত্রে নানা বিপদ ওঁৎ পেতে থাকবে।

আশঙ্কার শিকল চারিদিকে ঝুলতে দেখে সেহেলী আবার মৃদুভাবে উচ্চারণ করে, "বাদ্‌শাজাদি, খেয়ালকে আস্কারা দিতে নেই। তার চেয়ে, প্রহরিকে বলে আমিই নেব, কয়েদিদের কোন ভার আপনি আর নেবেন না।"

"তা হয় না।" গুল্‌শানের কণ্ঠস্বর রীতিমত দৃঢ়।

"বরং এক কাজ করুন", সেহেলী এইটুকু বলামাত্র বাদশাজাদি উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। নানা জটিলতার মধ্যে হঠাৎ কারো কথা এমন দৈববাণীর মত প্রতিভাত হয়।

"কি বল।"

"আপনি মাঝে মাঝে দু-এক জন কয়েদিকে মুক্তি দিয়ে দিন। তারপর একদিন ওই কেরমানি যুবক-যুবতীদের চলে যেতে বলুন। কেউ সন্দেহ করবে না। ভাববে বাদ্‌শাজাদির খেয়াল।"

"তা সম্ভব। কিন্তু সেহেলী—", নিজে বাক্য অসমাপ্ত রেখেই বাদ্‌শাজাদি নিজের মুখ দুই হাতে ঢেকে বুকের উপর তা ঝুঁকিয়ে নিলে।

সেহেলী অনুতপ্ত হয়। চোখের যাদুর অভিজ্ঞতা তার আছে। কিন্তু সে বাঁদী। রাজকন্যার স্নেহাশ্রয়ে সব ভুলতে পেরেছে। অনেকক্ষণ আবহাওয়া হাল্কা রাখার জন্যে এবার সেহেলীর আফ্‌সোস হয়।

কিন্তু সে আরো একটা সংবাদ দিতে দেরি করে না, "বাদ্‌শাজাদি, শুনেছি কেরমানি যুবক খুব অসুস্থ। প্রহরিদের তার একটা ব্যবস্থা করতে আসতে হয়।"

"সত্যি অসুস্থ?"

"হ্যাঁ।"

"চল, আমিও আজ কয়েদখানায় যাব। প্রহরিদের বলে রাখিস।"

"আপনি যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ব্যবস্থা করে আসব।"

"আমি ব্যবস্থা করতে পারব না?"

"আপনি গোটা রাজ্যের মালিক। আপনি পারেন না ত কে পারবে?"

"তবে—?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

হরমুজ ভাবতেই পারে না, কোথা দিয়ে কী ঘটল। সে জ্বরের বিকারে পড়েছিল। আর মনে আছে, রুদ তার সিথানে বসেছিল পানির জাম হাতে। বাতাস করছিল ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা দিয়ে পাখার যখন অভাব।

আরো মনে আছে, রুদের কথা অসংলগ্ন কী বলছিল সে তাও পরিপূর্ণ জানার কথা নয়। তবু কানের নাকাড়ায় শব্দগুলো বাজে। এই অনিশ্চয়তার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আর কিছু নেই। সবাই আসে চলে যায়, থাকে জোর দু-দিন কি তিনদিন। কিন্তু আমাদেরই মেয়াদ বেশি। অর্থাৎ যন্ত্রণা-ভোগের দণ্ড আরো পাকা। সামনে সব অন্ধকার জানার উপায় নেই...মনে রেখো।

শেষ দুই শব্দ হাজার বিকারের মধ্যেও যেন স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল হরমুজ। একটা উত্তর দিয়েছিল। কী মনে নেই। তবে মনের মধ্যে সেই জবাব কোথাও লুকিয়ে ছিল। আজ যেন বেরিয়ে এসে শব্দের আকারে তার চোখের সামনে দাঁড়ায়ঃ আমার ফাটা ছাতির মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঢেলে তুমি জুড়ে দিয়েছিলে, তোমাকে কী করে ভুলব? আমি ত নিমকহারাম নই...

কিন্তু হরমুজ অবাক হয়। শান্ত্রীদের থাকার এক কামরায় সে শুয়ে আছে। এখানে ভিড় নেই, ভ্যাপ্‌সা গরম নেই। নরম বিছানা। সিথানে জাম আর গেলাস। পানির জন্যে কাউকে ডাক দিতে হবে না। তার লেবাস পর্যন্ত বদলে গেছে। নোংরা পাজামা কামিজ গায়েব। ধপ্‌ধপে পরিষ্কার এখন পরিধেয়। আহারের পর্যায় তার মত গ্রামীণের জন্যে ত রাজকীয় ব্যাপার।

হতভম্ব হওয়ার যোগাড়। কোন তেলেস্‌মাতি কিছু ঘটছে না ত দুনিয়ায়। অনিশ্চয়তা তা-কে আরো অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমশঃ। এই নতুনত্ব কিছুটা সোয়াস্তিকর। কিন্তু এত অদল-বদলের উৎস কোথায়?

আথালি পাথালি ভাবনার মধ্যে এক যমদূত সদৃশ শান্ত্রী এসে খবর দিলে, "হুজুর, বাদ্‌শাজাদি গুল্‌শান আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এখনি। তাজিমের সাথে কথা বলবেন। বেয়াদবি করবেন না।"

"বাদশাজাদি?"

"হ্যাঁ, বাদ্‌শাজাদি গুলশান।"

এত অভাবনীয়তার জন্যে হরমুজ প্রস্তুত ছিল না। কোন যাদুর দেশে হয়ত এসে পৌঁছেছে সে যেখানে পলকে পলকে সব ছক বদলে যায়।

"বাদ্‌শাজাদি কেন?"

শান্ত্রী গম্ভীর স্বরে জবাব দিলে, "তা আমার জানার কথা নয়।"

হরমুজ বুঝতে পারে, কাল রাত্রি। তার কামরায় মোমের বাতি জ্বলছে। প্রহরি তখনই এত্তেলা দিলে, "বাদ্‌শাজাদি এসে গেছেন।"

গুল্‌শানের সঙ্গে ছিল সেহেলী। শান্ত্রী কামরা থেকে চলে গেল পরিচারিকার ইঙ্গিতে। হতভম্ব হরমুজ বিছানায় শুয়ে ছিল, হঠাৎ উঠে মেঝের উপর দাঁড়ায় মাথা

AMARBOI.COM

ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশসহ।

সেহেলী তখন বললে, "নওজওয়ান, আপনি অসুস্থ। আপনার ওঠার দরকার নেই। আপনি বসুন।"

হরমুজ মাথা তুলে না। তেমনই দাঁড়িয়ে।

গুল্‌শানের ইঙ্গিত সেহেলী বুঝতে পারে এবং বলে, "নওজওয়ান, আপনি মাথা তুলুন, বাদ্‌শাজাদি হুকুম করছেন।

ইতস্ততঃ করে হরমুজ। গুল্‌শান সেহেলীর দিকে তাকায়। এই দৃষ্টির মর্মোদ্ধারে বিলম্ব হয় না সঙ্গিনীর।

সে আবার বলে, "আপনি মাথা তুলুন। আমাদের দিকে তাকান। বাদ্‌শাজাদির আইন অমান্য করলে কি শাস্তি হয় তা বুঝি আপনার জানা নেই।"

বাক্য সমাপ্তির দিকে সেহেলীর ঠোঁটে হাসি এসে গিয়েছিল। কিন্তু গুল্‌শানের দিকে চেয়ে সে কোন রকমে তা সংযত করলে।

ভেতরে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে হরমুজ এবার সাক্ষাৎকারিনীদের দিকে তাকায়। কিন্তু তখনই সে নতজানু মাথা ঝুঁকিয়ে বসে পড়ে। রাজনন্দিনীর সম্মানের ক্রটি হয়ে গেছে, বোধহয়। হরমুজ তাই তদবস্থায় অনড়।

সেহেলী এবং গুল্‌শান তখন চোখ ঠারাঠারি করে। প্রথমজনা কিন্তু আবহাওয়ার মধ্যে সতেজই থাকে।

বাদশাজাদির দিকে চেয়ে থেকেই সেহেলী হরমুজের উদ্দেশে সম্বোধন চালায়, "নওজওয়ান, আমাদের বাদ্‌শাজাদি জল্লাদ নন। আপাততঃ করো গর্দান নেওয়ার জন্যে তিনি আসেন নি, তাঁর হাতে খাঁড়াও নেই। আপনি মাথা তুলে উঠে দাঁড়ান।

গুল্‌শান কষ্ট-ক্রোধে সেহেলীর পিঠে চিমটি কাটে। কিন্তু সেহেলী নিরস্ত হয় না।

"নওজওয়ান, আপনি দুই রমণীর সম্মুখে এমন অবস্থায় বসে আছেন। তা পুরুষের পক্ষে শোভা পায় না। উঠুন।"

কথাটুকু শেষ হওয়ামাত্র বহু জড়িমাসহ যখন হরমুজ ধীরে ধীরে অবনত চোখে মাথা তুলতে ব্যস্ত, সেহেলী বিদ্যুতের মত কক্ষ থেকে উধাও হয়ে যায়।

হরমুজ জড়তা কাটিয়ে ধীরে ধীরে ওঠার সময় চোখ খোলে। সম্মুখে এক সুন্দরী দাঁড়িয়ে। আর কেউ নেই। আর একজন কোথায় গেল? এই বিস্ময়ের ধাক্কা এবং রাজনন্দিনীর উপস্থিতি ও অন্যান্য আবেগের উপাঘাতে আবার যেই মাত্র চোখ নামিয়ে নতজানু হওয়ার উপক্রম করে, বাদ্‌শাজাদি তাকে আর নিচু হতে দেয় না; বরং হরমুজের চিবুক নিজের করতালুর মধ্যে নিয়ে অস্পষ্টভাবে বলে, "ওঠো, আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

একি স্বপ্ন! তখনও করতালুর মধ্যে তার গৌরমুখ বন্দী। হরমুজ সোজা গুল্‌শানের চোখের দিকে তাকায়। কদিন আগে সে দয়াময়ী নয়ন দেখেছে। এ কোন জাতের চক্ষু? স্নেহোচ্ছলতার অবয়ব ঢাকা পেলবতায় অস্থির, এমন্ স্বপ্নাচ্ছন্ন আবেগের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসার প্লাবন? নারীদেহের সৌরভ হরমুজ এতক্ষণে উপলব্ধি করে। নিঃশ্বাসে বুকের স্পন্দন অনুভূত হয়। আত্মস্থ হতে পারে না কেরমানি যুবক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনন্দিনীর কণ্ঠস্বর এই সময় আঘাত হানে, "আমি তোমার সাক্ষাৎ-প্রার্থী।"

অনড় দাঁড়িয়ে তখনও হরমুজ, উচ্চারণ করে, "কেন, জাঁহাপানা বাদ্‌শাজাদি। আমি ত দীন অধম।"

"সেবা আমার ধর্ম। কয়েদখানায় তোমার অসুস্থতা দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।" সহজভাবেই গুলশান কথাগুলো উচ্চারণ করলে। তারপরই দুই করতালু থেকে চিবুকের বন্দিত্ব ঘুচিয়ে দিলে সে।

হরমুজ চোখ নামিয়ে নিতে পারে না। অতর্কিত এমন করুণার প্লাবনে সাহস-সঞ্চয়ের অনুপ্রেরণা পায় সে। কিন্তু ওই চোখের দিকে বেশিক্ষণ চাওয়া যায় না। অজানিতে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "আরো বন্দী আছে কয়েদখানায়।"

"তা জানি। তুমি তোমার বিছানায় শুয়ে পড়ো, তুমি অসুস্থ।" নরম গলায় বাদ্‌শাজাদি বললে।

সত্যি হরমুজের মাথা ঘুরছিল। এত উত্তেজনার মধ্যে নিমজ্জমান সে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। বসে পড়ল হরমুজ। রাজকুমারি আর দাঁড়িয়ে থাকে না। সে-ও পাশে বসে। কিন্তু নিঃস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল বন্দীর দিকে চকিতে তাকায়। তারপর এক সময় ডেকে বসে ঃ

"হরমুজ!"

"আপনি আমার নাম জানেন?"

"জানি বৈকি। নাম লেখা থাকে সব বন্দীদের।"

"কিন্তু আমরা বন্দী কেন, বাদ্‌শাজাদি?" হরমুজের প্রশ্নে গুলশান বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে না শুধু তার মুখাবয়ব হঠাৎ শ্রাবণের জলভারাবনত মেঘের মত দেখায়।

AMARBOI.COM

ঈষৎ স্তব্ধতা।

হাততালি দেয় গুলশান। এবার সেহেলী ফিরে আসে। হরমুজ তার দিকে তাকায়। বুঝতে পারে এই বাচাল রমণীই তার সঙ্গে প্রথমে বাক্যালাপ করছিল।

সেহেলী দাঁড়িয়ে গুলশানের আদেশ প্রার্থনা করে। কিন্তু সে তার দিকে তাকায় না। হরমুজকেই বরং সে সম্বোধন করে।

"তোমার কোন প্রার্থনা আছে আছে, বন্দী?"

হরমুজ যেন কথাটা হঠাৎ উপলব্ধি করতে অসমর্থ, এমনই বলে যায়, "প্রার্থনা!"

"হ্যাঁ।"

"প্রার্থনা?" তখনও হরমুজ অস্থিরতায় আবদ্ধ।

"তুমি মুক্তি চাও না?"

"চাই বৈকি।"

"তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখা হবে।"

"মুক্তি চাই বৈকি। কিন্তু কেন আমরা বন্দী?"

গুলশান এবার যেন বেশ বিরক্ত। সে তা গোপনের প্রয়াস পায় না। সেহেলীকে সম্বোধন করে, "সেহেলী চল্‌। প্রহরিকে ডাক দে। আর জওয়ান, তুমি মুক্তি পাবে বৈকি। তার আগে এই স্বাধীনতাটুকু তোমার রইল, তুমি যখন খুশি এখান থেকে

কয়েদখানায় যেতে পারবে। প্রহরিদের বলে যাব।"

"আপনার মেহেরবানি।"

সেহেলীর হাততালিতে প্রহরি এসে পৌঁছেছে। তার আগেই গুলশান উঠে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। প্রদীপ হাতে তারা প্রহরির অনুসরণ করে। সেহেলী শুধু এই সময় বললে, "বড় অন্ধকার, অন্ধকার।"

"কী অন্ধকার, সেহেলী?" বাদ্‌শাজাদির প্রশ্ন।

"আমার মগজ", কথাটা উচ্চারণ করেই সেহেলী হেসে উঠল।

এগার

খাটুনে গতর যাদের, রোগ-শোক কিছু অবসরের আশ্রয় পেলে সহজে দূর হয়ে যায়। হরমুজের সেরে উঠতে বেশি দেরি হয়নি। তার নব-লব্ধ স্বাধীনতার সুযোগে কিছু বাড়াবাড়ি করতে পারত। কিন্তু বেশির ভাগ সময় সে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে কাটায়।

রুদের কাছে সে ব্যাপারটা প্রকাশ করলে।

"আমি শুনে খুব খুশি।" জবাবে বলেছিল রুদ। আবার যোগ করে সে, "এমন শ্বাসটেপা জায়গায় এমন মানুষ থাকে নাকি?"

"আমারও অবাক লাগে।" হরমুজ উচ্চারণ করে।

"আমরা বাদ্‌শাজাদিকে দেখেছি অনেক রাত্রে আসে এক দাসীসহ। সব বন্দীদের দেখে যায়। আপনার অসুখে আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। থাক, অদৃষ্ট-দেবী আপনার সহায়।"

"আমি তোমার কথা বাদ্‌শাজাদিকে বলব।"

"না, না।" রুদের এই অনুরোধ কাতর প্রার্থনার মত শোনায়।

"আপত্তি কী?"

"এমন মেহেরবানি এখানে একদম দৈব-দুর্ঘটনা। কাজেই বেশি সুযোগ নিতে নেই। হয়ত সব মাটি হয়ে যাবে।"

এই যুক্তি হরমুজের কাছে ফাঁকি মনে হয় না। বরং রুদের সান্নিধ্যে নতুন করে চেনে তাকে। গ্রামীণ মেয়ের আক্কেল আদৌ খাটো নয়। এই রমণীর আকর্ষণ তার কাছে দুর্বার হয়ে ওঠে।

কিন্তু রাজকুমারির কী প্রার্থনা?

আরো তিন দিন তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে যখন কক্ষ অন্য কোন প্রাণি-শূন্য। বার বার এক কথায় এসে পড়ে ঃ সেবা-ধর্মের তাগিদেই তিনি আসেন। তার জন্যে একটা হুকুমই ত যথেষ্ট। নিজে এই তক্‌লিফ করেন কেন? কৃতজ্ঞতায় হরমুজের মাথা নুয়ে আসে। কিন্তু বন্দীশালায় তাকে ছুটে আসতে হয়। শুধু রুদ নয়, তার পরিচিত বহু জন রয়ে গেছে। কারো কারো যেতে চার পাঁচ দিন পর্যন্ত দেরি হয় আজকাল। অল্প সময়ের রেস্তা। কিন্তু বন্দীশালায় সময়ের তেমন পরিমাপ থাকে না। সকলের জন্য হরমুজ উতোল হয়ে ওঠে, যদিও তাদের ধরে রাখা তার সকল আয়ত্তের বাইরে। এই যন্ত্রণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবর্তে রুদের সাহচর্যে সে যেন আবার বাঁচার শপথ পায়। একদিন অকপটে তার কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল হরমুজ মমতা যেন অবিভাজ্য। স্নেহ প্রেম দয়া— সব দল একই কুসুমের মধ্যে গ্রথিত। আলাদা করতে গেলে আর কিছুই থাকে না। যেমন সৌন্দর্য ধ্বংস হয়, তেমনই সৌরভ চলে যায়।

কিন্তু একদিন বন্দীশালার চত্বরে এক প্রৌঢ়কে দেখে হরমুজ স্তম্ভিত। স্মৃতিশক্তি তার চিরদিন প্রখর ছিল। কাজেই বেশি কসরৎ করতে হয়নি এই প্রৌঢ়কে চিনতে। চত্বরের উপর চিন্তাবিষ্ট প্রৌঢ় বসে ছিল। কিন্তু এই বিমর্ষতা কোন আত্মরক্ষাজাত নয়, বরং কোন রহস্য-উদ্ধারের ব্রত উপলক্ষে একাগ্রতা।

হরমুজ কাছে এসে সালাম দিয়ে বললে, "আমার নিশ্চয় ভুল হচ্ছে না যদি বলি, আপনি শান্ত্রী মাবুদ সাহেব।"

প্রৌঢ় হরমুজের দিকে চেয়ে বিস্মিত। পলকে তার মুখের উপর হাসির ঝিলিক বয়ে যায়। একটা দাঁত সামনের পড়ে গেছে। মুখে রেশ জিইয়ে রেখে সে জবাব দেয়, "পুত্র, তুমি ভুল করো নি। তুমি কী সেই কেরমানি যুবক?"

"জী হ্যাঁ।"

শান্ত্রীর পুরাতন লেবাস নেই। এখন সাধারণ নাগরিক। পরিচ্ছদ বেশ কয়েক দিনের ময়লা, ধুলোমাখা। হরমুজ ত পরিষ্কার কাপড় পরে আছে। সে কিন্তু আর কিছু খেয়াল করে না, মাবুদের পাশেই বসে পড়ে বিনা দ্বিধায়। সাবেক ঘৃণার এতটুকু রেশ আর তা-কে স্পর্শ করে না। হয়ত শান্ত্রী হিসেবে তাদের গাল দিয়েছে সে। কিন্তু কিছুই মনে নেই। প্রৌঢ় মানুষটির উপস্থিতি তা-কে চঞ্চল করে তোলে।

বিনয়-ভাষণে হরমুজ জিজ্ঞেস করে, "আপনি কেন এখানে?

"আবার তোমাদের দেখতে। কিন্তু চেনা মুখ কাউকে দেখলাম না।"

"আমিই কেবল সাবেকদের মধ্যে এখানে আছি। আর সব কোথায় যেন গেছে কেউ জানে না।"

হরমুজ ধরা গলায় কথাগুলো শেষ করলে। কিন্তু এই বেদনা যেন আর মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে। তাই কৌতূহল-আশ্রিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে বসে, "আপনি কেন এখানে?"

"তোমায় নিয়ে যেতে।"

"কোথায় নিয়ে যাবেন?"

"তা কী আমার জানা?"

"সত্যি নিয়ে যাবেন?"

"না না, নওজওয়ান।"

কথগুলো উচ্চারণের মধ্যে প্রতিবাদ যত থাকে, ক্ষোভের মাত্রা তার চেয়ে প্রবলতর। শেষে মাবুদ যোগ করে, "মিথ্যে বলছি, নওজওয়ান। তোমাদের নিতে এলে আমার রাজকীয় বেশ থাকত। আজ তা নেই।"

"তবে কেন এসেছেন?"

পিতৃ-সুলভ স্নেহদৃষ্টি ছড়িয়ে মাবুদ আবার মুখ খুললে, "মনে আছে, সেই প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, কেন আমাদের ধরলেন?"

হরমুজ মাথা দুলিয়ে সায় দেয় এবং বলে, "মনে আছে।"

"সেই কথাটা আমার মনে বিঁধেছিল। ছেলেপুলে নিয়ে আমরাও বসবাস করি। তারপর জবাব খুঁজতে লাগলাম। যেদিন জবাব পেলাম, তার ক'দিন পরেই তোমার কাছে।"

"কি জবাব পেলেন!"

"তা তোমাকে জানাতে পারব না। সারা সত্তা দিয়ে আমি যা পেয়েছি, তা তোমাকে বললেও তুমি বুঝবে না।"

"তবু বলুন।"

"না। তবে শুনে রাখো, যেদিন তোমার জিজ্ঞাসার সড়ক ধরে এগিয়ে যথা-উত্তর পেলাম, সেদিন আমার জীবনও বদলে গেল। আমিও তখন জ্ঞান-সরস বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় যা বল—।"

মাবুদ এখন দূর-বিসারী দৃষ্টি ফেললে হরমুজের মুখের উপর, আর কোন কথা সরল না তার। পুনর্বার জিজ্ঞাসার সাহস সঞ্চয় করতে পারল না সে। ভাবলে, আর এক দিন জিজ্ঞেস করে দেখবে।

অন্যদিকে মাবুদ ভাবলে নিশ্চিত মৃত্যুর খবর আগে দিয়ে লাভ কী?

কিন্তু পরদিন ভোরে মাবুদ এই অতিথিশালা থেকে বিদায় নিলে।

সঙ্গীদের কাছ থেকে হরমুজ শুনলে শান্ত্রীরা তাকে আরো বিশ পঁচিশ জনের সঙ্গে নিয়ে গেছে।

সারাদিন বড় বিমর্ষ হয়ে রইল সে। বুদ্দা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। কিন্তু হরমুজের কথা বলার কোন ইচ্ছা ছিল না এক দায়-সারা কিছু উচ্চারণ ছাড়া। তার মনে হয়েছিল, এই নারীও তার কাছে তুচ্ছ। কী হবে নারী মাংসে লেপ্টে কীট সেজে, বিরাট জিজ্ঞাসা যখন সব কিছু কুরে কুরে খায়।

আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল হরমুজের জন্য। বাদ্শাজাদির সোহাগে তার থ' হতে পারে না।

পরদিন বন্দীশালার চত্বরে পায়চারি করছিল হরমুজ।

অকস্মাৎ তার চোখ পড়ল এক কয়েদির উপর। দশ জন থেকে তিনি আলাদা। তার বেশভূষা অভিজাত শ্রেণীর। পায়ে জুতা পর্যন্ত আছে। তিনি চুপচাপ বসেছিলেন, কারো দিকে দৃষ্টি না ফেলে।

হরমুজ আরো নিরীক্ষণ করে। বেশভূষা থেকে মানুষের সামাজিক স্তর নির্ণয় খুবই সোজা। কারণ, লেবাসের চাকচিক্যের সাথে দেহের চিক্নাই একটা বরাবর সঙ্গতি রাখে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। চুল সবই শাদা। খাড়া নাক বুদ্ধিদীপ্ততার প্রতীক সেজে বসে আছে। মাঝে মাঝে চোখ বুঁজছিলেন এই কয়েদি। তখন মনে হয়, ধ্যানমগ্ন কোন সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবিষ্ট।

হরমুজের কৌতূহল হয়, এই মানুষের সঙ্গে কথাবার্তার কোন যোগসূত্র গড়ে উঠুক। কিন্তু সে সাহস পায় না। এম্নিতে ভদ্রলোক খুব গম্ভীর। দীর্ঘায়ত চোখ মাঝে মাঝে যখন খোলেন, সমস্ত পৃথিবী যেন তার সীমানায় ছুটে আসে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাঁটু দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতালুর মধ্যে গুঁজে তিনি বসে আছেন ত আছেন-ই। কোন কয়েদি তার দিকে এগিয়ে যায় না। বাইরে তিনি ছিলেন এখানকার অধিবাসী থেকে আলাদা। এখন সকলে তাকে আলাদা করে রেখেছে অথবা আলাদা করে দেখছে। তিনি যেন কিছুই দেখছেন না। এই অধিবাসীরা ত তার প্রতিবেশী নয়। তবে তিনি কেন তাদের মধ্যে?

হরমুজ কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। আরো কয়েদিদের চোখ এদিকে পড়তে তারা হয়ত ফিস্‌ফিস্‌ করছে নিজেদের মধ্যে কিন্তু এই মানুষের কাছ ঘেঁষতে কেউ সাহস পায় না।

বাদশাজাদির কথা স্মরণ করে, হরমুজ কিছু বুকে বল পায়। কিন্তু তার ইদানীং লব্ধ মর্যাদা এখানে থ' পায় না। বহু দিনের অভ্যাস সহজে কী যায়? এমন মানুষের পাদুকা-বহন অভ্যেস তাদের চিরকালের।

এখন কাছে পেয়েও তার কাছে যেতে সঙ্কোচ দেখা দেয়, কারণ জুতো খোলা বা পরানো কাজ ত হাতে নেই। জুতো থাকলে একটা সুরাহা হত।

হরমুজ ভাবছে, এই মানুষের কাছে গিয়ে কতাবার্তার একটা যোগসূত্র পাতাবে কি না, এমন সময় দেখা গেল, শান্ত্রী চত্বরের এই দিকে আসছে। তার সঙ্গে তার একজন লোক। উপস্থিত ব্যক্তির মতই সে শরিফ। তারও কোমরে দড়ি বাঁধা।

বিস্ময়ের অন্ত থাকে না হরমুজের। শান্ত্রী যখন ওই কয়েদির দড়ি খুলতে থাকে, তখন সে ডাক দিলে, "দারিয়ুস!"

চিন্তাবিষ্ট ব্যক্তি এবার মুখ তোলেন। সহসা নতুন কয়েদির ডাকে তিনি হচ্চকিত তাকান। কিন্তু জবাব আসে না তার মুখে। শান্ত্রী কর্তব্য সমাধা করে চলে গেল। অবিশ্যি যাওয়ার আগে নতুন কয়েদির পাছায় এক জোর লাথি কষিয়ে দিলে। কিন্তু সে উচ্চবাচ্য করলে না। প্রতিকার-হীন অপমানের মুখে সম্মানিত ব্যক্তির আচরণ এখানে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। কিন্তু সাবেক অভিজাত কয়েদি হঠাৎ চমকে উঠলেন, যেন পদাঘাত তারই নিতম্বে পড়ছে।

নতুন কয়েদি অবনত-মুখ আবার ডাক দিলে, "দারিয়ুস।" এই আহ্বান শুধু বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আহ্বান নয়, হঠাৎ ওলট-পালট ঝড়ের মধ্যে কোন দরদি হস্তের জন্য হাত্‌ড়ে বেড়ানো।

এতক্ষণে মুখ খুললেন, যার প্রতি সাড়ার জন্যে আবেদন।

"জার্জিস, তুমি!"

দুই সাবেক বন্ধুর চক্ষুদ্বয় এবার একই রেখায়। জবাব আসে অপর দিকে "তুমি, তুমি!" তার পর সে মাথা হেঁট করে বলে যায়, "তুমি এলে, তাই আমিও এলাম।"

"পাগল নাকি তুমি?"

"না বরং এত দিনে মগজ পরিষ্কার।" মাজেন্দারানের ধনাঢ্য, বিদ্বান, প্রতিপত্তিশালী অভিজাত জমসেদ দারিয়ুস যেন শিষ্টাচার ভুলে গেছেন। এতক্ষণ তাঁর বন্ধু নবাগত কয়েদিকে তিনি স্বাগতম জানাননি। করমর্দন ত দূরের কথা।

এবার তিনি উঠে পড়ে জার্জিসের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বস।" তারপর দুইজনের আড্ডা বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা দিয়েই এখন জীবনকে যাচায়ের চেষ্টা ছাড়া, আর ত কোন উপায় নেই।

হেসে উঠল জার্জিস। নিতান্ত খাদহীন। সাবেক জীবন যেন এখানে এসেও ঢেউ তুলছে। রেশ জিইয়ে রেখে সে বললে, "তোমাদের মত কেতাবি লোকদের নিয়ে এই মুশকিল। এখানে ফিলজফি শুরু করবে নাকি?"

"ফিলজফি ছাড়া মনুষ্যজন্ম অর্থহীন।"
"তার ফলেই তুমি এখানে।"
"সে ও ভাল। জীবনের একটা মানে পাওয়া গেল।"

দুইজন মুখোমুখি বসে পড়েছিল। জার্জিসের লেবাস তার সামাজিক মর্যাদার পরিচয় সহজে দিয়ে যায়। কিন্তু চত্বরের ধুলোর দিকে কারো নজর নেই। সবই এখানে যেন ধুলো। মানুষ, লেবাস।

হরমুজ বোকার মত দু' জনের দিকে চায় আর তাদের কথা শোনে। কিছু হদিস করতে পারে না। বাদশাজাদির পরোক্ষ প্রেম-নিবেদনের চেয়েও এই ঘটনা আরো বিস্ময়কর। কিন্তু অন্যান্য কয়েদির মত সে তাদের কাছে যেতে সাহস করলে না।

রহস্যের ঘেরা-টোপ তাকে প্রবলভাবে শুধু ঘিরে ধরে নয়, সবকিছু তার জানার বাইরে রয়ে গেল।

AMARBOI.COM

নিশীথ রাত্রে সবই সেদিন নিশুত। কয়েদির দল ঘুমিয়ে গিয়েছে যে-যার উদ্বেগ দুঃশ্চিন্তা বা স্মৃতি জটিলতায় অস্থির থেকে থেকে।

জার্জিস এবং দারিয়ুস দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। চত্বরে বিশ্রাম গ্রহণের অভ্যাস নেই। দারিয়ুস আরামে শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু জার্জিসের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পাখির পালকে ঠাসা থাকে যার উপাদান, তার পক্ষে পাথরের শয্যা দোজখের চৌকাট-সংলগ্ন প্রাঙ্গণ। দারিয়ুসের স্বাচ্ছন্দ্য তাকে অবাক করেছিল। পণ্ডিতদের দশা এমনই হয়। জার্জিস মনে মনে তাই ঠাউরে বন্ধুকে বিরক্ত করেনি।

কিন্তু দারিয়ুস উঠে পড়েছিলেন। বহু দিনের নানা দুষ্কৃতির সঙ্গীকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন না। একবার হেসেছিলেন মনে মনে, জার্জিসের সহযোগে কোন সৎ কাজ করেছেন কিনা।

কিন্তু হাজার স্মৃতির ব্যবচ্ছেদ এখানে অসফল। এই বোধহয় জীবনে একত্রে কোন সুকৃতির মুখোমুখি।

অনুতাপের একটা সরু রশি সাপের মত আবেগের গোড়ায় গোড়ায় সঞ্চরমান ছিল। কিন্তু তাদের সংলাপ খুবই সহজ। যেন কিছুই ঘটেনি জীবনে। দু'-জনে অন্যান্য বহু রাত্রির মত হামপেয়ালা আসরে বিশ্রম্ভালাপ শুরু, যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কতো সন্ধ্যায় নৈশ মাজেন্দারানের নানা পল্লীতে, নানা উপাদান-উপাচারে।

জার্জিস : আমিও এসে পড়লাম।
দারিয়ুস : কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জার্জিস : কারণ, তুমি এলে।

দারিয়ুস : ভাল করোনি।

জার্জিস : আমি ত নাবালক নই, দারিয়ুস।

দারিয়ুস : তারও অধম। খামাখা জীবনকে কেউ পায়ে ঠেলে নাকি?

জার্সিস : তুমি কেন পেয়ালা ভেঙে ফেললে?

দারিয়ুস : জীবনের পেয়ালাকে উপোড় করে ভেঙে ফেলার মধ্যেই আমি সব সার্থকতা খুঁজে পেলাম।

জার্জিস : এসব ধাঁ-ধা হটিয়ে রাখো। সোজাসুজি বলো, তুমি এমন পাগলামি কেন করলে?

দারিয়ুস : শোনো, জার্সিস। জীবনে এই প্রথম ঘা পেলাম, তাঁর জন্যে আমি ধন্য। আমার একটা অনুতাপ আছে, আর কোন আফসোস নেই।

জার্জিস : কী শুনি?

দারিয়ুস : সে কথা পরে, আগে পূর্বের কথা শোনো। রোজগার ত দু'-জনেই কত রকমে করেছি। কতো কাজে আমরা উভয়ে শরিক। এই মগজ সরবরাহ দু'-জনেই করেছি। কিন্তু চিন্তা করা অভ্যেস ছিল। এক দিন বুঝতে পারলাম দশ বছর ধরে এত নওজোয়ান কি জ্ঞান-সরস বৃদ্ধের যোগান দিলাম। দেশের মগজ থাকবে না। তখন থাকবে কী? থাকবে শুধু পশুত্ব। ওদের যতটুকু মগজ আছে, ততটুকু থাকবে দেশে। অর্থাৎ দেশ জানোয়ারের দেশে পরিণত হবে। কিন্তু আমরা রোজগার করছি কেন?

জার্জিস : আরামে থাকব, খাব, পরব বলে।

দারিয়ুস : ঠিক বলেছ। কিন্তু একটা ভুল থেকে যাচ্ছে।

জার্জিস : কী?

দারিয়ুস : শুধু নিজে আরামে আয়েশে থাকব যে তা নয়, আমাদের সন্তান-সন্ততি আছে, তারাও সুখে থাকবে।

জার্জিস : খাঁটি কথা।

দারিয়ুস : কিন্তু জানোয়ারের দেশে সব সম্পদ দিয়ে তুমি তোমার বংশধরদের রেখে যাচ্ছ। তারা কী দিয়ে সুখী হবে? জঙ্গলে জানোয়ার সুখী, আর কেউ না।

জার্জিস : সত্যি কথা।

দারিয়ুস : তাই ভাবলাম, এই হত্যা বন্ধ হওয়া উচিত। আমি আর মগজের ঠিকাদারি করব না।

জার্জিস : অনেক আগে একথা তোমার মনে হয়নি কেন?

দারিয়ুস : তোমার কাছে মিথ্যে বলব না, জার্জিস। আর কোন ঝুঁটের সঙ্গেই আমার কোন রেস্তা নেই। মনে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু তখনও আমার চিন্তায় জট ছিল। ভয় পেতাম বৈকি। তাই ভাবতে গিয়ে থেমে গেছি। কী হয় জানো?

জার্জিস : বলো।

AMARBOI.COM

দারিয়ুস : তোমার বোধহয় মনে আছে, বণিক সাইরাসের বাগানে আমরা বারো বছরের একটা মেয়েকে বলাৎকার করেছিলাম।

জার্জিস : অমন কতো কথা মনে আছে। মেয়েতে অরুচি ধরে গেলে হঠাৎ হঠাৎ সুন্দর ছোকরা পর্যন্ত আনতাম। ভুলে গেছ নাকি?

দারিয়ুস : সে কথা রাখ। মেয়েটা সদ্য আনকোরা গাঁ থেকে দালালরা আমাদের জন্যে এনেছিল। মেয়েটা কাঁদছিল। কান্না আর থামে না। জোর করে বিছানার উপর যখন ফেললাম, সে কাঁদতেই থাকল। কিন্তু আমার মজার ব্যাঘাত আমি ঘটতে দিই নি।

জার্জিস : তোমার পর আমার পালা। সেই একই অবস্থা। হারামজাদির চোখ যেন নাইরিজ হ্রদ। পানি শেষই হয় না। কতো বার ডুকরে কাঁদল। আমি কিন্তু নিজের কাজে মশগুল ছিলাম। ওসব ঘ্যানঘ্যানানি আমার কানে পড়েনি।

দারিয়ুস : কিন্তু জানো, ওই মেয়েকে আমি পরে কতো মওজের আসরে দেখেছি। কী ঠমক, কী চমক, আর কী হাসি।

জার্জিস : সে কথা নতুন কী আমাকে শোনাবে?

দারিয়ুস : আমি আর ওই মেয়ের মধ্যে কোন ফারাক নেই। ভেসে গেলাম। কারণ, মনের জোর ছিল না। কিন্তু যখন দেখলাম, আমার সব স্বপ্নের কোন গোড়া নেই, তখন রুখে দাঁড়ালাম। জঙ্গলে নিজের পুত্র-কন্যাদের নির্বাসন দেওয়া চলে, কিন্তু মগজ-ছুট দেশে রেখে যাওয়া পাপ। কিন্তু তুমি কেন এমন নাদানের কাজ করলে, জার্জিস?

জার্জিস : আমিও খোলাখুলি কথা বলব আজ। কারণ, দু'জনেই কালসাপের খোরাক। তুমি আমাকে বোকা ঠাউরাতে। আমার বন্ধুত্ব তুমি গ্রহণ করো নি।

দারিয়ুস : না, না।

জার্জিস : চুপ করো, দারিয়ুস। তার বহু প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আমার কোন দিন কমেনি। যখনই ভেতরে ভেতরে ফাঁকা বোধ করেছি, ছুটে গেছি তোমার কাছে। মনে হত, আমি পূর্ণ হয়ে উঠলাম। তোমার সঙ্গে বদমাশি করে যে আনন্দ পেতাম, তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি পণ্ডিত—

দারিয়ুস : মূর্খ—

জার্জিস : আমাকে বলতে দাও। মাঝে মাঝে তোমার জুলুম এমন চরমে উঠত, অর্থাৎ তুমি আমাকে অপমান করতে। তখন প্রতিজ্ঞা করতাম, তোমার কাছে আর যাব না। তাই কিছুদিন পুরোহিতের কাছে যেতে লাগলাম, পুরোহিত ধরলাম। কিন্তু ওখানে কারা যায় জানো? সমাজ-শীর্ষে চড়তে গিয়ে তোষামুদি, মোসাহেবি অন্যান্য মৌখিক লৌকিকতা বা সামাজিকতার প্রাণহীন খসলতে ঢুকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ক্ষয় করেছে দিনের পর দিন, শেষে ফাঁপা হয়ে গেছে। তাই ওদের পুরোহিত দরকার। ভেতরে একদম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁকা অথবা হঠাৎ কিস্‌মতের জোরে সমাজের এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে আগমন তাদের খোয়াবের বাইরে ছিল। কিস্‌মত ত অন্ধকার বিশেষ। তার ভেতর তারা হাতড়ে-পাতড়ে কিছু ধরতে চায়। ফলে সোজা রাস্তা— পুরোহিতের দরবারে জড়ো হয়। নিজেদের ব্যক্তিত্ব অপরকে সোপর্দ করে তাদের একটা আরাম জোটে। আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু মেজাজে কুলোল না। পূর্ণ হতে গিয়ে আরো খালি হয়ে যাচ্ছি। কাজেই গিয়ে লাভ কি? আবার—

দারিয়ুস : আবার কী?

জার্জিস : পুরাতন বন্ধুর কাছে ফিরে এসেছি, যদিও সে নির্দয়।

দারিয়ুস : না, না।

জার্জিস : কাল শুনলাম, সেও চলে গেছে। তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমি জীবনে এমন যন্ত্রণা কোন দিন পাইনি। নির্বান্ধব জগত আর নরক সমান। আমার বন্ধু রাষ্ট্রদ্রোহী। সুতরাং আমি ত আর দূরে থাকতে পারব না। সংসারের পরিজনদের প্রতি আমার তোমার মত দয়ামায়া ছিলনা কোনদিন। স্ত্রীকে ত প্রতি রাত্রে ফাঁকি দিতাম। সন্তানদের সম্পর্ক স্রেফ সামাজিক, তার বেশি না। কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় যখন ঝড়ে ভেঙেছে, আমার বাঁচার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে কী? যদিও তুমি আমাকে চিরদিন নির্বোধের খোঁয়াড়ে ঘাস-বিচুলির সঙ্গে জায়গা দিয়েছ।

দুইজনে নীরব হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। হিসাব-নিকাশ শেষ, এখন সওদা মাথায় যে যার পথে চলে গেলেই হাটের ঝামেলা চুকে যায়।

দারিয়ুস স্বতঃই জার্জিসের হাত নিজের করতালুর মধ্যে টেনে নিলেন। নীরবতার যন্ত্রণা উভয়ের পক্ষে এত সুখময়, আর কোনদিন হয়ত কেউ উপলব্ধি করেনি। একবার কথা বলতে গিয়ে দারিয়ুস থেমে গেলেন। এখন কোন সাফাই হয়তো জার্জিসের অন্তঃক্ষতে এতটুকু প্রলেপ লাগাতে পারবে না। তাই অনুশোচনা হয় তার। দ্বীপের মত এক একটি মানুষ মহাসমুদ্রের উপর ভাসমান যেখানে যোগাযোগের বাহন থাকে না। তখনই নিঃসঙ্গতা মর্ম-ঘাতিনী। জার্জিসের স্তব্ধ মুখের দিকে দারিয়ুসের তাকাতে সাহস হয় না। আড়চোখে একবার চেয়ে নিয়ে তিনি ঠোঁট নাড়ার চেষ্টা করলেন। কোন শব্দ বেরুল না। জার্জিসের হাতে মৃদু চাপ নয়, বরং নিজের দুই হাতে তা নিয়ে দারিয়ুস সম্বোধন করেন :

— জার্জিস।

— বলো।

— আমি কী ভাবি জানো?

— আমার জানার কথা নয়।

দারিয়ুস থেমে যান। বুঝতে পারে, বন্ধুর ক্ষোভ এখনও মেটেনি।

এবার সঙ্গী তার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং বলে, "আচ্ছা কী ভাবো বলো।"

"সব দেরি হয়ে গেল।"

"কিসের দেরি?"

"জীবনের অর্থ যখন পেলাম তখন আমি মৃত্যুর কোলে। এই আমার একটি অনুতাপ। শেষ নিঃশ্বাস তক্ তা আমাকে অনেক যন্ত্রণা দেবে।"

অবিশ্যি জার্জিসের জন্য তার দরদ এমন পর্যায়ে স্থিত এই মুহূর্তে, তাও দারিয়ুসের আর এক অনুতাপ। কিন্তু ওই প্রসঙ্গ তিনি আর উত্থাপন করেন না।

চুপচাপ দুই জন।

দারিয়ুস মুখ খুললেন আবার, "জানো, এই জীবন গোটা পৃথিবীর মত অখণ্ড। নিজেকে সব কিছুর ভেতর প্রসারণ এবং মিশিয়ে দেওয়ার সাধনা আর প্রচেষ্টার মধ্যেই সব অর্থ লুকিয়ে থাকে। আরো মানুষ আছে দুনিয়ায়। অথচ তুমি আমি তাদের কাছ থেকে কতো দূরে। কখনও ভেবে দেখেছ কি?"

ওদিকে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত আগত।

শাস্ত্রী এসে গেছে অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে এদের নিয়ে যেতে । এত্তেলা শুনে দুই জনে উঠে পড়ল। পারস্পরিক আলিঙ্গন এবং চুম্বন শেষে বিপরীতের সমাহার অথচ আজ একাত্ম দুই বন্ধু শাস্ত্রীর অনুসরণ করতে লাগল।

হরমুজ অনেক ক্লান্তির শেষে তখন গভীর ঘুমে।

বারো

AMARBOI.COM

সৌন্দর্যের কল্যাণে অথবা কল্যাণের সৌন্দর্যে বন্দী-জীবনের শিকল তেমন দুঃসহ ভার নয়। হরমুজের বুঝতে বিলম্ব হয় না, যদিও স্পষ্ট হদিস নেই তার মনের কাছে। অবিশ্যি ভারবাহী জানে ভারের গুরুত্ব।

সেদিন সে আরো বিস্মিত হয়, তার গতিবিধির সীমানা শাস্ত্রীর বাসা থেকে আরো উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের এলাকায় প্রসারিত দেখে। সেখানেই শাস্ত্রীরা তাকে এনেছে। রাজকুমারী আবার নাকি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

অবাক হয়ে হরমুজ চারপাশে তাকায়। এখানে বাতাস যেমন অঢেল, তেমনই পরিচ্ছন্নতা। ছোট বাগান পর্যন্ত আছে সঙ্গে। কারাগারের মধ্যে এমন ব্যবস্থা! বিস্ময়ের ধাক্কা নানা দিক থেকে আসে। শুধু কয়েকটা প্রাচীর বা কয়েক কাঠা জমিনের তফাৎ। তারপর সব বদলে যায়। বন্দীশালার কুৎসিত মুখ আর চোখে পড়ে না।

হরমুজ অপেক্ষা করছিল এক সুসজ্জিত কক্ষে নয়, বরং দপ্তরে। রাজপুরুষেরা এখানে শাসনের কলকব্জা নাড়াচাড়া করে, বুঝতে পারে হরমুজ।

অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ।

বাইরে রাত্রি, বাগানের গাছপালা জানান দিয়ে যায়। কামরায় কয়েকটি মোমের শিখা একত্রে জ্বলছে। মৃদু বাতাসে তাদের কাঁপুনি কোন জ্যোৎস্নালোকের আভাস আনে, যা খোরাসানের পাহাড়ি জনপদে এতক্ষণ বেবহা ধারায় যাদুর কাঠি ছুঁইয়ে যাচ্ছে, মোহন কোন আবেশের হিল্লোল তুলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক্ষা পাষাণ। মাথা কুটার ইচ্ছা হেন অবস্থায় জাগলে, বিরতি বুদ্ধিমানের কাজ।

হরমুজ কিন্তু চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তের অবসান যত জল্‌দি ঘটে, ততই মঙ্গল। খোলা জানালা-পথে বাগানের রাস্তায় বার বার তাকায় হরমুজ।

অতর্কিত এক সময়ে তার চোখে পড়ল কালো আচ্ছাদনী ঢাকা দুই মূর্তি বাগানের রাস্তা পার হচ্ছে। এখানে আন্দাজ লাগে না আর। হরমুজ প্রস্তুত হয়।

গুলশানের সঙ্গে সেহেলী যথারীতি আছে। আজ কিন্তু ছদ্মবেশের দিকে প্রত্যেকেই সচেতন। কালো পরিচ্ছদ কেউ খুললে না। শুধু মুখের নেকাব খস্‌ল মাত্র। উভয়ে গৌরাঙ্গিনী। কালো রঙের আবরণে এমন খোলতাই সৌন্দর্যের কাছে হরমুজ স্থির করতে পারে না— কে বাদশাজাদি, আর কে বান্দী?

একদা-অভয়ের তেজে রাজকন্যাকে হরমুজ অভিবাদন করে। কিন্তু মাথা ঝোঁকায় না। গুলশানের এসব খুব না-পছন্দ। একদিন ভর্ৎসনা করেছিল তা-কে। সন্তর্পিত-দৃষ্টি কিন্তু বাদশাজাদি মাঝে মাঝে বাগানের দিকে নিক্ষেপ করে।

আজ সেহেলী সরে গেল না। এমন মুহূর্তের কোন অভিলাষ হরমুজের কাছে অবিদিত। তবু কেন জানি, সেহেলীর উপস্থিতি তার কাছে বিস্বাদ লাগছিল।

কিন্তু আজ কোন ভূমিকা ছিল না এই অধ্যায়ের।

তিনজনেই গোড়ালির উপর। গুলশান রাজপুরুষের আসনে বসতে পারত, আজ সেদিকে ফিরেও তাকাল না সে।

কথাবার্তা সোজা শুরু করলে বাদশাজাদি। কিছু ব্যস্ততার ভাব তার বাচন-ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পায়।

AMARBOI.COM

গুলশান : নওজোয়ান, তোমার কোন অপরাধ নেই। আজ থেকে তুমি মুক্ত। নিজের গ্রামে বাপ-মার কাছে ফিরে যেতে পারো। আর তুমি যদি চাও তোমাকে এখানেই কোন কাজে বহাল করে দেওয়া যায়।

হরমুজ : আপনার মেহেরবানি। কিন্তু আমার অপরাধ কি ছিল, তা ত জানতে পারলাম না।

গুল্‌শান : তোমার জানার দরকার নেই। তুমি মুক্ত। যেথা খুশি যেতে পারো।

হরমুজ মাথা নিচু করলে। রাজকন্যার জবাব তার মনঃপূত নয়, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই দ্বিরুক্তি করলে, "আমার অপরাধ কী, তা জানলাম না।" বক্তার কণ্ঠস্বরে প্রতিবাদের সুর আছে, যদিও কিছু মোলায়েম।

অপরপক্ষ তখন ঈষৎ ঝাঁঝ লাগায় নিজের গলায়, "তোমার জানার প্রয়োজন কী?"

হরমুজ : প্রয়োজন হয়ত নেই কিন্তু জানতে চেয়েছিলাম, বাদশাজাদি।

গুলশান : দরকার নেই। তুমি এখনই মুক্ত।

হরমুজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন কোথায় বিঁধছে তার মনে। শেষে আবার মুখ খোলে।

হরমুজ : আর যারা কয়েদখানায় আছে—

গুলশান : তারা থাকবে।

হরমুজ : কয়েদখানায়?

গুল্‌শান : হ্যাঁ।

হরমুজ : কেন, জনাবা?

গুল্‌শান : তারা অপরাধী।

হরমুজ : ভুল, ভুল, বাদশাজাদি। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। হয়ত তারা সকলেই আমার মত নিরপরাধ। আমার মত তারাও জানে না নিজেদের কসুর।

গুল্‌শান : দেখছি, তুমি বেশ বাচাল ব্যক্তি। গাঁয়ের সরল মানুষ নও। আমার ভুল ধারণা ছিল। তুমি এই দোজখ থেকে মুক্তি চাও না?

হরমুজ : চাই, বাদশাজাদি। আলবৎ চাই। আমার সঙ্গীরা অবিশ্যি পেছনে পড়ে থাকবে।

গুল্‌শান : তাদের নিয়ে তোমার কোন শিরঃপীড়া হওয়া উচিৎ নয়।

হরমুজ : কিন্তু তাদের ছাড়া—

গুল্‌শান : কী?

হরমুজ : আমি জানি, তাদের হয়ত সকলেই নিরপরাধ।

গুল্‌শান : জানো এই উক্তির অর্থ কী?

হরমুজ : বাদশার অপমান। কারণ তিনি যা করেন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই করেন।

গুল্‌শান : তুমি গায়ের সাধারণ সরল গাঁওয়ার নও, বেশ বুঝতে পারছি। এত কিছু জানো অথচ নিজের কথাটা বুঝতে শেখোনি। তুমি মুক্তি চাও না? (কর্কশ কণ্ঠে) চাও না?

হরমুজ : কোন্ আহম্মক মুক্তিপ্রার্থী নয়?

গুল্‌শান : তোমার বর্তমান আচরণ আহম্মকের চেয়ে কম যায় না।

হরমুজ : হয়ত তা-ই। কিন্তু আমি আমার সঙ্গীদের ফেলে একা প্রাণের ভয়ে চলে যেতে পারব না। মাফ বরবেন, বাদ্‌শাজাদি।

গুল্‌শান : একার মুক্তি চাও না?

হরমুজ : না।

গুল্‌শান : ভেবে দেখো।

হরমুজ : দেখার কিছু নেই।

গুল্‌শান : আমি জানি তুমি নির্দয় ব্যক্তি। নিজের দিকে যখন চাও না, কারো দিকেই চাইতে পারো না।

হরমুজ : ভুল করছেন বাদ্‌শাজাদি। ছেলেবেলা থেকে অপরের দিকে চাইতে শিখেছি বলে নিজের পানে তাকাতে ভুলে গেছি।

গুল্‌শান : অর্থাৎ তোমার সঙ্গীদের ফেলে তুমি মুক্তি চাও না?

হরমুজ : না। তারা আমার সঙ্গী নয়, আত্মীয়। মানুষে মানুষে চেনার অন্য কোন মানে হয় না।

বেশি কিছু সময় গুম, দাঁড়িয়ে থাকল বাদ্‌শাজাদি। সোহেলী তেমনই স্তব্ধ। সওয়াল-জওয়াবের বন্যায় সে থ' পাচ্ছিল না। হরমুজ পর্যন্ত অনড় কোন থাম। অথচ চঞ্চলতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে অনুপস্থিত কেউ বলবে না।

শেষে গুল্‌শানই উচ্চারণ করলে, "জানো এই হিমাকতের শাস্তি কী?"

হরমুজ : কী শাস্তি?

গুল্‌শান : মৃত্যু।

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বাদশাজাদি মুখ বুকের উপর প্রায় ঝুলিয়ে ফেলে। হরমুজের মুখে চিন্তার কঠিন রেখা ভেসে ওঠে। আতঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু সে নিঃশ্বাসের জোরে তাড়িয়ে ছাড়ে।

আত্মস্থ হতে তার কিছু সময় যায় না। তখনই সে সম্বোধন করে, "কেন, বাদশাজাদি?"

গুল্‌শান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় না, অবিশ্যি বিলম্ব হয় না বেশি। সাধারণ ভারাক্রান্ত তার গলা থেকে আওয়াজ বেরোয়, "জানতে চাও। না?"

হরমুজ শুধু আবার উচ্চারণ করলে, "মৃত্যু!" কিন্তু তার কণ্ঠে ভীতি ক্ষোভ বিস্ময় কিছুরই আভাষ পাওয়া গেল না।

আবার স্তব্ধতা।

সেহেলী যেন এই মুল্লুকে নেই।

স্বস্তি-দাহী এমন মুহূর্ত কারো পক্ষে বেশিক্ষণ সহ্য করা কঠিন। এই পীড়ন থেকে মুক্তির জন্যেই গুলশান বললে, "তুমি ভেবে দেখো, কাল রাত্রে আবার এই জায়গায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।"

কথা ঠিকই ছিল।

আজ সেহেলী নেই সঙ্গে। রাজকুমারি একাই এসেছিল।

কোন ভূমিকা প্রয়োজন হয় না আজ। গুলশান সোজাসুজি লেন-দেনে ঢুকে পড়ে।

গুলশান : ভেবে দেখেছো?

হরমুজ : দেখেছি, বাদ্‌শাজাদি।

গুলশান : কী সিদ্ধান্তে এসেছো?

হরমুজ : বহু প্রাণের চেয়ে আমার একটা প্রাণের দাম বেশি নয়।

গুলশান : তার পর—

হরমুজ : এমন বিচারে আর বেশি ভাবা লাগে না। সকলের জন্য যদি মৃত্যু অবধারিত থাকে, তবে তা-ই হোক।

গুলশান : তোমাকে যত সরল ঠাওরেছিলাম তুমি তা নও। তুমি, তুমি সত্যি মূর্খ।

হরমুজ : আশীর্বাদ করবেন, যেন চিরদিন এই মূর্খতা আমার বজায় থাকে।

বাদশাজাদি কক্ষের মধ্যে পায়চারি করে কোন জবাব না দিয়ে। এক একবার খোলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে হাতের মুঠি পাকিয়ে। নিজের কাছে নিজের প্রশ্নের জবাব দেয় বাদশাজাদি মাথা দুলিয়ে। হরমুজ নির্বিকার। আজ জমিনের উপর চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কৌতূহলের কশাঘাত তাকে উৎপীড়িত করে না।

গুলশান জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ ঘুরে বাম হাতের তালুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য তালু যোগে শব্দ তুলেই সে চিৎকার দিয়ে উঠল, "নওজোয়ান, তুমি সত্যি মূর্খ।" আবার খিল্‌খিল হেসে উঠল সে "মূর্খ", "মূর্খ" শব্দ কয়েকবার মাঝে মাঝে উচ্চারণ দ্বারা ছেদ ঘটিয়ে।

হরমুজ অনড়, প্রেতায়িতের মত মাথা ঝুঁকিয়ে রাখে। এত শব্দেও মুখ তোলে না।

তখন বাদ্‌শাজাদি দ্রুত কাছে এসে তার চিবুক তুলে ধরে দুই অঙ্গুলি সহযোগে আর বলে, "তুমি মূর্খ। তুমি কি জানো না, বাদ্‌শা জাহ্‌হক অভিশপ্ত? তাঁর দুই কাঁধে দুই সাপকে প্রতিদিন বিশ-তিরিশ জন তরুণ-তরুণী এবং জ্ঞান-সরস বৃদ্ধের মগজ খাওয়াতে হয়?" বড় ধীর গলায় অস্পষ্ট আওয়াজে উচ্চারণ করে গুলশান। তার পর চিবুক ছেড়ে পেছিয়ে যায়।

উত্তর দিলে হরমুজ, "অভিশপ্ত!"

"হ্যাঁ।"

"মগজ—।"

"হ্যাঁ—।"

"মানুষের মগজ—।"

হরমুজ নিশিগ্রস্ত মানুষের মত কথাগুলো উচ্চারণ করে যায় মাত্র।

"ভেবে দ্যাখো।" তার মধ্যে গুলশান সমস্যা স্মরণ করিয়ে দিলে।

"না, ভাবার কিছু নেই।" হরমুজ মাথা দুলিয়ে জবাব দিলে।

এবার সে উন্নত-মুখ। কিন্তু তার চোখ বহু দূরে দূরে বিস্তৃত। এই কক্ষের কোন কিছু তার সীমানায় পড়ে না, এমন কী রাজকুমারি পর্যন্ত অবান্তর।

গুল্‌শান হরমুজের মুখের দিকে চেয়ে চিন্তাক্লিষ্ট হওয়ার আগে সম্বিৎ দেয়, "ভেবে দ্যাখো।"

হরমুজ এবার নিজের মনেই উচ্চারণ করে যায়, "অভিশপ্ত, নরহত্যার পাপ। আমি...।"

"হ্যাঁ, তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে।"

"আত্ম-বিনষ্টি আমাকে পীড়িত করে না বাদশাজাদি।"

"ভেবে দ্যাখো—।"

হরমুজ চোখ নামিয়ে নিলে। জমিন তখন তার কাছে অন্ধকার। তার চোখ যেন পাতাল বিদারী। ভাবতে লাগল সে দ্রুত।

আবার মুখ তোলে হরমুজ এবং বললে, "আমি দুই সাপ ধ্বংস করব। বাদশা শাপ-মুক্ত হবেন।"

"পারবে?" অবিশ্বাসের হাসি ছিটিয়ে উক্তি ছুঁড়লে বাদশাজাদি।

"যদি বিফল হই, গর্দান দেব।" আপ্তকণ্ঠ হরমুজের।

গুলশান : এমন বাজি ধরার সাহস রাখো?

হরমুজ : রাখি।

গুলশান : তোমার বাজি ধরার দরকার নেই। তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি, নিজের বাপ-মার কাছে ফিরে যাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরমুজ : কিন্তু আমার জন্যে এই করুণা কেন?

গুলশান : মানুষের জন্যেই মানুষের দয়ামায়া হয়।

হরমুজ : সব মানুষের জন্য নয় কেন?

গুলশান : পিয়াসী মানুষ এক পেয়ালা পানি খোঁজে, গোটা সমুদ্র প্রার্থনা করে না।

হরমুজ : এ ছলনা আপনাদেরই সাজে, মানুষের কাছ থেকে যারা অনেক দূরে থাকে।

গুলশান : (স-চিৎকার) কে বলে ছলনা?

হরমুজ : বাদশাজাদি, সে কথা থাক। আমি সাপ ধ্বংস করব। বাদশা শাপমুক্ত হবেন।

গুলশান : গর্দানের ভয় নেই?

হরমুজ : গর্দান যাবে না। নির্ভয়ে বলতে পারি। আমার মন্ত্রে কোন ভুল নেই। সাপ ধ্বংস করব।

গুলশান : তোমার মুক্তির চেয়ে তা আরো মঙ্গলময় হয়। কোন প্রাণেরই আর অপচয় ঘটবে না। আমি আজই সম্রাটকে সংবাদ দেব।

হরমুজ : এ বাজি আপনার-আমার মধ্যে। জিতলে সেদিন আপনার কাছ থেকে মুক্তি নেব। তখন মুক্তি দেবেন ত?

গুলশান : আলবৎ।

হরমুজ : আমাকে এক হপ্তা সময় দিন। সাপকে খাওয়ানোর ভার আমার থাকবে জল্লাদের জায়গায়। অবিশ্যি মগজ জল্লাদ এনে দেবে।

গুলশান : সে বন্দোবস্তের ভার আমার উপর রইল।

হরমুজ : আর একটা অনুরোধ—

গুলশান : বল—

হরমুজ : কয়েদিদের মধ্যে রুদ্ নামে এক মেয়ে আছে, তাকে রক্ষা করবেন। তার যেন কোন ক্ষতি না হয়।

গুলশান : আমি তাকে চিনি। তোমার সেবা করতেও তাকে দেখেছি। কথা দিলাম, তার কোন ক্ষতি হবে না। আমি এখন বাদশার কাছে যাচ্ছি।

ঝটিকা গতি বাদশাজাদি চলে গেল।

হরমুজ জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর নৈশ আকাশকেই যেন সম্বোধন করে, "কি কঠোর নিয়ম, এ কি কঠোর নিয়তি! বহু জনের প্রাণরক্ষার জন্য কিছু অল্পসংখ্যক প্রাণ কেন রক্তে ডুবিয়ে দিতে হয়, কেন ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হয়? আগামী দিনের জন্য এই নরমেধযজ্ঞ না করলেই কী নয়? চুরমার হয় না কেন এই নিয়মের কঠোর-প্রস্তর মন্দির? প্রাণের রক্ষক সাজে প্রাণের জল্লাদ। একি প্রহসন, আহ...!

AMARBOI.COM

তের

মাজেন্দারানের রাজপথ।

শাদা গোঁফদাড়ি শোভিত মুখ, দুই বৃদ্ধ হাঁটছিল। আর কোন জনপ্রাণি নেই কোথাও। দুই জনে গ্রামের অধিবাসী। তারা এসেছিল শহর দেখতে। বহু দিন থেকে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। কিন্তু যারা বৃদ্ধ এবং গ্রাম্য বৃদ্ধ তাদের ভয় কী? ত্রাস, শঙ্কা ত কেবল তরুণ আর তরুণীদের, পণ্ডিতজনের।

দুই বৃদ্ধ নীরব। কৌতূহলী দুই চোখ দিয়ে তারা সারা শহর যেন চাটছিল। প্রথম বৃদ্ধের নান খাইবান। তার চোখে চতুরতার ছাপ সহজে স্পষ্ট। দ্বিতীয় বৃদ্ধ কারাশির সরল লোক, হাবভাব জানান দিয়ে যায়।

কিছু দূর এগিয়ে গেলে, খাইবানের চোখে পড়ল, রাস্তার বিপরীত দিক থেকে দুইজন শান্ত্রী বা কোতোয়াল আসছে। রাজপুরুষদের দেখে উভয়ে একটু চঞ্চল হয়। খাইবান তখন সঙ্গীর পাশ ছেড়ে বেশ সাত আট গজ এগিয়ে যায়। শান্ত্রীরা খুব বেশি দূরে নেই।

তাদের কাছাকাছি শিগ্‌গির আসার জন্য খাইবান দ্রুত পা চালায়। কারাশির অবিশ্যি ঢিমে তেতলা আপন স্বাভাবিক গতিতে এগোতে থাকে। সঙ্গীকে নিবৃত্ত হতে বলতে পারত সে। এত জোরে হাঁটার দরকার কী? কিন্তু ইশারায় হাত তুলেও সে অন্য দিকে মন ফেরালে। মুখ খোলা প্রয়োজন মনে করলে না।

খাইবান অনেকখানি এগিয়ে গেছে। একদম শান্ত্রীদের মুখোমুখি।

অন্যতম কোতোয়াল খাইবান-কে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এই মিয়া, যাও কোথায়?"

খাইবান ইশারায় হাত মুখ নাড়তে থাকে।

হেসে উঠল দ্বিতীয় শান্ত্রী এবং বললে, আরে এ হালা ত বোবা।"

প্রথম শান্ত্রী মাথা নেড়ে সায় দিল।

দ্বিতীয় তখন আবার আদিখ্যেতা জোড়ে, "দেশে ছোকরা খুঁজে হয়রান। ভাবলাম, বুড়োটাকে পেলাম।

"ইলেমদার বুড়ো হলেও চলবে। হালা বোবা।"

হাতের লাঠি দিয়ে খাইবানের বুকে খোঁচাতে খোঁচাতে দ্বিতীয় কোতোয়াল আবার জিজ্ঞেস করে, "এই, বাড়ি কোথা?"

খাইবান গলায় ঘড়ঘড় গোঁগোঁ নানা রকম শব্দ তুলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হাত-মুখ নাড়া আর চক্ষু-ভঙ্গি। যেন কত কী বলতে চায়, শুধু গলায় আটকে যাচ্ছে।

দুই কোতোয়াল এক চোট হেসে নিলে, তারপর একজন বললে, "এই ব্যাটা বোবা, যা ভাগ্।" তারপর কোতোয়াল তার পাছায় এক লাথি কষতে দেরি করলে না।

ধুলো মুছতে মুছতে খাইবান নিকটস্থ এক গলির ভেতর ঢুকে গেল। আর পেছন পানে ফিরে চাইলে না।

কারাশির কিন্তু চলা থামিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। সঙ্গীর উপর দিয়ে কী যায়, দেখা ছাড়া উপায় নেই। রাজপুরুষের সঙ্গে কথা বলা বৃথা।

এবার কোতোয়াল দু'জন এগোয়। কারাশিরের পা চালু হয়।

অল্পই ব্যবধান ছিল। এবার শান্ত্রীদের সে মুখোমুখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম শান্ত্রী লাঠি নাচাতে নাচাতে বললে, "যাও কোথা, বুড়া মিয়া?"

সরল মানুষ কারাশির। কিন্তু হাওয়া হাল্কা করার জন্য ভাবলে ঈষৎ রসিকতা মন্দ নয় এইখানে।

তাই জবাব দিলে, "আসমানে।"

উত্তর কাজে লাগল, দুই শান্ত্রী একযোগে হেসে উঠল।

প্রথম শান্ত্রী তখন বললে, "তুমি ত বাবা, পাকা ইলেমবাজ।"

"না বাবা। ডাহা নাদান। আলেফ, বে শিখেছি মাত্র।"

শান্ত্রী যুগল আবার হেসে উঠল এবং একজন হাসি থামাতে বললে, "বাবা, তুমি ত আমাদের চেয়ে বিদ্বান। আমরা তা-ও শিখিনি। আচ্ছা করা হয় কী?"

"কাজ করি। আর মেয়েমানুষ—", কারাশিরের কথা শেষ হওয়ার আগেই দুই শান্ত্রী হেসে উঠল। বৃদ্ধ বলতে চেয়েছিল, ঘরে মানুষ থাকলে রোজগার না করে উপায় আছে? কিন্তু শান্ত্রীরা ভাবলে, রসিকতা করছে।

তাই একজন বললে, "ও বাবা বুড়ো কালেও এত রস? তুমি পণ্ডিত, আলেম না হয়ে যাও না।"

প্রতিবাদ জানায় বৃদ্ধ, "না, না। আমি নাদান। লেখাপড়া কিছুই শিখিনি।"

শান্ত্রী : দাড়ি কী তোমার খামখা পেকেছে?
বৃদ্ধ : না, বাবা। মোটেই না।
শান্ত্রী : দেখি তোমার দাড়িতে হাত বুলিয়ে।
বৃদ্ধ : দেখেন।

কারাশির স্বচ্ছন্দে বলে। শান্ত্রী সত্যি দাড়িতে হাত বুলাতে গিয়ে এক গোছা ধরে টান মারে। তখনই কারাশিরের গোঁফ-দাড়ি-পরচুলা খসে পড়ল। সে এক নওজোয়ান, তারুণ্যে ডগমগ চেহ্‌রা।

শান্ত্রীদের আদল চকিতে বদ্‌লে যায়। একজন ব্যঙ্গ করে বলে, "ভেশ নিয়েছিলে? আমরা ওদিকে ছোক্‌রা খুঁজে খুঁজে হয়রান। তাই ভাবি, দেশে ছোক্‌রা পাওয়া যায় না। সব বুড়ো হয়ে গেছে শালারা। তোর সঙ্গীটাকেও ধরতে হয়। এই আবাদী (সঙ্গীর প্রতি) তুই এটাকে ধর। আমি যেটা পালিয়েছে ওটাকে দেখি।"

শান্ত্রী কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানায়, "না, পাওয়া গেল না। পালিয়েছে। যাক্, একটা ত ধরা গেল।"

কারাশিরকে তারা প্রহার করতে করতে নিয়ে গেল। কোমরে শক্ত দড়ি বাঁধতে অবিশ্যি শান্ত্রীরা ভোলে নি।

শিকার নিয়ে রাস্তার আড়াল হয়ে গেলে যথাশুভ্র গুম্ফ-শশ্রু-শোভিত খাইবান বেরিয়ে এসে সর্ন্তপিত এদিক ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করলে, "কারাশিরটা আহম্মক। দেখলে আমি বোবা সেজে বেঁচে গেলাম। ও নিশ্চয় মুখ খুলে তেরিমেরি করেছিল। বাঁচতে চাও বোবা সাজো। যা দিনকাল।"

"বোবা সাজো, বোবা সাজো।" কথাটা আরো দু-একবার ফিস্ ফিস্ আউড়ে নির্জন পথে খাইবান দ্রুত হাঁটতে লাগল আর পেছনে ফিরেও তাকালে না।

AMARBOI.COM

চৌদ্দ

আজ সঙ্গে কেউ ছিল না।

সেহেলী ক'দিন থেকে অসুস্থ। রাজ-হাকিম রোগ ধরতে পারেনি। তখন এক পুরোহিত-কে ডাকা হয়েছিল। সে জোতিষ-বিদ্যায় আবার পারদর্শী। গণনার ফলে, তার ধারণা, সেহেলী কোন প্রেতের কু-নজরে পড়েছে। তা কাটিয়ে উঠতে মন্দিরে বলির বন্দোবস্ত করা উচিত। কোন বালক হলেই চলতে পারে।

সেহেলীও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু সে এমন কান্নাকাটি করেছে, বাদশাজাদিকে এই মানৎ পরিশোধ থেকে দূরে রাখতে যে, গুলশান আর কোন উচ্চবাচ্যে যায়নি।

একটা বালক বলি-দানের বন্দোবস্ত করা রাজকন্যার পক্ষে কিছুই নয়। আঙুলের সামান্য ইশারায় তা সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু সেহেলীর প্রতিবাদ এত জোর, আর সাহস হয়না। গোপনে বা সেহেলীকে না জানিয়ে তা করা যায়। কিন্তু মিথ্যা-কথন গুলশানের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষতঃ সেহেলীর একটা কথা কানের চেয়ে মনে অনেক বেশি বিঁধছে। একজন বিসর্জ্জন দিয়ে যদি আর একজন রক্ষা পায়, এমন ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার সার্থকতা কোথায়? যেখানে একটি প্রাণের বিনিময়ে শত প্রাণ বাঁচে, তেমন ক্ষেত্রে হয়ত ভেবে দেখার সুযোগ ছিল। কিন্তু যেখানে লাভ-লোকসানের পাল্লা সমান, সেখানে একদম চুপ থাকাই কী মঙ্গল নয়?

পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় গমন-পথে বারবার গুলশান তা-ই ভাবছিল। তার বিবেকের কাছে দাস-রমণীর প্রতিবাদ বার বার ধাক্কা মারে। সে ত তার পিতার প্রাণ-রক্ষায় লাভ-লোকসানের হিসাব করেনি। নির্বিত্ত রমণী হিসাব কষে। আর সে এত সম্পদের অধিকারিণী অথচ অঙ্কের কাছে এগোয় না।

দূর থেকেই সাপের গর্জন শোনা যায়।

একটা থামের কাছে এসে কক্ষের বাইরে গুলশান থমকে দাঁড়ায়। কানের ভেতর হিস্‌হিস-ধ্বনি তা-কে কিছু চিন্তা করতে দেয় না। প্রহরিদের আদেশ দেওয়া আছে, কোন জনপ্রাণি আসবে না এই দিকে। নিতান্ত নিঃসঙ্গ এমন জায়গায় চিন্তা জট পাকিয়ে যায়। বাদশাজাদি জানে, পিতা তার সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎপ্রার্থী নয়। কিন্তু অবস্থার চাপে তাকে আসতে হয়। সেহেলী কাছে না থাকলে পিতার অভাবে সে কবেই সংসারের দয়ামায়া কাটিয়ে বনে চলে যেত। নিরুদ্দেশ দিশাহারা হওয়া ঢের কাম্য। কারণ, তখন মনের প্রশ্নগুলো জেগে উঠলেও জবাবদানের কোন বাধ্যকতা থাকে না।

প্রাসাদের গাম্ভীর্যের সঙ্গে রাত্রির অন্ধকার মিশে গিয়ে ভয়াবহতা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। শূন্যের দাপট আছে। অথচ ভরাট বস্তু ত মনের উপর এমন ছায়া ফেলতে পারে না। গুলশান নিঝুম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সেহেলীর ব্যাধিমলিন মুখে হৃদয়হরণ মমতা লেপা রয়েছে। অন্ধকারে সেই মুখ দেখতে লাগল বাদশাজাদি।

আশেপাশে চিন্তারা লেজ ঝাপটায়, গুলশান আমল দিতে নারাজ।

কিন্তু এই ভাবে সময়-ক্ষেপণ আর যুক্তিযুক্ত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরবারে নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

সিংহাসনের জন্য তার লোভ নেই।

তবু কোন লোভী সভাসদ কোথায় কি ফাঁদ পাতছে কে জানে। ঈষৎ ভয় পায় গুলশান।

আবার সাপের গর্জন শোনা গেল। একত্রে দুই সাপ হয়ত আগত আততায়ীর ছায়া দেখেছে।

অতি সন্তর্পণে গুলশান কক্ষে প্রবেশ করলে।

আবছা অন্ধকারে তাকে দুই চক্ষু আরো সজাগ করতে হয়।

দুই হাতে মুখ ঢেকে বাদশা জাহুক বসে আছে। কাঁধের দুই সাপ খেলাচ্ছলে গর্জন তুলছে, একের প্রতি অপরে কৃত্রিম আক্রোশ দেখিয়ে।

পিতার জন্য তার অশেষ করুণা হয়। এখনই ছুটে গিয়ে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত সে।

বীর্যের সঙ্গে যেখানে সৌন্দর্য মিশেছে সেখানেই বদলে গেছে ধরাধামের প্রতিচ্ছবি। নচেৎ নিঃসঙ্গ বীর্য সাপের মতই হিংস্র।

আর একক সৌন্দর্য প্রভাতের শিশিরসিক্ত সাধারণ লতা মাত্র। তা দিয়ে ধাম রচনা চলে না।

গুলশান ভাবে, পিতার আশেপাশে যাওয়াই বিপদ, বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া ত অনেক দূরের কথা।

বাদশা জাহুক তেমনই মুখ ঢেকে বসে থাকে। পৃথিবীতে কী ঘটছে লক্ষ রাখে না।

গুলশান পিতার দিক থেকে আর কোন সাড়াশব্দ আসছে না দেখে ভয় পেয়ে যায়। সাপের দংশনে বিষ-নীল পিতা ওই ভাবে ধরাধাম ছেড়ে চলে যায় নি ত?

এই চিন্তা শেষ হয়নি, অজানিতে সে চিৎকার দিয়ে ওঠে, "পিতা।"

জাহুক স্বপ্নোত্থিতের মত। তখনও শব্দের অর্থ বোধগম্য হয় না তার। তাই জিজ্ঞাসায় অতি অলসের মত উচ্চারণ করে, "কে?"

"পিতা!"

আবার গুলশানের হাঁক।

"তুই এসেছিস?" বাদশার কণ্ঠে এমন চরম বিরক্তি। গুলশানের কষ্ট হয় কিন্তু তা মুছে যেতে দেরি হয় না।

আবার আদেশ কঠিন কণ্ঠ, "তুই এসেছিস?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"ফিরে যা, কেন যে আসিস?" জাহুকের কণ্ঠ কিছু মোলায়েম।

গুলশানের চিৎকারে সাপগুলো পর্যন্ত গর্জন থামিয়ে থমকে গিয়েছিল। কিন্তু আবার হিস্‌হিস শব্দ তুলতে লাগল।

ম্রিয়মান বাদশাজাদি এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে না। তার এখনই চলে যাওয়া উচিত।

তাই আবার হেঁকে যায়, "বাবা, কাল থেকে এখানে ওদের (সাপ উচ্চারণ করে না) খাবার দিতে আসবে এক কেরমানি নওজোয়ান। তুমি যেন বিরক্ত হয়ো না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জল্লাদ কী সব মরে গেছে?"
"না।"
"তবে।"
"আমি নতুন একজন বহাল করেছি।"
"তুই রাজকাজে মাথা দিয়েছিস?"
"বাঁচতে গেলে যে অনেক কিছু করতে হয়।"
"আচ্ছা—।"
"তুমি রাগ করবে না ত? কথা দাও।"
"না।"
"কথা দাও।"
"দিলাম।"
"তবে আসি?"
"কিন্তু খামখা কেন আসিস, মা?" গুলশান তার পিতার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর চেনে। তাই অতি পুলকিত হয়ে ওঠে।
"খামখা আসি না, বাবা।"
"কিন্তু আর নয়— যা।"
কণ্ঠস্বরের রেশ কানে, গুলশান এত পুলকিত যে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় পিতাকে সালাম জানাতেও ভুলে গিয়েছিল।

AMARBOI.COM

পনের

নতুন পদে বহাল হরমুজ। পরদিন অবসর-কালে খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অবস্থার আদেশ যখন স্বচ্ছন্দে সজ্ঞানে পালন করা যায়, তখন দুঃখ বোধহয় অন্য মাত্রায় গিয়ে পৌছায়। তা যতই পীড়িত করুক, দাগা দেয় না।

দুই অভিজাত কয়েদির মুখচ্ছবি হরমুজের স্পষ্ট মনে আছে। অল্পক্ষণের দেখা। কিন্তু তাদের সহসা অন্তর্ধান সে কয়েক দিন মনের সঙ্গে মেলাতে পারছিল না। কেন তারা কয়েদের রহস্যজালে ধরা দিল? কেউ ত সাধারণ মানুষ নয়। চেহারায় স্পষ্ট, পৃথিবীর আরাম-আয়েসে চিক্না-চিক্কণ জৌলুষ। হঠাৎ এমন জায়গায় তাদের আসার কথা নয়। প্রহরি যেমন অতর্কিতে তাকে ধরে এনেছিল, এদের ত সেই ভাবে কেউ টেনে আনতে পারবে না। কী অপরাধ করেছিল তারা?

নিজের পেশার মধ্যে ঢুকে প্রথমেই তার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ল, সেই দুই অভিজাত অতিথির পরিণাম।

হরমুজের ইচ্ছা ছিল, বাদশাজাদির কাছ থেকে ওই দুই ব্যক্তির পরিচয় যোগাড় করবে। কিন্তু এক সপ্তাহের আগে তার সঙ্গে দেখার আর সুযোগ নেই। কৌতূহল অনেক সময় মনের শান্তি কেড়ে নিয়ে পারে। বিশেষতঃ এমন প্রাণঘাতী অবস্থার ক্ষেত্রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দীদের মধ্যে হরমুজ আর যাতায়াত করে না। তার থাকার জায়গা অন্যত্র নির্দিষ্ট। অবিশ্যি তার প্রতি তেমন কোন নিষেধ ছিল না।

কিন্তু সে নিজেকে এই যুক্তির বলে সান্ত্বনা দিয়েছে ঃ প্রতিদিন চেনা মুখ কয়েকজন কমে যাবে। আমি ত জানব, আমি কী পরিবেশন করছি সর্পের আহার রূপে। তখন মনে হবে, এই ঘিলু কোন্ মাথার? বন্দীশালায় গিয়ে যদি কোন চেনা মুখ আর চোখে না পড়ে, তখনই আমি স্থির থাকতে পারব না। এই জায়গায় শুধু করুণাই আসল কথা নয়। যতই শুভ ইচ্ছা থাক, তা পুরণ করতে কঠিন হতে হয়। কথা আর কাজে এই তফাৎ থেকেই যায়।

তবু হরমুজ মুষড়ে পড়ে।

সাপ ধ্বংস করতে গেলে, সাপের গতিবিধি খুব বিশেষভাবে অবলোকন করা উচিত। হঠাৎ সাপ দু'টো তার সামনে যেন জিভ বের করলে। দ্বিখণ্ডিত দুটো সরু ছুরি লিক্‌লিক করে উঠল। প্রথম দিন সে ভয়ে চোখ পর্যন্ত মেলেনি। শুধু মগজের বাটি দুই দিকে এগিয়ে দিয়েছিল দুই হাতে।

কিন্তু সেদিন রাত্রে হরমুজ ভেবেছিল এই ভাবে ভীরুতা দেখালে তার কার্যোদ্ধার ঘটতে পারে না। হদিস জানার জন্যে সাহসটুকু তার অতি-মাত্রায় দরকার।

সাপের দিকে সে অবিশ্যি তাকায় এবং গভীরভাবেই তাকায়। চোখে চোখে পড়ে গেলে কেন জানি, সাপ দু'টো বেশ থমকে যায়। তারপর ঘাড় নাড়িয়ে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে হিস্‌হিস শব্দ তোলে। মগজের দিকে অবিশ্যি লোভ সমান মাত্রায় থাকে। আরো বেশি দিলে সব গিলে ফেলত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

AMARBOI.COM

রাত্রির অবসর কাল হরমুজের কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। বন্দিশালায় আরো বহু মানুষ ছিল। সকলের সঙ্গে একটা অদৃশ্য শরিকানা সব যন্ত্রণার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারত, এখানে তার যো নেই।

বার বার দারিয়ুসের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রতি রাত্রে। কেন, জানে না হরমুজ। তার মনে হয়, সেই মুখের বিচিত্র গঠন এবং আদল দেখলে কেউ ভাবতে পারবে না, লোকটার কোনও অপরাধে অপরাধী হওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আছে। এমন সৌম্য, প্রৌঢ় চেহারা! বুদ্ধির দীপ্তি চোখে টুইটুম্বুর। অথচ তেমন মানুষ কেন লুটিয়ে পড়ল জীবন-বোধ জলাঞ্জলি দিয়ে?

হরমুজ ভাবে বহু প্রাণ-রক্ষার ব্রত তার। সে সফল হলে কত লোক মৃত্যুর হাত থেকে বর্তমানে নয় শুধু ভবিষ্যতেও রেহাই পাবে। কিন্তু এই ক্রুর হিংস্র সাপের সঙ্গে আচরণ। এক এক বার তার মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে।

কিন্তু সে জুয়াড়ি। বাজি ধরে বসে গেছে। পাশা পড়ছে। সব ঢাকনির মধ্যে ঢাকা। আবরণী তোলার পর বোঝা যাবে, তার জায়গাটা কোথায়?

কয়েক দিনে সরল গ্রাম্য যুবক কত কী যে ভাবতে শুরু করেছে।

বাইরের চাপ মানুষের ভেতরের সব দল ধরে নাড়া দেয়।

হরমুজ তা জানত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোল

দিন বা রাত্রির পুনরাবৃত্তি এখানে নতুন কিছু ঘটার সুযোগ রাখে না। বারমেসে পুরাতন ব্যাধির আক্রমণে তারতম্য থাকে। কিন্তু চিত্ত যেখানে পরিবেশ-জর্জর, সেখানে দীর্ঘশ্বাসের সমতা পর্যন্ত এদিক ওদিক হয় না। অসাড়তা যেটুকু আসে একঘেয়েমি-জাত, তা বরং সমতার উপর ধূসর রঙ লেপে যায়, চোখকে সাহায্য করতে।

বাদশা জাহ্নক হাই তুলতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ হাত যদি সাপের মুখে বা গায়ে ঠেকে যায়। ছোবল বিষেও ত সে মরতে পারে। বৎসরের পর বৎসর এই অভিনয়ে সে ভুল করেনি।

সেদিন গোধূলির পর হঠাৎ হাই তুলতে গিয়ে সাপের মাথার উপর আঙুলের ঈষৎ ছোঁয়া লেগে গেল। রীতিমত কোন শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হয় জাহ্নক। কিন্তু সাপটা তার দিকে তাকাল না মাত্র। এই সব দুর্জন প্রতিবেশীদের সঙ্গে বহু দিন অধিবাসের ফলে সাহস বাদশাকে নিজের গরজেই কিছু বাড়াতে হয়েছে। অন্ততঃ আড়চোখে দেখার জন্য কোনো বুকের পাটা প্রয়োজন হয় না।

সেদিন সাপটা জাহ্নকের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করলে না। বরং ফোঁস করে উঠল। কিন্তু তার লক্ষ-বস্তু অন্য সাপটা।

অন্য তরফ থেকে তখন তেমনই ফোঁস ফোঁস রব উত্থিত হয়।

বাদশা এবার আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। বরং দুই হাতে মুখ ঢাকেন। যা-খুশি ঘটুক পৃথিবীতে। তার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সাপের গর্জন দুই দিক থেকে সমান তালে বাড়ছে। বাদশা বুঝতে পারে, তার মাথার উপর এক সাপ অন্যটাকে ছোবল দেওয়ার জন্যে লেজে রীতিমত বল সঞ্চয় করছে। রাজার গ্রীবাদেশে তার টান পড়ছে। এই ভাবে প্যাঁচ বাড়লে অন্ততঃ আর নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না।

সর্পগর্জন আর গর্জন নেই। হিংসা এবং জিঘাংসার চরম পর্যায়ে ঘাতক যেমন আরো সরীসৃপতা-সঞ্চয়ে চিৎকার দেয়, এই ফোঁসধ্বনি তেমনই বিকট কিছু।

হঠাৎ একটা সাপ উপর থেকে ঘাড় দ্রুত নিচে নামিয়ে অপর সাপের লেজে এক কামড় মারলে। প্রতিপক্ষ প্রস্তুত ছিল না। তার সামলে উঠতে হয় দ্রুত। প্রতিদ্বন্দ্বীর লেজ কামড়ে ধরতে তারও বিলম্ব হয় না। সুতরাং লেজ কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি মারফৎ শক্তি পরীক্ষা চলতে থাকে। ডান কাঁধের সাপ বরং বাম দিকের সাপের লেজ গিলতে শুরু করছে।

বাদশা একদম অসাড় হয়ে হায়। আর চোখ খোলে না সে। কিন্তু তার উপলব্ধির কোন অসুবিধা ঘটে না। তার কাঁধ আর পিঠ ত লড়ায়ের ময়দান।

বাম দিকের সাপ রীতিমত বেকায়দায় পড়ে গেছে। শত্রু তা-কে গিলে ফেলেছে প্রায় অর্ধেক। এবার এই অবস্থায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। পাল্টা দিলে সাপটা বেশ জোরের সঙ্গে। দুশমনের ঘাড় কামড়ে ধরলে এক পলকে। ডান কাঁধের সাপ তখন তাড়াতাড়ি গেলা লেজ উগ্‌রে দিয়ে ঝট্‌কা মেরে নিজের ঘাড় ছাড়িয়ে নিলে। শুধু তা-ই নয়। বাদশার গলার প্যাঁচ খুলে ফেলে সোজা মেঝের উপর গিয়ে পড়ল। তারপর লেজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর দিয়ে ফণা তুলে মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। সেখানেও বেশি দেরি হয় না। গর্জন হেঁকে আবার প্রতিপক্ষের লেজে দংশন করলে। একবার গিলে ফেলার চেষ্টা বিফলে গেছে, তাই বোধহয়, অন্য পাঁয়তারা ফাঁদতে লাগল।

এবার দেখা গেল নতুন কায়দা। লেজে ভর দিয়ে দাঁড়ালেও গোটা লেজের প্রয়োজন হয় না। আরো অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকে। তা দিয়ে সাপটা শত্রুর লেজে পাশ গিঁঠোতে লাগল। অর্থাৎ চাপ দিয়ে বাম কাঁধের সাপকে কাবু বা কাহিল করে ফেলবে।

বাদ্‌শার ঘাড়ে বসে-বসে এই অবস্থায় লড়াই সম্ভব নয়। বাম কাঁধের সাপ জোরে প্যাঁচ খসিয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়ল।

প্রায়-মৃত জাহ্‌হক কিন্তু এতক্ষণ মুখ ঢেকে বসে ছিল। কণ্ঠদেশে বহু দিনের সাবেক বন্ধন আর নেই। মুক্তির আমেজ কিন্তু তাকে বিহ্বল করে না। বরং আরো ভয় পায় বাদশা।

মেঝের উপর কী ঘটছে, তা-ও দেখা উচিত। বাদ্‌শার মুখ ঢাকা থাকে। কিন্তু আঙুল ঈষৎ সে আল্‌গা করে এবং ফাঁকের ভেতর দিয়ে সর্পযুদ্ধের মহড়া দেখার চেষ্টা পায়।

মেঝের উপর তখন যথাযথ দ্বৈরথ শুরু হয়েছে।

নিরন্তর ফোঁস এবং মাঝে মাঝে গর্জন সমস্ত কক্ষ কাঁপিয়ে তুলছিল।

ফণায় ফণায় তখন ঠোকাঠুকি চলছে।

আলাদা হয়ে গেছে দুই সাপ।

লেজে ভর দিয়ে একে অপরকে দেখছে এবং থেকে থেকে আক্রোশে ছুটে যাচ্ছে, প্রতিপক্ষের যেখানে পায় ছোবল দিতে।

AMARBOI.COM

কিন্তু এই পৃথক ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। প্যাঁচ কষাকষি এবং ছোবলের টানাপোড়নে এক একবার মনে হবে, এখানে সাপ একুনে এক— কেবল তার মাথা একটা নয়, দু'টো।

অবিশ্যি মেঝে আর শুক্‌না নেই।

সাপের রক্তে ভিজে যাচ্ছে। বাম কাঁধের সাপের কোমরের কাছে খানিকটা মাংস উধাও। মেরুদণ্ডের হাড় ঝিল্‌মিল চোখে পড়বে। ঈষৎ চর্বির ঝিল্লি শুধু ব্যবধান।

ডান কাঁধের সাপের লেজের এক বিঘৎ খসে গেছে। একদম আলাদা। খণ্ডটুকু পৃথক নড়ছে, মাথার সঙ্গে যোগছিন্নতা সত্ত্বেও আরো জখম-জর্জর উভয়ের দেহ। হিংস্রতায় কেউ কারো বাঁয়ে যায় না।

ডান দিকের সাপটা হঠাৎ ধাঁ করে এগিয়ে, সামান্য এদিক-ওদিক হেলে-দুলে, বামী সর্পের গলায় লেজের ফাঁস জড়িয়ে ফেললে। খুব দ্রুত। দম বন্ধ করে মারার ফন্দি।

কিন্তু অপর পক্ষ অত সহজে কাবু হয় না। মাথা নিচু করে শত্রুর পেট-সংলগ্ন এক নয়, বারবার চার-পাঁচ ছোবল মারলে, যদিও কণ্ঠে রশি জড়িয়ে রয়েছে।

এই দংশন বিফলে গেল না। বোধহয় বিষ-ক্রিয়া দুই শরীরে ধীরে ধীরে জানান দিচ্ছে। গলার প্যাঁচ ছেড়ে দিতে তাই সাপটা বাধ্য হয়। আবার ছিট্‌কে পড়ে একটু দূরে গিয়ে ফণা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ দুল্‌তে থাকে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে। তখন ভয়ানক দেখায় এই নাগ-মূর্তি।

কিন্তু দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অত সহজে ইতি হয় না। বাদ্‌শা জাহুক আঙুলের ফাঁক বাড়িয়ে দিয়েছিলে। কাছে তলওয়ার পড়ে রয়েছে। একবার ভেবেছিল, এক কোপে দু'টো সাপই নিধন করা যায়। কিন্তু কে জানে হিতে যদি বিপরীত কিছু ঘটে। তাই নিবৃত্ত হয়। আরো হেতু ছিল।

দুই পক্ষ তখন কাহিল হয়ে পড়েছে। তারা লড়ছে, কিন্তু লড়ায়ে আর তেমন জোর নেই। অবিশ্যি ফোঁসের মাত্রা বরং উত্তরোত্তর বাড়ছে। গর্জনের পালা প্রায় নিঃশেষ। তার জন্য নিঃশ্বাসে জোর থাকা দরকার।

হঠাৎ নিস্তেজ সাপ দুটো আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। লেজের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে একে অপরের লেজে পাক দিয়ে টানছে। অবিশ্যি গলা, ফণা সটান। কুস্তি শুরু হয়েছে লেজে। অন্যান্য অংশ শুধু কৌশল দাগার জন্যে স্থির। বাম দিকের সাপটা লেজের সাপ্‌টানিতে হেঁচকা টান মেরে একদম আছড়ে পড়ল প্রতিপক্ষের কোল ঘেঁষে। এবার ফণায় ফণায় চুম্বন। ছোবল দেওয়ার সুযোগ পায় না কেউ। তার জন্যে কিছু ফাঁক দরকার। পেছিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের মৌকা লাগে। টেলাঠেলি শুরু হলে সেই জন্য। রক্ত-জর্জর দুই সাপের গা। উপরের চামড়া মেঝের ঘষ্‌ড়ানিতে ছড়ে গেছে। দগ্‌দগে মাংস ছোবলের ফলে কোথাও কোথাও ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ঝুলতে থাকে।

চুম্বন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ডান দিকের সাপটা হঠাৎ ঘুরে নিজের লেজের কাটা অংশে বোধহয় আঘাত বা যন্ত্রণা সাম্‌লাতে মুখ ঘষতে লাগল। বাম-সর্প মৌকা বুঝে দাদ নিতে গেল। কিন্তু কামড় বা ছোবলে তেমন জোর নেই। দুটো সাপই তারপর কী ভেবে একে অপরের জড়ানির মধ্যে ঢুকে মেঝের উপর মাথা রাখলে, আর মাথা তুললে না।

তাগদ কী, আর কারো বিন্দুমাত্র নিঃশ্বাস পর্যন্ত নেই, দেহ থেকে বেরোয়।

নিঃসাড় সাপের দিকে তাকাতে এব্যার সম্রাট জাহুক আঙুলের ফাঁক আরো প্রসারিত করে। তবু সাহস যোগায় না। কতক্ষণ এই লড়াই চলেছে কে বলবে? হয়ত হাজার হাজার বছর। সময় তখন সম্রাটকে পরিত্যাগ করেছিল।

কিন্তু যখন এক প্রহর আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না সরীসৃপের দিক থেকে, সম্রাটের আর কোন সন্দেহ থাকে না। আমার গলায় আর ওরা ফিরে আসবে? না, তার শত্রুরা চিরদিনের জন্য মরেছে।

কিন্তু বাদ্‌শা যেন যোগাসনে উপবিষ্ট। শুধু হাত সরানোর সময় যা ঈষৎ দৈহিক চাঞ্চল্য ফুটেছিল। নচেৎ জাহুকও মৃত ওই সাপের মত। ফারাক শুধু তার বক্ষ-স্পন্দনের উত্থান-পতনে।

অকস্মাৎ চমকে উঠলে সম্রাট 'পিতা' আহ্বানে।

"পিতা।"

তখনও মুখ খুলতে পারে না বাদ্‌শা। দুই চোখ মেলে কান তখন সজাগ করতে হয়।

"পিতা।"

স্তম্ভের কোন আড়াল থেকে এই শব্দ উঠছে। কিন্তু গুল্‌শানকে তার চোখে পড়ে না নিজের গলায় বাদ্‌শা বার বার হাত ফেরায়। না, তার বহুদিনের বন্ধন অন্তর্হিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার চোখ মেঝের উপর পড়ে। লম্বিত-দেহ দুই সরীসৃপ শুয়ে আছে একের মধ্যে আর একটা জড়িয়ে। আর উঠবে না।

“পিতা।”

আবার আহ্বান।

এবার সম্রাট পিতৃ-সুলভ স্বতঃস্ফূর্ততায় জবাব দিয়ে বসেন, “কে? গুল্‌শান।”

“হ্যাঁ, বাবা।”

“কাছে আসিস না, মা।”

গুল্‌শানকে এবার দেখা যায়। থামের আড়াল থেকে সে বেরিয়ে মেঝের উপর দাঁড়িয়েছে।

এই কক্ষের আলো অস্পষ্ট থাকত এত দিন। দৃষ্টি সজাগ করেই সব কিছু দেখতে হয়। বাদ্‌শা ঝাপসা কন্যার অবয়ব লক্ষ করে।

“পিতা, একি!”

“কাছে আসিস না, মা। মেঝের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ।” সম্রাটের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তোলে।

“এ কি, বাবা! তোমার কণ্ঠে তারা নেই। মেঝের উপর শুয়ে আছে কেন?”

“হয়ত মরে পড়ে আছে। তুই এদিকে আসিস নে, মা।”

অনেক আগেই এসেছিল গুল্‌শান পিতার সঙ্গে সাক্ষাতে। কিন্তু সাপের গর্জন শুনে আর এগোয় নি। পিতা রীতিমত বিরক্ত হবেন। কিন্তু অস্বাভাবিক বহুক্ষণ সর্প-গর্জন শোনার পর সে আর ধৈর্য রাখতে পারে নি।

সম্রাট বার বার বারণ করে। গুল্‌শান ঠায় অনড়। সে ভাবতে পারে না নিজের কর্তব্য।

দুই জনের এত চিৎকারেও যখন দুই সাপের মধ্যে নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, গুল্‌শান সাহস পায়। সে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। অন্য দিকে পিতার আদেশ শেষে বজ্রনাদে ফেটে পড়েঃ আর এক পা এগোলে এই তলোয়ার দিয়ে আমার গলা দু'-আধখান করে ফেলব, যে গলা এখন খালি।

গুল্‌শান থামতে বাধ্য হয়।

পিতা দুহিতার দিকে তাকায়।

কন্যা পিতৃ-পানে।

অস্পষ্ট আলো।

নীরবতা।

এমন সময় পেছনে পদধ্বনি শোনা গেল, কে যেন কক্ষে প্রবেশ করছে।

গুল্‌শান পেছন ফিরে তাকায়। নতুন জল্লাদ এসেছে। তার দুই হাতে দুই থালা।

তাকে দেখা-মাত্র গুল্‌শান ছুটে গিয়ে বলে, “নওজোয়ান, সাপ দুটো মেঝের উপর পড়ে আছে। ওই দ্যাখো।”

নওজোয়ান কুর্নিশ জানাতে ভুলে যায়। হাতের থালা জমিনের উপর রেখে এক লহ্‌মা মেঝের দিকে তাকিয়ে আনন্দে চিৎকার দিয়ে ওঠে বাদ্‌শার দিকে অগ্রসরমান

AMARBOI.COM

অবস্থায় বলতে থাকে, "আলম্পনা, আপনি শাপমুক্ত।"

থাম-সংলগ্ন অস্পষ্ট বাতির শিখা বাড়িয়ে দিতে থাকে হরমুজ এক এক করে।

সমস্ত রাজকক্ষ আলোর বন্যায় উজ্জ্বল।

পলকে সব যেন বদ্‌লে গেল।

বাদ্‌শা ওঠে আসে মেঝের উপর এবং তার বহুদিনের সঙ্গীদের মৃত লাশের দিকে তাকায়। হয়ত আনন্দে, হয়ত বিষাদে।

কন্যা তখন পিতার বক্ষ-সংলগ্ন। এক দিকে হরমুজ মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অসোয়াস্তিকর নীরবতা বাদ্‌শার উচ্চারণেই মুছে যায়।

— এ নতুন জল্লাদ কে, মা? বড় দেখতে সুন্দর।

— এর সব কথা তোমাকে পরে বলব। চলো।

— কোথায়?

— রাজ্যময় ঘোষণা করতে হবে না?

— চলো।

কিন্তু আর এক থামের পাশে যেখানে ঘিলুর থালা রক্ষিত ছিল, সেখানে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে হরমুজ।

এতক্ষণে পিতাপুত্রীর চোখে পড়ে।

এগিয়ে যায় দুই জনে। বাদ্‌শা তার কাছে দাঁড়িয়ে সম্বোধন করে, "নওজোয়ান আমি মুক্ত। আর এই আনন্দের দিনে তুমি কাঁদছ? তুমি খুশি নও?"

"জাঁহাপনা—", হরমুজের কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। গুল্‌শান তার পাশে বসে পড়ে।

বাদ্‌শা বিস্মিত হয়। কোন সাড়া কারো দিকে না পেয়ে বাদ্‌শা আবার মুখ খোলেন

"সুন্দর জল্লাদ, তোমার বক্তব্য কী?"

"জাঁহাপানা, প্রাণরক্ষার জন্যে প্রাণের বিনিময়ে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এতগুলো প্রাণের অপচয় ঘটল। দুশ্‌মনরা আগে মরল না কেন?"

হরমুজ থালায় রক্ষিত ঘিলুর দিকে চেয়ে থাকে, যেন এই ঘিলুর মালিকদের সে জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে। সেই মুখ, সেই চোখ।

"তার জন্যে তুমি অপরাধী নও, বৎস। আমি অপরাধী।"

"জাঁহাপানা—।

"তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। আমি জাহুক বাদ্‌শা নই। আমি নতুন রাজ্য গড়ব যেখানে মানুষের জন্য কোন মানুষকে জুলুম ভোগ করতে হবে না। যে সকলের গোলাম হতে পারবে সে-ই হবে সকলের বাদ্‌শা। চলো। কিন্তু কে আমাকে শাপমুক্ত করলে?"

"পরে বলব, বাবা।"

গুল্‌শান আর কোন কথা বলতে দিল না কাউকে।

তিন জন কক্ষ পরিত্যাগ করলে।

মেঝের উপর পড়ে রইল দুই কালী-গোক্ষুর।

সত্যিই মৃত।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতের

উৎসব-মত্ত মাজেন্দারানের নগরী।

বাদ্‌শার ঘোষণা অনুযায়ী আমোদ-প্রমোদের মেলা বসেছে এলাকায় এলাকায়। বহু দিনের বিষণ্ন হাওয়া আবার স্বাভাবিক বইতে শুরু করেছে গাছপালায় মর্মরের সুড়সুড়ি রেখে।

সকলেই জানে বাদ্‌শা শাপমুক্ত। এত দিন যা গোপন ছিল এখন রাজ-দরবারেই তা প্রকাশ্যে ঘোষিত। তরুণ-তরুণীরা দল বেঁধে রাস্তায় হাঁটছে। অনেক বৃদ্ধ নাজেহালের মুখে পড়েছে। তাদের দাড়ি আসল না কৃত্রিম দেখার জন্য বার বার হাত বাড়িয়েছে রাস্তার মানুষ। এক তরুণ আবার মুখে দাড়ি গুঁজে অভিনয় করছে হাটের চত্বরে। হাসি-মশ্‌করা গলি-ঘুঁজির ভেতরে পর্যন্ত শোনা যায়। হঠাৎ যেন এক রাত্রির ভেতর গোটা দেশ যাদু-দণ্ডের স্পর্শে চেতনার বহু সিঁড়ি পার হয়ে গেছে।

বাদ্‌শা জাহুক আর নিজের পুরাতন দরবারে বসবেন না। গোটা দেশ যেন তার সভাসদ। তাই ঘোষণা মারফৎ, সকলেই শরিক হওয়ার অধিকারের সংবাদ শুনেছে। দলে দলে লোক ছুটছে ময়দানের দিকে। প্রত্যেকেই শরিক হওয়ার চেয়ে কৌতূহল মেটাতে লাগল। শহরের দুই জন পরিচিত খস্‌লতি মাতাল পর্যন্ত এই জমায়েতে হাজির হতে চায়। তারা টলে টলে এগোচ্ছে একে অপরের কাঁধে ভর দিয়ে। হাসি-ঠাট্টার অন্ত নেই ওদের কেন্দ্র করে। রাজপথে আর প্রহরিদের দেখা যায় না। যাদের দাপটে পথচারিরা অস্থির থাকত, সব কর্পূরের মত উবে গেছে। মাতাল জনতা।

আজ দরবারের কোন জৌলুষ নেই। সাধারণ মঞ্চ মাত্র। তবুও সামনের সারির দিকে ছুটে লোক এগিয়ে যেতে পারছে। তারা সাবেক সভাসদ। তাদের লেবাস দেখেই পুরাতন অভ্যাসবশত লোক জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ, এমন কোন বাড়তি অধিকার আজ কেউ দাবি করতে পারে না। তবু অভ্যাস যেতে বিলম্ব ঘটে বৈকি।

জাহুক মঞ্চে উপবেশনের পর তুমুল হর্ষধ্বনি ওঠে চারিদিক থেকে। আজ সাধারণ রাজকীয় কোন কাজের তেমন ফিরিস্তি উঠল না। প্রাচীন সভাসদগণ সকলে উপস্থিত। কেবল দারিয়ুস এবং জার্জিস-কে না দেখে বাদ্‌শা বিস্মিত হয়। পরে তাদের খোঁজ নেওয়ার কৌতূহল আপাতত জমা রইল। থেকে থেকে বাদ্‌শার প্রশংসায় জনতা এমন উল্লাসমুখর চিৎকার তোলে জাহুক অভিভূত না হয়ে পারে না। আসন গ্রহণের পূর্বে অবিশ্যি তিনি নতুন ঘোষণা করেছেন, সেদিন শাপমুক্ত হওয়ার পরক্ষণেই যা বলেছিলেন। "আর তিনি বাদ্‌শা নন, গোলাম। আর সেই হবে এই রাজ্যের বাদ্‌শা যার সকলের গোলাম হওয়ার ক্ষমতা আছে।"

জনতার তুমুল হর্ষধ্বনি তর্খন সমুদ্র-কল্লোলের গভীরতাকে ছাড়িয়ে যায়।

জাহুক আবার জনতাকে সম্বোধন করে জানান, আজ এইখানে দরবারের আর একটি কাজ সমাধা হবে— যা হয়ত গোপনে সম্পন্ন হতে পারত। কিন্তু তাঁর মতে বাদ্‌শা ও প্রজার মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকা অনুচিত। বহু দিনের যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে এই তার লব্ধ শিক্ষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহুক সম্বোধন করলেন, "এই জনতার মধ্যে যদি জল্লাদ হরমুজ থাকো, আমার মঞ্চের উপর উঠে এসো।"

"হরমুজ, হরমুজ" ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ সকলের মুখে। খুব দূরে ছিল না হরমুজ। হাত তুলে সে তার উপস্থিতি জানায়।

জনতা এবার তা-কে পথ ছেড়ে দিতে থাকে। কিন্তু সকলেই নিজেদের মধ্যে মন্তব্য লোফালুফি করে।

এ কি জল্লাদ?

এত ফুল-বাগানের মালীর মত দেখায়।

এ আবার কী রকমের জল্লাদ!

মানুষের মাথা কাটত না মুরগি জবাই করত?

দেখতে ত রাজপুত্রের মত।

কাল থেকে রাজ্যে যত তেলেস্‌মাতি কাণ্ড শুরু হচ্ছে।

এক সময় হরমুজ এই ফিস্‌ফিসানি এবং জনতার ভিড় ঠেলে মঞ্চে এসে পৌঁছায়।

বাদ্‌শা তখন জনতাকে সম্বোধন করে আবার বলেন, "আমি আগেই বলেছি, রাজা-প্রজার মধ্যে গোপন কিছু থাকা উচিত নয়। আজ সকলের সামনে আর এক রহস্য ভেদ হোক, যা আমার কাছে এখনও অজানা।"

সমগ্র জনতা তখন একদেহ। কোথাও বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য পর্যন্ত নেই।

হরমুজ মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাদ্‌শা আবার অভয় দিলেন, "না। বাদ্‌শার সামনে অপরাধী ছাড়া আর কেউ শির ঝোঁকাবে না। আর নতি বাদ্‌শার কাছে নয়। সমস্ত মনুষ্যত্বের কাছে।"

হরমুজ মাথা তুলে দাঁড়ায়। জনতা যেন অভিনয় দেখছে নিঃশ্বাস থামিয়ে।

জাহুক এবার জিজ্ঞেস করেন, "নওজোয়ান, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমাকে শাপ থেকে মুক্তি দিয়েছ। কিন্তু আমার প্রশ্ন— কী ভাবে তুমি আমার কাঁধের দুই শত্রুকে ধ্বংস করলে?"

হরমুজ আবার মাথা ঝুঁকিয়ে নেয়। জিজ্ঞাসার সম্মুখে হতভম্ব, ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল সে, বলা বাহুল্য।

আবার বাদ্‌শার প্রশ্ন, "এই জনসমক্ষে প্রকাশ করো তুমি। তোমার কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। জানো, আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ আমার নতুন জন্মের জন্য। গোটা রাজ্যের মানুষ কৃতজ্ঞ তারা জুলুমের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।"

তখনও হরমুজ দ্বিধান্বিত। কিন্তু সে সাহস পায় না মুখ খুলতে। অবিশ্যি বাদ্‌শার কণ্ঠস্বরে অশেষ মিনতি। তা শুনে জনতাও প্রথমবারের মত বিস্ময়ে বিস্ময়ে ধাক্কা খায়।

"মাথা তোলো", আবার হরমুজকে বাদ্‌শা অনুরোধ করলেন।

হরমুজ সটান শিরদাঁড়া; মুখ তুলতে বিলম্ব করে না।

জাহুক : এবার তুমি বলো, কী ভাবে তুমি তোমাদের জালেম বাদ্‌শাকে শাপমুক্ত করলে?

হরমুজ : আমি ত বলতে পারব না, জাঁহাপানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহুক : কারণ—

হরমুজ : কারণ, আমি কিছু জানি না।

বিন্দুমাত্র যেটুকু চাঞ্চল্যের আভাস ছিল জনতার মধ্যে, তা আর কোথাও চোখে পড়ে না। ফলে উদ্গ্রীব, উন্মুখ।

জাহুক : নিশ্চয় তুমি কোন মন্ত্র জানো।

হরমুজ : না, জাঁহাপানা।

জাহুক : তুমি বিনয় দেখিও না। নিশ্চয় তুমি মন্ত্র জানো। নচেৎ এমন দৈত্য কী ভাবে ধ্বংস হতে পারে। এক হপ্তার মধ্যে আমিও নতুন মানুষ হয়ে গেলাম।

হরমুজ : আমার কোন মন্ত্র জানা নেই, জাঁহাপনা।

জাহুক : নচেৎ তুমি মস্ত বড় কোন হাকিম।

হরমুজ : আদৌ না, আলম্পনা।

জাহুক : কোন উপাধ্যায়, ওঝা?

হরমুজ : আদৌ না।

জাহুক : তুমি রহস্য গোপন রাখতে চাও?

হরমুজ : না, জাঁহাপানা। আমার গোপন কিছু নেই।

জাহুক : ঝুট কথা।

বাদ্‌শার কণ্ঠ হঠাৎ ঈষৎ চড়ে যায়। কিন্তু তখন তা সামলে নিতে দেরি হয় না, যখন আরো খাদে নামে স্বর।

জাহুক : বুঝেছি, এত লোকের সামনে তোমার ইলেম তুমি কাউকে জানাতে চাও না।

হরমুজ : বেয়াদবি হলে মাফ করবেন, আমি মাফ চাই। আমাকে মূর্খ বলতে পারেন। আমার বিশেষ কোন ইলেম নেই। অযথা আমাকে গোনাহগার করছেন।

জাহুক : তোমার এমন সুগঠিত সুন্দর চেহ্‌রা, অথচ তুমি সরলভাবে কথা বলছ না।

হরমুজ : জাঁহাপানা, এই বান্দা গরিব, অতি সাধারণ মানুষ। মার-প্যাঁচে আদৌ অভ্যস্ত নয়।

জাহুক : শোনো নওজোয়ান। এই প্রকাশ্য দরবারে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আমি ঘোষণা করছি : তোমার রহস্য জানিয়ে দিলে, বাদশাহজাদি গুল্‌শান-কে আমি তোমার হাতে সঁপে দেব। শুধু সঁপে ক্ষান্ত হব না। আমি আরো ঘোষণা করছি, তুমিই হবে এই রাজ্যের বাদশা। কারণ, তুমি প্রাণ রক্ষা করতে পারো, প্রাণ বাঁচাতে পারো। প্রাণ-হত্যা নয়, যে প্রাণ বাঁচাতে পারে, বাদশা হওয়ার অধিকার শুধু তারই হওয়া উচিত—আর কারো নয়।

এই সময় উপস্থিত সভাসদ এবং জনতা-মহলে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদল শুধু অবাক না। ভ্রূকুটি তোলে মুখমণ্ডলে। জনতা বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উৎফুল্ল হর্ষধ্বনি করবে এবার। কিন্তু তার আগেই বাদশার গম্ভীর কণ্ঠ আবার সব চাঞ্চল্য পলকে থামিয়ে দেয়।

জাহুক : আমার ঘোষণা শুনলে। এখন মন্তব্য বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরমুজ : আমার কোন গুপ্ত মন্ত্র নেই, কোন রহস্য নেই, জাঁহাপানা।

জাহুক : তুমি কি জানো না, বাদশার হুকুম অমান্য করলে গর্দান যায়?

হরমুজ : তা জানি। কিন্তু আমার কোন তুক্‌তাক, মন্ত্র জানা নেই।

জাহুক : আমার ঘোষণা শোনার পরেও তোমার কোন চৈতন্য হচ্ছে না। এখন সকলের সামনে প্রকাশ করো— কী উপায়ে তুমি আমার শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়লে?

হরমুজ : সত্যি বলছি, জাঁহাপনা, আমার কোন মন্ত্র জানা নেই। তবে—

জাহুক : (উদগ্রীব) তবে কী—?

হরমুজ : বালক-কালে আমাদের গ্রামে এক গেরুয়া-বসন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তার একটা কথা আমি কোন দিন ভুলতে পারিনি। কিন্তু সে-কথা কোন মন্ত্র নয়।

জাহুক : সে-কথার সাহায্যেই তুমি আমাকে শাপমুক্ত করলে?

হরমুজ : হ্যাঁ, জাঁহাপানা।

জাহুক : কথাই ত মন্ত্র।

হরমুজ : তা আমার জানা নেই।

জাহুক : তুমি খামখা বিলম্ব করলে। মনে রেখো আমার ঘোষণার কোন নড়চড় হবে না। বাদশাজাদি গুল্‌শান আজ থেকে তোমার— আর কারো নয়। সেই মন্ত্র না, তোমার কথাই থাক, সেই কথাই এখানে প্রকাশ করো সকলের সামনে।

হরমুজ : জাঁহাপানা, বাদশাজাদি বাদশাজাদি থাকুন। তিনি আর কারো ঘরণী হন। বামনের হাতে চাঁদ শোভা পায় না। কথা মন্ত্র হতে পারে তা আমার জানার কথা নয়। তবে সেই সন্ন্যাসীর কথা আজ সকলকে বলে যাব। তা আমি মনে মনে পুষে রেখেছিলাম বহু দিন ধরে।

জাহুক : দেরি করো না, বৎস।

তবু এতক্ষণ জনতার অবয়বে কালেভদ্রে কিছু টুকিটাকি অসঙ্গতি ভেসে উঠত। কিন্তু হরমুজের জবাবের পর আবার তা শ্বাসরুদ্ধ নিথর এক প্রতিমায় পরিণত হয়। সকলের দৃষ্টি জাহুক এবং হরমুজের উপর নিবদ্ধ।

হরমুজের মধ্যে আর জড়তার কোন লেশ থাকে না। খাড়া মেরুদণ্ড, উন্নত শির, দীপ্ত তেজ। সে এবার বাদশাকে সম্বোধন করে, "জাঁহাপানা—"। তার প্রতিধ্বনি স্পর্শে গোটা জনতা নিঃসাড়। কোথাও বক্ষস্পন্দন পর্যন্ত অনড়। বেশ উদাত্ত কণ্ঠেই হরমুজ আরম্ভ করে। "জাঁহাপানা, সেই গেরুয়া-বসনধারী বলেছিলেন : "লোভ করোনা।" আরো বলেছিলেন : "যখন লোভ করবে, তা গোটা রাজ্যের সকলের জন্য করবে। তা হলে লোভ আর লোভ থাকবে না। কিন্তু একার লোভ থেকে জন্মায় ঈর্ষা, হিংসা। আর তা থেকে আসে ধ্বংস।"

জাহুক : উত্তম উপদেশ।

হরমুজ : আর—

জাহুক : বিলম্ব করো না, বৎস। বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরমুজ : জাঁহাপানা, বাদশাজাদির কাছ থেকে সেই কথার জোরেই আমি ঘিলু পরিবেশনের ভার নিয়েছিলাম। আমি জল্লাদ নই। নরহত্যা আমি পাপ মনে করি। ভার নিলাম। আমি ঘিলু পরিবেশনের সময় এক সাপকে কিছু বেশি ঘিলু অন্যটাকে কম দিতাম। কোন দিন এটাকে কম, ওটাকে বেশি। এমনই পালাক্রমে। আর সাপের চোখের দিকে তাকাতাম। সাপ ত। কত আর বুঝবে। ওদের রাগ হওয়া উচিত ছিল আমার উপর। কম বেশি দেওয়ার জন্য আমি দায়ী। কিন্তু সাপ ত। মগজ কত দূর আর যেতে পারে। আমি দেখলাম দু'দিন পরেই ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। একটা আর একটার উপর বেশ গরম। কিন্তু ভেবে দেখেন, মগজ কম বেশি হচ্ছে আমার জন্যে। আক্রোশ ত আমার উপর পড়া উচিত ছিল। কিন্তু তা আর হয় না। তার জন্যে বাড়তি মগজ লাগে। সাপের ব্যবহার সাপের মতই চলতে লাগল। ওদের মধ্যে রেষারেষি শুরু হল তা আমার জানতে বাকি রইল না। আমি মনে মনে সেই সন্ন্যাসীকে ডাকতে লাগলাম। রেষারেষি আরো বাড়ে। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে কি ঘটল তা ত আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

হরমুজের কথা শেষ। আবার সে মাথা নিচু করে। বাদশা তাকে তখনই আলিঙ্গনে বেঁধে স্তব্ধ চেয়ে থাকে। জনতা সভাসদ তখন এমন উল্লাসমত্ত যে প্রশংসাসূচক চিৎকারে কানের স্বাভাবিক ধর্ম ভুলে যাওয়ার উপক্রম।

AMARBOI.COM

বাদশার আবেদনে আবার জনতা স্থির হয়। জাহুক আবার জিজ্ঞেস করেন, "সন্ন্যাসীর কথাই তোমার হাতিয়ার ছিল?"

"হ্যাঁ, জাহাপানা।"

বাদশা আবার সম্বোধন করে, "উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ, আমি আবার ঘোষণা করছি, চাঁদের আগামী সপ্তম তারিখে বাদশাজাদির শাদি এই যুবকের সঙ্গে সম্পন্ন হবে। আজ থেকেই তার উৎসব শুরু।"

হরমুজ তখন বলে উঠে, "জাঁহাপানা—।" তার আরো কিছু যেন বলার ছিল। কিন্তু বাদ্‌শা বা জনতা আর কোন কিছু শোনার মেজাজে ছিল না। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সব ডুবে গেল।

তখনই সমুদ্রে পরিণত ভিড়ে ঢেউ উঠল।

আঠার

"বাদ্‌শাজাদির সঙ্গে আমার দেখা করা নিতান্ত দরকার।"

এই কথা ভাবতে ভাবতে হরমুজ তার জন্যে নির্দিষ্ট এক বাগানবাড়িতে পায়চারি করছিল।

সমস্ত নগরী দীপমালায় সজ্জিত। সেদিকে হরমুজের লক্ষ নেই। বাদ্‌শার আদেশে তার এখন দাস নফরের ব্যূহের মধ্যে বাস। এই বাগানবাড়ির মালিক ছিল সাবেক এক

বিদ্রোহী সভাসদ। জনরবে হরমুজের কানে গেছে, তার বৃদ্ধ পিতামাতা-কে আনার জন্যে পর্যন্ত বাদশা সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছে। অদৃষ্টে পরিবর্তনের পরিহাস লেখা থাকে। কিন্তু এমন অভাবনীয়তার জন্যে হরমুজ প্রস্তুত ছিল না। তার মনে উঠেছিল, অদৃষ্টের কাহিনীই হয়ত একটা পরিহাস।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাগানবাড়ির মধ্যে আর আটক থাকতে পারল না হরমুজ। তা-কে বেরিয়ে পড়তে হল এই কয়েক দিনের পরিচয়ে বিশ্বস্ত এক গোলামের সঙ্গে উভয়ে লেবাসের কিছু পরিবর্তন করে। এত জনপ্রিয় হরমুজ যে তাকে কেউ যেন সহজে চিনে না ফেলে।

"বাদশাজাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ নিতান্তই জরুরি।"

হরমুজ মনে মনে কয়েকবার বিড়বিড় করলে সন্ধ্যার পর নিজের আবাস ছাড়ার সময়।

অবিশ্যি সে আগেই সংবাদ পেয়েছিল, গুল্‌শান আর প্রাসাদের আসল মহলে থাকে না। বিবাহের সরঞ্জামের জন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থিত এক বাগানবাড়ি আছে, সেখানেই নাকি সেহেলী এবং আরো পরিচারিকা সহ বাদ্‌শাজাদি বর্তমানে থাকে। পুরুষেরা সেদিকে যায় না। নিতান্ত কামিনী-মহল। কড়া পাহারা থাকে অষ্টপ্রহর।

"যতই বাধা থাকুক, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়া কোন ফয়সালা হতে পারে না।"

এই ভাবে আবার সংকল্প নিতে হয় হরমুজ-কে।

বাইরের জৌলুষের প্রতি কিন্তু আজ হরমুজের কোন আকর্ষণ ছিল না। অকস্মাৎ বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত জনস্রোত। কতজন সে আনন্দের চোটে মাতাল হয়ে গেছে। তামাসায় আচ্ছন্ন অলিগলি। বড় রাজপথেই হাঁটা দায়।

রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের সম্মুখে এসে হরমুজ থামল। এই জায়গাটুকু পার হতে পারলে সে ভেতরে বাদশাজাদির সন্ধান নিতে পারবে। কারণ, শাপমুক্তির কাহিনী এত ফলাও, প্রয়োজন হলে সে আত্মপ্রকাশ করবে। যে-কোন মূল্যে সাক্ষাৎ-সুযোগ সে হারাতে পারে না।

সময়ের ব্যবধান আর মাত্র চারদিন। এই সীমানার মধ্যে সে অকৃতকার্য থাকলে আর যাই হোক অন্ততঃ একটা কাঁটা তার মনের মধ্যে অহরহ বিঁধবে।

কিন্তু অমূলক আশঙ্কা হরমুজের। এত দিন কত না উদ্বেগ, চিন্তা, আশঙ্কা, আর জুয়াড়ি-সুলভ বিতর্তির টানে সে এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে যা সহজে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব তার জন্য খামখা আকাশ-পাতাল বিচরণ করে বেরিয়েছে এতটুকু ভাবেনি। তার কাছেই ত প্রতিষেধক রয়েছে তার হাতের মধ্যে। হাতের মধ্যেও না, তার অনামিকায়।

গুল্‌শান তাকে একটা অঙ্গুরি দিয়েছিল বিপদে-আপদে ব্যবহারের জন্য। সব জায়গায় ছাড়পত্র মিলতেও এই মধ্যকার লাল পাথরটুকু ব্যবহৃত হতে পারে।

নিজের প্রতি অনেক ধিক্কার দিলে হরমুজ। আর সঙ্গীরও প্রয়োজন নেই। স্বচ্ছন্দে একলা থাকাই মঙ্গল। কারণ, তার ত ছাড়পত্র নেই।

প্রহরিরা শুধু পথ ছেড়ে দিল না, অনেক কুর্নিশ বিছিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

এমন-কি প্রাসাদের মধ্যে তা-কে অন্ধের মত ঘুরতে হল না। লাল পাথরের ঝলমল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভা অন্ধকারেও দেখা যায়। প্রয়োজন শুধু আঙুলটুকু বাড়িয়ে ধরা। তারপর যার চোখে সেই আলো সেঁধোয় সে আর কথা বলে না। শুধু হুকুম তামিলের অপেক্ষায় থাকে।

অবিশ্যি প্রাসাদ নানা টিলা জুড়ে অবস্থিত বিধায় এখানে নানা স্তর পার হতে হয়। কোথাও জমিন থেকে নিচে কোথাও চড়াইয়ে পা ফেলার ক্রমিকতা সোজা সামনে এসে পড়ে।

বেশি বিলম্ব হয়নি। এক জায়গায় উৎরাই পথে নেমে হরমুজ দেখলে বিরাট এক বাগান। তারি মাঝখানে একটি ছোট্ট অট্টালিকা। আলোর নৈরাজ্য এখানেও প্রকট। ফোয়ারাগুলো ঊর্ধমুখী রঙিন শিখায় বর্তমান। তরু-কুসুম শোভায় উজ্জ্বল জায়গাটা। কিন্তু আত্মচিন্তায় বুঁদ থাকলে এসবে চোখ তখন স্থিতি পায় না।

হরমুজ শেষে এক নারী প্রহরিকে অনুসরণ করছিল। ভীমাকৃতি বামা। সঙ্গে উন্মুক্ত কৃপাণ। অবিশ্যি নানা ভয়াবহতার সঙ্গে এই নগরেই তার পরিচয় ঘটেছে। তাই কঠোর কোমলতা তাকে আর কতটুকু বিস্ময়ে অভিভূত করবে?

বামা-প্রহরি পথ-শেষে বললে, "আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। বাদ্‌শাজাদিকে খবর দেই।"

এক চত্বরের কিনার জায়গাটা।

তারপর অট্টালিকার সিঁড়ির প্রান্তর। আসল মহল বেশ ঊর্ধে। আশি নব্বই ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

বামা কিন্তু এক দৌড়ে উপরে উঠে গেল। অন্য সময় হরমুজ রীতিমত হেসে উঠত এমন পুরুষসুলভ ব্যবহারে। কিন্তু সে শুধু উপরের দিকে চেয়ে রইল।

কালক্ষেপ ঘটে না বেশি।

বামা ফিরে এলো। একা নয়। সঙ্গে আরো দুই কামিনী। কিন্তু তারা বিপরীত মেরুর অধিবাসিনী। উভয়ে প্রহরির হাতে তীর ধনু। কিন্তু দু'জনেই গৌরাঙ্গী সুন্দরী। তাদের মুখে ভীষণের ছাপ হাজার অভিনয়-কৌশলেও আনা সম্ভব নয়।

নিকটে এসে নারী-প্রহরিদ্বয় মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, "বাদশাজাদি আপনার অপেক্ষার্থী। আমাদের অনুসরণ করুন।"

ভীমাকৃতি প্রহরি যেপথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল নিজের কর্তব্যের ঘাঁটিতে। সম্মোহিতের মত হরমুজ দুই রমণীকে অনুসরণ করে।

কিছু দূর এগিয়ে, আরো সামান্য দশ ধাপ হয়ত বাকি আছে, একজন রমণী তার কাঁচুলির ভেতর থেকে এক আকাশী নীল রুমাল বের করে বললে, "কিছু মনে করবেন না, এই শেষ পথটুকু আপনাকে চোখ-বন্ধ পার হতে হবে।"

হরমুজ জবাব পর্যন্ত দিলে না। শুধু চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে, যখনই সেই সুন্দরী সৌরভসিক্ত রুমাল দ্বারা তার দৃষ্টিশক্তি নিমেষে হরণ করে নিলে। যুবকের দুই হাতও তখন যুগল রমণীর নিকট রেহেন-প্রদত্ত।

গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, এক সময় হরমুজ বুঝতে পারে। আর তার চোখে কোন বন্ধন নেই।

এক কামরায় সে একা বসে আছে। কিন্তু বিস্ময় এমনই, সে আবার চোখ বুঁজে নেয়। কল্পনা করে, দুই রমণীর সঙ্গে এখনও সে হেঁটে হেঁটে যোজন যোজন পার হচ্ছে।

AMARBOI.COM

এমনই অনন্ত কাল হয়ত সে বসে থাকতে পারত সাফল্যের পর যেমন অভিভূত ভাব ঘিরে ধরে— তেমন আচ্ছন্নতায়।

"কি সংবাদ, নওজওয়ান?" পেছন থেকে উত্থিত শব্দে হরমুজ চমকে উঠে।

মুখ ফিরিয়ে দেখে বাদশাজাদি গুল্‌শান মিটিমিটি হাসছে। আজ তাকে চেনা কঠিন। বৈরাগ্য-ধূসর যে মূর্তি দেখেছে একদিন আজ তা অন্তর্হিত। এ যেন বিদ্যুৎ মানব-প্রতিমারূপে তার সম্মুখে উপস্থিত। যত জ্বালা ছড়ায়, তত আলা। এমন দাহনে ঝাঁপ দেওয়াতেই জীবন সার্থক।

গুল্‌শানের অপূর্ব বেশ, অবর্ণনীয় হাসির ছটায় হরমুজ এতক্ষণে উপলব্ধি করে সে বিস্মিত। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু বুকে ত অনেক কথা আছে, যার জন্য এত ঝঞ্ঝাট, দুর্ভোগ। কিন্তু কথা মুখে যোগায় না।

বাদ্‌শাজাদিই ইঙ্গিতে তাকে উপবেশন করতে বলে। নিজেও বসতে দ্বিধা দেখায় না। তারপর পাতলা ঠোঁট থেকে অহেতুক হাসি ছিটোয়।

হরমুজের মনে হয়, সে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। গুলশানই তাকে উদ্ধার করলে।

"কী সংবাদ, হরমুজ?"

বাদশাজাদি আর কোনদিন নাম এত নিকট-জনের মত ডাকেনি। অন্তরে অশেষ পুলক অনুভব করে হরমুজ। কিন্তু কথা বলার জন্যে তার ব্যাকুলতা এত বেড়ে যায় যে আর মুখ খুলতে পারে না।

গুল্‌শানের মিটিমিটি হাসি আরো রহস্য ছড়ায়। অবনত-মুখ হরমুজকে সে এবার শল্যবিদের মত নিরীক্ষণ করে। তারপর স্তব্ধতা দূর করতে অস্ত্র-প্রয়োগের ভঙ্গিতেই উচ্চারণ করে, "কী, আর সবুর সইল না?"

হরমুজ এই ধাক্কায় নিজেকে ফিরে পায়। শক্ত মাটির উপর এতক্ষণে সে পা রাখতে সমর্থ। পাল্টা জবাব দেয়, "কিসের সবুর, বাদ্‌শাজাদি?"

গুল্‌শানের মুখের হাসি পলকে নিভে যায়। এবার মুখ নিচু করে সে। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলে না, পরে প্রায় অস্পষ্টভাবে সম্বোধন করে, "আর চার দিন পরেই তুমি আমার, হরমুজ।"

তড়িতাহত যেমন শেষ চিৎকার দিয়ে স্তব্ধ হয়, হরমুজ আন্দোলিত স্বরে তেমনই প্রকাশ করে, "ঝুঁট স্বপ্ন।"

গুল্‌শান : না স্বপ্ন নয়, ঝুঁটও নয়। তুমি কি জানো না, বাদ্‌শা জাহুকের ঘোষণা রদবদল হয় না?

হরমুজ : কিন্তু ঘোষণার পর তিনি আমাকে আর কথা বলতে দিলেন না। তার জন্যেই আপনার কাছে এত কষ্ট করে সাক্ষাৎ।

গুল্‌শান : কেন?

হরমুজ : যোগ্যতার প্রশ্ন আছে।

খুব দ্রুত কথা সমাপ্তির পর হরমুজ মুখ নিচু করে না শুধু, মনে হয়, তার গলায় যেন পাথর আট্‌কে গেছে।

"কে বলে সে-কথা?" গুল্‌শান স্বতস্ফূর্তভাবে হরমুজের হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে কয়েক অনুপলের পর ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে। আরশি রক্ষিত ছিল নিকটে। তা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে এসে পরে বলে, "এই আরশির সামনে তোমার মুখ দ্যাখো। রাজবেশ-পরা নিজের সুন্দর আদল কোন দিন দেখেছো?"

হরমুজ আরশির দিকে ফিরেও তাকায় না। বরং গ্লানিসিক্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলে, "না বাদ্‌শাজাদি, তা হয় না। বাদ্‌শার শাপ-মুক্তির বিনিময়ে আমি কিছু চাই, এমন লোভের পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে।

গুল্‌শানের মুখে আর সেই হাসি নেই। কণ্ঠে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল। কিন্তু হরমুজ নির্বিকার।

গুল্‌শান : তোমার স্পর্ধা দেখছি, আকাশ ছুঁয়ে যায়।
হরমুজ : আস্পর্ধা নয়। আপনার মেহেরবানিতে এত আরাম ভোগ করছি। কিন্তু মনের হাহাকার যায় না।
গুল্‌শান : বাদ্‌শজাদিকে পাওয়ার স্বপ্নেও না?
হরমুজ : না।
গুল্‌শান : কেন?
হরমুজ : এক জন-কে আমি কথা দিয়েছিলাম, আমি তাকে মনে রাখব।
গুল্‌শান : এখনও মনে রেখেছ?
হরমুজ : ঈমানদার মানুষ নিজের কারার ভাঙে না।
গুল্‌শান : কে সে সৌভাগ্যবতী?
হরমুজ : সে কোন বাদ্‌শাজাদি নয়।
গুল্‌শান : কী তার পরিচয়?
হরমুজ : সে এক গ্রাম্য মেয়ে।
গুল্‌শান : কে সে? রুদ?
হরমুজ : হয়ত—
গুল্‌শান : লজ্জা কী? স্পষ্ট বলো।
হরমুজ : (নতমুখ) রুদ....রুদ্।

AMARBOI.COM

গুল্‌শান এবার হরমুজের দিকে তাকায়। ব্যাধরমণী তীর হানার আগে গোধিকার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের ঝিলিকে কোন সহনীয় উত্তাপ নেই। ঠোঁট দু'টো কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর কুটিল হাসির সরু রেখা যেন হঠাৎ দ্রুত বেরিয়ে গেল রুদ শব্দের অনুসরণে, "কিন্তু সে ত নেই।"

হরমুজ সত্যি বজ্রাহত। গুল্‌শানের কথায় খেই ঠেলে সেও 'নেই' শব্দ চিৎকার দিয়ে উচ্চারণ করে। আঘাত নাকি এইভাবে পিছু ধাওয়া করে।

"নেই?" আবার উচ্চারণ করলে হরমুজ। যন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠস্বর।

গুল্‌শান কিন্তু নির্বিকার।

হরমুজ দুরন্ত ঘৃণায় বাদ্‌শাজাদির চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "কি হয়েছে তার? জল্‌দি বলুন।"

গুল্‌শান এবার প্রস্তর-প্রতিমা। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে উচ্চারণ করলে, "নেই।"

"তার কোন ক্ষতি হয়েছে, বাদ্‌শাজাদি?"

অনিচ্ছুক, নির্বিকার গুল্‌শান-কণ্ঠ থেকে নিসৃত হয়, "হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈকি।"

হরমুজের দুই চোখে পানি আর রোধ মানে না। কিন্তু দীপ্ত গলায় সে জবাব দাবি করে, "একি বলছেন আপনি? আপনি কথা দিয়েছিলেন তার ক্ষতি হবে না।"

"কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেছে। উপায় কী", গুল্‌শানের জবাবে মনে হয়, কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না।

কিন্তু হরমুজ অধীর হয়ে উঠেছে, গুল্‌শান চেয়ে দেখলে, কিন্তু কিছু বললে না।

হরমুজ আবার জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে বলুন।"

গুল্‌শান : ক্ষতি হয়েছে।

হরমুজ : (অতি-অধীর) কি হয়েছে?

গুল্‌শান : সে ত তুমি জানো।

হরমুজ : আমি জানি?

গুল্‌শান : হ্যাঁ।

হরমুজ : আমি কী করে জানব?

গুল্‌শান : নিজের হাতে সাপের মুখে মগজ তুলে দিয়েও তুমি জানো না, তার কী হয়েছে?

বাদ্‌শাজাদির বাক্যে অসম্ভব শ্লেষ মাখানো থাকে। সব কথা হরমুজের কানে সেঁধোয় না। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতই সে উচ্চারণ করে চলে, "আমি নিজ হাতে....নিজ হাতে....", তারপর দুই হাত ঊর্ধে তুলে সেদিকে তাকিয়ে আবার বলে, "আমি নিজ হাতে— ?"

সায় দিলে গুল্‌শান, "নিজ হাতে— ।"

হরমুজ নিজের চিন্তায় তখনও বুঁদ, বাদ্‌শাজাদির কথা শোনে বা শোনে না। স্বগতোক্তি করে যায়, "বাদ্‌শাজাদি ঝুট কারার করে, আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমি একি করলাম? নিজের হৃদপিণ্ড নিজের হাতে মাংসভুক প্রাণীর মুখে রাখলাম?"

প্রায় উন্মাদের মত তার পর দুই চোখ উপরে তুলে চিৎকার দিয়ে বলে, "আবার তাই হবে?"

"কী হবে?" জিজ্ঞেস করে গুল্‌শান। হরমুজ এবার বাদ্‌শাজাদির প্রতি আঙুল বাড়িয়ে ধমক দিয়ে ওঠে, "চুপ করো, ছলনাময়ী। বিশ্বাসঘাতকতা তোমাদেরই সাজে। তবে, তবে,— আমিও প্রায়শ্চিত্ত করব। নিজের হৃদপিণ্ড উপড়ে তোমার পায়ে বিসর্জন দেব, ছলনাময়ী। তুমি বাদ্‌শাজাদি। কুটিল ক্রূরতা তোমাদেরই শোভা পায়। বিশ্বাসঘাতকতা তোমাদের জেওর।"

গুল্‌শান আর বসে থাকতে পারে না। সংকটের মুখে তাদের বিভেদ যেন ঘুচে গেছে। কিন্তু হরমুজের অভিযোগ সে স্বীকার করতে নারাজ। তাই পাল্টা ভর্ৎসনা ছোঁড়ে, "নওজোয়ান, বাদ্‌শাজাদি গুল্‌শান ছলনা হয়ত জানে। কিন্তু ক্রূরতা জানে না। বিশ্বাসঘাতকতা জানে না।"

হরমুজ : বিশ্বাসঘাতিনীদের জিভ সর্বদা সচল থাকে।

গুল্‌শান : জানো, এই হিমাকতীর শাস্তি?

হরমুজ : (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) শপথ যারা ভাঙে তারাই চক্ষু রাঙায়।

গুল্‌শান : মিথ্যা দোষারোপ করো না।

কিন্তু হরমুজ মুখ নিচু করে অশ্রুপাত করতে লাগল। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিশ্চয়তা, শোকের প্রবাহে সে প্রায় নিজের হিতাহিত বোধ হারিয়ে ফেলেছিল।

গুল্‌শান এই সময় হাততালি দিলে। হরমুজ সেদিকে ফিরেও চাইলে না। সমগ্র পরিবেশ তার কাছে অপরিচিত। নিজের কাছেও তার কোন পরিচয় নেই।

গুল্‌শানের হাততালির ইঙ্গিতের ফল, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল। সেহেলী রুদ্‌কে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলে খুব সন্তর্পিত। নতমুখ অশ্রুপাত-রত হরমুজকে দেখে তারা বিস্ময়ের চেয়ে বিব্রত বোধ করে বেশি। কিন্তু এই আবহাওয়া গুল্‌শান আর অনড় থাকতে দেয় না।

আবার হাততালি যোগে বাদ্‌শাজাদি বলে "নওজোয়ান চেয়ে দ্যাখো।"

হরমুজ চোখ তুলতেই চোখে পড়ে, রুদ দাঁড়িয়ে আছে। পরিবেশ সম্পর্কে আর তার কোন জ্ঞান থাকে না। সে দ্রুত দৌড়ের মতই দুই বাহু প্রসারিত, রুদ্‌কে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রলাপের মত বলে যায়, "আমি স্বপ্ন দেখছি না ত?" তারপর চুম্বনে রুদের ঠোঁট আর উন্মুক্ত রাখে না। সে আর কোন অঙ্গ দিয়ে কথা বলবে? শুধু হাতের বেষ্টনি কথা বলে যায়।

গুল্‌শান সে দিকে তাকিয়ে আবার মিটমিটি হাসে। ঈষৎ অপাঙ্গ দৃষ্টি ছড়িয়ে এবং আবার সুর বদলে বিজয়িনীর মত সম্বোধন করে, "নওজোয়ান, মনে রেখো চোখ হয়ত মওকা অনুযায়ী রাঙায় বাদ্‌শাজাদি। কিন্তু কারার ভাঙে না। মনে রেখো, বাদ্‌শাজাদি পরীক্ষা গ্রহণ করে... কিন্তু এখানে আর না। চলো এখুনই আমরা সবাই বাদ্‌শার কাছে যাই। যার যা কথা সেখানেই হবে।"

AMARBOI.COM

উনিশ

জাহুকের প্রাসাদ কক্ষ।

বাদ্‌শা তাঁর আসনে বসেছিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে হরমুজ, গুল্‌শান এবং সেহেলী। সকলে অবনত-মুখ। জাহুকের গম্ভীর মুখাবয়ব জানান দিয়ে যায়, এতক্ষণ এখানে অনেক বাক-বিনিময় ঘটেছে। তারই জের চলছে কক্ষময়।

কেউ আর স্তব্ধতা ভাঙার সাহস পায় না। যেন সকলে সমস্যার সম্মুখে। স্বয়ং বাদ্‌শা পর্যন্ত তার শিকার।

কক্ষে তেমন জোরালো কোন আলো নেই। অবিশ্যি খোলা জানালা-পথে দেখা যায়, সমগ্র নগরী অন্ধকার নির্বাসন দিয়েছে। নৈশ কোলাহল মৃদু নিনাদে এখানে লহরি তুলে যায়। তা-ও এই নীরবতার শাসনের প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।

জাহুক একবার হাই তুলে নিজের মুখমণ্ডলে হাত ফেরায়। চোখ তুলে সে সকলকে একবার দেখে নিলে। তার আদেশের জন্যই অপেক্ষার্থী কয়েকজন নরনারী।

সময়ের বোঝা এখানে ক্রমশঃ ভারি হতে থাকে যে কারো পক্ষে আর চুপ থাকা দায়। কিন্তু বাদ্‌শার দিক থেকে কোন সাড়া না আসার ফলে, ওই দৌরাত্ম্য তারা নীরবে বহন করছে।

জাহুক শেষে কাউকে যেন সম্বোধন না করে নিজের মনেই বলে চলে, "তবে তা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই হোক।" এবার আর সকলে উৎকর্ণ।

প্রত্যেকের দেহাবয়বে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা যায়। নিজেকে সম্বোধন করে বাদ্‌শা আবার বললে, "তবে তা-ই হোক।"

যেহেতু আর কারো শরিক হওয়ার সুযোগ নেই এই স্বগতোক্তির সড়কে, আর সকলে আবার মিইয়ে যায়। তাদের ঈষৎ উত্তোলিত মুখাবয়ব আবার নিচে নামে।

বাদ্‌শার আদেশের জন্যই ত তারা অপেক্ষার্থী।

জাহুক এবার প্রার্থীদের দিকে তাকান কারো চোখে চোখ পড়ার প্রত্যাশায়। কিন্তু তিনি হতাশ। তাঁর প্রিয়তমা কন্যা পর্যন্ত অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে।

সময়ের বোঝা-হরণের ভার শেষে বাদ্‌শার দিক থেকেই এল।

তিনি হরমুজকে সম্বোধন করেন, "হ্যাঁ তবে তা-ই হোক, নওজোয়ান। তুমি ঠিকই বলেছ, বাদ্‌শা জাহুকের কন্যার পাণিপ্রার্থীর অভাব ঘটবে না। কিন্তু আমি আর বাদ্‌শা থাকতে চাই না। তোমাদের উপর ভার দিয়ে বিদায় নেব ভেবেছিলাম, তা আর হল কৈ?"

হরমুজ বাদ্‌শার দিকে এবার তাকায়। চোখে চোখ পড়ে যায় । সে মুখ নিচু করে। অশেষ লজ্জায় জমিনের উপর দৃষ্টি বেঁধে রাখে।

জাহুকের উক্তি এগিয়ে যায়, "তা-ই হোক। এমন-কি তুমি চাও না, তোমার শাদি আমার ওই নতুন দ্বিতীয় কন্যার সঙ্গে এখানে সম্পন্ন করি। তুমি গ্রামে ফিরে যেতে চাও, আপন মানুষদের নিকট। তোমার যা ইচ্ছা। আঞ্জাম সাজিয়ে দেব। তোমরা সকলে গ্রামে ফিরবে।"

হরমুজ প্রায় উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে," সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।"

প্রশংসাবাদের দিকে লক্ষ না রেখেই সম্রাট বলে যান, এতদিন আমি অভিশপ্ত ছিলাম। এখন থেকে তোমাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। কাল সকালেই আমি আঞ্জাম সাজিয়ে দেব। আমার সৈন্যসামন্ত তোমাদের গ্রামে নিয়ে যাবে।"

"মহান সম্রাট মহতের মতই কাজ করেন।"

"মহান সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।"

রুদ্‌ এবং হরমুজের কণ্ঠে প্রায় একই সময়ে প্রশংসা ধ্বনিত হয়। সেহেলী এবং গুল্‌শান-কে স্তব্ধ দেখে তাদের আহ্বান করে জাহুক, "তোমরা খুশি ত মা?"

অনুচ্চ উচ্চারণে কক্ষের মুখরতা আরো বাড়িয়ে তোলে গুল্‌শান, "আমার মহান পিতা মহানের মতই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।"

"গুল্‌শান, এদের রাস্তার জন্য কী কী দেওয়া উচিত, তুমিই ঠিক করো, মা।" কন্যার প্রতি বাদ্‌শার অনুরোধ।

"সে ভার আমি নিলাম, পিতা।" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গুল্‌শানের মুখ মৃদু হাসির ছটায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেহেলী কিন্তু নীরব। সে প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে ত আছেই।

আবার কক্ষে স্তব্ধতা।

এবার চাঞ্চল্য শুরু হয় হরমুজের দিক থেকে। সে ধীরে বাদ্‌শাজাদির পানে এগিয়ে যায়।

বাদ্‌শা চেয়ে দেখেন। বেশ অবাক হন তিনি। কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে সম্বোধন করে হরমুজ, "মাননীয় বাদ্‌শাজাদি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুল্‌শান আহ্বানকারীর মুখের দিকে তাকায়। সে কিন্তু দৃষ্টি মেঝের উপর মিশিয়ে দিয়েছে।

গুল্‌শানের ঠোঁটে সেই অবর্ণনীয় হাসি, কিছুক্ষণ আগেই যা হরমুজ দেখেছিল। কিন্তু আবার দেখার সুযোগ তার হল না। কারণ, চোখ সে তুলতে পারছে না।

মৃদু-ভাবে জবাব দিলে গুল্‌শান, "কি তোমার বক্তব্য?"

"আপনি আপনার কারার পূর্ণ করুন।"

হরমুজ কথা বলে, কিন্তু মুখ তোলে না।

"আমার কারার?" বিস্মিত বাদ্‌শাজাদি একটু চমকে ওঠে।

'হ্যাঁ।"

'আমার কারার তোমার কাছে?"

"হ্যাঁ, বাদ্‌শাজাদি।"

স্মৃতি উদ্ধারের চেষ্টা পায় গুল্‌শান। তারপর সে উত্তর দিলে, "আমার মনে পড়ছে না।"

বাদ্‌শার চোখ সকলের উপর এক একবার নিবদ্ধ হয়। রীতিমত কৌতূহলী তিনি।

"আপনি বলেছিলেন—," হরমুজের অসমাপ্ত বাক্যের উপর গুল্‌শান ছেদ ফেলে, "কি বলেছিলাম? আমার মনে না থাকার জন্য দুঃখিত।"

"আপনি বলেছিলেন," হরমুজ এবার ধীরে ধীরে মুখ তোলে। তার চোখ গুল্‌শানের উপর পুরোপুরি নিবদ্ধ। কয়েক প্রহর পূর্বে যে হাসি তাকে উতোল করে তুলেছিল, হরমুজ আবার তেমন ছটার সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু মুখের কথা সে থামায় না, "আপনি বলেছিলেন, বাজি জিতলে আপনি আমাকে মুক্তি দেবেন।"

"বাজি জিতেছ বৈকি।"

"এখন আপনার কাছ থেকে কয়েদি জীবনের মুক্তি চাই।"

"তা আমার দেওয়া লাগবে কেন?" গুল্‌শানের হাসির সঙ্গে প্রশ্ন যখন মেশে, হরমুজ তার দৃষ্টি আর এক রেখায় রাখতে পারে না।"

"কারণ কারার— শর্ত— আপনার সঙ্গে।" মৃদু অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলে হরমুজ।

"বাদ্‌শা ত তোমাকে মুক্তি দিয়েছেন।"

"এখন আপনার কাছ থেকেও প্রার্থনা করি।"

"তা কী মুখে বলার দরকার আছে?"

গুল্‌শান প্রায় প্রতিপক্ষকে জবাবদিহি করে বসে। কিন্তু হরমুজ প্রশান্ত, মোলায়েম গলায় উচ্চারণ করে, "আছে বৈকি।"

জাহুক এই বাক-বিনিময়ের সময় বার বার দুই মুখের দিকে তাকান। বিস্ময় কৌতূহল অবিশ্যি তাঁকে আনন্দিত করে তোলে।

এই সময় একটু দরাজ স্বরেই হেসে উঠল গুল্‌শান এবং বললে, "তার জন্য এত ভনিতা, নওজোয়ান? কারার বাদ্‌শাজাদি ভাঙে না। শুধু স্মরণ ছিল না। তোমাকে মুক্তি দেব না ত কাকে দেব?"

তারপর হঠাৎ সব গ্রাম থামিয়ে স্বাভাবিক গলায় বাদ্‌শাজাদি উচ্চারণ করলে, "তোমরা সুখী হও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাদ্‌শাজাদি, আপনার মহানুভবতা গোটা দেশ মনে রাখবে। মানুষের কাছাকাছি যেতে পারেন, তাই মানুষের প্রাণদাত্রী আপনি।"

গুল্‌শান এই কথার কোন জবাব দিলে না। সেহেলীর হাত ধরে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কন্যার আকস্মিক অন্তর্ধানের পর বাদশা রুদ ও হরমুজকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। চলো বৎস। যাওয়ার সব বন্দোবস্ত এই রাত্রেই শেষ করতে হবে।"

কাফেলার দল অনেক বড় হয়ে গেল।

অনেক মানুষ এসে জুটেছে।

হরমুজের পিতা-মাতা এবং বহু গ্রামবাসী। সাবেক কয়েদিদের অনেকে এই খানে অপেক্ষা করছিল।

বাদ্‌শার কিছু সৈন্যসামন্ত আছে রক্ষী হিসাবে। আর উপঢৌকনবাহী জনতা। শুধু রাজার উপহার নয়। বহু যুবক এসেছে নিজেদের ছোট ছোট সওগাত হাতে।

পার্বত্য পথ।

হরমুজ বা রুদ অশ্বারোহণে রাজি নয়। সারা জীবন পদাতিক, পদাতিকই থাকার প্রার্থী তারা।

ঘোড়সওয়ার বিশ-পঁচিশ জন শুধু সেনাবাহিনীর রক্ষী দল।

বহু প্রত্যুষেই বিদায়ের পালা সাঙ্গ। জাহুক নিজে দাঁড়িয়ে ছিল যাত্রার প্রারম্ভে।

সঙ্গে দুহিতা।

মঞ্জিল মঞ্জিল রাস্তা তারা এইভাবে অতিক্রম করবে। কারণ গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই মিছিলের শোভা দেখার জন্য অনুরোধ পাঠিয়েছে।

এগিয়ে চলে কাফেলা। আনন্দের নীরব মূর্তি ক্বচিৎ দেখা যায়, বিশেষতঃ যেখানে প্রাণস্পন্দন নতুন করে জাগে।

মাজেন্দারানের পার্বত্য পথে অল্প সময়ের মধ্যে তারা এমন জায়গায় এসে পৌঁছল, সেখানে পাহাড়ি বাঁক কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ওৎ করে দেবে। কাফেলা চলবে। কিন্তু কাফেলার মূর্তি আর দেখা যাবে না।

পাহাড়ি বাঁক।

এক পাশ ফাঁকা।

অন্য দিকে পর্বতগাত্রজাত গুল্মলতা আর সমুন্নত তরুশীর্ষ সব ঢেকে রেখেছে। আরো পাহাড়ের চূড়া দূরে দূরে অপেক্ষার্থী।

একাকী বাদ্‌শাজাদি গুল্‌শান প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়িয়ে, কাফেলার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে। প্রায় অপলক নেত্র।

আর কয়েক পল মাত্র।

কাফেলার শেষ বিন্দু পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাঁকের আড়াল হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

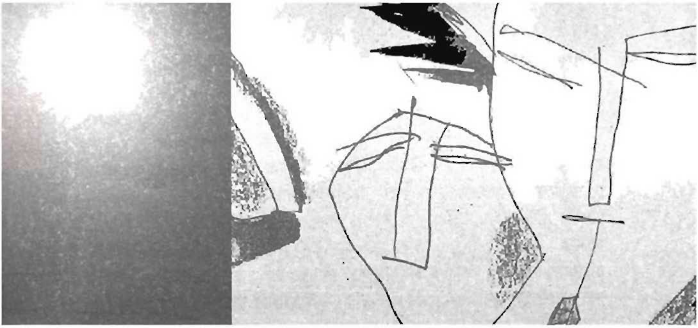

জাহান্নম হইতে বিদায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

— এখন কী করবেন, স্যার?

— তাই ভাবছি।

গাজী রহমান তার আশ্রয়দাতার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অপলক চোখ।

ওই প্রশ্নে যে সে অশেষ চিন্তিত তা বোঝা যায়। কিন্তু আসলে সে কিছুই ভাবছিল না। বরং চোখ মেলে ধরেছিল অনিশ্চিত এক প্রশ্নচিহ্নের উপর, যার প্রতিভাস— সে জানে তার পক্ষে ধরা অসাধ্য।

গত দেড় মাস হিতাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন হঠাৎ-হঠাৎ তার কাছাকাছি এসে পড়েছে। সকলের মুখে এক কথা : "তোমার প্রাণ সংশয়াপন্ন, অতএব নিরাপদ কোথাও চলে যাও।"

AMARBOI.COM

গাজী রহমান তার সোজাসুজি কোন জবাব দেয়নি। কারণ, সোজা কোন উত্তর তার জানা ছিল না। অস্তিত্ব-রক্ষার আদিম একটা তাগিদ সে অনুভব করত মাত্র। তারপর অপলক চেয়ে থাকত প্রশ্নকর্তার মুখের উপর অথবা একেবারে শূন্যতায় দুই চোখ ফেলে, আর সে জানত অতল খাদের ভেতর তার দৃষ্টি শুধু বিশ্রামের একটা অবলম্বন খুঁজছে, কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না।

এই গ্রামে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল ইউসুফ, তারই এক পুরাতন ছাত্র, বর্তমানে কোনো সদাগরি ফার্মের কেরানি।

বত্রিশ বছরের স্কুল মাস্টারির এমন বহু সুধা-ফল তার জন্যে এখানে ওখানে অপেক্ষার্থী, তা ঘরছাড়া বেরিয়ে পড়ার আগে গাজী রহমানের কাছে পুরোপুরি অজানা ছিল।

শহর থেকে অনেক দূরে, এমন কী বড় জেলা-সড়কও এখান থেকে পাঁচ মাইলের কম হবে না। আত্মগোপনের জন্যে এমন জায়গা আশাপ্রদ। বিশেষত, ঝোপঝাড় আগাছার জঙ্গল এবং বাঁশবনে এই গ্রাম এমনভাবে ঠাসা যে, মিলিটারি নেহাত প্রয়োজন না পড়লে এদিকে পা বাড়াতে তিনবার ভাববে।

অবিশ্যি গাজী রহমান ওই সব বাধা-বিপত্তির উপর আদৌ জোর দেয় নি।

আধুনিক রণশাস্ত্র নরক-রচনার আর এক আদিম সংহিতা। পাঁচ সাত মাইল দূরত্ব কিংবা পাঁক কি মেঠো রাস্তা, এসব কোন বাধা নয়। তবে এই গ্রামের দূরত্বে তেমন কিছু নেই। অবিশ্যি রাজনৈতিক কর্মী হয়তো কিছু আছে। কিন্তু তাদের নামডাক এখনই

কর্তৃপক্ষের টনক ধরে নাড়া দেবে, তেমন কিছু না।

সব ভরসা এখানেই জমা করেছিল গাজী রহমান। অবিশ্যি সচেতনভাবে না। কারণ, গত দেড় মাস তার চিন্তার পদ্ধতি যে-কোন ন্যায়িক গণ্ডির মধ্যে অচল ছিল। নানা স্মৃতি এবং ঘটনার ছায়ার অরণ্যে বিচরণই গাজী রহমানকে উপলব্ধির সিঁড়ি যুগিয়ে যেত। দুঃস্বপ্নের পর তবু অর্ধজাগ্রত অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় যুক্তির রেশ কিছু থাকে। গাজীর মগজের কোষে তার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর ছিল। নিঃসাড়, অদ্ভুত এক অবস্থা। যান্ত্রিক কতগুলো জৈবিক নিয়ম সে পালন করে যাচ্ছে। খাওয়ার সময় খাওয়া, ঘুমানোর সময় ঘুমানো। যান্ত্রিকতার মধ্যে উন্মাদেরা হয়তো শান্তি পায়। কিন্তু গাজী রহমান তো বাতুল নয়। সে পুরাতন হেডমাস্টার। সব জ্ঞান, বিশেষত : আত্মমর্যাদাজ্ঞান এখনও টনটনে। তার কোন প্রশান্তি পাওয়ার কথা নয়। হয়তো অস্থিরতার তোড়ে সে ভেসে যেত এবং তাই সচেতন বোধের সাহায্যে আর কিছুই নিজের কাছে টেনে আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে সে বিরত থাকত।

পাতলা একহারা চেহারা গাজী রহমানের, কিন্তু বেশ পোড়খাওয়া এবং ধকল সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত। পাতলা শাদা দাড়ি শেষের দিকে সুঁচোলো, তার ছোট ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে বেশ সমতা বজায় রেখেছিল। প্রথম দর্শনেই মনে হবে, এই মানুষ কঠিন কোন সাধনার পশ্চাতে তৎপর এবং চোখ অন্বিষ্টের দিকে সদাজাগর। ফলে, উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে সম্মুখাভিসারী। এমন নয়নের আতপত্রের নিচে ইউসুফ কেন, বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে অসোয়াস্তি অনুভব করতে দেখা গেছে। তুরপুনের মত চোখ যদি বিঁধে যায়, নিজেকে খামোকা অপরাধী মনে হবে যে-কোন মানুষের।

ছাত্রের প্রশ্নে গাজী রহমান ঈষৎ নাড়া খেয়েছিল মাত্র। কিন্তু তার মন নিজস্ব কায়দায় এগিয়ে যায়। সেখানে সিদ্ধান্ত খাড়া থাকে না। কাত হয়ে একে অপরের গায়ে দ্রুত ঢলে পড়ে, অতি দ্রুত। তারপর প্রশ্নহীন দবদবা জায়গাটা শাসন করে। আভাসে ছিটেফোঁটার ইতঃক্ষিপ্ততার মোটামুটি একটা ধারণা গাজী রহমানের আশেপাশের লোক করতে পারে। কারণ, যখন একদম একা থাকে না, তখন আটপৌরে কথা তো সে বলে। তার নিজের কাছে অনেক সময় স্থানকালের সঙ্গতি হয়তো থাকে না। কিন্তু দেড় মাসে বাংলাদেশের বাতাস সে আর্তনাদ মাত্র, তা কার কাছে অজ্ঞাত? তাই গাজী রহমানের কথার অর্থোদ্ধার তেমন কঠিন কিছু নয়।

অবিশ্যি গাজী রহমান জেনেছিল, এই বাড়িতে তার বেশিদিন থাকা কঠিন।

সম্প্রতি যে খবর এসেছে, তা তেমন চাঞ্চল্যকর কিছু নয়। কয়েক দিনের মধ্যে এই গ্রামে হামলা শুরু হবে, কিছু দাগী আওয়ামী লীগারের খোঁজে।

গাজী রহমানের সিদ্ধান্ত এসেছে কিন্তু অন্যদিক থেকে। ইউসুফের বৌ সখিনার ভাই খালেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। দেড় মাস তার কোন খোঁজ নেই। পিতৃমাতৃহীন বোনের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল সে। ইউসুফের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। কিন্তু শ্যালককে সাহায্য করত। নানা ধরনের কৃচ্ছ্রতাসাধন মারফত খালেদ তার লেখাপড়া চালিয়ে নিত। সে আর ফিরে আসে নি। শোকের প্রথম স্তর কেটে যাওয়ার পর গাজী রহমান এই বাড়িতে আসে। অবিশ্যি পুরোপুরি শোকের পর্যায়ে গোটা দুঃখটাকে ফেলা অন্যায়। সে বেঁচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে তো পারে। ঢাকা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। জোয়ান স্বাস্থ্যবান যুবক খালেদ হেঁটেও তো চলে আসতে পারত। প্রথম কয়েকদিন যানবাহনের অভাব, একটা স্তোকের কাজ করেছে সখিনার মনে। কিন্তু আর তো মন প্রবোধ মানতে নারাজ। গাজী রহমান এমন আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়েছিল। সেও এখানে থাকতে চায় নি। কোনরকম শারীরিক অসুবিধা? তা না। তার খাওয়া-দাওয়ার স্বল্পতা দেখে সখিনা খুবই বিব্রত। ইউসুফ পর্যন্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছে, "স্যার, আপনাকে বাঁচতে তো হবে।"

কিন্তু বাঁচার উপাদান কি আছে কোথাও? এই বাড়ির পটভূমি ঘিরে রয়েছে একটি তরুণের মৃত্যু। তাই অসোয়াস্তি। কিন্তু এই বাড়ি ছেড়ে গেলেই কি মৃত্যুর ছায়া সে ডিঙিয়ে যাবে? কোথায় মৃত্যু নেই? শত শত বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ এই গ্রামে বসে সাম্রাজ্যের উত্থানপতন দেখেছে অথবা উপদ্রুত শহর ছেড়ে স্বর্গকল্প নিসর্গ-সবুজের সান্নিধ্যে যেমন বাঁচার শক্তি সঞ্চয়, তেমনই বিপদের কাল-গণনা করেছে। আজ চতুর্দিকে তারা নিরাশ্রয়। কিছুদিন পূর্বে একটা জ্বলন্ত গ্রাম দেখতে বাধ্য হয়েছিল গাজী রহমান। পাঞ্জাবি সৈন্যগুলো তিন মাইল দূর থেকে আগুনে-বোমা নিক্ষেপের পর বিনা হামলায় সামনে এগিয়ে চলে গিয়েছিল। আর এক বড় ঘাঁটি ছিল গন্তব্য। পেছনে নিরাপদ থাকার জন্যে এই আতঙ্ক বিস্তার।

বাংলার গ্রামে কি আগে কখনো আগুন লাগে নি? গেরস্তর অসাবধানতাজাত অগ্নিদাহনের বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তখন গ্রামের সমস্ত গাছ পুড়ে ছাই হয়ে যেত না। এমন এক শত্রুর পরিচয় আবহমান কাল থেকে ইতিহাসে কখনও পায় নি বাঙালি। তাদের কী আখ্যা দেবে— জন্তু, দানব বা আর কিছু, তা-ও বাঙালি কোনদিন স্থির করতে পারবে না। তেমন ঘৃণা প্রকাশের ভাষা বাঙালির কাছে এখনো অজ্ঞাত। তা হয়তো ভবিষ্যতে তৈরি করবে তার চারণ কবিবৃন্দ।

মৃত্যুর কাফনের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। গাজী রহমান এই বাড়িকে মেনে নিতে বেশ বেগ পেয়েছিল। খালেদের মৃত্যু সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। তারই এক সহপাঠী বন্ধু চুপিচুপি খবর দিয়ে গিয়েছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অবিশ্যি লাশ কেউ দেখে নি। কিন্তু তার বালিশ বিছানায় প্রচুর রক্তের দাগ ছিল। সিদ্ধান্ত সেখান থেকেই।

গাজী রহমান এখানে বাড়ির সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু নিঃসঙ্গতার প্রতিঘাত তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত সদাসর্বদা। তার সূত্রপাত এই বাড়িতে কি না, সে বলতে পারবে না। অমন দয়াময়ী বধূমাতা সখিনা। ফরসা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ভায়ের কথা ভেবে ভেবে। কিন্তু খাতিরদারিতে কী আন্তরিকভাবে তৎপর! স্বামীর শিক্ষকের বিপদের কথা সে জানে। কিছুটা করুণাপরবশ হয়তো মহিলা। কিন্তু তেমন আঁচ পাওয়া যেত না ব্যবহারে। সবই কর্তব্যের তাগিদে করা, যে-কর্তব্যের পেছনে স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক সর্বদা দীপ্যমান। সখিনার এই হৃদয়বত্তা প্রাচীন শিক্ষককে বেশ দুঃসাহসী করে তুলেছিল। নৈতিকতার মাপকাঠি তাকে যতই আরো অস্থিরতা দিক, শেষ পর্যন্ত ডাহা মিথ্যা কথা বলতে তার এতটুকু আটকায় নি।

— সখিনা-মা, খালেদ মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে।

— আপনে ক্যামনে জানলেন?

সন্দিগ্ধ, তবু আশান্বিত সখিনা তখনই প্রশ্ন ছুঁড়েছিল।

— আমার কাছে খবর এসেছে।

সখিনা সেদিন নিজের স্বভাবজাত বিষণ্নতা নিমেষে কাটিয়ে উঠেছিল এবং জবাব দিয়েছিল, 'কিন্তু আমার লগে একবার দ্যাখা কইরা গ্যাল না ক্যান?'

— মা, সময় কোথায়? হঠাৎ কোনো হুঁশিয়ারি না দিয়ে ডাকাতের মতো পাঞ্জাবি নেকড়েরা গোটা দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কি প্রস্তুত ছিল? যাদের হাতে বন্দুক দেখেছ তারা কি কোনদিন ভেবেছিল হাতে বন্দুক নেবে?

— তা ঠিগ্ মাস্টার সাব। আপনে আরো খোঁজ নেন। মা নাই, বাবা নাই— একডা ছোড বাই, হেরেও যদি আল্লা নেয়—

— তুমি দোয়া করো মা, আল্লা তোমার ভাইকে আবার কাছে এনে দেবে।

সেদিন থেকে এই বাড়ির আবহাওয়া অনেকটা বদলেছিল। কিন্তু গাজী রহমান সোয়াস্তি পেত না।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে সে বারান্দায় একা একা অন্ধকারে নিজেকে প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করে তুলত এবং পাগলের মতই কোন যুক্তিযুক্ত জবাবের জন্য প্রতীক্ষা করত না। মিথ্যার মলাট ধর্মগ্রন্থের উপর চাপিয়ে দিয়ে হয়ত রক্ষা পাওয়া যায়। বহুকাল পরে পরবর্তী পুরুষ তার খেসারত টেনে নাজেহাল, শেষে মুক্তির রাস্তা খোঁজে। কিন্তু একটি রমণীর বুকে ঈষৎ আত্মবল যোগানোর জন্যে কি ছলনা প্রয়োজন ছিল? যমের আয়োজন চতুর্দিকে। নদীনালা ঝোপঝাড়ে গঞ্জে বন্দরে, মানুষের নিভৃত কক্ষে; পথে প্রান্তরে। এই কাঁটাতারের জাল ক্রমশ চতুর্দিকে বিস্তারিত হচ্ছে, যার রগড়ানির ভেতরে আহতের গোঙানি, ধর্ষিতার আর্তনাদ, অসহায় ফরিয়াদ সব একাকার পাক খাচ্ছে শব্দের একটি বিশাল কুণ্ডের মধ্যে। তখন একটি মৃত্যু, একটি মৃত্যুর জন্যে কেন এত খেদোক্তি?

গাজী রহমান অবিশ্যি সেদিন নিজেকে শান্ত করতে সক্ষম হয়। নিজের মনেই আবার সাঁতার কেটেছিল, যার বুদ্বুদের দল সংলগ্নতায় কিছু অর্থ বয়ে এনেছিল বৈকি। কিন্তু মৃত্যু হয় ব্যক্তির, একটি ব্যক্তির। একুনে তা হাজার লক্ষ কোটিতে পরিণত হয়। এই সংখ্যার মূল্য নেই। কিন্তু প্রত্যেক সংখ্যার পেছনে যে ব্যক্তি আছে, তা নিতান্তই নিজস্ব ছায়াছবি, স্মৃতি— এক কথায়, গোটা ব্যক্তিত্বসহ— জানান দিতে থাকে, জানান দিয়ে যায়, আত্মীয়স্বজনের কাছে, জনক-জননী, দয়িত বা দয়িতার কাছে, সুহৃদের নিকট। একক ব্যক্তি যখন চোখ থেকে হারিয়ে যায়, তখন যে-কোনো আদর্শ হতে বাধ্য। তার একটা নির্বস্তুক রূপ নিয়ে তুমি বুঁদ থাকতে পারো, আদিম মানুষ যেমন তার পিতৃপুরুষের কবর দেখে প্রেতায়িত হয়, তেমন তুমি রোমাঞ্চিত হতে পারো ভক্তি-গদ্‌গদ, কিন্তু তার মধ্যে আর রক্তমাংসের উত্তাপ থাকে না।

এমন সব সিদ্ধান্তে নিজের কায়দায় পৌঁছেও কিন্তু গাজী রহমান সোয়াস্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সখিনার সঙ্গে সব কথা এক গন্তব্যে পৌঁছত। আবার শোনা যেত বেতারের সংবাদ।

— মাস্টার সাব, কস্‌বা এলাকায় মুক্তিফৌজ হানাদারদের খুব মারছে। বাঙালির লগে লড়তে আইছে কোন্ মুল্লুকথন। অহন দ্যাহো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— হ্যাঁ, মা। আমাদের ফৌজ তো আর টাকার জন্যে লড়ে না। তারা দেশের জন্য লড়ে।

— খালেদ একবার আইত!

— আসবে, মা। আসবে বৈকি।

ইউসুফ কাছে এসে পড়লে অবিশ্যি কথার মোড় নিত অন্যদিকে। এই খেলার রহস্য সে বোঝে। সখিনার সমীহ-জাত বিশ্বাসের ফলে বাড়ির আবহাওয়া কিছুটা যে বদলে গিয়েছিল তা তার মনেও এক ধরনের প্রলেপ মাখিয়েছিল, যা বেকার জীবনে বিশেষ সান্ত্বনা। সদাগরি অফিসগুলো দেড় মাস হয়ে গেল এখনো খোলে নি। হয়তো অফিসের মাথাগুলো উড়ে গেছে। আর কোনদিন খোলার সম্ভাবনা কম। শহরের রোজগার এবং গ্রামে জমিজিরাতের আয় মিলিয়ে ইউসুফ এক ধরনের মানসিক নিরাপত্তা ভোগ করত। আজ সেখানে চিড় ধরেছে। তার উপর খালেদের মৃত্যু তাকে স্পর্শ করেছে বৈকি। অতিশ্রদ্ধেয় শিক্ষক কিছু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে যদি তাদের পারিবারিক জীবনে সামান্য সহজভাব এনে দিতে পারেন, অপরাধ কোথায়?

গাজী রহমান কিন্তু ছাত্রের সামনে নিজেকে বড় ছোট মনে করত; যখনই সখিনার সঙ্গে মুক্তিফৌজ-সংক্রান্ত কোন কথা চলাকালে এসে পড়ত ইউসুফ। শিক্ষক অতি মজলিসী মানুষ ছিলেন একদা, অন্তত দেড় মাস পূর্বেও। আজকাল সেই মুখ বন্ধই থাকে। ওর অবয়বের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায়, কী যেন গভীর তন্ময়তার মধ্যে সে ডুবে আছে। সখিনা গাজী রহমানের মুখের দিকে চেয়ে, সেখানে কোন আশ্বাস দেখলেই তবে ডাক দিত অতি আদরের সঙ্গে : মাস্টার সাব।

সম্বোধনের ফলে গাজী রহমান নিজেকে ছেড়ে কিছুটা বেরিয়ে আসত এবং সহজ গলায় সব পরিবেশ ভরে তুলত স্নেহের আচ্ছন্নতায়। হয়তো কৃত্রিম একটা প্রচেষ্টা তাকে নিতে হতো প্রথম ধাক্কায়। কিন্তু তারপর যতটুকু সময় দুজনের কথাবার্তা হতো, তার মধ্যে কোন খাদ এসে মিশত না।

এখানেও পরিস্থিতি মাঝে মাঝে বিগড়ে যেত।

বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ শিক্ষক কিন্তু সরল গ্রাম্যবধূর সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে হঠাৎ নিজের সঙ্গে সংলাপ জুড়ে দিত, বাইরে যার কোন প্রকাশ নেই, কিন্তু ভেতরে বেশ তপ্ত হয়ে উঠত গাজী রহমান এবং আত্মসম্বোধন চলত : সে একটা ডাহা মিথ্যেবাদী, অকারণ একটি বিশ্বাসপ্রবণ মনের উপর জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন তো দিনের আলোর মতো সব প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন আঘাত সইতে পারবে স্নেহার্দ্র এই কচি-প্রাণ?

এমন প্রশ্নের সম্মুখে শিক্ষক যুক্তির দড়ি ঝুলিয়ে উল্লম্ফ কোন প্রশান্তির ডাল পাকড়ানোর জন্যে তৎপর হতো। মহাকাল আছে সম্মুখে। দগদগে ঘা পর্যন্ত মুষড়ে যেতে থাকে তার অদৃশ্য ফুৎকারে। একদিন সত্য যখন বিবস্ত্র জানান দেবে তখন দাগ অনেক শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মিথ্যের চেহারা তো ম্লান হবে না, বরং আরো কুটিল দম্ভসহযোগে বিকৃত বদনে তা ব্যঙ্গ হেনে যাবে।

অন্যান্য অস্থিরতার সঙ্গে এই বাড়ির হেন পরিবেশ গাজী রহমানকে আরো নিজের ভেতরে সেঁধোতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছিল। তাই তো সে নিঃসঙ্গ-যাত্রায় সাধারণ যুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাপকাঠি দিয়ে আর কিছু বোঝার চেষ্টা পেত না। অপরাপর মানুষের সান্নিধ্যে যখন সহজ হওয়ার চেষ্টায় গলদঘর্ম হতো, তখন আজীবন রবীন্দ্রভক্ত সে নিজের মনেই কখনো কখনো সচেতন অথবা নীরব বা সরব আউড়ে চলত : 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনো খানে।'

যন্ত্রণা মিছিল করে আসে।

মৃত্যুর মণ্ডপ বাংলাদেশের আকাশে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ হচ্ছে। দৈহিক বিনষ্টির মহড়া এখানে গোপনে হয় না। তালঠোকা কায়দায় রাক্ষস এক এক দিক থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দন্তকড়মড় আসুরিক চিৎকার যোগে, সব আহাজারি মেশিনগানের আওয়াজে ডুবিয়ে দিতে। এই চণ্ডনীতির মোকাবিলা শুরু হয়েছে একটু বিলম্বে। বিনা প্রস্তুতি, সহসা— অনেকটা আবেগের ঝোঁকে ঝোঁকে। সান্ত্বনা আছে, ওই দম্ভী অসুরের পাঁজর অস্থি একদিন বাংলার মাটির উর্বরতা-বৃদ্ধির উপাদান হবে। কিন্তু আবহমান বাংলাদেশের আত্মার চত্বরে— যার সদা-সমুজ্জ্বল কুহকের টানেই তো বাংলার সন্তান আবার জেগে ওঠে, যার ফলে সহস্র বিকৃতির মধ্যেও বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগরই থাকে, পাকিস্তান উপসাগর হয় না কোনদিন— সেই মণিকুট্টিমের উপর এ কি বিষ্ঠার প্রলেপ ছড়িয়ে দিচ্ছে কবন্ধবাহিনী? মৃত্যু আর মিথ্যার জাল এখানে নিঃশ্বাসের বাতাস।

সখিনার সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে, এমন সব চিন্তার উদয় হলেই গাজী রহমান বিনা ভূমিকায় প্রসঙ্গ শেষ করে নিজের ঘরে ঢুকত। দিনে তো সে কোথাও বেরোয় না। অনেককালের শিক্ষক, কখন কোন পুরাতন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখন গ্রামে তার উপস্থিতি হয়তো চাপা থাকবে না। সকলে তো ইউসুফ নয়।

নিঃসঙ্গতার মোকাবিলার আজকাল একটি সৌম্য চেহারা উত্তর-ষাট বৃদ্ধের আদল গাজী রহমানের চোখে বার বার ভেসে উঠত। শুধু দৃশ্য নয়। শুনতে পেত সেই বৃদ্ধের কান্না, যাকে বালকের মতো একপক্ষ কাল আগে নৌকার উপর দশ-বারো জন কচিকিশোর এবং বৃদ্ধ যাত্রীর সামনে সে কাঁদতে দেখেছে।

ডুকরে-কান্না এমন হৃদয়ভেদী হতে পারে, গাজী রহমান আগে কখনো উপলব্ধি করে নি। আর কোনদিন সেই বৃদ্ধের সঙ্গে হয়তো সাক্ষাৎ ঘটবে না ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এই কালের প্রাঙ্গণে, কিন্তু দুজনে একই যন্ত্রণার শিকার। আশ্চর্য, সেদিন গাজী রহমান নৌকার আর দশ-জনের সঙ্গে চুপচাপ বসেছিল, খেয়ালও করে নি সেই কান্না বিভীষিকার মতো হন্যে হয়ে তার পিছু পিছু ঘুরবে। একটা কথাও হয় নি আহত-আত্মা সেই মানবসন্তানের সঙ্গে।

নরসিংদি এলাকা থেকে তারা নবীনগর যাচ্ছিল।

মেঘনার উত্তাল বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের জন্য নয়, নৌকার সকল যাত্রীই সেদিন যে-যার নিজের ভেতর সেঁধিয়ে বসে ছিল।

মাঝি পর্যন্ত চুপ।

আজকাল বাংলাদেশের গঞ্জ বন্দর আর কলকোলাহলের ডিপো নয়। অনেক থিতানো মনে হবে এখানকার নর-তরঙ্গ। হাঁকডাক চিৎকার যে নেই তা নয়। তবে তা যেন মাপজোক। গঞ্জের পর হয়তো আদিগন্ত মাঠ শুরু হয়। সেখানে স্তব্ধ চিরাচরিত। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রোতের আওয়াজ, পাখির ডাক কি দাঁড় টানার শব্দ— এখন কয়েকটিতে নিনাদ-ভাণ্ডার সীমিত। আজকাল মনে হবে, প্রান্তর আর গঞ্জ-বন্দরের মধ্যে কোন মিতালি চলছে, যার ফলে মৌনের শাসনই দুই দিকে যথাসম্ভব সংযত-বাক্। হাসির আওয়াজও কানে পড়ে না। দু-চারজন দুঃসাহসী অবিশ্যি লা-পরোয়া, কথা বলেই যায়। এই নৌকায় তেমন একজনও ছিল না।

শাদা দাড়ি-সমন্বিত, খালি-গা, পরনে লুঙ্গি, কাঁধে গামছা, বুড়ো মানুষটি কৃষকশ্রেণীর। চেহারায় শ্রমজাত কাঠিন্য এই বয়সেও চাপা পড়েনি। নৌকার গুলুয়ের মুখে সে চুপচাপ বসে ছিল। অত্যন্ত চিন্তামগ্ন। মাঝে মাঝে মেঘনার পানি সে চোখেমুখে ছিটিয়ে নিচ্ছিল। বোঝা যায়, হয়তো মাথা ধরেছে বা ভেতরে কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। বার তিন হাই তুললে পর্যন্ত বৃদ্ধ। নৌকায় তেমন গুড়ের-নাদা ভিড় ছিল না। দু'তিনজন চেপেচুপে বসলে ওর কাত হওয়ার একটা সুযোগ হতে পারে। বৃদ্ধ তেমনই একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। তা একটু পরে জানা গেল। চোখেমুখে দু-তিনবার জল ছিটিয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে একটু জায়গা দেওয়ার জন্যে ইশারা জানান। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। তার উপর চেহারায় সেই ছাপ বর্তমান, যা স্বতঃই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আশেপাশে কেউ, সামান্য অসুবিধা সত্ত্বেও নিঃশব্দে বৃদ্ধের অনুরোধপালনে মন দিলে। বেশ অনেকখানি জায়গা হল। মজকুর ব্যক্তি লম্বা শুয়ে পড়তে পারতেন। কিন্তু অপরের অসুবিধার দিকে এই মানুষের এমন খেয়াল যে, নিজের শরীর খুব কুঁচকে, হাত বালিশ বানিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। মোটা মানুষ। কাজেই খাড়াইয়ে অন্তত প্রমাণ, মাদ্‌বর ধরনের এক লোক ওখানে শায়িত। অনেক যাত্রীর চোখ সেদিকে ধাইছিল নেহাত অকারণ।

AMARBOI.COM

হঠাৎ বৃদ্ধ ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন এবং তারপর উবু অবস্থায় দুই হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপাতে লাগলেন।

এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিল। কিন্তু একজন বর্ষীয়ানের এমন অবস্থা দেখলে কে আর নির্বিকার থাকবে? সকলেই জিজ্ঞাসাবাদের দিকে এগিয়ে যায়।

সেদিন নীরব ছিল কেবল গাজী রহমান। চোখ দিয়ে সব অনুধাবন করছিল সে, মুখ খুলছিল না। নিজের চিন্তায় বুঁদ বিধায় সে চোখের উপর সব ছেড়ে দিয়েছিল। তাই বলে সে একদম আত্মমগ্ন তা বলা অবিধেয়।

বৃদ্ধের ফোঁপানি দিয়ে শুরু, কিন্তু ক্রমশ স্বরগ্রাম চড়ে যেতে লাগল। এক পর্যায়ে তিনি ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। বয়সকালে শিশুত্ব ভর করে বসে। এ বৃদ্ধের বয়স এখনো তেমন পর্যায়ে নয়। তা ছাড়া এখনো বেশ ডাঁটো আছেন তিনি। এমন বালকসুলভ ব্যবহার তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। সকলেই তাই অবাক হয়ে যায়।

শেষে একজন বৃদ্ধের গায়ে হাত দিলে ঈষৎ মৃদু ধাক্কার সাহায্যে সহজ চৈতন্য ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে।

ফল অবিশ্যি পাওয়া গেল।

বৃদ্ধ মুখ খুললেন এবং ডুকরে-ওঠার ফাঁকে ফাঁকে, 'বেইমান হয়ে দুনিয়া থেকে যেতে হল, আল্লা—' এই কথা ক'টা জুড়ে দিলেন।

এতক্ষণে নিঃসাড়তা একটু চিড় খেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রীদের মধ্যে এবার এক সঙ্গে অনেকের কথা বলার তাগিদ চাগান দিয়ে ওঠে। বৃদ্ধ জবাব দেয় না। নিজের বেইমানির অনুশোচনায় তিনি অস্থির, এইটুকু বেশ জানা গেল। কিন্তু কিসের বেইমানি? কৌতূহল সহযাত্রীদের কুরে কুরে খেতে লাগল। দুই-তিনজন অতি সমব্যথী মেঘনার পানি ছিটোয় বৃদ্ধের মুখে। কান্না প্রশমিত হোক। থামুক তার আবেগের প্রচণ্ডতা।

— জ্যাডা আর কাঁদেন না। কী হয়েছে কন?

একটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠ হঠাৎ সরস হয়ে উঠল এই সময়।

— জ্যাডা!

আবার স্নেহমথিত উচ্চারণ!

বৃদ্ধ এতক্ষণে থামলেন। যদিও ফোঁপানি মাঝে মাঝে অজানিতে চলে আসে।

তারপর সকলে উৎকর্ণ। জ্যাডার বয়ান শুনতে লাগল।

নবীনগরের দিকে কোন এক গ্রাম তার গন্তব্য। এসেছিলেন এক আত্মীয়ের খোঁজে নরসিংদির শিবপুর অঞ্চলে। এক সাবেক বন্ধুর দোকান ঐ গঞ্জে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু অতর্কিত পাঞ্জাবি সৈন্যদের আক্রমণের ফলে কোন রাস্তাই আর থাকে নি। পালানোর সময় এক জায়গায় ধরা পড়ে যান, বয়স এবং তাকে দিয়ে বেগার খাটানোর এখনো সম্ভাবনা আছে— এই দুই দোহাইয়ে।

একদিন মিলিটারিদের বেগার তিনি খেটেছেন, বেগার আহার।

তার জন্যে বর্ষীয়ানের কোন দুঃখ নেই। সব অনুতাপ অনুশোচনা অন্যখানে।

বৃদ্ধের মুখেই তা শোনা যাক্ :

"আট-দশজন মিলিটারি হইব। হগ্গলের হাতে মেশিন্গান। আমরা বিশ-তিরিশ জন। আমাদের কইল, চলো। হাঁটতো থাকি। এ ক'দিন প্যাডে বাৎ (ভাত) নাই। শরীর কাহিল। তয় নাচার। আমরা হাঁটতা থাকি। বেশি দূর হাঁটা হয় না। দেড় মাইল হইল। কিন্তু মনে হয়, হাজার মাইল হাঁটছি। পা আর চলে না। একডু জিরাইতা চাই। তহন গালি দ্যায়, এই বাঙালি শুয়ার কা বাচ্চা, কদম হেলানে নেহি সাক্তা?

বাপজানরা, হাঁইটা আইলাম নরসিংদি বাজার। একডা মানুষ নাই বাজারে। হব পালাইছে। ক্যামতে থাকবো এই জল্লাগদো সাম্নে? এগুলা মান্ষের আওলাদ না। রাস্তার ধারে দেখছি দুই বছরের ছাওয়াল পইড়া আছেগ্যা। কাউয়া ঠোকর দিতাছে লাশের চোখে। বেগুনা (নিরপরাধ) বাচ্চাদের মারে। এগুলা মান্ষের আওলাদ না।

বাজারে ত আইলাম। সব বিরান। ভাবলাম, শয়তানদের মনে কি আছে কে জানে? কয়েকডা বড় দোকান পাশে পাশে। এহানে হডাৎ চিক্কর দিলে এক মিলটারি, 'এই রোকো।' বা-জান্রা, হাল্লাক হইছি। নাকের উপর দম। তয় রক্ষা। একটু দম নিতা পারি। কিন্তু হেকি আর নসিবে আছে। পিস্তল দিয়া ফড়ফড শব্দ কইরা হব দোকানের তালা ভাইঙল। আমরা ভাবি, অহন বুঝি আমাদের মাইরব। তা কইরল না। তিন-চার মিলিটারি এক লগে চিক্কর দিয়া উঠল, 'এই দোকান কা অন্দর যাও।' দোকানের ভেতর যাওয়া লাইগব ক্যান? এর ভেতর আমাগো জান্ যাইব। হগ্গলে দোনা-মোনা। নিজের ইচ্ছায় কে আর কবরে সান্ধাইতে যায়। হগ্গলে দোনা-মোনা। আমাগো লগে কয়েকজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোওয়ান পোলা ছিল? তাগোর একজন সাহস কইরা কইয়া ফেলাইল, 'কিঁউ অন্দর জায়েগা?' হে বুঝলাম উর্দুফুর্দু কইতা পারে।

'আরে শালা বাৎ করতা? অন্দর যাও।'

'কিঁউ?'

মিলিটারি ধাঁ কইরা আইয়া হে জওয়ানের মুখে তিন-চার ঘুষি মারল আর কইল, 'অন্দর যাও, আওর লুটো।'

লুটের হুকুম দিতাছে। ক্যান? ফের দোনা-মোনা, দোনা-মোনা। লুট করন পইড়ব ক্যান? তাগোর মতলব কী, কোনো দিশা পাই না। কিন্তু জোয়ান তিন-চার পোলা, বুকের পাডা আছে বাজান, ফের জিগাইল, 'লুট কিঁউ করে গা?' আমার মুখে আইব না, বা-জানরা। এবার মিলিটারি দুই শুয়োরের পুৎ পচা খিস্তি কইর‍্যা কইল, 'লুট করো। এহসব হিন্দু কা দোকান হ্যায়।'

প্রতিবাদ করে জওয়ানেরা, এসব নাকি মুসলমানের দোকান। হেরা বালামৎ (ভালোমত) জানে। তয় কী পেছায় মিলিটারিরা। শেষেমেষ কয়, 'বাঙালি শালালোগ কা দোকান হ্যায়। লুটো, লুটো।'

সাবাস আমাগো জওয়ান। একজন বেশ তাগদের সঙ্গে জিগায়, 'গুনা (পাপ) হোগা নেহি? দোস্‌রে কা চিজ।'

'আরে এ শালা ত মসজিদ কা ইমাম কী তরহ বাৎ করতা।' তার দিকে খেঁকাইয়া যহন আগায় মিলিটারি তহন আরও চার-পাঁচ জওয়ান সায় দিলে, 'আলবৎ গুনা হইব।'

এই পাঁচ জনরে আমাদের সামনে এককাতারে কইরা মেশিনগান চালাইল। আহ্...। পাঁচ-পাঁচডা জওয়ান মরদ পোলা...কইতে পারুম না, বা-জান। তহন কাঁদছি, কাঁদছি। চোখে কিন্তু পানি ছিল না। বুক তড়পায় ডাঙায় লাফাইয়া-পড়া মাছের লাহান আহ...।

পাঁচ মিনিড বাদ আমাগো পালা। আমাগো কয়, 'লুটো। লুটো।'

তহন আর কী করা! জোওয়ানের লাহান না আছে বুকের তাগদ না আছে মনের তাগদ। লুট শুরু করলাম। হালারা টাকাকড়ি সোনাচাঁদি হব লইল। আমাগো কয়— মাল লে যাও। একের পর এক দোকান আমরা লুড করলাম। হিস্যা— হেই এক রকম। হেরা টাকাকড়ি সোনাচাঁদি লয়, আমরা মাল। দুটা কাপড়, একটা থালা— হেইজাতী লোয়াজিমা। আমাগো মুজিবর রহমান যে কইছে, পশ্চিম পাকিস্তান গোস্ত খায় আর আমরা তার হাড় চুষি। একদম হাঁচা কথা। এহানেও বা-জানরা, হেই তামাশা দেখলাম। আমরা লুড করি, হেরা আবার ফডো তোলে। ফডো তোলে ক্যান?'

গাজী রহমানের কানে এখন স্পষ্ট বাজে এক নেপথ্য-জবাব, যে-মুখের আদল আজও তার কাছে এতটুকু ঝাপসা হয় নি।

বোধহয়, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে উপদ্রুত এলাকা ছেড়ে নিরাপত্তার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। সে বলেছিল, 'জ্যাডা, ফটো তুলছে। কারণ, দুনিয়াকে দেখাবে বাঙালিরা লুট করে আর পাঞ্জাবিরা শান্তি বজায় রাখে।' কথাগুলো আবেগের বশেই ছেলেটা বলে ফেলেছিল, ধারণা করা যায়। তারপর সে আর মুখ খোলে নি। চোখ নামিয়ে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাজী রহমান তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার আদল দেখে নেওয়ার সুযোগ পায়। কয়েকদিন শেভ করেনি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে মুখ বোঝাই। দৃঢ়তা যেমন আছে তার দেহের বাঁধনে, তেমনই মুখাবয়বে। একবার সন্দেহ টুঁ মেরেছিল গাজী রহমানের মনে। হয়তো বাংলাদেশের গেরিলাবাহিনীর সদস্য। তাই নিজেকে সে হঠাৎ উন্মুক্ত করে ফেলেছিল। এই মুখ গাজী রহমান বার বার দেখেছিল, তবু তৃপ্তি মেটেনি সেদিন। আপন জননী আর দেশ-জননীকে এই তরুণেরা এক করে নিতে পেরেছে। অকুতোভয়তা, সাহস, নৈতিকতা, দুর্জয় সংকল্প, দেশবাসীর প্রতি অগাধ প্রেম, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কর্মে, স্নেহে-ভালোবাসায় বিকশিত হওয়ার উদগ্র অভিলাষ— এমন সবকিছু যখন অস্তিত্বের গোড়া ধরে একত্রে দিগ্বিদিক টান মারে— তার সংগতিসাধন অত সহজ নয়। দুঃসহ এই বয়সেই হয়ত তা পারা যায়। বৃদ্ধের প্রতি সেদিন গাজী রহমানের অমনোযোগের হেতু এখানেই বুঝি নিহিত।

'ভাবলাম,' বর্ষীয়ান বলে চলেন, 'কয়মৎ নজদিগ। আর বাঁইচ্যা লাভ কী? তাগদ ছিল না কিছু, বা-জান্‌রা, ওদের মুখ-বরাবর কিছু কই। মনে মনে আল্লারে ডাকি, হে আল্লা, ইমান খুয়াইয়া এমন বেইমান হওনের লাইগ্যা তুমি বানাইছিলে; জোয়ান কালে কতো খোওয়াব দ্যাখছি, পাকিস্তান হইব, মানুষ হইতা পারব হগ্‌গলে। কতো খাড়ছি, ভোট দিছি। পাকিস্তান হইল। কতো রিফিউজি আইল। তাগোর জায়গা দিছি, খাওয়াইছি... হেরাও শুনি অহন মিলিটারিগো লগে। আল্লা...বেইমান হইয়া এই বয়েসে মরণের লাই পাকিস্তান বানাইছিলাম?...আর কী কইমু বা-জান্‌রা। বহুৎ টাহাপয়সা পাইছে। তাল তাল সোনা। মিলিটারিগো দ্যাখলাম বেজায় খুশ। আমাদের আর লগে নিল না। কইল— ভাগো, আপনা দেহাৎ যাও...। তয় রক্ষা। লুডের মাল দরিয়ার মদ্দি হব ফেইলা দিছি। লুড করছি হে ত আল্লা দ্যাখছেন। গুনা মেঘনার পানিতে ধোয়া যায় না...।'

তারপরই বৃদ্ধ পুনরায় বালকের মতো ডুকরে কান্না শুরু করেছিলেন। এবার কেউ তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে এগোয় নি। সকলেই স্তব্ধ।

ঐ কান্না অসহায়তার আকস্মিক প্রকাশ নয়। বিক্ষুব্ধ আত্মা যখন একের পর এক সব অবলম্বন ঠেলে অম্বিষ্টের ছায়ার জন্যেই শেষ পর্যন্ত হন্যে হয়ে ওঠে এবং নিমেষের প্রতারণাটুকু উপলব্ধির পর চিৎকার দিতে থাকে— এই রোদন-নাদ তেমনই কিছু।

এক আওয়াজ সব মুখের কথা আত্মসাৎ করে নিয়েছিল।

গাজী রহমান একবার সচকিত, আর কিছুই ঠাহর করতে পারে নি। সুদক্ষ গায়ক কর্তৃক রেখায়িত সুর যেমন এক পর্দায় থেকেও বাইরের বিচিত্র জগৎ টেনে আনে, গাজী রহমানের কাছে মনে হয়েছিল তেমনই একটা কিছু ঘটছে। কিন্তু কোন যুক্তির সাহায্যে সেদিন প্রবীণ শিক্ষক এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় নি।

সখিনার সঙ্গে কথা শেষ হলেই গাজী রহমান যেন স্পষ্ট শুনতে পেত বৃদ্ধকণ্ঠের কান্না।

নিজের অস্থিরতার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেওয়া অত সহজ নয়।

এই গ্রামে মিলিটারি আসবে। তার সম্ভবনা কম। তবে অপমৃত্যুর যেখানে ভয়, সেখানে হুঁশিয়ার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। খামোকা মরে লাভ নেই। মাঝে মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিসচেতন মুহূর্তে গাজী রহমান তা উপলব্ধি করেছে বৈকি। কিন্তু পরিত্রাণের আশায় হন্যে হওয়া তার কাছে এক ধরনের কাপুরুষতা। কোটি কোটি নরনারী, শিশু কিশোর বৃদ্ধ আছে না বাংলাদেশে? সকলে যদি শুধু নিরাপত্তার খোঁজে বিবাগী হয়, জালেমের মুখোমুখি কে রুখে উঠবে? অবিশ্যি সংসারে আবার সকলে যোদ্ধা নয়। তা হওয়াও অনুচিত। চাষী লাঙল ছেড়ে দিলে বিনা আহারে কী দিয়ে গেরিলারা লড়বে। এই যুক্তি দিয়েছিলেন গাজী রহমানের এক বন্ধু, যিনি কমিশনার অফিসে বহুদিন বহাল থেকে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু বাইরের জগতের হদিশ বোঝার জন্যে কখনো পেছ-পা হন নি। অমন খাঁটি কথা গাজী রহমানকে বিচলিত করেছিল। সেদিন ছাত্রের প্রশ্নে দুঃস্বপ্নগ্রস্ত আচ্ছন্নতা কয়েকবার ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা পেয়েছিল গাজী রহমান। অমন নির্জীবতা তো মৃত্যুর সামিল। তারপর তার মনে হয়েছিল, নৈতিক মৃত্যু প্রতিদিন সে কীভাবে সহ্য করবে? বাংলার প্রান্তর কোনকালে কেউ এমনভাবে তো দূষিত আবর্জনায় ঢেকে দিতে এগোয়নি।

বৃদ্ধের কান্না এবার বার বার আছড়ে পড়ত তার দুই কর্ণপটে অতি-প্রত্যক্ষ প্রাচীরভেদী বায়ুপ্রবাহের দুর্বার গতি-তোড়ে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দুইজনে। শিক্ষক এবং সাবেক ছাত্র। দুজনের ভাবনার এক জায়গায় মিল আছে। ইউসুফ ওস্তাদের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত। শিক্ষক ভাবছেন, যদি এই বাড়ি বা গ্রামে সে ধরা পড়ে যায়, আশ্রয়দাতা এবং তার স্ত্রী উভয়ে লাঞ্ছিতই হবে না শুধু, প্রাণও খোয়াতে পারে। গত একমাসে সামরিক জুলুমের নকশা সম্বন্ধে সে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল।

ইউসুফ— অনেকক্ষণের স্তব্ধতা হটিয়ে গাজী রহমান উচ্চারণ করেছিল।

— স্যার!

— কিছু মনে করো না। খুব ভোরেই আমি তোমাদের গাঁ ছেড়ে যেতে চাই।

— স্যার, মনে করব বৈকি। আপনার সেবার নসিব আমার হল না।

— কেন? এই তো এক সপ্তাহ কাটালাম।

— স্যার। ওতে মন ভরে না। আপনার উপর জোর করতে ভরসা পাইনে। যদি কোন বিপদ আপনার হয়ে যায় এখানে থাকার ফলে, তার চেয়ে আমার কাছে মৃত্যু হবে ঢের বেশি সুখের। কিন্তু কোথায় যাবেন?

হঠাৎ পালটা প্রশ্ন করে বসেছিল ইউসুফ।

— তা ঠিক করি নি। তবে আমার জন্যে চিন্তা করো না।

— স্যার, দুদিন আগে নেজামে ইসলাম, মুসলীম লীগের কেঁচোগুলো কেঁচোই ছিল, ভুঁয়ে মুখ। এখন সেই কেঁচোগুলো কেউটে হয়ে গেছে মিলিটারি বাবাদের জোরে। তাই ভয় পাচ্ছি। যদি ছোবল মেরে বসে।

— অতটুকু বুদ্ধি আমার আছে, বিশ্বাস রেখো।

— কিন্তু আপনি আর আগের মানুষ নেই, তাই ভয়।

— বুকে যে অনেক যন্ত্রণা, ইউসুফ।

— কিন্তু কোনো দরকার পড়লে খবর দেবেন।

— নিশ্চয়। সখিনা মাকে একটু ডাকো। ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

AMARBOI.COM

২

নদীর টলটলে জলের উপর ভাসতে ভাসতে দুই চোখ লংশটে ছড়িয়ে দিয়ে যদ্দুর তাকাও, বাংলাদেশের আকাশ, হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, একক বিধৃতির মধ্যে গাছপালা পশুপাখি মানুষ প্রান্তর টেনে এনে, এমন চিত্তপ্লাবী মোহনীয়তায়, মনে হবে, চরাচরের স্পন্দনের সঙ্গে স্পন্দিত তোমার হৃদয় থেমে থেমে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় সব আত্মসাৎ করছে। এখানেও প্রতীয়মান বিচ্ছিন্নতা আছে। কয়েকটা কালো জেলে নৌকার বহরের পর ঈষৎ শূন্যতা শেষে একদল ফিংগে পাখি সঞ্চরমান, আরো দূরে শুধু এক চিলতে লাল রং— যা ভুক্তভোগী মাত্র জানে, অনেক দূরে ভাটিদেশমুখী কোনো নৌকার বাদামের পরিপ্রেক্ষিতবিন্দু, যদিও আকাশ আছে। কিন্তু আকাশও তখন গায়েব হয়ে যায় এই নিমেষের লীলায়। নৌকার গতি দৃশ্যপট বদলে দিতে থাকে প্রায় মন্টাজের কায়দায়। কিন্তু পাটাতনের উপর শুয়েই থাকো না বসে-বসে আত্মপীড়ায় বিব্রত হওয়ার চেষ্টা পাও, রেহাই নেই তোমার অনির্বচনীয়তার স্বাদ পরিবেশন থেকে। গুলিবিদ্ধ চাষীকে দেখা গেছে নদীপথে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে, চোখে পরম প্রশান্তির স্পর্শ, বাংলাদেশের এই প্রান্তর-ভাণ্ডারের হাতছানিজালে বন্দি। ধ্বনি এখানে রঙ। রঙ এখানে ধ্বনি। দোটানার ভেতর অবিশ্বাস সমাহারের তোড়ে আবর্তিত আনন্দ এমন অন্তঃপ্রসারী, যে, অতি-নেশার মতো তা শেষে সোয়াস্তিকর হতে থাকে। আনন্দ-বেদনা তখন আবার সর্পমিথুনের মতো দ্বৈত জোট বাঁধে। বিপরীত-বিপরীতে মৈত্রীর নিকট তুলনা বাংলাদেশের নিসর্গশোভা। অকবিও এই মোচ্ছবে শরিফ হয় স্বাহূত, অজানিতে।

একটা খুব ছোট নৌকা গাজী রহমান ভাড়া করেছিল। দু-ভাঁজ ছৈয়ের চাল।

বড় নৌকায় অনেকের সঙ্গে যাতায়াত বরং নদীপথে নিরাপদ। চোর-ডাকাতের ভয় নয়। মিলিটারি স্পীডবোট হঠাৎ এসে পড়ে খানাতল্লাসি শুরু করতে পারে। ওদের ধারণা, এলাকা থেকে এলাকায় অস্ত্র চলাচল হচ্ছে দেশী নৌকা মারফত। এক জায়গায় খড়-বোঝাই গোটা গহনায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল একদল সৈন্য, স্রেফ সন্দেহের বশে। এত খড় আবার ডাঙায় ফেলে খানাতল্লাসির সময় কোথায়?

এমন ঘটনা গাজী রহমানের কাছে অপরিচিত কিছু নয়। সবই তো নির্ভর করছে কিছু অল্পসংখ্যক লোকের মর্জির উপর। তারা ছাড়া আর কারো কোন অধিকার নেই। মোদ্দা কথা, এই যখন পরিবেশ তখন সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু তা কোন নিরাপত্তার জামিন নয়। সুতরাং ঝুঁকি যখন সব দিকেই, নিজেকে একা-একা পাওয়া এবং বড় নৌকার ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় থেকে অন্তত রেহাই মিলবে। এমন সব সাত-পাঁচ ভেবেছিল গাজী রহমান।

ভোরে মজকুর নৌকাঘাটে আসতে তাকে পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়। এই পরিশ্রমের ফলেই সে যেন নিজেকে আবার ফিরে পায়। জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে অভ্যস্ত, হঠাৎ কাবু হয় নি কোনদিন সে। কিন্তু অকারণে অপমৃত্যু এবং বর্তমান পরিস্থিতি-জাত আকস্মিকতায় সে মনের বল হারিয়ে ফেলেছিল। তখন বিশেষত বিশাল প্রান্তরের মধ্যে এই নদীপথ, জলো বাতাস, নানা দৃশ্যের তামাশা ধীরে ধীরে ফিরিয়ে দিচ্ছিল যতো সাবেক তাগদ। এতদিনকার আচ্ছন্নতা যেন ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। মাঝির সঙ্গে দু-একটা কথা অবিশ্যি মাইলপোস্টের মতো তাকে গন্তব্য-সচেতন রাখছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত-আট ঘণ্টা নৌকাপথে।

আর এক গ্রামে কিছুদিন অধিবাসের ইচ্ছা আছে গাজী রহমানের।

নিজের বয়সের উপর বার বার ধিক্কার দেয় সে। কত কাজ এখন। আর তাকে বহু দিন স্কুলে যেতে হবে না। অবসর থাকলেও সে যেকাজ করতে চায় তার জন্যে অন্য বাতাস দরকার। এখানেও সে পারত যদি বয়স থাকত চল্লিশের নিচে। তাই তার পক্ষে স্থির করা কঠিন, তার কর্তব্যের ক্ষেত্র কোথায় নিহিত। একদম পাকা যুক্তিবাদীর মতো হঠাৎ গাজী রহমান সব দিক তলিয়ে দেখার চেষ্টা পাচ্ছিল। নিঃসঙ্গতা তাকে আর পেয়ে বসে না।

বিপদের কথাও একবার ভাবলে সে। হঠাৎ মিলিটারিদের মুখে পড়লে জিজ্ঞাসাবাদে কী জবাব দেওয়া যায়। অতটুকু উপস্থিত বুদ্ধি আছে তার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার স্কুল নানা কাজে অগ্রণী ছিল। সুতরাং প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তার বাঁচোয়া নেই। কিন্তু তাকে খুব পরিচিত লোক ছাড়া সনাক্ত করা অসম্ভব। একটা লুঙ্গি আর আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, পালিশহীন পুরাতন পাম্‌শু এবং গত এক মাসের আহারনিদ্রাঘটিত রগ্‌ড়ানি তার আদলই বদলে দিয়েছে। প্রয়োজন মতো দৌড়ের জন্যও সে প্রস্তুত।

জীবনে গাজী রহমান প্রথম উপলব্ধি করেছে প্রবীণ অস্থিসহযোগে, মানুষের প্রয়োজনের সীমানা অনেক খাটো করা যায়। আর পার্থিব সম্পদের প্রতি মমতা— যখন অস্তিত্বের শিকড়েই টান পড়ে— মুহূর্তে উড়ে যায়। পঁচিশে মার্চের পর সাতাশের সকালে গাজী রহমান লাখ লাখ মানুষকে শহর ছেড়ে যেতে দেখেছে। কেউ কেউ মাত্র এক বস্ত্রে। কত ধনীনন্দিনীকে সে দেখেছে খালি পায়ে দ্রুত হাঁটতে। হাতে চিরাভ্যস্ত ব্যাগটা পর্যন্ত নেই। আসবাব-সজ্জিত সুরম্য ইমারৎ এক মুহূর্তে রাস্তার মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, পলকে মূল্যহীন। কত বাড়িতে তালা দেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করে নি মালিকেরা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, সব সামগ্রীর যাচায়ের পদ্ধতি এমন বদলে যেতে পারে!

একবার মনে মনে হেসে উঠেছিল গাজী রহমান। গত এক মাসে প্রথম হাসি।

তার পার্থিব সম্পদের তালিকা এখন কোথায় দাঁড়িয়েছে? একটা টুথব্রাশ, পেস্ট। দু'টো লুঙ্গি। পাজামা, ছেঁড়া পিরহান, ছোট তোয়ালে। একটা ঝোলা ব্যাগ। নৈশকালে... সব আধেয়-সহ বালিশ। জয় বাংলা...। গোঁফে হাসি ছড়িয়ে সে বালকের মতো প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল।

সহসা-নিবৃত্ত, মনের ভেতর প্রতিধ্বনি কিন্তু গুঞ্জরণ তুললে বেশ কয়েকবার : জয় বাংলা।

নেহাত কোন মিলিটারি চেক্‌পোস্ট পার হওয়া তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারীদের ভয় পদে পদে। তারা হয় মুক্তিফৌজের সদস্য অথবা ভবিষ্যৎ দিনের স্বাধীনতার সৈনিক। তাদের পরিত্রাণ নির্ভর করে সেই সময়কালে পরীক্ষকের মর্জির উপর। উত্তর-পঞ্চাশে এমন কৃশ শরীর তাই অপমৃত্যু থেকে কিছুটা রেহাই দেবে।

গাজী রহমান আজ সচেতনভাবে নিজেকে প্রশ্ন করলে, সে কি প্রাণভয়ে ভীত? অপমৃত্যুর ভয় না-থাকা হয় দুঃসাহস, নচেৎ মূর্খতা। সংসারের বিনা কাজে হঠাৎ জন্তুর মতো আয়ু খোয়ানো কারো অভিপ্রেত নয়। একবারই যখন বাঁচা, তার সমাপ্তি অর্থবহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া উচিত।

এই প্রথম ব্যাপারটার মুখোমুখি হল গাজী রহমান।

শীতলক্ষা নদীর এই এলাকায় দু'পারের গ্রামগুলো এখনও ভস্মীভূত হয় নি।

দৈনন্দিন তার জোয়ার ঠিকই বয়ে যাচ্ছে কি?

দুষ্ট ছেলের পাল কিন্তু কোথাও দাপাদাপি করছে না। দু' একজন বৃদ্ধ নদীর ঘাটে আসছে। ঢাকা শহর থেকে তের-চৌদ্দ মাইল দূরে। এসব এলাকা কি তবে জনশূন্য হয়ে গেছে?

গাজী রহমানের ভয়ানক ইচ্ছা একবার সব দেখে আসে।

ডেমরা-ঘাটের চেক্‌পোস্ট পার হওয়ার সময় তার বুক একবার কেঁপেছিল বৈকি। মৃত্যুর অদৃশ্য জিজ্ঞাসা এইভাবে আসে। সুতরাং আর তীরে নেমে কাজ নেই। ছোট নৌকা এবং নিরাভরণ দেখে মিলিটারি চৌকিদার আর ডাক দেয় নি। তা করলে, প্রথম একটা পরীক্ষা হয়ে যেত। বেপরোয়া তরুণেরা চেকপোস্ট এড়িয়ে অন্য পথ ধরে। এক হিতাকাঙ্ক্ষী পয়পয় গাজী রহমানকে উপদেশ দিয়েছিল। আজ এ ভাবে রাবণের প্রতি অবহেলা উচিত হয় নি। মুক্তির মত মৃত্যুও অবশ্যি নানা পথ ধরে আসে। একচক্ষু হরিণের প্রাবাদিক কাহিনীর দৃশ্য না আবার ঘটে যায়।

ছয়ের তলায় বসে বসে, গাজী রহমান অনেক কিছু ভাবছিল। চড়া রোদ্দুর থাকায় বাতাস অত মনোরম লাগছিল না। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় একমাস শরীরকে নানা কষ্টসহিষ্ণুতার মুখে সঁপে দিয়েছে। শহরে পাখার তলায় বসা বা শোয়া, যান্ত্রিক সুবিধাগত আরো কত আরাম না তার আয়ত্তের মধ্যে। এসব বিসর্জন দিতে তার কোন কষ্ট হয় নি। বাইরে দেবনার ছ্যাঁকাব্যগ্র ফোঁস শত শত আবর্তে লকলক করছে। একটি দেহ তখন আর অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। অল্প ব্যথায় কেউ ছিঁচকাঁদুনে, আবার প্রেমিক ভ্যান গ'র মত কেউ নিজের কান কেটে প্রিয়তমাকে স্বচ্ছন্দে উপহার দিতে পারে। ডিগ্রির তারতম্য শুধু। গাজী রহমান ঘেমে উঠছিল। কিন্তু রুমাল বা তোয়ালে দিয়ে তা মোছার চেষ্টা ছিল না এতটুকু। শরীর নাকি মহা-সয়। সে বেশ কিছু দিন তার প্রমাণ দিতে তৎপর। মৃত্যুর ফলে কিন্তু দৈহিক এসব ঝামেলা চুকে যায়। সুতরাং শারীরিক বিড়ম্বনা-সহ্যের মধ্যে জীবনের সাধনা আছে বৈকি। নচেৎ প্রাণভীতি সত্ত্বেও নিজেকে সে অত প্রস্তুত করছিল কেন? চিন্তার জট ক্রমশ নানাভাবে পাক খায়। পরিবেশ হয়তো সেদিন গাজী রহমানের পক্ষে তা সম্ভব করে তুলেছিল।

মাঝি গত চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কেবল কয়েকটা বিড়ি ফুঁকেছে। কথা সে একবার জীইয়ে রেখেছিল পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য। তারপর তার জানার সবকিছু প্রয়োজনে বোধ হয় ফুরিয়ে গিয়েছিল। মাঝির স্তব্ধতা কিন্তু কতকটা বিঁধছিল খোঁচার মত। তার বহু বছরের জ্ঞানের বহর কল্কে পায়নি এই আম ব্যক্তির নিকট।

"সাব, একডা কথা জিগামু?" খুব মোলায়েম স্বরে মাঝি প্রথম তার আচ্ছন্নতার গায়ে টুঁ মেরেছিল।

"আঁ।" সম্বিত নেওয়ার জন্যে চকিতে এমন এক শব্দের ব্যবহার-শেষে গাজী রহমান সাহস যুগিয়েছিল সহযাত্রীর মনে, "কী জিজ্ঞেস করবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— শেখ মুজিব কি অ্যারেস্ট অইছে?

ভাষার উপনিবেশবাদ অত সহজে যায় না। অবিশ্যি সাধারণ মানুষের মুখে বহু ইংরেজি শব্দ বহুদফা গাজী রহমান শুনতে অভ্যস্ত। আজ কিন্তু একটি বিদেশী শব্দ তার কানে অত সহজে অর্থবিস্তার করতে পারে নি। একটু সময় গিয়েছিল।

"কাগজে তো তা-ই লিখেছে" একদম সমানে সমান বরাবর, কোন শ্রেণীজাত দূরত্ব না রেখেই গাজী রহমান জবাব দিয়েছিল। মাঝির উপর তার শ্রদ্ধা আরোপিত কিছু নয়।

— ওই ছাপানের কাগজের কথায় আপনি বিশ্বাস রাখেন?

একটা তাচ্ছিলের হাসি কিন্তু জবাবের সঙ্গে লেপ্টে রইল। মিইয়ে যেতে হয় গাজী রহমানকে। কিন্তু এই নিষ্প্রভতা হঠাৎ বিস্ময়ের ধাক্কা। গত একমাস এমন নিখাদ স্বর সে আর কারো কাছ থেকে শোনে নি। শিক্ষিত জবাব দেয়, কিন্তু ক্ষুব্ধ। ধনী সম্পদ-হারানোর শোক কণ্ঠে চেপে রাখার চেষ্টা পায়। রাজনৈতিক কর্মী প্রতিপক্ষের খুঁত দিয়ে গলায় আওয়াজ ফাঁপা করে। ফলে নৌকার উপর গাজী গত কয়েক সপ্তাহের ম্রিয়মানতা এক নিমেষে হারিয়ে বসে না শুধু, নিজের স্বভাবজাত তেজ হঠাৎ ফিরে পায়।

— তা ঠিগ। কিন্তু কী মনে করো?

— আমি জাহেল মানুষ, মুরখখু সুরক্ষু। আপনি কি করেন— কন? গাজী রহমান তখন সহজভাবেই সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি করে, "মনে হয়, শেখ মুজিব অ্যারেস্টেড।"

কিন্তু কথা শেষ করার সুযোগ পায় না গাজী রহমান। আবার সাবেক তাচ্ছিল্যের হাসি শোনা গেল, এবার আরো জোর এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষের করুণ ছবিটাই প্রকট।

— সাব, শেখ মুজিবরে ধইরব কোন হালা। শেখ মুজিবর অ্যারেস্ট অইছে না। আমি কই হোনেন— ।

গলা যথাসম্ভব শিক্ষকের দিকে বাড়িয়ে মাঝি তখন উচ্চারণ করেছিল, "শেখ মুজিব ফেরার। নানা বেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতাছে। তাজ্জব, আপনে লিখাপড়া মানুষ এ খবর জানেন না?"

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে এমন জবাব গাজী শুনেছে এমনই মানুষদের কাছ থেকে, যারা সাধুতা সরলতার সকল উৎস এখনও জীইয়ে রেখেছে। জীবনের জটিলতা এদের অত বিভ্রান্ত করতে পারে নি। বহু শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অনেক আগেই তারা গন্তব্যে পৌছায়। তাদের বিভ্রান্তিও সরলতা-জাত। তাই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয় পৃথিবীতে।

ব্যক্তি নামে আবদ্ধ হয়। তারপর সাধনায় ব্যক্তি হয় ভাবমূর্তি। আইডিয়া-কে কোন পশুশক্তি বন্দী করতে পারে?

গাজী রহমানের আর কথা বলার সাহস হয় নি। তার ইলেমের উপর কটাক্ষ নয়, তা সে বিরাট গৌরবের মত গায়ে মেখে নিয়েছে।

গোটা বাংলাদেশের অভ্যন্তর অবলোকন করছিল গাজী। বাইরের এত শোভাপ্রান্তর শেষে বিষণ্ন তরুবীথি, হঠাৎ মোচড়-মারা নদী বা খালের বাঁক, বালু-চিকচিক চর— কোন কিছুর উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। ভূতাত্ত্বিকের মত বাংলাদেশের গহন তাকে তখন সবেগে টানছিল, মাঝির বাক্যপ্রতিধ্বনি যেখানে শিকলের মত নিঃশব্দে অনেক নিচে নেমে গেছে, তার পায়ে বেড়ি আকারে প্রারম্ভটুকু অটুট রেখে।

AMARBOI.COM

আকাশে অকালে মেঘ জমছিল। উল্টো বাতাস উঠল।

ছোট নৌকায় অনেক দেরি হয়ে যাবে ঘাটে পৌছতে। গাজী রহমান অবিশ্যি গা-ঢাকা সন্ধ্যার জন্যে প্রস্তুত ছিল। আরো দেরি হলে নাচার। মাঝির এই এলাকায় যাতায়াত বহু কাল থেকে। সুতরাং তার জন্যেও কোন চিন্তা নেই। বেশি রাত হয়ে গেলে গ্রাম এখন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দালালের দল সক্রিয় ঘুরে বেড়ায়। কিছু না পারলে লুঠপাট করে। অবিশ্যি তার মত বিবস্ত্রের জন্য বাটপাড় থেকে তেমন বিপদ আসবে না। টাকা একশ'র মত সঙ্গে আছে। তা পামশুর এমন কোটরে ঢুকে রয়েছে রঞ্জনরশ্মি পর্যন্ত খ' পাবে না। যদ্দূর জানা আছে, এই এলাকা হানাদার বাহিনী থেকে নিরাপদ। ওদের বড় ঘাঁটি বিশ মাইল দূরে। পাকা রাস্তা থাকার ফলে হঠাৎ হঠাৎ টহল দিতে বেরোয়। এমন ঝুঁকি তো বাংলাদেশে সর্বত্রই আছে। এত চিন্তা করলে ঘরে বসে তা দিতে হয়।

অবশ্যি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা বেশিক্ষণ টিকল না। বাতাসের গতি ঝিরিঝিরি পর্যায়ে। মেঘ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

একা মাঝি শুধু নৌকা বেয়ে চলেছে। নদীপথে যাত্রীর আনাগোনা খুবই কম। এই সময় শীতলক্ষা জমজমাট থাকে। এখন তুলনায় মনে হবে, নদী শুকিয়ে গেছে, আর কিছু নেই। নীরব হওয়ার দিকে যেন সর্বত্র সাধনা চলছে।

মাঝি যা চুপ করে গিয়েছিল, আর মুখ খোলে নি।

সঙ্গীতের আচ্ছন্নতার মত গাজী রহমান নিজের মধ্যে কিছু যেন অনুভব করছিল। চোখে তীরবর্তী জীবনের সব খণ্ড-ছবির ছায়া এসে পড়ে। কিন্তু তার কোন অর্থবহ বিবরণ গাজী রহমানের কাছে নেই। বস্তুমান সেখানে অনুপস্থিত। অনেক দূরে আকাশে একদল বকের বহর ভেসে চলেছে। অন্য সময় হলে গাজী রহমান ঘাড় ঘুরিয়ে সব গতিবিধি দেখত। এমন কি পাখির সংখ্যা গোনার মত বালকোচিত নেশায় মেতে উঠত। আজ সে যেন কিছুই দেখল না। এক-এক বার স্তব্ধতা পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে যায়।

খোঁয়ারি আজে গাজী রহমানের দুই চোখে। সে তো গত এক মাস ঘুমোয় নি। মাঝে মাঝে ক্লান্তির টানে টানে দুই চোখ বুঁজে সে পড়ে থাকত। শ্রান্ত পেশী বিশ্রামের স্পর্শ-প্রার্থী। কিন্তু চোখের মধ্যে বীভৎস দৃশ্য তখন দাপাদাপি করছে। মন তদ্রূপ লণ্ড-ভণ্ড ঠিক পেশীর উল্টো দিকে ধাইতে চায়। এই টানাটানির চোটে আর যাই হোক তন্দ্রাভাব সম্ভবত থাকে, কিন্তু ঘুম ধরে না। সাপের বিষে ক্রমশ অঘোর ব্যক্তির নাকি এমন দশা হয়, যদিও তার পক্ষে তখন ঘুম মানে মৃত্যু। গাজী রহমানের তেমন বালাই ছিল না। আসুক না মৃত্যুর মত ঘুম। তার কাছে আর কোন উত্তম অন্বিষ্ট এখন অজ্ঞাত। বিভীষিকার হাত থেকে রেহাই পেতে আর কী প্রার্থনা করা যায়?... পায়ের দুটো নলির উপর কয়েকটা কাটামুণ্ড, খোলা এবং তাজা চোখসহ ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল আরো কয়েকটা লাশের স্তূপের দিকে, যেখানে পাঁচটি জ্যান্ত কচি শিশু বুকে হাত রেখে একদম ভ্যাবাচাকা চেয়ে আছে বেড়া দেয়া একটা বিরাট খাদের ধারে। প্রথমে তা-ই মনে হয়। বুঝি বেড়ার খুঁটি। চোখ কচ্‌লানোর পর সংযত দৃষ্টি জানান দেয় ওগুলো মানুষের হাত, সারি সারি অনেক দূর বিস্তৃত। ধড়হীন হাত। ক্ষোভ, প্রতিবাদ, ঘৃণা, অসহায়তা আঙুলের অবস্থানভঙ্গি থেকে উদ্ধার করা কঠিন। মানবগোষ্ঠী অথবা আকাশের মুখে লাথি-মারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচেষ্টারত উলঙ্গ রমণীর দুই ঊর্ধ্বমুখী পায়ের মাঝখানে বেয়নটের খোঁচা থেকে টাটকা রক্ত ঝরছে, আর মাটি থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে-একদল কুকুর। চাপ-চাপ কালো সীসার ভাস্কর্য কয়েক ফুট জুড়ে, এবড়ো-খেবড়ো জমিন, যার উচ্চতা কম'চে কম দশ ইঞ্চি। ভাস্কর্য নয়। আসন্ন মৃত্যুর মুখে পাঁচসাত জন, গোটা পরিবার জড়াজড়ি এক আলিঙ্গনে পার্থিব জীবনের সব স্বাদ মিটিয়ে নিতে চেয়েছিল, যখন আগুন এবং গুলির আঘাত তাদের নিমেষে স্তব্ধ এবং পরে দাহকার্য সমাপ্ত করেছে। মুসলমান পরিবার। কিন্তু হিন্দুদের মত শেষকৃত্য পেয়ে গেছে ইসলামী রাষ্ট্রে। কারণ, সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ তারা চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করতে চেয়েছিল। তাই শাস্তি, এই চরম শাস্তি। এমন কত বিভীষিকাময়ী ছবি। মানুষের খণ্ড খণ্ড কুঁচি যেন জ্যোতিরিঙ্গণ-বাহিনীর যাযাবরপনার মত বাংলাদেশের চারিভিতে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। চোখের অংশ, হাত-পায়ের অংশ খণ্ড, স্তন-উরুর ভাগ, বুকের টুক্‌রো...। তাই চোখের রেহাই নেই। ঘুম কী করে আসবে?

নৌকার দুলুনি। তবে জননী ক্রোড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চোখ বুঁজে গিয়েছিল গাজী রহমানের, হয়ত ঘুম আসত। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সে। কারণ, আর এক বিভীষিকার মিছিলের হাত থেকে মুক্তি পেতে সে হঠাৎ দৌড় দিয়েছিল ঊর্ধ্বশ্বাস। ঘাম দিয়ে খোঁয়ারি ভেঙেছে। সুতরাং আর শোয়ার ধারে কাছে থাকতে সে নারাজ।

বাইরে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রহমান শীতলক্ষার পানি আঁজলা-আঁজলা পান করার পর চোখে-মুখে ছিটোতে লাগল। কিছুটা মাথায় পর্যন্ত দিলে, বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। পূর্বে বহু রাত্রি ভয়ে ঘুমোয় নি সে। বরং বসে থাকা ভাল। তন্দ্রাচ্ছন্নতা কত ভয়াবহ হতে পারে তা সে জানে।

জলো বাতাস এবং পানির সিঞ্চন মারফত বেশ সোয়াস্তি অনুভব করেছিল সেদিন গাজী রহমান। বালকের মত আঙুল ডুবিয়ে রাখলে কতক্ষণ, নৌকার গতির সঙ্গে সমান্তরাল। এই সুড়সুড়ি অনেক শান্তির প্রলেপের মত মনে হলো। পা নদীতে ডুবিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ। তারপর এমন সব স্পর্শে অস্থিরতা কিছুটা কমে। একটু আগে মাঝির সঙ্গে কথাবার্তায় কী সুখের সন্ধান না সে পেয়েছিল। এখন কিছু নেই। আবার চারিদিক থেকে চারখানা পাঁচিল যেন এগিয়ে আসছে তাকে ঠেসে ধরতে। নদীর পানিতে ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দে জোরে জোরে পা ধুতে লাগল গাজী রহমান। শরীরের এই নড়াচড়া যদি সাহায্য করে। প্রত্যাশা অনেকখানি পূর্ণ হলো।

গাজী রহমান তীরবর্তী জীবনধারার দিকে আবার আকৃষ্ট। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক জিনিস দেখতে লাগল। উঁচু ভিটের উপর থেকে সরু রাস্তা নেমে এসেছে নদীর ঘাট পর্যন্ত। তার শাদাটে রেখার আঁক্‌বাক দু'পাশের সবুজ গুল্মলতার আবেষ্টনীর মধ্যে শুধু রং-মাহাত্ম্যে চোখের কাছে জানান দিতে থাকে। দুটো ন্যাংটো শিশু দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘরের পেছন দিকে। বুড়ো আঙুল মুখে গুঁজে দু'জনেই স্টীমারের হুইশেল বাজাবে। এই কৃষকপল্লীর অবস্থান দেখে মনে হয় না, কেউ কোথাও সরে গেছে। বেশি ঝোপঝাড় নেই যে, বিপদের দিনে কোনরকমে ওরা আড়াল হতে পারে। ঘাটে নৌকা বাঁধা চার-পাঁচ খানা। কিন্তু স্পীড্‌বোটের কাছে এসব খেল মাত্র। ধাওয়া করলে আর রেহাই থাকবে না। জানের ডর সকলের আছে। কাজেই ওদের জন্যে চিন্তা খামোকা। যুক্তির

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেই ধরতে পারার ফলে গাজী রহমান ক্রমশ প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে সক্ষম হয়। অন্তত বিভীষিকার উৎপাত গরহাজির। এত জ্যান্ত ছবি চোখের সম্মুখে। তাদের জুলুম অত কঠিন নয়। মৃত ছবির টুক্‌রো-টুক্‌রো তো নিগ্রহের মই চালিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার দ্রুততা এমন বাড়ে যে দিশাপাশ, কিছুই আর বোধগম্য হয় না, অথচ দুর্ভোগের গতি অকুণ্ঠ অব্যাহত থাকে। এই জন্যেই বোধহয় প্রেতের এত ভয় দুনিয়াময়। জ্যান্ত মানুষ স্থানকালের গণ্ডিতে পড়ে, সেখানে মৃতাত্মা লা-পরোয়া বেপরোয়া।

তিন-চারটে কুকুর গাজী রহমানের নৌকা দেখে অস্বাভাবিক শব্দে ডাকতে লাগল। একেই কান্না বলে সাধারণভাবে। ঢাকা শহরে সন্ধ্যার পর আজও কুকুরগুলো অন্য ধরনের ডাক যেন ভুলে গেছে। উ-উ-উ-রব একটু উঠে, তারপর খাদে নেমে আবার যে একটানা চলতে থাকে, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বগ্রামে একদম স্থির থাকে। আশ্চর্য, অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে কুকুরের বোধ আছে, অথচ পাঞ্জাবী অফিসার আর তাদের চামুণ্ডাদল একদম অজ্ঞান। হয়ত ওগুলো কুকুরের চেয়েও কোন নিচ পর্যায়ের জীব।

গাজী রহমান এই চিন্তার পর অবিশ্যি লজ্জিত হয়। আকৈশোর রবীন্দ্রবিলাসীর কানে বাড়ি মারে, 'মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারানো পাপ', এবং তা খোয়ালেই গোটা দেশের মানুষ সম্পর্কে অমন ভাবা যায়। কিন্তু সেদিন মনের মুখে শেষ পর্যন্ত লাগাম দিতে পারে নি গাজী রহমান। নৃশংসতার ছবিগুলো আবার হন্যে বিভীষিকার রূপ নিতে পারে, এই আশঙ্কায় সে বরং কুকুরদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগল। নেহাত জানোয়ারের দল, আবহাওয়া দূষিত করলে কয়েকবার ককিয়ে ককিয়ে, তারপর এক ছুট দিলে মাঠের দিকে। এইখানে নদীর পাড় সমতল। বেলেমাটি ঝুরঝুর ভেঙে ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের আঘাতে। পাখিদের গর্ত জায়গায় জায়গায় কালো কালো দাগের আভাস সৃষ্টি করেছে। বাইরের দিকে মন ছুটে গেলে হাজার চঞ্চলার মাঝে একটা প্রশান্তির ভেলা পাওয়া যায়। নিজের তোলপাড় আবেগের কথা ভুলতে বসেছিল গাজী রহমান। সত্যি বিস্মৃতির নিপট অন্ধকার ধেয়ে এল যখন সে দেখলে, বারোয়ারি অশত্থ গাছের নিচে একজন প্রৌঢ়া মহিলা এবং দশ-বারো বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সব নিরীক্ষণের আগেই মহিলা ডাক দিলে "ও মাঝি, বা-বাজান—।"

গাজী রহমান চোখ ফিরিয়েছে মাঝির দিকে। সে জবাব দিতে দেরি করেনি, "কি বু-জান?"

গ্রামাঞ্চলে সম্পর্ক এমন ছড়ানো থাকে। আকস্মিক যোগসূত্র কাউকে লজ্জা দেয় না।

"আমাদের একডু নিতা পারবা, বা-জী?" প্রৌঢ়া শুধায়।

— যাবেন কই?

— মরিচাখালি।

নৌকার মালিক তো আর মাঝি নয়। ইতস্তত করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, হুকুম নিতে হয়। মালিকের দিকে তাকানোর সময়ও তাকে ক্ষেপ করতে হয় না, যথা-জবাব উচ্চারিত হয়ে গেল, "আইতা পারেন। মাঝি নৌকা লাগাও।"

ছোট নৌকা। দু'জন আরোহী বাড়ল। মাঝি গাঁইগুঁই করতে পারত মেহনতের কথা ভেবে। হাওয়ায় আর আরামের ঘুড়ি ওড়ে না। বুটের ঠোক্করে থেঁতলে গেছে বাংলাদেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চেয়ে কষ্টদায়ক বোঝা আর কি আছে কোথাও?

এবার নিরীক্ষণের সুযোগ পায় গাজী রহমান। প্রৌঢ়া মহিলা শহরে আয়া বা রাঁধুনি শ্রেণীর। ঢাকা শহরে এদের বলা হয় মাতারি। বয়স হয়ত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। বেতরীবৎ মেহনত আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয়। তাই বেশ প্রৌঢ় দেখায় মাতারিকে। সঙ্গে বালক পুত্র। মাতারির হাতে একটি ছোট গাঁঠরি, এক হাতে লণ্ঠন। পুত্রের হাতে শুধু একটা তারের খাঁচা। ভেতরে এক হালি (গণ্ডা) সাদা বিলেতি ইঁদুর হৈচৈ জুড়েছে। পরিধানে হাফপ্যান্ট, ময়লা হাফশার্ট। ছেলেটাকে কিন্তু বেশ তেজী দেখায়। মা-ছেলে অনেক অপথ ধরে বহুক্ষণ হেঁটেছে, তা তাদের হাঁটু-তক্ কাদা এবং মুখের ঘাম দেখলে বুঝতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। শ্বেত গিনিপিগগুলোর দিকে চোখ পড়তে গাজী রহমানের কেন জানি ঈষৎ হাসি পেয়ে যায়। অবিশ্যি কিশোর বা তরুণদের খেয়ালিপনা প্রৌঢ়দের কাছ থেকে করুণা বা ব্যঙ্গ লাভ করে। গাজী রহমানের হাসি স্বতঃস্ফূর্ত। অবিশ্যি পরমুহূর্তে তার মনে হয়, পথশ্রমে দুইজনে নাজেহাল অথচ আর একটা বোঝা বাড়িয়েছে খামোকা।

বড় সঙ্কোচের সঙ্গে পায়ের কাদা ধুয়ে মা-ছেলে নৌকায় উঠল। বড় ম্রিয়মাণ প্রৌঢ়া মহিলা। মুখের ঘোমটা কিছু বাড়িয়ে দেয়। অথচ এতক্ষণ পর্দার কোন বালাই ছিল না। মেহনতী মেয়েদের কাছে সামাজিক অনুশাসন এইভাবে ঢিলে হয়ে যায়।

গাজী রহমানের চোখ বার বার মুষিক কুলের উপর গিয়ে পড়ে। সদা-ভীত এমন প্রাণি আর দ্বিতীয় নেই দুনিয়ায়। তাই বিহ্বল চোখ আর গোঁফ সদা-কম্পমান। গোটা বাংলাদেশকে গিনিপিগ বানানোর পূত সাধনায় মত্ত হানাদার সৈন্যবাহিনী। এই চিন্তা হঠাৎ প্রৌঢ় শিক্ষককে আহ্বান করে ফেললে। আবার মনের ভার বেড়ে যেতে পারে, আশঙ্কিত হয় গাজী রহমান। এসব এড়াতে সে বালকের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলে যথারীতি কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর।

"তোমার নাম ফালু। কেমন?" প্রশ্ন গাজী রহমানের।

"জী। ভাল নাম, মহম্মদ ইউনুস।" সংকোচহীন এমন জবাবে বিদ্যালয়ের বর্ষীয়ান পরিচালক খুব খুশি হয়।

— বাপ বেঁচে আছে?

গাজী রহমানের এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে বালকের মুখ অবনত, তড়িঘড়ি আর সে জবাব দিতে পারে না।

গাজী রহমান বুঝতে পারে, পিতা মৃত। কিন্তু ফালু যে মুখ নিচু করেছে আর তুলছে না। বিস্মিত শিক্ষক বালকের মুখাবয়ব এবার বেশ খুঁটিয়ে দেখে। পানি ঝরছে দুই গাল বেয়ে। মনে মনে অনুতপ্ত হয় গাজী রহমান। এমন পুরাতন ঘায়ে খোঁচা দেওয়া উচিত হয়নি। কচি বালক। অথচ মৃত্যুও এই বয়সে মাটিতে তার মুখ থুবড়ে দিয়েছে। বালকের অন্যদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন চিজ, যথা টফি বা ঐ জাতীয় কিছু সঙ্গে নেই। একটা গুমোট সৃষ্টি হয় এবার এখানকার সম্পর্করাজ্যে।

হয়ত মরিচাখালি পর্যন্ত এই মৌন অব্যাহত থাকত। কিন্তু মাতারি ঘোমটার প্রস্থ কমিয়ে তখন পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ অভয় দান করে।

— ফালু, উনারে ক'না, ব্যাডা। বা-জানরে আল্লায় নিছে না, মিলিটারি নিছে।

মাতারির কণ্ঠে সজলতার আভাস তার দৃষ্টির বিকল্প।

জননী আরো কিছু যোগ দিলে পুত্রের মূহ্যমানতা ঝেঁটিয়ে ফেলতে। কিন্তু ফালু শুধু নিঃশব্দে কাঁদে। তখন মাতারি নিজেই এগিয়ে এল। শুধু প্রাথমিক সঙ্কোচের বেড়া ছিল এতক্ষণ বাধা। নচেৎ সেও কম বাক্‌পটু নয়। এবার যোগাযোগ সোজাসুজি। মাঝখানে পুত্রের ঠেস অন্তর্হিত।

— মিলিটারি নিছে?

গাজী রহমান বেড়া ভেঙে দিতে আরো তৎপর।

— হ, মিয়াভাই। আল্লায় নিলে তো 'দিলে' বুঝ দিতাম, যার মাল হেই নিছে। নিল শয়তান মানুষে।

গাজী রহমানকে আর কোন প্রশ্ন করতে হয় না। মাতারি গটগট বলে যায়, তাদের বস্তি কীভাবে মিলিটারিরা আগুন লাগানোর পর গুলি করে করে মারতে লাগল, যাদের সামনে পেলে। মা-ছেলে কোন রকমে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তারপরও একমাস ঢাকায় কাটিয়ে এখন গ্রামে ফিরছে দুইজন। ছেলেটা বাপের বড় ন্যাওটা ছিল, তাই স্মৃতির ধাক্কায় অমন মুষড়ে গেছে।

মাতারির ঘোমটা আর বহাল নেই। গাজী রহমান প্রাচীন শিক্ষকের মত পরস্ত্রীর দিকে তাকাতে অনভ্যস্ত, তবু চোখে চোখ পড়ে গেল। নসিবের কাছে পয়জার শত খেলেও এই রমণী জীবনের মোকাবিলায় সক্ষম। বয়ান-কালে তার কণ্ঠে কোন জড়তা ছিল না। কিন্তু কথা শেষে সেও হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল এবং পুত্রকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমু খেতে লাগল।

গাজী রহমান অসোয়াস্তির মুখে আর ধরা দিতে নারাজ। ফালুর সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্কধারা আবার চালু করার পক্ষপাতী। নচেৎ মনের অনুশোচনা যাবে না। সেও তাই ফালুর পিঠে সস্নেহে হাত বুলাতে লাগল।

আদরের এই আতিশয্য হয়ত বালকমনের ঢেউ খাত-মত ফিরিয়ে আনলে। মা'র উপর সে ঈষৎ তেতে ওঠে, "তুমি কইলে না ক্যান মা, বা-জান আমাগো ধাক্কা দিয়ে পাশে ঠেইলা দিছল হালা খানকির পুতেরা যহন গুলি ছোঁড়ে। তাই বাজান মইরা গেলেন, আঁরা বাঁচলাম। আমিও হালাদের গুলি করমু।"

পুত্রের এই কুৎসিত গালি এবং আস্পর্ধায় শঙ্কিত মা হঠাৎ পুত্রের মুখ চেপে ধরে।

স্বাভাবিক হাওয়া বইছে। এই ফাঁকে গাজী রহমান তার হাত সরিয়ে নিয়েছিল।

নিষেধের স্বরে মাতারি বলে যায়, "অমন কতা কইতে নাই।"

— কইতে নাই, তোমারে লাটসাবে কইছে।

বেশ তাচ্ছিল্যের সুরেই সে আরো যোগ করে, "হালারা বা-জানরে মাইরব, আমার হে কথা কওয়াও নিষেধ? থোন আপনের লাটসাব।"

— চুপ, চুপ।

"চুপ করমু ক্যান? হিতাল্লাই (সেই জন্য) বাপজান, তোমারে না কইয়া ভাগছে।" পাল্টা দিতে দেরি করলে না দুরন্ত বালক।

মাতারি এবার শুধু স্তব্ধ হয়ে গেল না, মুখ ভার করে ছেলেকে এক পাশে সরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলে। অর্থাৎ সেও কম বিক্ষুব্ধ নয়।

সম্পর্কের ত্রিভুজে বিস্মিত গাজী রহমান আবার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী। সে সোজাসুজি মাতারিকে এমন সহসা-স্তব্ধতার হেতু জিজ্ঞেস করে।

প্রৌঢ়ার মুখজবানিতে জানা গেল আরো হদিস। স্বামী দিন-মজুর খাটত। স্ত্রী মাতারি। কিন্তু গ্রামে সতর-আঠার বছরের এক জোওয়ান ছেলে ছিল তার। বিঘা দুই জমি এখনও তাদের আছে। প্রৌঢ় স্বামীর পক্ষে চাষবাসের তদারকি, লাঙল ধরা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তাই গ্রামের ভার ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর। ঢাকা শহরে সে পিতামাতার খোঁজ নিতে এসেছিল মিলিটারি হামলার সাতদিন পরে। পিতার মৃত্যু এবং বহু মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। বড় ছেলের সঙ্গে মাতারি চলে আসতে পারে নি। কারণ বেতন বাকি পড়ে আছে। তদুপরি হঠাৎ গৃহস্বামীকে অসুবিধায় ফেলে আসা তার কাছে সমীচীন ঠেকে নি। কিন্তু কাল এক গ্রামবাসী খবর দিয়ে গেছে গত পনর দিন তার ছেলে ঘরে নেই। সেই মুক্তিফৌজে যোগদানের জন্যই বাড়ি ছেড়েছে। ছেলের বন্ধুদের মুখ থেকেই পরে ঘটনাটা প্রকাশ পায়। তাই শহর থেকে তারা গ্রামে ফিরছে।

গাজী রহমানের কিছু বলার থাকে না। তার বিস্ময় কেটে যায় অবিশ্যি। কিন্তু মনে মনে কষ্ট পায়, এই দুঃস্থ পরিবারের দেখার মত আর লোক নেই। দশ-এগারো বছরের বালকও চাষে খাটার অযোগ্য। তবু সান্ত্বনা দিতে হয়।

— ঘাবড়ান না। জোওয়ান ছেলে হয়ত ঘরেই আছে।

— না, ভাইজান। হে-ও এডার মত দুইদ্দা (দুঁদে)। দা'দ (প্রতিশোধ) নিতা যাইতা পারে। মুক্তিফৌজের কাম ত বালা (ভাল)।

এই অবোধ জননীকে কী বা জবাব দেবে গাজী রহমান? তাই নির্বিকার কণ্ঠে উচ্চারণ করে, "হ, বু-জান। বা'লা কাম।"

মাতারি আশ্বস্ত হয়। ফালুর চোখ তখন তার পোষা ইঁদুরের দিকে। আকাশে মেঘ কেটে আবার চড়া রোদ বেরিয়েছে। গরমে হাঁপাচ্ছিল প্রাণীগুলো।

ফালু এবার আবার নিজের স্বরূপে ফিরে গেছে। বিনা সঙ্কোচে সে গাজী রহমানকে শুধায়, "সাব আমার একডা উপকার কইরবেন?"

শিক্ষক দ্বিধান্বিত। কিশোরের মুখে কথাগুলো বড় পাকা-পাকা শোনায়। তবু ঠোঁটে মৃদু হাসিযোগেই সে অভয়দান করে, "কী কও।"

— আমার ইঁদুরগুলান আপনের ছৈয়ের ছায়া রাখমু?

এতক্ষণ সেদিকে গাজী রহমানের খেয়াল ছিল না বিধায় সে মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়। শুধু প্রাণী কেন, ওদেরও সে ভেতরে জায়গা দিতে পারত। আর একটু পরে মা-ছেলে নেমে যাবে। আর এক আওড় মাত্র। এখন আর আমন্ত্রণ দিয়ে ওদের অপমান করা উচিত হবে না। মূক ইঁদুরগুলো অন্তত ছায়ার বিশ্রাম পাক।

খাঁচার মধ্যে একটি মাটির পেয়ালা বসানো। ফালু তা বের করে পানি-বোঝাই দিলে। পিপাসু ইঁদুরগুলোর জলপান দেখায় ব্যস্ত থাকে সে। মাতারি তখন তার পথে-পাতানো অগ্রজের সঙ্গে কথা বলে।

— ভাইজান, আবলা প্রাণী। ভাবলাম থুইয়া আসি। কিন্তু ভাবলাম, এগুলার কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত্ন নিল না। বেগর খাওয়া মইরা যাইব। জান্ হগ্গলের সমান।

"মা, খাঁচা বইতে আমার জান্ যায় গা। তবু ইঁদুর রাখখ্যা আসতাম না।" ছেলে মাঝখানে ফুট কেটে বসল। মা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

— ফালুও তাই কইছিল। বেগর খানা মইরা যাইব।

খাঁচার মধ্যে তৃপ্ত মুষিকবৃন্দ তখন বেশ ছুটোছুটি করতে লেগে গেছে। মা-ছেলের কথা আর শেষ হয় না। ইঁদুরগুলো তাদের ফেলে আসতে হয় নি, সেই সান্ত্বনার আশ্বাসই বার বার ঘাই মারে। মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের সুযোগ, হোক ক্ষুদ্র প্রাণী, কী কম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মহামারী মৃত্যুর মুহূর্তে মুহূর্তে প্রসরিত মুখ-গহ্বরের নিচে কয়েকটি জীবের বাঁচানোর ওই সংকল্প, গাজী রহমানের কাছে মনে হয়, বিরাট কৌতুক তামাশা। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে শুধরে নেয় এবং আত্ম-সম্বোধনে মগ্ন অস্ফুট উচ্চারণ করে—

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি...।"

৩

কান খাড়া করলেন রেজা আলি।

উত্তর-পঞ্চাশে তার ঘুম কমে গেছে। প্রবীণ উকিল মামলা নিরিখ শেষ করে বিছানায় যেতে যেতে বারোটা বেজে যায়। আজকাল অবিশ্যি সে বালাই নেই। কোর্টকাচারি প্রায় বন্ধ। শ্মশানপ্রহরিরা দু'চারজন শুধু হাজিরা দেয়। তবু ঘুমাতে পারেন নি তিনি। গত হপ্তা থেকে নিদ্রাহীনতা আরো বেড়েছে। বাইরে থেকে শব্দ এলে উৎকর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ শব্দভেদী বাণের প্রাচুর্যে এখন বাংলাদেশ পৌরাণিক যুগকে ছাড়িয়ে গেছে।

ঠক্-ক্ ঠক্...।

মফস্বল শহর এত রাত্রে নিঃশব্দ হয়ে যেত বহুকাল থেকেই। আজকাল এখানে দিনরাত্রির ফারাক নেই। দুপুরেও গা-ছমছম করে। প্রথমে পাকবাহিনী এক নাগাড় বোমাবর্ষণ মারফত গোটা শহরটা ছারখার করে দিয়েছিল। তারপর আসে সাক্ষাৎ হামলা। শহরে একটা প্রাণী ছিল না। একমাসে কিছু কিছু লোক ফিরে এসেছে নিতান্ত দায়ে ঠেকে অথবা ঘরবাড়ির হাল-হকিকৎ নিতে। সিপাইদের কিছু স্থানীয় সহচর অবিশ্যি বহাল তবিয়ৎ আছে, ঠাটের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটে। তারা এসেছে ইহকাল এবং পাকিস্তানকে গুছিয়ে দিতে। একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল পবিত্র ইসলামের মন্ত্র ফুঁকে। তা ধ্বংস হয়ে যেতে দেওয়া যায় না। পরকালে আল্লার কাছে জবাব দিতে তো হবে। তাই কত্‌লে আ'মের পর কত্‌লে খাসে তারা কিছু কিছু সাহায্য করছে। সঙ্গে লুঠতরাজ, ফরজের (অবশ্যপালনীয় শাস্ত্রীয় কর্তব্য) সঙ্গে ওয়াজেবের (যা বাধ্যতামূলক নয়, শাস্ত্রীয়ভাবে) মত। যুদ্ধক্ষেত্রে লুঠ বলে কিছু থাকে না। অন্তত মধ্যযুগের আরবে তা ছিল না।

শহরের স্তব্ধতা প্রেতপুরীর মত। এখানে আর যা-ই হোক, বাস করা অসম্ভব। রেজা আলি এক বিশ্বস্ত চাকরকে নিয়ে শহরে কেন এসেছিলেন বলতে পারবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির বহু দূরে থাকতেন তিনি। আর রাজনীতিবিদ্ বন্ধুর অবিশ্যি অভাব ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, মুসলিম লীগার দেখলে, তার কাছে মনে হতো, সে একটা সাপ দেখেছে। যৌবনে স্রেফ নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের আওতায় গড়ে-ওঠা মন। কিন্তু বড় চাপা আলি সাহেব। বাইরে বড় চুপচাপ থাকতেন, এ-সব কাউকে জানতে দিতেন না। তাঁর শহরে আবির্ভাবের হয়ত নানা কারণ ছিল। গ্রামের একঘেয়েমি সহ্য করতে পারেন নি। অথবা নিঃসঙ্গ থাকার আকস্মিক লোভ তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

মোটাসোটা, ভারিদেহ, থলোথলো, মুখাবয়বে একরাশ শাদা-পাকা গোঁফ— এই মানুষ কিন্তু বাইরে অসম্ভব গম্ভীর হলেও ভেতরে বেজায় মজলিসী। নচেৎ বন্ধুসংখ্যা নানা ধরনের এবং অনেক হয় কীভাবে?

এক মাস আগে থেকে রেজা আলির জীবনেও ঝড় উঠেছিল। আগে জীবিকা এবং সংসার পালনের মধ্যে তার সময় কেটে যেত। এক আইনের প্রশ্ন ছাড়া আর কোন প্রশ্ন অতি তীক্ষ্ণতায় জবাবদিহি করত না তাকে। সংসারের ছোটখাট ক্ষয়ক্ষতি সরস প্রাণ কোন রকমে সঙ্গতির ভেলায় তুলে দিতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষয়ক্ষতির পরিধি যখন স্তূপের উপর বিরাট জগদ্দল রচনা করে, তখন সরস প্রাণ বোধহয় শুকিয়ে যায়। রেজা আলির ক্ষেত্রে অন্তত তা-ই ঘটেছিল। এত মৃত্যু— দীন এবং অসহায়— আর এক সঙ্গে তিনি কোনদিন দেখার সুযোগ পান নি। তাজা প্রাণ-মুকুল থইথই করছে পথঘাট জুড়ে, ঘরের আঙিনায়, জলা-জাঙালে, নদীর উপর— কত না সুগম-দুর্গম এলাকায়। হঠাৎ কয়েক লহমা। সব শুকিয়ে গেল অথবা কালো ছাই হয়ে গোটা দেশে লেপে দিলে। দিনের পর দিন এই সব ছবি তাকে রেহাই দিত না, চোখ বুজলেই দেখতে পেতেন, মানুষ নিজের ভগ্নাংশ হয়ে কীভাবে আবর্জনার সামিল পড়ে আছে অথবা মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। পরিতৃপ্ত শেয়াল এবং শকুন তাদের স্মৃতিস্তম্ভরূপে জানান দিচ্ছে : এখানে একদা মানুষ ছিল। একটা দৃশ্য, প্রায় তিন দিন তাকে আহার স্পর্শ করতে দেয় নি। উঁচু বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল নিচে প্রায় শুষ্ক সরু নয়ানজুলির উপর পাঁচজনের এক পরিবার। বোধহয়, বাঁধের দু-এক ফুট নিচে ঝোপের মধ্যে তারা লুকিয়ে ছিল। কারো চোখ পড়বে এমন সম্ভাবনা ছিল খুব কম। অতর্কিত কোন দিক থেকে এলোপাতাড়ি মেশিনগানের গুলির চোটে সবাই গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পনর ফুট, মুখ থুবড়ে বা অন্যান্য যৌগিক আসনের কায়দায়, ছিটকে পড়েছে। আশ্চর্য, একটা শিশু, হয়ত ছ-সাত মাসের, মা'র চুল মুঠিয়ে ধরেছিল। তার বদ্ধমুঠি এখনও অটুট, মা'র সিতানের দিকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সমস্ত লাশের উপর সটান পড়ে ছিল এক বৃদ্ধ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কর্তব্য তিনি মৃত্যুর পরও পালন করে গেছেন। আজীবন ক্ষেমঙ্কর, সকলকে দেখাই তো ছিল তার দৈনন্দিন আনন্দের উৎস। গোটা পরিবারের ছায়াশ্রয় তখনও নিজের ভঙ্গি পরিত্যাগ করে নি। একটি বালিকা পিতার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে, যদিও তার মুখ নাকের ডগা থেকে অনেকখানি উড়ে গেছে।

রেজা আলি গ্রামবাসীদের সহায়তায় পরে এদের কবর দিয়েছিলেন, অবিশ্যি একই কবরে। শেষকৃত্যের ত্রুটি রাখেন নি। মৃত্যু তো বহু চোখে পড়েছে। কিন্তু কারুণ্যপরিচায়ক অবস্থানভঙ্গির জন্যে রেজা আলির চোখ থেকে তা মুছে ফেলা অসম্ভব ছিল। আইনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজত্বে উকীল প্রয়োজন হয়। সেদিন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অন্তত আদালতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে। রক্ষক-ভক্ষকের এমন মহাসভায় আইনজ্ঞ অবান্তর। একপাল নেকড়ে জনপদের ভেতর দিয়ে মাংসাহার-পর্ব শেষ করে যেতে যেতে চিৎকার দিচ্ছে এবং ক্ষুধাহীন বিধায়, সম্মুখস্থ জীবন্ত সবকিছু সংহার করছে, কিন্তু উদরস্থ করছে না। এই কারুণ্যই হায়েনাদের মহত্ত্ব এবং আইন। রেজা আলির এমন উপলব্ধি কিন্তু সত্যি আকস্মিক। শ্মশানে বৈরাগ্য আসে। না, তার বর্তমান মানসিক অবস্থা কেবল পরিবেশ-জাত ব্যাপার নয়। তার সক্রিয় মন জীবন-প্রবাহের নকশা দেখতে পেয়েছিল। হয়ত বহুদিন অনেক সৎ মানুষের সংসর্গ ফল অলক্ষিতে কাজ করে গেছে। যা-ই হোক, উকিল রেজা আলি তার পুরাতন খোলসে আর ঢুকতে পারলেন না।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দে তিনি বেশ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। ঠক্-ঠক্-ক্...।

ক'টা বেজেছে জানার উপায় নেই। টর্চের ব্যাটারি শেষ। রাত্রে শহরে কেউ বাতি জ্বালে না। কারণ, তোমার অবস্থান-পরিচয় তোমার কাল, বা কাল না হোক, বিপদ হতে পারে।

কয়েকদিন আগেই তো একটা ঘটনা ঘটল। এক ব্যক্তি মৃদু আলোয় বাইরের জগতের কোন বেতার স্টেশনের সংবাদ শুনছিল। নিভাঁজ অন্ধকারে একটা জোনাকি একটা ঝাড়বাতি বা শ্যান্ডেলিয়ার। দুই পাঞ্জাবী জওয়ান যথাস্থানে উপস্থিত। দরজায় করাঘাত। গৃহস্বামী কর্তৃক দুয়ার উন্মোচন। 'শালা, হিন্দুস্থানি রেডিও শোন্‌তা হ্যায়?'

— নেহি। আপ দেখিয়ে। ইয়ে রেডিও লুক্সেমবুর্গ হ্যা।

— নেই শালা, তোম চাক্‌কা উধর সে হিলা দিয়া।

গৃহস্বামী কী আর জবাব দেবে? ট্র্যানজিস্টারখানা হাতে ঝুলিয়ে গট্‌গট দুই সিপাই বেরিয়ে গেল। সৌভাগ্যবান বটে গৃহকর্তা! অল্পের উপর দিয়ে গেছে। প্রাণের কাছে তিনশ' টাকা মূল্যের জিনিস কিছু নয়। ঐ ভদ্রলোকের বৃদ্ধা জননী একটা খাসি মানৎ করেছেন। আগামী শুক্রবার তা শোধ হবে।

রেজা আলির কিন্তু আর কোন সন্দেহ থাকল না। করাঘাত তারই দরজায় এবং নিচের তলায়। ভৃত্যকে জাগিয়ে তোলা এত রাত্রে অন্যায়। তাছাড়া অপমানের বোঝা যদি কপালে থাকে, দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী?

অন্ধকারে একটা মোমবাতি আর দেশালাই হাতে হাতড়ে-হাতড়ে তিনি দোতলা থেকে নেমে এলেন। দরজায় করাঘাত এবার একদম মৃদু নয়। অতিথির বে-সবুর মন হাতে প্রবেশ করছে।

দরজার পাল্লায় একদম কান ঠেসে ধরে রেজা মুখ খুললেন, "কৌন হ্যায়?"

উর্দু জবান, কিন্তু ওদিক একদম স্তব্ধ করে দিলে, আর কেউ করাঘাত করে না।

অসোয়াস্তিকর নীরবতা দুই দিকে। কারণ, এদিক থেকে যেমন 'কৌন হ্যায়' বেরোয় না, অন্য দিকেও তেমন সব চুপচাপ।

রেজা আলির সন্দেহ এবার উদ্বেগে পরিণত হয়। তার কান অত্যন্ত পরিষ্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দের অবস্থান সম্পর্কে তার হদিস নির্ভুল।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। রেজা আলি পুনরায় মুখ খোলেন, "কে?"

ভাষান্তর ম্যাজিকের কাজ দিলে। করাঘাত ফের চালু হলো। তারপর বন্ধ মাত্র ফিসফিস আওয়াজ শোনা গেল, "আমি গাজী।"

— কে?

— আমি গাজী?

কানখাড়া রেজা আলির আর শুনতে ভুল হয় না, যদিও অতি অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। তারপর তার দরজার খিল এবং তস্করেরোধী হুঁড়কো খোলার ব্যস্ততাটুকু দেখার মত। তাড়াতাড়ি মোমবাতি জ্বালাতে যা সময় যায়।

দরজা সামান্য খুলেই এক হেঁচকা টানে গাজীকে ভেতরে টেনে নিয়ে রেজা বলেন, "মোমবাতিটা ধরো।" আবার তস্কররোধী প্রয়াস। তারপর তিনি মোমবাতি হাতে বন্ধুকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিলেন।

দোতলার এক কামরায় এতক্ষণ জানালাগুলো খোলা ছিল। রেজা আলি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলেন। মোমবাতির আলো কিন্তু বাইরে যত নিষ্প্রভতাই হোক, আলোত্ব তো ঘুচবে না।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পাট সারলেন না তিনি। সোজা চোটপাট শুরু করলেন রেজা আলি, "তুমি এখনও এদেশে আছ? তোমার মাথাটা চিরকাল খারাপ দেখেছি, এই বয়সেও তার আর উন্নতি হলো না।"

— এদেশ ছেড়ে কোথায় যাব?

"আচ্ছা সে-কথা পরে হবে, এখন একটু জিরোও। ওই চেয়ারে বসো। এত রাত্রে এসেছ। কী খাবে বলো?" কথা শেষ করেই রেজা আলি মোমবাতি নিভিয়ে জানালা খুলে দিলেন।

ঝিরিঝিরি বাতাস ঢুকতে লাগল কামরায়। গাজী রহমান মুখ খুললেন, "শোনো, যা দরকার পরে বলব। এখন খিদে নেই। যদি ভুক্ পায় আমার ব্যাগে মুড়ি আর চিনি আছে, চলে যাবে।"

— আমি ভেবেছিলাম, এত শিক্ষক, অধ্যাপক— প্রায় বাষট্টি জনকে পাঞ্জাবীরা কত্ল করেছে, তুমি নিশ্চয় আর বেঁচে নেই। শেষে খবর পেলাম তোমাকে ওরা ধরতে পারে নি। কী যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম সেদিন!

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রেজা আলি গাজী রহমানের দিকে। এমন উত্তাপমুখর করমর্দনে আর কোনদিন তাদের দুই হাত মিলিত হয় নি। প্রায় কিশোরকালীন হৃদ্যতার আভাস ফুটে ওঠে যুগল প্রৌঢ়ের মধ্যে।

"কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে?" হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন রেজা আলি।

— পলাতক জীবনে আশ্রয় থেকে আশ্রয়ান্তরে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন রেজা আলি এবং বললেন, "চোর-ডাকাত, খুনীর দল সদম্ভে ঘুরে বেড়ায় আর সাধুসন্ত লোকচক্ষুর আড়ালে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে মাথাগোঁজার জায়গা খোঁজে। কিন্তু এ আমি আর সহ্য করব না।' প্রায় চিৎকার দিতে গিয়ে থেমে

গেলেন পেশাদার উকিল।

— তুমিও দেখছি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ।

"অন্যায়ভাবে ক'টা লোভী জানোয়ার গোটা বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, তুমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে রাজনীতি বলো?" রেজা আলির কণ্ঠে ক্রোধ, ক্ষোভ, প্রশ্ন একসঙ্গে মাথাচাড়া দিতে থাকে।

"তারই নাম রাজনীতি।" খুব সহজ গলায় উত্তর দিলে গাজী রহমান এবং আবার যোগ করলে, "তোমাকে রাজনীতি করতে হবে না।"

— তুমি গাজী রহমান, একথা বলছ? সারা জীবন শিক্ষকতার আদর্শ সামনে রেখে, যে সামাজিক সকল প্রশ্নে মাথা ঘামিয়েছে, স্ত্রী-পুত্রের দাবি ভালমত মেটায়নি, তার মুখে এই কথা?

কামরায় দক্ষিণ দিকে জানালার পাশে দু'জন শোয়ার মত একটা মামুলি খাট পাতা ছিল। মেঝের মাঝখানে ফাঁকা। উত্তর-পূর্ব কোণে জানালার ধারে দুটো বেতের চেয়ারে বসা ছিল সাবেক দুই বন্ধু। খাটের তলায় একটা খসখস শব্দ ওঠে। গাজী রহমান এখন এত শব্দ-সচেতন যে তার কান এড়ায় নি। ফলে চোখ সেদিকে ধাওয়া করে। ঝাপসা অন্ধকার। পুরোপুরি সব ঠাওর অসম্ভব।

গাজী বললে, "খাটের তলাটা দ্যাখো তো, রেজা। মোমবাতি জ্বালো। সাপ-টাপ হতে পারে।"

কিন্তু একটা জ্যান্ত মানুষ তলা থেকে মাথা বের করে, "সাপ নয়", উচ্চারণের পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং বলে, "দুইজনে কাজিয়া করে ঘুমটার দফা দিলে।"

কণ্ঠস্বর অতি চেনা। গাজী রহমান বিস্ময়ে আপ্লুত, বলে উঠল, "কিরণ রায়, তুমি? এখানে?" তিনজনেই বাতি না থাকায় ছায়ামূর্তি। কিন্তু খাটের তলা থেকে নির্গত ছায়া একদম দানবের কায়া থেকে বেরিয়েছে। তা সোজা এগিয়ে এসে চেয়ারে উপবিষ্ট গাজী রহমানের দুই কাঁধে হাত রেখে বললে, "আমার ঘুমটা দুজনে তর্ক জুড়ে নষ্ট করলে তো।"

— খাটের নিচে? তুমি তো আচ্ছা বোকা।

— কেন, আহম্মকি কোথা দেখলে?

— মিলিটারি হলে তো ইঁদুরের মত ধরা পড়তে।

— আজীবন বিপ্লবীকে সবক দিচ্ছে স্কুলমাস্টার। এই জন্যে আদালতে তোমাদের সাক্ষী বারো বছর পেশায় থাকার পর অচল হয়ে যায়।

উভয়ের কথাবার্তার বহুদিনের অন্তরঙ্গতা স্পষ্ট। কিরণ রায় কিছু অত্যুক্তি করেন নি। কৈশোর-যৌবনে তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। জেলে সাম্যবাদে হাতেখড়ি, পরে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ। দেশ বিভাগের ফলে আত্মীয়স্বজন সকলে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিল। কিরণ রায় কিসের মায়ায় এদেশে পড়েছিলেন সহজে বলা শক্ত। নিজের প্রতি করুণায় মাঝে মাঝে তিনি জবাব দিতেন, 'ইলিশ মাছের লোভে।' এ-সব রসিকতা মাত্র। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল, তা কোনদিন হারান নি। ঠিক দেশ বিভাগের পূর্বে সন্দীপের চরে উন্মত্ত মুসলমান জনতা কর্তৃক লালমোহন সেনের নিহত হওয়ার সংবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে কিরণ রায় মন্তব্য করেছিলেন, "পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণ একদিন এই খুনের প্রায়শ্চিত্ত করবে, যার আন্তরিকতার স্বরূপ পৃথিবীতে কোনদিনও কোথাও দেখা যায় নি। আমি চিনি এদের।" তাঁর ভবিষ্যৎ বাণি সফল হতে চব্বিশ বছর কেটে গেছে। উত্তর-ষাট বয়সের বৃদ্ধ কিরণ রায় এখনও এই দেশে আছেন সকল ঝড়ঝাপটা মাথায়। জনসাধারণের সকল সুখ-দুঃখের শরিক, ত্যাগ-তিতিক্ষা-সহিষ্ণুতার প্রতীক।

গাজী রহমান অনুভব করে, বজ্রদীর্ণ এই এক শালতরু এত ঝড়ের মধ্যেই কী নির্বিকার! অথচ সে ব্যক্তিগতভাবে এক বান্ডিল নার্ভ, সহজে এমন মুষড়ে পড়ে যে, চিন্তার ক্ষমতা পর্যন্ত ঘুলিয়ে যায়। সম্বোধনে তুমি-শব্দ যোগসেতু। কিন্তু রায়ের প্রতি গাজীর সমীহ আকাশচুম্বী।

রেজা আলির সিগারেট খাওয়ার বাতিক আছে। কামরার অন্ধকারে দেশলাই জ্বালানোর ঝলকে গাজী একবার কিরণ রায়ের মুখখানা দেখে নিলে। তিনি তখনও তার সামনে ঝাপসা দাঁড়িয়ে। ঠোঁটে মৃদু হাসি। জীবনবোধের অনেক গভীরে প্রবেশাধিকার যাদের আছে, তারাই শুধু এমন ভাবলেশহীন গিল্টির কারবারি অথবা নানা দিকের টানে নাজেহাল অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার কারিগর। বিষে কণ্ঠ নীল। কিন্তু গোটা অবয়বে প্রাণদীপ্তি সাঁতার কাটে রামধনুর আদিগন্ত বিস্তার ছড়িয়ে।

গাজী রহমান নিজের কাঁধের উপর রক্ষিত কিরণ রায়ের দুই হাতের উপর আঙুলের চাপ দিয়ে বলে, "বসো, বসো। লড়ায়ে লোক। দেখা হলো প্রায় মৃত্যুর পর, কিছু কুশল জিজ্ঞেস করবে, না ঝগড়া শুরু করে দিলে।"

খাটের দিকে এগিয়ে বসে পড়লেন কিরণ রায় এবং বললেন, "লড়ায়ের ময়দানে আছি, ভায়া। এখন ছোটখাট সেন্টিমেন্টের দিকে নজর দেওয়ার সময় কোথা? তবে আসল কথাটা বলে রাখা যাক। পরে ভুলে যেতে পারি। কেউ তো আর তরুণ স্মৃতিধর বা শক্তিধর নই। তুমি ঠিক বলেছ।"

"কী ঠিক?" বিস্মিত গাজী রহমান প্রশ্ন করে।

— রেজা আলির রাজনীতির দরকার নেই।

"সারা জীবন রাজনীতির পর, তুমিও! ব্রুটাস।" রেজা আলি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

— অত বেসবুর হয়ো না। অবস্থা অনুযায়ী কাজের ধারা আছে, কৌশল আছে।

"কী রকম?" রেজা আলির মুখ দেখা যায় না। কিন্তু গলা জানান দেয়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু আস্থাহীনভাবে আমেজ।

— এই যে আমি নির্বিবাদে তিন হপ্তা তোমার কাছে কাটিয়ে দিলাম, তার কারণ, তোমার রাজনৈতিক রং নেই। এখন প্রয়োজন হলে তুমি নিজেকে মুসলিম লীগার বলেও জাহির করতে পারো।

— তোবা, তোবা। ওই বেজন্মাদের আমি কোনদিন প্রশ্রয় দিই নি। আর এই বয়েসে—।

তাকে কিরণ রায় কথা শেষ করতে দিলেন না, বরং পালটা বাণবৎ উত্তর ছাড়লেন, "বামুন নতুন গোমাংস খেতে শিখলে তোমার মত কাণ্ড করে বসে। রয়-সয় ব্যাপার নেই। একবার গন্ধ পেলেই হলো, পৈতা খুলে দৌড়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেজা আলি প্রতিবাদ করার সুযোগ পেলেন না। গাজী রহমান বলে বসল, "আমারও তাই মত। এই জন্যেই আপত্তি তুলেছিলাম।"

"তোমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিপক্কতা দেখে আমি খুব খুশি, গাজী রহমান।" কিরণ এই রায় উচ্চারণের পর পরমুহূর্তে যোগ করলেন, "কিন্তু।"

অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না। নোক্তা কার জন্যে, এই নিয়ে রেজা এবং গাজীর মধ্যে সন্দেহ দোলা খায়।

শেষে কিরণ রায় ধন্দ দূর করে দিলেন, "কিন্তু গাজী রহমান, তুমি কোন্ সাহসে এতদিন এইভাবে আছ। শুনতে পারি?"

"কোথায় যাব?" গাজী রহমান বেশ অসহায়ের মত শুধিয়ে বসে।

— কিন্তু এইভাবে তুমি দেশের কী কাজে লাগবে? সদা জান্ নিয়ে টানাটানি। তারপর জান বাঁচানোও শিখতে হয়, তুমি তো কিছুই শেখো নি।

— কেন?

— আন্ডার-গ্রাউন্ড থাকা শিখতে হয়। তুমি বেঁচে আছ ওদের দয়ায়। জাতীয়তার পরিচয় দিয়েছে বটে পুলিশ-ভায়েরা। পাঞ্জাবীরা যদি বাঙালি পুলিশের মদৎ পেত তুমি এবং আরো বহুজন কবে কূপোকুৎ হয়ে যেত। এখনও সময় আছে, কেটে পড়ো।

— কিন্তু ভেগে গেলে আমি দেশের কী কাজে লাগব?

— কিছু কিছু মুক্ত এলাকা আছে, সেখানে তোমার মত প্রবীণ শিক্ষক গেরিলা-শিবিরে বক্তৃতা দিতে পারে। যুদ্ধ তো শুধু অস্ত্রের কাজ নয়। কেন লড়ছি, কিসের জন্য লড়ছি, তার সঠিক হদিস যদি জানা থাকে, তাগদ অনেক বেড়ে যায়।

— তা তো বুঝলাম।

— সেই জন্যে তুমি বিপ্লবী সেজেছো। বয়সও তো দেখতে হয়।

— তোমার বয়স কত?

— আমি তো আজীবন বিপ্লবে সবক নিয়েছি। তারপর শরীরটা দ্যাখো। যৌবনে যখন সন্ত্রাসবাদী ছিলাম—!

কিরণ রায় চুপ করে যান। কিন্তু গাজী রহমান এবং রেজা আলি কথার খেইয়ের সঙ্গে এক ঘটনা অবলোকন করেন আরো নিঃশব্দে। শোনা যায়, কিরণ তার সন্ত্রাসবাদী আমলে এক বিশ্বাসঘাতক কর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাঁশবনের অন্ধকারে গলা টিপেই শেষ করে দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়া কতটুকু? সেদিন রাত্রে আর আহার করেন নি, এক গ্লাস জল খেয়ে দিব্যি ঘুম দিয়েছিলেন। সেই আসুরিক শক্তি আর কিরণ রায়ের নেই, কিন্তু ধকল সহ্যের ক্ষমতা এখনও বহু তরুণকে লজ্জা দেবে।

"থাক সেকথা—", কী ভেবে কিরণ রায় আবার প্রসঙ্গের জের টানেন, "তোমার পক্ষে এই বয়সে পেখমধারী বায়স-ময়ূর্ সাজা অসম্ভব।"

"আমিও তাই বলি", রেজা আলি সায় দিলেন। পরিবেশ বেশ তেতে উঠেছে দেখে তিনি তখনই আবার কথার মোড় ফেরান, "গাজী দ্যাখো খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করি।"

"না, শুধু হাত-মুখ ধুতে পারলেই হবে। ঠিক ঘুম আমার না। আজ দেখা যাক।" খুব নির্লিপ্ত গলায় উচ্চারণ করলে গাজী রহমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নিচে গেল জলের সাহায্যে সব দিক থেকে কিছু ঠাণ্ডা হতে। তখন কিরণ মুখ খুললেন, "শোনো রেজা, ওর পালানোর বন্দোবস্ত আমাদেরই করতে হবে।"

'বন্দোবস্ত।' রেজা আলি সাবাসি নেওয়ার ভঙ্গিতে শব্দ তুলে যোগ দিলেন, "তা আমি আগেই করে রেখেছি। অনেকের কথা আমার মনে পড়েছে। এমন কি তুমিও বাদ যাও না।"

"আমার কথা তোমার ভাবতে হবে না", রেজা আলিকে নিরস্ত করলেন কিরণ রায়।

"এই এক জায়গায় আমি তোমাকে পেয়েছি।" রেজা আলি টেক্কা দিতে পেরেছে অন্তত একটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিপক্ষ যেখানে ঝানু রাজনীতিবিদ। কাজেই আত্মশ্লাঘায় তিনি ফেটে পড়লেন, "এখানে তুমিও কাঁচা বলব না, ঠিক ধরতে পারো নি"

কিরণ রায় খুব জেদী বা পরমত-অসহিষ্ণু ব্যক্তি নন, সাধারণ বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। তিনিও কিন্তু কিঞ্চিৎ দমে যান এবং অনুজস্থানীয় বন্ধুর দিকে তাকান, যদি কোন রেখাপাত করা যায়। গৃহ অন্ধকার বিধায় সেদিক থেকে কোন সাহায্য আসা বন্ধ। তাই কিছু অধৈর্যের মত ধমক তিনি দিলেন, "রেজা, হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা কী বলে ফেলো। রাতও বেশ হয়েছে। গাজী এলে ঘুমোনোর বন্দোবস্ত করতে হবে। ওর চেহারা দেখে বুঝা কঠিন নয়, এ-সবের জন্যে বেচারা প্রস্তুত ছিল না।"

আলো থাকলে কিরণ রায় দেখতে পেতেন, ঝানু উকিল ঘায়েল সাক্ষীর দিকে যেভাবে তাকায়, রেজা আলি সেদিন একই ভঙ্গিতে অগ্রজ-বন্ধুর মুখের উপর লেন্স ফেলেছিলেন। সঙ্গে কিঞ্চিৎ অনুচ্চরব হাসি। অবিশ্যি সমীহার গোড়া না ফেঁসে যায় সেদিকেও রেজা সাহেবের লক্ষ্য আছে। তাই তাড়াতাড়ি বাকি্য খালাস করেন, কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত, বেশ সিরিয়াস, "এমন আর কোথাও হয় নি!"

— কী?

— একটা সভ্য দেশের আর্মি খুঁজে খুঁজে তার মাইনরিটিদের মারছে, যেখানে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। এটা তুমি লক্ষ্য করো নি, তাই আগেকার মত নিজের বিপ্লবী ইলেমের উপর আস্থা রেখেছ।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ। প্রথম এক মাস বাঙালি মেরেছে। হিন্দু-মুসলমান বাদ-বিচার নেই। এখন দেখে দেখে হিন্দু নিধন করছে। এইভাবে হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ আনা যাবে, বেজন্মারা ভাবছে। সেই পুরাতন কায়দা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জের ও পুরাতন কৌশল। জিন্না সাহেবের জন্মদত্ত জোঁক।

কিরণ রায়ের অগাধ শ্রদ্ধা বেড়ে যায় প্রবীণ উকিলের প্রতি। এক বিরাট পরিতৃপ্তি তার বুকে। মানুষটা ভাল। শুধু এই সূত্র ধরে বহুদিন আগে রেজা আলির সংস্পর্শে আসেন এবং কোনদিনই তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন না। গত আঠার বছরে সেই ব্যক্তি তার কত কাছাকাছি। অথচ রাজনীতির মাপকাঠিতে রেজা তো ব্রাত্য। বেসবুর হয় বিপ্লবীরা। জানে না, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মত মানুষ পাকিয়ে তোলা যায় না।

— তুমি ঠিক ধরেছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মচিন্তায় বুঁদ কিরণ রায় সঙ্গীর কথায় সায় দিলেন।

— তাই তোমার দেমাক বিবেচনাপ্রসূত নয়। তাছাড়া কত মুসলমানকে লুঙ্গি তুলে প্রমাণ করতে হয়েছে, সে মুসলমান।

— এখনো তো ফেল হয়ে যাবো, রেজা।

কিরণ রায় তারপর খিক্‌খিক্ হেসে উঠলেন এবং বললেন, "বহু পরীক্ষা পাশ করেছি এক এক সংকটে। তোমাকে বলতে কী! প্রেমের বন্ধনও বহু বছর আগে ছিঁড়তে হয়েছিল। আগে সন্ত্রাসবাদী ছিলাম। এক রকমের ধর্মীয় আচ্ছন্নতা বহুদিন ঘিরে রেখেছিল। বিশ্বাস করতাম, বিপ্লবীর সংসার থাকা উচিত নয়। সেদিন নিজের বিরুদ্ধে লড়ায়ের প্রচণ্ডতা আমাকে প্রায় কাবু করে ফেলেছিল।"

ঈষৎ হেসে তখনই সুর কেটে রায় ধামার থেকে যেন ঠুংরিতে ডুব দিলেন, "কিন্তু এই পরীক্ষার কথা আগে ভাবিনি। মুসলমানদের মধ্যে থাকতাম, তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

"এখনও মুসলমানদের মধ্যে থাকছ।"

"কিন্তু তারা বাঙালি নয়।"

"এই তফাত তো বোঝ নি তুমি।"

"ঠিক।"

অন্ধকারে নিজের বিরাট মাথা দুলিয়েছিলেন কিরণ রায়। সায় নয়, হঠাৎ যেন তার দিব্যদৃষ্টিলাভ ঘটেছিল।

গাজী রহমান ফিরে আসতে প্রসঙ্গ এক মোড়ে গিয়ে থামল।

কিরণ রায় বললেন, "আমাদের সুচিন্তিত অভিমত, তুমি সীমান্তের কাছাকাছি কোথাও থাকবে এবং প্রয়োজন বোধ করলে পার হয়ে যাবে।"

"আমি তো রাস্তাঘাট চিনি নে। তাছাড়া চেকপোস্ট আছে, ঘাঁটি আছে। এসব বেড়া কী করে পার হব?"

"সে-ভাবনা আমাদের।" প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারণ করে বসেন কিরণ রায় এবং রেজা আলি সাহেব।

"বেশ। এমনিতে আমার সহ্য হচ্ছে না। প্রায় মনে হয়, মগজে রক্তক্ষরণ হয়ে মরব।"

"তোমার চরিত্রের এই এক দোষ। এত ভাবপ্রবণতা নিয়ে কি শত্রুর মোকাবিলা করা যায়? তার জন্যে মাথা ঠিক রাখতে হবে।"

"বুদ্ধি দিয়ে এসব আমি কি আপনার চেয়ে কম বুঝি? কিন্তু মন শান্ত হয় কোথায়? এই পরিবেশ আমাকে পিষে মারছে," অসহায় বালকের মত কথাগুলো উচ্চারণ করলে গাজী রহমান।

"তাই, হেথা নয় হোথা নয় অন্য কোনখানে।" কিরণ রায় ঘষা গলায় আবৃত্তি করলেন। ফিসফিস শব্দে কবিতা পড়ার ফল।

"কিন্তু কী হয়ে গেল, কী স্বপ্ন দেখেছিলাম!" গাজী রহমান বেশ আবিষ্ট উচ্চারণ করলে।

— যা হওয়ার তাই হলো। গোখ্‌খুর সাপের লেজে হাত দিতে গেলাম, অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোবলের কথা ভাবিনি।

এই উত্তর দেওয়ার পর কিরণ রায় সহসা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু পাছে দুর্বলতার অপরাধে বন্ধুদের কাছে ধরা পড়ে যান, তাই আবহাওয়া পালটে দিতে দেরি করলেন না প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের স্বভাবজাত অধিকারীরূপে— "সেকথা ভেবে একটু হা-হুতাশ না করলে লোকে আমাদের পাথর বলবে। তবে সত্যি আমরা পাথর!"

গাজী রহমান বন্ধুর চাতুর্যজালে বন্দী, সরল বিশ্বাসে শুধায়, "সে কেমন?"

— বাংলাদেশের জনসাধারণ খাঁটি স্বর্ণ-পিণ্ড। আমরাই মেকী নেতা। বুঝতে দেরী হয়। ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লীগ ধ্বংস করো। জনসাধারণ দিলে ধ্বংস করে। আইয়ুব খাঁকে তাড়ালে। গেল দশ বছরের স্বৈরতন্ত্র। দু-বছর আগেই উনসত্তর সনে গণঅভ্যুত্থানের সময়, শত্রু প্রস্তুত ছিল না, আমরা স্বাধীন হতে পারতাম। তখনও পিছিয়ে রইলাম। আবার ভুল। ভুল, ভুল। অথচ সাধারণ মানুষ এত এগিয়ে গেছে। কারফিউ মানলে না, সাঁজোয়া গাড়ির পরোয়া করলে না। আর আমরা নেতারা বুকে অতটকু বল-সঞ্চয়ে পেছ-পা। তাই এ বিরাট খেসারৎ। দুঃখ হবে বৈকি গাজীর মত মানুষের, কিন্তু আবার দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে কি? দাঁড়িয়েছি না? আমাদের তরুণ মুক্তিফৌজদের দিকে তাকাও। জননী বাংলাদেশ সব ঐতিহ্যের যোগফল-সুধা নিজে ওদের হাতে বিতরণ করছেন। তাই তো ওদের হাতের অস্ত্রে এত তেজ...।"

কিরণ রায় আবেগের বশে হঠাৎ স্থানকালের পরিমাপ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বহুদিন তাঁর বক্তৃতা দিতে হয়নি। নিজেই বলেন, "বাচালতা দূর হোক এদেশ থেকে। বাক্যি হোক বন্দুক", বক্তৃতা দেওয়ার পুরাতন অভ্যেস হঠাৎ তাকে চেপে ধরেছিল।

গাজী অভিভূত। অতি পুরাতন কথা বন্ধুর মুখে পুরাণ হয়ে ওঠে। তাই মনে বেশ তেজ ফিরে পায় সে। সব জড়তা যেন নিমেষে উবে গেছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পা ফেলে তো সে চলতে পারবে না। নিজের অক্ষমতার প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ পায় হঠাৎ মন্তব্যে, "খামোকা দেশের ভার বাড়াতে জন্মেছিলাম।"

ধমক দিতে বিলম্ব করলেন না সাবেক সন্ত্রাসবাদী, "এই এক ধরনের নাকি-কান্না আমার অসহ্য। সংসারে প্রত্যেকের কাজ আছে যোগ্যতা এবং আপন-আপন ধরন-অনুযায়ী। আমি যা করি, তোমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, আবার তুমি যা করো, তা আমার সাধ্যির বাইরে।" অনুজ বন্ধুকে স্তোক দিতে নয়, গুরুত্বের সঙ্গেই রায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

রেজা আলি এগিয়ে এলেন আরো ব্যবসাসুলভ প্রস্তাবসহ, "কাল এখানে জিরোও। তিনজনে আবার কখন দেখা হয় কে জানে। পরশু সকাল থেকে যে-যার কাজে। তবে কিরণদাও সীমান্তের কাছাকাছি চলে যাবে।"

অন্ধকারে গাজী যেন রাস্তা দেখতে পেলে এবং বললে, "দুজনে একসঙ্গে তো যেতে পারি।"

"না।" কিরণ রায় প্রতিবাদ জানালেন।

"কেন?"

— আমরা দাগী আসামী। আর দুজনে একসঙ্গে ধরা পড়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়।

মন্তব্য গাজী রহমান মেনে নিলে। কিন্তু তার সংশয় অন্য দিক থেকে আসে, "আমি একা যেতে পারব।"

"তুমি একা থাকবে না। বন্দোবস্ত করছি। বোঝ না ক্যান?" রেজা আলি শেষে উপভাষা জুড়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

হঠাৎ তিনজনের মধ্যে স্তব্ধতা নামে। কারো কোন কথা বলার উৎসাহ নেই যেন। কিরণ রায় জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। গাজী ক্লান্ত। ঘুমোনোর বন্দোবস্ত তেমন কিছু নয়। কিন্তু ঘুমোতে তো হবে। কিন্তু কেউ উসখুস পর্যন্ত করে না।

এমন স্তব্ধতা দেড় মাস গোটা বাংলাদেশ জুড়ে, হঠাৎ কোথায় যে ভর করে। সাজানো-গোছানো ড্রয়িংরুম সুশোভন পরিচ্ছদধারী মানুষে বোঝাই; একুনে হয়তো দশজন। কিন্তু সকলে চুপচাপ বসে আছে। প্রত্যেকে যেন এইমাত্র নিজের বুকে, পাছায় লাথি-লাঞ্ছিত বেইজ্জতির কশাঘাত অনুভব করছে। তাই মুখ খুলতে অপারগ।

কিরণ রায় নিজের অতীত জীবনের নানা অধ্যায়-বিচরণ শেষে ভাবছিলেন, বর্তমান সংকটের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে। সম্মুখে স্তব্ধ, অন্ধকার মফস্বল শহর এক-একবার তার চোখে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছিল, যা আলোর কর্তব্যে সীমাবদ্ধ। চিন্তা সুষ্ঠু খেই ধরতে বাধা দেয়। নিজের মনেই তিনি উচ্চারণ করে বসেন, "দ্যাখো, দ্যাখো।"

অপর দুইজনের বজ্রাহত-ভাব চিড় খায় এবং দুজনেই একসঙ্গে শুধিয়ে বসে, 'কী, কী?'

— দেখে যাও। একটা গোটা শহর, হোক মফস্বল শহর, মুষড়ে পড়ে থাকলেও, এক কথা ছিল— মড়ার নিষ্প্রাণ, এবং সটান।

AMARBOI.COM

তিন ছায়ামূর্তি তখন জানালার ধারে। প্রত্যেকের অনুভূতি স্বতন্ত্র খাত থেকে একই ধারায় যেন মিশেছে। গাজী রহমান আবার নিজের মনের বল হারিয়ে ফেলে। অসহ্য এমন অন্ধকার এবং সুমসাম-ভাব তার কাছে নতুন নয় গ্রাম-এলাকায়। কিন্তু শহরও একই ভাবে মৃত। গোটা দেশ, বোধহয়, মৃত! এমন প্রশ্ন গাজী রহমানের মনের কোণে এলেও তা সে আমল দেয় না, বরং এই দুঃসহ বাক্‌হীনতা কাটিয়ে উঠতেই মুখ খোলে, 'রেজা, লক্ষ্য করেছ?'

— কী?

— ঝিঁঝিগুলো পর্যন্ত ডাকে না।

কিরণ রায় এবার আর নিজেকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনই অবস্থায় ভাব-গদ্‌গদ্ স্বরে সরব হন, 'এই আমাদের সৌভাগ্য। এমন দেশে জন্মেছিলাম, যার কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেশের দুঃখে শরিক, মানবিকতা অর্জন করে বসে...। লাথির বদলে পাল্টা লাথির আয়োজনে আমরা সফল হব না তো কে হবে? এই দেশকে দেখেছি, ধর্মান্ধতার বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। আজ সেখানেই ধর্মান্ধতা ঘৃণ্য। এই অন্ধকারও তেমনি একদিন কাহিনী হয়ে থাকবে মাত্র...।'

গাজী রহমান অনির্বচনীয়তার স্বাদ পায় অস্পষ্ট-কণ্ঠস্বর-মথিত এই অন্ধকারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক ক্লান্তি গেছে শরীরের ওপর দিয়ে সারাদিন এবং আজ রাত্রি পর্যন্ত তবু সে ঘুমানোর বিরোধী। কিরণ রায়কে কখনও সে এত ভাব-বিহ্বল দেখে নি। জেলে যেতে যেমন তাকে নির্বিকার দেখা যেত, তেমনই পার্টির সংগঠনের কাজে। অদ্ভুত এই ঔদাসীন্য। আজ গাজী তাই বিস্মিত হয়। কিন্তু ওদিকে তখন বোধহয় আত্মসমীক্ষা পালার সূত্রপাত।

হঠাৎ ঘুরে কিরণ রায় বললেন, "দূর, শুধু মগজে গেঁজালে দুনিয়ায় কোন কাজ হয় না। চলো শুয়ে পড়া যাক।"

গাজী সম্মতি দিলে এবং রেজাকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমার দু-তিনখানা বই সঙ্গে নেব। বই আছে তো? না গাঁয়ে নিয়ে গেছ?"

— এই এখানেই আছে। কিন্তু তুমি সঙ্গে কিছু নিতে পারবে না।

— পারব না?

— না। চেকপোস্টে ধরলে কী বলবে? ছাত্র না শিক্ষক। অবিশ্যি তোমার দাড়ি তোমাকে ছাত্র হওয়া থেকে অব্যাহতি দেবে। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে ধরলে তো দু-চার কথায় সব বেরিয়ে পড়বে। তোমার ওসব ট্রেনিং নেই। কেতাবের ওপর ওদের ঘৃণা কম নয়।

মিইয়ে গেল গাজী রহমান সঙ্গীর কথাবার্তায়। ঢাকা শহরে পাঁচ দিন ধরে ইউনিভার্সিটির মাঠে সে বইয়ের স্তূপ পুড়তে দেখেছে। বিভিন্ন হল ও ইউনিয়নের লাইব্রেরির হাজার হাজার বই।

আজ সেই দৃশ্য আবার অবলোকন-বৃদ্ধ গাজী রহমান নিজের মনে উচ্চারণ করে বসল, 'বই...বই।'

'ও কথা ভুলে যাও।' ধমক দিয়ে উঠলেন রেজা আলি।

AMARBOI.COM

৪

এটা ঠিক, শারীরিক অভ্যেস এবং মানসিক আকৃতি ইচ্ছামত বদলানো যায় না। যাঁরা পারেন, তাঁরা বিশেষ ধাতু সমন্বয়ে গঠিত। গাজী রহমানের মনে বার বার এই চিন্তা আন্দোলিত হয়। সে তো কিরণ রায় নয় যে, সব সময় পরিবেশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে অভ্যস্ত। আবার রেজা আলির মত তার নির্বিকার হওয়ার ক্ষমতা নেই, জীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বসবাসের ফলে বা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কিরণ রায় তো বৃহত্তর জীবনের সম্মোহ সামনে রেখেই সদাসর্বদা চলেন। তিনি কীভাবে বরফের মত ঠাণ্ডা হতে পারেন, যেন কোথাও, উত্তাপ নেই একটুকু— যদিও শরীরে রক্তমাংস বর্তমান। আবার বিপদের মুখেও এই ব্যক্তি সহজে বুদ্ধি খুইয়ে বসে না। কিরণ রায়ের মুখ বার বার ভেসে উঠতে লাগল গাজী রহমানের সামনে। কিরণের আর এক রাজনৈতিক সহকর্মী আছে, একদা মুসলিম লীগের জেলা-সেক্রেটারি ছিলেন। মিষ্টভাষী, শান্ত চোখ, দোহারা শ্যাম চেহারা। তাকে উত্তেজিত হতেই দেখা যায় না, এমনকি যখন রাজনৈতিক মতামত নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কের ঝড় বয়ে যায়। জীবনকে এঁরা গড়েপিঠে রপ্ত করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ হাসি পেল গাজী রহমানের। কিরণ রায় বা একদা মুসলিম লীগার, বর্তমানে ন্যাশন্যাল আওয়ামী-পন্থী, বিপদের মুখেও বড় সহজ থাকেন। একবার একবার অসাবধানতাবশত কিরণ রায়কে চেকপোস্ট পার হতে হয়েছিল।

পাঞ্জাবী জওয়ান জিজ্ঞেস করে, 'নাম বলো। নাম কিয়া?'

'স্বদেশ বিহারী।'

গুম্ফধারী সৈনিক হাসি ছিটিয়েই জবাব দিয়েছিল, 'আচ্ছা, তোম বিহারী হ্যায়। তব যাও'। তুমি-সম্বোধন কিরণ রায় এই বয়সে অপরিচিত কারো কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন না। ওই অপমান বেশ লেগেছিল তার। বাঙালি হলেই বিপদ এবং অপমান। আবার আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে অনেক সময় ফয়সালা মুলতুবি রাখতে হয়, তা কিরণ রায়ের মতো মানুষেরাই পারেন। বিরাট চৌহদ্দি নিয়ে তাদের কারবার। তাই তার নক্‌শা সাধারণভাবে চোখে দেখা যায় না। বন্ধুদের বড় হিংসে হয় গাজী রহমানের। কিরণ রায় এখনও নিরাপত্তার কথা ভাবেন নি, যদিও তার বিপদ ঢের বেশি। অথচ সে পলাতক, নিশ্চিন্ত আশ্রয়-সন্ধানী। একবার ভেবে নিলে গাজী রহমান, চেকপোস্টে সে কী জবাব দেবে। আগে থেকেই তা বন্দোবস্ত করা আছে।

চলন্ত বাসেরই আর এক কোণায় বসে আছে এক পাতলা চেহারার রুগ্‌ণ-মুখ যুবক। রেজা আলি তার চেয়ে বেশি পরিচয় দেয়নি। শুধু বলেছিলেন, 'এর নাম সৈয়দ আলি। আমার মতই ওকে বিশ্বাস করবে।' দেখে মনে হয়, কোন আপিসে ছোটখাট চাকরি করে সে। তারপর রেজা আলি আরো সতর্কতার সংকেত দিয়েছিলেন, 'জিজ্ঞেস করলে ঘাবড়ে যেও না। সহজ উত্তর দেবে। তোমার মত লোককে নিয়ে মুশকিল। ট্যারাবাঁকা হতে শেখো নি।' রেজা আলি শেষে নিজেই সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গাজী রহমান তাকে নিবৃত্ত করে প্রয়োজনমত আচরণের আশ্বাস মারফত।

AMARBOI.COM

হঠাৎ বাসের গতি মন্দীভূত হয়ে এল। ড্রাইভার হেঁকে উঠল, 'আপনারা সবাই নামেন। সামনে ব্রীজ ভাঙা।'

এতক্ষণ বাসে চোখ বুজে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে খোঁয়ারি নেওয়ার চেষ্টা পেয়েছিল গাজী রহমান। এবার সে চমকে উঠল এবং ইতিউতি তাকাতে লাগল।

বাস থেকে নেমে পড়েই গাজী রহমান দেখতে পেলে ব্রীজের পাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা শুনে গাজী রহমান বিস্তারিত জানতে পারলে, মুক্তিফৌজ ব্রীজের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। কিন্তু একদম উড়িয়ে দিতে পারে নি। ভারি গাড়ি খুব সাবধানে পার হয়, কর্তৃপক্ষের মেরামতি হাত-লাগার পর।

যাত্রীরা হেঁটে ব্রীজ পার হলো। বাস অতি ঢিমা-গতি এগোতে লাগল। অনেকে তামাশা দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গাজী রহমান কোন দিকে তাকায় না। ঝোলা ব্যাগ হাতে অবনত-মুখ, শুধু পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখে।

আবার আরোহণ-পর্ব। যাত্রীরা যে-যার জায়গা দখলের পর বাস ছেড়ে দিলে।

গাজী রহমান ব্রীজের দিকে তাকাবার চেষ্টা পায়। পেছনে ঢ্যাঙা যাত্রীদের অবয়ব বড় বাধা। সে দ্বিতীয়বার চেষ্টা নিলে না।

আকাশে কাঠফাটা রোদ্দুর। বাস ছাড়তে গরম থেকে কিছু নিস্তার পাওয়া গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাজী রহমান এবার জানালার বাইরে চোখ সজাগ রাখে। এই জায়গায় দু-পাশে বসতি। ফলে মাঠের বিস্তার নেই কোথাও। গাজী রহমান কিন্তু চোখের বিশ্রাম প্রার্থনা করছিল। তা আর হয় না। মিনিট দুই পরে দৃষ্টি যেন ছ্যাঁকা খেলে। কয়েকটা ভিটে-বাড়ি চোখে পড়ল অগ্নিদাহের সব সর্বনাশ-লেখাসহ, বর্বরতার সাক্ষীরূপে চারপাশের সবুজকে ব্যঙ্গ করছে। পোড়া কড়িকাঠ এখনও ঝুলে রয়েছে, একদম ভূমিসাৎ হয়নি। একটা ভিটা একদম সমান। শুধু কালো ছায়ের দাগ লেপ্‌টে রয়েছে। ভিটের নিচে চারা কতকগুলো খেজুরের গাছ ঝল্‌সানো-দেহেই বাতাসে আন্দোলিত। চারপাশের গাছপালা আর লতাগুলোর অঢেল সবুজ ভিটের অধিবাসীদের অতীত সুখের রং হিসেবেই যেন সূর্যের আলোয় আরো দীপ্যমান। অল্প আয়তনের জায়গা। সামনে জেলা বোর্ডের রাস্তা। তিন দিকে প্রকৃতির বেষ্টনি। মাঝখানে কিছুটা মাটি উঁচু করে ভিটা বাঁধা। এলাকার মাটি শাদা কিন্তু পোড়া ভিটের উপর লাল। দুমড়ানো টিনগুলো পাঁপড়ের মত কোথাও এখনও চালের পেরেকের সঙ্গে লেগে রয়েছে। একটা দালানের দুর্দশা শুধু তার অবশিষ্ট অক্ষত থামের বিদ্রোহী উপস্থিতির মধ্যে ধরা পড়বে। মর্টারের গোলা উপর থেকে ধ্বংসলীলা শুরু করলেও নিচে তার জের, বোধহয়, কেবল কম্পন ও আগুনের সাহায্যে পৌঁছেছে।

গাজী অতি সহজে আজ ভাবপ্রবণতা থেকে দূরে থাকে। মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার এই সব ক্ষুদ্র লীলাভূমি তার মনে বিষাদ বা স্মৃতিচারণার কোন অনুষঙ্গ-রূপে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সে একান্তভাবে নির্বিকার, এমন বলা অন্যায়। হঠাৎ কিল-চড়-ঘুষি খাওয়ার পর যেমন ধাঁধানো ভাব থাকে প্রত্যঙ্গের উপর, এ-ও হয়ত তেমন একটা কিছু। অথচ গাজী রহমান বোধশূন্য নয়। সম্মুখে শূন্য ভিটার উপর অবশিষ্ট একটিমাত্র খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে উদাসদৃষ্টি এবং আলুথালু-চুল বছর পাঁচেকের ফালি-পরিহিতা বালিকা। এবার গাজী রহমান বিচলিত হয়ে ওঠে। বারেক বাসের গতি দ্রুত সব আড়াল করে দিলে। মানুষ যত সহজে ধ্বংস হয়, তার মূর্তি অত সহজে লয় পায় না। বালিকার মুখ ক্রমশ বিস্তৃত, শেষে গাজী রহমানের সব দৃষ্টি ছেয়ে ফেললে। আর কিছুই দেখছে না সে। শ্মশান-চত্বরে কী সাহসে এসে দাঁড়িয়েছে, অতটুকু অবোধ আত্মা? গাজী দেখতে পায়নি ওই চোখে কী ছিল? ফরিয়াদ, অভিশাপ? হয়ত অভিশাপ। এসবে বিশ্বাস গাজী রহমান কবে হারিয়েছে। কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দিতে আর শব্দ সে খুঁজে পেলে না। অভিশাপ, অভিশাপ...

বাসে সবাই বোবা। ইঞ্জিনের খট্‌খট্ শব্দ কেবল দূর-দূরান্তরে প্রতিধ্বনি তুলছে। খাণ্ডব অরণ্য যেন আর শেষই হবে না। কিন্তু এক মাইল পরে মাঠের বিস্তার দৌড়রত। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে গাজী রহমান। এখানে এক-দু মাইল বেগুনের ক্ষেত ধূসর রঙের পট বানিয়ে রেখেছে। নিচে কালো কালো বেগুন যেন দোল্‌না-বিহারী, ডালের বিভিন্ন উচ্চতায় গোলদেহে আসীন। হঠাৎ লাল আলুর ক্ষেত আবার রঙ বদলে দিলে। লতার ডগাগুলো কোথাও কোথাও খাড়া, সূর্যমুখী লঙ্কার মত আলোর জন্য তৎপর। মাঠে কাজকর্মরত কৃষক আছে। কিন্তু গানের একটা কলিও কোন দিক থেকে কানে আসে না। গাজী রহমান সুরেলা যে-কোন শব্দের আজকাল বৈরী। গান তার কানে সয় না। কী যেন হয়ে গেছে কানের পর্দায়। অথচ সঙ্গীত-পিপাসায় সে এই বয়েসেও রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে, শহরে কোন ভাল ধ্রুপদী গায়কের আবির্ভাবে।

গাজী রহমানের পরিচিত নয় এই এলাকা। সৈয়দ আলি পাশে থাকলে সব জানা যেত। কিন্তু রেজা আলি উপদেশ দিয়েছিলেন, 'বাসে কাছাকাছি বসবে না! অবিশ্যি পায়ে-হাঁটা রাস্তায় কেউ কিছু জিজ্ঞাস করলে সৈয়দ সব জবাব দেবে।' গাজী রহমানের কিন্তু তেমন আস্থা নেই সঙ্গীর উপর। যদি তাকে ধরিয়ে দেয়? কিন্তু রেজা আলির লোক যখন, অমন ধারণাও সত্যি ইতরতা। লজ্জা পায় গাজী রহমান। বাসে কিছু কথাবার্তা আছে, তা যখন মামুলি, তত প্রাণহীন। হৈ-হল্লা করে না কেউ।

হঠাৎ কন্ডাক্টার, যে দরজার উপর দাঁড়িয়ে ছিল, নাতিউচ্চ কণ্ঠে, বললে, 'সম্মুখে চেক হৈত্ পারে। আপনেরা যে-যার সীটে চুপচাপ বসেন।

চেক!!!

এই শব্দ যাত্রীদের মধ্যে চাপা আলোড়ন সৃষ্টি করে। গাজী রহমান সৈয়দ আলির দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখ কালো, এবং ঠোঁট নেমে গেছে। কিন্তু সে ধড়িবাজ ছেলের মত সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি বের করে ফুঁকতে লাগল, আদল যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে।

নেপথ্যে একজন জবাব দিলে, 'কন্ডাক্টার সাব, এখানে তো চেকপোস্ট থাকনের কথা না। চেকপোস্ট আছেগো ফলানা গ্রামের লগে।'

'নতুন বসাইতে পারে। মিলিটারি জীপ দেইখ্যা আমি আপনেদের হুঁশিয়ার কইরা দিলাম।'

কন্ডাক্টারের আরো কিছু হয়ত বলার ছিল। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে সাঁ-সাঁ শব্দে দুটো মিলিটারি জীপ নিকটে আসামাত্র এক সিপাই হাঁক মারলে, 'রোকো—।'

গাজী রহমান আশ্চর্যভাবে কিন্তু নির্বিকার। সে আড়চোখে দেখে নিয়েছে একটা 'কেরিয়ারে' পনরজন মেশিনগান ও রাইফেলধারী সৈন্য। অন্য জীপে ড্রাইভার ও একজন অফিসার। পেছনের সীটে প্রস্তুত মেশিনগানসহ এক সৈনিক উপবিষ্ট। এতক্ষণ যাত্রীদের হাল-হকিকৎ জানাবার কোন কৌতূহল ছিল না। এবার সে যে-সব মুখ তার সীট থেকে দেখা যায়, নিরীক্ষণ করতে লাগল। তিন-চারজন সুঠামদেহ যুবক আছে। বাকি আধবুড়ো অথবা জীর্ণস্বাস্থ্য। সৈয়দ আলি জওয়ান হলেও জীর্ণতায় মান্ধাতা।

চেক শুরু হয়ে গেল জনা পাঁচ সিপাইয়ের তত্ত্বাবধানে। একজন জিজ্ঞেস করলে, 'ইদার মুক্তি ফউজ হ্যায়?'

কেউ কেউ জবাব দিলে— না। কয়েকজনকে সুটকেস খুলতে হলো। একজন গণ্ডাখানেক ডিম সিদ্ধ করে এনেছিল পথে খাওয়ার জন্যে। তার উপর জিজ্ঞাসাবাদ বেশ কড়া শুরু হয়।

— এই চারঠো আণ্ডা কিঁউ লায়া?

সে বেচারা উর্দু জানে না, কোন রকমে কথা বলার চেষ্টা পায়।

— হাম এক আদমী।

— আ-রে পাঁচ নেহি লায়া কিঁউ?

সে জবাব দেবে কী, হাত কচলায় এবং অনুনয়-মাখা কণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'জনাব, জনাব...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভয় দিলে এক সিপাই, 'আয়েন্দা পাঁচ লাও।' কথা শেষ করে তারা চারজন এক একটা ডিম বুশ শার্টের পকেটে ঢোকালে। পঞ্চমজন বঞ্চিতের দলে। সে আবেদন ছুড়লে, 'দেখো ইয়ার, হামেভি কুচ চাহিয়ে।' সে ডিমের বদলে একজনের একটা দু ব্যাটারি টর্চ পকেটে হেফাজত করলে।

গাজী রহমানের পালা এল। কিরণ রায় তাকে তালিম দিয়েছে একদম সাগ্‌রেদের মত। সেইমত জবাব দিলে।

— কিয়া করতা?

— ছোট সি বিজিনেস।

— সামানা?

ব্যাগে লুঙ্গি পিরহান টুকিটাকি দু-একটা জিনিস সম্বল। কাজেই চেক-পর্ব আর কীভাবে লম্বা হবে? যাত্রীদের কারো কারো জিনিস কমে গেল। তা যাক্, মালের উপর কারো অত দরদ নেই। জান্ বেঁচে গেলেই সর্বাঙ্গ কুশল।

ডিমবঞ্চিত সিপাই বোধহয় ধর্মপ্রচারক। সে মেশিনগান হাতে হেঁকে উঠল, 'সাব মুসলমান হ্যায়?'

— জ্বী হাঁ।

কোরাস উঠলো গোটা বাস জুড়ে।

গাজী রহমান নাকে একটা শব্দ করেছিল কোরাসে শরিক হতে।

— দেখো, হিন্দু কুই নেহি হ্যায় ত? পাকড়ায়া ত তোম্‌লোগ কা চেহারা ভি খারাপ হোয়ো যায়েগা।

— জ্বী নেহি। কুই হিন্দু নেহি।

— কলেমা জান্‌তা?

— জান্‌তা।

— পাকিস্তান মাংতা?

— মাংতা?

— বহুত আচ্ছা। লেকিন আণ্ডা জেয়াদা লাও। হাম মুসলমান ভাই হ্যায়। মুল্‌কা কা হেফাজৎ করতা। হামকো খেলানে সে কুচ নোক্‌সান নেহি হ্যায়। আচ্ছা, স্লামালেকুম।

— স্লামালেকুম।

উত্তর সবই কোরাস-সমন্বিত।

গাজী রহমান আসলে রসিক মানুষ। সে তামাশা বেশ উপভোগ করছিল। অসোয়াস্তির সুতোয় আর ঝুলতে হয় না। ভালয়-ভালয় গেরো কাটছে। সৈন্যদের দিকে সে কয়েকবার বেশ নিরীক্ষণের ভঙ্গিতে চোখ ফেললে। অবিশ্যি খেয়াল থাকে, আবার পাল্টা ওদের দৃষ্টিপথে না পড়ে যায়। হঠাৎ খেয়াল গজালেই হলো। তখন আর রক্ষা থাকবে না।

চেক-পর্ব প্রায় শেষ। এমন সময় এক সিপাই তার সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, 'এই কাইয়ুম?'

— কিয়া?

— ও দেখা?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কিয়া?

তারপর আঙ্গুল বাড়িয়ে সে একটা সীটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। গাজী রহমান এবার সচকিত, যেন দেখেও কিছু দেখলে না, এমন ভাণের আশ্রয় নিলে। কিন্তু তখনো তার কাছে পরিস্থিতি অজ্ঞাত। তবে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে, এমন আশঙ্কার জলে তাকে সাঁতার কাটতে হয়।

পেছনের দিকে বসেছিল গাজী রহমান। কাজেই সব যাত্রীর মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। কার কী বয়স, সে কেমন অবয়বের— এসব নিরীক্ষণের কৌতূহল থেকে সে মুক্ত। পাগল আর এক পাগলের চিকিৎসা করতে অক্ষম। নিজেই সে প্রাণভীত। নিরীক্ষণের জন্য শক্ত ডাঙা লাগে পর্যবেক্ষকের।

সিপাই দুটো একটা সীটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

কাইয়ুম নামক জওয়ান এবার সঙ্গীকে শুধায়, 'কিয়া?'

— এই দোনা কো বড়া ডেঞ্জারাস মালুম হোতা।

— তোম এহি সোঁচতে হো?

— হাঁ।

দুজনকে ওদের খুব বিপজ্জনক মনে হয়। সেই মজ্‌কুরযুগল উত্তর মুখে বসেছিল, গাজী রহমান তাদের দেখতে পেলে না। উদ্বেগ-উদ্বেলিত হৃদয়ে সে কালগণনা করে।

কাইয়ুম সঙ্গীর মন্তব্যের প্রতিবাদে জবাব দিলে, 'আ রে মমতাজ, ছোড়ো। ডেঞ্জারাস কুচ নেহি।'

— নেহি। ডেঞ্জারাস হ্যায়।

দুজনের মতভেদ ক্রমশ জমাট হতে লাগল। গোটা বাসের যাত্রী একাকার, স্তব্ধ। হয়তো স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পর্যন্ত কেউ ফেলছে না। ওদিকে সিপাই-যুগল তর্ক করে চলেছে।

— ডেঞ্জারাস হ্যায়।

— নেহি।

— হ্যায়।

— নেহি।

বেশ ঝাঁজ তুলে মমতাজ আসামীদের হুকুম দিলে, 'এই, তোম দোনো উতার যাও। ওঠ্‌ঠো।'

যারা বচসার নিমিত্ত, তারা এবার সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাজী রহমান তাদের এক লহমা দেখে নিয়েছে। সুঠাম স্বাস্থ্যের দুই যুবক, বয়স তিরিশের মধ্যে। একজন ক্লিন-সেভ। অপরজন হয়তো একদিন ক্ষৌরকর্ম-বিরতি, তাই মুখের আদল দূরে থেকে বিষণ্ণ দেখায়। গাজী তখনই চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার আত্মমগ্ন হয়। কিন্তু কোন চিন্তাই আর তার মগজে নেই। ফাঁকা মরুভূমির মধ্যে মরীচিকাগ্রস্ত দিশাহারা ব্যক্তির মত রক্তের তোলপাড়ে সে রাস্তার ইঙ্গিত পায়।

বাধা দিলে কাইয়ুম খান আসামীদের, 'নেই— বয়েঠ যাও।'

— এই তোম উতার যাও।

— নেই, বয়েঠ যাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতভেদের তাপ ডিগ্রি-ডিগ্রি বেড়ে গেছে এবং যাচ্ছে। যাত্রীরা শীতল, দুই সিপায়ের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শেষে স্বাভাবিকগ্রামের থাকে না। জীপে বসেছিল এক অফিসার। ক্যাপ্টেন। প্রথমত, এত বিলম্বে সে বিরক্ত। দ্বিতীয়ত, বচসা এবং আত্মকলহ তাকে কিছুটা উত্তেজিত করে তোলে।

সে জীপ থেকে নেমে বাসের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অধস্তনদের জিজ্ঞেস করলে, 'কিয়া হুয়া?'

কাইয়ুমের পাকানো গোঁফ তার মুখের চেয়ে লম্বা। কিন্তু মেজাজ অত কড়া নয়। সে মোলায়েম কণ্ঠে অফিসারকে অকুস্থলে আসতে অনুরোধ জানায়।

মামলা দায়ের করলে দুইজনে নিজেদের যুক্তিসহ। বিচারকের রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, 'আগার সব হুয়া তোম লোগ্ কা, তব দোনো-কো উতার লো।' অর্থাৎ যদি তাদের সন্দেহ হয়ে থাকে, দুজনকে নামিয়ে নিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

অফিসার তবু অন্যতম আসামীকে শুধায়, "এই কাঁহা জায়েগা?"

— আপনা দেহাৎ।

— আচ্ছা, আব ওতার যাও।

যুবক এতক্ষণ শান্ত ছিল। এবার কিন্তু সে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, "মাঁই বেকসুর খালাস হুঁ (আমি নিরপরাধ)।"

"ওতার যাও।" অফিসারের আদেশ আদৌ মোলায়েম নয়।

"মাই বেকসুর হুঁ" যুবক নিজের অধিকার পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করলে।

— এই জোয়ান-লোগ, ইসকো পাকাড় করকে নিচে লে যাও। বড়া বেতমীজ। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ।

সিপায়েরা হুকুম-তামিলে এগিয়ে আসতে যুবক চিৎকার দিতে লাগল, "মাই বেকসুর— " তার বাক্যের 'হুঁ' আর শেষ হয় না, এক সিপায়ের অকস্মাৎ থাপ্পড়ে স্তব্ধ। যুবক যাত্রীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার দিয়ে বললে, 'ভাইসব, আমার স্যুটকেস আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবেন।' অমুক গ্রাম পোস্টাফিস, ফালানা জেলা।

"রোকো", আবার ক্যাপ্টেনের নির্দেশ।

বাসের সব যাত্রী যেন ঘুমন্ত। অফিসার একজনের দিকে তর্জনি বাড়াতে সে আঁতকে জেগে উঠল। তখন অফিসার প্রশ্ন করে, 'এ-ই, বাংলা মে কিয়া বোলা?

স্বপ্নাবিষ্টের মত উত্তরদাতা যুবকের শেষ পার্থিব কামনার হদিস দিলে।

অফিসার মুখ খুললে জওয়ানদের উদ্দেশ্যে, 'উস্‌কো স্যুটকেস উতার লো।'

আসামীর চোরাই মাল, পুলিশ-দারোগা যেন গেরস্থর বাড়ি পরিত্যাগ করলে।

যাত্রীরা মনে মনে হাঁফ ছাড়ছে হয়ত। সকলে চোখ খুলে অন্তত তাকায়। তারা দেখলে, কালো ফেটি দিয়ে দুই যুবকের চোখ বেঁধে জীপের পেছনে তাদের গুদামজাত করা হলো। 'মাঁই বেকসুর হুঁ' চিৎকার তখন দশদিকের বনিয়াদ ধরে টান মারছে। কিন্তু শব্দ আর একটানা হচ্ছে না। সিপাইদের গাল এবং মাত্রাদানে তা ব্যাহত।

বাস থেকে বেশ স্পষ্টই শোনা যেতে লাগল "এই শালা, চেল্লাও মাৎ।"

"মাঁই বেকসুর হুঁ— যেন শেষ চিৎকার দিলে যুবক পৃথিবীকে সম্বোধন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরমুহূর্তে ধাবমান জীপের শব্দে আর কোন কিছু শোনা গেল না।

গাজী রহমানের খোঁয়ারি ভাঙল, বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট! সে অনুভব করে, তার এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানব্রতী কৃচ্ছ্রতার গোড়ায় নিমেষে 'সব ঝুট হ্যায়' হেঁকে কে যেন লাথি দিয়ে গেল। আত্মসম্মাননার আর কোন অবলম্বন নেই তার। কসায়ের দোকানে কিমা তৈরিকালীন মাংসপিণ্ডের উৎক্ষিপ্ত টুকরার মত সে বিবেকের ছুরির সামনে অণুমাত্র, গোটা মানব নয়।

বাসের জানালার দিকে মাথা চেপে গাজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বালকের মত কাঁদতে চেয়েছিল। যুবকের মুখ, শেষ আর্তরব সমতল-পটে তার কাছে ধরা পড়ে। মাতালের ইমেজ-মুখর মস্তিষ্ককোষের আওটানির যত তোলপাড় করে তার সারা বুক। সে কেন কোন প্রতিবাদ করল না? কিরণ রায় গোটা সমাজের নকশা বোঝার চেষ্টা পান। তিনি বলতেন, 'ভিক্ষে দিয়ে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো উদ্যমের অপচয় মাত্র। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হয়ত প্রশংসনীয়। কিন্তু তা সার্বিক ফলের সঙ্গে মেলে না। তাই প্রতিকারহীন অন্যায়ের উপর উপরি-উপরি আঘাত, স্রেফ ইটের দেওয়ালে মাথা ঠোকা।' কিন্তু কোথাও তো কাউকে শুরু করতে হবে। সে কেন চুপ করে রইল? চোখের সঙ্গে তার বিবেকও কি বুজে যায়নি?

বাস নয়, যেন চলন্ত শবাধার। ভেতরে কতগুলো মড়া উপবিষ্ট। গাজী রহমান ভাবলে, তা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই কারো। বাসের জানালার শিকে মাথা আরো সজোরে চেপে ধরল সে। এখনই করোটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে কোন আফসোস থাকত না। মিথ্যের সামনে একটা সরু ঘাস পর্যন্ত দাঁড়ানোর সাহস পেলে না। যুবককে ধন্যবাদ, সে তবু নিজের সাফাই জগৎকে জানিয়ে দিয়ে গেছে। হাতিয়ার বিবেকের শত্রু। এখন ক্ষেত্র-অনুযায়ী দেখা যায় মিত্র। তিরিশ জন লোক, পাঁচজন কি একজনের সামনেই রা কাড়ত না। অস্ত্রের নীরব ভর্ৎসনা ভ্রুকুটির এত শক্তি? সে কিরণ রায় বা রেজো আলির মত প্রাণ নায়ক নয়। রেজো কীভাবে বদলে গেল? অথচ আঘাতে হতচৈতন্য সে স্থাণুত্ব পেলে। কিরণ রায়ের দূরদৃষ্টি আছে। তাই হয়ত শান্ত থাকতে পারে। রেজো আলিকে তিনি পছন্দ করতেন, মানুষটা সৎ বলে। অথচ মতামতের কত ফারাক। এখন রেজো আলি পর্যন্ত অস্ত্র গ্রহণে প্রস্তুত।

পরদিন তিনজনের কথাবার্তার মধ্যে গাজী রহমান প্রাচীন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। কিরণ রায় মিষ্টি হাসি যোগে উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাজনীতি করো আর যা-ই করো, মানুষটা তো করবে। তাকে দেখবে না? দ্যাখো, রেজো এখন আমার মতই রাজনৈতিক জীব। অথচ এ-সবের ধার ধারত না। নিজের গণ্ডির মধ্যে তার সততা আশ্চর্যজনক। তাই আমাকে যেমন ও সহ্য করেছিল, আমিও ওকে সহ্য করেছিলাম। আজ ঘুঁটি কোথায় দ্যাখো। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছে।' কিন্তু তার বিবেক লাশের অভ্যন্তরে ঢুকে বাঁচার চেষ্টায় ব্যাপৃত। নিজের কাছে আর নিজের অবলম্বন নেই। খোয়ার-বিশ্বাস গাজী রহমান জানালার শিকে চরম আশ্রয় পেয়েছিল সেদিন।

পাশের সীটে দুজন ফিসফিস করে আরম্ভ করেছিল এতক্ষণে। ওই শব্দের ঢেউ তাকে কিঞ্চিৎ আশ্বাস দিচ্ছিল, হয়ত কিছু পাওয়া যাবে, মজ্জমানের মত পানির উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত তুলে খাবি খেতে হবে না।

— আপিসে চাকরি করে।

— হ।

— না। ব্যবসা করে!

— ক্যান?

— আপিসের বাবু-বাবু চেহ্‌রা—।

— তা হৈত্‌ পারে।

— নতুন বিয়া করছে, মনে অয়।

— আহা, বেচারার বউ আজ হনিবার দুলা (জামাই) আইব, পথ চাইয়া আছে। প্রতীক্ষার সড়ক কত দীর্ঘ হতে পারে, আর বধূ জানবে না কোনদিন।

—ঠিকানা কইল। গাঁর নাম আছে।

—আছে।

—অহন বাদ দাও। পরে চিডি দিমু।

—আহা, বদ-নসিব বউ...

গাজী রহমান জানালার শিকের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রণাভার উজাড় করে দিতে চাইলেও ব্যর্থ মনস্কাম। খোলা কানই বরং তাকে আনমনা হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। বউ-শব্দে সে নড়েচড়ে উঠল। শিকের উপর থেকে প্রবীণ শিক্ষক মাথা সরিয়ে নিয়েছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল মুখের উপর। এই স্পর্শ এবং কানের সড়ক ধরে সে নিজ গৃহে পৌঁছায়। বউ, ছেলেমেয়ের কথা তার মনে হয়নি এতদিন, তা নয়। মগজ ধাঁধিয়ে গেলে বেদনার উপস্থিতি ঠিক থাকে কিন্তু তা দৈহিক যন্ত্রণা হয় না। বরং অশীরীরী এক ধরনের তীব্র অনুভূতির আকার লাভ করে, যেখানে বিশেষ কোন মানব- মানবীর মুখ আঁকা হয় না। ওই বিমূর্ততার মধ্যেই সোয়াস্তির বিনাশ ঘটে। কেন্দ্রীয় কোন কারণ নেই। অথচ তুমি আইটাই করছ। ডাঙার আঁশ-ছাড়ানো কই মাছের তো মুক্তি আছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাণশূন্যতা অবধারিত। কিন্তু মানুষ এখানে যেন মহাকালের দোসর, আপন দুঃসহ অমরত্ব নিয়ে ছটফট করে। স্ত্রীর মুখ, কন্যার মুখ, আরো পরিজনের মুখ দ্রুত অপসৃয়মান— একটু বিশদ দেখার আবেগের সঙ্গে বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। অন্তরের প্রতিধ্বনি এখানে সহায়, চোখ যখন নাচার। ...তোমার স্ত্রী বিদায়কালে একদিকে মুখ ফিরিয়ে আঁচলে মুখ ঢেকেছিল, যেন তুমি দেখতে না পাও। স্নেহের বিনিময়ধারা কন্যার চোখের পানি তুমি নিজের গণ্ডদেশেই সওদা করেছিলে। অশ্রুদগ্ধ হওয়ার আগে বাংলাদেশ পুড়েছিল বোমায় সর্বহারাদের রাষ্ট্রে তৈরি মেশিনগানে। তোমরা তো জীবিত। কত অসহায় চাষী-মজুর আত্মবলি দিয়েছে কেবল বাঙালি হয়ে জন্মানোর অপরাধে। নিশ্চিহ্ন কত পরিবার। শ্মশানচত্বরে মৃত ছাড়া কারো মুখ খুঁজতে যেয়ো না। অমঙ্গল হয়।...

গাজীর হঠাৎ মনে পড়ে, অসহায়তা প্রাচীন সংস্কারের দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। যেখানে আবেগের নিরাপত্তা, সেখানেই স্বর্গের কল্পনা। তাই বোধহয়, ভৌগোলিক বন্ধনের বাইরে অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত। অথচ একটি গৃহাঙ্গন, মধ্যবিত্তের সাধারণ শহুরে জীবনযাপন, এবং টবে তৈরি ছোট বাগান-সমন্বিত— তাকে আর রেহাই দিচ্ছে না। ধাবমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসের সঙ্গে হরিৎ-সমুদ্র থই থই বাংলাদেশের জনপদ প্রান্তর তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। অথচ গৃহনীড় থেকে বেরিয়ে আসার কথা কত বছর ধরে কত বার না গাজী রহমান ভেবেছে! আজ এমন সুযোগের মুখে সে গৃহাগতপ্রাণ, যদিও সচেতনভাবে নয়। কিন্তু নিজের বোধের ওপর দাগাবাজি অসম্ভব। যতই নিঃসাড়তায় মন ছেয়ে যাক, ভাবমূর্তির জুলুম নিরবচ্ছিন্ন, একটানা।...উঠানের একটা ফুলগাছ তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিছু বলার উদ্দেশ্যে। গাছ নয় একদম মানুষ। পাঁপড়ির উপর সন্তানেরা বসে আছে, যখন প্রতিবেশী কণ্ঠ তাদের ডাক দিচ্ছে এক পার্টির আয়োজন সম্পন্ন করতে। লন্, গান, ভাঙা দেওয়াল, কয়েকটা বেওয়ারিশ কুকুর, স্টার্ট-বিমুখ মটোরের কুন্থন-আওয়াজ, পুলিশের হুঁইসেল, বিদেশী রেকর্ডে 'আভামারিয়ার' একটানা সুরেলা ধ্বনি, পিণ্ডিশাহী ধ্বংস হোক, স্লোগানে বিধ্বস্ত মানচিত্র। এই নরক থেকে আমি মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি...মাঁই বেকসুর হুঁ...আমি নিরপরাধ, শুনে রাখো বেজন্মা বজ্জাতের দল... একদল হিজ্‌ড়ে সঙ্গিনের সামনে করজোড় প্রার্থনারত...খামোকা বিবেকের লড়াই...গাজী আবার বাসের জানালার শিক অজান্তেই চেপে ধরেছিল। কেবলমাত্র মূক থাকার জন্যেই কি তার এত স্বরসাধনা? এই সংগীত, এই কাব্য, ধ্বনির এমন বিচার, রাগের মেজাজের অনুধাবন। সবই তো দেখা যায় শঠতার বাহন। নচেৎ সে কেন চিৎকার দিয়ে উঠল না, 'মাঁই বেকসুর হুঁ', অথবা অপরাধের স্বীকৃতির জন্য কণ্ঠ বিদীর্ণ করে বললে না, 'আমি তোমাদের ধ্বংসের জন্যেই বাঁচব। মিথ্যের বেসাতির দল, বঞ্চনার মসনদ থেকে তোমাদের গর্দান ধুলোয় লুটোক অথবা কালনেমির মুগুর মত বঞ্চনার মসনদেই আবার ফিরে যাক, তার জন্যেই আমার জীবিকা। আমার অর্ধভুক্ত দেশবাসী তোমাদের হাতে অস্ত্র সাজিয়ে দিয়েছিল দেশরক্ষার জন্য, আজ কৃতঘ্নের মত তাদের ধ্বংস করছ ছলনার পাশা খেলে। যা তোমাদের স্বার্থরক্ষী তা-ই ইসলাম। যা করাচী, ইসলামাবাদকে ঝক্‌মকে রাখবে তা-ই পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা...বেইমানের দল...দূর হও অথবা ধ্বংস হও।'

ঢোক গিললে গাজী রহমান, কী যেন তার গ্রীবায় আটকে গেছে, সহজে নামছে না। শূন্য সীট দুটোর উপর চোখ পড়তেই তার বুক ধক্ করে উঠল। ওই দুটি জওয়ান ছেলে হয়ত আর বাড়ি ফিরবে না। অশেষ নির্যাতনের কাহিনী নিপীড়কদের বাইরে, কারাপ্রকোষ্ঠ শুধু জানবে। এই যমালয় থেকে কবে মুক্তি পাব আমি? কবে মুক্তি পাবে বাংলাদেশ? প্রশ্ন এখন সোজাসুজি খাড়া হয় না। ছেঁচা স্নায়ুদল থেকে নির্গত শব্দের আকারে চিন্তাগুলো অসংলগ্ন, তবু জানান দিয়ে যায়। ওই দুই সীটের উপরকার শূন্যতা গাজী রহমানের দিকে যেন এগোতে থাকে এবং তাকে যখন ঘিরে ধরে, সে তুলকালাম আত্মধিক্কারে মত্ত হয় : ভীরু, কাপুরুষ, না-মরদ। প্রতিকারের মুহূর্ত পেরিয়ে গেলে সব কর্তব্য; বিশ্লেষণ হিজড়ে-কীর্তনে পরিণত হয়। তা গাজী রহমানের চেয়ে কে আর বেশি জানে।

নেপথ্য ফিসফিস ধ্বনি আবার কানে এসে পড়ে না শুধু, শব্দের উৎস-ভূমিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার আকর্ষণ পর্যন্ত রাখে। তা গাজী রহমানের জন্য কিছুটা স্বস্তিপ্রদ। অন্তত আত্মসংগ্রামের বোঝা ঈষৎ হালকা হয়।

— কইলো বউ। হের মা আছে না?

— তা নইলে পয়দা অইল ক্যামনে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আহা মায়েও পথ চাইয়া থাইকব।

— এদের মারব নাকি?

— মোডাতাজা শরীর। রক্তসব নিয়া নিবো। তহন আর কী দিয়া বাঁচাইব?

— রক্ত লয় ক্যান?

— আস্তে কথা কও, মিয়া।

শব্দের উৎসভূমি এবার পরিষ্কার দেখা যায়। দুই পৌঢ় চাষী। অতি সাধারণ জীর্ণ বেশ, জীর্ণ দেহ। পাশের দিকে সীটে বসে আছে।

গাজী রহমানের ইচ্ছা হয়, সে নিজের গ্রীবা দুই হাতে টিপতে টিপতে ওদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আদেশ করে 'তোমারাও কথা বলতে ভয় পাও? তোমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র। আর আমিও বহু ডিগ্রি অর্জনের পর তোমাদের খুঁটাতেই বাঁধা রয়েছি। আমাকে খুন করো। অপদার্থ, ভীরু...। গলা টিপে আমাকে খুন করো, করো, ...। বালাই ঘুচে গেছে। মূর্খ আর পণ্ডিত সমান ওজন। কারণ, বিবেকের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উবে গেছে। তাই সকলে সমান পল্‌কা, ভারহীন। এই নরকমুক্তির লগ্ন কবে আসবে?' গাজী রহমানের নিকট নিমেষে সবকিছু অর্থশূন্য প্রতিভাত হয়।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা— যাদের জন্যে একটু আগে সে বিচ্ছেদ-ব্যথা অনুভব করেছিল, তা আর কোন আবেদন রেখে যায় না। চতুর্দিক লণ্ডভণ্ড। আদিগন্তবিস্তৃত মৃত্যুর সড়ক। ব্যক্তিগত আদিখ্যেতা এই রাজ্যে বেঢপ দন্তনির্গত হাসির পরম ঠাট্টা। পাগলের মত হেসে উঠতে পারলে হয়ত সব গুমোট কেটে যেত। কিন্তু হাসির সংজ্ঞা গাজী রহমানের কাছে দেড় মাস অজ্ঞাত। কিরণ রায় এবং রেজা আলির সাহচর্যেও সে প্রাণ খুলে হাসেনি। রসিকতা দিয়ে দুঃখ চাপা দেওয়ার হদিস তাঁরা জানে। রেজা আলির মুখাবয়ব কত গম্ভীর। তিনিই সুহৃদসংসর্গে বিদূষক। কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য-বাদকের পক্ষেই বৃন্দাবনলীলা সম্ভব। গাজী রহমানের লড়াই ছিল বারো আনা মগজের ব্যাপার। তাই সহসা-আঘাতে হতবুদ্ধি। যন্ত্রণার মোড় মুহূর্তে মুহূর্তে দিক বদলায়। এই চকিত অপ্রস্তুতি পাঁজর ধরে টানে, রক্তের চলাচল বন্ধ করে দেয়। চোখ আর দেখে না। ওই তো ধাবমান বাসের সঙ্গে দৌড়রত মোহিনী বাংলাদেশের জনপদ, তরু-সজ্জ, ঈষৎ জমাট মেঘ, বস্তুবিরহিত ফালি ফালি রঙ, গগন-প্রান্তে কোলাকুলিমত্ত জনপদ, মেঘ, নদী। সকলেই আকর্ষণ-ক্ষমতারিক্ত। অথচ চৈতন্যের দরজায় কেউ ব্রাত্য নয়। বিস্রস্ত দৈনন্দিনতা সহ্যশক্তি অপহরণ করে। দেড় মাস নিয়মিত আহার-নিদ্রার সঙ্গে পরিচয় নেই। তার চেয়েও মারাত্মক মিনিটে মিনিটে প্রাণভীতি। কলিজার ধুকধুকানি একেবারে থেমে যায় না কেন? আর কোন বালাই থাকত না। একটি আত্মার পরিত্রাণ ঘটত। কিন্তু দেশে মানুষ কি রয়ে যেত না? এই অবশেষই তো জীবনের গতি সচল রাখে। ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, মানবগোষ্ঠি বিনষ্ট হয় না। গাজী রহমান হঠাৎ তেজপ্রাপ্ত, নিজের সঙ্গে বেশ যুক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করেছিল। সুতরাং তার যন্ত্রণার অবসান ঘটতে পারে, কিন্তু যাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছে তাদের যন্ত্রণার জের মিটবে না। এমন পক্ষপাত-বিশিষ্ট মানসিক গঠনই কি তার সারা জীবনের সাধনার ফল! নিজেকে সে প্রতারণা করেছে অথবা যথা-দীক্ষায় দীক্ষিত হয়নি। ভণ্ডামির মুখোশ খুলে পড়ে ক্রান্তিকালে। আসলে ছা-পোষা মধ্যবিত্ত প্রবীণ শিক্ষক মাত্র সে। তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি নিজেরই কল্যাণ-কামনা? নিজের কাছে ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল গাজী রহমান। হয়ত একটা বোঝাপড়া হতো। আহ! কিরণ রায় কি রেজা আলির সংসর্গ-ছাপ তার ওপর এসে যেত। কিন্তু তখনই আর একদিক থেকে নোক্তা পড়ল।

— স্যার?

আচমকা ছাত্রের ডাক। সে তো ছোট ব্যবসায়ী। শিক্ষক নয়। তবু জবাব স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবর্তী কর্মের মত বেরিয়ে যায়, 'কি?'

প্রশ্নকর্তা কে, তা জানার কথা তো গাজী রহমান ভাবেনি।

'স্যার', ফিসফিস শব্দে জবাব এল, 'স্যার, আমাদের নামতে হবে।' সৈয়দ আলি এ .ত্তলা-দাতা।

— আচ্ছা।

— আপনার ব্যাগ আমার হাতে দিন।

— সামান্য ঝোলা আমি নিতে পারব।

— তা হয় না, স্যার।

শেষ সম্বোধনে চকিত হয়ে ওঠে গাজী রহমান। বাসে আর কেউ শুনছে না তো। তার মত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কেউ স্যার ডাকবে কেন? সন্দেহ জাগতে পারে। শিক্ষকতা তার কাছে অতীতের ব্যাপার। আবার কেন ওই সম্বোধন? বাঁচার জন্যে এখানেও মিথ্যের সঙ্গে আপস। নপুংসকের প্রেমাকাঙ্ক্ষা কিন্তু অকৃত্রিম সত্য।

AMARBOI.COM

৫

সামনে আরো দুই ভদ্রলোক। একজন ফরসা চেহারা। চোখে চশমা। শিক্ষক, সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবী মনে হয়। ময়লা লুঙ্গি এবং পিরান মানুষটাকে চাপা দিতে পারেনি। অন্যজন বেঁটে, বেশ গোলগাল চেহারা। কর্মকুশলতার ছাপ তিন দিনের দাড়ি ভেদ করেও বেরিয়ে আ ছে।

এরা কারা?

তাই সন্দিগ্ধ গাজী রহমান সৈয়দ আলিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়। কিন্তু সে সুযোগপ্রাপ্তির আগেই মজকুর ব্যক্তি তাড়া দিলে, 'আপনারা যদ্দুর সম্ভব জোরে হাঁটেন। তবে দৌড়াবেন না।'

সৈয়দ আলি লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। বাকি তিনজন অনুপদী। কেউ পেছনে পড়ে নেই। কিন্তু গাজী রহমান সৈয়দ আলিকেও ছাড়িয়ে গেল। জায়গাটা সে দেখে নিলে। বাঁধের উপরকার পাকা রাস্তা ছেড়ে নিচে নেমে গ্রাম-পথ ধরতে হয়েছে। সামনে দেড় মাইল মাঠ। তারপর গ্রাম-সীমানা আরম্ভ। ডহর এলাকা। মাঝে মাঝে সরু খালের রেখা এখনই দেখা যায়। চারিদিকে জলাভূমির প্রাধান্য। রাস্তা কখনও শুকনা, কখনও কাদা। সকলের পরনে লুঙ্গি, জুতা হাতে। সুতরাং হাঁটার কোন অসুবিধা ছিল না। ফরসা ভদ্রলোক সঙ্গে ছাতা নিয়েছিলেন। বগলদাবা হাঁটছেন। হংফং করেছেন বেশ। অর্থাৎ এমন পথহাঁটা অভ্যেসের বাইরে। কিন্তু সৈয়দ আলির নির্দেশে সকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি সক্রিয়। গাজী রহমান সকলের দশ-বারো হাত অগ্রগামী। পদব্রজের সঙ্গে তার যে খুব পরিচয় ছিল, তা নয়। কিন্তু আজ সে অনুপ্রাণিত। বিরাট মাঠের মধ্যে চারজন প্রাণী। লোকালয়ে না পৌঁছলে আর মানুষ দেখা যাবে না। মাঠে কাজকর্মরত একজন চাষীও নেই। সাত-আট দিনের মধ্যে পেকে যাবে, এমন ইরিধানের ক্ষেত পড়ল দুপাশে। জনহীনতার, বোধহয়, এই একমাত্র কারণ। মাঠে কাজের কোন সুযোগ নেই।

সৈয়দ আলির তাগিদ সকলকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। প্রথমত, পরিচয়ের গা নেই কারো। আরো জোরে জোরে হাঁটা আলাপচারিতার অনুকূল নয়। গাজী রহমান নিজের ভেতরে গোঁজা। তার বেরিয়ে আসার কোন আগ্রহ নেই। অপর দুইজন কী উদ্দেশ্যে সঙ্গী, জানা না-থাকার ফলে তার সন্দেহপ্রবণতা বার বার চাড়া দিয়ে ওঠে। একপাশে সৈয়দ আলিকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যেত। কিন্তু সে বার বার যেভাবে পেছন দিকে তাকাচ্ছে আর ঠ্যাং ফেলছে, আশঙ্কা হয়, কী যেন তাকে স্বাভাবিক থাকতে দিচ্ছে না। আর সৈয়দ আলিকে, তা-ও তার কাছে অজ্ঞাত বললেই চলে। রেজা আলির বিশ্বস্ত চেনা লোক। এটুকুই ভরসা। অনিশ্চিত গন্তব্যের ধাক্কা কিন্তু এতটুকু গাজী রহমান অনুভব করছিল না। এই নরকে যেভাবে দিন গুজরান, তার চেয়ে যেখানেই গিয়ে পৌঁছাক না কেন সে, এত যন্ত্রণা থাকবে না অন্তত। দেবতার না হোক, মানুষের বাসযোগ্য হবে বৈকি তেমন এলাকা। নিঃশ্বাসের তেজী-মন্দির খেল্ অহরহ— এমন ব্যবসা থেকে অন্তত সে রেহাই পাবে। কাজেই দুই পা মনের সঙ্গে সমান্তরাল তেজ বজায় রেখেছিল। অপর দুই ভদ্রলোক সমানভাবেই অনুপ্রাণিত। যদিও ক্লান্তির ছাপ মুখে। গাজী রহমান সকলের আগে যেন দৌড়তে পারলেই আরো খুশি হয়। সৈয়দ আলির নির্দেশনামা তাকে নিবৃত্ত করে রেখেছিল।

কুড়ি মিনিট কি জোর পঁচিশ মিনিটে তারা পথটুকু অতিক্রম করে এল। সৈয়দ আলির কৃশ শরীর, কিন্তু পোড়-খাওয়া, হাতে আবার ব্যাগ। তবু সে বাজি জিতেছিল আগে। শেষ পর্যন্ত গাজী রহমান তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারে নি।

প্রথমে একটা পুকুরপাড় আর বাঁশবন সামনে পড়ল। ওপারে গেরস্থ চাষী-বাড়ি। পাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা আছে জনপদের আরো ভেতরে যেতে।

সৈয়দ আলির ফরমান শোনা গেল, 'স্যার, আপনারা বাঁশবনের ওই পাশে চলুন, তাড়াতাড়ি আসুন আমার সঙ্গে।'

পুকুরের পাড় একদম খটখটে শুকনা। থেবড়ে বসে পড়ল গাজী রহমান। এত জোরে আর জীবনে কোনদিন সে হাঁটে নি। অপর দুইজনও শিক্ষকের পথ অনুসরণ করলে।

ঝিরঝির বাতাস বইছিল। সৈয়দ আলি বললে, 'আপনারা জিরিয়ে নিন। বর্ডার এখান থেকে আট-ন' মাইল।'

বর্ডার!

আলিবাবা মন্ত্র উচ্চারণের পর এইমাত্র যেন রত্নগুহার দরজা খুললে। গাজী রহমান অকারণ পুলকের স্পর্শ অনুভব করে। একদম অপ্রত্যাশিত, গুমোট সরে যাচ্ছে কাছ থেকে। নার্ভগুলো পর্যন্ত শুনেছে 'বর্ডার'! আর তাই সতেজ হচ্ছে ক্রমশ।

গাজী রহমানের আর কোন সন্দেহ থাকে না সঙ্গীদের উপর। সকলেই এক বাথানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরু। পরিচয়ের খিল আর এঁটে রাখা অশোভন। জানা গেল, সঙ্গী দুজনই মাথায় হুলিয়া-খাড়া রাজনৈতিক কর্মী এবং মাইনরিটি। তাদের স্ত্রী-পুত্রাদি আগে চলে গেছে অন্য মুসলিম পরিবারের সঙ্গে। দুইজনেই দুর্বিপাকে পড়েছিলেন গ্রামে মিলিটারি হামলার সময়। পরে রেজা আলি এই ব্যবস্থা করেছেন।

সৈয়দ আলি অবিশ্যি তাদের কথা যেন শুনছিল না, এমন ভাব। আরো কারণ আছে। ক্লান্তিকর বাতাসে সংলাপ জমে উঠল, সৈয়দ আলি, যেদিক থেকে তারা এসেছে, সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে উচ্চারণ করলে, 'দেখুন—।' বাঁশবনের আড়ালে তারা বসেছিল। তখনই উৎব্যগ্র দৃষ্টি ধেয়ে যায় তর্জনির সোজাসুজি। তিন-চারখানা মিলিটারি জিপ, একটা বড় কেরিয়ার বিকট শব্দ তুলে পাকা রাস্তা পার হচ্ছে।

ফিসফিস এবার সৈয়দ আলির আওয়াজ, 'খুব বেঁচে গেছি স্যার।'

ভয় পেয়ে যায় গাজী রহমান এবং প্রশ্ন করে, 'কেন?'

'স্যার' সব তো খেয়ালের ব্যাপার। রাস্তা থেকে এই গাঁয়ের পথ দেড় মাইলের কম নয়। চারজনকে একসঙ্গে দেখে— ধরুন এক মাইল চলে আসার পরও— যদি হাঁকত, 'এই ইধার আও', তখন কী করতাম? মনে রাখবেন, চীনা মেশিনগানের গুলি দেড় মাইল যায়। ফিরে যেতে বাধ্য হতাম। তারপর হয় ছেড়ে দিত জিজ্ঞাসাবাদ করে, না হয় চোখে কালো ফেটি বাঁধত। কিন্তু এখানে আর না।'

সৈয়দ আলি গ্রামের আলপথে ওদের নিয়ে হাঁটতে লাগল। আবার উপদেশ দিলে সে, যদিও অনুরোধ মলাট, 'আপনারা আর কোন কথা বলবেন না। গাঁয়ের ভেতর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, আমি জবাব দেব।'

তার পরই একটু থেমে সে ব্যাখ্যা জুড়ে, 'গ্রামে দালালরা অনেক সময় খামকা হয়রানি করে। আমার এই এলাকা সুপ্রশস্থ। রাত্রে থাকারও জায়গা আছে। ঘাবড়াবেন না।'

AMARBOI.COM

আগের উল্লিখিত নাবি বা ডহর এলাকা। অর্থাৎ ডাঙার চেয়ে জলের আয়তন বেশি। তাই এবার রাস্তার মোকাবিলা বেশ দুরূহ হয়ে উঠল। পথে কাদা। মাঝে মাঝে জল ভাঙতে হয়। কাপড় অর্থাৎ লুঙ্গি অবিশ্যি এই ক্ষেত্রে সমন্বয়ের জন্য তোফা। কোমর পর্যন্ত তুলে যাও। তারপর পানি যদি কমে তুমিও নামেও। মাঝে মাঝে পচা কাদার গন্ধ বমির উদ্রেগ করছিল। কিন্তু নাকের ঘ্রাণশক্তি তখন বড় কথা না। তাই উচ্চবাচ্য থেকে সকলেই দূরে। চিরাচরিত পল্লীশ্রী চোখের নিকটে ছুটে আসে। কিন্তু মেহনত এত বেশি যে কারো চোখ আর নিরীক্ষণে এগোয় না। সৈয়দ আলি আরো বলেছিল— বর্ডার এলাকার পাঁচ মাইলের মধ্যে সান্ধ্য আইন জারি হয় সূর্যাস্তের পর। অতএব দিনের আলোর সদ্ব্যবহার একান্ত দরকার। অবশ্যি মাভৈঃ বাণিও ছিল সঙ্গে। এইরকম পচা জায়গায় কে তদারকে আসবে? সুতরাং ঘাবড়াবেন না। কেবল আলো সম্পর্কে একটু সাবধান হলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

এবার কিন্তু ঘন ঘন সরু খাল পড়তে লাগল। কোথাও কোথাও স্রোত আছে। তেমন ডহর নয়। তাই এখনও চরম অসুবিধার সম্মুখীন কেউ নয়। বার বার সাঁতার দিতে হলে শেষ পর্যন্ত উদ্যম ফুরিয়ে যেতে পারে। সৈয়দ আলি ছাড়া আর সকলেই পৌঢ়। গ্রামের লোক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে। সৈয়দ আলি হুঁশিয়ার ছেলে বটে! নিকটস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু গ্রাম এবং অধিবাসীদের চেনে। তাই হয়ত প্রচ্ছন্ন দালালও তাদের ঘাঁটতে সাহস পায় না। সৈয়দের জবাব জবাব নয়, হাতুড়ি ঠিক পেরেকের মাথায় গিয়ে পড়ছে।

এক জায়গায় তারা বেশ ঠেকে গেল। সরু খাল। আর একটু সংকীর্ণ হলে লাফিয়ে পার হওয়া যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। হঠাৎ ঝুঁকি গ্রহণের ফল, কাপড়-চোপড় ভিজে যাবে। তখন হাঁটা শুধু শ্লথ হবে না, কষ্টের পরিধি এমন বাড়বে যে, সান্ধ্য আইনের কবলে পড়ার আশঙ্কা। তবে উপায় হয়ে যায়। একটা ডোবানো ডিঙির পানি ছিঁচে তারা পারযোগ্য করে তুললে।

গাজী রহমান কিন্তু ক্লান্তির কথা আদৌ ভাবে নি। সে যেন খোলস ছাড়ছে। বসন্তের বাতাসকে সাপ এই অবস্থায় নবদেহে তেজের কোমল স্পর্শ মনে করে এবং চঞ্চল এদিক-ওদিক ছোটে। গাজী রহমানের তেমনই অনুভব। ঘামে শরীর নেয়ে গেছে, কিন্তু তার পদক্ষেপ অব্যাহত আছে। অবারিত গগনের নিচে এই জনপদের মধ্যে একগণ্ডা প্রাণী পরিমাপে কত ছোট। অথচ তাদের কামনা, আবেগের বিস্তৃতি হাজার হাজার মাইল জুড়ে। দেশ-দেশান্তর, গৃহ-গৃহান্তর, ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমারোহের ওপর কী প্রবল গতিতে না আছড়ে পড়ছে এবং তখনই অন্য অবলম্বনের অন্বেষায় হন্যে হয়ে ছুটছে। নিসর্গের পটভূমি এখানে অবান্তর হয়ে যায় না, তবে তার প্রতিবেদন স্তব্ধ থাকে। গাজী রহমান কি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেখত না, ধানবনের গোড়ায় জমা পানির পাশে চরের অভিরূপ ঈষৎ ডাঙার উপর দিয়ে কীভাবে শামুক বা গুগ্‌লি হাঁটে? বিশেষত এমন চলাফেরায় মাটির উপর যে সব দাগ পড়ে, দাগ অথবা রেখা, তা-ও আদিম মানুষের ছবির সঙ্গে অনেক সময় মিলে যায়। এই সাদৃশ্য প্রকৃতির অহরহ নকশাহীন ঘূর্ণি-বুদ্বুদকেও রেহাই দেয় না নিয়মের আওতা থেকে। নিরন্তর পরিবর্তন প্রবাহও প্যাটার্নের ছাপ রেখে যায়। অন্য সময় এমন সব চিন্তা গাজী রহমানের মনে দেখা দিত। আজ পথ চলাই তার কাছে একমাত্র সত্য। আর প্রাণভীতির জুলুম অত নেই। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা এক একবার টুঁ মেরে যাচ্ছিল। সঙ্গে দুই ভদ্রলোক খুব সোয়াস্তি নয়। দাগী সরকারি আসামী। বিরূপতা পোষণ এমন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু রাস্তার ভিজে এবং কোথাও কোথাও গা ঘিনঘিন চেহারা, বহু অবান্তর বা সঙ্গত চিন্তা শুষে নিচ্ছিল। পাশের এক ভিটের উপর কৌতূহলী ছেলেমেয়েদের দিকে একটু তাকায় না গাজী রহমান। চারজনেই নিঃশব্দে হাঁটছিল সেদিন। কৌতূহলী বা দুরভিসন্ধিমনা ব্যক্তির জবাবও দিতে হয়। ফলে, চলায় ব্যাঘাত ঘটে। ঝোপঝাড়, কলমিলতা বোঝাই ছিপছিপে জলো মাঠ, সরু আলপথ, রক্তদর্শী ভাঙা শামুকের খোসা, হাঁটু-পানিতে ঝপঝপ পা ফেলার শব্দ, আঘাটার অনুৎসাহ, নড়বড়ে সাঁকোর ধর্ণিহীন সম্বোধন, জলঢোঁড়ার পিঙ্গল সতর্কতা, হঠাৎ হঠাৎ পানকৌড়ির উড়াল ও শিশুসুলভ পালাক্রমিক ডোবা-ভাসা, শাপলার রগরগে ইঙ্গিত— এমন লীলাপট তো নিরন্তর ঋতু-বদলের সাক্ষী, পর্যটকের শ্রান্তিহর নয়নাশ্রয়। আজ বিপর্যস্ত চারজন তখন কেবল একটি নৌকার জন্যে আগে থেকেই চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখছিল। এই লোকালয় ঈষৎ ঘনবসতি, পথ খটখটে ডাঙা। কিন্তু আর যাওয়ার উপায় নেই। সামনে কয়েক মাইল জুড়ে বিলের প্রসার। এত বিস্তৃত জল ভেঙে গন্তব্যে পৌঁছানো দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, এই বিল মাঝে মাঝে এত ডহর যে সাঁতার পারার্থীর একমাত্র উপায়। কিন্তু অনিশ্চয়তা এখানে বাধা। কতক্ষণ

সাঁতার দিতে পারে একজন?

ভিটার নিচে দূর্বাঘাসের উপর তারা বসে পড়ল। নৌকা ছাড়া গতি কোথায়? সুতরাং অপেক্ষা করো। ওদিকে বেলা ঢলে আসছে, তা আশঙ্কা আরো বাড়িয়ে তোলে।

কয়েকজন গ্রামবাসী এসে পৌঁছল। জিজ্ঞাসাবাদ চিরাচরিত ব্যাপার। এই সময় দেখা গেল, লাঠির সাহায্যে এক যুবক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাদের দিকে হেঁটে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাসে গাজী রহমান কিছু তাগদ ফিরে পেয়েছিল। যুবকের দিকে সে তাকায়। আখাম্বা জওয়ান, চওড়া হাড় আর গতরে, এই পল্লীর মধ্যে এমন চেহারা চোখে পড়ার কথা নয়। আরো গ্রামবাসী এসে জুটছিল। নৌকার বন্দোবস্তের জন্য তারা বেশ সহৃদয়।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জওয়ান ছেলেটা লাঠির উপর ভর দিয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। গাজী রহমান নৌকার কথা আপাতত আর তুলতে চায় না। আশঙ্কা অনেক কিছু। তাই মনের মোড় ফেরাতে সে সৈয়দ আলির নির্দেশ ভুলেই জিজ্ঞেস করে বসল, "নাম কী বা-জী?"

— আলম।

— বয়ো, বয়ো।

কিন্তু সে বসলে না দেখে গাজী রহমান শুধায়, "আপনে জিগান, গুলি করেছিল কেডা?"

"হ।"

"আপনে বুড়া মানুষ আজও জানেন না, গুলি আবার কোন্ হালারা করব? ওই পাঞ্জাবী—।" তার পরই সে একটা পচা খিস্তি জুড়লে।

গাজী রহমান এদিকে বড় ধোপদুরস্ত। খিস্তি তার কানে গেলে অনেকক্ষণ জের চলত। আজ তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। বরং আরো সহজ গলায় উচ্চারণ করে, "আহা, এমন খুবসুরৎ জোয়ান-পোলা তারে অকেজো কইরা ছাড়ল।"

AMARBOI.COM

আলম এই সহানুভূতির পালটা দিলে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে, "ও কথা মুখে আনেন না। ডাক্তারবাবু কইছিলেন, দু-তিন হপ্তা লাইগব সারতে।"

সত্যিই আলমের জখম খুব গুরুতর নয়। রাইফেলের গুলি যখন মন্দীভূত গতি, তখনই পায়ে এসে লেগেছিল। অবিশ্যি তার আগে বহুজন ধরাশায়ী হয়।

— গুলি অইছিল কোথায়?

— আমার মামুর গাঁয়ে।

উপস্থিত গ্রামবাসীরা সব ঘটনা জানে। তারা কিছু জিজ্ঞেস করলেও আলমের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যদি আবার শোনা যায়।

গাজী রহমান জিজ্ঞাসা-অজিজ্ঞাসার মাঝখানে অবস্থান, মুখ খোলে, "তোমার মামাবাড়ি— "

"আজিমগঞ্জ এলাকা।"

"গুলি কবে হয়?"

"হিসাব করণ পড়ে। তহনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্তিফৌজের দখলে আছিল।"

"বারো-তের এপ্রিল হবে।"

"সাব, আমরা তো আর হিসাব রাখতে পারি না।"

"তা যা-ই ওক্, কী অইছিল?"

"আপনের কওয়া লাগে", এই উচ্চারণের পর যুবক ঈষৎ মুখ বিকৃত করলে। যেহেতু আঘাতের জায়গায় কিছু যন্ত্রণা হচ্ছিল। একটু হাঁফ ছেড়ে সে মাটির উপর বসে পড়ল। বাম পা একদম সোজা করতে পারে না। একটু বাঁক থাকে হাঁটুর কাছে।

আলমের মুখ স্বাভাবিক হতে বেশি সময় যায় না। বিলের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে সে বললে, "সাব, ঘরে বইস্যা আছি, এই দুঃখে আর বাঁচিনে।"

— ক্যান, মিয়া-বাই।

— লড়ায়ের অক্তে (সময়) জওয়ান মান্‌ষের কাম ময়দানে।

—তা ঠিগ।

সায় দিয়েছিল গাজী রহমান।

আরো মানুষ জুটে যায়। বিকালে অনেকে কাজকাম থেকে ফারাক, আড্ডার মৌতাত-সন্ধানী।

আলমের মুখে বয়ান শোনা গেল।

ঘটনা ঘটে আজিমগঞ্জ এলাকায়। সেদিন ভোর হয়েছে মাত্র, আবছা আলোয় দেখা গেল, পনর জন রাইফেলধারী পাঞ্জাবী সৈন্য জেলা বোর্ডের সড়কের উপর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে। তখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকা মুক্তিফৌজের অধীনে। সম্ভবত, কুমিল্লা ক্যান্টন্‌মেন্ট থেকে এদের পূর্বে পাঠানো হয়েছিল। কোন্ কারণে এই পনের জন মূল রেজিমেন্ট থেকে ছিটকে পড়ছে। মুক্তিফৌজের চাপের সম্মুখেও এই ব্যাপার ঘটতে পারে। সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এই এলাকায় বিহানের অক্তে তারা পনরজন হাঁটছিল। গ্রামবাসীদের ঘুম তখন কারো ভেঙেছে বা কারো ভাঙেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘটনা একজনের কাছে জানা হয়ে গেল, তা বিদ্যুৎবেগে শত শত মানুষকে ছুঁয়ে যেতে লাগল। যাদের সকালে বিছানায় পড়ে থাকা সাবেক অভ্যেস, তারাও আর কাঁথার উমে বন্দী নয়। ধড়মড়িয়ে উঠল না শুধু, হাতের সামনে যা পেলে, বাঁশ, কোঁচ, লাঠি— তুলে নিয়ে সড়কের দিকে দৌড় দিলে। চারিদিকে ধাইতে লাগল। মিলিটারি হুয়ারের পুৎ গাঁয়ে ঢুকছে। সূর্য সবে-মাত্র ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শত শত লোক মিলিটারিদের পেছন পেছন হাঁটছে, গুলির লক্ষ্যের বাইরে। একদিকে হাতিয়ার অতি হালফিল রাইফেল, অন্যদিকে মান্ধাতা আমলের লাঠি। সূর্য উঠেছে। ওদিকে জনতার ভিড় এবং উত্তেজনা সমান তালে বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে আগে মিলিটারিরা হাঁটে, পেছনে অনুসরণ-রত জনতার দঙ্গল। দুই দিকে শব্দের তেমন ঘটা নেই। বুটের আওয়াজ জনতার অনুচ্চ রবে ঢাকা পড়ে যায় নি। কিন্তু এই উত্তাল অবস্থার ভেতর দাহ্যমান মানসিক উপাদানগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। হঠাৎ স্লোগানে সকালে শান্ত পৃথিবী সচকিত হয়ে উঠল :

"জয় বাংলা, জয় বাংলা।"
"বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ।"
"শেখ মুজিব জিন্দাবাদ।"
"মৌলানা ভাসানী জিন্দাবাদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের প্রারম্ভ। কিন্তু মনে হয়, উত্তেজনা যেন সমাপ্তির সড়কে এইমাত্র পা রাখল। আর শতে শতে নেই জনতা। হাজারে হাজারে। শুধু পাকা রাস্তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম নয়, আশেপাশে পাঁচ মাইল ছ' মাইল দূরবর্তী গ্রামের মানুষ পর্যন্ত ছুটে এসেছে। সকলে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। তখনও সৈন্যরা নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছে। আর জনতা হায়দারি হাঁক হাঁকছে দু-তিনশ গজ দূর থেকে।

: জয় বাংলা।

: জয় শেখ মুজিব।

গ্রীষ্মের সূর্য আর সদয় নেই। এই তুমুল উত্তেজনার সঙ্গে এসে যোগ দিলে। শব্দও ক্রমশ তারাগ্রামের দিকে অগ্রসর। হাজার হাজার মানুষের বজ্রনাদ কম্পন তুলছিল।

দশ-বারো মাইল দূরে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট। সৈন্যবাহিনীর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। কোন নিরাপদ আশ্রয়ও তাদের নিকটে থাকার কথা নয়। আর আশ্রয় হস্তস্থিত হাতিয়ার। কোন্‌টার উপর তাদের লক্ষ্য বেশি ছিল, তা হানাদারেরাই জানে।

এতক্ষণ মানুষ আসছিল দুপাশ থেকে। এবার চারপাশ থেকে জনতা ছুটে আসতে লাগল। অবশ্যি কেউ কেউ খালি হাত। যে কিছু পায় নি, সে দশ ইঞ্চি ইট অন্তত চার টুকরো করে তার দুই হাতে নিয়েছে। রাইফেল বনাম পাটকেল। তবু লড়াই করতেই হবে। যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি। বাতাস ফিসফিস শব্দে সকলের কানে মন্ত্র দিচ্ছে। পঙ্গপালের মতো গ্রামবাসীরা ধেয়ে আসছে চতুর্দিক থেকে। খালবিল ঝাঁপিয়ে ডহরডাঙার কোন ভেদ না রেখে। গন্তব্য আসল। পথ যা-ই হোক। তের-চৌদ্দ বছরের এক কিশোর এক হাঁটু কাদা সহ উপস্থিত। সোজা রাস্তা প্রয়োজন তার। পায়ে কাদা থাকলে কি লড়াই করা যায় না? বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়ে, ঝুঁড়ি, লাফ খেয়ে পড়তে সে চিৎকার করে উঠল :

— জয় বাংলা

— বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ

— জঙ্গীশাহী ধ্বংস হোক।

যাদের হাতে লাঠি ছিল, তাদের অনেকেই অনুকরণ শুরু করে দিলে। যে যদ্দুর পারে মাটি থেকে উপর দিকে আকাশ-অভিসারী, তারপর বসুন্ধরার বুকে পদস্পর্শমাত্র হাঁক মারে : জয় বাংলা। এক হাতে এক ডজন ব্যাঙ ধরতে গেলে যেমন দিক-জ্ঞান থাকে না, যেহেতু ব্যাঙের লাফের উপর দৃষ্টি, তেমনই গন্তব্যের উপর চোখ থাকায় সবাই স্থানকালের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। এক ব্যক্তি ইট ছুঁড়তে লাগল মিলিটারিদের দিকে। পাঁচশ গজ দূর পর্যন্ত তার ইঁট পৌঁছবে না, সেদিকে তার খেয়াল বেমালুম গায়েব।

দুমাইল রাস্তা এইভাবে অজানিতে জনতা এবং সৈন্য পার হয়ে এসেছে। কোন দিক থেকে এখনও চোটপাট শুরু হয় নি। কোলাহল এতক্ষণে সমুদ্রকল্লোলের রূপ নিয়েছে। চিৎকার, মন্তব্য, কথাকাটাকাটি— তারি মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ শ্লোগানের যতিচিহ্ন— অন্যান্য শব্দের মসনদ চুরমার করে দিয়েছিল। বেসবুর যুবকেরা দৌড় মেরে গুলির রেঞ্জের মধ্যে ছিটকে পড়ে, বারণ শোনে না। এখানে অবিশ্যি কেউ কারো কথার গোলাম নয়। বাইরের এত চাঞ্চল্য, ফেটে পড়ার উদগ্রতা, কিন্তু হৃদয়কন্দর উৎসারিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে শিল্পীর মত সকলে ভাবলেশহীনতার মৌন অনুভব করছিল। স্লোগান তার বাহ্যিক প্রতিরূপ নয়। গৃহবিবাগী উন্মাদনাসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্লোগান তার বাহ্যিক প্রতিরূপ নয়। গৃহবিবাগী উন্মাদনাসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্লোগান পঙ্গু। তার কারখানা একমুহূর্তে চালু হয় না। দিন রাত্রি, অতীত বর্তমান, জ্ঞান-অজ্ঞান বহুদিন সক্রিয় থাকার পর তার সম্মোহ্ ঝলসে ওঠে। সুর্মা-পরার মতো তখন যে-যার সাধ্যানুযায়ী তা চোখে তুলে নেয়। এই দৃষ্টিই ফল্গুদৃষ্টি যার মৌন এদের এত শব্দপ্রিয়তা এবং আকুলতা দান করে।

সূর্য তেতে উঠেছিল ক্রমশ। জোয়ান কিশোর, প্রৌঢ় এমন কি কয়েকজন বৃদ্ধ পর্যন্ত সামিল ছিল এই জনদেহের মধ্যে। এক আত্মা। প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোর বসুন্ধরার চত্বর জরিপ করছে আহার্যের সন্ধানে। বিরাট। তার মধ্যে কুৎসিত কিছু আছে, তবু মহিমময়। তারই হুঙ্কার গ্রামবাংলার শান্ত ছবি ফ্রেম থেকে খসিয়ে ফেলেছে। দুর্দম এই প্রাণশক্তির আলেখ্য শুধু চোখে ধরা যায় না। যারা শরিক, তারা যেন অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। আর দূরে অবস্থানকারীরা দর্শকের মতো তামাশা দেখে। তাই একত্রে শরিক এবং তামাশাদর্শী না হতে পারলে এখানে মুহূর্তের স্পন্দন অনুভব অসম্ভব। এগিয়ে চলেছে একদল মানুষ, মারণাস্ত্রের স্বরূপ বোঝা যাদের কাছে আর নিষ্প্রয়োজন। প্রাণ দাও অথবা নাও। মাঝামাঝি পথ এখন রুদ্ধতাই কেবল গলা ফাটিয়ে সৈন্যদের পিছু নিয়েছে কত কিশোর। একদম রিক্ত হস্ত। হাতিয়ারের ধার সে ধারে না। এই ঐক্যতানে জোয়ারী তাদের প্রাধান্য থাকলেও বাদ্যযন্ত্রের নিজস্ব রূপে সবাই বাজছে, রাগের ধর্ম বজায় রেখে বিস্তারের স্বাধীনতায়।

প্রৌঢ় এক চাষী, হাতে তেলাপাকা বাঁশের লাঠি, চিৎকার দিয়ে বললে, "ভাইসব, আমরা কি হালাগো লগে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত হাঁটতেই থাকমু?"

প্রশ্ন সময়োপযোগী। সত্যিই তো, তারা কি শুধু অনুসরণার্থে এত লোক ফজরে ফজরে কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে এসেছে! প্রশ্ন সুতোর মত সকলকে জড়ায়।

"হাঁচা কথা।" নেপথ্যে কয়েকজন কোরাসে মন্তব্য বললে।

— আর দেরি না। বিসমিল্লা, কাম আরম্ভ করা যাক।

— অহনই!

— অহনই।

বেষ্টনি ব্যূহ যে যেদিক থেকে পারে সৈন্যদের ঘিরে ধরতে লাগল। এতক্ষণ পনর জন বেশ হাঁটছিল। অবিশ্যি সম্মিলিত স্লোগান তাদের সন্ত্রস্ত করেনি, তা যাচাইয়ের পথ রুদ্ধ ছিল। কিন্তু তাদের পদক্ষেপ শুধু দ্রুত হল না, ট্রিগারে হাত প্রস্তুত রইল।

— জয় বাংলা।

— বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ।

— জয় মুজিব।

তৃতীয়বার 'জয় মুজিব' উচ্চারণের পর কিন্তু আর কেউ স্থির থাকল না। সামনের দিকে দৌড়ে এগোতে লাগল, হাতে যার-যা অস্ত্র সহ।

ফট্‌ট্‌...

ফট্‌ট্‌...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইফেলের গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল তখনই। জনতার ঘূর্ণিতোড় কিন্তু মন্দীভূত হয় না। চারিদিক থেকে গ্রামবাসীর হামলা। তাই সৈন্যরা এদিক-ওদিক রাইফেলের নল ঘোরাতে বাধ্য। গুলির আঘাতে কয়েকজন ধরাশায়ী, কয়েকজন আহত হামাগুড়ি দিয়ে এই ভিড় থেকে একপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। জনতা লাঠি বল্লম বাঁশ কোঁচ ইত্যাদি নানা কিসিমের হাতিয়ার নিয়ে কিন্তু পেছ্-পা হচ্ছে না। আহতদের দিকেও সতর্ক নজর আছে অনেকের। মাঝপাড়ার মজিদ দরজির উরুর উপর গুলি লেগেছিল। গুরুতর যখম। তাকে সাহায্য করতে গেলে সে কিন্তু খেঁকিয়ে উঠল, "ভাইসব,. যে-যার কামে যান, আমার দিকে নজর দেবেন না, খোদার কসম। যে যার কামে যান।" কিন্তু তার রক্তস্রোত দেখে দু-তিন জন এগিয়ে গেল, খোদার কসম মানলে না। মজিদ দরজি তখন চিৎকার দিয়ে উঠল, "নিজেদের কামে যান। আমিই পিছাইয়া পড়লাম—।" মুখের কথা জড়িয়ে আসে, তবু বেশ কষ্টেই সে অনুরোধ উচ্চারণ করলে, "বাচুম না। হে তো বুঝছেন। এক কাম করেন।" সঙ্গীরা আদেশের অপেক্ষায়। "আমাকে ওই উঁচু ঢিবির উপর গাছের গুঁড়ির লগে বসাইয়া দ্যান, আমি লড়াই দেখমু। দেখমু আমার দ্যাশের মান্‌ষে কেমন লড়ে। তয় মরণেরও সুখ।" প্রতিবেশীরা তার শেষ অনুরোধ রক্ষা করলে। চ্যাংদোলা মজিদ দরজিকে নিকটস্থ ঢিবির এক গাছের গুঁটিতে সে ঠেস-বসিয়ে দিলে। মৃত্যুর পূর্বে অসম যুদ্ধের ফলাফল সে শুনে গিয়েছিল। কারণ, তার লোকান্তর ঘটে আরো চার ঘণ্টা পরে। খবর শুনে সে উত্তেজিত। বাড়ি যেতে চেয়েছিল পুত্রকন্যাকে দেখার উদ্দেশ্যে। বাড়ি সে গিয়েছিল বৈকি, কিন্তু প্রাণহীন।

গুলির পর একটা ছত্রভঙ্গ ভাব। দশ পনের মিনিট কাটে। পানাবনে ঢেলা মারার পর পানাকুল প্রথমে হটে যায়, তারপর আবার ফাঁকা জায়গার দিকে যেমন এগোয়, এখানে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ তেমন রূপ নিলে। গুলি খাওয়ার পর অনেকে ধরাশায়ী হয়। জখমীদের স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন চলল। কিন্তু আবার দম্‌কা বাতাসের মত যারা অবশিষ্ট থাকে তারা মরিয়া, প্রতি-আক্রমণে এগোয়। ঐ লাঠি-সোটা নিয়ে। লোহার জবাব বাঁশ।

কিন্তু সিপাইগুলো বেশ একটা অসুবিধায় পড়ল। চারদিক থেকে বেষ্টনি এগোনোর ফলে তাদের বিন্যাস বদলাতে হয়। চারজন চারদিক রক্ষা করে। ফলে এক এক দিকে চারজন। কিন্তু এমনভাবে অবস্থান নিলে আবার এগোনো চলে না, পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আক্রমণে এই একদিক সম্পর্কে সতর্কতা রণনীতির পয়লা সবক, যা বেতনভুক সিপাইরা ভালমত জানে। ওদিকে কর্ণবিদারী স্লোগান নির্বান্ধব এই জগতে বৃথা যাচ্ছে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। একটা মোটা বটগাছ আশ্রয় করে শেষে সিপাইরা অবস্থার কিছু উন্নতি সাধন করলে। মোটা গাছ। এক দিক থেকে অন্তত আক্রমণ বন্ধ থাকবে। এখানেও অসুবিধা। যদি মোটা গাছের সোজাসুজি বিপরীত দিক থেকে কেউ আসে, তাকে আবার দেখা যাবে না। এই শত্রু মরিয়া। অস্ত্রশস্ত্র নেই। অথচ লড়তে এসেছে। আনাড়িকে শিক্ষিতের যেমন ভয়, এখানেও তা-ই ঘটে। গুলির আঘাতে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। সকলেই এখানে মজিদ দরজি। জীবনের শেষ সীমান্তেও মনোবল হারায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদিকে বেষ্টনি সংকীর্ণ হয়ে আসছে। লড়ায়ের আর একটা ফ্রন্ট বাড়ল। নিকটস্থ গাছপালায় অনেকে উঠে পড়ল, ঝুড়ির মধ্যে ইঁট-পাটকেল নিয়ে, তারপর ছুঁড়তে লাগল। যুদ্ধের সময় পঞ্চম ফ্রন্ট। দু একজন গুলির ঘায়ে গাছ থেকে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে সবকিছু সব সময় এত প্রাণঘাতী নয়। ইঁট পাটকেলের বৃষ্টি হতে লাগল মাঝে মাঝে। এবার সিপাইরা প্রমাদ গণলে। দশ হাজার লোকের বেষ্টনি ভেদ করে তাদের পশ্চাদপসরণের পথ বানাতে হবে। প্রমাদের বোধহয় আরো কারণ ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় মুক্তিফৌজের সংঘর্ষে তারা দলছুট হয়ে গেছে। এই ধারণা অমূলক নয়। তারপর মার্চ করে করে এসেছে সারারাত। ফলে ধকল অনেক গেছে। সকালের খাওয়া, নৈশ ঘুম— এসব ছাড়াই এই বেষ্টণির মোকাবিলার সম্মুখে পনর জন মাত্র প্রাণী। ওদিকে গুলির ভাণ্ডার তো একসময় শেষ হয়ে যাবে। আগেকার মত গুলি আর সিপাইরা খরচ করছে না। ওদিকে জনতাও অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে, হয়রানি বাড়িয়ে তুলতে পারলেই এক সময় স্রেফ শান্তির চোটেই ওরা লড়ায়ে ইস্তফা দেবে। শ্লোগানের তীব্রতা এবার আরো বাড়ছে। গাছের ডাল থেকে পর্যন্ত গায়েবি আওয়াজের মত শোনা যায়, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ইসলামাবাদ ধ্বংস হোক" ইত্যাদি। এক একবার দুই দিকের স্তব্ধতা মনে করিয়ে দেয়, না, কোথাও কিছু অশান্তি নেই। পৃথিবী যেমন চলত তেমনি চলছে। দুই কুস্তিগীর দাঁউয়ের খোঁজে যেমন একে অপরের দিকে চেয়ে স্থাণু দাঁড়িয়ে থাকে টান-টান পেশী, সর্বাঙ্গের প্রতি মনোযোগ-এ-ও তার অবিরূপ। সিপাইরা যে প্রমাদ গণেছিল, তা ধরা পড়ল, যখন দেখা গেল, তারা শুধু একদিকেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে বেষ্টনি খানিকটা ফাঁকা করল। তারপর সেই ফাঁক-পথে তারা দৌড়াতে লাগল। প্রাণপণ দৌড়। আর পেছনে তাকাচ্ছে না তারা। গুলি ছোঁড়াও বন্ধ। এইভাবে তারা নিরাপদে কোথাও পৌঁছে যাবে, বোধহয়, নিজেদের মধ্যে স্থির করেছিল। জনতাও তখন পিছু-ধাওয়া উল্লাসে ছুটতে থাকে। পেছনে পঞ্চাশ-ষাট জন মৃত, আহতের সংখ্যা আরো ঢের বেশি। কিন্তু তখন এমন হিসাবে কারো মন ছিল না। জনতা সিপাইদের পেছনে ছুটতে লাগল লাঠি-উঁচু, মরিয়া এবং প্রতিশোধপরায়ণ সংকল্পে অটল। কেউ কেউ ধুয়ো দিতে লাগল, "ভাগছে, হালা পাঞ্জাবী ভাগছে।" "বাংলাদেশের লড়ায়ের সাধ একদম মিটাইয়া দিমু।" "ধর খান্‌কির পুত্‌দের।"

পঞ্চনদের পঞ্চদশ অধিবাসীর তখন আর লড়াইয়ে মন নেই। চরণই সকল হাতিয়ারের চরম। কোন্ দিকে তারা যাবে, এখনও আগে থেকে স্থির ছিল না। সোজা দৌড় মারছে, কোনদিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। জনতার মধ্যে তখন উৎসাহ আরো শতগুণ বেড়েছে। গাছে উঠেছিল, তাদের কয়েকজন নামার কথা ভাবছে না। সেখান থেকেই চিৎকার দিচ্ছে, "ওই যায় হালারা। পাকড়াও পাকড়াও। আমাদের বহুৎ মারছে।" দু-এক জন গাছ থেকে সিপাইদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারছিল না। তারা তাড়াতাড়ি নেমে জনতার সাথ ধরলে।

পনর জন পাঞ্জাবী সিপাই রাইফেল হাতে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই দৃশ্যে কয়েক ব্যক্তি এত উল্লসিত যে হাততালি দিতে লেগে গেল। হয়ত মৃতদের মধ্যে তার ভাইও থাকতে পারে, সেদিকে আর খেয়াল ছিল না। ধর— হালাদের ধর— এই রব পেছন থেকে হাজারে হাজারে একত্রীভূত ত্রাসের সৃষ্টি করবে— বিচিত্র কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয়, দম ফুরিয়ে এসেছিল অথবা দৈহিক এবং মানসিক দুই তাগদ নিঃশেষ, পনর জন জওয়ান শেষে সম্মুখস্থ এক মসজিদের ভেতর ঢুকে পড়ে জানালা দরজার খিল এঁটে দিলে। পুরু বেষ্টনি তখন ক্রমশ নিকটতর, মসজিদের চতুর্দিকে বাসুকীর মত গর্জমান : শালা কেউয়াড়ি খোলো। কাহা ভাগে গা এৎনা খুন লে কর?

অভিজ্ঞতা থেকে প্রাণের অপচয় কমে।

আলম বলে যায়, "হালাগো হাতে রাইফেল আছে। দরজা ভাইঙতে গেলে যদি গুলি ছোঁড়ে, মানুষ খামোকাই মইরব। তার চেয়ে আগুন লাগান ঢের সোজা।"

সেখানে সমস্যা উঠল, অন্য বাড়ি হলে স্বতন্ত্র কথা, এ তো মসজিদ। জনতা দ্বিধান্বিত। কোঁচ সড়কি, শাবল ইত্যাদি শানানো রয়েছে। কেবল লক্ষ্যস্থলের অভাব। মসজিদ এক অসুবিধায় ফেললে তাদের। কিন্তু সহস্র সহস্র মাথার মধ্যে আক্কেল কোথাও পাওয়া যাবে না— এ কথা অবিশ্বাস্য। যুবক কয়েকজন সলাপরামর্শের পর অপারেশনে মন দিলে।

"আমার সাক্ষাৎ মাম্‌তো বাই জহীর একডা ফন্দি দিলে", উচ্চারণ করল আলম এবং সেই টানে সে বলে যায়, "হগ্‌গলে সেই মত কাম করতে লাগল।"

কাজ খুব সহজ। আবহমান বাংলাদেশ মাঝে মাঝে তা প্রয়োগ করে এসেছে সাপের ক্ষেত্রে। সাপকে গর্তছাড়া করতে।

শাবল দিয়ে মসজিদের ছাদ কিছুটা ছিদ্র করে তারপর মুঠো মুঠো পোড়ালঙ্কা জনতার কয়েকজনে ভেতরে ফেলতে লাগল। এই ধোঁয়ার প্রতিক্রিয়া সকলের জানা। বাইরের থেকে মসজিদের দরজার শিকল তুলে দেওয়া হয়েছিল, যেন বাছাধনেরা আর বেরুতে না পারে।

ফল ফলতে শুরু করলে। একটানা কাশি। তারপর দরজা জানালায় মাথা কোটাকুটি। শেষে কান্না, চিৎকার : "ভাইয়া বাঁচাও। মাঁই মুসলমান হুঁ।" আর কিছুক্ষণ পরে মসজিদের অভ্যন্তর শব্দ-শূন্য হয়ে গেল। বাইরে জনতাও এবার স্তব্ধ। আরো বাকি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি।

জানালা ভেঙে পনরটা বেহুঁশ লাশ বের করা হলো। তরুণ জওয়ান সব ক'টি পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে বয়স। একজনের পকেটে মাকে লেখা চিঠি পাওয়া গেল। ডাকে দেওয়ার জন্য লিখেছিল আর ফেলা হয় নি। পত্রদাতার নাম শের খান। ঝিলমের কোন গ্রামের অধিবাসী। চিঠি অবশ্যি মামুলি। তবে কয়েকটা খবর পাওয়া গেল। শের খান এক জায়গায় লিখেছে: "এখানে আসার আগে শুনেছিলাম, বাঙালিরা মুসলমান নয়। তাহারা হিন্দুদের সহিত বসবাস করিয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছে। তাই পাকিস্তান চায় না। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি মসজিদ আছে। আজান্ দেয়। লোকে নামাজ পড়ে। তাই বড় তাজ্জব লাগে। এখানেও দেহাতে লোক আমাদের মত বড় গরীব, চেহ্‌রা তন্দুরস্ত নয়। আমাদের পাহাড়ি এলাকার লোক যেমন গর্তে থাকে, এখানে ঝুপড়িগুলো সেই রকম..."

বাকি পারিবারিক সংবাদ। ভাই-বোনদের খোঁজ খবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলম শেষে বলে, "আমাগো পঁয়ষট্টি জন মরছিল। আমারে নিয়া দুই শ' যখম। তাগোরে কবর দিলাম এক লগে। ওই পনর জনেরও হেই বন্দোবস্ত। মুসলমানের লাশ। মান্‌ষে কইল শরীয়ৎ মোতাবের দাফন হওন উচিত। ওদের জানাজা পড়লেন ঐ মসজিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমাম সাব। তিনি কইলেন— হাদিসে আছে আপন দেশকে ভালবাসাই ঈমান।"

কথাটা গুছিয়ে বলতে পারে নি আলম। হাদিসে আছে. "হাব্বুল ওয়াতান মিনাল ঈমান।" অর্থাৎ দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

তারপর আলম বললে, "ইমান সাব কইলেন, ঠিগ্ করছেন, হাল্যাদের সবক দিছেন। তবে জানাজা ফরজ (অবশ্যপালনীয় শাস্ত্রীয় ক্রিয়াচার)।"

নেপথ্যে একজন বলে উঠে, "সাব, আপনাগো নাও আইয়া পড়ছে।"

গাজী রহমান আলমের দিকে তাকিয়ে আরো ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। সেও তো দেশকে ভালবাসে। তার এই মানসিক জোর নেই কেন? বয়স, ভদ্রলোক হওয়ার ফল, প্রাণভয়? না, আর কিছু!"

গাজী রহমান জবাব পায় না। তার প্রয়োজন ছিল নৌকার।

৬

নিস্তব্ধতা কতদূর মর্মঘাতী হতে পারে?

প্রেমিক-প্রেমিকা গৃহবন্ধনের প্রশ্নে প্রত্যাখ্যান হয়ে স্তব্ধ মুখোমুখি বসে থাকে। তখন বেদনা তো এক-তরফা। অতীতের সম্পর্ক হয়ত কিছু অসোয়াস্তি সৃষ্টি করতে পারে প্রত্যাখ্যানকারীর মনে, তার প্রসার সংকীর্ণ, অপর জনের দুঃখব্যথার মত নয়।

কিন্তু যখন শত শত, লাখ লাখ মানুষ একই বেদনার ভারে মূহ্যমান এবং যীশু খ্রীস্টের মত যে-যার যন্ত্রণার ক্রুশ কাঁধে এগোয় একদম চুপচাপ, সেই নিস্তব্ধতার স্বরূপ কি পরিমাপ করা যায়? এই জন-ধারা বাইরে থমথমে সমুদ্রের মত, উপরে আলোড়ন-মুক্ত এই পদচারণা কল্লোলহীন। কিন্তু তার চেয়ে মর্মঘাতী স্তব্ধতা আর কিছু নেই পৃথিবীতে।

AMARBOI.COM

ঢাকা শহর সন্ধ্যার আগেই মরে যেত। আততায়ীর লক্ষ্য-আকর্ষণের আশঙ্কায় নগরবাসীরা বাতি জ্বালত না। অন্ধকার প্রেতাত্মার জননী, স্তব্ধতা প্রেতাত্মার সহচরী। গোটা নগর তাদের আপ্যায়নে একদম চুপ করে যেত। ঘরে মানুষ আছে। কথা বিরল উচ্চারিত, তবু আছে। নৈঃশব্দের এমন মোড়ক তত ভীতিপ্রদ নয়। কিন্তু যখন জনতা বাকহীনতার মাদুর বিছিয়ে যায়, তখন পূর্বাশঙ্কার চেয়ে ভূতুড়ে-গন্ধী আবহাওয়া কেবল ভয়াবহ মনে হয় না, বরং হৃদপিণ্ডে টান পড়ে সজোর হেঁচকায়।

শহরতলীর পাশে এক বাঁশের ঘরে কয়েকদিন কাটিয়েছিল গাজী রহমান। যানবাহন না থাকলে বা অভাব ঘটলে, ঢাকা শহর ছেড়ে যাওয়ার এই পথ অতি উত্তম এবং নিরাপদ। দুমাইল হাঁটলেই তুমি বরকন্দাজদের আওতামুক্ত। দিনে তখন কোথাও বেরুত না সে। কিন্তু তার জানালাপথে দেখা যেত, হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতা কাতারে কাতারে নিঃশব্দে এগোচ্ছে, চিরাচরিত বাঙালিসুলভ হৈচৈ-মুক্ত। মানসিকভাবে তাদের সামিল গাজী রহমান। অসহ্য লাগত তার কাছে এই নৈঃশব্দের বহর। আনমনা কখন জানালা বন্ধ করে দিত সে জানত না। তবু রেহাই ছিল কি? একা একা বাঁশের ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করত নিরুপায় আত্মকরুণায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধতার অলক্ষিত আঘাত এমন কঠিন হতে পারে সে পূর্বে উপলব্ধি করেনি। অথচ হামেহাল মানে-অভিমানে, ক্রোধে, আস্পর্ধার প্রতি ঘৃণায় আকস্মিক চুপ হওয়া কত স্বাভাবিক। পরিধি, প্রসার তার রূপ বদলে দেয়। লাখ লাখ লোক পলাতক। এই অদৃশ্য কিন্তু স্তব্ধতার জনক হতে অক্ষম। পাখির ঝাঁক বারুদের গন্ধ বা অন্য কোন আশঙ্কায় উড়াল দেয়। তাদের চিৎকারই ভূমিকা, অপরের প্রতি সতর্কতার নোটিশ। সব ক্ষেত্রেই এমন ধারা প্রবাহিত। এখানে প্রাণাশঙ্কা আসল হদিস নয়। দাম্ভিকের জুতাপেটা খেয়ে সহায়হীন ব্যক্তির স্তব্ধতা কতকটা এই নির্বাকতার কাছাকাছি যায়। কিন্তু স্রোত যেমন তরঙ্গে পরিণত হয় বাতাসের চাপে, এই ক্ষেত্রে অপমান-জর্জর জ্বালা তেমনই পেষণের কারিগর। সকলেই ইজ্জৎ হারিয়ে একে অপরের কাছে ছোট হয়ে গেছে। এই চেতনা আর কাউকে মুখ খুলতে দেয় না। অপমানিত তার পিঠের ছড়া-দাগ আবৃত রাখে পর-চক্ষু থেকে। তাই সকলে নিজের আবরণে আবৃত। কেউ কথা বলতে পারছে না।

গোটা বাংলাদেশ স্তব্ধ। শব্দের মালিক তারাই যাদের হাতে মেশিনগান প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্র আছে, পিতলের নক্ষত্র উর্দির উপরে বসিয়ে যারা নিজেদের ভাবে পৃথিবী এবং আকাশ-বিজেতা।

ঢাকা শহরের সেইসব দিনরাত্রির স্মৃতি গাজী রহমানকে পীড়িত করছিল। এখানে নৌকায় সকলে চুপচাপ। দুই সঙ্গী পাটাতনে একপাশে গুড়িসুড়ি ঘুম দিচ্ছে অতি মৃদু নাসিকা-নিনাদ সহ। ক্লান্তি তাদের রেহাই দেয়নি। সৈয়দ আলি বেশ ঝিমিয়ে পড়েছিল। সে হাই তুললে তিন-চারবার। অন্য দুজনের সঙ্গ ধরতে চায়— বোধহয়। কিন্তু গাজী রহমান ঠুঁটো বসে রইল। সাবেক নিস্তব্ধতার স্মৃতিচিত্র তার চোখে লেগেই থাকে একনাগাড়।

এই বিল খুব ছোট নয়। পাশে তিন মাইল হবে। অবিশ্যি শব্দের জগৎ এখানে সীমিত এবং অনুচ্চ। দাঁড় ফেলার শব্দ, হঠাৎ-হঠাৎ পাখির ডাক— তা-ও বাজখাঁই কোন গলা নয়, খুব জোর ছিল। সেদিক থেকে স্তব্ধতা এখানে প্রসারিত। গাজী রহমান তাই সম্ভবত সোয়াস্তি পায় না। অনড় বসা থেকে মাঝে মাঝে সে পাশ বদলায়। একবার কনুয়ের উপর হাত রেখে সেও শোয়ার চেষ্টা পেলে, কিন্তু তখনই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বিছানায় কাঁটা থাকার প্রয়োজন নেই, মন যদি নির্বিবাদ না হয়। বিলের কাকচোখা জল সেও আঁজলা ভরে হাত-মুখ ধোয়ার পর পান করলে। একবার আকাশ দেখে নিলে, ঊর্ধ্বমুখ। সূর্যের তাপে তেমন কামড় নেই। বেলা চলে গেছে। সে-ও এক অসোয়াস্তি। বর্ডার এলাকায় কারফিউ জারি আছে। সময়-মত পৌঁছতে না পারলে ফ্যাসাদ বেধে গেলেই হলো। সৈয়দ আলির আশ্বাস অবিশ্যি সেদিক থেকে সহায়। পূর্বাশঙ্কা গাজী রহমানের নিকট আর মোটেই বিপুল আকারে হাজির হয় না।

বহু দূর জুড়ে বিলের উপর কলমিলতার শয়ান মূর্তির উপর কতগুলো লাল ফড়িং লেজের হাওয়া দিতে বেশ ব্যস্ত। গাজী রহমান তা দেখেও দেখলে না। পানির বিস্তার আকাশ-তটে কোথাও বিবাগী। এই লম্বা দৌড় আনমনা হওয়ার জন্যে সুবিধাজনক। প্রৌঢ় শিক্ষকের দৃষ্টি কিন্তু অস্থির। একবার স্থিতি পেলে ঘুমন্ত দুই সঙ্গীর মুখের ওপর। তাদের বক্ষস্পন্দন দেখা যায় মৃদু নিঃশ্বাসের তালে তালে সমতা বজায় রেখেছে। অমন ঘুম এলে মন্দ হতো না। কিন্তু বিনিদ্রতা যার কাছে ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার ইচ্ছাশক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয় কম-জোর। নিজের এই দুর্বলতার মুখোমুখি হতে গিয়ে গাজী রহমান রাস্তা বদল করলে। বলদের শিং পাকড়ানেওয়ালার শরীরের মধ্যেও কয়েকটা বলদ থাকে। সে সত্যিই কম-জোর মানসিক তাগদের ক্ষেত্রে। কিন্তু জীবনে অনেক প্রলোভন তা হলে কী করে সে এড়িয়ে এসেছে? সেখানে বিপদ অত প্রত্যক্ষ নয়। প্রাণের টানাটানি ছিল না। গাজী রহমানের কাছে আত্মসমীক্ষা আজ ভয়াবহ। ওই পথ মাড়ানোর চেয়ে বরং অসোয়াস্তির অকারণ সমতলে ঘোরাফেরা ঢের আরামপ্রদ। সৈয়দ আলি একবার কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। গাজী রহমান খুঁচিয়ে প্রশ্ন বের করতে পারত। দুই দিকে অনিচ্ছা এখানে কিন্তু এক ধরনের নয়। সৈয়দ আলি নিজেকে যত ঢেকে রাখতে পারে ততই তার আনন্দ। অভিজ্ঞ শিক্ষক তখন দূরত্ব বজায়ে মশগুল। বিষে বিষক্ষয়। স্তব্ধতার পরিধি আরো বাড়ুক, সব ফুৎকারে উড়ে যাবে। এখানেও শ্রেণীভাগ আছে। সব নৈঃশব্দের উৎস তো এক নয়।

বিলের জল জায়গায় জায়গায় খুব কম। একবার নাওয়ের তলা ঘষ্-ষ্ শব্দে ঠেকে গেল। হঠাৎ তাল-ফেরতা ঘুমন্ত দুজন পর্যন্ত ঝাঁকুনি খেলে। গাজী এবং সৈয়দ আলি নৌকার কিনারা জাপটে তাল সামলায়। এবার নৌকা সরগরম হওয়ার কথা। কিন্তু সঙ্গীরা আবার যথাস্থানে ফিরে গেল। ওদের চোখ থেকে ঘুম যায়নি। এই সব ছোটখাট দুর্যোগ অনেক সময় অস্বাভাবিকতার মুখবন্ধ হতে পারে। কিন্তু এখানে কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

দাঁড়ী মাঝি দুজনেই বোবা, নিজ কর্তব্যে মোতায়েন। দূরে তীরস্থ গাছপালা অস্তিত্ব জমাট রঙে পরিণত করেছে। আশপাশের ছবি পর্যন্ত ঘুলিয়ে গেছে তার সঙ্গে।

একটা আওড় ফিরল নৌকা। সৈয়দ আলি তখন গাজী রহমানের কানের খুব কাছাকাছি মুখ এগিয়ে ফিস ফিস শব্দে ডাক দিলে, "স্যার— !"

হয়ত ভেতরের জের অব্যাহত আছে। তাই গাজী রহমান কোন জবাব দিলে না, সৈয়দ আলির মুখের ওপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রাখল। ফিসফিস শব্দের ভেতর আবার কথা ভেসে উঠল, "স্যার আমরা বর্ডারের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। নৌকা খুব জোর আর তিন মাইল।"

আচমকা ধাক্কা খেলে গাজী রহমান। কথাগুলো তাকে অস্থির করে তুললে। এতক্ষণ স্তব্ধতার সমুদ্রে যন্ত্রণার বুঁদ, তার কিন্তু চাঞ্চল্য ছিল না।

"তিন মাইল!" গাজী রহমানের বুকের মধ্যে কথাগুলো সেঁধিয়ে রইল। কিন্তু অস্থিরতার আকর্ষণে সে তখনই নৌকা থেকে ঝাঁপ দিলে বিচিত্র কিছু ঘটত না।

নৌকার এক কিনারা আবার বাসের শিকের মত চেপে ধরে নিজের অভ্যন্তরে পরিব্রাজক গাজী রহমান। বাইরে তার কোন চিহ্নই পৌঁছায় না। কেউ দেখে না বিক্ষুব্ধ শিক্ষকের সম্মুখে কী প্রতিমূর্তি ভেসে ভেসে উঠছিল!

মাঝি চালাও, জোরে চালাও, আরো জোরে-জোরে চালাও। তোমার নৌকা হাঁটে না কেন?...এ কোথায় আনলে?...এমন সুড়ং। অন্ধকার। তারই ভেতরে কোথায় যাবে? জোরে চালাও জোরে— আরো জোরে। দেখছ না চারিদিকে দোজখ। অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ

AMARBOI.COM

জ্বলছে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য নরনারীশিশু দলে দলে এবং ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে আর-এক কুণ্ডের মধ্যে। এরা কেউ কিন্তু কোন পাপ করেনি। গ্রামের সাধারণ মানুষ। কুঁড়েঘরে বাস। বাঁশবনের অন্ধকারে পেঁচার সঙ্গে মৈত্রী পাতিয়ে অনেকে জীবন খোয়ার করে দিয়েছে। কেউ পাপী নয়। কারো পাকা ধানে মই দেয়নি একজনও। বরং ওদের ঘটিবাটি গরু নিলামের পরে জরুর দিকে চোখ পড়ত এবং সেও একদিন ক্রোক হয়ে যেত— অস্থাবর মালের আর এক কিসিম।

কিন্তু এরা পাপী। পাপের সংজ্ঞা কে দেবে? আমার ইচ্ছার বিরোধী হলেই তুমি অসৎ আর অসৎ অর্থ পাপের দোসর। ওরা কারো মর্জির ওপর নিশ্চয় লাথি মেরেছে। তাই পাপমূর্তি। পূর্বে পাপ করত ভগবানের বিরুদ্ধে। এখন তার জায়গায় মানুষ বসিয়ে দাও, জবাব পেয়ে যাবে। তাই অগ্নিবোমায় পাপের শাস্তি হয এখন। ন্যাপামে গায়ের চামড়া ছড়ে-ছড়ে খসে যায়। ভগবানের নরকের শাস্তি তড়িঘড়ি হতো। এখানে তিলে তিলে দগ্‌দগির উনুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে তোমার সেদ্ধ মাংস আর কাক-চিলেও আহারযোগ্য রাখবে না। হাল যুগের মাদারিরা এই আজব খেলার আবিষ্কারক। তাই পূর্বে তুমি পাপ বা অন্যায় করতে এক এলাকায়, এক এলাকার মানুষ বা মানুষগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এখন তোমার পাপ বিশ্বময়, আর আগেকার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ নেই। তোমার পাপের শাস্তি দিতে আসবে গোটা পৃথিবী না হোক, অন্য দেশ, অন্য জাতি। কারণ তুমি দাঁড়িয়েছ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে— যখন তারা দুজন আবার সাঙাৎ। তুমি আর গোষ্ঠী-জীব নও, তুমি আন্তর্জাতিক। মানুষ হিসেবে তোমার উন্নতি। তাই তোমার বিনষ্টির পথ কত সহজ, কত সুগম। তোমার অত্যাচারী রাজা না এঁটে ওঠে তোমার সঙ্গে, নিঃশঙ্ক নির্ভাবনায় বগল বাজিয়ো না। তাদের স্যাঙাৎরা ঠিক তোমার বুক-বরাবর মেশিনগান ছোঁড়ার জন্যে মহড়া নিয়ে আগে থেকে বসে আছে। তুমি সর্বহারা হলেও তোমার প্রত্যাশা যেন অন্য সর্বহারাদের রাষ্ট্রের দিকে না ধায়। সে তো হিসাব কষছে আত্মস্বার্থের। সুবিধা হলে পাশে আছে, অন্যথায় নেই। তোমার রাজা তো সর্বহারা নয়। দেখবে, স্বার্থ থাকলে তোমার রাজা তার ইয়ার, তুমি জুতা-বাহক, যা দিয়ে তুমি নিত্যি পেটা হও। তোমার লাল ঝাণ্ডার সামনে সে তো তেড়েমার ষাঁড়। তেড়ে আসবে। খাড়া-শিং। হেঁকে উঠবে পুরুষ্টু ষাঁড়, “আমার লাল রঙই আসল, তোমারটা নকল।” ন্যায়, অন্যায়? জোরে-- জোরে— চালাও, মাঝি। এই নরক থেকে আমি বাইরে যেতে চাই। কোথায় এলাম এই সুড়ঙ্গের ভেতর? কোথায়? আমি আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। তোমার বৈঠা জোরসে হাঁকাও। এ কোথায় নিয়ে এলে...???

ধন্যবাদ মাঝি, সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছ। কিন্তু এই জায়গাও তো প্রশস্ত তেমন কিছু নয়। বিলের উদারতার মধ্যে তবু অশান্ত প্রাণ চোখ মারফত দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে পারত। এ জায়গা সুড়ং না হলেও তার চেয়ে আর কত বড়ো? কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নরকে এমন চিজ দুষ্প্রাপ্য। একি চারিদিকে নানা ধরনের দোকানপাট! ছোট জায়গা, হঠাৎপ্রসারতার নির্দেশ তবু বজায় রাখে। তরতর স্বচ্ছ পানি বইছে ক্যানালের উপর। তোমার নৌকা তো আর নৌকা নেই। গণ্ডোলা। ভেনিস শহরের ভেতর দিয়ে কি আমরা আত্মার কোন সফরে বেরিয়েছি। এখানে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। কিন্তু দম নিতে গেলে, মনে হয়, নরক নিকটেই কোথাও আছে। ওহ্, জোরে চালাও, জোরে। স্বর্গ হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নরক হোক, আমার কিছু আসে যায় না। গতির হাতে নিজেকে সোপর্দ করেই আমি নিজেকে বাঁচাতে পারি। আমার বুকের তোলপাড় নেভে কই তাড়াহুড়া ছাড়লে। যুগ-যুগান্তে মুকুল ফোটাতে আমার থোড়াই কেয়ার। জোরে— আহ্ আরো জোরে। ক্যানেলের পারে হেমকান্তি এবং লালের আভায় ঝলমল ওটা কিসের দোকান? ভেনিস সুন্দরীরা নেই। তাদের দেহকাণ্ড ঝুলছে দোদুল-দুল। পাশে কি বড়শী-বক্র আংটায় গাঁথা? একটা ঠ্যাং তলপেটের নিচ থেকে কাটা। একটা কচি মুণ্ড শিকের মাথায় শোভা পাচ্ছে। যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগের কোন ভাস্কর্য? গণ্ডোলা থামাও মাঝি, একবার দেখে নিতে। একেবারে থামিও না। গতি ছাড়া আমি মৃত। নব নব উন্মাদনা আবিষ্কারের অসমর্থ মন যন্ত্রের ওপর তার ঝাল ঝাড়ে। তাই গতি...অগতির গতি...। গণ্ডোলা থামিও না। আমি লাফিয়ে নেমে যাব, আমার দেহও একটু গতি-সমন্বিত হোক। তুমি গণ্ডোলা চালিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও। আমি দৌড় দিয়ে তোমার নাগাল ধরব এবং আবার লাফ দিয়ে ঠিক উঠে পড়ব। ওটা ভাস্কর্য না কসায়ের দোকান, খোঁজ নিতে হয়। নচেৎ কৌতূহল না-মেটার অপরিতৃপ্তি আমাকে আরো হন্যে করে তুলবে!...এগোও, এগোও...

তোমার গণ্ডোলায় এমন উন্মাদের মত ছুটে এসে লাফিয়ে উঠলাম। এত হাঁপাচ্ছি দেখে বেশি অবাক হয়ো না। একটু দম নিই। আমার মুখেই শুনতে পাবে।...

...আজব বিপণি। শুধু নরনারী, শিশু, কিশোরদের দেহ-টুকরো ঝুলছে আংটা থেকে। গোটা কোথাও কিছু নেই। উরু, স্তন, দেহকাণ্ড— এমন নিছক অংশ পর্যন্ত আছে। কসাইগুলো কাটছে আর ঝুলিয়ে রাখছে। রক্তের এতটুকু অপচয় নেই। সব শিশিভর্তি গুদামজাত হচ্ছে। যতক্ষণ দর্শক ছিলাম, ওরা আমার দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে তাকায়নি। কিন্তু যেই জিজ্ঞেস শুরু করলাম, ওরা আমাকে ঘিরে ধরলে, কৌতূহল আমার কাল হলো। "কী হচ্ছে, এত জানতে চাও কেন?" একজন জিজ্ঞেস করে বসল, শাণিত ছোরা তার হাতেই বর্তমান।

— খরিদ্দার জিজ্ঞেস করবে বৈকি।

তারা অবাক হয়ে জবাব দিলে, "খরিদ্দার কোথায় দেখলে?"

"এটা দোকান না?" আমার প্রশ্ন।

— আমরা কিছু বেচি না।

— দোকান কি না?

— না, দোকান নয়।

— তবে এই বাজারে?

— ভাস্কর্য। অপরে দেখবে বলে।

— ভাস্কর্য?

— হ্যাঁ, জ্যান্ত মাংস লাশ বানিয়ে ভাস্কর্য। আমাদের ভাস্কর আবার রণবিশারদ সেনাপতি।

"বেশ। কিন্তু তোমাদের খরিদ্দার নেই কেন?" যেইমাত্র এই প্রশ্ন করেছি তারা আমাকে সাত-আটজনে ঘিরে ধরলে। প্রত্যেকের হাতে কসাইয়ের পেশায় যা-যা চিজ লাগে তার সরঞ্জাম সহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— এগুলো কী হবে?
— তোমাকে কসাই হতে হবে।
— আমি কসাই হতে যাব কেন?
— যাবে।
— মানে—?
— হবে। হতে হবে।
— জোরজবরদস্তি?
— তা-ই।
— যদি না হই?
— হবে। আলবৎ হবে।
— না, আমি কসাই হতে পারব না।

কথাগুলো উচ্চারণ মাত্র একজন খিস্তিযোগে বললে, "সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না। এটা আস্ত খান্কির পুৎ। জিজ্ঞেস করে, প্রশ্ন তোলে। কৌতূহলবৃত্তি টনটনে। জলদি লাও।"

দোকানের এককোণায় ডাণ্ডা, বেড়ি, আরো নির্যাতন-যন্ত্র যথা পাঁচশ পাওয়ারের বালব দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই, এবং বললাম, "এসব কী?"

"শোনো, আমাদের এখানে খরিদ্দার থাকে না। এখানে হয় তুমি কসাই অথবা তুমি মাংস। মাঝামাঝি রাস্তা বন্ধ।" একজনের মুখে এই কথা শোনামাত্র আমি বলতে পারব না কীভাবে ধ্বস্তাধস্তি শুরু করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। তারপর প্রাণপণ দৌড়েছি শুধু...। হয় তুমি মাংস অথবা কসাই...মাঝপথ এখানে বন্ধ...।

হাত চালাও মাঝি, দেরি করো না, ওরা পিছু ধায়, যদি এসে পড়ে! জোরে বৈঠা মারো, আমি আর পারছি না...তমসো মা জ্যোতির্গময়, অসতো মা সদগময়...

সৈয়দ আলি ঘুমন্ত দুই সঙ্গীর অনুপদী।

নির্জন বিল।

অন্তহীন স্তব্ধতার ছেদ ঘটছিল শুধু দাঁড় ফেলার ঝপাঝপ শব্দে।

৭

"মানব-অধ্যুষিত এলাকা নয়।"

আন্তর্জাতিক সীমারেখায় দুই দেশের মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গা ফেলে রাখা হয়, সেখানে কোন মানুষের বসবাস থাকে না, থাকলে দেওয়া হয় না। তার মধ্যে গেলে, ধরে নেওয়া যেতে পারে। তুমি আর মনুষ্য পদবাচ্য নেই, অর্থাৎ জন্তু। সুতরাং দুই সীমান্ত থেকে তোমার হত্যা-আয়োজন মোতায়েন থাকে। অবিশ্যি বেঁচে যেতে পারো। তার কারণ বিভিন্ন।

গাজী রহমান এবং সৈয়দ আলি এমনই সীমানার ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল।

সঙ্গী দুজন নিজেদের সিদ্ধান্তে দ্রুত পা চালিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে গেছেন। ওদের দুজনের পেছনে পড়ে থাকার কারণ ছিল। গাজী রহমানের দোমনা-ভাব। নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন দেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ। তা হারিয়ে গেলে তার প্রয়োজন তো শেষ হয়ে যায়। শুধু বাঁচাই বড় কথা নয়।

নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল সৈয়দ আলি। গাজী রহমানের বুঝতে বাকি থাকে না, সঙ্গী এক বিশদ ছেলে। এইসব কাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং রাস্তা জানা আছে।

দুইজনে কথাবার্তার আর রাখ্-ঢাক কিছু নেই। আশ্রয়ের জন্য সব বন্দোবস্ত আছে। নাম, ঠিকানা মুখস্থ করে নিয়েছে গাজী রহমান। দুইদিকে প্রয়োজন-মত সে যাতায়াত করতে সমর্থ।

কিন্তু সমস্যা বর্তমানের। সে এখন কোন দিকে থাকবে?

সময়ের প্রশ্ন ঠিক এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের সময় বড় হয়ে দেখা দিল। গাজী দশ-পনর মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে পারবে না।

বিপজ্জনক এলাকায় সতর্কতার প্রশ্ন আছে। শ্রান্ত-নার্ভ, গাজীর দ্বিধা কিন্তু ঠেলে ফেলে দিলে। কৃশ চেহারায় সৈয়দের অমন ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে ছিল, গাজী রহমান অবাক হয়।

— স্যার—।

— কী বলো।

— আপনার যা শরীরের অবস্থা রেজা সাহেবের মুখে শুনেছি, আপনি আজ সোজা বর্ডার পেরিয়ে ওদিকে যান। দেরি করবেন না।

— কিন্তু—।

— যোগাযোগের পথ তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। এখন সাময়িক বন্দোবস্ত। শর্ট টার্ম প্ল্যান।

সৈয়দ আলির কথাবার্তা মার্জিত মনের প্রতিধ্বনি মনে হয় প্রবীণ শিক্ষকের কাছে। অথচ চেহারায় তার প্রকাশ নেই। বিস্মিত হয় গাজী।

— আচ্ছা...।

— স্যার, দ্বিধা রাখবেন না। অবিশ্যি এদিকেও আপনার বন্দোবস্ত রইল। কিন্তু শরীর কিছু নয়, তা আর বলতে পারেন না। তাই আমি অনুরোধ করব, আপনি সোজা চলে যান। এই তিনশ গজ— যদি আপনি বলেন, আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

— তা আর দরকার হবে না।

—আমার হাতে আর সময় নেই।

গাজী রহমান চতুর্দিকে তাকায়। ভোরের আলো সবেমাত্র পুবের আকাশে জানান দিচ্ছে। রাত্রে এক চাষীর বাড়িতে ছিল তারা। রাত থাকতে থাকতে বেরুতে হয়। এই সময় নাকি এদিকে নিষিদ্ধ পারাপারের জন্য তোফা। আশপাশের চাষীরাই হাওয়া বলে দেয়। গণ্ডগোল থাকলে তারাই নিষেধ করে, এখন ওদিকে যাবেন না।

গাজী রহমানের জীবনের প্রথম উপলব্ধি— আত্মীয়তার এত যোগসূত্র এদেশের পথেঘাটে ছড়িয়ে থাকে! চোরডাকাত সংখ্যায় ক'জন? প্রকৃতির মধ্যে বিকৃতি অল্পসল্প থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ভোরের আবছা অন্ধকারে পথ-হাঁটার সময় অতিপ্রত্যূষে জাগর এক কৃষক সোজাসুজি বললে, "ঠিগ সময় বারাইছেন, মিয়াসাব।"

AMARBOI.COM

এই পথে হাঁটার উদ্দেশ্য তাদের জানা থাকে নাকি?

এই জায়গায় টিলার বহর বেশ কয়েক মাইল ছড়িয়ে রয়েছে। একদম সমতলভূমি নয়। এই বন্ধুরতা গাছপালার অবস্থান মনোহর করে তোলে। চোখ সহজে ক্লান্ত হয় না। এমনকি ঝোপঝাড়ের বিন্যাস অদ্ভুত ঠেকে। টিলার মধ্যিখান থেকে হয়ত সরু রাস্তা রয়েছে। হাঁটার সময় নিচে যেমন ঝোপের বিস্তার, উপরেও তেমনি। সমতলভূমির ঝোপঝাড়, যত ঘনই হোক, অরণ্যের আভাস দিতে অক্ষম। আজ অজানিতেই গাজী রহমানের এদিকে চোখ ধায়। নিজেই সে অনুভব করে, শুধু ঈষৎ জায়গা-পরিবর্তন তার দেহের ওপর স্বাস্থ্যপ্রদ নিঃশ্বাস ফেলতে তৎপর।

আর একটু পরে সূর্য উঠবে। তার ঝিলিক ঐ বনানী-শীর্ষে। নিচে অন্ধকার এখনও সরে যায়নি। এই আলো-আঁধারির সমন্বয়ে এলাকার সৌন্দর্য মুহূর্তে শতগুণ বর্ধিত। চোখ কি তার দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে? আত্মজিজ্ঞাসার পর দুই চোখে হাত বুলায় গাজী রহমান। সকালের বাতাসে শীতল করতালু মমতার মত বিগলিত। আঙুলের অস্তিত্ব ঘুচে গেছে, সে জানে না।

"স্যার," সৈয়দ আলির ডাকে চমক খায় গাজী রহমান। সে আরো যোগ করলে, "সামনের টিলা লক্ষ্য রাখবেন। তার পরবর্তী টিলা এখান থেকে দেখা যায় না। এই আড়াল পেরুলেই চোখে পড়বে। সেই টিলায় পৌঁছানো মাত্র বুঝবেন আপনি বর্ডার পার। আর একদম নিরাপদ। অবিশ্যি এই জায়গাও নিরাপদ। তবে নয়।"

গাজী রহমান পথ-নির্দেশ এই দ্বিতীয়বার শুনলে। সৈয়দ আলি অধৈর্য হয়ে উঠছে, স্পষ্ট প্রতীয়মান। অতিথিবিদায়ের পরম অস্ত্র আদাব বা নমস্কারের পুনরাবৃত্তি। 'আবার আসুন' উক্তি সৌজন্য বা খাতির ম্লান করে দিতে পারে।

গাজী রহমানের দোলাচল অত সহজে কাটে না। গত দেড় মাসের ছবিগুলো হঠাৎ তার সামনে নিরন্তর ক্রমিকতায় খুলে যেতে লাগল। তখন সে ভাবলে, সীমান্ত অতিক্রম অগস্ত্য যাত্রা নয়। বিভীষিকার আকস্মিক ঝাপটা এল এক দমকা। সামনে তিন কবন্ধ মুণ্ড-হাতে নৃত্যমান সজোরে ঠ্যাং তুললে তার মুখে লাথি দিতে। আত্মরক্ষার প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় সে একপাশে সরে গেল। সৈয়দ আলি অবাক হয়। অবিশ্যি তার হাতে আর সময় নেই। বিপদের ঝুঁকি তো আছে। কিন্তু বেশি ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই স্বভাবজাত স্বরে এত্তেলা দিলে একটিমাত্র শব্দে, "স্যার—।"

— তোমার কথা-ই ঠিক। শরীর তো সারতে হয়।

"আর দেরি করবেন না।" সৈয়দ আলির অনুরোধে কিছু ক্ষোভ মেশানো ছিল। একবয়সী হলে সে বলে বসত, "এত দেরিতে বুঝলেন?"

গাজী রহমানের মনে হয়, এমন স্নেহবিগলিত দৃষ্টি দিয়ে সে আর কখনও কিছু স্পর্শ করেনি। সৈয়দ আলির মুখের দিকে তার চোখ অপলক। অজ্যানিতে নিজের হাত সে সৈয়দ আলির দুই কাঁধে তুলে দিলে এবং উচ্চারণ করলে, কণ্ঠস্বরে অসীম পরিতাপজাত লজ্জা মিশিয়ে, "তোমার পরিচয় মোটেই পেলাম না, এই দুঃখ রয়ে গেল।"

— গোলামের কোন পরিচয় থাকে না, স্যার। গোলাম গোলামই। স্বাধীন বাংলাদেশই হবে আমার পরিচয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ আলি আর কিছু বললে না, নিজের স্বরূপ যেন খুলে ধরলে শুধু।

স্তম্ভিত গাজী রহমান কয়েক মিনিট নির্বাক। ওই অখ্যাত চেহারা, অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারে না সে। কাঁধে দুই হাত ছিল। গাজী রহমান সবেগে সঙ্গীকে বুকে টেনে নিয়ে উচ্চারণ করে, "সৈয়দ আলি...আলি...!" শুধু নামসম্বোধন এখানে শেষ কথা নয়। অপত্যস্নেহও কোনদিন তাকে এমন দ্রবীভূত করেনি।

আলিঙ্গনের বেড় যথারীতি থাকে। গাজী রহমান বলে, "আমার একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।"

কিরণ রায়, রেজা আলির ছবি হঠাৎ গাজী রহমান দেখতে পায়। তখনই মনে পড়ে, দুজনে তার ভাবাবেগ দেখলে এখন কী ভাবত? তাড়াতাড়ি আলিঙ্গনমুক্ত গাজী রহমান স্বাভাবিক কণ্ঠে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বলে, "এটা আমার ছাত্র ইউসুফ চৌধুরীকে নিজে পৌঁছে দিও।"

খাম হাতে নিয়ে উপরে ঠিকানা দেখে সৈয়দ আলি বিস্ময় প্রকাশ করে, "উপরে লেখা সখিনা চৌধুরাণী!"

— সখিনা ওর স্ত্রী।

— দেবো, স্যার। নিশ্চিন্ত থাকেন।

— আমার বড় সেবা করেছিল।

— দেবো, স্যার। এবার আসি।

সৈয়দ আলি বিদায় নিলে। তার গমনপথের দিকে হয়তো গাজী রহমান বহুক্ষণ চেয়ে থাকত, কিন্তু একটা টিলা দুমিনিটে সব আড়াল করে দিলে।

নিজের পথ ধরলে গাজী রহমান। সে যেন তার নিজের কাছেই অপরিচিত জন। সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, পেছনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সংসার। কিন্তু কিছুই তার চোখে প্রতিভাত হয় না। স্বপ্নের মত অলীক পৃথিবী তার কাছে আরো স্বপ্নময় হয়ে ওঠে এই মুহূর্তে কিন্তু গন্তব্য টিলার লতাগুল্মাবৃত গম্ভীর হরিৎ ক্ষুদ্র-বিশালত্ব তাকে হটিয়ে নিয়ে যায় অন্য মানসলোকে। নিঃশ্বাস নিতে বুক ভরে উঠল। পেছন ফিরে সে একবার দেখে নিলে এবং অনুভব করলে, পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল তার চোখের কোটরে বন্দী। ধর্ষিতা বাংলাদেশ তার অন্তরস্থিত বিদীর্ণতা-অধীর লাভারূপী সকল জ্বালা-প্রবাহ নিসর্গের মোড়কে ঢেকে শান্ত হয়ে আছে।

বুকের ভেতর কত যন্ত্রণা দেড় মাস ধরে। গাজী রহমান কোনদিন চোখের পানি ফেলে নি, কিরণ যায় এবং রেজা আলি তাকে যতই বিদ্রূপ করুক না কেন। আজ অলক্ষিতে তার গণ্ডদেশ ভিজে যায়। তা মোছার চেষ্টা পায় না পর্যন্ত গাজী রহমান। গন্তব্য টিলার কাছাকাছি আসা-মাত্র সে অনুভব করে যেন আর-এক স্বর্গরাজ্যে তার পদার্পণ ঘটবে। কোথাও হয়তো অমরাবতী নেই পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষের পোড়া মাংসগন্ধ অন্তত তার ঘ্রাণশক্তি আর পীড়িত করবে না।

"মিথ্যের সঙ্গে এই হোক আমার শেষ আপস।" মনে মনে উচ্চারণ করলে গাজী রহমান। সখিনার কথা তার স্মৃতিপথে ধাক্কা দিতে থাকে। সৈয়দ আলির হাতে যে চিঠি সে দিয়েছে, গত রাত্রে মজকুর চাষীদের বাড়িতেই লেখা। চোখে ঘুম ছিল না। বহু গ্লানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো বিভীষিকার মতই তাকে উন্নিদ্র করে রেখেছে। মুখস্থ আছে, দৃশ্যতও সখিনাকে লেখা চিঠি যেন দেখতে পেলে গাজী রহমান :

"মা, আমার দোয়া জানিও। তোমাদের সেবাযত্ন আমি ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। যদি খোদা চাহেন, আবার তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবে...

"...ইউসুফকে আমার দোয়া দিও। অমন ছেলে আর হয় না। তোমরা সুখী হও। ইহা আমার অন্তরের সাতিশয় কামনা। তোমাদের সংসার সুন্দর হউক...

"খালেদের সহিত আমার দেখা হয় না। কিন্তু এখানে শুনিয়াছি, মুক্তিফৌজদের মধ্যে তার বীরত্বের খুব নামডাক আছে। কিছুদিন আগে নাকি এই বর্ডারে ছিল। এখন অন্য জায়গায় বদলী হইয়াছে। তাহার জন্য চিন্তা করিও না। জন্মভূমির ডাক তাহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে। এমন ডাক শুধু সৎ, সুন্দর এবং ভাগ্যবানেরাই শুনিতে পায়। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের সেবার উপকারে নিজেকে নিয়োজিত করা। খালেদ তেমন পথই বাছিয়া লইয়াছে। মুক্তিফৌজেরা আমাদের গর্ব। দেশের প্রতি ভালবাসা তাহাদের নিকট ছেঁদো কথা নয়। প্রাণ-সোপর্দ প্রতিজ্ঞায় অটল মুক্তিফৌজেরা আমাদের জন্য নতুন সমাজ গঠন করিতেছে— যেন দেশবাসী সকল দুঃখ-দারিদ্রের হাত হইতে মুক্তি পায়, নিজেদের জীবন নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। খালেদের কাজে তোমার বুক বোন হিসাবে ভরিয়া ওঠা উচিত।

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে শুধু বীর পুরুষেরা। মুক্তিফৌজের ব্রত তাই কঠিন। এমন কঠিনের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে আমাদের নয়ন-মণি মুক্তিফৌজবৃন্দ। এই বীর-দল মানুষ হওয়ার পথ সৃষ্টি করিতেছে...মুক্তিফৌজের কীর্তি যুগ যুগ ইতিহাসের বুকে ধ্বনিত হইবে। তুমি কথাটা বুঝিতে পারিবে কি না জানি না, তবু লিখিলাম। মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের বুকের নিশান, মানুষকে চিরদিন সঠিক পথের ইশারা জানাইবে...।"

"মিথ্যের সঙ্গে এই হোক আমার শেষ আপস", আবার মনে মনে উচ্চারণ করলে গাজী রহমান। আকস্মিকভাবে সে অনুভব করলে, এতদিন পরিবেশ ঈষৎ মিথ্যার অভিমুখে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আজ তো তেমন চাপ নেই। তবু কেন ছলনার জাল আকীর্ণ করে চলেছে সে? একবার শুরু হলে তার জের থেকে যায়। ঝুট্ ঝুটের জন্মদাতা। কিন্তু গাজী রহমান আরো উপলব্ধি করে, অনুশোচনার দগ্ধশলাকা আজ তাকে তেমন পোড়ায় না। একটি মানব কি মানবীর প্রাণে, যখন তারা অথৈ দুঃখে আশ্রয় খোঁজে, এমন ভেলা ভাসিয়ে দিলে অন্যায় কোথায়? পরিবেশের দায় আছে সত্যি, কিন্তু তার দিক যদি শূন্যে ঠেকে, মানব হিসেবে তার পরিচয়-মূল্য থাকে না। জড়পিণ্ডের সামিল তখন সে। বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে অন্যান্য অস্ত্রের মত আত্মিক হাতিয়ার কম প্রয়োজনীয় নয়।

নবীনগর যাত্রার দিনে বৃদ্ধের ডুকরানি কান্না অনুতাপের অসহায় বিকাশ মাত্র। যে-কয়জন যুবক প্রাণ দিয়েছিল লুটে যোগদানে অস্বীকার মারফত, তারা মহৎ অথবা মূর্খ? এই প্রশ্নের জবাব সোজাসুজি দিলে না গাজী রহমান। অন্য বিস্ময়ের ধাক্কা তাকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে বাধ্য করল। সোজাসুজি চিন্তায় রত সে। আশ্চর্য! এতদিন ধাবমান শোলার মত সে ঢেউয়ে নাজেহাল কোন একদিকে এগিয়ে যেত, অন্তর্ক্ষোভের খবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখত না, যদিও সে জানত জলের উপরকার গতিমুখ তার আসল পরিচয়ের ছদ্মবেশ মাত্র। এখন সচেতনভাবে সে হদিস সন্ধানে তৎপর।

পদক্রিয়া অব্যাহত আছে এত চিন্তার মধ্যেও। গাজী রহমান আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলে। তার এত বিস্তার যেন সে আর কখনও দেখেনি। সূর্যের মোলায়েম আলো এবং নীলের অনন্ত অভিসার তাকে এত মুগ্ধ করে যে, হঠাৎ থামতে ইচ্ছা হয়। তখনই স্থান-সচেতন, তার কাছে ধরা পড়ে, সে আর জাহান্নামে নেই। সৈয়দ আলির নির্দেশিত টিলার পাদদেশে এসে পৌঁছেছে। মানব-মানবীর পোড়া মাংসগন্ধ অন্তত তাকে আর বিব্রত করবে না।

জোরে নিঃশ্বাস নিলে গাজী রহমান। এবার চলা বা বিশ্রাম তার মর্জি-এক্তিয়ার। থমকে দাঁড়িয়ে সে দেখে নিলে, এবার ঈষৎ চড়াই ভাঙতে হবে তাকে। উপরে রাস্তার মেঠো অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। চতুর্দিকে সবুজের রাজ্যে ওইটুকু প্রতিবাদ, সুন্দর গালে কালো তিলের মত : চোখের বিশ্রাম। ফলে গোটা এলাকা আরো মোহনীয়। নিরবচ্ছিন্নতা, এমনকি সৌন্দর্যের আদৌ মহিমা বাড়ায় না। নানা ধরনের ক্লান্তি এতদিন তাকে পিষে মেরেছে। গাজী রহমান, আজ পথশ্রান্তির অভিঘাতে নাজেহাল। তাই নির্বিচার ধুলোর উপর থেবড়ে বসে পড়ল সে। লুঙ্গিটা এমনি ময়লা। আরো ময়লা হোক। কী আসে যায়? জীবনে নানা উপাদান লাগে। বহু দিকেই যখন অসংখ্য ঘাটতি, একটা কমলে দুনিয়া কিছু উল্টে যাবে না। ঈষৎ হেলান দেওয়ার লোভ পর্যন্ত জাগে। আবার একই যুক্তি। লাগুক ধুলো পিরহানে। ঝোলা ব্যাগ শিথানে বালিশ হোক। গত রাত্রেও সে ঘুমোয়নি। ওই বিনিদ্রতা ততটা নিরাপত্তার আশঙ্কা থেকে নয়, যতটা চিন্তার ধাক্কায় এবং নার্ভের অত্যাচারে। আহ্, এমনভাবে সে কেয়ামৎ তক্ শুয়ে থাকতে পারত! উৎপিঞ্জর ডানায় যদিও ক্লান্তি কদাচিৎ আসে।

বর্ডার অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও লোকালয় দূরে। আরো তিন মাইল। সেদিন পথের দৈর্ঘ্য, আর এমন আঘাটাপূর্ণ, তাকে দমাতে পারে নি। আজ সামান্য পথ, এমন সুন্দর মেঠো আকর্ষণ, রীতিমত শত যোজন ঠেকে গাজী রহমানের কাছে। তবু উঠতে হয়। লোকালয়ে পৌঁছলে বাস, বাসে শহর। সেখানেই তার জন্য আস্তানা অপেক্ষার্থী।

চোখ থেকে অতীতের পিঁচুটি ধুয়ে গেছে নিরাপত্তার শিশিরে। ভুবনে আনন্দধারা বহমান। গাজী রহমান শরিক। কিন্তু তখনই বিষাদে মন নেতিয়ে পড়ে। পা আর ওঠে না। পেছনে দায়িত্ব বহু মানুষের অপেক্ষার্থী। দ'কে রথের চাকা বসে গেছে। অসংখ্য পেশল হাতই পুনরায় তাদের সহায়। অথচ সে আত্মবিব্রত। যেখানে মিথ্যের উৎস সেখানেই তো আর কর্তব্যভূমি। অথচ আজ সে পলাতক। এই সময় কিরণ রায় এবং রেজা আলির স্মৃতি তাকে রেহাই দিলে। জীবনের পরিধি অত সহজে পরিমাপ করা যায় না। আপাতত ছক হয়ত বৃহত্তর নকশার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। তাই তার মরীচিকায় অত সহজে প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয়। অতি-জ্বরাক্রান্ত রোগীর মুখে অসম্ভব দীপ্তি ফুটে ওঠে। তা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তাই উপস্থিত আশা বা নৈরাশ্যকে বেশি স্বীকৃতি দেওয়া অনুচিত। বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎকালের এই ঘুরপাকে ভবিষ্যৎও অতীত হয়ে পড়ে। পরিক্রমের ধারা তাই এক কালের বিন্দু থেকে দেখলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানের দায়িত্ব উপেক্ষা অন্যায় নয় শুধু, আত্মহত্যার সামিল। জটিলতা নিরাকরণের জন্য যদ্দুর সম্ভব নির্বিকার নির্লিপ্ত হওয়া তাই বাঞ্ছনীয়।

ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গাজী রহমান পা ফেলতে লাগল। লয় দ্রুত। দুপাশের বনজ প্রহরিদের দিকে তার চোখ আবার স্বতই ধায়। অনেক গাছের সে নাম জানে না। কাঁঠালের মৌসুম বোধহয়। টিলার নিম্নভূমি জুড়ে শত শত গাছ ঐ ফলের ঢোলক গলায় ঝুলিয়ে চুপচাপ খাড়া। আনারসের গাছের সারিগুলো ক্রমিকতায় এমন পোঁতা যে নিচে থেকে মনে হবে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে গেছে অথবা নেমে এসেছে এবং তা একটিমাত্র গাছ, বহু নয়। লিচু ফলে পাক ধরেছে, কাকের ছোঁ-মারা ঝাঁপ দেখে হঠাৎ চোখে পড়ল। বনের মধ্যে যদ্দুর সম্ভব সজ্জিত বাগান। নৈরাজ্যের ভ্রূকুটি আছে, কিন্তু আইন মানার লক্ষণও স্পষ্ট। বিরলবসতি এইসব এলাকায় নির্জনতার শাসন আদৌ ভাল লাগে না। মানুষের সঙ্গ অভিলাষী— গাজী রহমানের মন হঠাৎ ইতিউতি তাকায়। একঝাঁক শালিক পাখি বনভূমি সচকিত করে উড়ে গেল। গাজীর হাঁটার বিরতি নেই। কিন্তু মন অকস্মাৎ জনপদে ফিরে যায়...

মেশিনগানের গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে। কোলাহল, আর্তনাদ।...সঙ্গিনের আগায় গাঁথা শিশু চিৎকার-রত, যখন অগ্নিবোমা তাকে নিমেষে কাবাব বানিয়ে দিলে। জল্লাদ অট্টহাসি পৈশাচিক উল্লাসের শিকার হওয়ার পর পাঞ্জাবী সেনানীর ধর্ষণেচ্ছু লালাসিক্ত ঠোঁটে ফিরে গেল...প্রলয়ের প্রকম্পন মর্টারের আওয়াজে, রণতরীর শেল-বর্ষণে, কামানের হুঙ্কারে...অসহায় দীর্ঘশ্বাসের গতিক্ষুব্ধ বাতাস যেখানে নিরর্থক।

কিন্তু সব শব্দ গাজী রহমানের কর্ণপট্ট থেকে নিমেষে মুছে গেল সৈয়দ আলির সংলাপের পুনরুত্থানে : "গোলামের কোন পরিচয় থাকে না। গোলাম গোলামই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাই আমার পরিচয় হোক...।"

বাতাসে তাই অগাধ কানাকানি।

গাজী রহমান হঠাৎ বিপরীতে পেছন ফিরলে। পুনরায় জন্মভূমির দিকে মুখ। তারই উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্ববাহু সে মনে মনে উচ্চারণ করলে :

> আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
> কুয়াশার বুকে ভেসে আবার আসিব এই কাঁঠাল ছায়ায়।

হয়ত কয়েক লহমা।

আবার গন্তব্যমুখী গাজী রহমান।

জয় বাংলা।

এই একটি স্তননের জের শুধু পেছনে পড়ে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

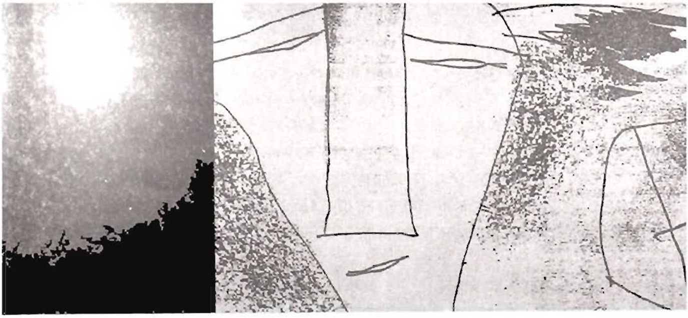

দুই
সৈনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাস এমন মধুর কে জানত!

ফুরফুরে হাওয়া বয়ে আসছে কতো দূর থেকে। সামনে হিজলতলীর মাঠের বুকের উপর জেলাবোর্ডের পীচ-ঢালা কালো রাস্তাটা চোখকে টেনে টেনে নিয়ে যায়, তারপর এক সময় আছড়ে ফেলে দেয় যেন আর কিছুই দৃষ্টির মধ্যে না থাকে। তখন হঠাৎ ভেসেভেসে ওঠে বনজ নানা শ্যামলিমা। বোঝা যায়, অনেক অনেক গ্রাম অস্তিত্বের ছায়া ফেলছে আবছা রঙে রঙে। তারি মধ্যে খাল-বিল পড়ো জমি কতো কী গচ্ছিত রয়েছে।

বড় আরাম!

বড় আরাম, যদি নির্ঝঞ্ঝাট বিকেল, আশপাশে ঘুরঘুর করা আর হাতে কোন কাজ না থাকে। তখন অমন পরিবেশে যাদু লাফালাফি করে।

মখ্‌দুম মৃধার কাছে তা-ই মনে হয়েছিল।

আরাম কেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে বসার সুযোগ সব সময় আসে না। পাশে গুড়গুড়ির নল। কল্কে নিভে গেছে।

মৃধা হাই তুললে দু-তিন বার। একবার তামাকের নেশা চেপেছিল। তাহলে চাকরকে ডাক দিতে হয়। এমন ঝামেলায় যেতে তখন মন নারাজ। কুড়েমির আমেজ কী ইচ্ছেমত আসে? এসে পৌঁছলে তা-কে ভেস্তে পাঠানো অনুচিত।

বিশেষত এমন বিকেল যখন সত্যি-সত্যি বিরল।

শাদা তহবন, পিরান মৃধার পরনে। মাথায় শাদা জালি কিস্তি টুপি। গাব্‌দাগোব্‌দা মুখে শাদা ঝোপ-দাড়ি, গোঁফ। এমন তুষার রাজ্যে অখ্যাত কালো কল্কেটা কিন্তু জেল্লাদার হয়ে উঠেছিল।

বিরাট চত্বর দহলিজ বা বৈঠকখানার সামনে। সীমানার বেড়ে নানা ফলের গাছ। আম জাম জামরুল ইত্যাদি। মধ্যে লন্-সদৃশ ফাঁকা জায়গা। বাড়ির পাশ দিয়ে জেলাবোর্ডের রাস্তা আভিজাত্য এবং রুচির পরিচয়। এই ভাবে অঙ্গাঙ্গি বাড়ি পথঘাট পল্লীঅঞ্চলে খুব কম দেখা যায়।

পারলৌকিক ভূষণও এখানে গরহাজির নয়।

মখদুম মৃধা হাজি। কিন্তু কখনও নামের আগে বা পাছে আল্‌হাজ্ব লেখে না। আরো আশ্চর্য, হাজি-সম্বোধন পর্যন্ত তার কাছে না-পছন্দ। তাই মজ্‌কূর এলাকায় ভদ্রলোক শুধু মৃধা-সাব নামেই পরিচিত। লোকে ভাবে, অত পয়সা খরচ করে তা-হলে মক্কা যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? এমন মন্তব্য গ্রামে চালু আছে বহুদিন থেকে। শেষমেষ,

কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, তোমার আমার কী করার আছে?

কিন্তু মৃধা-শব্দ শুধু পদবি নয়। এই অঞ্চলে মান, সম্মান, প্রতিপত্তি দব্‌দবা, কোর্ট-কাচারি অগয়রহ।

একটা ঝাঁকড়া নাতিদীর্ঘ কলমি আমগাছের নিচে বসে এতক্ষণ ফরসি টানছিল প্রচুর ধোঁয়া বাতাসে মিশিয়ে। পেছনে টিনের পাকা দহলিজ, চুনকাম মাত্র সেদিন সমাপ্ত। তার পেছনে অন্দর মহল। সেদিকেও পাকা ইমারৎ আছে। একতলা তিন বা চার কামরা। সঙ্গে আরো খান দুই টিনের ঘর। অবিশ্যি ভাল-ভাল জাতি গাছপালা প্রায় ভিটার চারপাশে দঙ্গল-বাঁধা। সেদিক থেকে তপোবন-সুলভ ইশারা গৃহস্বামীর উদ্ভিদ-বিদ্যার পুণ্যফল। নিরপত্তার বনিয়াদে পা দিয়ে বসতে পারলে দিনক্ষণ ভালই লাগে।

অবিশ্যি এমন নির্বিবাদ বিকেল বহুদিন মৃধার কপালে জোটে নি। অন্য সময় হলে এতক্ষণ দহলিজ লোকে ভরে থাকত। মৌলিক গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান। আল্লাতালা আইয়ুব খান এবং তার বংশধরদের অমর করুক। আর যদি কেউ অকালে মরে, তার ভেস্ত নসিব হোক। সেই ছিল প্রেসিডেন্টের মত প্রেসিডেন্ট। অবহেলিত গ্রামাঞ্চলের দিকে তার মত আর কেউ নজর দেয়নি। দুর্দশাগ্রস্ত পরিত্যক্ত পল্লীর জন্যে নগর কমলাপুরনিবাসী কবি জসিমউদ্‌দীন বহুৎ লম্বা শ্বাস ফেলতে পারেন, কিন্তু আইয়ুব খান হচ্ছেন সত্যিকার দরদী। খাজাঞ্চিখানা খুলে দিয়েছিলেন। পাড়াগাঁয়ে যে ক'টা ইমারত কী টিনের ঘর উঠেছে সব সেই মহাত্মার কল্যাণে। মখ্‌দুম মৃধা আজও তা অতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। কিন্তু বেঈমানস্য বেঈমান বাঙালি জাত। হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। মৌলিক গণতন্ত্রীদের মারধোর, তাদের ঘরদোর পোড়াতে লাগল। তখন মৃধাও এক হপ্তা বাড়িতে থাকতে পারেনি। পরিবারসহ রাত্রে নৌকাযোগে ঢাকা শহরে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই সবক মৃধা ভুলে যায়নি। বুঝেছিল, হিসাব করে-করে পা ফেলতে হবে। নচেৎ একটু এদিক ওদিক হলে একদম তলহীন খোন্দলের তলায়। দ্বিতীয় মার্শাল ল' চালু হওয়ার পর সে বেশ কিছুদিন চুপচাপ রইল। সাতে-পাঁচে নেই। ধন-দৌলতের মালিক আল্লাতালা। যা দিয়েছেন তিনি তা নিয়েই শোকর মাবুদের দর্গায়।

কর্মী লোকের হাত অবসরকালে নিস্‌পিস করে। অভ্যেস সহজে রেহাই দেয় না। চুপচাপ থাকা দায়।

তখন একই সঙ্গে মৃধা দুই কূল রক্ষায় মন দিয়েছিল। পুরাতন মুসলিম লীগ ত আছেই। পুরাতন মহব্বৎ। দেশে জাতীয়তার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। সেই ঢেউ উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই ভেতরে ভেতরে মৃধা স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের সমর্থন দিতে লাগল। একদম-প্রকাশ্যে নয়— প্রকরণে। টাকাপয়সা চাঁদা-স্বরূপ দান। কিন্তু তার জন্যে রশিদে নাম তুলতে মখদুম মৃধা নারাজ। স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা তা-কে নির্বাচনের সময় দাঁড়ানোর জন্যে অনুরোধ করলে। কিন্তু মৃধা রাজি হল না। মুসলিম লীগের দাওয়াত তেমনিই প্রত্যাখ্যান করলে, নিজের বয়স এবং অক্ষমতার দোহাই দিয়ে। গোয়ালপোড়া গরু সে। একবার উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের সময় মৌলিক গণতন্ত্রের মহিমায় তার জান্‌ যেতে বসেছিল। ঢের হয়েছে রাজনীতি। আর না, চাচা। এখন আল্লাতালা আর আইয়ুব খান যা দিয়েছে তা ভোগ করে দুনিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মানে মানে চলে যেতে পারলেই— আর কিছু প্রার্থনা নেই পরম করুণাময়ের নজদিগে। হিসেব মোতাবেক চলতে হবে। অঙ্কে ভুল হয়ে গেলে সব দিক ধ্বসে যেতে বেশি টাইম লাগবে না। হুশিয়ার ব্যক্তি মখ্দুম মৃধা। সত্তর সনের নির্বাচনের সময় সে কোন পক্ষে ভোট দিয়েছিল, জানা যায় না। তবে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ মেজরিটি পাওয়ার পর সে স্থান বুঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। হ্যাঁ, মুজিব একজন বাপের ব্যাটা, এবার মিলিটারিদের দেখিয়ে দিলে বটে! কিন্তু গ্রামে রাত্রে আসত তার চর-অনুচর মোসাহেব বা ঐ জাতীয় কিছু। তাদের গলা খাটো করে বলত, "বসো, মিয়া। দ্যাহো কোথাকার পানি কোথা যায়। অহন চুপচাপ থাকন-থাকান বা'লা। উপরে আল্লা আলেমুল গায়েব। তিনিই সব কাঠি নাড়েন, তোমার-আমার বুঝবার সাধ্যি নাই।"

সেই সময় মজলিসে উপস্থিত থাকল গ্রামের সয়ীদ মাতব্বর। আসলে মাতব্বর নয়। পদবি। চল্তি কথায় মাদ্বর। কৃশ চেহ্রা। মৃধার চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট। এককালে গ্রামের মক্তবে মৌলবীগিরি করত। এখন নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিনগুজ্রান। কিন্তু সয়ীদ মাদ্বর পরহেজ্গার। শরীয়তের নিয়ম-কানুন একটু এদিক ওদিক হলে তিনবার নাউজুবিল্লাহ্ পড়ে। বহুদিন থেকে মুসলিম লীগের অন্ধ ভক্ত। সে আস্কারা পেয়ে মৃধার কথায় নোক্তা দিত, "কিন্তু মৃধাসাব, দ্যাশে ইসলামি আর কিছু থাইকব না, এই আওয়ামী লীগ যদি শাসন চালায়। হিন্দু রবিঠাকুররে নিয়া কী মাতামাতি! তওবা, নাউজুবিল্লাহ্। তৌবা"। অবিশ্যি মাদ্বর জানে, চাল যদি ঠিকমত লেগে যায়, রাতের পাত মৃধার সঙ্গেই পড়ে যাবে। খায় বটে মৃধাসাব! পাড়া গাঁয়ে রাজা...রাজা...। কিন্তু মৃধার এক রকমের ঘৃণামিশ্রিত কৃপার সম্পর্ক এই সব মোসাহেবদের সঙ্গে। তবু মখদুম নিজেকে তাদের সামনে খুলে ধরত না। ছাত্ররা পাকিস্তান সরকার রবিঠাকুরের গান বন্ধ করাতে ক্ষেপে উঠেছিল, তাদের বড় ভয় মৃধার। তাই মাতব্বরের অমন মন্তব্য শুনেও যেন শুনত না। এমন ভান করত। তখন অপরপক্ষের এমন সাহস নেই যে মৃধা প্রসঙ্গান্তরে গেলে তারা আবার যথাস্থানে তা টেনে আনবে। নিজকে রহস্যময় করে তোলার মধ্যে মৃধা মনে খুব আনন্দ পেত। রাত্রে শুয়ে শুয়ে চালাত চুল-চেরা বিচার। যেদিকে বাতাস বয় সেদিকেই তুলে দাও পাল। কিন্তু কখন কী হয় বুঝে-ওঠা মুশকিল। গেল আইয়ুব খান। অমন প্রেসিডেন্ট! তখন মনে হ'ল কেয়ামত আর বেশি দূরে নেই। বাড়িঘরদোর সব আগুন লাগিয়ে শেষ করে দেবে। কিন্তু কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেল। আল্লাতালা পাকিস্তান রক্ষা করার জন্যে এহিয়া খান-কে নাজেল করে দিলেন ইসলামাবাদের সিংহাসনে। হঠাৎ ঝড় যেন থেমে গেল। কিন্তু আবার আকাশে ঘন মেঘের ঘটা। শেখ মুজিব ত জুড়ে বসল উড়ে এসে জেল্খানার ভেতর থেকে। আবার কিসে কী হয় আল্লা মালুম। সমঝে চলাই মঙ্গল। মুজিব এখনও গদিতে বসেনি। বসবে বসবে করছে। একদম বসে পড়ার আগে সেদিকে ঢলে-পড়া, কোন কাজের কথা নয়। দু'বছরে কতো খেল্ দেখা গেল। তামাসা আরো দেখা যাক্। ঠোঁট একদম হিসেব কষে-কষে খুলতে হবে। সয়ীদ মাদ্বরকে বিশ্বাস নেই।

সত্যিই তখন মৃধা পুরাতন মোসাহেবদের উপর থেকে সব আস্থা গুটিয়ে নিয়েছিল। কাজেই অসোয়াস্তির মুখোমুখি। স্ত্রী রাজনীতির ধার ধারে না। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। তার কাছে মন খোলাসা করার রাস্তা বন্ধ। মুখ আর মনের খিড়কি দরজা বন্ধ হয়ে গেলে

ভেতরে হাতড়পাতড় খুব বাড়ে। মৃধা সেই সময় গেরস্থালির নানা কাজে নিজকে ডুবিয়ে রাখত। যথা, ভাঙা বেড়া মেরামত, নারিকেল গাছের ডালপালা সাফ, কোথাও মাটি ফেলানো ইত্যাদি। পূর্বে এসব দেখাশোনায় লোকের অভাব হ'ত না। চাকরবাকর ছাড়া মোসাহেবেরা ছিল। কিন্তু তেমন অবসর ভোগ করলে সোয়াস্তি পাওয়া যায় না।

সেই সব অতীতের ছবি এখনও চোখের সামনে। মৃধা তাই বাতাস খাচ্ছিল গরম উপভোগের মাত্রাসহ! তাই ফরসি নিভে গেলেও চাকরকে ডাক দিতে গড়িমসি নয়, ঘোর অনিচ্ছা। সুখস্বপ্ন স্বেচ্ছায় ভাঙার মত মূর্খতা আর কিছু আছে নাকি? মৃধা অতি চৌকোষ মানুষ। এই অঞ্চলে তার প্রতিপত্তি খামকা গড়ে ওঠেনি।

কালো রাস্তার উপর মৃধার চোখ বার বার ধেয়ে যায়। সর্পিলতার ছন্দে আমেজ থাকে, তা অবসরের মেজাজের সঙ্গে মিশে গেলে সোনায় সোহাগা। তাছাড়া, এই রাস্তা ত সহজে বাড়ির কাছে ঘেঁষে যায়নি। কতো ঝামেলা। পাশের তিন-চারখানা গাঁয়ের লোক হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছিল কোন কেন্দ্রস্থল অনুযায়ী পাবলিক রোডের অবস্থান হওয়া উচিত। মৃধার সুবিধা দেখতে গেলে বহু মানুষের অসুবিধা। কতো দরখাস্ত, কতো মিটিং। শেষে ব্যাপারটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ধন্যি আইয়ুব খান সাহেব এবং তার মৌলিক গণতন্ত্র! চেয়ারম্যানের বায়না কী অতি সহজে নড়ে? সে ত প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি। তাহলে প্রেসিডেন্টের গদিও নড়ে যাবে। আখেরে নচেৎ মৃধা জিতল কী করে? বহু লোকের আক্রোশ আকসাআকসি, পরশ্রীকাতরতার মুখে বাস। সুতরাং সাবধানে থাকতে হয়। তার উপর একবার ঝড় গেছে। আল্লাতালার অশেষ মেহেরবাণি জান্‌মাল সব সহি-সালামতে (নিরাপদে) বেঁচে গেছে। নচেৎ সেই সময় অঘটন ঘটে যেতে পারত। দশ বছরে আল্লাতালা এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যা দিয়েছিলেন সব ধুলোয় মিশে যেতে পারত।

কিন্তু আলেমুল গায়েব আল্লাতালা কী না করতে পারেন? এই নিরাপত্তা দু'মাস নয় মাত্র পনর দিন আগে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল। খোদা সব দিকই রক্ষা করেন। তাঁর রাজত্বে বেঈমানেরা খুব বেশিদিন লাফালাফি করতে পারে না। এই আওয়ামী লীগারগুলো কী কুদোকুদি না শুরু করেছিল। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" এখন দ্যাখো, ভালবাসা মার্গে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঠ্যালার নাম কয় বাবাজি। আর যে-সে গুঁতো নয়, একদম পাঞ্জাবি মিলিটারি। এখন দ্যাখ মজা। পথে ঘাটে চলা দায় হত। বয়স আর দাড়ি দেখে হারামজাদারা স্লামালেক দিত বটে, তবে ভেতরে ভেতরে হিংসের ছুরি। এখন দ্যাহো, হালার পুৎ হালারা। তোগোর বাবা মুজিব আছে কি নাই। পশ্চিম পাকিস্তানে জেলের মদ্দি বাপ-বাপ ডাক ছাইড়ছে। অহন তোরা কারে বাপ ডাকবি? পঁচিশে মার্চ। ও আল্লারে আল্লা। তুমিই ঠিগ কইরা দিছলে, মাবুদ। অহন আর "জয়বাংলা...জয়বাংলা" কোন খান্‌কির পুতের মুখে হুনি না। হব গুয়ার মদ্দি ঢুকছে। আরো ঢুকাইয়া দিবো, সবুর করো। তিন হপ্তা অইল মাত্র। আজ এপ্রিলের বিশ। শোকর তোমার দর্গায় পরওয়ারদেগার। আলহামদোলিল্লাহ...এক মাসের মদ্দি তুমি কী না দ্যাহাইলে? কাফেরদের হাত থেকে যুগে যুগে তুমি এই ভাবে এম্নি ধারায় কতোবার ইসলামকে বাঁচিয়েছো। এহিয়া খান, আগা মোহাম্মদ এহিয়া খানকে তুমি লম্বা দরাজ হায়াৎ দাও, প্রভু। আহ, হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলতে পারতাম না। তুমি আলেমুল গায়েব, আজ বুক কী হাল্কা! আর দয়াময়, তুমিই আক্কেল দিলে। মেয়েদের আর মার্চ মাসে শহরে রাখা ভাল নয়। গণ্ডগোল বাধবে। ওরা আমার ঘরের ধন। আমার চামেলী, আমার সোহেলী, আল্লা, আমাকে তুমি কী না দিয়েছ? দুই মেয়ে যেমন জেহেন (মেধা) তেমন দেখতে। হস্টেল থেকে নিয়ে এসে ভালই করেছি। আমার বুক বাঁধা। খাতিরজমা সুখ শান্তি— সব তোমার নেয়ামৎ (দান) আল্লাহ। অহন হবে্ নাফরমান (অবাধ্য)গুলো গাঁ ছাইড়া ভাগছে। অহন আর কারো চিল্লাচিল্লি হুনি না। গোটা গাঁ মগরিবের অক্ত থেইক্যা চুপ হইয়া থাহে যেন মানুষ নাই... হগ্‌গলে মরছে। বেঈমানরা মইরব বই কি... আল্লা, শোকর মাবুদ...।

ঝিরিঝিরি বাতাসের ঝলক এসে লাগল।

মৃধার ঝোপ-দাড়ি বেশ দুলিয়ে দিয়ে গেল। আরাম-কেদারায় আরো গা এলিয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে দিতে। কয়েকটা আঙুল দাড়ির জঙ্গলে এপার-ওপার করতে লাগল। মৃধা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল নিজের একাকিত্ব সম্পর্কে। কিন্তু আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাদের ভয়ে গা দিনেও ছম্‌ছম করত, তারা আর কাছে ঘেঁষবে না কোনদিন। সকলের নাম মনে আছে, সব হালার নাম। খালি নিজের গ্রামবাসী ব'লে এখনও সে কাঠি ঘোরায়নি। নচেৎ মিলিটারিদের ডেকে কবে বদ্‌মাসদের সে ধরিয়ে দিতে পারত। অত দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সোজা আঙুলে ঘি বেরোলে বাঁকানো অনর্থক। জাল যখন পুকুরে পড়েছে, দরকার-মত খুশি-মাফিক সব রুইকাৎলা চুনোপুটি ডাঙায় তোলা যাবে। আজ সয়ীদ মাদ্‌বর এখনও আসেনি। না এসেছে, ভালই হয়েছে। খামখা বক্‌বক করে মারত। এমন নির্জন নিখুঁত বিকেল পাওয়া মুশ্‌কিল হত। বহুদিন পরে মানসিক শান্তি ফিরে পাওয়া গেছে। মনের কথা খোলাখুলি নিজের সঙ্গে বলাবলি করা যায়। আহ্, এ কী কম শান্তি, খোদা!

মৃধা সাতাশে মার্চ, ১৯৭১ গ্রামবাসীদের ডেকে বলেছিল, 'ভাইসব, আপনারা কেউ ঘাবড়ে যাবেন না। আল্লা যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। মঙ্গলের জন্য করেন। দেশ রাষ্ট্র বজায় রাখতে গেলে বদ্‌মাসদের শায়েস্তা করা লাগে। পাকিস্তান-রক্ষা সব মুসলমানদের জন্য ফরজ। আল্লার ইচ্ছা তিনি পাকিস্তান রক্ষা করবেন। তাই তিনি ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। এই মিলিটারিরা সাধারণ সিপাই নয়। ওরা আল্লার ফেরেশতা। আল্লা কাফের আব্‌রাহার হাতি-সৈন্য ধ্বংস করতে ছোট ছোট আবাবিল পাখি পাঠিয়েছিলেন, মুখে ছোট ছোট পাথর। তারই আঘাতে সব বড় বড় হাতি ও সৈন্য নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। শেখ মুজিব ত কোন ছার। এখন পল্টনের মাঠে কোন বাবা গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেবে : জয় বাংলা? ঘুঘু দেখিছিলে চাঁদ, পাঞ্জাবি ফাঁদ ত দ্যাখোনি। আইয়ুব খান শাদা দীলের মানুষ ছিল। সোজা লোক পেয়ে তা-কে তাড়িয়েছিলে। এবার করো দেখি নাদির খাঁর বংশধরের সঙ্গে মোকাবেলা। যে সে নাম নয়, আগা মোহম্মদ এহিয়া খাঁন। এবার মজা দ্যাখো, ঠ্যালা সামলাও। উঃ, দু'টো বছর কী ভাবে না গেল। তখনও এহিয়া খান ছিল। চুপচাপ। স্বস্তি ছিল না। তিনিও চেয়েছিলেন, সোজা আঙুলে ঘি বের করতে। তুই শেখের পুৎ মুজিব তা হতে দিলে কই? এবার এহিয়া খান তোর জয় বাংলা হগ্‌গলের মদ্দে ঢুকাইয়া ছাইড়ব। আল্লা পরম করুণাময়। ঈমানদারের

বেইজ্জতি বেশি দিন সহ্য করেন না। মানীর মানের হেফাজৎ করনেওয়ালা তিনি। খোদা শেষ হাত দেখিয়ে ছাড়লেন। মুসলমানদের রাষ্ট্রে পালক-রক্ষক আল্লা...' ইত্যাদি।

পরম সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললে মৃধা। তামাকের নেশা আবার চাগান দিয়ে ওঠে ভেতর থেকে। দু'একবার হাই উঠল। জোড়া বাহু ছড়িয়ে আলিস ভাঙলে মৃধা। ঘুম-ঘুম পায়। নিরাপত্তা-স্বস্তি, বহুদিনের কামনা-রঞ্জিত দিন হাতের কাছে, পায়ের তলায়। তবু নেশার ধাক্কা সহজে হটানো গেল না। এমন মৌকায় ইষৎ ধোঁয়া দিতে পারলে আয়েশ-আবেশ আরো জমবে।

মৃধা হাঁক দিলে, "ওরে, মনা।"

ভৃত্য নিকটেই ছিল। "যাই হুজুর", জবাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌছল।

ছেলেটার বয়স বছর পনর হবে। এক চোখ নেই। ছেলে-বেলায় বকছানা নিয়ে খেলা করার সময় চোখে খোপর খেয়েছিল। তারই ওই ফল। গ্রামের অনাথ। আগাছার মত বেড়ে উঠেছে কোন রকমে। মৃধার আশ্রয়েই এখন থাকে। দেনা পাওনার কী হিসেব উভয়ের মধ্যে, পাড়াপড়শিরা জানে না।

— মনা।

— জী।

— অহন লোকে কী কয়? আমারে নিয়ে কিছু কয় না?

— আমি কাম নিয়া থাকি। কিছু হুনি নাই। মনার মুখাবয়বে আক্কেলের ছাপ আছে। কিন্তু সে কথা বলে কম। হঠাৎ মনিবের প্রশ্নে অবাক কিন্তু জবাব দিতে দেরি হয়নি।

মৃধা বিরক্ত হয় জবাব না পেয়ে। সে আলিস ভাঙলে আবার হাই তুললে এবং শেষে হুকুম ছাড়লে, "জল্‌দি তামাক দিয়া যা।"

চাকর বিদায় নিলে মনিবের চোখ আর খোলা থাকতে নারাজ। ক্রমশঃ বুঁজে আসে। বোশেখ মাস হলেও তেমন গরম পড়েনি। বাতাস থাকার ফল।

মৃধা সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

মনা কল্কেয় ফুঁ দিতে এসে পৌছল বটে, কিন্তু তার পক্ষে এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। মনিবকে জাগানো ঠিক হবে কী?

তবু সামান্য ইতঃস্তত করে সে ডাক দিলে, "হুজুর, তামাক আনছি।"

ডাক কাজ দিলে। মৃধা খোঁয়ারির মধ্যে থেকেই আধা-সচেতন উচ্চারণ করলে, "থুইয়া যা।"

কিন্তু নিজকে ক্রমশঃ খোঁয়ারির হাতে সোপর্দ করার মধ্যেই যেন সকল জন্মের আরাম নিহিত। আসরের অক্ত হতে এখনও কিছু সময় আছে। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। খোঁয়ারির মধ্যে ডুবেও মৃধা এই হিসাবটুকু কষে নিয়েছিল।

কিন্তু পনর মিনিট যায়নি, মনাই মনিবের চেয়ারের পাশে আতঙ্কিত ফিস্ ফিস্ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল, "হুজুর— মিলিটারি।"

"মিলিটারি!"

মখদুম মৃধা চেয়ার থেকে একদম লাফিয়ে উঠে পড়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেরা, "কুই রে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখলদার সেনাদের গতিবিধি নিরীক্ষণের ব্যাপারে বাংলাদেশের অধিবাসীদের দৃষ্টিশক্তিই তখন একমাত্র সহায়ক ছিল না, বহুজন যেন ষষ্ঠ কোন ইন্দ্রিয় খুঁজে পেয়েছিল।

মনা আঙুল বাড়িয়ে মাঠের দিকে দেখায়।

মখদুম মৃধার খোঁয়ারি চোখ যেন সামনে দু'মাইলের মধ্যে আর ছিল না।

মনা-কে সে বললে, "চল একটু এগিয়ে দেখা যাক, ব্যাপারডা কী?"

মাথার টুপিটা আরো যত্নের সঙ্গে লাগিয়ে, হাতে লাঠি নিয়ে মৃধা এগোতে লাগল।

মনা সম্মতি চায়, "আমি লগে যামু, হুজুর?"

"তয় ব্যাডা খবর দিছিলি ক্যান?"

মখদুম মৃধা খেঁকিয়ে উঠল। অবিশ্যি তার দৃষ্টিশক্তি উত্তর-ষাট বয়সে আদৌ তীক্ষ্ণ নয়। মনা মানুষ হিসেবে ছোট। কিন্তু তার চোখের পাউয়ারের উপর তেমন বিশেষণ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হবে না।

মখদুম মৃধা তাই শান্ত গলায় বললে, "চল ব্যাডা, একডু আগাইয়া দেহি সাপ ব্যাঙ কী দেখ্‌ছস?"

২

অন্দরে মৃধার দুই কন্যা চামেলী এবং সাহেলী একটি ট্র্যান্‌জিস্টার নিয়ে তখন কলহ বাধিয়েছিল। তেমন গুরুতর কিছু নয়। যন্ত্রখানা কার কাছে থাকবে তা নিয়ে বচসা।

উভয়ে কলেজের ছাত্রী। সাহেলী বয়সে বড়। দেড় বছরের ফারাক থাকলেও দু'জনে এক ক্লাসের ছাত্রী।

এদিকে পিতার কোন কৃপণতা ছিল না। মেয়েরা ঢাকা শহরে মৃধার এক ফুপাতো ভায়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে।

সেই ভদ্রলোক বয়সে মৃধার চেয়ে বছর দুই বড়। ভাগ্যবান পুরুষ। আগে সরকারি চাকরি করতেন, তিরিশ বছর আগে যখন মুসলিম লীগের জোয়ার আসে। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল। সিভিল সাপ্লাইজের অফিসার। ফলে, দু-হাতে রোজগারের মৌকা আল্লাতালা মুসলমান অফিসারকে দিয়েছিলেন। গদি মুসলিম লীগের। সুতরাং কোন অসুবিধা হয়নি। দেশ বিভাগের পর তিনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় মন দিলেন এবং মুসলিম লীগে নাম লেখালেন। রাজনীতি এবং অর্থনীতি এক সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে নসিব খুলতে দেরি হয় না। আগে খুলেই ছিল, এবার খোলতায়ে-খোলতায়ে আকাশে কিনারায় ঠেকার কথা। মৃধা নিজেই মাঝে মাঝে আফ্‌শোস করে। ভাই মুসলিম লীগার আমিও তা-ই। কিন্তু আকাশপাতাল ফারাক। পঁচিশ বছরে তফাৎ কতো বেড়ে গেল। দু'জনেই এক চৌকিতে শুয়ে স্কুলে লেখাপড়া করতাম। ভাই এখন ঢাকা শহরে তিনখানা বাড়ি মালিক। নিজে যে-দোতলা বাড়িতে থাকেন, তার নক্‌শা আর আসবাব-পত্র তিনি কোনদিন স্বপ্নেও দেখেননি, যদিচ অফিসার হয়েছিলেন। প্রত্যেক কামরায় কার্পেটই আছে হয়ত লাখ টাকার। আর আমি গ্রামে এখানে... অথচ দু'জনেই মুসলিম লীগ করলাম। লেখাপড়া শিখিনি, বি-এ পাশ করতে পারলাম না। তারই খেসারৎ। ফুপাতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই মেয়ে দুটোকে জোর করে নিয়ে গেলেন। যখন— যা— হয়। এক দু'শ টাকা জোর করে হাতে গুঁজে দেওয়া। অত অল্পে কী শহরে মেয়েদের লেখাপড়া সারা যায়? সেদিকে ভায়ের কলিজা আছে। তবু খোদার কাছে শোকর, দরিদ্র দেশে আমার যা আছে, তা অনেকেরই নেই। তবে এটা শিক্ষা হয়েছে, যা করো শহরে গিয়ে করো। মুসলিম লীগ করতে হয়, তাও শহরে। গাঁয়ে ছুঁচোর মত কিচিমিচি, কিছু রাস্তাঘাটের কন্ট্রাক্টারি, কিছু রিলিফ-বণ্টন, রেশনের দোকান— এসব দিয়ে আর কতো টাকা হয়? মারি ত হাতি, এখানে ত শেয়াল পাওয়া দায়। গাঁয়ে পড়ে থেকেই ভুল করলাম। একবার চোখ-কান বুঁজে গিয়ে পড়লেই হত। দেশের দু'চার বিঘে জমির লোভে খামাখা ইহকাল বরবাদ। ভাই যখন উঠতে লাগল, তখন তার কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলেই হত। যাক, সে-সব। এখন শোকর, মাবুদ। মেয়েদু'টো অন্ততঃ মানুষ হয়ে যাবে। দু'জনেই বৃত্তি পায়। আক্কেল হুঁশ বেশ দিয়েছে আল্লা। কিন্তু আজকাল্কার মেয়ে। তমিজ লেহাজ আদব-কায়দা সব যেন কেমন কেমন ঠেকে।

সাহেলী সেদিক থেকে সত্যি বাঁকা ঘাড়। ধনী চাচার আশ্রয়ে অর্জিত তার মেম-মেম চাল-চলন মৃধার কাছে তেমন ভাল লাগে না। বেশ গৌরাঙ্গী, দীর্ঘাঙ্গী সাহেলী। শহুরে খাওয়া পরার রুচি তাড়াতাড়ি রপ্ত করে ফেলেছিল। ফুপাতো ভাই-ই কোন ছেলে খুঁজে দেবেন, মৃধা মনের কোণে তেমন ধারণা পুষে রাখলে কিছু অন্যায় করেনি। কলেজের ছুটি হলে ওরা গ্রামে মা-বাপকে দেখতে আসে। কিন্তু কদিন পরেই সাহেলীর ভাব পালাই পালাই। চামেলীও গৌরাঙ্গী। কিন্তু ঈষৎ বেঁটে। তবে খুব স্বাস্থ্যবতী। তাই আরো নাতিদীর্ঘ ঠেকে। দুজনেরই ডাগর চোখ। চামেলী সাহেলীরা তুলনায় বেশ লাজুক এবং স্বল্পভাষী। তার মাতৃশ্রদ্ধা এত বেশি যে ছুটি ফুরোলে সে বেশ কষ্ট পেত। চালচলনে সে পুরাতন উপমায় আষাঢ়ের বিদ্যুৎভাসিত জলভরা মেঘ। সাহেলী যেন আনন্দিত নটিনী তটিনী। শহর থেকে গ্রামে আসার সময় একদম বোরখাঢাকা। পথঘাটে চলাফেরার কৌতূহল উভয়ের কিন্তু বাপ এসব ব্যাপারে আগেই একটা সন্ধি করে রেখেছিল। সন্ধি নয় কিঞ্চিৎ শাসানি। তাই উভয়ে বেশ ছালাবন্দী হয়ে বাড়ি আসত। কিন্তু তারপর আশেপাশে ভিটার বাইরে তারা এমনভাবে বিচরণ করত যে শুধু মৃধা সাহেবের কন্যা, নচেৎ আর কারো মেয়ে অমন বেলেল্লাপনা করে পার পেত না। বৃত্তি পায়, মেয়েদের ছবি ছাপা হয় খবরের কাগজে। এই ছবি গ্রামের সকলকে আবার দেখায় মৃধা। গ্রামগৌরবের এমন রেশ নিন্দুকদের শান্ত করে রেখেছিল। কিন্তু শহরে দুই বোন মুক্ত বিহঙ্গিনী। চাচা মুসলিম লীগ করলেও ইসলামী আদবকায়দার তফসির আর দশজন নেতার মত করতেন। "মোল্লা আর মুসলমানে ঢের তফাৎ। প্রথমটা হচ্ছে জীবজন্তু আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে জ্বীন। তফাৎ থাকতে বাধ্য।"

চাচার স্ত্রী শেষ বয়সে বিয়োতে শুরু করেছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তিন জন। দুই মেয়ে এক ছেলে। কিন্তু বেশভূষায় তিনি তরুণীর মত থাকেন। আত্মীয় দেবর-কন্যাদের তিনি শিষ্যার মত পেয়েছিলেন। আর শিষ্যারা অনুকরণ করত ওস্তাদনীকে। চাচির রঙিন ব্লাউস এই বয়সেও। চামেলী সাহেলী পেছনে তা নিয়ে হাসাহাসি করলেও সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদম অবোধ বালিকা। ফলে, উভয়ের এক ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠছিল, মুরুব্বিদের যত পারো আদব তামিজে রেখে কলা দেখাও। চাচা মুসলিম লীগ করলেও খানাপিনায় সাহেব অর্থাৎ বিলেতি সাহেব। পাকিস্তান হলে ইসলামী তমদ্দুন জোয়ারের চচ্চর সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, যারা খোওয়াব দেখতেন তাদের ভুল ভেঙেছিল। কাটা মাথার দিকে ধড় যেমন চেয়ে থাকতে চাইলেও আর পারে না, কারণ, চোখ অন্য খণ্ডের সঙ্গে চলে গেছে, এখানেও তা-ই ঘটেছিল। নতুন স্রোত ঠেকানো অত সোজা নয়। তখন মুসলিম লীগ ভাঙতে লাগল। কনভেন্‌শনাল লীগ শুধু লুটপাটের বখরা নয় নানা অন্তর্বিরোধের ফল। এসব পরিবেশ তলিয়ে দেখার বয়স কিন্তু চামেলী বা সাহেলীর নয়। কাজেই স্রোতে গা ভেসেছিল। এই ব্যাপার বাইরের দিকে। ভেতরেও খাপ খাওয়ার প্রশ্ন ছিল। দুজনেই মনে মনে আওয়ামী লীগের সমর্থক। কিন্তু গুরুজনদের কিছু জানতে দিত না। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়িকতার এই ধূয়া ছাড়া মুসলিম লীগের ঘিলু পথে আর কোন সদর্থক চিন্তা কোনদিন প্রবেশ-পথ পায়নি। স্বয়ং জিন্না সাহেব ছিল এদিক থেকে সবচেয়ে যত বড় মুর্খ, তত বড় ভণ্ড। দেশবিভাগের পাঁচ বছর পরে দুই বোনের জন্ম। তাই ধর্মের জিগির সাম্প্রদায়িকতা তাতিয়ে তুলতে পূর্বে যেমন কার্যকর হত, আর তার সুযোগ রইল না। বাবা জোর করে তাদের গ্রামে এনেছিল পনরই মার্চ তারিখে। নচেৎ শহরময় উন্মাদনা ছেড়ে তাদের ঘরকুনো হওয়ার কোন বাসনা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছেলেমেয়েরা রাইফেল ছোঁড়া শিখছিল, কুচ্‌কাওয়াজ করছিল। সাহেলী সে-দৃশ্য নিজের চোখে দেখে ঢাকা নগর স্বেচ্ছায় পরিত্যাগের মত বান্দা নয়। কিন্তু চাচা নিজেই তাদের শহরের বাইরে থাকতে উপদেশ দিলেন, নিজেও ফ্যামিলি নিয়ে দাউদকান্দি, না আর কোথাও গেলেন। এক পাঠান দরওয়ান শুধু পাহারা দেওয়ার জন্যে বাড়িতে রইল। ফর্সা চেহারা। কিন্তু নাম কালে খান। বড় এবং বিশ্বস্ত মানুষ। চাচার সঙ্গে গত বিশ বছর আছেন। তাই হেফাজতির ব্যাপারে ভয়ের কিছু ছিল না।

AMARBOI.COM

কিন্তু গ্রামের শান্ত পরিবেশে দিন কাটানো কঠিন। বাংলাদেশে মিলিটারি হাম্‌লার ফলে, গ্রামগুলো নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মেয়েদের জীবন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা-আতঙ্কের ছায়াতলেও একঘেয়ে। আর শিক্ষিতা মেয়েদের মনের চাহিদাও নানা ধরনের। অন্ততঃ বহির্জগতের খবর ত কিছু চাই। ট্রানজিস্টার বহু জায়গায় শুধু ক্লান্তিহরণ নয়, প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল।

উপস্থিত দুই বোনে বচসা, যন্ত্রটা কোথায় থাকবে এবং কোথায় শোনা হবে। মৃধা অত খবর নিয়ে মেতে উঠে না। তাছাড়া ভারতের সংবাদ শুনলে সে জ্বলে উঠে। অথচ মেয়েদের কলকাতার খবর শোনা চাই। বাবার ধমক আজকাল প্রায় শুনতে হয়। দুই বোন বাবার সঙ্গে খোলাখুলি কোন রাজনৈতিক প্রশ্নও তোলে না। যেন কিছুই হয়নি দেশে। ঘৃণামিশ্রিত শ্রদ্ধা সম্পর্কে মৃধারা অজ্ঞ।

হস্তস্থিত ট্রানজিস্টার উপরে তুলে সাহেলী বললে, "শোন, রাত ন'টার পরে আমরা চুপিচুপি দাদির ঘরে গিয়ে শুনব। এটা আমার কাছে থাক।"

"না তুমি দাদির বিছানায় শুতে যাবে না, আমি জানি। এখানে বাবার জন্যে শোনা

যাবে না।"

"আমি বলছি, আমি যাব। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনেই বেঁচে আছি।"

চামেলী প্রতিবাদ করে, "মিথ্যে কথা। কাল তুমি ঘুমিয়েছ, যখন দেবদুলাল ভাষণ দিচ্ছিল।"

"কাল শরীর ভাল ছিল না। আমার ত একঘেয়ে লেগে গেছে আর মন বসছে না এখানে। তাই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

ট্র্যানজিস্টার তখনও সাহেলীর হাতে।

চামেলী অনুরোধ করে, "আমার কাছে থাক। তোমার শোনার কোন অসুবিধে হবে না। আহ, দেবদুলাল সত্যি বাংলাদেশের লোককে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

"শব্দও সৈনিক হতে পারে, এতদিনে বুঝলাম।"

বেশ বিজ্ঞের মত জবাব দিলে সাহেলী। কিন্তু মুঠি আরো শক্ত যেন হাতের জিনিস ছিন্‌তাই না হয়। তারপর সে আবার যোগ করলে, "কিন্তু রোজ অত্যাচারের যা কাহিনী শুনছি, আমার ত ঘুম হয় না।"

"বাপজান বলে, সব প্রপাগান্ডা। ইন্ডিয়ার কারসাজি"

"ঢাকা শহরে অন্তত দশ হাজার লোক মেরেছে, তা'ত আর প্রপাগান্ডা নয়। ইউনিভারসিটির কতো স্যারকে আর দেখব না।"

চামেলী এবার গম্ভীর হয়ে যায় এবং বলে, "বাপজান এক মানুষ বটে! হাজি মানুষ। এত অত্যাচার চলেছে, কিন্তু মুখে অহো-শব্দ পর্যন্ত নেই। শুধু ওই এক কথা : আল্লার দান পাকিস্তান। তাকে যত কাফের কম্যুনিস্ট আর আওয়ামী লীগ মিলে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিধর্মী হিন্দুস্তান।"

AMARBOI.COM

"বাপজানের কথা ছাড়ো। আমি ত মুখে মুখে তর্ক করি না। নচেৎ আমারও সোজা বলতে ইচ্ছে করে, হিন্দুস্তান বিধর্মী হবে কেন? সেখানে কী লোকে ধর্ম মানে না?

চামেলী হঠাৎ সাবধান করে দিলে, "আস্তে কথা বল, বুবু। বাপজানের কানে গেলে—।"

"বাইরে বাতাস খাইতাছে আমি দেখছি।"

"দূর আমার আর ভাল লাগে না। লেখাপড়া নেই। এইভাবে ক'দিন কাটে আল্লা জানে। আমার হাতে ট্র্যান্‌জিস্টারখানা দাও।"

"চাচা শহরে ফিরে আসেননি। এলে আমি চলে যাব," সাহেলী জবাব দিলে। অনুজার অনুরোধ এইভাবে চাপা দিতে চাইলে।

মৃধা সন্ধ্যার দিকে বেতারের কিছু খবর শোনে। তারপর সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। পাকিস্তানের খবর মেয়েরা শুনতে নারাজ। বাপের ধমকে চুপ করে যায়। কিন্তু বেশি রাতের দিকে তারা আকাশ-বাণীর সংবাদ শোনে। তাছাড়া যেখানে যে-স্টেশন পায় কান পেতে দেয়। বহু রাত পর্যন্ত ট্র্যানজিস্টারের কাঁটা ঘুরিয়ে দুই বোনের সময় কেটে যেত। সম্প্রতি একদিন মৃধার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মেয়েদের এই কাণ্ড পছন্দ করেনি। অনেক সময় এক বোন ঘুমিয়ে পড়লে, অপরের অসুবিধা। দু'জনে এক কামরায় শুলেও যে জেগে থাকবে সে-ই যন্ত্রটা ব্যবহার করতে পারবে অন্যের অসুবিধা না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটিয়ে, এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাই সাহেলীর পূর্বোক্ত প্রস্তাবনা।

মৃধার পাশাপাশি তিন কামরা পাকা বাড়ি। সঙ্গে অন্দরের উঠান। চৌকো তিন চার কাঠা জায়গা। তারপর আবার এক সারি টিনের ঘর আছে খান পাঁচেক পাক্‌শালসহ। এইদিকে মৃধার পৈতৃক আমলের ঘরদোর। পাকা ইমারৎ সেদিন উঠেছে। মৃধার মা পুরাতন বাড়ি ছেড়ে আসতে রাজি হননি। বহু কালের স্মৃতি ছিঁড়ে ফেলা যেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বর্তমানে আশি-বিরাশি বয়স। চোখে দেখেন না গত তিন বছর থেকে। তাঁর দেখাশোনার ভার পুরাতন এক বাঁদীর উপর। তারও বয়স পঞ্চান্ন হবে। মেয়েটা বাল্য-বিধবা। মৃধার মার স্নেহাশ্রয় ছেড়ে আর নিকা বসেনি বা আর কোথাও যায়নি। সৌভাগ্যক্রমে বাঁদীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। গিন্নির খেদ্‌মতে কুণ্ঠাহীন প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা তাই এক নিবিড় নৈকট্যে বাঁধা। তাদের সুখ দুঃখের জগৎ সেই টিনের ঘরেই বুদ্বুদ তোলে। অবিশ্যি মাঝে মাঝে দুই নাত্‌নি হাজির হয় দাদির কাছে গল্প শোনার জন্যে। তবে তারা ত বেশির ভাগ শহরে থাকে। তাই সব সময় কাছে পাওয়া দায়। মৃধা-জননী এখন অধিকাংশ কাল শুয়েই থাকেন। শরীর বেঁকে গেছে। লাঠি ধরে বাঁদীর সাহায্যে উঠানে বেরোন অল্প সময়ের জন্য। সেফ্‌টি ট্যাঙ্কের রেওয়াজ গ্রামে চালু হওয়ার ফলে মৃধা গোসল-খানা কাছেই তৈরি করেছিল। তাই রাতবিরেতে কাউকে পেসাব-পায়খানায় তেমন বিপদে পড়তে হয় না।

অনেক কথা কাটাকাটির পর দুই বোনে শেষে সন্ধি হলো।

দাদির কাছেই ট্রান্‌জিস্টারখানা রেখে আসা যুক্তিযুক্ত। মৃধা যদি খবর শুনতে চায়, তখন নিয়ে এসে দিলেই চলবে। দাদি ত প্রায় সারা রাত জেগে থাকেন। বেশি রাতে তাঁর কাছে গিয়ে বেতারবাণি শুনতে কোন অসুবিধে নেই। দাদি বরং খুশিই হবেন। নচেৎ এক কামরায় একজন রেডিও শুনবে, আর একজন ঘুমাবে, তা হয় না। অবিশ্যি মৃধার বাড়ির চারিদিকে পাকা পাঁচিল। রাত্রে উঠান পেরোতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

দাদির কামরাটা ছোট নয়। জানালাগুলো বড়। দক্ষিণ খোলা। আলো বাতাসের কমতি নেই। মৃধা মার বৃদ্ধকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বেশ নজর রেখেছিল। বড় তক্তপোষের এক দিকে প্রৌঢ়া বাঁদী কুলসম মাদুর পেতে ঘুমোয়। কিন্তু তোষক গোটা তক্তপোষময়। গিন্নীর দিকে শাদা ধব্‌ধবে চাদর পাতা। মোটামুটি সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবু শহুরে নাত্‌নিদের নাকে কেমন গন্ধ লাগত। তা নেহাৎ মানসিক ব্যাপার। সাহেলীর না-ছোঁ-না-ছোঁ ভাব। কিন্তু চামেলীর আদরে দাদিকে জড়িয়ে ধরতে এতটুকু বাধত না। কুলসম মাঝে মাঝে মন্তব্য করত বুড়িবিবির কাছে, 'লিখাপড়া মাইয়ারা ক্যামন য্যান হয়।' বুড়িবিবি জবাব দিতেন, 'জামানার তাসির' অর্থাৎ যুগের প্রভাব। চোখ নষ্ট হলেও মৃধা জননীর আক্কেল-হুঁশ টন্‌টনে ছিল। আর তিনি নিজকে গুটিয়ে নিতে জানতেন। বয়সের শেষ প্রান্তে এসে অনেকে আবার যৌবনকালের মত সম্মুখের সবকিছু আঁকড়ে ধরার প্রয়াসী হয় এবং সেই জন্য দুঃখ পায়। বুড়িবিবি সেদিক থেকে আশ্চর্য এক মানবী। দুর্বল শরীর। নামাজ নিয়মিত আর পড়েন না। কিন্তু অদ্ভুত মনের গঠন। ভবিতব্যের হাতে সঁপে দিতে পারলে যে-প্রশান্তি পাওয়া যায়, তেমনই চিত্তের অধিকারীণি বুড়িবিবি। কারো সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু বিশ বছর আগেও তিনি সাংসারিক ব্যাপারে

নাক গলাতেন। মৃধা যখন দহলিজের সম্মুখস্থ বাগান দখল করে নেয়, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রতিবেশী বিজয় বসুর সম্পত্তি সে কী করে পেয়ে গেল? "হেরা হিন্দুস্তান যাওয়ার অক্তে দিয়ে গ্যাছেগ্যা।" পুত্রের এই জবাবে বৃদ্ধা আদৌ সন্তুষ্ট হননি। গত পাঁচ বছর বুড়িবিবি অতীতের রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে বেশি সুখ পেতেন। তাই কেউ কাছে এলে জিজ্ঞাসার ধারা পেছনে বইতে থাকত। প্রৌঢ়া কুলসম প্রধান শ্রোতা। আর কারো প্রয়োজনও ছিল না। অনেক সময় বুড়িবিবি নিজের মনেই বলে যান, পাশে কেউ আছে ভেবে অন্ততঃ কুলসম আছে— এই মনে করে। কিন্তু হয়ত সত্যিই তখন নিকটে কেউ নেই।

দাদির কামরায় একটি পুরাতন আমলের উঁচু আলমারি রয়েছে। পাঁচ ছ'টা থাক্। একদম উপরে বেঁটে মানুষের হাতই যাবে না। কুলসম তখন অন্য পিঁড়ি বা চৌকির উপর খাড়া হয়ে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস নামায়।

সাহেলী এবং চামেলী একসঙ্গে এসে ডাক দিলে, "দাদিজান।"

"কী, বুবুরা।"

বৃদ্ধার কান এখনও প্রখর।

সাহেলী বললে, "আপনের আলমারিতে ট্র্যান্‌জিস্টার রেখে যাব। খবর শোনা যাবে।"

"খবর— ?" বৃদ্ধ একটু গলা টেনে জবাব দেন, "বু-জান, খবর বালা লাগে না। খালি খুন-জখম মারামারি। 'কাইল হুনলাম, মিলিটারিরা গুলি কইরা মাইল, তার বাদে আমার দুই পোলারে—! তহন রেডিওর মদ্দে কী চিক্কর পাইড়ল, হুইনলে বুক ফাইড্যা যায়— অহনও আমার বুক কাঁপে। বুবুজান, খবর হুইন্‌তে আর মন চায় না। আখেরী জমানা, কিয়ামৎ আইতাছে।"

একটানা জবাব দিয়ে দম নিতে বুড়িবিবি থামেন। চামেলী তখন দাদির পিঠে হাত বুলিয়ে সাদরে বলতে লাগল, "দাদিজান, হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন মরতাছে। আমাগো গাঁ অহনও ভালা।"

দাদি পৌত্রীর শরীর হাতড়ে প্রথমে মাথায় হাত রাখেন এবং পরে চিবুকে আঙুল রেখে জবাব দিলেন, "বুবু অমন অলক্‌খনে কথা মুখ আনতে নাই। রোজ আল্লার নজ্‌দিগ দোওয়া মাংগতাছি, আমার বাচ্চা, দুই বুবুজান্‌রে আর হগ্‌গল গাঁয়ের মান্‌ষের, সারা দুনিয়ার মংগল করো, আল্লা গফুরর রহিম।"

সাহেলী বেশ গম্ভীর আন্‌মনা হয়ে যায়।

মিলিটারিরা গ্রামে গ্রামে পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের গ্রামে যদি আসে! এতদিন এসব কথা তার মনে হয়নি কেন? নিজের এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে সে মনে মনে অনুতপ্ত হয়।

তাই আর কোন কথা বলে না।

বুড়িবিবি আবার মুখ খোলেন, "বু-জান পাকিস্তান আইল। কতো মারামারি অইছে হুনছি। পাশের গাঁয়ে অইছে। আমাগো গাঁয়ে অয় নাই। কিন্তু মান্‌ষে ত থাকল না। আমাগো দক্‌খিনের পাড়া— বিজয় বসুগো পাড়া। আজ পাঁচটা মান্‌ষ নাই। তাগোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরদোর বেইচ্যা চইল্যা গেল। কতো জমিন মানুষে জোর দখল কইরা লইল। তহন ভাবছি, পাকিস্তান অইল, তয় মানুষ ভিটামাটি ছাড়া অইব ক্যান? তোমরা লিখাপড়া জানো, বেশি বোঝো। আমি ত বুঝন পারি না। আমার তহন মনে খটকা লাগছে। এ জুলুম আল্লা ক্যামনে সইব? চইলা যাওয়ার দিন বিজয় বোসের মা আইল। আমারে দিদি ডাইকত...”

বৃদ্ধা অতঃপর স্মৃতিচারণ করেন। সেই বিদায়কালের বর্ণনা তিনি সহজে দিতে পারেন না। একবার চোখের পানি পর্যন্ত মোছেন। বসুদের বড় পুকুর এখনও রয়েছে। গ্রামে পানীয় জলের অভাব ছিল। মুসলমান মেয়েরা পর্দানশীন। তাই সন্ধ্যার পর অথবা খুব ভোরে বোসদের পুকুরে জল আনতে যেত। কলস কাঁখে এক জোৎস্নামাখা ভোরে দুই বধূর সাক্ষাৎ।

“বুবুজান্‌রা, ফর্সা চেহ্‌রা য্যান ঠাকুরের পিতিমা। দেহি হে-ও পানি নিতা আইছে। বাড়ির লগে পুকুর, তবু এত ভোরে উডছে? কয় ‘ভোরে পানি ঠাণ্ডা থাহে’। হেই আলাপ শুরু। তারপর কতো বচ্ছর না গ্যালো। আমাগো ছেলেপুলে আইল, চুলে পাক ধরল, বিজয়রে আমি ল্যাংড়া দেখছি। হের মা আমারে দিদি ডাইকত। আমিও পাল্ডা দিদি ডাইকতাম। কতো দিন দিদি আইছে। এই ঘরে বইছে না? আমিও তাগোর ঘরে গেছি মগ্‌রেবের পর। হের পর আইল পাকিস্তান। ঠিগ আছে। পাকিস্তান বানাও। কিন্তু আইল কী? পাড়া খালি অইতে লাইগল। দিদি আইল যাওয়ার দিন। লগে নাত্‌নি। নাম ভুইলা গেছিগ্যা। দশ বারো বয়স। হেও আমারে ঠাকুমা কইত। আমারে পেরনাম কইরত। দিদি কইল, ওরে আশীর্বাদ করেন আপনি, যেহানেই থাহে য্যান ভগবান সুখে রাখে হগ্‌লের। কইল, বর্ধমান না কি জিলা, সেহানেই যাইব। বুবুরা, সাতপুরুষের ভিটা ছাইড়া...কও...মান্‌ষের উপর জুলুম না? পাঞ্জাবি মুসলমান বা'ই। বা'ইয়ের লগে মিলে পাকিস্তান বানাইলি। ভিটার লগে ভিটা, এক পড়শি হে তোগোর বা'ই অইল না। তোগোর বা'ই অইল ভিনদ্যাশী...।”

বুড়িবিবি খক্‌কক কেশে ওঠেন। চামেলী দাদির বুকে তখন হাত বুলায় এবং বলে, “দাদি হে ত আগের কথা। যা হওনের হইছে। অহন কী অয় আল্লা মালুম।”

বৃদ্ধা আবার নিজের জগতে সফর করত থাকেন, ‘বিজয়ের বাপে ছিল বড় সংসারি মানুষ। তোমার দাদারে কইত, মৃধা, সম্পত্তি ছাড়া চলে না সংসারি মান্‌ষের। হিসাব কইরা চইলো। তুমি ত খাইয়া ফকির। পোলাপান আছে...। আমি বুড়া অত জলদি মইরা যাইব হপনেও ভাবি নাই। হঠাৎ দু'দিনের জ্বরে দম্‌ বন্ধ অইল। তোমার দাদার কী আফ্‌শোস! বড় হুশিয়ার মানুষ আছিল। দায়ে দফায় নিজের বাইয়ের লাহান। দু'বছর পরে তোমার দাদা ইন্তেকাল কইরল...। দুই বুড়াই শ্যাষ। কপাইল্যা মানুষ্‌ দুই জনে। সুখে মরছে...।”

সাহেলী মন্তব্য করলে, “দাদিজান, পুরাতন কথা ভাইব্যা মন খারাপ করেন ক্যান?”

বুড়িবিবি জবাব দিতে দেরি করেন না, “বুবু মায়ামমতা বড় জিনিস। আমি আইজ আছি কাইল নাই। তোমাগো কোলে যাইতা পারলেই সুখী কিন্তু যা খবর হুনি, মন আগা দ্যায়। খারাপ কিছু অইলে আমাগো বাঁইচ্যা কী সুখ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আজ রাইতে আপনার লগে হুইতাম। এই রেডিও রাইখা গেলাম। তহন আপনের কথা আরো হুইনব।"

প্রস্তাবনা সাহেলীর।

"বুবু, বুড়া মানষ একা একা থাহন পড়ে। তবু কুলসম আছে। তাই ভরসা। আমার নসিব, তোমরা আইলে কতো খুশি হই। মুরুক্ষু ছিলাম। তোমরা কলেজে পড়ো, আমার কলিজা দশ হাত ফুইল্যা ওডে। আমার দুই বুবু কতো সুন্দর। কতো সুন্দর...।"

পিতামহীর কথার উপর মাঝপথে সাহেলী টীকা জোড়ে, "দাদীজান, জওয়ান-কালে আপ্নেও কতো জনের মাথায় চককর লাগাইছেন হে অহনও বুঝা যায়।"

পৌত্রীর মন্তেব্যে ফোগ্লা গালে বৃদ্ধা হাসেন এবং হাতড়ে সাহেলীর মাথায় হাত রেখে বলেন, "আমি দোয়া করছি, আমার মাথাৎ যত চুল তত হায়াৎ (আয়ু) হোক।"

চামেলী তখন ফুট কাটলে, "না, দাদি অত বুড়ো হৈয়া বাঁচার সাধ নাই। মান্ষের মাথায় চককর লাগনোর কালেই—।" কিন্তু এই সময় সাহেলী তার পিঠে চিমটি কাটার ফলে সে থামতে বাধ্য হয়। পরে আবার খৈই ধরে, "আপনে দোয়া করেন য্যান বাংলাদেশ জলদি অয়।"

"ক্যান পাকিস্তান কী অইল?" বুড়িবিবি প্রশ্ন করেন যেন কিছু ঠাওর পাননি।

সাহলী তখন মৃদু হেসে জবাব দেয়, "দাদিজান, আপনে কী খবর হোনেন? পাকিস্তান অহনও আছে। তবে মইরতে বসছে। জলদি মরণ জ্বালা। তা অইলে জল্দি বাংলাদেশ অইব। বাঙালিগো লগে হের তরেই ত লড়াই লাগছে। রেডিওর খবর হুনেন না?"

বুড়িবিবি তখন বেশ সচেতন হন এবং নিজের ভুল সংশোধন করতে বেশ জোর দিয়েই বলেন, "এ-ই কথা মনে আসে এ-ই ভুইল্যা যাই। বুড়াকালে হতেক (শতেক) দোষ।"

কুলসম বুড়িবিবির পান ছিঁচতে গিয়েছিল। এই সময় এসে পৌছল। একা নয়। মৃধাপত্নী আসেমা সঙ্গে। নিজের দুই মেয়েকে এখানে দেখে খুব খুশি হয় মা। বেচারা অতি শান্ত মানুষ। বয়স খুব বেশি না, তবু কেমন বুড়ি বুড়ি ঠেকে। সংসারের কাজ নিয়েই আসেমা বিবি পাগল থাকে। মাঝারি আড়ং। কিন্তু মুখটি তুলনায় শীর্ণ। এক ধরনের শান্ত আবহাওয়ার প্রতীক। যেন সকল পরিতৃপ্তির মালিক এখন মহৎ মৌন আত্মোপলব্ধিতে মশ্গুল। মৃধাপত্নী স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। দুই মেয়ে অবিশ্যি তেমন হলে এই বাড়িতে হাঁসমুরগির হাঁকডাক ছাড়া আর কোন শব্দই থাকত না।

আসেমা বিবি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেও দুই মেয়ের হাস্যময় অভিনন্দনের জবাব দেন হাসিমুখে! কিন্তু কোন কথা বলেন না। আবহাওয়া পুষিয়ে দিলে দুই মেয়ে এক সঙ্গে মুখ খোলে, "মা আজ আমরা দুই জনে দাদির লগে হুইতাম। অনেক রাত তক রেডিও শোনা যাইবো।"

"বেশ," মার মৃদু জবাব মৃদুস্বরে।

"বাজানের কানে আওয়াজ গেলে গোস্বা হন। তাই আমরা ঠিক করছি...।"

"বেশ।"

বধূমাতার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হন বুড়িবিবি। তাই বলেন, "মা, চোখ খাইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইস্যা আছি। দেহি না ত কিছু। কহন আইছ? বইয়া পড়ো। আমার পাশে বইয়ো।"

অপরপক্ষ অতি সমীহের সঙ্গে জবাব দিলেন, "মা আসরের অক্ত। বহুৎ কাম বাকি। বসার সময় নাই।"

বুড়িবিবি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, "বেডির হারা জিন্দেগী খালি কাম আর কাম। মিলিটারির যুগ। মান্ষে কতো কী ভাবে। আমার বেডি কাজেই মশ্‌গুল।"

পরবর্তী মন্তব্যকারিণী কুলসম, "বিবিসাব, মিলিটারির যুগ ত ডরের কী আছে? মিরধা সাব কন, আল্লা পাকিস্তান রক্ষা করার লাইগ্যা ফেরেস্তা পাডাইছে। তাদের ভয়ের কিছু নাই।"

এই তফ্‌সির বা ভাষ্য বুড়িবিবির কানে মধুর ঠেকেনি। তাই বিরক্তি প্রকাশে বলে ওঠেন, "তুই হুন্‌ছিস আমাগো মধু (মৃধার ডাক-নাম) কইছে? কবে কইল?"

কুলসম আঁচ করতে না পেরে জবাব দিল, "মা-জান, হেদিন ত আপনের সামনে কইল। তিন দিন অয় না। আপনে ভুইলা গ্যাছেন গা।"

বুড়িবিবি চুপ করে যান। দুই পৌত্রী অবিশ্যি দাদির দলে। কিন্তু তারা কোন মন্তব্য করে না।

এই আবহাওয়া আবার হাল্কা করে তুললে কুলসম, "মা-জান, আপনের পান আনছি।"

ছোট হামানদিস্তা তখনও কুলসমের হাতে। তা থেকে সামান্য বের করে দিতে বুড়িবিবি পান চিবোতে থাকেন, ফোক্‌লা গাল নেড়ে। তিনি তখনই যেন কিছু বলবেন এই অনুপান সেরে। তাই সকলে চুপচাপ থাকে।

গোটা ভিটা গাছপালায় বোঝাই। গ্রীষ্মের দিন, তবু ঠাণ্ডা। অবেলার আবহাওয়া এবং ম্লান আলোয় বেশ তরতাজা মনে হয় চতুর্দিক।

পাশেই পিক্‌দান থাকে। বুড়িবিবি রস খেয়ে ছিব্‌ড়ে থু থু শব্দে ফেলতে লাগলেন।

তখনই মনা উর্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকে বললে, "মা, মিলিটারি! মিলিটারি!!?!"

এই শব্দে সকলে অনড়। অজানিতে সাহেলী এবং চামেলী দাদির দু'দিকের বাজু চেপে ধরে উৎকর্ণ। মনার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না যেন।

কুলসমই প্রথমে প্রশ্ন করতে সমর্থ হয়, "কুথা?"

"আমাগো দহলিজে"। তারপর মনার মুখ ঝট্‌পট খুলে যায়, "আমরা সাবের লগে রাস্তায় খাড়াইছিলাম। হেরা আইল। সাবের লগে কথা কইল। অহন তাগোর চা খাওয়ান পড়িবো। স্যাব আপনাদের খবর দিতা কইলেন, বু-জানরা। সাব দহলিজে চেয়ার-উয়ার ঠিক করতাছেন। অহনই আইব। আমার সয়ীদ মাদ্‌বর আরো পাড়ায় মান্ষে খবর দেওন পড়িবো।"

কর্তব্য সেরে মনা বিদায় নিলে।

বুড়িবিবি তখন দুই হাত তোলেন মোনাজাতের ভঙ্গিতে এবং উচ্চারণ করেন, "আল্লা, আমার গাঁয়ের হগ্‌গল মান্‌ষের জান্ সহি-সালামৎ রাইখ্যো... ।"

সাহেলী যেন অভয় দিলে, "দাদিজান, আপনে এত ঘাবড়ান না। বাপ্‌জান পুরাতন মুসলিম লীগার। আমাগো কোন ভয় নাই। চামেলী চল্। অহন মেহমানদারি করা লাইগব।"

আসেমা বিবি এতক্ষণে অনড় মুখ সচল করলেন, "হেরা শহরের মানষ। মা সাহেলী-

চামেলী তোরা আয়। তাগোর মেহমানদারি আমার কাম না।"

চামেলী বসে রইল যেন তার কানে কোন শব্দই যায়নি।

তবু বুড়িবিবির ঘর খালি হয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে। কুলসম গেল অন্য দুই জনের সঙ্গে।

কি যেন বিড়বিড় করেন বুড়িবিবি মনে মনে এবং শেষে হাত তোলেন আল্লার দর্গায়।

চামেলী অপর ঘর থেকে মার তাগিদ ডাকে উঠে পড়ার সময় দাদির কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "আমার বড় ডর করে, দাদিজান।"

৩

মেহমান্‌দের বসার জায়গা দহলিজের মধ্যেও হতে পারত।

মৌলিক গণতন্ত্রের আপিস। পাকা দালান। সাত আটটা চেয়ার আছে। সুতরাং পাড়াগাঁয়ে বসার দিক থেকে কারো আতিথেয়তা তার চেয়ে বেশি আশা করা অন্যায়। মখদুম মৃধা দু'টো ছোট চারপায়া পর্যন্ত আগে বানিয়েছিল। ছোটখাট মেহ্‌মানদারি সারতে বেশ এদিক ওদিক বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু মনে হয় মেজর হাকিম খান কিছুটা প্রকৃতিবিলাসী। সে বলেছিল, মাশ্‌রেকী পাকিস্তানের এমন মন্‌জের (দৃশ্য) বাইরেই সব চেয়ে তোফা। দৃশ্য আছে, বাতাস আছে— গরমের দিনে যা সব চেয়ে বড় কাম্য।

তাই ফাঁকা মাঠে মনার সাহায্যে নিজেই একটা চেয়ার বয়ে এনেছিল মৃধা। কিন্তু মেজর হাকিম তাকে আর তক্‌লীফ করতে দেয়নি। কারণ সঙ্গে ছিল এক ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ এবং আধ ডজন জওয়ান। চেয়ার টেবিল টিপয় ওই সিপাইলা বয়ে আনল। মখদুম মৃধা এই শরাফতি, ভদ্রতা দেখে বড় অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ সৈন্যেরা এখানে না থেমে জীপ চালিয়ে চলে যেতে পারত। ওদের আসতে দেখে মৃধা রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভৃত্যসহ। জীপের স্পীড অন্ততঃ তিরিশের কম ছিল না। তার উপর ঘড়ঘড় শব্দ ত আছেই। তবু মৃধার স্নামালেকুমের আওয়াজ শুনতে পাওয়া বিচিত্র বৈকি। অবিশ্যি সালামের ভঙ্গি হয়ত সিপাইরা লক্ষ্য করেছিল, বাণি শোনেনি। সে যা-ই হোক, হঠাৎ ব্রেক কষেছিল জওয়ান ড্রাইভার মেজরের নির্দেশে। মনা তখন দুরুদুরু বুক একদম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। সে কখনও সিপাই দেখেনি। রাইফেল, স্টেন্‌গান, হাল্কা মেশিন্‌গান দেখেনি। কৌতূহল আর ভয় দুই তাকে খাম্‌চি মারছিল। তবে সঙ্গে মিয়াসাব আছে। এই এক ভরসা। ব্রেক একটু দ্রুত কষলে গাড়ি বেশ এগিয়ে গিয়েছিল। তখন জীপ পিছু হটে এসে দাঁড়ায় একদম মৃধার সামনে। হাত তুলে বেশ জোর গলায় আবার স্লামালেকুম দিয়েছিল সে। মনাও হাত তুলেছিল। হাজার হলেও সংসর্গের ফল। হাজি সাহেবের সঙ্গে বহুদিন আছে। কাজেই আদব কায়দা সে বেশ রপ্ত করেছিল। সৌজন্য অপরপক্ষ কম দেখায়নি।

মেজর চট করে সীট থেকে নেমে সালামের জবাব শেষে মৃধার সামনে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করেছিল, "কিয়া মৌলবী সাব? অর্থাৎ কী চাই মৌলবী সাহেব?"

আরবি কায়দায় করমর্দনের জন্য মৃধা দুই হাত বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল, "পাকিস্তানকে হেফাজৎ করনেওয়ালু পর খোদা মেহেরবান রহে। পাকিস্তানের রক্ষাকারীদের উপর আল্লাহ সহায়ক হন।"

মেজর হাকিম সাড়া দিতে আদৌ বিলম্ব করেনি। সেও দুই হাতে করমর্দন বা মোসাহেফা শেষের পর শুধিয়ে ছিল, "আপ্‌কা কুই খেদমৎ মে আ সাকুঁ। আপনার কোন সেবায় আসতে পারি?"

সঙ্গে আরো ছ'সাত জন জওয়ান তখন স্টেন্‌গান হাতে আশেপাশে খাড়া হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ ছিল অন্য এক জীপে। সেও এসে হাজির হয়।

মৃধা একে একে সকলকে স্লামালেক দেয় এবং করমর্দন করে। এবং পাকিস্তানের রক্ষাকারীদের উপর যেন খোদা নেঘাবান থাকেন, তার ভাষা বদলে বদলে বলতে কোথাও তাকে হোঁচট খেতে হয়নি।

ষাট-বাষট্টি বয়স। তহবন্দ্‌, পিরহান পরনে। মাথায় টুপি। আর তন্দুরস্ত্‌ চেহরার এমন থাম-সদৃশ নর-বপু। সৈনিকেরা বেশ প্রভাবিত হয়েছিল বৈকি। হয়ত দু'চার কথাবার্তার পর তারা বিদায় নিতে পারত। কিন্তু আল্লাতালা ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্যে সৈন্যবেশে যে ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন, মর্তবাসীর সঙ্গে হঠাৎ তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়া ত এক পরম নসিবের ব্যাপার। প্রায় দৈব দুর্ঘটনার সামিল বলা চলে। তাই মৃধা যখন প্রস্তাব দিয়েছিল যে এক কাপ চা অন্ততঃ তারা খেয়ে না গেলে সারা জীবন আফ্‌শোসের গ্লানি তা-কে খোঁচাতে থাকবে তখন মেজর ক্যাপ্টেন অগয়রহ মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। তবে বাঙালিরা তখনও গ্রামাঞ্চলে ঘাড় বাঁকায়নি। সুতরাং পেছনে কোন দুরভিসন্ধির আশঙ্কা অমূলক। তা-ছাড়া গোপন বৈঠকে তাদের প্রতি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল, সমর্থক পেলে তাদের নানাভাবে আরো নিকটে টানার ব্যাপারে যেন কোন কার্পণ্য না থাকে। কর্নেল হেজাজী যে বক্তৃতা দিয়েছিল তার শেষ কথা : কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যায়। এমন বর্ষীয়ান ব্যক্তি হয়ত চাল-চলনে সেকেলে হতে পারে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ তোলা শোভন নয়। সব চেয়ে খারাপ কী হতে পারে? হঠাৎ কোন চোরাগুপ্তা মার? জেলা হেডকোয়ার্টার এখান থেকে মাত্র দশ মাইল। পনর মিনিট লাগবে না রিইন্‌ফোর্সমেন্ট্‌ বা মদৎ আসতে।

এসব কথা মেজর হাকিম মনে মনে দ্রুত কষে নিয়েছিল বৈকি।

মখদুম মৃধার অনুনয় তারি মধ্যে বিশিষ্ট ফোড়ন তুলেছিল, "স্রেফ এক চাপ চায়ে।"

"কিয়া ফৈয়াজ, ঠিক হ্যায়?" মেজর হাকিম সঙ্গী অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিল।

একে অপর থেকে পদমর্যাদায় ছোট হলেও দুই জনে সম্পর্ক বন্ধুত্বের। ক্যাপ্টেন সায় দিয়েছিল, "চলো। হরজ (ক্ষতি) কিয়া? আওর ঈয়ে বোজর্গ মৌলীসাব কা বাৎ টাল্‌না ঠিক নেহি হ্যায়।"

অফিসার দু'জন আর জীপে চড়েনি। তারা হেঁটে হেঁটেই মৃধার দহলিজের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে এসেছিল। তাদের দেখাদেখি দুই ড্রাইভার ছাড়া বাকি চার জওয়ানও অনুসারী।

মনা পৃথিবীতে আছে কি নেই। সে মিয়া সাহেবের সঙ্গে সামান্য তফাতে হাঁটছিল। তাই যখন একটা চেয়ার বওয়া শেষে তাকে মৃধা নির্দেশ দিলে পাড়ায় খবরটা পৌছে দিতে এবং নাস্তার আয়োজন করতে— সে আবার ইহলোকে ফিরে এসেছিল। শুধু মাত্র লুঙ্গি পরণে। চতুর্দিকে মিলিটারি লেবাস, অস্ত্রের জিল্লা। সে যে হঠাৎ ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠেনি— এই ত বিচিত্র। ঢাকা শহরে মিলিটারিদের জুলুমের কথা কে শোনেনি? মনার বহু ঘটনা মনে আছে। সেই মিলিটারিরা তার এত কাছে! কিন্তু চোখ তুলে সোজাসুজি কিছু দেখছিল না সে। আড়চোখে যেটুকু ধরা পড়ে, তারই উপর নির্ভর। তার বুক জোরো না হলেও ঢিব্‌ঢিব করছিল বৈকি। কিন্তু প্রয়োজন-মত সে সব চেপে যেতে পারে পেসাব-পায়খানার মত। তার সাহস বেড়েছিল পরে। জওয়ানগুলো তার মত ফাইফরমাস খাটে, যেমন চেয়ার বইছিল। এই দৃশ্য দেখার পর সে আরো ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু ভয় আর বুকে লেগে থাকেনি। দহলিজের পেছনে অন্দরের প্রাঙ্গণ পার হওয়ার সময়ে সে এমন দৌড় মেরেছিল যে পড়ে গেলে মরে যেতে পারত। অতি তুমুল উত্তেজনা কী সহজে সওয়া যায়? অবিশ্যি মৃধা সাহেবও কম উত্তেজিত হয়নি। এমন সৌভাগ্য! তার অনুরোধ ঠেলে ওরা চলে গেলে বলার কী থাকত? পাকিস্তানের দুশ্‌মনদের শায়েস্তা করাই এখন ওদের ডিউটি, আসল কর্তব্য। নসিবে ঈজ্জাৎ থাকলে তখন আল্লা নেঘাবান হন। চায়ের দাওয়াত গ্রহণে ওরা এতটুকু গড়িমসি দেখালে না। সব আল্লার মক্কর। আর আল্লাতালা মেহেরবাণি না দেখালে কী এমন ওলটপালট কয়েক দিনের মধ্যে দেখা দিত? এই গ্রামে সন্ধ্যার পর স্লোগানের চিৎকারে কানপাতা দায় ছিল। এখন সব সুম্‌সাম। একটু আঁধার হলে আর কেউ রাস্তায় চলাফেরা করে না। মনে হয়, গোটা গ্রাম এখন বড় কবরে পরিণত হয়েছে। সব আল্লার শান!

মেজর হাকিম পাৎলা, ঢ্যাঙা, বেশ ফর্সা চেহরা। গোঁফ ঈষৎ ঝুপো। আর জুলফি নেমে গেছে প্রায় থুৎনির সোজাসুজি। বেল্টে পিস্তল গোঁজা। তা খুলে টিপয়ের উপর রেখে সে আরাম-কেদারায় বেশ হেলানসহ পা ছড়িয়ে দিলে। একটু আগে এইখানে আসীন ছিল মৃধা। পাশে চেয়ারে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ। তার শরীর রোদে-পোড়া শ্যামকৃষ্ণ। সে নাতিদীর্ঘ। বোধহয়, তন্দুরস্ত স্বাস্থ্যের জন্য আরো বেঁটে দেখায়। আরো চেয়ার ছিল জওয়ানেরা বসতে পারত। কিন্তু তারা সবাই ফাঁকা ঘাসল জায়গাটায় বসে পড়ল, একজন ছাড়া। সে স্টেন্‌গান হাতে পাহারার ভঙ্গিতে এদিক ওদিক পায়চারি করছিল। মৃধার পীড়াপীড়িতে তারা কাবু হয়নি। অফিসারের সামনে চেয়ারে বসা বেয়াদবি, তা অবিশ্যি তারা চেপে গিয়েছিল। ফলের গাছ-পরিবেষ্টিত অমন জায়গায় বসার মধ্যেই আরাম বেশি। একজন সৈনিকের এই মন্তব্যে মৃধা নিরস্ত হয়েছিল। আতিথেয়তার চরম শীর্ষে কী ভাবে চড়া যায়, তখন মৃধার কাছে তা-ই ছিল পরম সমস্যা। মাঠের এক পাশে জীপ দু'টো নানা অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই। তখনও অন্তত এক-দেড়ঘণ্টা বেলা আছে। সৈনিকেরা চায়ের প্রতীক্ষার ফাঁকে নিজেদের মধ্যে কথা বলা-বলি-রত। অফিসারদের কাছ থেকে দশ-পনর গজ দূরে, তবু তারা খুব সরব নয়। মেজর হাকিম এবং ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ অবিশ্যি স্বাভাবিকভাবে জোর গলায় বাক্যালাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালায়। তাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

— জেগা বহুৎ আচ্ছা হ্যায়। মন্তব্য করছিল মেজর হাকিম।

— ইমাম বোলা হ্যায়, হাম জমিন দেখ্‌নে মাংতা আদ্‌মি নেহি। আমি জমিন দেখতে চাই, মানুষ না।

— আরে ও সাব বাৎ-কা-বাৎ। সাড়ে সাত ক্রোড় আদমি হ্যায়। কিয়া সাব মার ডালেগা?

— এৎনা মারনে কা কিয়া দরকার। ইয়ে মৌলীসাব ত সাচ্চা পাকিস্তানি হ্যায়। উস্‌কো মার ডালোগে?

— নেই, নেই। যো পাকিস্তান কা খেলাফ হ্যায়—

— তব ঠিক্ করনা পড়েগা, কোন খেলাপ্, কোন নেহি।

— ওহি-ত মুশকিল।

— ইসি ওয়াস্তে ইমাম সাব বোলা থা, 'হাম জমিন দেখ্‌নে মাংতা আদমি নেহি।'

— ও কুই কাম কা বাত নেহি।

জওয়ানেরা বাতাস খাচ্ছিল এবং সিগারেট। অফিসারের, পূর্বমুখী বসে থাকায় তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। পশ্চিমে তাদের অবস্থান। সূর্যও তখন ঢলে পড়ছে গাঁয়ের ওপাশে। লম্বা লম্বা ছায়ার আকার নানাভাবে বদ্‌লাতে থাকে আলোর মাত্রার সঙ্গে।

ফৈয়াজ ক্যাপ্টেনের তেমন চায়ের তৃষ্ণা ছিল না। তাছাড়া কেন জানি, পথে ঘাটে অস্বাভাবিক সময়ে কারো দাওয়াত নেওয়া তার অপছন্দ— যদিও নিজে সায় দিয়েছিল বন্ধুর খাতিরে।

উপরন্তু সিনিয়র অফিসারের মর্জি, তাই মেনে নিয়েছিল। সে তেমন সোয়াস্তি পাচ্ছিল না। তাই উঠে পাঁচ মিনিট পায়চারির পর আবার বসে পড়েছিল। তখনই সিগারেট বাড়িয়ে দেয় মেজর হাকিম। দুইজনে সিগারেটে কয়েক টান মেরেছে মাত্র, মৃধা অকুস্থলে এসে পৌঁছায়। সে দাঁড়িয়ে থাকে সৈনিকদের সামনে, চেয়ার থাকা সত্ত্বেও বসে না। মেজর হাকিম তাই বলেছিল, 'বুজর্গ, বৈঠিয়ে।'

কিন্তু মৃধা বসার আগে এক পশলা আদিখ্যেতা জুড়েছিল, "আপলোগ কো কৈসে তাজিম করুঁ। কী করে যে আপনাদের সম্মান দেখাই।"

এই হাত-কচ্‌লানি কিন্তু পছন্দ করেনি ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ। সে ঈষৎ রুষ্ট স্বরেই অনুরোধ ছুঁড়েছিল, "বৈঠিয়ে। বৈঠ্‌কে বাৎ কিজিয়ে।"

অতঃপর মেজরের প্রশ্ন, "মৌলীসাব, ইদার হিন্দু হ্যায়?"

— থা। সাব ভাগা।

— কিদার ভাগা?

— হিন্দুস্তান কা বর্ডার কী তরফ।

— ইদার আওয়ামী লীগার হ্যায়?

— ও সাব ভী ভাগা।

মৃধা তারপর হেসে উঠেছিল এবং আরো কিছু যোগ করার উদ্দেশ্যে মুখ খুলতে যাবে, —তখন মেজর শুধায়, "আপ্‌কা পাশ লিস্ট হ্যায়?"

— কিস চিজ কা লিস্ট?

—আওয়ামী লীগার কা।

—আওয়ামী লীগার, কম্যুনিস্ট সাব হারামজাদা কা লিস্ট হ্যায়।

—বহুৎ আচ্ছা। ও লোগ কাঁহা?

—ও সাব ভী ভাগা বর্ডার কা তরফ।

—খয়ের, বহুৎ খয়ের।

—দিন রহ্‌নে সে আপ্‌কো দেহাৎ দেখাতা। দিন থাকলে আপনাকে গ্রাম দেখাতাম। হুজুর, যাব খুশি আইয়ে। আপ হররোজ মেরে মেহমান। পাকিস্তান হ্যায় ত হাম হ্যায়। আগার পাকিস্তান না রাহে হাম কৈসে রাহ্‌ সাক্‌তে? পাকিস্তান না থাকলে আমারও অস্তিত্ব থাকবে কী করে?

শেষের দিকে কথাগুলো মৃধা এমন আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল যে মেজর এবং ক্যাপ্টেন উভয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে বিদ্যুৎগতির আশ্রয় নিয়েছিল। করমর্দন বিলম্বিত নয় দ্রুত লয়ে অনেকক্ষণ স্থায়িত্ব পেয়েছিল তখন।

পরে উভয়ে আবার সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছিল মৃধার দিকে। কিন্তু অভ্যেস নেই, তাই গ্রহণ করতে পারেনি সে। সিগারেট সহ্য করতে পারত না মৃধা। হুঁকো-কল্কি তার প্রিয়। নিজেকে সে ধিক্কার দিয়েছিল মনে মনে। নিজে ভেবে হয়রান, তার ত পয়সার অভাব ছিল না, তবু অমন সংসর্গ-বন্ধন অস্ত্রটা কেন ঠোঁটে তোলেনি?

অবিশ্যি সেদিন মৃধা প্রশ্নকর্তা নয়, জবাবের নফর। কিন্তু জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সে আবেগ ঢালতে কম কসুর করত না। এক ফাঁকে চা-পর্ব ত্বরান্বিত করার জন্যে তা-কে উঠতে হত বৈকি। তখনই সে মনা-কে পাখিপড়ানো কায়দায় তালিম দিয়েছিল, যেন সৈনিকদের সামনে সে তা-কে হাজি-সম্বোধনে বার বার ডাক দেয়। ভৃত্য অবাক হয়েছিল অতিমাত্রায়। মনিব অমন সম্বোধন পছন্দ করত না কোনদিন। গ্রামের লোক হঠাৎ হাজি-সাহেব ডেকে বসলে বিরক্ত হত যার-পর-নাই। মনা অবিশ্যি একেবারে নির্বোধ নয়। দহলিজ আর অন্দরের মধ্যবর্তী এক জায়গায় বড় পেঁপে গাছের তলায় মনিব নফর-কে সবক দিয়েছিল বেশ ভালমত। একদম মুখস্থ-হেফ্‌জ হওয়ার পর তবে তার নিস্তার।

ইতিমধ্যে সয়ীদ মাদ্‌বর এসে পৌঁচেছিল। মখদুম মৃধার ডাক সে সহজে এড়াতে পারত না। মিলিটারির আগমনে সে বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। মুসলিম লীগের ভক্ত হলেও সোয়াস্তি পায়নি। কেন? এ-প্রশ্নের জবাব তার পক্ষে দেওয়াও অসম্ভব ছিল। একদিকে মনিব-সদৃশ প্রতিবেশীর ডাক, অন্যদিকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া— দুই সংকটের মাঝখানে বেশ হাবুডুবু খাচ্ছিল মাদবর। পরে সিদ্ধান্ত স্থির হলেও মন স্থির ছিল না। তাই পায়ের চটিজুতা হাতে নিয়ে আর এক হাত বুলিয়েছিল যেন কোন রুমাল হঠাৎ ধুলোয় পড়ে গেছে। আর ব্যস্ততার মধ্যে সে আরো বিভীষিকা দেখছিল হয়ত। নচেৎ আয়নার সামনে চুল বিন্যস্ত আছে কি না দেখার সময় সে হঠাৎ চম্‌কে উঠল কেন? অকুস্থলে পৌঁছতে তার বুক কয়েকবার কেঁপেছিল। কিন্তু সাহস রপ্ত করেছিল দু'বার দরুদ পড়ে বুকে ফুঁক দিয়ে। অফিসারদের সামনে পৌঁছলে তারা এই চিড়িয়া দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল। থুৎনির উপর পাতলা ছাঁটা দাড়ি। কৃশ মুখে অদ্ভুত এক দাসত্ব-জাত বিনয়। ক্যাপ্টেন ফৈয়াজের ত রগড় করার বাতিক চেগে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন।

— আপ কৌন হ্যায়?

— হাম পাকিস্তানি হ্যায়।

মাদবরের জবাবে মেজর হাকিম তখন হেসে উঠেছিল। সয়ীদ মাদবর আরো ঘাব্‌ড়ে যায়। ভাবে, প্রশ্নের জবাব হয়ত ঠিকমত দেওয়া হয়নি।

— ক্যাপ্টেন। নেই, নেই। আপ্‌কো নাম?

— মাদবর। মহাম্মদ সয়ীদ মাদ্‌বর আফি আন্‌হু।

— ক্যাপ্টেন। ও কহিয়ে।

এবার মেজর হাকিম এগিয়ে আসে জেরা-পর্বে। সেও মজা পেয়েছে এতক্ষণে।

— আপ কেৎনা রোজ সে পাকিস্তানি। আপনি কদ্দিন থেকে পাকিস্তানি।

— বাচ্‌পান সে। বাল্যকাল থেকে।

— কেৎনা উমর সে? কত বয়স থেকে?

— পাঁচ বয়স সে।

— অভি উমর কেৎনা?

— পঁয়তালিশ।

— আচ্ছা-আচ্ছা, আপ চালিশ বয়স সে পাকিস্তানি? চল্লিশ বছর থেকে পাকিস্তানি?

— জী।

— বহুৎ আচ্ছা।

মেজর হাকিমের এই বাক্য উচ্চারণের পর ক্যাপ্টেন আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেছিল, 'আরে ইয়ার, ছোড়ো রংবাজি।" সয়ীদ মাদ্‌বর এই সময় অন্দর থেকে মৃধাকে আসতে দেখে যেন হালে পানি পায়। নিজে বুঝে উঠতে পারেনি, কোথায় গলদ। মৃধা অবিশ্যি প্রতিবেশী-সুলভ সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। এতক্ষণ মাদ্‌বর দাঁড়িয়ে জেরার সামনে বা কাঠগড়ায়। মৃধা তাকে বসতে বললে। সামনে খালি দুই চেয়ার। নিজেও বসে পড়েছিল অফিসারদের কাছে প্রতিবেশীর পরিচয় দিতে। উর্দু কেতাব থোড়া-বহুৎ পড়া আছে আর সাচ্চা পাকিস্তানি মাদ্‌বর। জিন্না সাহেবকে দেখার জন্যে সে চাঁটগা গিয়েছিল প্রায় পায়ে হেঁটে বলা চলে। তখন বয়স কম ছিল। মেহনতের পরোয়া করেনি। আর একবার— যেবার মুসলিম লীগের মিটিঙে বড় বড় নেতারা এসেছিল, মাদ্‌বর স্লোগান দিতে দিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। সে-কাহিনী এখনও পুরাতন নেতাদের কাছে গেলে শুনতে পাওয়া সম্ভব। মৃধার এ সব বয়ানের সময় মাদ্‌বর হাত কচ্‌লে কচ্‌লে বিনয় প্রকাশে হঠাৎ সাহসের উপর নির্ভর মন্তব্য মুখ থেকে বের করে দিয়েছিল, "ও গুজাস্তা বাৎ— অতীতের কাহিনী। মাৎ শুনিয়ে, শুনবেন না।"

সৈনিকেরা উত্তেজনার মধ্যে থেকে এক রকম উত্তেজনা পায়। শান্ত গার্হস্থ্য পরিবেশে যে ধরনের উদ্দীপনা হঠাৎ-হঠাৎ মেলে, তার সঙ্গে ওদের কারো পরিচয় ছিল না পঁচিশে

AMARBOI.COM

মার্চের পর থেকে। তাই বেশ আনন্দ পাচ্ছিল ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ। হাকিমের মনে পড়েছিল লাহোরের গুলবার্গ কলোনীর কথা— সেখানেই পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে উদ্বাস্তু হওয়ার পর নতুন অধিবাস তাদের পরিবারের। তাই সে কিছুটা আন্‌মনা হয়ে যায়। আর সঙ্গীর তামাসার দিকে তেমন কৌতূহল থাকে না। কয়েকবার হাই উঠছিল মেজর সাহেবের। মৃধার তা চোখ এড়ায়নি। তাড়াতাড়ি চা দিতে হয়। অবিশ্যি অন্দরে বলা আছে, প্রস্তুতি শেষ হওয়া মাত্র যেন মনা খবর নিয়ে আসে। জওয়ানেরা সকলে জমিনের উপর বসেছিল। দু'জন কেবল জীপের উপর। বোঝা যায়, একঘেয়েমির ক্লান্তি তাদের পেয়ে বসেছিল। মৃধার কাছেও আসোয়াস্তি কম নয়।

বিকেলটা ছিল সত্যি মনোরাম। বাংলাদেশের পক্ষীকুল অত্যন্ত নিঃশঙ্ক গলায় ডাক দিতে দিতে মাঠ থেকে এখানকার গাছপালায় এসে বসছিল। বেশ কিচিরমিচির জুড়ে দিয়েছিল এক দঙ্গল চড়ুই।

হঠাৎ আসরের নামাজের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু মেহ্‌মানদের আতিথেয়তা ফেলে যাওয়া সমীচীন হবে না। তাই ঈষৎ অসোয়াস্তি ভোগ করেছিল মখ্‌দুম। অবিশ্যি 'কাযা' নামাজ পড়ে নিলেই চলত। সেদিকে মৃধার একদম খেয়াল ছিল না।

৪

সাহেলী তাড়া দিলে, "চামেলী, জল্‌দি হাত চালা।"

রান্নাঘরে সেনাপতি হয়ে বসেছিল বড় বোন। পাক্‌সাকের ব্যাপারে সে খুব পটু। শহরের চাচি ভোজন-বিলাসিনী, কেবল লেবাসের দিকেই তার দৃষ্টি প্রখর নয়। সেই সূত্রে সাহেলী অনেক রন্ধন-ইলেম রপ্ত করেছিল। সেদিন হঠাৎ মেহ্‌মানদারির ভার নিতে সাহেলী পেছ্‌পা হয়নি। তাছাড়া, শহরের অধিবাসীদের কিভাবে খাইয়ে-দাইয়ে খুশি করতে হয়, তা আসেমা বিবির জানার কথা নয়। তাই লিস্টি ঠিক করেছিল সাহেলী। দফা বেশি নয়, তবু চায়ের সরঞ্জামে যেন মানিয়ে যায়। তাই অন্যতম ভোজ্য কিছু নিম্‌কি। কিন্তু আকার সিঙাড়ার। চামেলী তখন আকার-দাত্রী। তাড়া খেলে। তবে জবাব দিলে সঙ্গে সঙ্গে :

"সাহেলী আমি ত মেশিন নই।"

"বাপ্‌জান, দেখছিস ত কী রকম তাড়াহুড়া লাগিয়েছে।"

"আমিও কম তাড়াহুড়া চালাচ্ছি নাকি? যত তাড়াতাড়ি আপদ বিদেয় করা যায়।"

এক পাশে বসে কুলসম তখর্ন নারিকেল কুরছিল। সে অতি গম্ভীর। কাজের সঙ্গে সে মিশে যেতে পারেনি, তা বুঝতে দেরি হয় না। চামেলীর জবাব শুনে সে তার দিকে চাইলে।

দুইজনে চোখাচোখি হওয়ামাত্র কুলসম মুখ খুললে, "বুবু, আমার ডর করে। আপদ গেলে বাঁচা।"

"ডর করলে ত আর ডর যাইব না। অহন হাত চালাও" সাহেলী তাকে প্রায় ধমক দিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার হাতে কাজ আছে। তবে সে বড় চট্‌পটে। অপরে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে যাবে। শহরের চাচি ত বলেই বসেন, "আমাগো মাইয়া মাইয়া না মেশিন।"

সাহেলী আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে। পিস্তল-হাতা ব্লাউজ পরণে। বগলের তলা ভিজে সপ্‌সপ করছে। রান্নাঘর টিনে ছাওয়া। ফলে, বেশ গরম হয়ে থাকে। তার উপর, জানালা বড় ছোট। বাইরে বাতাস থাকলেও এখানে যাতায়াত খুব হিসেব-মাফিক। চামেলী পরেছিল ঘিয়ে রঙের শাড়ি। তার ঈষৎ-স্থূল শরীর। ব্লাউজ বেশি টাইট। তাই মাঝে মাঝে হাত উপরে তুলছিল, নিমকির আকার-দানের সময়। কারণ, ভার-ভার ঠেকে।

আসেমা বিবি চুপচাপ মানুষ। তিনি কড়ায় ঘি চাপিয়েছেন। ঠিকমত পাক ধরলে তখন নিম্‌কি ভাজা শুরু হবে। তার মুখাবয়ব অন্যান্য দিনের চেয়ে গম্ভীর। কাজেই তার আনন্দ বা কাজই তার আনন্দ। আজ তাঁকে কতকটা যন্ত্রচালিত মনে হচ্ছিল। অবিশ্যি তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। শহুরে অতিথি। সব দায়িত্ব মেয়েদের। তিনি শুধু গণ্ডায় আণ্ডা দিয়ে যাবেন, এখানে ভোজপর্বের যোগান্‌দার মাত্র। মেয়েদের কথাবার্তা তার কানে গেলে তিনি শুনেও শুনেন না। অথচ চিরদিন যেমন ভিতর-গোঁজা অবস্থা, আজও তা অনড়, অবিচল। মেয়েরা মার প্রতি খুব দরদী। তারা জানে, মা মুখে কিছু প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু স্নেহের ফল্গুধারা তার অপরিসীম। ছুটি-শেষে শহরে যাওয়ার দিন, তার নানা-পদ তরকারি করার মেহনৎ বেশ জানান দেয়। মা স্বল্পভাষী। দুই বোন অবিশ্যি খুব পুষিয়ে দেয়। নিঃশব্দ শ্রোতা পেলে বাক-পিয়াসীরা খুব খুশি হয়। মার প্রতি তাই আকর্ষণ এম্নিতে স্বাভাবিক।

আহার-তালিকা তেমন কিছু নয়। কিছু নিম্‌কি, আর ঈষৎ ঝালদেওয়া ডিমের বড়া। চিনির সিরাপ-মাখা নারিকেলের গুড়ো। এবং আলুর সিঙাড়া। শেষ পদ নিম্‌কির জন্যে তৈরি ময়দা দিয়েই ফতে করা যাবে। অবিশ্যি আট দশ জনের জন্যে অল্প জিনিষ। চায়ে আর এক গাদা কে খেতে যায়?

সকলে হাত লাগিয়েছিল। আধ ঘণ্টার কিছু বেশি গেল। অবিশ্যি মখ্‌দুম মৃধা নিজে দু'বার এসে কারখানা দেখে গেছে। এখানে মেয়েদের উপর তার ভরসা অশেষ। তারা হাল-মডেলের শিক্ষিতা নাগরিকা। তা নিয়ে মৃধার মনে অশেষ গর্ব।

আরো একবার এসেছিল মৃধা, ব্যবস্থা কত দূর দেখতে।

বড় মেয়ে জবাব দিলে, "বাপ্‌জান মেহ্‌মানরা মানুষ কেমন জানেন, এত যে উতালা হচ্ছেন?" সাহেলীর হাতের অবিশ্যি কামাই ছিল না।

"কী বলিস, মা! আমাদের বড় সৌভাগ্য বলতে হয়, পাকিস্তানের এই রক্ষাকর্তারা এখানে মেহমানী স্বীকার করেছে।"

"এই মেহমানরাই ত আবার হাজার হাজার মানুষ মারছে।"

"আস্তে কথা বল্‌ মা। মারবে না কেন? পাকিস্তান যারা ধ্বংস করতে চায়, তাদের কী পূজো করবে তামা-তুলসী দিয়ে?" পরে আবার এত্তেলা, "একটু তাড়াতাড়ি কর, মা।"

কাজের হিসেব নিয়ে তখন সাহেলী জবাব দিয়েছিল, "আপনে সেখানে টেবিল ঠিক করেন গিয়া। মনা পরে ট্রে নিয়া যাইবো। আর দশ মিনিট।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মখদুম মৃধা আবার নসিহত বিতরণ করে গেলেন, "মা, আজ আমার যে কী আনন্দ! আল্লা পাকিস্তান বানাইছিল, আল্লাই তা রক্ষা করছে।"

চামেলী একবার পিতার দিকে তাকিয়ে নিয়েছিল। হঠাৎ মুখ বিকৃত করতে গিয়েও পারেনি। সাহেলী সোজা কথায় জবাব দেয়। চামেলীর আশ্রয় অঙ্গভঙ্গি।

আর এম্নিতে রান্নাঘরের মধ্যে ঘেমে ঘেমে সকলে বেশ অস্থির ছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই। গোটা বাংলাদেশে তখন আতঙ্কই অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয়। এখন মুখোমুখি পরীক্ষা। মাথা খুব ঠাণ্ডা করে চলাই মঙ্গল। সাহেলী সেদিক থেকে খুব বুদ্ধিমতী এবং হিসেবী।

কুলসম মিয়া সাহেবকে দেখলে এই বয়সেও ঘোমটা টানে। এই প্রচ্ছন্নতা তা-কে নানাভাবে সাহায্য করে। আঁজ ঘোমটায় সে খেমটা নাচ নয়, খেউড় গীত ধরেছিল। অবিশ্যি নিঃশব্দে মনে মনে। দেশময় প্রতিদিন নানা ঘটনা, হাজার গুজব নানা আকারে ছড়িয়ে পড়ছিল। কুসলম অত বুঝার ধার ধারে না। পাঞ্জাবী মিলিটারিরা বাঙালির দুশ্‌মন। এই সিদ্ধান্ত থেকে তাকে কেউ হাজার যুক্তি দিয়েও টলাতে পারবে না, যতবড় তর্কবিদ পণ্ডিতই আসুন। আশ্রিত মানুষ অসহায়। তাই সে খোলাখুলি কিছু বলে না। কিন্তু বুড়িবিবির কাছে সে একদম খোলাখুলি। কারণ, বৃদ্ধার সঙ্গে এখানে তার কোন গরমিল নেই। তাছাড়া কুলসম ত এই বাড়ির বাঁদী নয়। সে বুড়ি বিবির সখি-সচিব, যদিও বয়সের ফারাক ঢের। কুলসমের নারিকেল কুরানির ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ তখন আরো কর্কশ হয়ে পড়ে গতি বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে। ফাটা আওয়াজেই যেন তার গুম-স্তব্ধতা।

AMARBOI.COM

বুড়িবিবির ঘুমের খোঁয়ারি জোটে এই বিকেল বেলায়। প্রায় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। খারয়ার সময় ডেকে তুলতে হয়। পরে অবিশ্যি অবশিষ্ট রাত্রি বিনিদ্র। তখন গল্প করার বাতিক চাপে। এদিকে কুলসম সখি। তার ঘুমও পাৎলা। মেহন্‌তে শরীর। এক ঘুম সে মনের সুখে মেরে নেয় দু'তিন ঘণ্টা। তারপর জেগে থাকতে তেমন খারাপ লাগে না। কর্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বড় আরাম। দরদের কাঙালিনীর পক্ষে এমন আশ্রয় সহজে মেলে না। কুলসম অনেক সময় ভাবে, বুড়িবিবি ত দু'এক দিনের মেহ্‌মান। যে-কোন দিন হঠাৎ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে। তখন তার দশা কী হবে? নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে সে বহুবার। অবিশ্যি গিন্নী কানে খাটো নন। বাঁদীর দুঃখ জানার কৌতূহল জাগে। কিন্তু কুলসুম এদিকে বড় বুদ্ধিমতী। মা, দীন দুঃখী মানুষ আমরা। আমাগো দুঃখের কতো কথাই মনে পড়ে, তাই বুকের হাওয়া বাইর কইরা ফেলি। কখনও কখনও কুলসম নিজের মৃত জনকজননীর কাহিনী তুলে আসল কথা গোপন করে রাখে।

এই বিকেলে কিন্তু বুড়িবিবির অভ্যেস ছুটে গিয়েছিল। আদৌ ঘুম আসেনি। হাঁক দিয়ে কুলসম-কে ডেকেছিলেন। পরিচারিকা হাতের কাজ ফেলে বুড়িবিবিকে বলে যায়, "অহন মেহ্‌মানের জন্যে নাস্তা বানাই। মা, পরে আমু।" পরে বুড়ি কোন জবাব দিলেও তা কুলসমের কানে যায় না। তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার। কারণ, তাহলে শিগগির আপদ বিদায় হয়ে যাবে। তাই বৃদ্ধার আহ্বানে সে সাড়া দিতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদিকে সাহেলীর মত দ্রুত কর্মপটিয়সীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অত সহজ নয়। কুলসমের আত্মসম্মান-জ্ঞান এই ক্ষেত্রে বড় টন্‌টনের। কেউ তা-কে ঢিলে বা কুড়ে অপবাদ দেবে তা অসহ্য।

মাইয়া নয়— মেশিন। আধঘণ্টার কিছু বেশি। নাস্তা তৈরি শেষ। শহরের চাচি খামখা খেতাবটা দেননি।

তাছাড়া পরিবেশনের কায়দা আছে না? সেখানে সাহেলী বাগেশ্বরী বিশ্বকর্মার সমাহার। কয়েকটা পাতাবাহার এবং গন্ধ পাতায় সে ট্রে এমন সাজিয়ে দিয়েছিল যে মৃধা পর্যন্ত তাক্ খেয়ে যায়। তার ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে ইলেম ছাড়াও এত গুণ বর্তমান! পিতা মনে গর্ব বোধ করে বৈকি।

বইরে টেবিলের উপর যখন সব পদ আহার্য রাখা হলো, অতিথি দুই অফিসার তারিফ শুরু করে দিয়েছিল।

মেজরের মন্তব্য, "হাজিসাব, ইয়ে বড় উমদা সাজাওট। বড় সুন্দর সাজানো।"

"জী। এইসা কুচ নেহি। জলদি জলদি সে— ," মৃধা বাক্য শেষ করে না।

"দেহাৎ মে ভি এইসা সাজাওট। সোবহান আল্লা!" ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ খেই ধরলে এবং বললে, "কোন কিয়া মৌলীসাব?"

— মেরা দো লাড়কি।

— আচ্ছা, সাবাস!

দুই অফিসারের মন্তব্য একই সঙ্গে ঠোকাঠুকি খায়।

তারপর অতিথিরা যখন খাদ্যে মুখ দিলে তখন তারিফের চোটে মৃধা পর্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করে, যদিও মনে মনে গর্বিত।

অতি মুচমুচে নিম্‌কি, সিঙাড়া তখন আর সাধারণ খাদ্যের পর্যায়ে থাকে না, অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেয়। মিষ্টি নারিকেল কোন স্বর্গীয় ফলে পরিণত হয়েছিল। এসব অবিশ্যি সভ্যতা-ভব্যতার ফল।

জওয়ানেরা একদিকে খাদ্য গ্রহণ করছিল। "বহুৎ খুব, বহুৎ আচ্ছা," ছাড়া আর কোন বিশেষণ তাদের মুখ থেকে বেরোয়ানি।

মৃধাও চা পানে বসে গিয়েছিল। সয়ীদ মাদবর যেভাবে গাল নাড়ছিল তার মন্তব্য নিক্ষেপের আর কোন যো ছিল না। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সব জিনিস। সুতরাং গন্ধেই দিগ্বিজয় হওয়ার কথা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মেজর হাকিম মৃধাকে সম্বোধন করেছিল, "হাজিসাব, আপ বুজর্গ আদমি। আপসে কিয়া কহু। আপকা দুখতার কো মেরা মোবারকবাদ দিজিয়ে। আপনার মেয়েদের আমার ধন্যবাদ।"

"জী-জী," মৃধা দাড়ি নেড়ে অশেষ তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ এবং পরে আরো যোগ করছিল, "ইয়ে ত কুচ নেহি সাব। হাম গরীব আদমি, আপকা কিয়া মেহমানদারি করু।"

অবিশ্যি চায়ের সরঞ্জামে আর কী থাকতে পারে এই অল্প সময়ের নোটিশে? মৃধা তার জন্যে বহুৎ আফ্‌সোস প্রকাশ করে। আরো পরিমাণে যদি বেশি পরিবেশন করতে পারত তবে সে লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেত। বিনয়ের চরম অবতার মৃধা। কিন্তু এই

ব্যাপারে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল।

মৃধা বললে, "পাকিস্তান কে লিয়ে আপ্‌লোগ জান-কোরবান কর দিয়ে হেঁই। থোড়া ছোটিসি মেহ্‌মানি কিয়া উসকা বদলে হোতা? আপহি কহিয়ে কর্নেল সাব? সামান্য আতিথেয়তা কী তার সমান হতে পারে?"

মেজর হাকিম সম্বোধনে খুব খুশি হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের ত সৈনিকের পদমর্যাদা জানার কথা নয়। এমন ভুল কানে মধু ঢেলে দেয়। মেজর হাকিম তখন চা শেষে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল মাত্র। তাড়াতাড়ি এক টান মেরেই সে জবাব দিলে, "মৌলীসাব হাজিসাব, কুরবান-উরবান কুচ নেহি। হাম পয়সা লেতে আওর কাম করতে।"

"জী নেহি," মৃধা বাধা দিয়েছিল।

"আপ সাচ্চা পাকিস্তানি," পাল্টা জবাব মেজরের।

"কৈসে, কিভাবে?" মৃধা মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করে।

"শুনিয়ে। হাম পয়সা লেতা কাম করতা। আপ সাচ্চা দিল্‌সে কাম করতে। আপ নাফা (লাভ) কা খেয়ার নেহি রাখতে। আহ্, আপ্‌নে কিয়া না খেলায়া— আহ, আপনি কি না খাওয়ালেন।"

মেজর হাকিম উত্তর দিয়েছিল। তার গলার আওয়াজে কোন খাদ ছিল না।

বেশ অভিভূত হয়ে পড়ে মৃধা। আল্লার পাকিস্তানের কতো বড়ো অফিসার। তার মত নগণ্য ব্যক্তি সম্পর্কে এমন মত পোষণ করে! জীবনের সার্থকতা তখন যেন মৃধার মুঠির মধ্যে।

সামান্য চুপ করে সে ভাবতে থাকে, এখন কী জবাব দেওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎই বলে ফেলে, "হাম্‌নে কিয়া খেলায়া? সাব লাড়কি নে কিয়া।"

"বহুৎ আচ্ছা পাকানেওয়ালী।"

"জী, এইসা কুচ নেহি।

"নেহি নেহি। আপ ঠিক নেহি কহা।"

মৃধা মেয়েদের গুণকীর্তনে খুশি হয়, বলা বাহুল্য। মেজর হাকিম আরো জুড়ে দিলে, "হাম এইসা কভি নেহি খায়া। খোদা কসম। মেরা ত দীল চাহ্‌তা, যো হাত এৎনা আচ্ছি আওর ইলেম্‌দার হ্যায়, ইন্‌কো থোড়া দেক্ লে। তারিফ উন্‌কি সামনে মে করনা চাহিয়ে।" অর্থাৎ প্রশংসা সাম্‌না-সামনি হওয়া উচিত।

মৃধা বিগলিত চিত্ত। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, "ইয়ে তো মেরা নসীব। আপ এৎনা বড় দর্জা (মর্যাদা) কা আদ্‌মি। দোনো লাড়কি সে মিল্‌নে চাহ্‌তে? আন্দর চালিয়ে।"

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ সায় দিলে, "হাজিসাব মাখ্‌লুক (সৃষ্টি) কো দেখ্ কর খালেক (স্রষ্টা) কা বাৎ এ্যায়সি ইয়াদ আ যাতা।"

মৃধা উঠে পড়ল এবং বললে, "আইয়ে, মেরা সাত আইয়ে।"

অন্দরে মেয়েদের নোটিশ দেওয়া দরকার, তারও প্রয়োজন মনে করলে না পিতৃদেব। পাকিস্তানের বড় অফিসার। মেয়েদের রান্নায় এত খুশি। এ ত সৌভাগ্যের ব্যাপার, কালেভদ্রে পাওয়া যায়।

দহলিজের পেছনে সামান্য আঙিনা। মেয়েরা ফুল ইত্যাদির গাছ লাগিয়ে জায়গাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ শোভাময় করে রেখেছিল। দালানে অবিশ্যি আলাদা করে বসার ঘর নেই। এক-নজর দেখে চলে আসবে। সুতরাং ড্রয়িং রুম সাজানোর প্রয়োজন কোথায়? তিনখানা পাকা কামরা। সবই শোয়ার ঘর। তবে মেয়েদের কল্যাণে বেশ পরিপাটি করে রাখা। সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চলে এমন জ্যামিতিক সাজসজ্জার কেউ ধার ধারে না। চেয়ার দরকার বসার জন্যে। মৃধার শোয়ার ঘরে একটা আছে। আর একটা অন্য ঘর থেকে আনিয়ে নিলেই চলবে।

দুই অফিসারকে সোজা মৃধা নিজের শোয়ার ঘরে এনে বললে, "মাঁই আওর এক কুর্শি লাতা।"

কিন্তু ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ তার হাত ধরে ফেললে অনুরোধসহ, "আপ্ বুজর্গ আদমি। ছোড়িয়ে। কুর্শিকা জরুরৎ নেহি। আপ দোনো আর্টিস্ট কো বোলাইয়ে। কুকিং (রান্না) ভি আর্ট হোতা বহুৎ আদমি কা পাত্তা নেহি।"

মেজর হাকিম এত্তেলা দিলে, "বৈঠনে কা কুই জরুরৎ নেহি। আপ আর্টিস্ট দোনোকো সালাম দিজিয়ে। ফৈয়াজ নে কিয়া কহা! বহুৎ খুব।"

মেয়েরা প্রস্তাব শুনে ত থ।

তারা মাঝের শেষ কামরা বাদ দিয়ে কামরায় ছিল। রান্নার পর বিশ্রামরত। আর ইচ্ছা করেই পাকিস্তান রেডিওর ভল্যুম চড়িয়ে দিয়েছিল। গান শোনার জন্যে নয়। ঝোপ সৃষ্টি করতে।

আসেমা বিবি অতি শান্ত প্রকৃতির রমণী। তিনিও মোলায়েম গলায় প্রতিবাদ তুললেন, 'মান্ষে কী কইব?'

মৃধা রাশভারী লোক। প্রায় বেশ ধমকের লয় রেখে জবাব দিয়েছিল, "পাক খুব পছন্দ অইছে। তাই মাইয়াদের দেখবার চায়।"

সাহেলী বললে, "আপনে ভুল করছেন বাপ্জান। ক্যামন মানুষ ওরা কে জানে"

"না রে বেটি। সাধারণ জওয়ান নয়। এত বড় অফিসার আদবতমিজ খুব ভাল। তা না হলে অত বড় অফিসার হয়। তাড়াতাড়ি কর, মা।" শেষের দিকে মৃধার গলায় অধৈর্য ফুটে উঠল।

চামেলী ত মার পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ে হাত রেখে জিদের সুরে রায় দিলে, "আমি যেতে পারব না, বাপজান।"

"আস্তে কথা বল্ মা। তোরা রাঁধছস ভাল। তাই মানষে দেখতে চায়। তোরা ত শহরে লিখাপড়া করিস। লজ্জা কিসের?"

মৃধা এক পদ পিছু হটল তির্ন পা এগানোর জন্যে।

আসমা বিবি অসহায়ের মত একবার স্বামীর দিকে আর বার দুই মেয়ের দিকে তাকান। তিনি তাঁর স্বভাবের বাইরে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন, তখনই চুপ করে যান।

সাহেলী অগত্যা চামেলীকে বললে, "চল্ না। আব্বা সঙ্গে, ভয় কী? তবে কাপড়চোপড় আমি আর বদলাব না।"

"যেতে যদি হয়, আমি বদলাব না কী?" জবাব দিলে অনুজা এবং আবার যোগ করলে, "আমার কিন্তু ভয় হয়।"

"ভয় কিসের?"

চামেলীর জবাবে মৃধা যেন নতুন যো পেলে। তাই বললে, "ভয় কী, মা? শরীফ লোক। অর্ডিনারি সিপাই না। ভয় কী?"

দুই জনে রঙিন শাড়ি পরেছিল। মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে। কোন যত্ন নিলে না সাজসজ্জা বা দেহাবয়বের। কিন্তু দুই জনে উত্তাল যৌবনের অধিশ্বরী। সারা অঙ্গ বসনের বারণ মানতে অনভ্যস্ত।

দুই সৈনিক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গৃহের সাজসজ্জা আসবাব ইত্যাদি নিরীক্ষণ করছিল। শেষ সূর্যের আলো এক ধরনের মায়াময় আস্তরণ বিছিয়েছে, যেমন বাইরে তেমনই আলো-ছায়ায় এই গৃহাভ্যন্তরে।

"কর্নেল সাব, ইয়ে মেরা দো লাড়কি।" মৃধার উচ্চারণে দুই অফিসার পেছন ফিরে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে "স্লামালেকুম," আদাবের ভঙ্গি সব।

সাহেলী অবাধে জবাব দিলে একই কায়দায়, "স্লামালেকুম।" ক্যাপ্টেন মেজরের দিকে এবং মেজর ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায়। বাক-পটিয়সীদের ধন্যবাদ কে দেবে অথবা কী ভাবে দেবে, এমন দ্বন্দ্ব ওঠার কথা স্বাভাবিক।

মেজরই স্তুতিবাক্য আরম্ভ করলে, "বহুৎ শুক্রিয়া। আপ্ এ্যাইসা মেহ্মান-নওয়াজী কিয়া!" এমন আতিথেয়তা দেখিয়েছেন।

পাকিস্তানি আমল। দুই বোনই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু পড়েছিল।

সাহেলী আদৌ ঘাবড়ে যায় না। ঈষৎ নতদৃষ্টি জবাব দিলে, "শুক্রিয়া কা কুচ নেহি থা। দেহাতী গরীব আদমি। কিঁউ হামলোগ কো সারমেন্দগী মে ডাল্‌তে হেই। ধন্যবাদের কিছু নেই। কেন আমাদের অকারণ লজ্জায় ফেলছেন। নেহাৎগ্রাম্যে গরীব মানুষ আমরা।"

দুই সৈনিক জবাবে এমন চমৎকৃত হয় যে চট করে কিছু জবাব দিতে পারে না। ঈষৎ নীরবতার পর ক্যাপ্টেন মুখ খুললে, "হাজিসাব, আপকা লাড়কি স্রেফ পাকানেওয়ালী আর্টিস্ট নেহি। বাৎ করনেওয়ালী আর্টিস্ট ভি হ্যায়।"

সাহেলীর ঠোঁটে তখন ঈষৎ হাসি খেলে যায়। কিন্তু চামেলী যেন বোবা। সে কিছুটা মায়ের স্বভাব পেয়েছে। চুপচাপ থাকে। তবে আড়চোখে সৈনিকদের দেখে নিতে তার বিলম্ব হয়নি।

মেজর সাহেলীর দিকে তাকায় এবং প্রশ্ন করে "ইয়ে ইলেম আপ শিকা কাঁহা?"

"জী। হর আওরত কা ত এহি কাম হ্যায়।' গটগট জবাব দিয়েছিল সাহেলী।

"আপ খামুস কিঁউ?" চামেলীর দিকে তাকিয়ে সম্বোধন করে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ।

চামেলী একদম বোবা মৎস্য নয়। সে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে পাল্টা দিলে, "জী এয়্যাসি। এম্নি চুপ করে আছি।"

মৃধা সাহেলীর ভূমিকায় অতি চমৎকৃত। মনে মনে ওডা ব্যাডা অইলে বহুৎ কাম দিতো। কন্যাগর্বের আতিশয্যে সে তখনই হাত কচ্‌লে এক প্রস্তাব দিলে যা দুই সৈনিকের ভেবে দেখার কথা।

"কর্নেল সাব মেরা এক আরজ হ্যায়।"

"কিয়া? কহিয়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আগার বুরা না মানে আপ সাব রাত কা খানা এহি খা লিজিয়ে।"

অতি বিনয়ের সঙ্গে মৃধা নিজের মনের কথা প্রকাশ করলে।

প্রথমেই প্রতিবাদ তুললে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ, "নেহি নেহি। আপ্‌লোগ আওর মাৎ তক্‌লীফ ওঠাইয়ে।"

সহযাত্রীর সমর্থনে এগিয়ে এলো মেজর, "হাজি সাব ইয়ে ঠিক নেহি। ফের আউংগা।"

"ও তো আয়েন্দা কা বাৎ।" মৃধার তড়িঘড়ি মন্তব্য।

মেজর হাকিমের চোখ কখনও কন্যার উপর কখনও পিতার উপর। সে ঘোর আপত্তি তুললে, "শুনিয়ে হাজিসাব, আভি শাম হো রহা। বহুৎ রাত হো জায়েগী আওর আপলোগ কা ভি তক্‌লীফ।"

"কুচ তক্‌লীফ নেহি। আপ্ দেড় হাজার মাইল সে আয়ে পাকিস্তান কা হেফাজাৎ কা লিয়ে। আওর হাম আপ্‌না ঘর মে বইঠা হ্যায়। ত ভী তক্‌লীফ্?" যুক্তির তোড়ে সকলকে ভাসিয়ে নিতে তৎপর মখদুম মৃধা।

'শুনিয়ে। রাত হো জায়েগী," আবার আপত্তি তুললে ক্যাপ্টেন।

দুই আঙুল উঁচিয়ে— তর্জনি এবং মধ্যমা— মৃধা জোর দিলে গলার আওয়াজে, "হামে স্রেফ দো ঘণ্টা চাহিয়ে।"

"নেহি হোগা দো ঘণ্টা মে," প্রতিপক্ষের জবাব।

"শুনিয়ে— ," ঈষৎ ঢোক গিলে মৃধা আবার বাক্য জুড়লে, 'চিকেন বিরিয়ানি মে কেৎনা টাইম জায়গা? ঘর মে সব চিজ মওজুদ হ্যায়। খালেস ঘি আওর চাওল। উস্‌কা সাথ এক কারী।' কেৎনা টাইম জায়েগা কর্নেল সাহাব?"

তারপর মৃধা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, "কী রে পারবি না?"

সাহেলীর দিকে সৈনিকের চোখ। সে তা টের পায়। কারো দিকে না তাকিয়ে সে পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করতে এবং অতিথিদের তাক লাগিয়ে দিতে বললে, "দো ঘণ্টা ত বহুৎ জেয়াদা টাইম। আওর জলদি হোনা চাহিয়ে।"

হয়ত সৈনিক যুগল আরো কোন আপত্তি তুলত। কিন্তু ফৈয়াজ ভোজনবিলাসী। চিকেন বিরিয়ানি শোনামাত্র তার জিভে পানি এসে গিয়েছিল। মেসে আজকাল পোলাওয়ের পাট উঠে গেছে। শুক্‌নো রুটি চিবিয়ে অস্থির। বাঙালিরা বয়কট করে ক' হপ্তা ভুখা রেখেছিল।

হাকিমের কাছেও প্রস্তাব একদম ফেল্‌না নয়। দু ঘণ্টার কমে হতে পারে শোনার পর আর আপত্তির ভিত কোথায়? তাছাড়া, তরুণীর মাভৈঃ সব ওজর ধ্বসিয়ে দিয়েছিল।

"আচ্ছা, আপ যাব কাহ্‌তে হেই," বেশ আমতাআমতা স্বরে মেজর হাকিম সায় দিলে।

ফৈয়াজের ত কোন আপত্তিই নেই। নিম্‌কি সিঙাড়ার সঙ্গে সে যে ঘিয়ের গন্ধ পেয়েছে, তা এখনও নাকে লেগে রয়েছে।

বলে রাখা যায়, ষাট-বাষট্টি বয়সেও হাজি মখদুম মৃধা শরীরের চাহিদা অনুযায়ী ভোজ্য সরবরাহ করতে অভ্যস্ত। অবিশ্যি অভ্যেস বহু পুরাতন।

"আচ্ছা মা, যা তোরা যা। লেগে পড়। আমি অন্যান্য বন্দোবস্ত করছি," মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মৃধা তাড়া দিলে।

সাহেলী তখন সৈনিকদের দিকে হাত তুলে উচ্চারণ করে, "আদাব।" চামেলী তৎঅনুসারী।

মেজর হাকিম প্রথমে আদাবের জবাব না দিয়ে বললে, "আপ হাত এক মরতবা খুব দেখায়ে। ফিন্ কিয়া করতে, দেখ্‌নে কা বহুৎ শওক হ্যায়।"

তারপর বেশ ঝুঁকে লক্ষ্ণৌ-কায়দায় হাত নেড়ে সহকর্মীসহ একই সঙ্গে উচ্চারণ করে উঠল, "আদাব, আদাব।"

৫

সয়ীদ মাদবরকে একবার বাড়ি যেতে হয়েছিল।

তিন চার মিনিটের পথ মৃধার মহল থেকে। কয়েকটা বাঁশ-বন এবং জংলা ঝোপ-ঝাড়ের পর পড়ো ভিটে পার।

এই যাত্রা অবিশ্যি মৃধার নির্দেশে। যদিও সাহেলী চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলেছিল, দু'ঘণ্টাও লাগবে না— তবুও আজ ত কম নয়।

চৌদ্দ পনর জনের খাবার তৈরি। তা-ও আ'ম খানা নয়— বিরিয়ানি। সাত আটটা মুরগি জবাই এবং খাল্‌পোষ ছাড়ানো বহুৎ ঝামেলা। গরম পানি প্রচুর লাগবে। সুতরাং বাড়তি হাত থাকা ভাল। মৃধা তাই মাদবরকে বলেছিল তার স্ত্রীকে আনতে।

তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আসতে বেপর্দা হওয়ার কোন ভয় নেই। এদিকে মাদবরের শরিয়ত জ্ঞান খুব টন্‌টনে। অবিশ্যি বেলা দুপুরে হলেও সে স্ত্রীকে আনতে আপত্তি তুলত না। কারণ, আহার আর অমন আহার— কে ছেড়ে কথা কয়। মৃধা আরো বলেছিল পাড়ার কোন লোক আনতে। কারণ, এখনই হ্যাজাক বাতি জ্বালাতে হবে। একটা বৈঠকখানায়, আর অন্দরে। রীতিমত ভোজের ব্যাপার। এমন গণ্যমান্য মেহ্‌মান। চারিদিকে নজর রাখতে হয়। কোন তরফে ত্রুটি না থেকে যায়। ফায়ফরমাস মনা একা পেরে উঠবে না।

পাড়ায় পৌঁছতেই মাদবরের মনে হলো, এই গা-ঢাকা সন্ধ্যায় সব সুম্‌সাম। রীতিমত ছম্‌ছম্ করে। এতক্ষণে সন্ধ্যা না হলেও অনেকে পিদিম জ্বালিয়ে ফেলে। আজ আলোর নাম-নিশানা নেই। নিজের ঘর খুঁজে পেতে মুশকিল হত যদি না অনেক দিনের অভ্যাসে চেনা হত জায়গাটা।

ছোট খড়ো ঘর মাদবরের। বাঁশের টাটিই দরজা। ঠেলা দিতে খুলে গেল না। ওদিক থেকে বাধা পেলে।

তখনই ভেতর থেকে ফিস্‌ফিস শব্দ বেরোয় "কেডা আইল?"

"আমি।"

মাদবরের স্ত্রী চল্লিশের কিছু বেশি হতে পারে। কিন্তু কৃচ্ছ্রতার ফলে এই বয়সেই বুড়িবুড়ি দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীর চেনা জবাবে সে উঠে দাঁড়িয়ে চাঁটি খুলে দিলে। "পিদিম জ্বালো নাই?" বেশ জোরেই বললে মাদবর।

"চিক্কর দিও না। আস্তে কথা কও।" স্ত্রী রীতিমত ধমক দিলে, কিন্তু চাপা গলায়।

"পিদিম জ্বালো নাই ক্যান?" মাদবরের দোসরা প্রশ্নমাত্র স্ত্রী খেঁকিয়ে উঠল, "তোমার কী খবর নাই, গাঁয়ে মিলিটারি ঢুকছে। হগ্‌গলে কইল আর বাতি জ্বালাইও না।"

অভয় দিলে মাদবর। ভয়ের কিছু নেই। তারা মৃধা সাহেবের অতিথি। গ্রামে ঢুকবে না। খাওয়াদাওয়া সেরে চলে যাবে। এমন অন্ধকার করে থাকলেই বরং তাদের সন্দেহ বাড়বে। সে অকুস্থল থেকেই আগত এবং তাকে নিতে এসেছে। রাত্রে মৃধাবাড়ি তাদের উভয়ের দাওয়াৎ।

— আমি যামু না। স্ত্রী বেঁকে বসল।

— ক্যান?

-- আমার ডর করে।

— পাকিস্তানি সিপাই আল্লার ফেরেস্তা। তোমার ডর লাইগব ক্যান?

— তুমি কিছু হুনো নাই।

— কি হুনব?

— কতো মাইয়ারে ধইরা বেইজ্জৎ করছে।

— হ করছে।

— তয়—

— যে-মাইয়ারা পাকিস্তান বরবাদ করতো চায়, তাগোর কী সালাম দিবো?

— তবু ইজ্জতের ডর আছে না?

— তুমার ডর কিল্লাই। তুমার বয়স কত?

অন্ধকারে এই সময় বেশ দাঁত বের করে সে হেসেছিল। তা প্রতিপক্ষের চোখে পড়ার কথা নয়।

— তুমি মৌলবী 'সাব ছিলে না? স্ত্রীর চোটপাট কণ্ঠস্বরে প্রতিভাত।

— ছিলাম তা আইছে কী?

— বুড়া অইলে ইজ্জৎ বুড়া অয়?

— তা আয় না। কিন্তু তোমার ডর নাই, জোয়ান জোয়ান অফিসার। হে তোমার দিকে ফিরাও চাইত না।

খুব স্বাদু ঠেকে না স্বামীর মন্তব্য। তবু মাদবরের বউ চুপ করে যায়। কিন্তু কর্তার তাড়া সঙ্গে সঙ্গে, 'উইঠ্যা পড়ো। জল্‌দি যাওন লাগে। দু'ঘণ্টার মদ্দি ওরা চইলা যাবো।"

অপরের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপার। অন্ধকারেই কলিমন কাপড় বদলে নিলে। সংখ্যায় তা এত কম যে আর আলোর প্রয়োজন হয়নি খুঁজে বের করতে।

কিন্তু আরো এক সমস্যা রইল। সঙ্গে একজন লোক নিতে হয়। এতক্ষণে মনাকে নিয়ে হাজিসাব সম্ভবত হ্যাজাক বাতি নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। এই জেয়াফতে খাঞ্চা প্লেট ইত্যাদি বওয়ার ব্যাপার আছে। আবার রাইট টাইমের মধ্যে সব সম্পন্ন করতে হবে। লোক ছাড়া মৃধাবাড়ি যাওয়া অসম্ভব। কাউকে না কাউকে সংগে নিতে হয়।

মাদবর বৌকে বললে, "তুমি একটু খাড়াউ। একজন কামের মানুষ লাগে। দেহি কারে পাই"।

— জারু মিয়ারে দ্যাহো।

— জারু মিয়া?

মাদ্‌বরের স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে যেন। এতক্ষণে মনে পড়ল, পাড়ার মাঝ-বয়সী প্রতিবেশীর কথা। একবার কলেরায় তার বউবাচ্চা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। তারপর আর সংসার পাতেনি। তবে সংসারে ঠিকমত আছে, তা বলা অসঙ্গত। নিজেই রান্নাবান্না করে খায়। ইচ্ছেমত কাজে যায় অথবা পড়ে পড়ে ঘুমায়। তবে খাওয়ার লোভ তার কম নয়। খেতেও পারে এক গাদা। কেবল পাতে পড়লেই হয়। প্রস্তাবনা শুনে বৌর প্রতি মাদ্‌বরের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

কিন্তু সমস্যা ছিল।

গোটা পাড়া কী গাঁ অন্ধকার। গলি ধরে তিন চার মিনিট গেলে জারুমিয়ার বাড়ি। লোক একজন দরকার। না গিয়ে উপায় নেই। আজ মৃধার কথা না শোনা এবং মিলিটারিদের প্রতি অবাধ্যতা দেখানো পাল্লায় সমান।

— তুমি খাড়াও আমি আহি।

মাদ্‌বর মনে মনে দরুদ পড়ে বুকে ফুঁক দিয়ে নিয়েছিল। অন্ধকারে সাপখোপের ভয় আছে। বাতি সঙ্গে থাকলে পাছে পাড়াপ্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়, সেই ভয়ে মাদবর আর পিদিমের কথা মুখে তোলেনি।

একটা উঠান পার হতে হঠাৎ কে যেন ডাক দিলে, "কেডা যায়?"

মাদবর তার পায়ের আওয়াজ গুম করতে পারেনি, বোঝা গেল।

রবিয়েল পাটোয়ারীর গলা সয়ীদ মাদবরের চেনা। ভাবলে, পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু ভয় পেলে, যদি হঠাৎ চোর-চোর রবে কেউ চিৎকার দিয়ে বসে। পাটোয়ারী তার দাওয়ায় বসেছিল, পা-তালির সাহায্যে সে মানুষের যাতায়াত আঁচ করতে পেরেছিল।

— কি চাচা, ডাকেন ক্যান?

কাছে পৌছে মাদ্‌বর ধরা দিলে।

ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে পাটোয়ারীর গলা, "যাও কুই। আঁধারে বারাইছ ক্যান?"

আবার ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে পাটোয়ারীর গলা, "গাঁয় মিলিটারি আছে হে খবর রাখোনি?"

— হ। হেরা আইছে বড় মানুষ মৃধা সাবের বাড়ি। হেরা-হেরা জানে। আমাগো ভয় পাওয়ার কী আছে?

— আরে মিয়া, বড় ছোডোর কথা না। তুমি কিছুই জানো না। হালারা গেরাম-গেরাম জ্বালাইয়া দিতেছে। তুমি কও বড়ো ছোডো। আগুন লাইগলে আগুন চিইন্যা রাহে নাকি, এডা বড় লোকের বাড়ি, হেডা গরীবের বাড়ি।

পাটোয়ারী এঁড়েল লোক। যদিও বয়স পঞ্চাশের উর্ধে, শরীরে প্রচুর তাগদ। তা-কে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই মিয়ানো সুরে মাদবর জবাব দিলে, "চাচা, হে ত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিগ। তবে আঁধার রাইত। আর হালারা যহন এদিকে আহে নাই, কোন ডর নাই।"

— কিন্তু মৃধাডা কী?

— কী কন চাচা?

— মৃধাডা জানোয়ারই রইল। হুনলাম হেরা যাইতেছিল জীপ গাড়ি চইড়্যা, তহন ডাক দিয়া আনছে।

— আমি কইতা পারি না। আমিও তা-ই হুনছি। তবে জানোয়ার কী সহজে মানষ অয়? চাচা কন দেহি?

— মাদবর ফিসফিসিয়ে জবাব দিলে এবং অন্ধকারে থুথু নিক্ষেপ করলে।

— অহন মানে-মনে রাইত কাইড্‌লে বাঁচি।

পাটোয়ারীর হুঁকা নিভে গিয়েছিল প্রায়। সে আবার কল্কেয় ফুঁ দিতে লাগল।

— দেরী করা বা'লা না। আহি চাচা। রাইত বড় আন্ধার। দোয়া রাইখ্যেন।

আবার বুকে দোয়া-দরুদের ফুঁক লাগিয়ে মাদবর প্রতিবেশীর সন্ধানে গেল। এবার বেশি বেগ পেতে হয়নি। জারু মিয়ার অত ডর-ভয় নেই। আর স্বচক্ষে মিলিটারি দেখার কৌতূহল তার বহু দিনের। তদুপরি আহারের লোভ থাকতে পারে। মাদবর প্রস্তাব দেওয়ামাত্র সে আর দেরি করেনি। একটা লুঙ্গি ছিল পরণে। তাও বহরে ছোট। হাঁটুর কিছু নিচে নেমে থেমে গেছে। কাম্‌লা মানুষ। তার ওসব দিকে খেয়াল নেই।

সুড়সুড় মাদবরকে সে অনুসরণ করছিল। খাওয়ার ঝামেলা আর করতে হবি না। তা কি সন্ন্যাসীর পক্ষে কম সান্ত্বনা?

মাদবর গিন্নীকে পুরো দেখতে পায়নি। তবে স্ত্রীলোক বিধায় আঁচ করে নিয়েছিল জারু মিয়া। তাই বললে, "ভাবী সাব, না?"

"হ। বহুৎ কাম। তাই মৃধাসাব কইল লগে নিতে।"

"চলেন, মাদবর সাব। কিন্তু দেইখ্যেন ব্যাডারা কিছু কইরা না বহে।"

নির্বিকার গলায় আশঙ্কা প্রকাশ করলে জারু মিয়া।

"তা দ্যাখন আমাগো কাম না। হে বড় মান্‌ষে বড় মান্‌ষে বুইঝব।"

মাদবর অভয় দিলে। কিন্তু গৃহিনী পথ চলতে চলতে বলেছিল, "আমার ডর করে।"

"মাইয়া মান্‌ষের ডর কিছু বেশি," মাদবর মন্তব্য করে অনায়াসে।

হঠাৎ অনুভব করে সকলে, যেন এক শূন্য গ্রামের ভেতর দিয়ে তারা হাঁটছে, যেখানে কোন মন্ত্রের জোরে সবকিছু পাথর ব'নে গেছে।

একটা বাঁশ-ঝাড় বাতাসে শন্‌শন করে উঠল। তখন রীতিমত গা ছমছম করতে লাগল সয়ীদ মাদবরের। এমন কখনও হয়নি। রাতবিরেতে হাঁটতে হয়েছে বৈকি। সাপখোপের ভয় স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের ভয় ইদানীং।

অন্দরের দিকে মাদবর গিন্নী চলে গেল। বাড়ির সকল চেনা। কতো দিন সন্ধ্যার পর দায়ে-দফায় আসতে হয়েছে। টাকা কর্জের জন্যে তার চেয়ে বেশি। সুতরাং অন্ধকারে মৃধার উঠানে পৌঁছতে দেরি হয়নি।

মাদবরের অনুমান ঠিক।

দহলিজে একটা হ্যাজাক ঝুলছিল গাছের ডালে বাঁধা। মৃধা নিজেই বন্দোবস্ত করেছে।

AMARBOI.COM

দুই প্রতিবেশীকে দেখে সে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠল, অন্ততঃ বাক্যপ্রকাশের অতি দ্রুততায়।

নিজে এগিয়ে এসে বললে, "আইছো জারু মিয়া। বহুৎ আচ্ছা।"

মৃধা নিজে তার পিঠে স্নেহের মৃদু থাপ্পড় যোগ করলে। এমন আদর জারু মিয়া জীবনে পায়নি। মাদবর বুঝে, মিয়াসাব খুব মেজাজে আছে। দশ বিশ টাকা হাওলাত চাইলে এখনই বের করে দেবে, ওজর আপত্তি তুলবে না।

"অহন কামে লাইগা যাও।" জারু মিয়ার দিকে আবার ফরমান। বেচারা উদোম গা, ময়লা লুঙ্গি। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোর কাছে বিব্রত বোধ করে। তাছাড়া বিদেশী কতো লোকের চোখ তার উপর পড়ছে।

জারু মিয়া আদব-কায়াদা জানে। সে মেহ্‌মানদের কাছাকাছি হতেই স্লামালেকুম দিতে ভোলেনি।

আরো নির্দেশ এলো, "জারু মিয়া, তুমি অন্দরে যাও। তোমার ত হগ্‌গল চেনা। কী কাম আছে দ্যাহো।"

— আচ্ছা, হুজুর।

মিলিটারি দেখার খায়েশ তার পুরো মেটেনি। এদিক ওদিক ঈষৎ আড়-চোখে পড়েছে মাত্র।

তখনই কাজের চাপ।

জারু মিয়া অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল।

সয়ীদ মাদবর বৈঠকখানার ভেতর গিয়ে বসল।

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ এবং মেজর হাকিম তখন কী যেন বহসে ব্যস্ত।

অকুস্থলে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস ছিল না জারু মিয়ার।

আর মখদুম মৃধা ত আজ ঈশ্বরের মত সর্বত্র বিরাজমান। কতো দিকে চোখ রাখতে ব্যস্ত। অতিথিসেবার আরকে যেন কোন কালো পোকা না পড়ে যায়।

৬

অন্ধকার এবং আলোর সমাপতন না থাকলে যেন কোন স্থানের সৌন্দর্যই খোলতাই হয় না। সন্ধ্যা এবং হ্যাজাক বাতির কোলাকুলি দহলিজের প্রাঙ্গণে উৎসবের ফুল্লস্রোত বয়ে এনেছে। ছোট বাগানের গাছপালাগুলো নানা ছায়া ফেলে জমিনের নক্‌শা এমন বদলে দিয়েছে যে এখানে কোথাও মাটি আছে ধারণা করা কঠিন।

বাতাসের গতি ঈষৎ বেড়েছিল। তাই কয়েকজন জওয়ান ঘাসের উপর সটান। অবিশ্যি দু'জন পাহারা-রত। অফিসার যুগল চেয়ারে আসীন। মেজর হাকিম আরাম-কেদারা ছেড়ে দিয়েছিল। অত টিলেঢালা ভাব তার ভাল লাগেনি। কারণ, আড্ডা দিতে গিয়ে যদি শরীরে অঢেল হেলান দেওয়া বাতিক চেগে ওঠে, তখন শুয়ে পড়তে হয়। তাই সে আর এক হাতল ওয়ালা চেয়ার চেয়ে নিয়েছিল। আরাম কেদারায় কেউ বসেনি। মৃধা সদর-অন্দরের মাকু। এদিক ওদিক করতে হচ্ছে। তবু ফাঁকে ফাঁকে এসে বসে যায়। অতিথিদের কী প্রয়োজন তা খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে অশেষ বিনয়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহ। বার বার এত্তেলা দেয় যেন কোন লৌকিকতার বেড়া না থাকে সম্পর্কের মধ্যে। গোটা পকিস্তান মুসলমানের আবাস-ভূমি। সকলে ভ্রাতৃসুলভ বন্ধনে আবদ্ধ। বিশেষতঃ বর্তমানে, যখন বাসভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন, সামাজিকতার সংকীর্ণ গণ্ডি মুছে যাওয়া উচিত। মৃধার উর্দুভাষার জ্ঞান দুই মেয়ের মত নয়। তবু কোন বাধা ঘটেনি আত্মপ্রকাশে। ভাষার ব্যবধান বিনয়ের মোড়কে সহজেই চাপা পড়ে অথবা ইংরেজি এসে জোটে। সয়ীদ মাদ্‌বর দহলিজের ভেতর একা। তবু সে-ই জিজ্ঞেস করেছে এবং বলেছে, মেহমানদের কারো কিছু দরকার থাকলে খিদ্‌মৎগার হিসেবে তাকে ভেবে নিতে যেন কেউ এতটুকু দ্বিধা না রাখে।

এমন আন্তরিকতা কিছুটা শ্বাসরোধী। তাছাড়া রাজনীতির আলাপ খোলাখুলি বেসামরিক জনের সঙ্গে না করাই ভাল।

অবসর বিনোদনের তেমন কিছু হাতের কাছে না থাকরে ক্লান্তি আরো চেপে বসে।

সৈনিকদের তা-ই মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ দুই জনের হাই উঠতে লাগল। এখানে সিনিয়র জুনিয়র এক।

জওয়ানেরা অফিসারদের কাছ থেকে সমীহব্যঞ্জক দূরত্ব রেখেই গুজগুজ করছিল।

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ আলিস ভাঙলে দুই বাহু ছড়িয়ে। প্রায় উত্তেজনার মধ্যে বসবাসকারীদের নার্ভ হঠাৎ শিথিল হয়ে পড়লে নানা ধরনের বিরক্তি ঘিরে ধরে। এতক্ষণ সে চুপচাপ ছিল, যদিও মনের ভেতর কথাটা উদয় অনেক পূর্বেই।

বন্ধু সিনিয়র অফিসার। ব্যাপারটা পছন্দ না-ও করতে পারে। এই ভেবে নিজের নার্ভের উপর কিছু শৃংখলার ভার চাপিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কয়েকবার আলিস-ভাঙার পর তার মনে হলো, হয় উঠতে অথবা দেহের ম্যাজম্যাজানির মোকাবিলা করতে হয়।

দুই জনে হ্যাজাক লাইটের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিল।

ফলে, একজোড়া সিলুয়েট-মূর্তি।

দু'জনেরই চোখ মাঠের অন্ধকারের পানে। এখন দৃষ্টি না থাকার মত। ফলে, কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে হয়।

পয়লা বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধলে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ।

সন্ধ্যায় চুপচাপ বসে থাকা তার পক্ষে অসহ্য। অবিশ্যি জওয়ানদের কী হচ্ছিল, সে-খোঁজ নিতে যায়নি। হবেই বা কী? তারা তো অফিসার বা শরিফ নয়।

"ফৈয়াজ ডাক দিলে, "হাকিম—"।

"কিয়া কহো"।

"হাম কহ্‌তে—।"

মেজর প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, "তো কহো— কহো।"

"হাম কহতে কে আচ্ছা খানা কা আগে আচ্ছা পিনা জরুরৎ হ্যায়।"

মেজর হাকিম জবাবের আগে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে। দুই সশব্দ করতালু-সম্মিলনের মধ্যে যখন একই সম্মতি উত্তপ্ত, তখন সে মুখ খুললে, "হাম ভি ওহি সোঁচতে থে। আমিও তা-ই ভাবছিলাম।"

শিরদাঁড়া খাড়া করে চেয়ারে বসল মেজর। বললে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু হতাশার সুর আবার "লেকিন ইন্তেজাম—।"

অভয় দিলে সঙ্গী "শোনো হাকিম, ইয়ে 'ওয়ার-ফ্রন্ট' হ্যায়। হাম তো সামাঝ্‌তে আগার মরনা হ্যায় তো খা-পী কর মরো।"

"আলবৎ। লেকিন মাল কাঁহা?"

হাত তুলে তাকে নিরস্ত করলে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ এবং বললে, "হাম হর ওয়াক্ত সাথ রাখতা" তারপর সে হাততালি দিলে তিন বার, অধিকন্তু হাঁক "এ— ই অর্ডারলী।"

এক জওয়ান এসে পৌঁছল "কিয়া হুজুর" রব মুখে।

"মেরা জীপ কা সাম্‌নে ডাব্বা মে দেখো এক বোতল হুইস্কি হ্যায়। লে আও।"

"জী সরকার।"

আরদালী চলে গেলে মেজর নোক্তা দিলে, "গ্লাস।"

"গ্লাস কিয়া জরুরত? হাম তো নীট পি লেতে। হিঁয়া আচ্ছা গ্লাস কাঁহা মিলেগা?"

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ জবাব এবং আর একবার হাঁক দিলে, "এই সয়ীদ মৌলীসাব—।"

কান খাড়া করে ছিল মাদবর দহলিজের ভেতর। তার নাম মেহমানদের কাছে এত চেনা হয়ে গেছে, এই আত্মশ্লাগার ঠেলায় মাদরব ত উড়ে এসে হাজির হতে পারলে খুশি হতো।

— জী, হুজুর।

— মৌলীসাব আপ্‌কো তক্‌লীফ দেতে। দো গ্লাস লাইয়ে।

— তক্‌লীফ কিয়া কহতে। ইয়ে ত মেরা খোশ-নসিব।

হাজি মৃধা ভেতরে ছিল। সেখানে রান্নাবান্না কী হবে, তার হিসাব নিতে ব্যস্ত। খুব সৌভাগ্য। বাড়িতে সব মজুদ ছিল। আটটা মুরগি, সের দুই ঘি, ভাল পোলাওয়ের চাল, উত্তম পেয়াজ ও অন্যান্য মশালা।

কুলসুম এবং মাদবরের বউ শিলনোড়া নিয়ে বসে গিয়েছিল। ঘট্‌ঘট শব্দ উঠেছে। চামেলী যোগান্‌দার। সে রেডিও দাদির কাছ থেকে নিয়ে এসে পাশে রেখে বসে গেছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খবর বা আর কিছু শুনছে মাঝে মাঝে।

হাজি মৃধার এত্তেলা এবং হুঁশিয়ারি দুই-ই সকলের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হচ্ছিল। তার প্রধান লক্ষ্য বড় মেয়ে। মা, তোর উপর সব ইজ্জত নির্ভর করছে। আর এক হাত দেখিয়ে দে। ওরা ভাবে বাঙালি মাছ খায়, গোস্ত খেতে জানে না। আজ মৌকা পেয়েছিস, দেখিয়ে দে বাঙালির হাত।

অবিশ্যি এমন প্রস্তাবনার জবাবে শুধু সাহেলীই এক আধবার হাঁ-না বলে সেরে দিয়েছিল। আর সকলে নীরব।

মৃধার অস্থিরতা চলাফেরায় স্পষ্ট।

উঠানে আর একটা হ্যাজাক জ্বলছিল। তার আলোয় সব দেখা যায়। বেচারা মনার আদৌ ফরসুৎ নেই। মাদবর পর্যন্ত তাকে ফরমাস খাটাতে ডাকে। একবার তামাক দিয়ে আসতে হলো।

মেহমানরা একা বসে থাকে, তা ভাল দেখায় না। তাই মৃধা মাঝে মাঝে সেখানে হাজিরা দেয়। আসেমা বিবি আলু ছেলায় ব্যস্ত। সাহেলীর প্রস্তাব, আট দশটা আলু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরিয়ানির মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে এবং সে আগে থেকেই বাপ-কে শুনিয়ে রেখেছে : দেখবেন, গোস্ত ছেড়ে আরো আলু না চেয়ে বসে।

জারু মিয়া উঠানের এক পাশে ছোট ডেগ্‌চিতে পানি গরম করছিল। তার জন্যে ঈষৎ গর্ত খুঁড়ে চার পাশে ইট বসিয়ে আলাদা চুলা তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। পানির দরকার ত নানা দিকে। প্রায় এক ডজন মুরগি পাশে পাশে পড়ে রয়েছে। সব জবাই করা। কাটা গলায় রক্ত থিক্‌থিক করছে। এই মুরগি ছাড়ানোর জন্যে পানি গরম দরকার সব চেয়ে বেশি। নচেৎ তাড়াতাড়ি পালক-ফেলা কষ্টকর। জারু মিয়া চেলাকাঠ চুলোয় গুঁজে বিড়ি ফুঁকছিল। বেশিক্ষণ তাকে সদরে থাকতে হয়নি। মিলিটারি গেরো। কী হয় কে জানে। তার জন্যে মনে মনে বেশ নিরাপত্তা ভোগ করছিল। তার কালো চেহ্‌রা। মুখে একরাশ গোঁফদাড়ি। হ্যজাকের আলো একটু অস্পষ্ট, একটা পাতাবাহারের গাছ আড়াল বিধায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জারু মিয়া যখন চুলোর কাঠ গুঁজে দিচ্ছিল, তখন মনে পড়তে পারে রাজা হরিচন্দ্র শ্মশানে চণ্ডালবেশে নিজ কর্তব্য-সম্পাদনে রত।

মাদবর কী এমন সুযোগ ছাড়ে।

সে মনাকে বার বার ডাক দিয়ে ফরমাস খাটাতে পারত। কিন্তু নিজে খেদমত করার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি তা কোথায় মিলবে?

মাদ্‌বর নিজেই অন্দরে চলে গেল। অবিশ্য তার কাছে এ বাড়ির কেউ পর্দানশীনা নয়। মৃধার সঙ্গে ত দেখা হবে। মেহমানদের অভিলাষ জানিয়ে দিতে কর্তা দুটো শাদা গ্লাস বের করে দিলে। তবে জিজ্ঞেস করলে, কী দরকার? বোধহয় পানি খাবে।

এদিকে জওয়ান আরদালী হুইস্কির বোতল টিপয়ের উপর রাখলে তখনই মাদবর গ্লাস নিয়ে পৌঁছল। মেজর তাকে খুব ধন্যবাদ দিলে। মাদবর ত আনন্দে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আর কী, যেন দশম দশা।

এত বড় অফিসার। তার মত নগণ্য কীটানুকীট ব্যক্তিকে এমন খাতির করে, ভাবা যায় না। পাকিস্তান না হলে কী এমন সব অসম্ভব কাণ্ড ঘটত? সাধে কী আল্লা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন। পরম করুণাময়ের কল্যাণে এমন ইজ্জৎ কপালে জুটে গেল।

পাশে চেয়ার খালি পড়ে থাকলেও দুই অফিসার তা-কে বসতে বললে না। এখানেই এমন সব শরিফ আদমির কাছাকাছি থাকা অসোয়াস্তিকর। তাই আবার সে দহলিজের ভেতরে চলে গেল। খোলা আকাশের নিচে গরমের দিনে বসা খুব আরামদায়ক। কিন্তু মনের সুখ একান্তেই উপভোগ্য। আল্লাতালা পাকিস্তান বদৌলতে তার কাছে এই সন্ধ্যায় যে-অভাবনীয় আনন্দোৎসব পাঠিয়েছেন, চুপিচুপিই তার আস্বাদন কাম্য। তাই সে আর অকুস্থলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

ছিপি খুলতে বাতাসে হুইস্কির সৌরভ তুলে আগে থেকেই আমেজ চেখে নিলে।

ফৈয়াজ বললে, "হাকিম, হাম ঈমানদার আদমি। হাম কুই চিজ খারাপ কারকে নেহি পিতে। পেরা পানি কী জরুরৎ নেহি।"

"হাম কো কিয়া সম্‌ঝা? হাম বেঈমান হ্যায়?"

সঙ্গীর দিকে চেয়ে জবাব দিলে মেজর হাকিম।

AMARBOI.COM

দুই গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে লাগল ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ এবং বললে, "শোনো হাকিম, তোম তো জান্‌তে হো যিস্‌ চিজ কা বনিয়াদ শখ্‌ত, ওচিজ জল্‌দি গিরতা নেহি।"

বনিয়াদ শক্ত হলে তা সহজে পড়ে যায় না। হাঁচা কথা।

এক সঙ্গে প্রায় আড়াই পেগ নিজের গ্লাসে ঢেলে সে আরো যোগ করলে, "পিনে কা ওয়াক্ত্‌ হামারা ওহি পলিসী তোমহারা কিয়া?"

"ওহি (তা-ই)" এই বলে হাত উপোড় করে সে কারণ-বারি ঢেলে যেতে বন্ধুকে ইশারা এবং উৎসাহ দিলে।

চিয়ার্স!

চিয়ার্স!

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ, বোঝা যায়, বড় কড়া খরিদ্দার। নির্জলা আধ পেগ সে গলায় ঢেলে দিলে যেন পানি। মুখে একটু বিকৃতি পর্যন্ত দেখা গেল না।

মেজর হাকিম সঙ্গীকে অনেক দিন থেকে চেনে। নিজের সাবাশি দিতে ক্যাপ্টেন বেশ ভালবাসে। অন্তত শরাবের মজলিসে সে সহজে কারো বাঁয়ে যেতে নারাজ। বাজি ধরে পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে গোটা বোতল সাবাড়ের নজির ত সে নিজের চক্ষে দেখেছে। আজ ভাণ্ডার সীমিত। পিণ্ডি ক্লাবের মত নীলা-নদ নয়।

হাকিম তাই এক চুমুক মেরেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল, আজ কোন বচসায় যাবে না সে সঙ্গীর মোকাবিলায়।

যদিও অধীনস্থ অফিসার ফৈয়াজ। কিন্তু চেতে উঠলে বড় বড় জেনারেলদের সে থোড়াই পরোয়া করে। জিদ্দী বললে তার পরিচয় অল্প দেওয়া হয়। জিদে তার মাথা ঠিক থাকে না। অথচ এম্নিতে সে তেমন বগ-চটা অফিসার নয়। কিন্তু হুইস্কির মৌতাতে কি অন্য কোন কারণে জিদ চেপে গেলে ত রোখে-রোখে ক্যাপ্টেন আলি ফৈয়াজ একদম অগ্নিপুত্র, কী তার পিতা স্বয়ং বৈশ্বানর। হাকিমের অভিজ্ঞানে এসব লিপিবদ্ধ আছে।

তাই সে সমঝে সমঝে চুমুক দিতে লাগল। অন্ততঃ কোন প্রতিযোগিতায় মাতবে না বন্ধুর সঙ্গে। আর এই সন্ধ্যায় যার বোতল ধ্বংস করছে তার প্রতি কিছু সৌজন্য দেখানো অবশ্য উচিত।

ক্যাপ্টেন মেজরের দিকে সিগারেট এগিয়ে দিলে। নিজে একটা নিয়ে অগ্নিসংযোগ করলে সঙ্গীর সিগারেটে। হঠাৎ বাতাসে কাঠি নিভে গেল। তাই আবার জ্বালাতে হলো।

মেজর প্রসঙ্গটা বেশ নিচু গলায় উত্থাপন করলে, "শোনো ফৈয়াজ, পলিটিক্‌স কা মামলা। কাঁহা কা পানি কাঁহা জায়েগা বোল্‌না মুশকিল হ্যায়।"

"কুচ মুশ্‌কিল নেহি। শোনো, মেজর দোস্ত—," গ্লাসে চুমুক দিতে ক্যাপ্টেন থামলে এবং এক ঢোক গিলে বাক্য সমাপ্ত করলে, "দেখো এ, লোগ কা (তারপর গলা সংগীর কানে কানে)— খস্‌লৎ আদৎকা হাম্‌কো পাত্তা মিল গিয়া। এদের স্বভাব চরিত্রের ঠিকানা আমি পেয়ে গেছি।"

'কিয়া মিল গিয়া?"

"এ লোগ খুব চিল্লানে জান্‌তো। আওর কুচ নেহি। মারো দো-চার দো-চার ডাণ্ডা। ব্যস, ঠাণ্ডা, তিন হফ্‌তা গিয়া কিয়া দেখা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোম কিয়া দেখা?" পাল্টা চেপে ধরলে মেজর হাকিম।

সংলাপ খুব অস্পষ্ট ভাষণে চালু হয়। প্রায় ফিস্‌ফিসানির পর্যায়।

"হাম যো দেখা বোলা"। সিগারেটে একটা জোর টান মেরে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে জবাব দিলে ক্যাপ্টেন।

— লেকিন। অর্থাৎ কিন্তু। হঠাৎ থামল মেজর এবং সঙ্গীর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আলোর দিকে পিঠ করে বসেছে তারা। তাই কিছুই দেখতে পেলে না। হাকিমের ইচ্ছা ছিল, কী প্রতিক্রিয়া অপর দিকে সেই বুঝে মন্তব্য ঝাড়বে।

— লেকিন কিয়া? কিন্তু কী?

ফৈয়াজ বেশ অধৈর্য, গলার আওয়াজে প্রতিভাত। হাকিমের গ্লাসে চিজ ফুরিয়ে এসেছিল, খেয়াল করেনি কথার তোড়ে।

সে ঢক্ ঢক্ এক পেগ হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে চুমক মেরে জবাব দিলে, "হাম সোঁচ্‌তা, যাব কুই আচানক মার খায়ে তো সহম খা কর রাহ্ যাতা।" যদি কেউ হঠাৎ মার খায় তখন হঠাৎ থ' হয়ে যায়।

— উস্‌কা বাদ? ফৈয়াজ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

— উস্‌কা বাদ ও ভী ইন্‌তেকাম লেনে কা লিয়ে তৈয়ার হো যাতা।

অর্থাৎ, অতঃপর সেও প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ফৈয়াজ মন্তব্যে সায় দিতে নারাজ, তাই চুমুক দিতে গিয়েও গ্লাস টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে জবাব দিলে, "তিন হফ্‌তা চলা গিয়া কুচ নেহি হুয়া। ও হোতা তো এক হফ্‌তা কা আন্দার হো যাতা।" তারপর সে ঢক্‌ঢক্ হলকুমের ওদিকে কিছু তরল পদার্থ ঠেলে নামিয়ে দিলে।

"লেকিন এঁহা তিন হফ্‌তা কা বাৎ নেহি। তিন মাহিনা লাগ সাক্‌তা, ইয়া তিন বরষ লাগ সাক্‌তা।"

হাকিম কথাগুলো উচ্চারণ করলে কিন্তু কোন জোর দিলেন। কারণ, আগেই সে স্থির করে নিয়েছিল, সঙ্গীর চ্যালেঞ্জের কাছ থেকে বহু দূরে থাকবে।

বিশ মিনিটের মধ্যে প্রায় সওয়া তিন পেগ সাব্‌ড়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন। তার মুখাবয়ব বেশ চমক-মুখর। এক পাশে ঘুরতে যে-টুকু আলো পড়ে, তা দিয়ে বুঝে ফেলা যায়।

ফৈয়াজের স্বরও আর নিচু গ্রামে নেই। পানির ধাক্কায় নদীর পাড়, শহর ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও স্বয়ং পদার্থ হিসেবে তরল।

এতক্ষণ আলাপ-আলোচনার ঔচিত্য সম্পর্কে সতর্কতা ছিল। তা ক্রমে ক্রমে উবে যাচ্ছে। আর যা-ই হোক, বাঙালিদের নিয়ে টীকা-টিপ্পনি বাঙালি-ঘরে করা শোভন নয়।

ক্যাপ্টেন গলার স্বর হঠাৎ চড়িয়ে জবাব দিলে, "তোম পাগল হো গিয়া। মর্নিং শোজ দি ডে।" অর্থাৎ উঠন্ত মূল পত্তনে বোঝা যায়।

হাকিম আর ও-পথে যাওয়ার বান্দা নয়। তাই প্রসঙ্গের মোড় ফেরাতে বললে, "আচ্ছা, ফৈয়াজ, বাঙালি আওরত কা বারে মে তোমরা কিয়া জিক্‌র?" বাঙালি মেয়ে সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

হুইস্কির গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে প্রসারিত-বাহু ফৈয়াজ সুর-সহ আবৃত্তি করতে লাগল আকবর এলাহাবাদীর কালাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংগাল কা বাৎ শোন্
বাংগাল্ নী কা বাল দেখ
বাঙালি পুরুষের কথা
করহ শ্রবণ
বাঙালি রমনীর কেশ
করহ দর্শন।

দুই জনে এক সঙ্গে হেসে উঠল

প্রসঙ্গ আরো কয়েক মাইল দূরে নিয়ে যেতে হবে, তবে নিস্তার। সেই অভিপ্রায়ে মেজর হাকিম মুখ খুললে। "আচ্ছা গেরিলা ওয়ার কা বারে মে তোম কিয়া সোঁচতে?"

"গেরিলা?"

"হাঁ, হাঁ।"

"গেরিলা আফ্রিকান জংগল মে রহ্তা।"

"ও গরিলা হ্যায়।"

"এক হি বাৎ।"

"কৈসে?"

"দোনো জংলীপনা। আওর কুচ্ নেহি।" উভয়ই জংলীপনা। আর কিছু নয়।

হাকিমের তখনই মনে হয়, না, কথা আর কোন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। যুদ্ধ বা বাঙালি-সংক্রান্ত কিছু হলে খামখা অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যেতে পারে। গেরিলা বা গরিলা আফ্রিকার জঙ্গলে থাকুক। নিকটে জওয়ানেরা বসে আছে। নারীকেন্দ্রিক আলোচনাও অশোভন। আফ্টার অল, অফিসার জওয়ানের পার্থক্য না রেখে উপায় নেই। যুদ্ধ চালাতে গেলে ডিসিপ্লিন শৃংখলা অপরিহার্য বৈকি।

ফৈয়াজ হঠাৎ আত্মমগ্ন। গ্লাস হাতে ধরা অথচ চুমুক মারছে না। তা থেকে একটা সিদ্ধান্তই আসতে পারে : কোন চিন্তা এমন পেয়ে বসেছে যে তার টানেই ভেসে যাচ্ছে।

নিজে সিনিয়র অফিসার। তবু মেজর ভাবলে, খোঁয়ারিটা কী ভেঙে দেওয়া উচিত হবে? মানুষ হুইস্কি খায় পলায়নের জন্যে। কেউ সারা দিনের ক্লান্তি থেকে পালায়, কেউ আত্মগ্লানি থেকে। কারো কারো স্ত্রীর কাছ থেকে পালাতে হয়। উপ-পত্নী, প্রেমিকা এসবও থাকতে পারে ওই জংগলে। শাস্ত্রকারগণ খামখা আওড়ায়নি : য পলায়তি স জীবতি।

তিন চার মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল।

গ্লাস শূন্যে ধরা।

যেন ম্যাজিক দেখাচ্ছে কেউ।

ফৈয়াজ অনড়।

হাকিম ভাল করে দেখলে। শরাব পানের সময় হার্টফেল মারফৎ প্রাণবায়ু নিঃসরণের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে। কৌতূহল, আশঙ্কায় মেজর হাকিম বেশ চমকে এবং স্বতঃই ডেকে উঠল, ফৈয়াজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম ডাক বৃথা দেখে পুনরায় সম্বোধন, "ফৈয়াজ।"

"কিয়া"।

মনুষ্য-মুখ থেকে শব্দ বেরুল ঠিকই কিন্তু মনে হবে, সামনে মদিরা পাত্র হস্তে ধৃত কোন প্রস্তরমূর্তি কথা বলে উঠল।

মাল বিরল। পাছে পড়ে না যায়, তাই হাকিম ক্যাপ্টেনের গ্লাস এক হাতে ধরে ঝাঁকানি দিলে স্বর-যোজনা সহ, "ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন।"

এবার আত্মস্থ হয় ফৈয়াজ। নিজের গ্লাস এক দিকে সরিয়ে বললে, "দীল চাহ্‌তো—। কাঁহি খো যায়ে—"

প্রাণ চায়, কোথাও হারিয়ে যাই।

হাকিম হেসে উঠল বেশ জোরে, এবং যোগ করলে, "তোমকো আজ শায়েরিপনা (কাব্য-পনা) পাক্‌ড়া হ্যায়।"

"নেহি", উচ্চারণের পর ফৈয়াজ আরো এক দ্রুত চোঁ-চুম্বক মেরে গ্লাসটা নিচে রাখলে।

— তব্‌— তবে—

— এ্যায়সি। অর্থাৎ এম্নি।

শরাব গ্লাসে ঢালতে গিয়ে হাকিমের হাত বেশ কয়েক বার কেঁপে উঠল। সে আর গোলাপির স্তরে নেই। এই চেতনা-টুকু তাকে ডাঙার দিকে ঠেলে দিলে।

বন্ধুর সান্ত্বনায় সে বললে, "ইয়ে হো সাক্তা। আখের আপ্‌না মুলুক ছোড় কর কিসিকো আচ্ছা নেহি লাগ্‌তা। লেকিন মজবুর। সোগল আওর পেট কা মাম্‌লা চারু তরফ।".

জীবিকা এবং পেটের মাম্‌লা চতুর্দিকে।

ফৈয়াজ এবার ধীরে ধীরে স্কটল্যান্ডে প্রবেশ করতে লাগল। কিন্তু ক্রমশঃ বাক্যহীন।

হাকিম তাই ফন্দি খোঁজা শুরু করলে। হাম্‌পেয়ালা-কে কাছাকাছি না পেলে শরাব পান বৃথা। হঠাৎ গুন্‌গুনিয়ে গজল গাইতে লাগল হাকিম। ভাবটা মধুর। প্রেমিক দয়িতাকে বলছে, আমাকে নির্বাক করে দাও। তোমার জুলুমে যদি আমি মুখ ফুটে কথা বলতে বা আর্তনাদ যন্ত্রণা প্রকাশে সক্ষম হই, তাহলে তা অনেক লাঘব হয়ে যায়। আমাকে জিহ্বাহীন নির্বাক করে দাও। 'লুৎফ আতা হ্যায় সিতাম মে।' তোমার অত্যাচারেই আমি জীবনের যথার্থ স্বাদ পাই।

গজলের মধ্যে গজাল দিলে ফেয়াজ, "হাকিম দেখো তোম মাত্‌ওয়ালা (মাতাল) না হো যাও।"

মন্তব্যে হাকিমের হি-হি হাসিতে ফেটে পড়ার কথা। চালুনি-বলে সূচের-পাছা-ছ্যাঁদা গোছের ব্যাপার। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে সে চুপ করে গেল এবং বশংবদের মত জবাবটা ঢাললে, "নেই, নেই। মেরা খেয়াল হ্যায়।"

"আলবৎ নেহি," ফৈয়াজ প্রতিবাদ তুলেছিল।

মেজর চুপ করে গেল। ফৈয়াজের খসলৎ তার বিলক্ষণ জানা। তাই শ্বেত পতাকা উড্ডিন রাখার খাহেসে বললে, "ফৈয়াজ এ্যায়সা কুচ হো যায়ে তোম হাম্‌কো দেখো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আলবৎ দেখুংগা। নেই ত দোস্তি কিয়া? নচেৎ বন্ধুত্ব কিসের হাম— তোম নীট আদ্‌মি। নীট হুইস্কি পিতে হো। ইয়ে হাম্‌কো মালুম হ্যায়।

— কেয়ামৎ তক্ ইয়াদ রাখগো।

ফৈয়াজের এই স্মারকের পর সে বোতলের দিকে চেয়ে দেখল। চল্লিশ পাঁচচল্লিশ মিনিটের মধ্যে আধার তথা আধেয় তখন অর্ধেক। অনুপাত বোধহয় পৌনে তিন : পৌনে চার।

হিসাব ঠিকই করেছিল মেজর হাকিম। কিন্তু কিছুই তার মনে রইল না।

এই সময় মৃধা পৌঁছল।

এতক্ষণ অন্দরে সে নিজেও যোগান্‌দার সেজে বসেছিল। দু'টো পেয়াজ ছেলায় সাহায্য করতে পারে, তাও সময়ের মোকাবেলায় কী কম কাজ। অবিশ্যি স্মরণ-কালের মধ্যে সে আর কারো সম্মানে এমন উতোলা ভাব দেখিয়েছে, কেউ বলতে পারবে না।

টুকিটাকি কাজ ত মেলা।

জারু মিয়া মাদ্‌বরের বৌর সঙ্গে মুরগি ছাড়াতে বসে গিয়েছিল। মনা ত সকলের নফর। তার আদৌ বিশ্রাম নেই। তবে সে মনে মনে খুব খুশি। বার বার তা-কে সদরে যেতে হয় না। মিলিটারি দেখার শখ তার মিটে গেছে। সব চেয়ে নিরাসক্ত সয়ীদ মাদবর। দহলিজের ভেতর একা একা বসে তার ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। মনের সুখে সে খোঁয়ারিতে ঢুলুঢুলু কিন্তু সর্ব ইন্দ্রিয় জাগ্রত। কেউ ডাক দিলে সাড়া পাবে তখনই।

দুই সৈনিক প্রথমে ঈষৎ থতমত খেয়ে যায়। বিলাতি আরক তাদের ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়নি।

ফৈয়াজ মুখপাতের দইয়ের মত মৃদু কণ্ঠস্বরে বললে, "হাজি-সাব বেয়াদবি মাফ কিজিয়েগা।"

"আপ্‌কা এজাজৎ নেহী লিয়া। আপনার অনুমতি নিইনি। মাফ কিজিয়েগা। বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে।" বন্ধুর দোহার হয়ে উঠল মেজর হাকিম। খালি চেয়ারখানা সে মৃধার দিকে এগিয়ে দিলে।

মানুষের মুখে, বাতাসে তখন ভুরভুর সোমরসের গন্ধ। কিন্তু হাজির নাকে যেন কিছু যায়নি।

মৃধা নির্বিকার কাণ্ঠে বললে, "বেয়াদবি কাঁহা?"

"ইয়ে—," বোতলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল ফৈয়াজ।

হেসে উঠল মৃধা এবং বললে, "পিনে কা চিজ। আদৎ পড় যাতা। আপ্‌লোগ লড়াই কা কাম করতে। কেৎনা ঝুঁকি। মেরা ছোট ভাই ভি পীতা, পান করে।"

— ও কাঁহা।

— শহর মে।

— আপ ভী থোড়া শওক কিজিয়ে।

— নেহি।

মৃধা মুখ কাচুমাচু এবং পরে যোগ করলে, "ইয়ে উমর মে নেহি। আপ্‌লোগ কা তরেহ জোয়ান রহ্‌তা তো আলবৎ পিলেতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের মত জোয়ান থাকলে কোন আপত্তি করতাম না। এখনই খেয়ে নিতাম। মৃধা বড় সহজ গলায় কথাগুলো বললে। মনে হবে, অতি সংস্কার-মুক্ত মন।

মেজর হাকিম বা ক্যাপ্টেনের দ্বিধায় এসব বিচারের কোন বালাই ছিল না। রাজার সিংহাসন কি অমাত্যবর্গের বাৎকর্মে আন্দোলিত হয়? বাংলাদেশের বিধাতাদের সে-বিষয়ে অতি সচেতন থাকা আশ্চর্য কিছু নয়।

কিন্তু মৃধা তুখোড় লোক। তার সঙ্গ এখানে বেমানান। তাই ছুতো করে উঠে গেল। অন্দরে তাড়া না দিলে দেরি হয়ে যাবে। এই যুক্তি শুনে ফৈয়াজ আপত্তি তুলতে গিয়েও থেমে গেল।

এসব এলাকা শান্ত। কিন্তু বাঙালিদের বোঝা দায়। হাকিম যে-প্রশ্ন তুলছে তা একদম উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাই ফৈয়াজ ক্যাপ্টেন বরং আরো এক্তেলা দিতে চোখালো এবং ধারালো করেই বলেছিল, "হ্যাঁ, হাজি আপ্‌কা লাড়কি কো জারা জল্‌দি করনে কহিয়ে।"

পানিতে ডুবলে ডাঙা আরো চাক্ষুসে স্পষ্ট দেখা যায়। হাকিমের কথাগুলো ক্যাপ্টেন ফৈয়াজের মনে আন্দোলিত হতে লাগল।

মৌতাত জমে উঠেছিল।

ফৈয়াজ স্মৃতিচারণা শুরু করলে। সে মন্টগোমারি জেলার অধিবাসী। কিন্তু পাঞ্জাবের হৃদপিণ্ড লাহোর। সুতরাং স্কুল-কলেজ জীবন সবই সেই শহরে। হাকিম এক বছরের সিনিয়ার। চাকরিতেও তথৈবচ। হস্টেলে আলাপ। দুই জনে অতীত স্মৃতিমন্থন করতে লাগল। চাপ্‌লী আর তিক্কা কাবাবের কথা প্রসঙ্গে দাউ দাউ হয়ে উঠল স্বদেশের জন্যে উভয়ের মনপোড়ানি। মুশায়েরার হুল্লোড় কানে বার বার ধাক্কা দিতে থাকে। আহমদ নাদিম কাশেমী গজল শোনাচ্ছে। কবি কথা-শিল্পী কাশেমী-জিস্‌নে আরশ কো ফারস্‌ বানায়া— যিনি আরশকে মাদুর বানিয়ে উপভোগের থালা সাজিয়ে দিতে সক্ষম।

দুইজন গুন্‌গুন্‌ করতে লাগল। বাক্যালাপ বন্ধ।

জওয়ানেরা কয়েকজন হাই তুলে তুলে শেষে কিছু ঘুম নিয়ে নিচ্ছে। অফিসারদের তামাসা তাদের কাছে নতুন কিছু নয়। বোতলের ছায়া লম্বা হয়ে উঠানের উপর পড়েছে সমস্ত জওয়ানদের দিকে। হুইস্কিয় গন্ধ তাদের দিকে যাচ্ছে বৈকি। করার কিছু নেই। হাজার হোক অফিসার। তাদের সাত খুন মাপ। তবে দু'একজন জওয়ান খুব অবাক হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ মৌতাতে ঢলে পড়ে এমন শান্ত আছে কী ভাবে। অফিসার মেসে তার সুনাম আছে। হার্ড ড্রিংকার, বিগ চ্যাটারবক্স। অবিশ্যি আর একজনের বাড়িতে তারা মেহমান। তাই সৌজন্য বা ভদ্রতার লাগাম হয়ত সকলের মুখে। সবই মাত্রার মধ্যে রাখতে হচ্ছে। খাওয়া সারা হলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। এখানে গৃহস্বামী এবং জোয়ানদের চিন্তা একই খাতে প্রবাহিত। কিন্তু অফিসারদ্বয় উক্ত দুই শ্রেণীচ্যুত। কাজেই আহারের কথা মনে ওঠে নি। মৌতাতে বিবাগী মন কামানের আওয়াজে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে-নীত ঘোড়ার মত চমকে উঠেছে, এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে। স্থিরতা সহজে রপ্ত হয় না।

ফৈয়াজ বুঁদ। চুপচাপ। অতি শান্ত নাগরিক। সে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে বেশ। কিন্তু চার-পাঁচ মিনিট পর-পর। ঢিমা লয়। নদী যেন সমুদ্রের মোহনায় উপনীত।

সয়ীদ মাদবর কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে উঠল। সামনে উঠানে অফিসারেরা মদ খাচ্ছে। এই দৃশ্য সে মনের সঙ্গে মেলাতে পারছিল না। হাজার হোক পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। সেখানে প্রকাশ্যে এমন বে-শরা কাজ ভাল নয়। তবে মুসলমানদের রাষ্ট্র। আল্লার নিয়ামৎ বা নিজস্ব অবদান। সবই তার ইচ্ছায় চলে। তার মতো আ'ম আদ্‌মি এসব বিচারের অনুপযুক্ত। অফিসারদের আচরণের ভার তার নয়। মক্কা-ফেরৎ হাজি সাহেব তাদের সঙ্গে বসে বসে কতো কথা বললে। টেনে দেখেছে নাকি এক আধ চুমুক? আল্লা মালুম। আজ প্রথম প্রহরেই আবার মাদবরের খিদে লেগে গিয়েছিল। বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে আগে জানা থাকলে অবিশ্যি অনেক সময় পেট চন্‌চনিয়ে ওঠে। কল্পনার শক্তি অসীম। মাদ্‌বর অন্দরে চলে যেতে পারত। সেখানে আবার হাঙ্গামা জোটে বলা যায় না। হাজি সাহেব ফরমাস করতে তা পালন অপরিহার্য। তার চেয়ে এখানে চুপচাপ থাকাই ভাল। সবুরে মেওয়া ফলে। আল্লা ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। কেতাবের কথা মাদবরের মনে পড়ে। কিন্তু আসীন দুই অফিসার আবার উঠে পড়ল কেন? আলোয় বোতল এবং গ্লাস দু'টো বড় ঝলমল করছে। দেখা যাক, অফিসারদের কী অভিপ্রায়।

হঠাৎ হাকিম উঠে পড়ল। তার পর হাতের গ্লাস দুলিয়ে আরোপিত সুরে আবৃত্তি করতে লাগল :

তেরী তিরছি নজর সে হামে ডর কিয়া?
মোহাব্বাত কী তো দীল কিয়া জিগর কিয়া?
তোমার বাঁকা নয়নে আমার ভয় কী
প্রেম করেছি যখন— দীলই কী, হৃদপিণ্ডই কী?

AMARBOI.COM

ফৈয়াজের আত্মমগ্নতা যেন সেই মুহূর্তে চুরমার। সে বাহ্ বাহ্ ধ্বনিসহ সঙ্গীর পিঠে এক হাতে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে গ্লাসে এক চুমুক মেরে নিমেষে দোহার ব'নে গেল :

তেরী তিরছি নজর সে মেরা ডর কিয়া?

একদম যুগল-বন্দেশ। গায়ক এবং দোহার এক কণ্ঠে মিশে যাচ্ছে। তার জের ছিঁড়লে প্রথমে ফৈয়াজ। সে গান করে এগিয়ে গেল জওয়ানদের দিকে। অফিসার অকুস্থলে। যারা হেলান দিয়ে শুয়ে ছিল বা তন্দ্রাভোগ-মত্ত তারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। এখনই কোন অর্ডার হয়ত হেঁকে বসবে। তবে হাতে গ্লাস আছে, রক্ষা।

হাকিম তখনও গলায় 'জিগর' নিয়ে মশ্‌গুল। গ্লাস থেকে শরাব একটু ছলকে পড়ে গেল তাল রাখার সময়। তা ফৈয়াজের চোখে পড়েনি। নচেৎ এমন অপচয়ের জন্যে বেশ বচসা হত।

ফৈয়াজ একদম মিটিঙের কায়দায় সম্বোধন করলে, "ভাইয়ো—।"

ভ্রাতৃবৃন্দ তখন একদম এ্যাটেন্‌শান কায়দায় একটি মাত্র বস্তুপিণ্ডে পরিণত। সকলের চোখ ক্যাপ্টেনেব মুখের উপর। অফিসারের নেশা-ছলো-ছালো দৃষ্টি তুলি-টানার মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিক থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছায়।

· এক ঢোক শরাব টেনে ফৈয়াজ বললে, "ভাইয়ো, আল্ হামদোলিল্লাহ্ গড হ্যাজ সেভ্ড পাকিস্তান। আল্লা নে পাকিস্তান কো বাঁচা দিয়া। একি খুশি মে হাম গানা গাতে।"

জওয়ানেরা হাততালি দিয়ে উঠল।

অফিসার এই ব্যাঘাত পছন্দ করেনি। তা চোখ দেখে বুঝা গেল।

আবার আরম্ভ করলে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ, "স্রেফ গানা সে নেহি হোগা। নাচ ভি থোড়া হোনা চাহিয়ে। কুই খটক নাচ্ নাচ্‌নেওয়ালা বাহাদুর তোম লোগ্‌কা আন্দর হ্যায়? তোমাদের মধ্যে খটক-নৃত্য অভিজ্ঞ কেউ আছে?"

দেখা গেল, এই নাচে সব জওয়ানেরা পারদর্শী, যদিচ সকলে পাঠান নয়।

আসর জমে উঠল নিমেষে।

দুই অফিসার হাততালি-যোগে তাল ঠিক রাখতে লাগল অন্যান্য জওয়ানদের সঙ্গে।

৭

বুড়িবিবির দৃষ্টিশক্তি গেছে। কিন্তু কান তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে সেই অনুপাতে ঢের বেশি। শুধু শব্দের সাহায্যেই তিনি দৈনন্দিনতা বা বাইরের জগতের খবর পান। অবিশ্যি তাঁর কৌতূহল সব সময় সজাগ থাকে না। নিজের চিন্তার খেই তাঁকে টেনে নিয়ে যায়। এ যেন চার-পাঁচটা রাস্তাবিশিষ্ট মোড়ে এসে কোন্ দিকে যাব ঠিক করা। গন্তব্য নির্দিষ্ট থাকলে অবিশ্যি সমস্যার সমাধান সহজ। কিন্তু এক দিকে গেলেই সারে— এমন পরিস্থিতি, তখন পথিকের পক্ষে সবকিছু জটিল হয়ে ওঠে। মোড় তখন ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে এবং পথচারী তা হারিয়ে ফেলে। বুড়িবিবির তেমনই দুর্দশা ঘটে। তখন কুলসমের সান্নিধ্য তাঁর কাছে সব চেয়ে আরামদায়ক। মৃধাবৌ কাজে ব্যস্ত থাকে। নাত্‌নিরা শহরে ন' মাস। কুলসুমই মেয়ের মত তাঁর খেদমতে নিবিষ্ট। বহুদিনের সাহচর্যে অনাত্মীয়তার বেড়া বহু আগে ভাঙা। বুড়িবিবির মনে হয়, তার একমাত্র সন্তান মখ্‌দুমের কোলেই যেন কন্যা কুলসম জন্মেছিল। নিজের মনের গোপন বাসনা-কামনা সে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে কুলসমের কাছে। বেটা আখেরে বেটা ছেলে। তার নানা কাজ থাকে। সে মার আঁচল-চাপা বালক বনে যেতে পারে না। তাই মনের কাছে শেষ পর্যন্ত কুলসমই টিকে ছিল।

বুড়িবিবি টের পান রান্নাঘর-জাত শব্দ ও গন্ধ থেকে। বহুজন সেখানে ব্যস্ত। মিলিটারিদের আহারের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাও তাঁর জানা। কিন্তু কুলসম এত দেরি করছে কেন? সন্ধ্যায় একটু ঘুম হয়ে গেলে সারা রাত তাঁর আকাশ-পাতাল বিচরণ। কুলসম জেগে থাকলে কথায় কথায় সময় যায়। অনেক সময় মেহনত হয় বেশি, কুলসুম ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে, তার নাকও ডাকে। তার জন্যে বিরক্ত হন বুড়িবিবি। নিজের মনেই স্বগতোক্তি করেন, "আহা কী নসিব! স্বামী নাই, পোলা নাই। দুনিয়ার কোন সুখই পাইল না। আমি বাদ ওর কী অইব আল্লা মালুম। কইয়া যামু মখুরে, অর যেন কোন কষ্ট না অয়। আহা, বেচারা!" নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে আরো

দুঃখিত হন বুড়িবিবি। কুলসমের কিছুই নেই। মানুষে সম্পর্ক না থাকলে আর কিসের খামখা বাঁচা? বুড়া বয়সে এই নির্মম সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। বিজয় বসুর মার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। কুলসমের কাছে অতীতের এক কাহিনী কতবার না তিনি বলেছেন। দরদী শ্রোতা কুলসম। হাজার শোনা থাকলেও কুলসম বুড়িবিবির স্মৃতির মৌচাক খুঁচিয়ে বসে আবার শোনার জন্যে।

সময়ের পরিমাপও বুড়িবিবি প্রায়ই ভুল করে বসেন। কুলসম এলো না দেখে তিনি দুবার বেশ জোরে হাঁক দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ জবাব দেয়নি। তিনি প্রায়ই কাউকে ডাকেন না এই সময়। প্রয়োজন কোথায়? আজ বুড়িবিবি বেশ মনক্ষুণ্ন হন। অথচ তাঁর মানাভিমানের পালা বহু আগেই সমাপ্ত। "নিঃশ্বাস বয়, হের তরে কই বাঁইচ্যা আছি। নচেৎ কহন টুক কইরা যামু কেউ জানব না।" বুড়িবিবির এই কথা কুলসমকে প্রায় শুনতে হয়। অবিশ্যি শ্রোত্রী তখন কৃত্রিম রাগ করে এবং বলে, "মা আপনের আগে আমি দুনিয়াথন যাই হেই দোয়া করেন।" সেই স্বল্প মুহূর্তে বুড়িবিবির কিছু ভাবপ্রবণতা দেখা যায়। কুলসমের মাথায় হাত রেখে নিজেই বলেন, 'অবাগী আর কস্ না। মুখে লইস না এসব কথা।" বুড়িবিবির মানাভিমান অমন দুচার মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

এক ঘুমের পর বৃদ্ধ কর্ত্রী উসখুস করেছিলেন বিছানার উপর। কুলসমের বিছানা শূন্য। সব অসোয়াস্তির উৎস ওই জায়গাটুকু। দুবার ডাক দিয়ে কোন সাড়া পাননি। বুড়িবিবি তাই চুপ করে থাকেন।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজে বৃদ্ধা কান খাড়া করেন। কিছু তাকে অনুমানে বুঝতে হয় না কানের কাছে মুখ ফিস্‌ফিস করে ওঠে।

— মা, দশ বারো জন মিলিটারি। হেরা চা খাইছে। ফের ফোলাউ খাইবো।

— কী কস্?

— মিলিটারিরা রাইতে খাইব। হে ত জানেন। তাই পাক করি।

— হে ত জানি। একবার আইলে পারতি। বালমতি খিলাইস। মানুষের সুবাদ আওনে যাওনে। বাঘের প্যাড ভরা থাইকলে মানুষের নিরাপদ।

— হে কওয়া লাইগব না, মা। মৃধাসাব বুবুরা খুব বা'লা পাক করতাছে। আপনের তরে পোলাউ আনমু?

— না রে বেডি আমার সইত না। কাল বিয়ানে দেখা যাইব, কুলসম।

— মা।

— তুই যা।

ওদিকে মৃধা হাঁকাহাকি ফেলে দিয়েছে : কুলসম, কুলসম।

বুড়িবিবির কানেই প্রথম ডাক পৌঁচেছিল।

— আহি, মা। আবার ফাঁকা পাইলে আইমু।

কুলসম কথাটা বলে ফেললে, বুড়িবিবি হাতড়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, "একটু র"। তার পর বিড়বিড় করে দুরুদ পড়লেন এবং কুলসমের গায়ে ফুঁক দিলেন তিনবার। শেষে আবার উচ্চারণ করলেন, "মা কুলসম, একবার সাহেলী চামেলী বুবুদের আইতা কস।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— ক্যান, মা?

— তাগের গায়ে ফুঁক দিয়া দিমু। আল্লার কালাম বালা মসিবত দূর করে।

কুলসুম কর্মস্থলে এসে রিপোর্ট দেওয়ামাত্র সাহেলী হেসে উঠল। সে তখন ডেগ্চিতে চাল ঘি দিয়ে ভুনছিল। এবং অল্প অল্প পানী ঢালছিল। কুলসমের দিকে তাকিয়ে সে বললে, "আমু দাদিবিবির কাছে। অহ্ন না। খালি ভয় পায়, বুড়া মানুষ কিনা।"

চামেলী অনুমতি চাইলে নিজের হাতের কাজ বন্ধ করে। সে সরু-সরু পিয়াজ কুঁচোতে ব্যস্ত।

— আরে চামেলী, তুইও দাদিবিবির মত। অহ্ন কাম কর। কাম কইরা যামু। দাদির দোয়া বড় কাজে লাগে।

— আমি নিয়া আহি।

— না। কাম করে মেহমানরা যাক গিয়া। তার বাদে যামু।

ঘিয়ের গন্ধে ঘরদোর মেতে উঠেছিল। পাশাপাশি দুটো চুলো জ্বালা হয়েছে। আসেমা বিবি একটা উঠান-চুলায় নারিকেলের দুধ তৈরি করছিল। শেষ পর্যন্ত ভোজ্য-তালিকা তিন পদে ঠেকেছে। বিরিয়ানি। সামান্য ঝাল গোস্ত। নারিকেলের দুধ দিয়ে ডিমের 'কারী'। আর সালাদ। তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। উঠানের এক পাশে প্রচুর টম্যাটো বা 'বিলাতি বাইগন' ফলেছিল। তখন শেষ কিস্তি। তবু সের খানেক পাওয়া গেল সব গাছ টুঁড়ে। ঘরে চাট্নি আছে দু'তিন রকমের। বুড়িবিবি মাঝে মাঝে চেয়ে বসেন। বৃদ্ধকালে মুখের স্বাদ চলে যায়, আহারে রুচি থাকে না। তাই চাট্নির খোঁজ করেন। এবার আম ফলেছিল মন্দ না। তার দু রকমের চাটনি আছে। একটা গুড় দিয়ে তৈরি। অপরটা বেলের। মৃধা আফশোস করে, প্রতি বছর কিছু কাসুন্দি তৈরি হয়। অবিশ্যি মুসলমান পাড়ায় নয়। গ্রামে এক ঘর কৈবর্ত ছিল। তারাই কাসুন্দি তৈরি করত। এবার বছরের প্রথম থেকে গোলমাল দেখে দেখে তারা কোথায় যেন চলে গেছে। তাই কাসুন্দি পরিবেশন করা যাবে না। পশ্চিমা জিভের স্বাদ বদ্লানো সহজ ছিল। বার বার অনুতপ্ত হয় মৃধা মনে মনে। সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। মুসলমানদের তৈরি আবার মিষ্টি নাকি? বাজার হাট আর আগের অবস্থায় নেই। সাহেলী নারিকেলের হালুয়া তৈরির বন্দোবস্ত করেছিল। মোটামুটি অতিথি আপ্যায়ন একদম খারাপ হবে না। পাড়াগাঁ, আর কী-বা করা যায়। সাধ্য আছে, কিন্তু উপাচারের শত অভাব। মৃধার আরো আফশোস, একটু বেলাবেলি এলে অতিথিতের ডাব খাইয়ে দিত। তার বাড়ির দক্ষিণে পুকুর পাড়ে সোনামুখী নারিকেলের গাছ আছে। তার ডাবের জল এত মিষ্টি যে চিনিগোলা পানি বললে কেউ সন্দেহ করবে না।

সাহেলীর আরো ইচ্ছা ছিল, টেবিল সাজিয়ে দেবে সে। কিন্তু আর বেশি দূরে এগোয়নি। কারণ, ফুল পাওয়া যায় না। তাই পিতৃদেবের কাছে বলতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে নিয়েছিল।

উঠানে মৃধা চৌকির উপর বসা। আর বাইরে যায়নি। বোতল দিয়ে যে-কোন সঙ্গীর অভাব মেটানো যায়। সুতরাং মেহমানদের ক্লান্তি আসলে বাক্যালাপ চালু না থাকলে, এমন আশঙ্কা অমূলক। আর মৃধা কান খোলা রেখেছিল। খটক নৃত্যের হাততালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং যৌথ হৈ-হৈ রব তাদের কানে পৌঁছাচ্ছিল। সাহেলী কখনও অমন নাচ দেখেনি। মনার মুখে শুনে তার বেশ লোভ জেগেছিল। কিন্তু শত হাতে তখন সে ব্যস্ত। এদিকে মনা বেশ চতুর। অন্দরের এক পাশ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সে সৈন্যদের জগঝম্প-নৃত্য দেখছিল আর হেসেছিল। হ্যাজাকের আলোয় লম্বা চওড়া সিপাইদের ছায়া সারা উঠানময়। নানা দীর্ঘ তার চলমান ছিল, যেন সিনেমার ছবি। মনার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে আরো অবাক হয়েছিল দুই অফিসারকে হেলেদুলে হাততালি দিতে দেখে। আর একজন চোরা দর্শক ছিল সয়ীদ মাদবর। সে সোজা উঠানে নেমে চেয়ারে বসে বসে নাচ দেখতে পারত। কিন্তু তার সাহসে কুলায়নি। দুই অফিসার শরাব পান করছিল। মাদবরের কাছে আদৌ ভাল লাগেনি। কিন্তু সে ফালতু ব্যক্তি এই মজলিসে। বলার কিছু নেই। তার জানা ছিল, শরাবের বোতলের দাম অনেক। কেন যে শরিফ লোকেরা অত পয়সা খরচ করে অপ্রকৃতস্থ হওয়ার জন্যে, তা মাদবরের বোধগম্যের বাইরে। নাচ শুরু হতে তার মতবাদ কিছু ফিকে হয়ে গিয়েছিল। হয়ত আনন্দের জন্যেই লোক ওই হারাম পান করে। সঙ্গে খিদের প্রকোপ থাকায় সয়ীদ মাদবর বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণের বাতাসে ঘিয়ের গন্ধ দহলিজ পর্যন্ত ছুটে আসে। মাদবর ধৈর্য ধরে বহু তক্‌লীফ সহ। একা একা চুপচাপ বসে থাকা কম নির্যাতন নয়। মাদবর উস্‌খুস করতে লাগল।

কিন্তু খটক নৃত্য খুব জম্‌জমাট তুরীয় পর্যায়ে। যৌথ কণ্ঠসঙ্গীতে বাতাস মুখরিত। একজন জওয়ান স্টেনগান হাতে ঠিক পাহারা দিচ্ছিল। সেদিকে কোন গাফিলতি নেই। সবাই অবিশ্যি নিশ্চিত। নচেৎ এমন পরিবেশ গড়ে ওঠে কী ভাবে?

মেজর এবং ক্যাপ্টেন তখন আনন্দ-উপভোগে মত্ত। তবু ফৈয়াজের ঝাপসা মনে হয়েছিল, ঢাকা হেডকোয়ার্টার থেকে যদি কোন জেনারেল পথ অতিক্রমের সময় তাদের হেন হালৎ দেখে তাহলে সবগুলোকে কোর্ট মার্শাল করে ছাড়বে।

হাকিমের পা টল্‌ছিল। সে ভাবলে ফৈয়াজ খুব 'হাই' (উঁচু) হয়ে গেছে। নীট না খেলেও পারত। এখনও দু'পেগ বোতলে রেখে দিয়েছে। কারণ, ডিনারের পর আজ ত ব্র্যান্ডি পাওয়া যাবে না। কাজেই হুইস্কি দিয়ে কাজ সারতে হবে।

৮

একদম আল্‌পিন-পাতনিক নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরল গোটা অকুস্থলে যখন মৃধা এসে নাতিউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলে, "কর্নেল সাব, খানা রেডি।"

প্রতীক্ষার ইতি ঘটল।

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠল একটু পরে, "বহুৎ আচ্ছি।" কন্ডাক্‌টারের ছড়ির মত তার হাত উপর থেকে দ্রুত নিচে নামিয়ে আরো সে যোগ করলে "খামুশ, স্টপ্।"

কিন্তু তার ঈষৎ আগেই সব থেমে গেছে। নৃত্য এবং কোলাহল।

জওয়ানেরা বেশ ঘেমে গিয়েছিল পদ-চালনা তথা অঙ্গ-চালনার সাথে। তারা একটু জিরিয়ে নিতে চায়। কারো কারো হাতে মুখে জল দেওয়া দরকার। মনা বালতি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি এনে রেখেছিল। সবাই হাতমুখ ধুতে লাগল।

মৃধার সমস্যা ছিল।

কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের সে খামখা আল্লার ফেরেশতা বলে না। যেন মানুষের মনের কথা তাদের আগে থেকেই জানা থাকে।

সমস্যা অসাধারণ কিছু নয়। খাবার প্লেট আছে যথেষ্ট। কিন্তু অত টেবিল ত নেই। অফিসারেরা যদি তাদের সঙ্গে খেতে রাজি না হয়? অথবা ঐ জাতীয় কোন বাধা থাকে? একটা বড় টেবিলে সব সাজিয়ে দেওয়া যায়। শহরে বলে বুফে বা খাড়া খানা। ঢাকায় ভায়ের এক পার্টিতে মৃধা শরিক হয়েছিল, সেখানে অমন বন্দোবস্ত দেখেছে। কিন্তু এখানে সম্মানিতরা কিসে খুশি হবে জানা নেই। গৃহস্বামীর মূল লক্ষ্য থাকা উচিত, মেহমানদের পছন্দ না-পছন্দের উপর। সুতরাং সমস্যা ছিল।

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ মৃধাকে বললেন, "হাজিসাব, পিক্‌নিক কা তরেহ হোনা চাহিয়ে। সব বনভোজনের মত হওয়া উচিত। আপ্ এহি খুল্লা আস্‌মান কা নিচে খানা দে সাক্‌তে। ইয়ে দারাখ্‌ৎ (গাছ) কি খুশ্‌নামা..." শেষের দিকে তার জিভ জড়িয়ে আসছিল, বোঝা যায়।

মৃধা যেন ওঁৎ পেতে বসেছিল। সে ত তা-ই চায়। কখন থেকে মনের ভেতর ঘুরঘুর করছিল। সব মুশ্‌কিল আসান হয়ে গেল।

জবাব দিলে মৃধা, 'আলবৎ। কিউ নেহি। আপকা যো মর্জি।"

হ্যাজাক ল্যাম্পে পাম্প কমে গিয়েছিল। সে নিজেই চলে গেল দু'তিন মিনিট বাতাস দিতে। তারপর আহার্য এন্তেজামে লেগে পড়ল।

সাহেলী ওদিকে অন্নপূর্ণা।

সে সব ঠিক করে রেখেছিল। এখন কেবল বয়ে নিয়ে যাওয়া। মৃধার হুকুমে দহলিজের বড় টেবিল প্রাঙ্গণে সঙ্গে সঙ্গে নীত। জারুমিয়া, মৃধা, মাদবরের সঙ্গে হাত লাগালে আরো দুই জওয়ান। মনা একটা সাদা চাদর বিছিয়ে নেয় তখনই, সাহেলী পাঠিয়েছিল।

এদিকে ইন্তেজাম পাক্কা।

আসল ইন্তেজাম যা এসে পৌঁছতে বাকি। সেখানে এমন ভারি ত কিছু নেই। দশ বারো জন লোক। তবু সাহেলী তিনটে ডিশে বিরিয়ানি সাজিয়ে দিয়েছে। কারী-ডিশের সংখ্যাও তিন। দহলিজের পেছনে কুলসম পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে টুকিটাকি বয়ে দিতে। মৃধা বুড়া মানুষ। কিন্তু তারও উদ্যম কম নয়। জারুমিয়া ত একাই একশ'। শুধু সময়ের তাড়া আছে বলে সবাইকে হাত লাগাতে হচ্ছে। নচেৎ সে একাই এসব করতে পারে। তা-ই করতে হত। মৃধা সাব এমন বওয়া-ঢওয়ায় কোনকালে গতর নড়িয়েছে তার জানা নেই।

দশ লাগে, ভূত ভাগে। ব্যাপারটা তেমনই দাঁড়ালো। মন্দ নয় আহার্য সংখ্যা। তার উপর, সালাদ ছাড়া চাটনিই জুটে গেল চার রকম। আমলকির চাটনি বানিয়েছিল নিজের জন্যে মৃধা গিন্নী। মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে খাওয়া একটু এদিক ওদিক হলে। আজ কর্তার প্রস্তাবনা ছাড়াই বের করে দিয়েছিল। এমন শরিফ সম্মানিত অতিথি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে! তাদের আপ্যায়নেই যাওয়া উচিত অমন জিনিস। এখন হয়ত আমলকি আর বাজারে উঠবে না। আরো এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। তা হোক। এমন মেহমান ত আর রোজ বাড়িতে উৎপাত করতে আসবে না। কালেভদ্রে কিছু কষ্ট সওয়ার ক্ষমতা না থাকলে আর মানুষ কিসের?

এক এক করে সব জিনিস টেবিলে মোতায়েন।

এখন অক্ষুধার্তের চোখেও মোহনীয় লাগবে। গরম গরম বিরিয়ানি। ভাপ উড়ছে। যেন শীতের সকালে কুয়াশা বাতাসের দোলা খেয়ে খেয়ে ঊর্ধগামী। ডিমের কারী ডিশ উপছে উঠছে। ক্রমে ক্রমে উঠেছে বৃত্তাকার নক্শা। হলুদ রঙ। তার উপর নারিকেলের দুধের আল্পনা। যেন হলুদ ব্লাউসের উপর নাইলনের শাড়ি চাপা দেওয়া। একটা ডিশে কয়েকটা মুরগির ঠ্যাং আড়াআড়ি রাখা। বিজলী কোম্পানি মাথার খুলি আর নলী হাড়ের ছবিসহ যেমন লিখে রাখে ৮৮০ ভোল্ট, দু'টো ঠ্যাং তেমনই বিপদের স্মারক মনে হতে পারে। অবিশ্যি পেটুকের জন্যে অমন নোটিশ থাকা ভাল। কিন্তু এখানে খাবার পর্যাপ্ত নয়। সব তাগ্ড়া ফৌজী মানুষ। মুরগির ঠ্যাং এখানে আর কী ভয় দেখাবে? এক পাশে থরে থরে চীনামাটির প্লেট সাজানো। হ্যাজাক লাইটের থাবা নকশা ও রঙ আরো বদলে দিয়েছে। ছোট ছোট পিরিচে চাট্নি। আমের বাখড়ার পাশে ছোট চামচ রাখা। যেন নৌকার পাশে হাল। অভাব ছিল শুধু ফুলদানির। তার জন্যে সাহেলী বহুৎ আফ্শোস করেছে। টেবিল সাজানোর ভার আর জিনিসপত্র থাকলে সে তাক লাগিয়ে দিতে পারত। রুচি আসলে ভেতরের ব্যাপার। টাকা পয়সাওয়ালারা অনুকরণে কিছু কিছু শেখে। কিন্তু রুচি আসলে ব্যক্তিত্ব। তা অর্জন করতে হয়। সাহেলী চাচির কাছে তালিম নিয়েছিল ঠিক। কিন্তু কল্পনা এবং ক্ষিপ্রগতি, কোন জিনিস সাজিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তার নিজস্ব শক্তি ছিল, যা ভেতর থেকে পাওয়া। চামেলী এদিকে বেশ শ্লথ। ঢিলেঢালা থাকার মধ্যে সে আরাম পায়। অত হৈ-চৈ পছন্দ করে না। সাহেলীর অনুতাপ অকৃত্রিম। সত্যি সে টেবিল সাজিয়ে দিলে আবহাওয়ার রওনক আরো ঝিলমিল খেত। টম্যাটোর সালাদ সে ইচ্ছামত সাজাতে পারেনি। নানা রঙের কাঁচা লঙ্কা প্রয়োজন ছিল বোঁটা সুদ্ধ। একটা খাড়া করে দেওয়া, যেন ল্যান্ড্স্কেপের মধ্যে কোন নিঃসঙ্গ রঙিন তরু। তার সঙ্গে বর্ণলীলা। একরঙা সবুজ কয়েকটা লঙ্কা ছিল উঠানের গাছে। তবু ইজ্জৎ রক্ষা।

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ প্লেট হাতে টেবিলের একপ্রান্ত থেকে দৃষ্টি চালিয়ে দিলে। তারপর ভাবগদ্গদ চিত্তের প্রবাহে বলে উঠল, "কিয়া মোন্জের কী দৃশ্য! ইয়ে মাশ্রেকী পাকিস্তান হ্যায়। দেখো জৈসা সব্জা মির্চা। যেন সবুজ মরিচ।"

সে ঝালের কথা উল্লেখ করল না।

মেজর হাকিম তার গায়ে ঠেলা দিয়ে সর্তকতা ছাড়লে, "আরে আওর দেরি হো যায়েগা। শায়েরী বন্দ করনা, ইয়ার।"

অতঃপর আহার পর্ব।

জওয়ানেরা মেসে অধিকাংশ ডাল রুটি খায়। ঘিয়ের গন্ধ তাদের আরো ক্ষুধার্ত করে তুলেছিল। অফিসার সামনে না থাকলে, হুড়মুড় তারা ভেঙ্গে পড়ত টেবিলের উপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটে সবাই খানা তুলে নিচ্ছে।

মৃধা প্রথমে শরিক হতে চায়নি। কিন্তু মেজর নিজে তার হাতে প্লেট তুলে দিলে। মাদবরের দিকে নজরের কোন প্রয়োজন নেই। সে নীরব কর্মী। গরম বিরিয়ানি। সঙ্গে মুরগি। যেন সোনায় সোহাগা। লাল্‌চে হলুদ এক রকম রঙ খুলেছিল মাংসের গায়ে গায়ে। মেজর-ক্যাপ্টেন তা নিয়ে শিল্পের সমঝ্‌দার হয়ে উঠেছিল কয়েকবার। কিয়া খুবসুরাৎ বাহার। তারপর বাহার মুখের গর্তে।

হাজি সাহেবের তারিফে দু'জনে পঞ্চমুখ। কিন্তু সে কেবল মেয়ের উপর সকল প্রশংসা চাপিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ তাই বললে, "আপ্‌ বহুৎ খোশ্‌-নসিব। আপকে এ্যায়সা লাড়কি খোদা নে দিয়া।"

আকাশের দিকে ইশারা উর্ধে মুখ তুলে মৃধা জবাব দিলে, "সাব উন্‌কা মর্জি।"

"ও বাৎ সহী (ঠিক)" মেজর হাকিম সমর্থন দিলে।

মাদবর আহার ঠিক উপভোগ করছিল না। বার বার তার মনে হচ্ছিল, সে যেন এখানে খাপ খায় না। তবু মৃধার কাছে থাকা, কথা বলার সুযোগ হয় না বেচারার। এইবার মৌকা পেয়ে গেল। অন্ততঃ তা-ই অনুমান করা যায়। তাই মেজর হাকিমের পরই সে মুখ খুললে, "সব খোদা কা মর্জি। আপ মেরা মুসলমান ভাই থে। দেড় হাজার মাইল দূর রহ্‌নেওয়ালে। আগার পাকিস্তান না হোতে আপ্‌সে কভি নেহি মোলকাৎ হোতা।"

শেষের দিকে বড় আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করে বসে সয়ীদ মাদবর। কিন্তু তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ তখন একটা সিনার হাড় চিবোচ্ছিল। সে এক দিকে তা ঠেলে কী যেন বলতে গেল, কিন্তু জিভ বাধা দিলে। মাদবর নিজের কাজে মনোযোগী হয়, কারো দিকে তাকায় না।

মেজর হাকিম আমলকির চাট্‌নী জিভে দিয়ে এমন স্বাদ পাচ্ছিল যে সে শুধু সমর্থনের দৃষ্টিতে মাদবরের দিকে তাকালো। মৃধার প্লেট হাতে। তেমন খাওয়ার দিকে মন ছিল না। কিন্তু জওয়ানেরা প্লেট ভরে নিয়ে গাছতলার দিকে চলে যায় আধো আলো আধো অন্ধকারে। তারপর ফিরে আসে। কিন্তু ঘি, খুব খাঁটি থাকার ফলে, মুখ মেরে আনছিল দ্রুত। কাজেই কোন যোদ্ধাই আর বেশি এগোতে পারছিল না।

মেহমানদের আহার বাবদ অন্তত আধ ঘণ্টা যাবে। সাহেলী এই হিসাব কষে, ফাঁকটুকু সদ্ব্যবহারে অন্য একদম পুকুর-ঘাটে পৌছেছিল। সারাটা বিকেল থেকে ঝামেলা। ঘামে শরীর জবজবে। ব্লাউস ভিজে এমন হয়েছে স্তনের উঁকি বন্ধ করা কঠিন। একই অবস্থা চামেলীর। তাই তারা তাড়তাড়ি স্নান করতে গিয়েছিল। আসেমা বিবির বারণ শোনেনি। টিউব-অয়েলের পানিতে তাদের ক্লান্তি মিটবে না। দুজনে কিছু সাঁতারও কেটে নিলে। কিন্তু সময়ের ধাক্কায় স্নানের আনন্দ অকেখানি মাটি। সারা রাত পুকুরে পড়ে থাকার মত অবস্থা। তবু চট্‌পট তারা বাড়ি ফিরেছিল। বিশ মিনিট পার হয়নি।

কিন্তু অত সহজে কী মধুর ভোজ শেষ হয়? চাট্‌নি এতটুকু রইল হালুয়া প্রায় চেটেপুটে খাওয়ার দশা। শেষ প্রান্তে সকলেই অতি ধীর। জওয়ান-অফিসারে কোন ফারাক ছিল না।

AMARBOI.COM

"কিয়া উম্‌দা খানা।"

"কিয়া উম্‌দা খানা।"

একথা জওয়ানেরা যত বলে, অফিসারেরা তার চেয়ে কিছু কম যায় না।

হালুয়ার তস্তরি হাতে মেজর হাকিম অনেকক্ষণ বুঁদ দাঁড়িয়ে রইল। কী ভাবছিল সে তারই জানার কথা। ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ এক চামচ মুখে দিয়ে কি যেন বলতে চায়, কিন্তু তোৎলাতে থাকে, "এ— এ— এ— ই, হাকি— কি— ম।"

মেজর কনুয়ের গুঁতো দিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে সঙ্গীকে সম্বোধন করলে, "তোম হাই হো গিয়া।"

"নেহি। তোম—।"

কোন প্রতিবাদ করলে না মেজর। বরং নিজের গায়ে আপবাদ মেখে নিলে "আচ্ছা হাম হাই।"

"আভি ঠিক কহা।"

"আভি আভি জল্‌দি খতম করো।"

"কিউ?"

"লোট যানা হ্যায়। ফিরতে হবে।"

"পুরা রাত পড়া হুয়া হ্যায়।"

"আচ্ছা। ও-বাৎ যানে দো। খানা খতম করো।"

আহারের শেষ পর্ব কম ঝামেলার নয়। টেবিল যথাস্থানে পড়ে থাক। কাল সকালে তুলে নিলে চলবে। কিন্তু প্লেট ইত্যাদি সরাতে হয়। মেহ্‌মানদের হাত ধোয়ার বন্দোবস্ত ভালই ছিল। যদিও ঝুটা হাতে ফৈয়াজ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। কী যেন চিন্তামগ্ন। চলার গতি খুব মসৃণ নয়।

AMARBOI.COM

মৃধা আর সদরে আসেনি। হুইস্কির ঢেকুর, এই জীবনে প্রথম আস্বাদন। কাজেই বড় কটু লেগেছিল। তবে খুব বিরক্ত হয়নি মৃধা। ফেরেশ্‌তাদের কাণ্ড মানুষের বুঝার অসাধ্যি। অফিসারদের মধ্যে এসব রেওয়াজ চালু আছে। তাছাড়া প্রাচুর্যের মধ্যে থাকলে এক আধটু অমন খসলৎ বোধহয় এসে যায়। ছোট ভায়ের বাড়িতে মেয়েরা থাকে। সে প্রায়ই পার্টি দেয়। তখন বোতলের ব্যবস্থা আকসার দেখা যায়। শরিফ লোকদের মধ্যে এসব রেওয়াজ। তা দোষ কী গুণ ধর্তব্যের দাঁড়িপাল্লায় আনা উচিত নয়। অন্দর থেকে হুকুম দিচ্ছিল মৃধা। বয়স অনুযায়ী অনেক আগেই তার ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু নানা সামাজিক কাজে সময় কাটানো অভ্যেস আছে বলে আজ বেশ সতেজই ছিল সে। তাছাড়া, দিনকাল খারাপ। মান-ইজ্জৎ সব এদের উপর নির্ভর। কিছু তকলীফ হলেও তা সয়ে যাওয়া উচিত। খুব হিসেবী এদিক থেকে মৃধা। হিসেব করে না চললে কী আল্লা এই অবস্থায় রাখে না। তাঁর কাছে শোকর। মান-ইজ্জৎ তিনি প্রচুর দিয়েছেন। পাকিস্তান হওয়ার পর দিলেন সম্পদ। এখন কোন রকমে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারলেই মঙ্গল।

যাত্রার পর খালি আসর সত্যি বিষাদময় ঠেকে। হয়ত কিছু বেঞ্চি কি সতরঞ্জি পড়ে থাকলে তখনও স্মৃতির রেশ কিছু আনন্দ বজায় রাখে। কিন্তু একে একে তা খস্‌তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলে পরদিন দর্শক কষ্ট পায়।

কী তাড়াহুড়া, কর্মব্যস্ততা, কোলাহল না গেল। এবার আসর খালি।

জারু মিয়া, মনা এক এক করে প্লেট ইত্যাদি নিয়ে অন্দর অভিমুখী। যেন আবার ফিরে আসছে খালি হাতে। পুনরায় হাতে নানা চিজ। মাদবর যেন এবার ছুটি পেয়েছিল। সে দহলিজের মধ্যে বসা। মৃধা সাহেব অমন চমৎকার খাওয়ালেন, তিনি না বললে ত আর যাওয়া যায় না। তাছাড়া এখনও মেহমান বিদায় হয়নি। সে-পর্ব বাকি আছে। মাদবর বেশ খোঁয়ারিতে ঢুলছিল। একবার তার মনে হয়েছিল, প্লেট ইত্যাদি বওয়ার কাজে যোগান দিলে তার ঘুম আসবে না। কিন্তু অমন চমৎকার খাওয়া। তারপর কুলীর কাজ কুলীকে সাজে। সে গ্রামের গরীব হলেও মানী লোক। তার পক্ষে কাম্‌লা সাজা সাজে না। হঠাৎ খোঁয়ারিতে চিড় ধরে তার। মৃধা সাহেব ডেকে সাড়া না পেলে বড় লজ্জার কথা। তাই নিজের চোখ মল্‌তে লাগল মাদবর যেন ঘুম সহজে না আসে।

দহলিজের মধ্যে পশ্চিম দিকে একটা জানালা আছে। গ্রাম প্রায় সেই অভিমুখে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত।

এখন গ্রাম কী আবস্থায় আছে দেখার খেয়াল হল মাদ্‌বরের। হঠাৎ খেয়াল। জানালার কাছে গিয়ে সে দেখলো, চতুর্দিক অন্ধকার। সব নিশুত। নিশীথ রাত্রের কবরস্থানের মত।

কেমন যেন ভয় পেলে মাদবর। তাই সে নিজের জায়গায় এসে আবার ঈষৎ ঘুমে ঢুলতে লাগল। শুধু তার ছুটি নয়। অন্দরেও বউ আছে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। আবছা চিন্তাটা মাথার ভেতর ছিল বৈকি।

AMARBOI.COM

৯

নৈশ ভোজের পর সামান্য ব্রান্ডি খুব স্বাস্থ্যপ্রদ।

ফৈয়াজের তা ভাল জানা ছিল। অবস্থার গতিকে কী করতে হয়, সে ব্যাপারেও ক্যাপ্টেন বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল।

পুরাতন আসনে আবার দুই সৈনিক আসীন।

টিপয়ের তলা থেকে হাকিম বোতল বের করলে। কি যেন বলবে সে। কিন্তু কথা এবার বেশ জড়িয়ে গেল।

ফৈয়াজ তার হাত থেকে হুইস্কির বোতলটা নিয়ে নাড়িয়ে দেখলে, তলানি কতখানি আছে। তারপর সঙ্গীর গ্লাসে আধেয় ঢালতে ঢালতে বললে, "তো— ম— জ— বা— ন— মে মোবিল লাগাও।" অর্থাৎ জিভে মবিল তেল লাগাও।

একটা হিক্কা তুলে মেজর জিজ্ঞেস করলে, "কিঁউ?"

কেন? নিজের গ্লাসে বোতল উপুড় করে সব ঢালার পর শূন্য বোতলটা ফৈয়াজ টিপয়ের উপর রেখে একটা দেশলায়ের জ্বলন্ত কাঠি তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া মাত্র হু— শ— শ— অং জাতীয় শব্দ বেরুতে সে তা ঠোঁটে অনুকরণ করলে।

হাকিম হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর সে তির্যক-দৃষ্টি সঙ্গীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন

করলে, "তোম জান্‌তে হো হাম বহুৎ জিদ্দী আদমি হয়।"

"আলবৎ। আ রে আভি তোমরা জবান আচ্ছা স্টার্ট লিয়া" হেসে-হেসে বললে ফৈয়াজ এবং অধিকন্তু যোগ করলে, হামারা ভী আচ্ছা স্টার্ট্ লিয়া। লেকিন কভি কভি নেহি লেতা। শো— শো— নো— দেখা, শালা ফের স্টার্ট্ লিয়া। লেকিন কভি কভি নেহি লেতা। শো— শো—নো— দেখো, শালা ফের স্টার্ট্ বন্দ হোনেওয়ালা।"

গ্লাসে মৃদু চুমুক দিয়ে মেজর এত্তেলা দিলে, "শো— শো— শো— ।"

হি হি হেসে উঠল ক্যাপ্টেন এবং মেজরের দিকে তর্জনি বাড়িয়ে বললে, "তোমরা স্টার্ট্ বন্দ। চালু করো।"

মেজর এক ঢোক হুইস্কি পান-শেষে এবার যথা-সতর্ক গড়-গড় বলে গেল, "ইয়ার অব চলনা চাহিয়ে।"

"কিউ? নেহি, আভি নেহি।"

"তব কিয়া চাহ্‌তা?"

'হাম শাদি করণে মাংতা।"

দুই জনে চট করে করমর্দন করলে এবং অতঃপর আবার আসনে আসীন।

মেজর বললে, "দুলহিন... আগর শাদি করনা হ্যায় ত মাশ্‌রেকী (পূর্ব) পাকিস্তান মে।"

"আলবৎ" শব্দটা উচ্চারণ শেষে উপুড় হাত চটাস্ শব্দে সঙ্গীর করতালুর উপর আঘাত করলে ক্যাপ্টেন।

"হাম দোনো ইয়ার।" মুখোমুখি বসেছিল দুইজন। হাকিম কথাটা বলে হাত সঙ্গীর কাঁধে রাখলে।

"ও দোনো বহেন..." এতটুকু উচ্চারণের পর ঠিক একই কায়দায় ফৈয়াজ হাত রাখলে মেজরের কাঁধে এবং মুখ নিচু করলে।

প্রায় তিন মিনিট কেটে গেল এইভাবে। অথবা ঈষৎ বেশি। প্রথমে মুখ খুললে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ, "আভি পয়গাম ভেজো।"

"আলবৎ। লেকিন জবান কা স্টার্ট ঠিক রাখখো! শালা Skid (স্কীড) করকে না চলা যায়।"

"আলবৎ নেহি।

ফৈয়াজ হাততালি যোগে ডাক দিলে, "এই সয়ীদ মৌলীসাব।"

মাদবরের খোঁয়ারি ছুটে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। তার মত দীন অধমের নাম অমন শরিফদের জবানে। আত্মশ্লাঘার চোটে ছুটে এসেছিল মাদবর। চটি দুটো ফট্‌ফট অতি শব্দ তুললেও তার মুখের কথা সংক্ষিপ্ত।

— জী, হুজুর।

— হাজিসাব কো বোলাও।

— জী, হুজুর।

মাদবর চলে যাওয়া মাত্র ফৈয়াজ আবার সতর্ক-বাণি ছাড়লে, "দেখো, লেকিন স্টার্ট ঠিক রাখ্‌খো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আল-ল— ব-ব— বৎ।"

"ঐইসা নেহি। কহো আলবৎ।"

"আলবৎ।"

"হ্যাঁ এ্যায়সা। আওর পিনা খতম করো।"

সঙ্গীর আদেশ। উভয়েই গ্লাস শেষ করে নিচে রেখে দিলে। তারপর রুমালে মুখ মুছলে এবং শেষে সিগারেট টানতে লাগল।

মৃধা পৌছতেই দুই জনে তা-কে খুব তাজিমের সঙ্গে খালি চেয়ার এগিয়ে দিলে। মাদবর নিজের জায়গায় ফিরে গেল। নিজের সাইজ সে ভালমত বোঝে।

"কিয়া মাঁই কর সাক্তো আপ্কা খেদমৎ মে", মৃধা জিজ্ঞেস করলে।

"এ্যায়সা কুচ নেহি। আপ লাড়কিয়োঁ কা শাদি দে চুকে?" প্রশ্ন মেজর হাকিমের।

"জী নেহি।"

"শাদি দিজিয়েগা?"

"আচ্ছা দুলা মিল্নে সে—।"

"হামলোগ ক্যায়সা দুলা?"

"বহুৎ আচ্ছা।"

"হাম দোনো— " প্রশ্ন করতে গিয়ে হোঁচট খায় ফৈয়াজ।

"হাম দোনো কিয়া—?" অধৈর্য বিস্ময়ে প্রশ্নের পর তাদের জবাবের প্রতীক্ষা করে মৃধা।

"হাম দোনো— আগার আপ চাহে।"

"কিয়া আপ শাদি করনে মাংতে?"

মৃধার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দুজনে সমস্বরে বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, "জ্বী। আপ্নে আব ঠিক পাক্ড়া।" আপনি এতক্ষণে ঠিক ধরেছেন।

মৃধা দুইজনের দিকে তার বিস্ফারিত জোড়া নেত্র তুলে আবার জিজ্ঞেস করলে, "কিয়া আপ্লোগ মজাক করতে হে?" কী আপনারা রসিকতা করছেন?

"মজাক নেহি। সাচ্।" আবার সমস্বর।

"মজাক নেহি?" মৃধার প্রশ্ন।

"সাচ— সাচ— সাচ তিন দফা সাচ।"

মৃধা হঠাৎ দিশা করে উঠতে পারে না, সত্যি পরিস্থিতি কী? শেষে নরম সুরে বললে, "ইয়ে ত নসিব কা বাৎ আপলোগ্ কা তরেহ্ দামাদ।" আপনাদের মত জামাই ত ভাগ্যের কথা।

"তব আপ রাজি?" দুই সৈনিক প্রায় একই সময়ে জিজ্ঞেস করে বসে।

"আপলোগ্ পয়গাম দিয়া। ঠিক হায়। আপকা ওয়ালেদ সে বাত করুংগা।" আপনাদের পিতার সঙ্গে কথা বলব।

"ও তো মর গিয়া।"

"দোস্রা মুরুব্বি হ্যায়?"

"নেহি। হামলোগ সে বাত কি জিয়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক হ্যায়। দো চার রোজ যানে দিজিয়ে। হাম ভী আপ্‌না রেস্তাদার (আত্মীয়) সে বাৎ করে। শাদি কা কাম। সব সে পুছনে হোতা।"

"লেকিন—।"

মেজর হাত নেড়ে বললে।

'লেকিন কিয়া?" মৃধার প্রশ্ন।

"শাদি আভি হোগা।"

"আভি???"

মৃধার দুই চোখ যেন কপাল থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়।

"হাঁ আভি।" দুই সৈনিকের সমস্বর।

"আপলোগ কিয়া কহ্‌তে?"

"উর্দু।" আবার সমস্বরে উত্তর দিলে দুই সঙ্গী।

"আভি বোলা শাদি। আওর আভী শাদি হো সাক্‌তা?" মৃধার স্বর ঈষৎ চড়া।

"হো সাক্‌তা"। পুনরায় কোরাস-কণ্ঠ।

"আপলোগ কিয়া পাগল হ্যায়?" মৃদা এবার মেজাজের সঙ্গে বলে।

"জী নেহি।" দ্বৈত গলা এক সঙ্গে।

"শাদি আভি হোগা। মোল্লা কাঁহা?"

উপস্থিত বুদ্ধির জোরে মৃধা একটা সমস্যা তুললে প্রতিপক্ষদের বেকায়দায় ফেলতে।

দুই অফিসার একটু দমে যায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন মাথা চুল্‌কাতে চুলকাতে ডাক দিলে, "এ— ই, মৌলবী সয়ীদ।"

মাদবর এতক্ষণে তার আহার উপভোগ করছিল। কান খাড়া। সব তার কানে যাচ্ছে। সে যে মজা পাচ্ছিল না, তা হলফ করে বলতে পারবে না।

সৈনিকের ডাক পড়ামাত্র মাদবর দহলিজের দাওয়া থেকে তড়াক লাফে নিচে নেমে অকুস্থলে পৌঁছল।

জেরা ধরলে মেজর হাকিম, "মৌলীসাব, তোম শাদি পড়হান জান্‌তা।"

"খোদা কা মরজি সে জান্‌তা।" সয়ীদ মাদবর তার সুঁচোলো দাড়ি নেড়ে পরিতৃপ্ত জবাব দিলে।

"আচ্ছা তোম যাও।" অফিসার তা-কে হাত নেড়ে বিদায় দিলে। সয়ীদ মাদবর আবার সুড়সুড় তার তা-য়ে গিয়ে বসল।

তখন ফৈয়াজ বললে, "হাজিসাব, আব শাদি কা এন্তেজাম কিজিয়ে।"

"আপলোগ কিয়া কহতে হামরা সমঝ মে নেহি আতা।" মৃধা এবার নিজের রব বের করলে। সে যে মৌলিক গণতন্ত্রের চেয়ারম্যান তা যেন এতক্ষণে মনে পড়ল।

"কিয়া নেহি সমঝতে? শাদি দেগা কী নেহি? সাচ কহো?"

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ বেশ চেতে উঠেছিল। হবু-শ্বশুরকে আপনিরূপে সম্বোধনে আর সে যেন রাজি নয়।

"ইয়ে শাদি হাম্‌ দে নেহি সাক্‌তা।"

"কিঁউ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“ও মেরা লাড়কি, মেরা খুশি।”

রুষ্ট কণ্ঠস্বর। সারা জীবন মৃধা হিসেবের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে চলেছে। হঠাৎ তার মেজাজ এমন হয়ে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু বেশ জোর দিয়ে সে কেবল বেঁকে বসল না, বরং আরো কোপ মারার জন্যে তৈরি হয়ে পড়ল। তাই উঠে পড়ল দুই অফিসারের সামনে থেকে এবং অন্দরের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে।

সংকল্পের স্রোত হুইস্কি অতি ক্ষিপ্র করে তোলে।

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার দুজনও গোড়ালির উপর। এবং মৃধার দুই পাশে হাঁটতে লাগল।

অন্দর এবং বৈঠকখানার সংযোগ-স্থলে এলে ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ মৃধার হাত চেপে ধরলে এবং প্রশ্ন ছুঁড়লে, “কিয়া শাদি নেহি দেগা?”

প্রায় চেঁচিয়ে জবাব দিলে মৃধা, “নেহি। মাতওয়ালা (মাতাল) কে সাথ হাম লাড়কি কা শাদি নেহি দুংগা।” অর্থাৎ দেব না।

“এ্যায়সি বাৎ!” মেজর হাকিম মৃধার আর এক হাত চেপে ধরলে এবং আরো যোগ করলে, “তোম ছিপা-হুয়া (ছদ্মবেশী) আওয়ামী লীগার হ্যায়।”

মৃধার মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে আওয়ামী লীগের নামের সঙ্গে একটা খিস্তি জুড়ে বললে, “সারা জিন্দেগী মুসলিম লীগ কিয়া। উস্‌কা বাদ—।”

কিন্তু তার কথা শেষ করতে দিলে না মেজর হাকিম। সে আরো চেঁচিয়ে উঠল, “আব পাতা (ঠিকানা) চালা, তোম কিয়া হ্যায়।”

একটা হিক্কা উঠল এই সময় তার গলা থেকে।

ফৈয়াজ জোরসে হাঁক দিলে, “এ-ই জওয়ানুঁ।”

সঙ্গে সঙ্গে স্টেনগানধারী চার-পাঁচ জন সিপাই দৌড়ে এলো।

ক্যাপ্টেন হুকুম দিলে, “ইস্‌কো এ্যারেস্ট করো। ইয়ে আওয়ামী লীগার হ্যায়।”

মৃধা এক দম থ।

তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। শুধু ভ্যাল্‌ভ্যাল্‌ তাকায় মাত্র। যেন আজন্ম বোবা।

মেজর হাকিম আরো এক হাঁক দিলে এবং সকল জওয়ানেরা এসে পৌঁছল। আবার অর্ডার: ইস্‌কা মকান সার্চ করো।

এক সিপাই এবং দুই অফিসার অন্দরের দিক গেল।

সয়ীদ মাদবর বুঝে উঠতে পারে না, কোথাকার পানি কোথা দিয়ে গড়াচ্ছে। সে দহলিজের ভেতর বসে ছিল। শুধু এটুকু বুঝতে পারে, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটছে। তাই সে আর অকুস্থলে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলে না। পথঘাট সবই ত জানা। দহলিজের পশ্চিম কোণা দিয়ে সামান্য এগোলে একটা সরু ঘুলি পথ আছে। বন-বাদাড়। যত ময়লা, ছেঁড়া কাগজপত্র ইত্যাদি আর্বজনা ফেলা হয় সেখানে। ওই পথে পালানোই যুক্তিযুক্ত। সে সুড়সুড় অন্ধকারে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একটা বেড়া পড়ল সামনে। বেড়া থাকার কথা নয়। সেটা পার হতে গিয়ে তার এক পাটি চটি আট্‌কে কোথায় যেন পড়ে গেল। মাদবর কান খাড়া করে শোনে মৃধার অন্দরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলমাল হচ্ছে। সে আর চটির মায়া করার বান্দা নয়। সে এক পায়ে চটি-সহই দৌড়াতে লাগল। বৌ পেছনে পড়ে রইল। তা থাক। বুড়ি বৌ। তার কোন ভয় থাকার কথা নয়।

অন্দরে বিকেলে যে-কামরায় অফিসার দু'জন গিয়েছিল, সেই চেনা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল ফৈয়াজ ও হাকিম। কামরা শূন্য। তখন জওয়ানদের সার্চ করতে তারা হুকুম দিলে এবং দু'জনে পাশের কামরায় গেল।

উৎকণ্ঠিত দাঁড়িয়ে আছে তিনটি অসহায় প্রাণী। সাহেলী, চামেলী ও তার মা।

মেজরের পা টললেও মাথা টলেনি। চোখে দুই বোন পড়ামাত্র সে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে গেল।

সাহেলী তখনও সাহস হারায়নি।

সোজা জিজ্ঞেস করলে, 'আপলোগ কিয়া মাংতে?"

"শাদি করনে মাংতে।"

"কিস্‌কো।"

"আপ দোনা বহেন-কো।"

"মজাক কর রহে হে?" বেশ তীক্ষ্ণ গলায় সাহেলী প্রশ্ন করে।

"নেহি, মজাক নেহি। সাচ।"

"এহি আপলোগ্‌কা ইন্‌সানিয়াৎ (মনুষ্যত)? আপলোগ্‌কো খেলায়া পেলায়া—

সাহেলীর কথা গলায় আটকে যায়। স্নানের পর বেশ টাট্‌কা শরীরে সে একটা লালপাড় শাড়ি পরেছিল। হঠাৎ ওই রঙের মতই তেজী দেখায়। তেমন আপ্ত স্বরেই সে ঢোক গিলে আর খেই ধরে, "এহি ইন্‌সানিয়াৎ আপলোগ্‌-কা। এৎনা মেহনৎ করে খেলায়া পেলায়া—।"

ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ তখন মাতাল চিৎকারে কক্ষ পূর্ণ করে তুললে, "লেকিন মেরি জান্‌, খানা-পিনা কা বাদ শোনা (শয়ন) ফরজ হ্যায়"

তারপর দুইজনে দুই বোন-কে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে। আসমা বিবি যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়লে এবং পালঙের একটা পায়া ধরে ক্রমশঃ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে।

অন্য কামরায় জওয়ানেরা তখন আলমারি ভেঙে লুটপাট শুরু করেছিল। গহনা টাকাপয়সা যা পাওয়া যায় হাতিয়ে নেওয়া। একজন একটা ছোট টেবিল-ঘড়ি পর্যন্ত পকেটে পুরে ফেললে।

চামেলী একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে থেমে গিয়েছিল। মেজর হাকিম তাকে তুলে তখন ঘাড়ে ফেলে নিয়েছে। সাহেলীর মুখে শুধু আর্তনাদ : বাপ্‌জান, বাপজান। আঁচড়-কামড়ের সুযোগ পাচ্ছিল না, সে শুধু পা ছুঁড়ছিল। ফৈয়াজ তাকে পাজাকোলা তুলে নিয়েছে। সাহেলীর দুই হাত এমনভাবে ঠাসা যে নাড়ার উপায় নেই। ফৈয়াজের মুখ থেকে ভরভর হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছিল। সাহেলীর ঠোঁটে বারবার চুম্বন-রত সে বলছিল, "চলো মেরি জান্‌। তোম্‌কো রাত কা রাণী বানায়ংগা।"

চাপা গোঙানি, আর্তনাদ : বাপ্‌জান বাপ্‌জান।

সৈন্যদের বুটের আওয়াজ। বাক্স পেঁট্‌রা ভাঙার শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাম-গোরস্তান বারবার সচকিত হয়ে উঠছিল।

বেচারা মনা ও জারুমিয়া উঠানের নিচে পল-গাদায় খড় ঢাকা, দুই চোখ সামান্য জাগিয়ে দেখছিল এই নারকীয় দৃশ্য। অন্দরে সৈন্যদের আগমন দেখামাত্র তারা আর নিজেদের জায়গায় থাকতে সাহস পায়নি। কুলসম এবং মাদবর-পত্নী রুদ্ধশ্বাসে রান্নাঘরের মধ্যে একে অপরকে জড়িয়ে বসে ছিল।

লুটের মালে বিত্তবান জওয়ানেরা হুকুম-তামিলে অতি তৎপর।

অন্দর থেকে বেরিয়ে এলো সকলে এক এক করে। চামেলী মেজর হাকিমের কাঁধে নিস্তেজ। এতটুকু শব্দ পর্যন্ত করেনি। সাহেলী যেন লাশ। ক্যাপ্টেন ফৈয়াজের কাঁধে মাঝে মাঝে শুধু "বাপ্‌জান' বাপ্‌জান' আর্তনাদ তুলছিল। গলা ক্রমশঃ ক্ষীণ।

মৃধা স্তব্ধ। সব দেখছিল মাত্র। কিন্তু বোবার মত। অত্যন্ত রাশভারি লোক। গাঁয়ের মানুষ রবদবে যার কেঁপে উঠেছে বছরের পর বছর, তার কোন প্রাণশক্তি ছিল কোন কালে আজ কল্পনা করা কঠিন।

জীপ দুটো স্টার্ট নিলে।

যে-সিপাই মৃধাকে আট্‌কে রেখেছিল সে এক দৌড়ে এসে ধাবমান গাড়িতে উঠে পড়ল।

মুক্ত মৃধা সামনে একটা ঢেলা পড়েছিল, তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল পাকা রাস্তা ধরে। তারপর ঢেলাটা যথাশক্তি গায়ে ছুঁড়ে দিলে। কার উদ্দেশ্যে, তারই জানার কথা।

আবার দৌড়ে ফিরতে লাগল সে।

বৈঠকখানায় ঝুলছে হ্যাজাক লাইট। পাম্পের অভাবে ক্রমশঃ নিভে আসছিল।

হঠাৎ দৌড় থামালে মৃধা। স্তব্ধ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মা-মা রবে অন্দরের প্রাঙ্গণে দৌড়ে এসে থামল। এই মাতৃ-সম্বোধন বুড়িবিবির প্রতি সম্বোধন নয়। এই আর্তরব সেই অদৃশ্য চিরবিরাজমান স্নেহময়ীর কাছে আবেদন— যিনি সকল বেদনা যন্ত্রণা নিমেষে হরণ করে নিতে সক্ষম, যার বুকের কাছে গেলে সকল দাহ নিভে যায়।

AMARBOI.COM

১০

উঠানে কর্তাকে দেখে সাহস পেয়ে কুলসম রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বুড়িবিবির কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে, "মা-মা"

"কি রে বেডি?"

"মা বুবুদের মিলিটারিরা ধই্‌রা নিয়া গ্যাছেগ্যা।"

"কী কইলি?" বুড়িবিবি হাউমাউ করে উঠলেন, "আমারে তাগোর কাছে নিয়া চল্‌, আমি বুবুদের ছাড়াইয়া আনমু।"

"নিয়া চইলা গ্যাছেগ্যা।"

"চইলা গ্যাছে?" বৃদ্ধা উঠে বসে ছিলেন, এবার দাঁড়ানোর চেষ্টা পান। কুলসম বারণ করে।

তখন বৃদ্ধা শুধান, "মখু খড়ে?"

"উডানে খাড়াইয়া আছেন।"

"আমারে তার কাছে নিয়া চল্। গাঁয়ে মানুষ নাই? আইন নাই? আল্লা নাই? কী অইল?"

মৃধা স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। যেন নিঃস্পন্দ বাসি লাশ। কুলসমের কাঁধে ভর দিয়া বুড়িবিবি এগিয়ে আসেন পুত্রের নিকট এবং ডাক দেন, "ও মখু মিয়া—।"

পুত্র নিরুত্তর।

চোখে অজস্র পানি। বুড়িবিবি শেষ শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "কথা কস না ক্যান? মুখে রাও নাই ক্যান? পাকিস্তান বানাইছিলি না? তহন হিন্দু মাইয়াদের উপর জুলুম অইলে কইতিস অমন দু'একডা অয়। অহন দ্যাখ্ আল্লার ইনসাফ আছে কি না। দ্যাখ্, চোখ খুইল্যা দ্যাখ। আহ, আমার সোনার বুবুগো আমি খড়ে পামু? ও আল্লা, আল্লা রে—।"

তারপর একটানা কান্না শুরু করেন বুড়িবিবি। কুলসম তাঁকে সহজে থামাতে পারে না।

মৃধা আবার দহলিজের দিকে এগোতে লাগল। বড় ধীর পদ। বড় শান্ত।

সয়ীদ মাদবর খুব ভোরে উঠে, বোধহয়, চটিজুতার আফ্‌শোসে যে-পথ দিয়ে রাত্রে পালিয়েছিল আবার সেই পথে ফিরে আসে। জুতা পেতে অসুবিধা হয়নি। বেড়ায় আটকে গিয়েছিল। আরো কৌতূহল ছিল মাদবরের। তারপর কী ঘটল?

দহলিজের বাগান-সংলগ্ন কাঁঠাল গাছের নিচে মাদবর দেখলে, একটা চেয়ার উল্টে পড়ে গেছে। অমন জায়গায় চেয়ার কেন?

অকুস্থলে পৌঁছে সে আঁৎকে উঠল।

মৃধা ডাল থেকে ঝুলছে!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে মাদবর চেয়ারটা সোজা করে তার উপর চড়ল। সাদা ফিন্‌ফিনে পিরহান। পকেটে একটা লেফাফা দেখা যায়। মাদবর সেটা নিয়ে নিচে নামল।

অনেকগুলো দশ টাকার নোট বোঝাই!! নিজের মুঠোয় নোটগুলো রেখে খালি লেফাফটা প্রতিবেশীর পকেটে গুঁজে চেয়ার আবার পূর্বের মত উল্টানো অবস্থায় ফেলে মাদবর সুড়সুড় দৌড়ে পালিয়ে গেল, যে-পথ দিয়ে এসেছিল।

একা মৃধা ঝুলতে লাগল। ঈষৎ দুলতে থাকল, প্রাভাতিক বায়ু আন্দোলিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

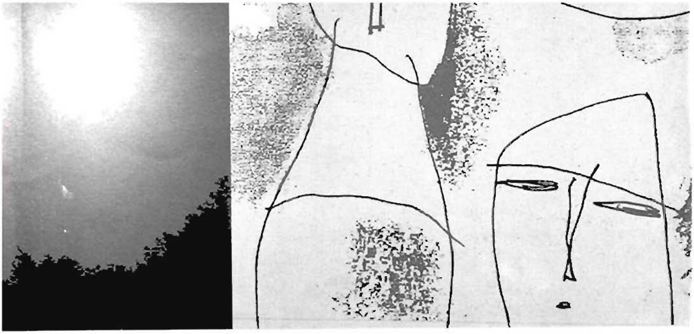

রাজসাক্ষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিলো ঠিকই। সবুরন। আমাকে পথের দিকে চাইয়া থাকতে হবে, সবুর করে থাকতে হবে চিরকাল। হয়তো কোনো ফায়দা নেই। মা তো দু' বছর বয়সে আমাকে সবুর করার জন্যে ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ, নিজে সরে পড়লেন দুনিয়া থেকে। যতই মা-মা ডাকে ডাক দিই, তিনি আর আসবেন না। অন্য কেউ সাড়া দেবে। তা-ই ঘটলো। বাপ আবার মা আনলেন। তার নয়, আমার। তবু নসিব ভালো। সৎ-মা নিয়ে সংসারে যে-কাণ্ড ঘটে, তা আর ঘটেনি। দোস্‌রা মা সত্যি ভালো মানুষ। আমাকে হয়তো ভেতরে ভেতের ভালো না-ও বাসতে পারেন। কিন্তু বাইরে কখনও আমাকে দুর ছিঃ করতেন না। নসিব বলতে হয়। নচেৎ দু'বছর বয়স থেকেই আমার দোজখ শুরু হতে পারতো। দোজখের শুরু এগারোর পরে। আজ যখন পেছনে চাই, সব ঝাপসা হয়ে আসে, কিন্তু মুছে যায় না। এক এক সময় এই হাজতের মধ্যে বসে ভাবি, মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় কেন? এতো আঁচ লাগে কলিজায়! আর দুঃখ দেয় মানুষই। আমি গেরামের মেয়ে। আমি কী চাইতাম? দু'মুঠো ভাত ভুকের ওয়াক্তে, পরনের দু'খান কাপড়, একটু মাথা-গোঁজার ঠাঁই যেনো বর্ষা-বাদলে, শীতে, ঝড়ের দিনে জান্ নিয়ে টানাটানি না পড়ে। তা-ও জুটলো না। তখন বাঁচার চেষ্টা করতে লাগলাম। কোনো রকমে অতোটুকু চাওয়া কী মিটবে না? বড়ো মজার দুনিয়া। চাওয়ার চেহ্‌রা নানা রকম। কোন চেহ্‌রা কে চায়, বলা দায়। অনেকে আমাদের ওই সামান্য, তুচ্ছ-তাচ্ছার দিকে ফিরেও চায় না। তারা খেতে পায়। আর তা শুধু দু-মুঠো ভাত নয়। তবু তারা আরো চায়। কেন চায় আমি বলতে পারবো না। ওই জায়গায় পৌঁছলে আমি বলতে পারতাম, আমি কী চাই। কিন্তু আল্লার কসম, আমার যখন দু'-মুঠো ভাত জুটলো, তাও মেয়াদী সারা-জীবন পাবো? তা নয়। তা-হলে আপনাদের হুজুরে আর এই কাহিনী বলার কোনো দরকারই পড়তো না। রগ্‌ড়ানি খেয়ে খেয়ে মাত্র দশ-বারো বছরের মধ্যে, আমি নিজেই বুঝি, আমার বয়স যেন কতো বেড়ে গেছে। অথচ কতো আমার বয়স? বাজান বলতেন, যখন বাংলাদেশের লড়াই হয়, তখন আমার বয়স এগার কী বারো। আমার মনে আছে সেসব দিনের কথা। সে-যাই হোক, পঁচিশ তো পেরোয়নি। অথচ প্রতিদিন মনে হয়, কবরে সেঁধিয়ে যেতে পারতাম। আর দুনিয়ার কোনো কিছু চাওয়া-পাওয়ার বাকি আমার নেই। আল্লা দিতে চাইলেও আমার দরকার মিটে গেছে। এখন

হাজতের দেওয়ালের দিকে আমি চেয়ে থাকি। দুনিয়া যেমন বে-দরদী আমার পানে চেয়ে আছে ছেলেবেলা থেকে, তেমনই এই দেওয়ালের ইটের চোখগুলো। আমার কলিজায়ও কোনো রহম (দয়া) আছে বলে মনে হয় না। নইলে, বাজানের কথা ভুইল্যা থাকি ক্যামনে? বাজান হায়াতে না মওতে তারও খবর আমি দিতে নাপারগ। আমি নিজে সুখী হব, বাজানকে সুখী করবো, আমার মরদ থাকবে, পেট পুরে ভাত খেতে পাবো, আপন জমিনের ফসলের ভাত। এই তো নিশানা। তার বেশি কিছু না। যদি ঝুট্ বলি আমি খান্‌কির বেটি। না, তার বেশি কিছুই চাইনি আল্লার দরগায়। এখন আমি কী চাই? তা হলফ করে বলতে পারবো না। কারণ, হাজতের ভেতর থাকা এক কথা, আর বাইরে থাকা আর এক কথা। এখন এখান থেকে বেরুতে কবে পারবো, আল্লা জানে। তবে পুলিশের লোক বলেছে, তুমি হাঁচা কথা বলবে, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে। অন্যান্য আসামীদের তারা সাজা দিতে চায়। আমার মতো মেয়ের উপর তাদের গোসা নেই। গোসা নাকি যারা আমাদের এই রাস্তায় নামিয়েছে, তাদের উপর। আমার সাক্ষীর উপর সব মামলা খাড়া। আমি ঝুট্ কথা বললে, মামলার আসামীরা ছাড়া পেয়ে যাবে। তখন আমার উপর তাদের রাগ হতে পারে। পুলিশ এসব বলেছে। আমার কাছে যা-যা জিজ্ঞেস করেছিলো, আমি কিছু এদিক-ওদিক করিনি, সোজা জবাব দিয়েছি। এতটকু মিথ্যে ছিলো না তা-তে। তাই বোধহয় আমার উপর এত রহম। আমাকে ওরা বলেছে, তোমার হাজতে থাকার দরকার নেই। আমি যদি কোথাও যেতে চাই, ওরা সেখানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আসামী ছাড়া আমার কে আছে শহরে? আমি কোথা গিয়ে উঠবো? পুলিশ বলেছিলো, মামলার যেদিন যেদিন দিন পড়ে সেদিন আদালতে হাজির হলেই সব সারে। যদি না যেতে পারি, হাজিরা না দিলে পুলিশ আবার এসে ধরে নিয়ে যাবে। বাইরে যাবো কোন্ চুলায়? আবার কার হাতে গিয়ে পড়ি, আল্লাকে মালুম। ছয় বছরে কতো হাত ফেরি হয়ে তো এই জায়গায় পৌঁচেছি। তার চেয়ে হাজতে থাকা ভালো। অন্তত হাত ফেরি হওয়ার ভয় নেই। হাজতে কষ্ট আছে। তা ভয় পাওয়ার কি আছে? আরামের নসিব নিয়ে তো জন্মাইনি। আড়াই বছর বয়েস হয়নি, তখনই সৎ-মার ফরমাশ খাটতে শুরু করেছি। চার বছর বয়সে তো মাঠে যেতাম, বাজানের নাস্তা নিয়ে। সবাই বলতো, খুব বাহাদুর মেয়ে হবে। বাহাদুর হইনি। নসিবের সঙ্গে লড়াই করতে বেরিয়েছিলাম। পড়ে-পড়ে মার খেতে চাইনি। ভাবলাম, এক সময় না এক সময় আল্লা মুখ তুলে চাইবেন। তাকে দোষ দিব না। আল্লা চেয়েছিলেন। ভেবেছিলাম, এক দু'বছর এইভাবে কাটলে হাতে কিছু পয়সা জমবে, কিছু গয়না-গাঁটি হবে। তারপর একদিন এখান থেকে সরে পড়বো। আবার গাঁয়ে ফিরে যাবো। বুড়া বাজান আমার লগে থাকবেন। তেমন মানুষ দেখে তিনিই জামাই খুঁজে আনবেন। আমার কিছু বলার থাকবে না। পুঁজি দিয়ে কিছু জমি কিনবো। কিন্তু বাধ সাধলে মানুষ। এখানে এসে ভালো খাই। অনেক রকম খাওয়া তো গাঁয়ে কেউ কখনও দেখে না। পরদা ঘেরা হোটেলের কেবিনে বসে খেতে বেশ মজা লাগে। কিন্তু এসবতো ব্যবসার ধরন। এক এক কাজের এক এক রকম ধারা হয়। মাঠে চাষের কাজ করতে লাগে লাঙল, বলদ এমন আরো কিছু। ঘরে পাকশালাতে তো এসব লাগে না। সেখানে বলদ,

লাঙল ফজুল। বঁটি, দা দরকার হেঁশেলে। তিজেল হাঁড়ি দরকার। আসল কথা, কি কাজ, তার চলন-অনুযায়ী জিনিস লাগে। পা ফেলতে হয় নতুন ব্যবসায় এসে তা বুঝলাম। গোড়ায় তো সব ইলেম রপ্ত হয় না। তবে কারো দেরি লাগে, কেউ জলদি শিখে ফেলে। আমি শহরে পয়লা এসেছিলাম বস্তির ভেতর। দু'বছরে শহরের অনেক কিছু শিখলাম। পয়লা-পয়লা বাজানকে টাকা পাঠাতে পারতাম না। তারপর যোগাযোগ হলো। বেশ কিছু টাকা পাঠাতাম, বাপজান যা আশা করেননি। তারপর যোগাযোগ রইলো না। কিন্তু টাকা তিনি পেতেন। কারণ, আমার শহরের মুরুব্বি আর যাই হোক সামান্য পঞ্চাশ টাকা মেরে দেওয়ার মতো মানুষ নয়। আমি যা-ই করি, যা-ই হই, আমি বাজানের কাজে আসতে পেরেছিলাম, তা ভেবে বড়ো সুখ পেতাম। মনে হতো, অন্যভাবে দুনিয়ায় সুখ মেলে না। অন্যের দিকে চাইলে, যদি দ্যাখো তার মুখ শুকনা, সেই মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলে, তুমিও তাজা হয়ে উঠবে মনে, এমন কী শরীরে, এ-টুকু আমি শিখেছিলাম। তবু মনে হতো, আর কী কোন রাস্তা নেই রোজগারের? তাই শেষ দু'বছর কিছু পয়সা জমাতে শুরু করেছিলাম। টাকা আমার কাছেও ছিলো না। জমা রাখতাম আর একজনের কাছে। তিনি বলতেন, 'সবুরন, আমি ব্যাংকে রেখে দিচ্ছি। আর মনে রাখিস, গরীবের টাকা যেদিন মারবো, সেদিন আমার যেনো মওত হয়।' আল্লাকে মালুম, লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। ওর চেহ্‌রা দেখে কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না, মানুষটা খারাপ। সুন্দর গোলগাল মুখ। ধলো চেহ্‌রা, তার উপর কালো দাড়ি, গোঁফ নাই। দেখে ধর্মপ্রাণ (পরহেজ্‌গার) ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। কিন্তু তার চলাফেরা কাজকর্ম বড়ো সন্দেহের বিষয়। আর মেয়েছেলে নিয়ে কারবার। তা-ও প্রায় জোওয়ান মাইয়া। এক আধজন তিরিশের বেশি বয়স। কিন্তু মেয়েদের দিকে ওর কোন লোভ আছে বলে মনে হয় না। হাজুতের এই কামরায় বসে আমি কোরআন ছুঁয়ে বলতে পারি, লোকটার ভিতর হয়তো ওর বাইরের চেহ্‌রার মতো। আমার ওর উপর বিশ্বাস কী সাধে? আমি তো কতো দিন ওর গায়ে-পড়ে হালচাল করতাম। মুখের দিকে বেশরমের মতো চোখ ফেলে রাখতাম। একবার হাত বাড়াক, আমাকে জড়িয়ে ধরুক। কিন্তু অন্য দিক একদম পাথর। আরো কত মেয়ে এই বাসায় এসেছে। দশ দিন, পনেরো দিন বা বেশি থেকেছে। তাদের নিয়ে আবার চলে যেতো আমার মুরুব্বি। ওর ভরসায় তো আমি এখানে টিকে গেলাম, গেলো তিন বছর। কিন্তু মনে হতো, লোকটা কোনো জোওয়ান মেয়েকে একটা কোনো ফালতু চিজের বেশি কিছু মনে করে না। যেনো ঘরের কোনো লোয়াজিমা। শিলনোড়া বা হাঁড়ি-পাতিল। পাঁকের ভেতর পাঁকাল মাছ থাকে। এ যেনো তা-ই। অথচ আমি কোনো মিয়ার লগে বাইরে গেলে, কিছু মনে করতো না। অন্য সময়ে নিজেই বলতো, তোর টাকার দরকার, আমারও টাকার দরকার। বাইরে না গেলে পয়সা কে দেবে? আমি আজও বুঝতে পারি নে, আমি কেনো এই বাড়িতে টিকে গেলাম। সবাই আসে চলে যায়। আমার মুরুব্বি শুধু আমার কোনো কাজ অন্য জায়গায় খুঁজে দিলেন না। অন্যেরা কাজ পায়, চলে যায়। আমি জিগালে বলতো 'সবুরন, রোজগার তো কথা। এক জায়গায় হলেই হলো।' কিন্তু যারা চলে যায়, তা আমি কোনোদিন জানতে পারতাম না, তারা কোথায় যায় এবং কি কাজ পায়? আজ আমি সব জানতে

পেরোছ। সে-কথা পরে শুনবেন। হয়ত আমার বলাও লাগবে না। বাংলাদেশের লড়াই শেষ হওয়ার পরের বছর বাজান আমার বিয়ার পাট শেষ করেন। জোওয়ান মানুষটা। আমি মোটে এগারো বারো, তখন মরদের দাম ঠিক মতো বুঝি নাই। যখন বুঝতে শিখলাম এবং ভাবতাম এমন মরদ আর নিজেদের কিছু জমিন হলেই তো দুনিয়া সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু সে একদিন যে গেলো তো গেলোই। বাপজান কতো খোঁজ নিলেন। তার নিজের বাপ-মা-ই কাইন্দা সারা। আমার শেষ দিকে মরদের উপর কিছু মায়া জন্মেছিলো। কিন্তু সেতো ধোঁকা দিলে। দুঃখ আর কা'কে বলে? তবে দুঃখে কষ্টের লগে আমার পরিচয় তো আজকার না। সৎ-মা তো পাশের মিয়াদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কামে যাইত। আমাদের জমিন ছিলো না। বাপজান কামলা খাটতেন অপরের জমিতে। কতো দিন নাস্তা নিয়া গেছি। বাপজান দিনের মজুরি পুরা পাওয়ার জন্যে এই নিয়ম করেছিলেন। নচেৎ যাদের কামলা তারাই নাস্তা ভাল দেয়। কিন্তু তখন মজুরি আবার কমে যায়। বাপজান তা পছন্দ করতেন না। চার বছর বয়সে সৎ-মার লগে মিয়াদের বাড়ি গিয়া আমি তো অবাক। আমি জানতাম না মানুষ এই ভাবে থাকে, এত জিনিস লাগে আর এত রকমের জিনিস! মিয়াবাড়ির মেয়েরা বাইরে যায় না। কি সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে। আমার নতুন মাকে কইতাম, আমি বড়ো হলে অমন খুবসুরাৎ খুবসুরাৎ শাড়ি কিনবো। মা হাসত। এখন বুঝি মা কেন হাসত। কিন্তু আমি এখন যে কাপড় পরি তা গাঁয়ের যে কোনো মিয়াদের বিবির কাপড়ের চেয়ে সুন্দর- আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। কুড়ি বছর আগেকার সঙ্গে কি কুড়ি বছর পরের তুলনা হয়? আমি নিজেই কত বদলে গেছি না? নিজের চেহরার দিকে চেয়েই অবাক হয়ে যাই। গাঁয়ে থাকার সময় একটা ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতাম না। এখন সাহেবদের ভাষা আমিও ক'বছরে শিখে ফেলেছি। এখন আমি তো ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি। বাজানের একার রোজগারে সংসার চলে না। বর্ষাকালে আবাদের পর কতোদিন বেকার থাকতেন। নতুন মার বিবেচনা ছিলো। নিজেই নেমে পড়লো সংসারের লড়ায়ে। মিয়া বাড়ি যেতাম, ঘরে একা কার কাছে থাকবো? বাড়ির কাছেই ছিলো একটা ছোট ডোবা। বাপজান ভয় পেতেন, কোনদিন না ডুবে মরি। মাঝে মাঝে খেলতে যেতাম পাড়ার অন্যান্য কচি ছেলেমেয়েদের লগে। কাম না থাকলেও বাপজান ধান্দায় ঘুরে বেড়াতেন। গাছের কয়েকখানা শুকনা ডাল তোয়ায়ে আনলেও তো কিছু উপকার হয়। অন্তত চুলা জ্বালানোর ঝক্কি কমে। পাড়াগাঁয়ে গরীবের সংসারের ছবি খুব আলাদা আলাদা না। ঈষৎ হেরফের হয়তো থাকে। সবচেয়ে বড়ো জ্বালা পেটের জ্বালা। বাজান কোনো কাম না থাকলে পলো নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যেতেন। কোন বড় মাছ পেলে কোথাও বেচে আনতেন চাল-ডাল মরিচ-লবণ। আবার কোনদিন মেহনতই বরবাদ। কতো দিন দেখছি বাজানের শরীর খারাপ, কামে যেতে পারলেন না। মার মিয়ার বাড়ির কাজ ছেড়ে গেলে কি দশা না হতো। বদ-নসিব, তা-ও হতো মাঝে মাঝে। মিয়ারা শহরে গেলে কি নাইওরে গেলে, ঘর ফাঁকা। তখন মার চাকরি খতম। সে-সব দিনের কথা আর নাইবা তুললাম। কিন্তু এ হাজতের বেড়ায় তো কোনো কাম থাকে না। কতো কথা, চাই বা না চাই সব দৌড় মেরে আসে। পুরাতন দিনগুলো রেহাই দেয় না। হাজতে এক মাঝ-বয়সী খালা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে। তার বিচার শেষ হয়নি। আমাদের মতোই এখনোও কোর্টে ওঠেনি। এই খালা এখন শহরে থাকে। বিশ বছর আছে। খুব পাকা খালা। আমি রেস্তা পাতিয়ে নিয়েছি। খালা কথা বলে বড় মজার। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। চুরি করেছিলো ঠিকই এক বিবি সাহেবের গয়না। কিন্তু পুলিশের তল্লাশিতে বমাল আসামী। চুরি করে ধরা পড়েছে। কিন্তু খালা তা মানতে রাজি নয়। সে বলে, 'চুরি কইরা ত গিয়া ধরা পড়ছি।' আমি বলি, 'খালা?' জবাব আসে, 'ক' বোনের মাইয়া।' তারপর খামকা হাসে একগাদা। তারপর কয় 'কি জিগাস, তাড়াতাড়ি ক'। 'আপনে তো চুরি কইরা ধরা পড়েছেন কন, ক্যান চুরি কইরতা যান?' 'আরে তুই বেডি, বয়স কম, কিচ্ছু বোঝস্ না। চুরি কইরা ধরা পড়লে ত আর চুরি থাকে না। ধরা না পড়লে হয় চুরি— কেউ দ্যাখে নাই। দ্যাখলে ত হয় পেরায়-ডাকাতি।' খালা কিন্তু খুব মজার মানুষ। অনেকবার চুরির জন্য জেল খেটেছে। কিন্তু তার মনে, কসুর হয়েছে— এমন দাগ সামান্য নাই। হাজতের অসুবিধাগুলো কেচ্ছা বলে খালা দূর করে দিতে পারতো। বেটির গতরের বাঁধন খুব মজবুত। বলতে শরম লাগে, ঠিক আমার লাহান। চল্লিশের বেশি ওর বয়স হবে। কিন্তু তেজ কমে নাই আর মুখখানা আল্লায় দিলে একদম ছুরি। আমার অনেক সাহস হয়েছে। আদালতে ত কখনো যাই নাই। হাকিম কিছু জিগাইলে কি জবাব দেব, ভাবতে বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু খালা অনেক সাহস যোগান দিলে। বেটি বলে, হাকিম যা জিগায় তা বুঝেসুঝে সময় নিয়ে জবাব দিলেই চলে। কিছুক্ষণ নাকি বয়রা কালার ভান করা যায়। কানে, হাতের তালু গোখখুর সাপের ফণার মতো রেখে। খালার সঙ্গে বসা মানে হাসি। যেন দুনিয়ার যতো দুঃখ খুশি আসুক, খালা সব খেদিয়ে ছাড়বে। সেদিন জিগাইলাম, ধরা পড়লে তো রক্ষা নাই। এখন কয় মাস কয়েদ হয় সেই সওয়াল হচ্ছে আসল সওয়াল। খালা জবাব দেবে কি হেসে কুটিকুটি। হাসি আর থামতে চায় না। শেষে আমি বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে গেলাম না শুধু বললাম, 'খালা তোমার লগে আর বইতাম না।' বেটি খপ করে আমার হাত ধরে এক চোট হেসে নিতে কসুর করলে না তার আগে, শেষে মুখ থেকে বের করলে, 'সবুরন আমি হাসব না ক্যান? ঘাবড়ানোর কিছু নাই। মিয়াদ হইব ছ'মাস কি এক বছর। এ-ই-ত? হে আমি ডরাই না।' 'ক্যান?' 'তোর বয়স কাঁচা। হে তুই বুঝবি না। আর বুঝলে এত জেরা করতিস না। জেলে যামু। এ-ই-ত? সেহানে তো খাওয়ার মিলব। মেহনত করাইয়া নিবো জেলের দারোগা। হে যতো খুশি নিক্। খাইতা ত দিব। মেহনত করি খাওয়ার পাই। তাতে ডর কি? বাইরে থাইকা মেহনত করি পেড ভরে না। অনেক সময় বেকার। তহন দশার কথা ভাবো। তার থেইক্যা জেল শতগুণ ভালা।' হারামজাদীর হাসি আবার উছলে পড়ে। আমি রাগ করবো কী? খালার ন্যাওটা হয়ে পড়ি। মনে হয় মাকে তো মনে নাই। সৎ-মার পর আবার যেনো এক মা পাওয়া গেছে যদিও তাকে খালা বলে ডাকি। হাজতে কতো আসামী বিচারের অপেক্ষায় থাকে। অনেকের তারিখই পড়ে না। মাসের পর মাস যায়। আমি কিন্তু কারো সাথে তেমন রেস্তা পাতাই না, কাছে গিয়ে বসতামও কম। কিন্তু খালা লগে থাকলে বড় আরাম। কতো রকমের কথা শোনা যায়। একদিন আমারে কয়, 'জানিস মা।' এমন ডাক কতো দিন শুনি নাই। বাপজানের ডাক যেন মেয়েলী গলা হয়ে বেড়ে উঠে। 'জানিস মা,

হগগলে চুরি কইরা আসে না। কেউ করে খুন, কেউ মারামারি। আরো এই সব কাইজ্যা ফ্যাসাদ। কিন্তু অনেকে হাজতে আসে, এসব কিছু না কইর‍্যা।' আমি তো অবাক হয়ে জিগাই, 'হে ক্যামন কথা, বেডি?' 'হ্যাঁরে মা, হেরা খুব ভালো মানুষ, তবু জেলে আসে। তরে তবে কই কয়েক বছর আগেকার কেচ্ছা। হে-বারও চুরি করছিলাম। ধরা পইড়া গেলাম হাতেনাতে। আর কিছুই করার নাই। চুরি করছিলাম এক দোকান থেইক্যা। বিবি সাহেবের সাবান-পান আরো-আরো টুকিটাকি আনা লাগত। কত পায়ে-হাতে ধরলাম দোকানদার সাবের। মানে, পায়ে হাত দেই নাই, হাতে আর হাত ক্যামনে দিমু? হেত আমার মরদ না।' আবার হাসতে থাকে খালা। বেদম হাসি। শেষে থামিয়ে বলে, 'মুখে পা হাত। কিন্তু ব্যাডা কসাই, দীলে একটু রহম নাই। পুলিশের হাতে তুইলা দিল। হারামিরে বললাম, কসুর করছি। হে-ও কসাই। ছুরি চলাইয়া দিল। ছ'মাস।' আমি মাঝখানে বলে বসি, 'খালা, হে-কথা নয়, আপনি যে কইলেন, ভালা মানুষ কসুর করে না, তবু জেল হয়।' 'বড় মনে করাইয়া দিছস। বুড়া হইতাছি, সব মনে থাকে না, খেয়াল থাকে না। অহন কই।' আবার একটু হেসে খালা শুরু করে, 'কসুর করছিল এক বেডি। লিখা পড়া জানে, দেখতে কালা হইলেও নাক-নকশা খুপ্‌সুরাৎ। আমি তারে আপা ডাকতাম। আর এক বেডি ছিল হিন্দু তাকে কইতাম দিদি। দুইজনে লিখাপড়া ভদ্দর মানুষের ছাওয়াল আর মুখের কথা যেন মিঠা মধু। আমার সাজা হইছিল ছ-মাস। আমাদের কয় ফালতু। জেলে ত কাম করা লাগে। আমার কাম দিছল, ওদের ফাই-ফরমাস শোনার। ফাই-ফরমাস শুনব কি বেডি? হেরাই আমার ফাই-ফরমাস শুনত। একদিন আমারে কয়, চাচি— আমারে চাচি ডাইকত। আপনের চুলে তেল দেওয়া দরকার। বড় রুখ্‌খ উখ্‌না শুখনা হয়ে আছে। আমি ত শরমে মাডির ভেতর সাইন্ধাতে পারলে বেঁচে যাই। এই সব মিয়া-ভদ্দর লোকদের মাইয়া আমার মাথায় দিবে ত্যাল? হে আল্লা হে মাবুদ, পানা (আশ্রয়) দাও। যতো বারণ করি হেরা দুই জনে শোনে না, শেষে দুই জনে আমার মাথায় ত্যাল দিল, আঁচড়াইয়া দিল। তাগোর কাপড়-চোপড় হেরা নিজেরা ধুইত, আমারে ছুঁইতে দিত না। কতো কথা ক'মুরে, মা, এক মুখে। হেরা কয় একদিন, জানো চাচি, মানুষ যে কসুর করে তার নাকি ষোল আনা দোষ না। যে দ্যাশে বাস করে, যে সমাজে বাস করে হেই দ্যাশ-সমাজও নাকি দায়ী। তাগোর কথা বুঝার পারি না। কইতেও পারি না, বুঝি না। ভাইব্‌বো এমন বুড়া মাগীর আক্কাল নাই এক ফোটা। আমি মাথা দোলাই আর হ-হ শব্দ করি। হেরা ভাবে, বহুত বুঝছি। কিন্তু আসলে ঢু-ঢু। বড় ভালা দুই বেডি। অমন আরামে জেল খাটা যায়, আমার জানা ছিল না। আমার কাম নাই বললেই চলে। শুধু আপাদের লগে গল্প করা। এক বেডি পেরায় বলত চোর বানায় দ্যাশের মান্‌ষে। আবার গালি দেয় চোর চোর বইল্যা। হগ্‌গলে ত চুরি করে না। কেন করে না? হে-কথা ত হগ্‌গলে বুঝ-সুঝ করে দেখে না। দ্যাশে চোর বাড়ে আর জেল বাড়ে। এসব বুঝার মগজ আল্লায় আমারে দেয় নাই। শ্যাষে দুই বেডি কয়, খালা, আমাদের কাম করার দরকার নাই। আমরাও মাইয়া। গেরস্থর হগ্‌গল কাম-ই জানি। তুমি লিখা-পড়া শিখো। আমি বুড়া পাখি বুলি শিখব? হাঁইস্যা বাঁচি না। হেরা নাছোড়বান্দা। তয় আর কি করি পীরের নাম নিয়া শুরু করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ… আ… । চুপ বেডি । একটু হাইস্যা লই ।’ তখন খালার হাসির জোয়ার আসে । কই, ‘থামো, খালা’ । থামতে চায় না । আরো জিগাই, ‘লিখা শুরু করছিলা না?’ নিজের গালে আলতো চড় দিয়ে খালা জবাব দেয়, ‘তা আর করি নাই । শেলেট পেন্সিল সব আনাইলো দুই বেডি । আহা রে, কার সোনার চাঁদ, কি মুখের বুলি, আমার মতন মাতারির জন্যে এত দয়ামায়া । দুই বেডি সোনার বেডি ।’ খালা হঠাৎ চুপ, একটু আনমনা থেকে বলে, ‘দুই বেডির মুখে শুনতাম, আজব-আজব বুলি । হেরা কইত, মানুষ নিজের পরিচয় জানে না । হে কি? তাহলে আর খারাপ হইত না । এই পরিচয় না-জানার জন্যে কেউ চোর, কেউ খুনী, ডাকাত, দাগাবাজ, গরীবরা জানেনা হেরা কেন গরীব? নিজের পরিচয় জানে না, তাই গরীব থাকে, কষ্ট পায় । আ রে বেডি । দু’ এক কথা ছাড়া-ছাড়া অহন মনে পড়ে । সব বুঝি নাই ত । কিন্তু শুনতে বড় ভালা লাগত, দুই সোনার বেডি ।’ সেদিন খালার মুখের দিকে চেয়ে আমার সহজে বিশ্বাস হয়নি, খালার মুখ কালা হতে পারে । হাসি সব নিভে গেছে । চোখের পাতা, মুখ বুকের উপর ঝুলে পড়ে ধীরে ধীরে । আমার মুখ দিয়েও রা সরে না । হাসি যে-গালের উপর হরঅক্ত ছিটানো থাকে, সে-জায়গা এমন হতে পারে? এমন কি খালার মুখে বয়সের দাগ এখন ধরা যায় । একটা লম্বা শ্বাস ফেলতে ফেলতে খালা আমার দিকে চেয়ে বললে ‘সবুরন, মা রে দুনিয়াডা আজব জায়গা, তার মানুষ আরও আজব । আমি বড় খাতিরজমা ছিলাম । অ… আ… ক… খ শ্যাষ করলাম । হেরা কইত আপনের বহুত আক্কেল আছে । এত জলদি শিখতে পারছেন, বেশি দিন লাইগত না, আপনের লিখাপড়া দুই রপ্ত হইয়া যাইব । হাঃ নসিব । তহনই দু’ জনারে দুই জেলে বদলি কইরা দিলো । যেদিন ওরা গেলো, সারাদিন চক্ষের পানি ফেলছি । কাউরে জানতে দেই নাই । অহনও তাগোর কথা মনে উডলে, বুকডা খালি খালি লাগে ।’ ওদের অনেক কথা খালার স্মরণ আছে । মাঝে মাঝে জিগাইতাম, বেশি কিছু কইত না । বলতো, ‘কেউ নাই । বাংলাদেশের লড়ায়ে সব গ্যাছে গ্যা ।’ পাছে কোন কষ্ট পায়, তার বেশি খুঁচিয়ে এগোতাম না । কিন্তু আমি মনে মনে ভাবতাম, খালার চোরামি খস্‌লৎ কবে থেকে । এসব কাউকে জিগানো যায় নাকি? তাছাড়া খালাতো আমার মা হয়ে বসে আছেন । বড় দরদী । হাজতে খাওয়া দাওয়া শোয়া পেশাব-পায়খানা নানা অসুবিধে । খালা নিজের মার মতো যদ্দুর পারেন, করে যেতেন আর বলতেন, ‘বেডি, আমার মাইয়া থাকলে কী তার কোনো অসুবিধায় চুপচাপ বইসা থাকতাম ।’ একদিন খালাকে জিগাই, ‘আপ্‌নে বললেন, চুরি না করে থাকার পারেন না । যে-দুই বুবুজানের কথা বলেন, যারা আপনারে লিখাপড়া শিখাইত তাগোর কিছু চুরি করেন নাই?’ ‘তোবা তোবা, কী যে কস্‌ মা । হেরা ফেরেস্তার লাহান বেগুনা, তাদের আবার চুরি করা যায়? তবে দু-গা পিলেস্‌-টিক না কি বলে খুব দাম কম, দু-গা মাথার কাঁটা রাইখা দিছি । জেলে ঢোকার সময় চুলে গুঁজে রাখি । আবার বাইরে গেলে বাকস-প্যাটরা যা থাকে, তার ভেতর থুয়ে দিই । হে কথা আর তুলিস না, মা । পোড়া কপাল, হেরার সাথে থাইকলে তো এ্যাদ্দিন মানুষ হইয়া যেতাম । বই, শেলেট, পিন্‌সিল সব জেলেই থুইয়া দিলাম খালাস পাওয়ার কালে । কী হবে ওসব? কে আমারে অমন দরদ আর মেহনত দিয়া শিখাইব ।’ এই হাজতে খালা ছিলো অনেকের বুকের পাঁজর । যত দুঃখই

AMARBOI.COM

থাক, রঙ্গ একটা-না একটা খালা বের করবেন, তখন হেসে অস্থির। আর শাস্ত্রীর লগে রগড় করতে তার জুড়ি ছিলো না। আর কারো অসুখে কোনো ডাক্তার যদি এসে পড়তো, খালা তাকে বলতেন, 'কিছু দুওয়াই দেবেন না ডাক্তার সাব। দেন একডু বিষ।' ডাক্তার বললে, 'বিষ তো দাওয়াই।' তখন খালা জবাব দিতো, 'আপনেরা খামখা এতো লেখাপড়ি শিখেছেন। এক দাওয়াই আছে, তার নাম বিষ। হে ওষুধ থাকতে আপনেরা এটা-ওটা দ্যান কেন? ইডা তো কোনো আক্কেলের কাম না।' খালার সাহসও বেজায়। জেলের বড় ডাক্তার। তার মুখে মুখে সওয়াল-জবাব। বুকের পাটা লাগে। পরে আমাকে বলেছিল সে, 'সবুরন, ভাত না পাইলে মানুষ বিষ খায়। বিষের পরিমাণ ত দুনিয়ায় কম। অথচ সে দিকে লোকে দৌড়ায়। আরে ভাতের কথা ভাবিস নে কেন? আমি ত ভাত পাওয়ার জন্যে জেলে আসি।' আজব ছিলো খালার দুই বোন-ঝি আর তেমনই আজব খালা। কিন্তু আমার কপাল, এক মাসও যায়নি এক দিন তার কেসের তারিখ পড়লো। খালা যাওয়ার সময় বললে, 'মা, ডরাস না, আমি আবার আইমু। বাইরে ভাতের বড় টানাটানি।' মনটা বড়ো ঝিমিয়ে গেলো। দুই তিন দিন তো হাজত আমার কাছে দোজখ মনে হতো। শহরে মুরুব্বিরা রেখেছিলো বড় আরামে। এক কামরায় দু'জন তিন জন। খাট-পালঙ্কের বিছানা। লগে গোসলখানা। হঠাৎ হাজতে এসে আমার কিন্তু তেমন তক্‌লীফ হয়নি। আমি ভেবেছি বাজানের কথা, ভেবেছি আমি কোন্ বিছানায় শুয়ে মানুষ? একটা বড় তক্তপোশ ছিলো দাদার আমলের। বাঁশের ঘুপচি কামরা পাশাপাশি দু'খানা। তার ভেতর হাঁড়ি-পাতিল, ছোট-খাট গেরস্থালির নানা জিনিস। ছোটখাট জানালা এক খান করে। গরমে সিদ্ধ হইতাম না? হঠাৎ বাঁদী থেকে বিবি। আমার মাথায় চক্কর লাগে নাই। তাছাড়া, পয়লা উঠেছিলাম তো বস্তির ভেতর। শহরের বস্তি তো আগে দেখি নাই। গাঁয়েও আছে। ঘুঁজি গলি, লাগালাগি ছোট ছোট অনেক বাড়ি থাকলে, বলা হয় বস্তি। কিন্তু শহরে এসে কী দেখলাম? হায় আল্লা! গাঁয়ের চাচা সুবাদ সে-ই বাপজান-কে বলেছিলেন, 'ভাই গরীবের দুঃখ, অনেক সময় কিছু করার থাকে না। তবু নড়েচড়ে দেখা উচিত। মেয়েডার নসিব খারাপ। জামাই থাইক্যাও নাই। বাঁইচা আছে কি-না আল্লা মালুম। আপনে এক কাজ করেন, সবুরন-কে শহরে পাডান। একডা খাওনের প্যাড কমল। মাস-মাস কিছু টাকা পাইবেন।' তারপর চাচা পাশের গাঁয়ের কয়েকজনের তুলনা দিলে। বাজান তাদের চেনেন, রাজি হয়ে গেলেন। আমি তো আগে থেকে মন ঠিক করে ফেলেছিলাম। হাঁচা কথা। সংসারে একটা পেট কমবে। আধ-পেটা খেয়ে থাকে বাজান, মা। বেচারা মা। ছেলেপুলে নাই। আমাকে কোনো কষ্ট দেন না। আমার বড় মায়া পড়েছিলো তার উপর। নিজের মাকে তো মনে নাই। কী মনে থাকবে? দু'বছর তখন বয়স। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। আর বড় আশা এক দু'মাস গেলে বাপজান-কে টাকা পাঠাতে পারবো। দশ পনেরো টাকা তো মাইনা হবে। আর শুনেছি, সাবরা শাড়ি জামা বকশিশ দেয়। তা মার জন্যে পাঠিয়ে দেব। মা খুব খুশি হবেন। নিজের উপর রাগ ধরতো। যদি ব্যাটাছেলে হতাম কবে বাপ-মার কামে আসতাম। মেয়ে হয়ে এতো দুক্ষু। আহা, বাপ চাচাকে-নিজের চাচা হলে এত ভাবনা লাগতো না, বললেন, 'তুমি কবে যাইবা?' 'পরশু'। 'সেদিন ওরে নিয়ে যাইতা চাও। কিন্তু রাহা খরচ ত লাইগব।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হে আপনে চিন্তা কইরেন না। অহন আমি দিই, পর ওর মাইনা হইলে শোধ দিয়া দিবে।' আহা, বাপজানের মুখ দেখে বুঝেছিলাম, তার বুকে কতো আন্দেশা, কতো আহাজারি। আজ সবই মনে পড়ে। বুক খালি হয়ে থাকে নিঃশ্বাস নিলেও। মা-তো রওয়ানার সময় কেঁদে ফেললেন। দুই চোখের পানি আর থামে না। সৎ মেয়ের জন্যে কেউ এমন করে নাকি? আর আমার দশা বেশি বলে কোনো লাভ নাই। চারিদিক আন্ধার আর আন্ধার ঠেকে। চোখের পানি তা আরো গহিন করে দিলো। বাপজানের কদম-বুসির অক্তে তিনিও হাউমাউ করে উঠলেন। চার বছর হয়ে গেলো তাকে দেখি নাই। বুকে কতো আথালি-পাথালি। ভেবেছিলাম, আর বেশি দিন না, বাজানের নজ্‌দিক বাকি জীবনের জন্যে চলে যাবো। আর শহরে না। মাস-মাস তিনি টাকা পান, খবর পাই না। তবে বিশ্বাসী মানুষ কাজী সাব। সন্দেহ খামকা। পাগলের মন। কোথা থেকে এসে আবার ধাক্কা খায়। বস্তির কথা থেকে কোথা এসে ঠেকলাম? শহরের বস্তি। আল্লা, সে তো দোজখ! গাঁয়ের বস্তি তো এমন নয়। অন্তত পায়খানা করার জন্যে কারো ভাবতে হয় না। ঝোপঝাড় আছে। চাচা এনে তুললেন এক জায়গায়। আমার কাছে রেল গাড়ি, রিক্‌শা গাড়ি সবই নতুন। আগে তো দেখি নাই। যেদিকে চাই ভয়-ভয় আর অবাক লাগে। চাচার বাসা দেখে তো আমার মাটির উপর তখনই বসে পড়ার কথা। মাথা ঘুরছিলো। রাত্রে পৌছলাম। তাই সব দিকে নজর ছিলো না। চিলতে আলোয় যে-টুকু দেখা যায়। কিন্তু কী বাসা? গাঁয়ে গোয়াল-ঘর তো এর চেয়ে ভালো। পরদিন সকালে জায়গাটা দেখলাম। রেল লাইনের ধারে বাসার পর বাসার সারি। বাসা মানে মাথা ঠেকে যাওয়ার কথা কী, একদম গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয়। সব ঘর বাঁশেরও না। যে-যা টুকিয়ে পেয়েছে তা-ই দিয়ে ঘরের চাল আর বেড়া বানিয়েছে। রেল-লাইনের পাশে খাদে পানি আছে। পানির কল আছে রাস্তার ধারে। অনেকখানি হেঁটে গিয়ে তবে খাওয়ার পানি আনতে হয়। চাচা অনেক দিন শহরে চলে এসেছে। চাচি আছে দুই বাচ্চা নিয়ে। কী সুখের আশায় তিনি গাঁ ছেড়েছেন? আমি জানি শুধু দু'মুঠো ভাতের খোঁজে। মাসের পর মাস উপোস দিয়ে তো ভিটা আঁকড়ে পড়ে থাকা যায় না। চাচাকে জিগাতে ইচ্ছা হয়েছিলো। কিন্তু কে জানে, কি মনে করেন। আর এখন তো তার হাতে। একা তো দেশে ফিরে যেতে পারবো না। চাচাই একমাত্র ভরসা আল্লার পরে। চাচার কামরা— যদি কামরা বলা যায়, মাত্র একখানা। তবে বেশ একটু বড়ো। তারই ভেতর শোয়া। আমি এক কোণায় তার আট-দশ বছরের দুই ছেলের লগে। রাত্রে ঘুম হয় না। যেনো কবরে শুয়ে আছি। গোর আজাব শুরু হয়েছিলো। গরম। বেড়া একটু ফাঁক-ফাঁক করে দুই দিকে বাতাস যাতায়াতের একটু রাস্তা বানানো। সকালে পায়খানা ফিরতে গিয়ে আমার কান্না পাচ্ছিল। খাদের উপর উঁচু টঙয়ের মতো বানানো। চট-ছালা দিয়ে চার পাশে ঘেরা। উপরে ফাঁকা। কে জানে, উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে যখন রেলগাড়ি যায়, তাদের ভেতরে চোখ পড়ে কি-না। পায়খানায় পৌছতেও হুঁশিয়ার হতে হয়। খাদের কিনারায় পানি জমে গেছে। পানা-বন তার উপর। এই পানা ঠেলে তবে রাজ-তখ্‌তে গিয়ে বসতে পারো। আমি ভেতরে-ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিলাম। এখানে আর এক লহমা-ও না। আমি দেশে ফিরে যাব। হে, আল্লা আমাদের দ্যাশে নিয়া যাও। সেখানে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না খেয়ে থাকব, তবু এই দোজখে না। চাচির কথায় আবার বুক কিছু হালকা হয়। সে বললে, 'মা সুখে আছি কী? তবে শহর বইল্যা কথা— বেশি দিন বেকার থাকা পড়ে না। একডা না একডা হিল্লা আল্লা জুটিয়ে দেয়। অন্তত প্যাডের ভাত মেলে। গাঁয়েথন কি সাথে আইছি, মা। পয়লা তোর চাচা আইল। তারপর আমাদের নিয়া এলো। আমি তো শুধু কাইন্দ্তাম আর কাইন্দতাম, অহন সব সইয়া গ্যাছেগ্যা।' কিন্তু সয়ে-সয়ে দশা তো ফিরেনি। এমন অবস্থা আমি হতে দিব না। মনে মনে কিরা কাটলাম। আমি বাপের বেটি। একবার ভয়, আবার বুকে সাহস। এইভাবে এক হপ্তা কাটলো। চাচার রোজগার ছিলো এক রাজমিস্ত্রীর যোগালিয়া। শহর তো আগে দেখি নাই। ইমারতের সারি আর কতো বাড়ি না তৈরি হচ্ছে। চাচা বললে, অহন কামের অভাব নাই। কিন্তু বাড়তি পেট তো আমি। চাচার কিছু গরজ ছিলো, আমাকে কোথাও কাজে দেওয়া। সাতদিন এই বস্তির ভেতর কতো কি না দেখলাম। চাচার বড় ছেলের, দশ-বারো বয়স, এই বস্তির স্কুলে পড়তে যায়। ছুটির দিনে সে আমাকে আশপাশ ঘুরিয়ে নিয়ে এলো হেঁটে হেঁটে। আমার চোখে সবই আজব মনে হয়। কিন্তু গাঁ থেকে আলাদা নয় এই বস্তি। এখানেও মানুষ নসিবের লগে লড়ে। কারো বেশি বাড়তি কিছু নাই। সুযোগ পেলে চুরি হয়। আর বাড়তি না থাকলে, ছোট-খাট জিনিস নিয়ে কাইজ্যা-কোন্দল। সারা রাত কতো মেয়ে-পুরুষের গলাবাজি। একদিন ছেলেপিলের মারামারি নিয়ে লেগে গেল দুই মা। তারপর দুই বাপ। এখানেও মুরুব্বি আছে গাঁয়ের মতো, পাড়া-প্রতিবেশী আছে। তারা এগিয়ে এসে মিটিয়ে দেয়। তবে দুই দল চুপ করে। আরো ব্যাপারে আছে। আমরা তো বেশি রাত জাগি না কেরোসিন আক্কাড়া। চাচা কাজ থেকে এলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। আমরাও। তারপর কয়েক হাত চওড়া উঠানে একটু বসে পরে ঘুমোতে যাই। ঘুম তো সহজে আসে না। চোখ বন্ধ করলেই কোথা কোথা না মন ধেয়ে বেড়ায়। কি আছে নসিবে আমার? এই সওয়াল তো হামেশা ঘিরে ধরে। কোন জবাব নিজে দিতে পারি নে। আল্লা জান্ ভালো রাখছে ক'দিন তার কাছে শোকর। যেভাবে রাত-কাটানো শরীর খারাপ হতে-বা কতক্ষণ। চাচার উপর বোঝা। আশপাশের মেয়ে দু' একজনের সঙ্গে জানা-শোনা হয়েছে। জিগায় কুথা গ্রাম, বাপ-মা আছে কিনা। কেন শহরে আইলাম। বিয়া হইছিলো, স্বামী কেন বিবাগী। এমন কথার জবাব দিতে ভালো লাগে না। একদিন বিকেলে চাচির কাছে এক বেডি এলো। বেডি নয় ব্যাডা। একদম পুরুষ মানুষের লাহান। মোটামোটা গর্দান। এই মোটা। চেহ্‌রার দিকে চাইলে ভয় করে। গলা তো বাজখাঁই। চাচি তাকে পান দিলে। আমাকে দেখে জিগায়, আমি কে? চাচি বললে, ভাইয়ের বেডি। ধুমসী বেটি কিছু গপ্‌শপ করে চলে গেলো। সেদিন রাতে ঘুম আসে না। চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। অনেক রাত। হঠাৎ ফিসফাস শব্দ কানে আসে। কান খাড়া করে শুনি। চাচি বলছেন, একই তো ঘর। ভেবেছে, আমরা ঘুমাইছি। চাচি কয়, 'রমজানের বাপ, এই বেডিরে জলদি বিদায় করো।' চাচার জবাব, 'ক্যান।' 'সেই ধুমসী মাগীডা আজ আইছিলো। গোটা বস্তি জ্বালাইয়া খাইছে। পরের মেয়ে আনছ, মানে মানে কাম দেইখ্যা দাও। ওই বেডির লগে কী কাইজ্যা করতে পারবে? কত গুণ্ডা-পাণ্ডা। মেয়েটার বয়স কম। শরীর বেশ তরতাজা। দেখতে খুপসুরাৎ। আমি কসম আল্লার বলতে পারি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেডির নজর পড়ছে। কাইজ্যা কইর‍্যা পারবা না ও গুণ্ডাদের লগে। আনছ পরের মাইয়া ইজ্জতে ইজ্জতে য্যান দ্যাশে ফিরা যায়।' চাচা তখনই জবাব দেয় না। পরে বলে 'খুব বালা কথা কইছস। হালা গরীবের কোথাও সুখ নাই। প্যাডের ভাত জোডে না, গাঁও-গেরাম থেইক্যা দুঃখী মানুষেরা আসে তাগোর উপকার করবি না, হেরা আসে প্যাডের জ্বালায়, এহানে মানুষের চ্যাঁডের জ্বালা। প্যাডের ভাত আছে শালাগো। আর কী বা করবার পারে?' শেষের দিকে চাচার গলা চড়ে গিয়েছিলো মেজাজের চোটে। তা আমি আওয়াজে বুঝে ফেলি তখনই। এ আবার কোন্ মসিবত। হঠাৎ বিবাগী জামায়ের কথা মনে পড়লো। বড়ো পেয়ার করতো। কিন্তু কী হলো অমন জোওয়ান মানুষটার? কেনো আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলো? আজ আমার এই দশা তো শুধু তার জন্যে। রাগ ধরে গেলো। গেছে যাক। সেই মুখ আর দেখার সাধ নাই। কিছু টাকা রোজগার করতে পারলে বাকি জীবন বাজানকে নিয়ে কাটিয়ে দেব। গাঁয়ে ফিরে যাব। হে আল্লা, দয়াল মাবুদ, আমারে দ্যাশে নিয়া যাও। চাচার কথার ইশারা আমার বুঝতে দেরি হয় না। বস্তির ভেতর আর এক রকমের ব্যবসা চলে। চাচা-চাচি দুই জনের বয়স হয়ে গেছে। দুই জন আছে মাথার উপর আমার ভয় কিসের? কিন্তু চাচির কথা আবার আমাকে তলিয়ে দিলে। ধুমসী মাগীটার গুণ্ডাষণ্ডা আছে। তারা কি করে? জোর করে কাউকে ধরে নিয়ে যায় না কি? এই তো মুলি-বাঁশের বেড়া। কাটতে তো সময় যায় না। কিন্তু শহরে ত রাত্তিরেও বাতি জ্বলে। এ তো আর পাড়া-গাঁ না, রাইতে আন্ধার। তখন চোর ডাকাত বদমাশরা দাঁও পায়। শহরেও এমন কাণ্ড ঘটে। সহজে আর ঘুমাতে পারি নে। এ কোন্ ঠাঁয় এসে পড়লাম? চাচিকে বিহানে জিগাই। তখনই নিজে-নিজে দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কাটি। এ-সব কথা কি মুরুব্বির লগে বলা-কওয়া যায়। তৌবা, তৌবা। ওই ধুমসী মাগী আবার দু'দিন পরে এসেছিলো। কিন্তু চাচার আল্লা ভালো করুন, আমার চাকরি হয়ে গিয়েছিলো। এই শহরেই পশ্চিম দিকে এক সা'বের বাড়ি। চাচা তার কাম করেছিলেন বাড়ি তোলার সময়। নতুন বাড়িতে সা'ব উঠে গেছে, অন্দরে কাজকর্ম করার লোক দরকার। আল্লা চাচার মঙ্গল করুন। বড়ো নেক্‌কার মানুষ। মনে হয় কি? সত্যি। আমারে কতো কী শিখিয়ে দিলেন। শহরে থাকতে গেলে ঠিকানা জানা লাগে। রাস্তার নম্বর, রাস্তার নাম, এলাকা। এলাকার নাম জানলে, তাড়াতাড়ি যে-কেউ বলে দিতে পারে জায়গাটা কোথায় পড়বে ঠিক বাড়ি না চিনলেও। বাড়ির নম্বর ছাড়া ঠিকানা বের করা দায়। 'এ তো আর গাঁ নয় রে মা, হগ্‌গলে হগ্‌গলকে চিনে। এ শহর। অনেক লোক, অনেক বাড়ি, অনেক ধনদৌলত। আবার বহুত পাপ, বহুত কসুর। মা, আক্কেল হুঁশ কইরা চলবা। এখানে পেটের ধান্দায় মানুষ আসে। নইলে নিজের বাপ-দাদার ভিটা ছাইড়া কেউ আসে নাকি?' চাচার তরে মাঝে মাঝে মন খারাপ করে। ভালো মানুষ। এক শহরে আছি, তবু আর দেখা হয় না। রাস্তাঘাট এখন প্রায় আমার চেনা। দশ বছর এক শহরে আছি। তার চেয়ে বড়ো কথা, ঠেকে-ঠেকে অনেক বেশি শেখা যায়। জানি না, ওরা এখনও সেই বস্তির মধ্যে আছে কি না। চাচিও ভালো মানুষ। সেদিন রাইতের কথা থেকে বুঝেছি। কিন্তু, আমি? আমি অনেক ঘাটের পানি খাইলাম, বহু মানুষ দেখলাম। সে সব আর মনে করতে চাই না। এমন অবস্থায় এসে পড়লাম।

AMARBOI.COM

বাপজানরে চিঠি দিতে পারি না। আমি তো মুরুক্ষ রয়ে গেলাম। আর কাউকে দিয়ে লেখাতে পারি। পয়সা থাকলে লোক পাওয়া যায়। আর আমার মুরুব্বি কাজীসাব আর যা-ই হন আমার সাথে দাগাবাজি করবেন না। তিনিও আমার মতো সামান্য রোজগার, তারপর চুপচাপ জীবন কাটিয়ে দিতে চান। এমনই ফেরে পড়লাম। ঠিকানা ঠিক থাকলে অসুবিধা। অনেক সময় নাম বদলাতে পারলে আরো ভালো হয়। এসব মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না। গত চার বছর তিনি আমার দেখাশোনা করেন। তার কথামতো চলি। পদ্মা নদীর বানের মতো জীবন কখন কোন্ দিকে বয়ে যায়, বুঝা দায়। এখন মনে হয়, আমার দয়া-মায়া শুকিয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতর। বাপের কথা মনে হয়। হাজতে এসে আরো ধাক্কা খাই। কিন্তু তার আগে নিজের ধান্দায় সব যেনো ভুলে থাকতাম। বাপজান মেয়ের নাম ঠিকই রেখেছিলেন। আমি সবুর করতে পারি। কিন্তু কতো দিন? তাছাড়া যেখানে এসে পড়লাম, সেখান থেকে উদ্ধার পাব তো? তবে পুলিশের লোক বলেছে, হাচা সাক্ষী দিলে আমার কোনো শাস্তি হবে না। কিন্তু আমার শাস্তি হবে কেন? আমি তো যেনো ছোরার বাঁট। সঙ্গে আছি। নচেৎ দোষ তো যে ছোরা চালায় তার। এখানে হাজতে আরেক আসামীর কাছ থেকে শুনলাম, এমন সাক্ষী হলে তারা মাফ পেয়ে যায়। কিন্তু আমার মুরুব্বি কাজী সাবের বিরুদ্ধে তো সাক্ষী দিতে হবে। তখন ভাবি নাই। সাক্ষী দিলে তো তার মেয়াদ হয়ে যাবে। তা হলে আমার দশা কি হবে? আমার টাকা-পয়সার হিসাব তো তিনি রাখেন। দুই হাতে দুই গাছি সোনার বালা সম্বল। তা জেল-গেটে জমা আছে। কিন্তু যদি ফিরে না পাই। আর কি নেমকহারামি না হবে। কপাল-গুণে এই মানুষটা পেয়ে গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে নয়, আজকাল প্রায়ই এসব কথা মনের ভেতর আথালিপাথালি করে। খালা ছিলো সঙ্গে। বেশ ভুলে থাকতাম। শুনলাম খালার আবার এক বছর জেল হয়েছে চুরির কসুরে। কিন্তু তাকে অন্য জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে গেট থেকে। আমার নৌকা ঘাটে এসে বুঝি ভরাডুবি হয়। কোথা দিয়ে কী হলো বুঝার কাজ আমার নয়। কাজীসাব কিন্তু প্রায় বলতেন, কোনো বিপদ এলে ঘাবড়াতে নাই। পুলিশ তাকেও হাজতে নিয়ে গেছে। মরদ-কিতায়। একবার দেখা হলে জেনে নিতাম সব বেত্তান্ত। কিন্তু হাজতে শুনলাম, দেখা হবে আদালতে হাকিমের সামনে। তখন কথা বলা নিষেধ। আসামী কেবল উকিলের জেরার জবাব দিতে পারে। আর হাকিম যদি কিছু জিগায় তার উত্তরে। আখেরে কী আছে জানেন আল্লা মাবুদ। আমার ঘুম রাইতে হঠাৎ ভেঙে গেলে বুক মোচড় দিতে থাকে। কী যে করি। ঢাকা জেলায় সোনারগাঁ আছে। না, আমাদের গাঁ-ই সোনারগাঁ, যদিও নাম হিজলিয়া। শহরে না এলে কি হতো? সারা জীবন কষ্ট লেগে থাকতো সংসারে, খেতে পেতাম না, কাপড় থাকতো না পিন্ধনের। কিন্তু সে কষ্ট কি এতো বুক পোড়াতে পারতো? আর এতো মোচড়। সাক্ষী হাঁচা দিলে নেমকহারামি হবে। লোকটা কোথাকার, কি, আমার সব জানা নাই। কিন্তু লোকটার দয়া না পেলে সুখের আশা করতে পারতাম না। শহরে না এসে আর কী করতে পারতাম। একবার নিজেই বাজানের কষ্ট দেখে কইলাম, 'আমারে হউর বাড়ি দিয়া আসেন।' তিনি পয়লা রাজি হন না, বললেন, 'হেরাও গরীব রে মা। পোলা নাই। অহন পোলার বউ পুইষব, মনে বিশ্বাস লয় না।' তবু আমি জিদ ধরলাম। 'একবার

দ্যাখেন না, বাজান কোনো ক্ষতি নাই তো।' একদিন বাজানের কাজ ছিলো না, তিনি আমাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পৌছলেন। দুই কোশ রাস্তা খুব বেশি না। বোরকা নাই। একটা পুরাতন কাপড় কোনো রকমে বোরকার মতো জড়িয়ে হেঁটে গেলাম। বোশেখ মাস, ঘামে শরীর একদম ছপ্ছপ ভিজা। শ্বশুর-বাড়ির নিকট দিয়ে এক গাব তলায় বাপ-বেডি জিরাই। জামা-কাপড় কিছু শুকালে আবার হাঁটা দিই। মনের কথা শুধু আল্লাপাক জানেন। শেষের দিকে আর পা উঠছিলো না। এক বছরে দুইবার এসেছিলাম। বিয়ার সময় এবং পরে আর একবার। পনেরো দিন ছিলাম। তারপর আরো দু'বছর গেছে। ওরা কোনো খোঁজ নিলো না। বাজান আর কী করেন। কথায় কথায় তিনি নসিবের দোহাই মারেন। তা-ও ফেলে দেওয়া চলে না। নসিব তো দোস্‌রা রকম হতে পারতো। সকলের জীবন তো আমার মতো নয়। বড় মান্‌ষের কথা বাদ দিলাম। আমাদের লাহান গরীবদের মধ্যে কোন মেয়ের কপাল তো এমন পোড়া নয়। শ্বশুরবাড়ি পৌছুতে আগে দেখা শাশুড়ির লগে। অন্দরের মুখে আমি। শাশুড়ির হঠাৎ চোখ পড়ে। তাই 'কে-আইল' এমন ভাব জাগা স্বাভাবিক। আমি তখন ঘোমটা সরিয়ে ফেলেছি। তিন বছর কেটে গেছে। কিন্তু শাশুড়ি আমাকে ভুলে যাননি। বুকে জড়িয়ে ধরে কী হাউমাউ কান্না। পাড়ার আরো মেয়েরা আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসে। 'এমন সোন্দর বউ, চোখ দুডা য্যান মায়ায় টাইন্যা লয়। কবাল, কবাল নইলে আজ এই দশা হয়'— কে কথাটা বললো, আমি জানি না। শরমে মুখ নিচু করে থাকি। পাড়ার সাত-আটজন মেয়ে এক জায়গায়। কিন্তু কথাগুলো আজও আমার কানে বিঁধে আছে। বাপ আমাকে পৌছে দিয়ে ওজর দেখিয়ে আমার শ্বশুরের কাছ থেকে তখনই বিদায় নিয়েছিলেন— পরে আমি শুনতে পেলাম। বুকটা ধক্‌ধক্ করতে লাগলো। রোদ্দুরে দেড় ঘণ্টা হেঁটে এসে তখন আবার রোদ্দুরের ভেতর। হয়তো শ্বশুরের ব্যবহারে কিছু ছিলো। তা যে ছিলো, আমি পরেই বুঝতে পারলাম। পাঁচ দিন পরে। এদের সামান্য জমিজেরাত আছে। চার মাসের ভাত হয়। দু'টি কামরা। মাটির দেওয়াল। ভালো ঘরেই আল্লা দিয়েছিলেন। কিন্তু সইল না। শাশুড়ি আমাকে যেনো বুকে বুকে করে রাখতে পারলে খুশি হন। এতো দরদ আর কখনও জীবনে পাইনি। খাওয়ার সময় নিজের পাত থেকে তরকারি তুলে দেন। জিদাজিদি করেন : 'এক মুডা ভাত লও মা। মাথার কিরা।' পেট বুক সঙ্গে সঙ্গে ভরে যায়। তবু মুরুব্বির অনুরোধ। থোড়া ভাত নিতে হয়। কিন্তু একদিন শ্বশুর-শাশুড়ির ফিসফিস কাইজ্যা আমি পাশের ঘর থেকেই শুনতে পেলাম : হে কি আর ফিরা আইব? সংসারে আগুন দিয়া গেছে, এমনই পুত। খামকা আর একে জড়িয়ে রেখে লাভ কি? বাপের মাইয়া বাপের কাছে ফিরা যাক। বুড়া মানুষ তুমি। তোমার ছেলের বউ। অহন আমাগো বংশের মাইয়া। ওর আবরু ইজ্জত গেলে আমাগো নাক কাটা যাইবো। থাকুক না আমাগো লগে। ভুইল্যা যাইও না, আর একডা বাড়তি প্যাড। হের কাবড়-চোপড়, মাথার ত্যাল, অসুখ-বিসুখ। এত ঝক্কি আর এই বয়সে নিতা পারুম না। তয় তুমি কও, হেরে বাপের বাড়ি ফিরা যাইতে। আমি পারতাম না। ক্যান, কথায় কথায় ইশারা দাও। কও, মাইয়া তোমার বাপ য্যান একবার আহে, দরকার আছে। হে আমি পারতাম না। আচ্ছা, ছাড়ান দাও, আমি বিয়ায়ের লগে কথা কমু। তারপর এক হপ্তা গেলো না,

একদিন বাজান আইলেন। হেদিনও এ বাড়িতে এক গেলাস পানির বেশি কিছু খাইলেন না। আমার তৈরি হতে যা দেরি। আবার বাপ-বেটি রাস্তার উপর। শাশুড়ির কথা আজও ভুলতে পারি না। আসার সময় আমাকে একটা পুরাতন শাড়ি আর জামা দিলেন। মাথা আঁচড়ে দিলেন নিজের হাতে। এগিয়ে এলেন অন্দরের শেষ সীমা তক্ ভিটার কিনারে। রাস্তায় নামলাম। কানে পড়লো হাউহাউ কান্না। এই বাড়িতে ক'দিন আগে পয়লা পা দিতে যে কান্না শুনেছিলাম। আরো জোরে। অনেক দূর তক্ শোনা যায়। তারপর কান্নার শব্দ হয়তো আর এতো দূর আসছিলো না, কিন্তু গোটা পথ আর কিছুই সেঁধোয় না আমার কানে। চোখ পানিতে বার বার অন্ধ। বাজান যেনো টের না পান, তাই ফুঁপাই না। বার বার নিঃশ্বাস নিয়ে নিয়ে বুক শক্ত করি। মাঠের ভেতর কতো লোক যাতায়াতে ব্যস্ত। আমার ঘোমটা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। সব যন্ত্রণা ঘিরে রাখছিলো সেদিন। পা-ও ঠিকমতো পড়ে না। বাজান সামনে, আমি সামান্য পিছনে। বার বার আমি আরো আরো পিছিয়ে পড়ি। তিনি তাড়া দেন। পা জোরে চালাই। তাগদ ফুরিয়ে আসে। তবু বাড়ি পৌঁচেছিলাম। দু'দিন ঠিকমত খাইতে পারি নাই। খামখ্যা কেন গেলাম আবার নিজোর দাবির ঘরে? ঘর হলো কবর। আমি আর জ্যান্ত নই। পেতনী (প্রেতনী) হয়ে ঘুরে বেড়াই এই দুনিয়ার বুকে। এই ভাবে অনেক কিছু সইতে শিখলাম। এখন মনে হয়, বুক পাথর হয়ে গেছে। নইলে সাত-আট বছরে হাজার ঝড়-ঝাপটার ভেতর বেঁচে রইলাম কি করে? যে বাজান লগে ছিলো, আজ কত দূরে। শুধু টাকার সম্পর্ক আছে। তা-ও অন্য কারো হাত দিয়ে। পোস্টাফিসের হাওয়ালায় টাকা পেতে পারতেন। তা বন্ধ। কাজী সাব বলেছেন, 'সবুরন, তোর টাকা আর এই এক দুশ' টাকা মাস-মাস মেরে কেউ বেইমানী করবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।' কথা অবিশ্বাসের মতো কিছু নেই। আমার মন সায় দেয় ষোল আনা। কিন্তু যদি কোনো গণ্ডগোলে বাজান না পান। এমন সন্দেহ যে হয় নাই তা নয়। কিন্তু মাত্র দু'-একবার। কাজী সাহেবের জন্যে অনেক মসিবত থেকে বেঁচে গেছি। এখন বুঝেছি সবই নদীর ছয়লাবের মতো। তুমি কখন কোন্ রকম বানের মুখে পড়েছ, তারই উপর লেখা হয়ে যায় তোমার জীবন। কাজী সাব না হয়ে অন্য বদমাশের হাতে পড়লে আর-এক ধারায় ডুবতাম বা ভাসতাম। অমন মানুষ, কিন্তু ধরা-ছোঁওয়া দিতে নারাজ। বেহায়া ইশারার মানে বোঝে না। অথচ আমি তো দোসরা মানুষের লগে বাইরে যাই। অহন বুঝেছি, দুনিয়ায় সবচেয়ে সহজ কাপড়-চোপড়ের ফুটানি। শিখতে কিছুই লাগে না। শুধু মাল থাকলেই হলো তারপর রপ্ত হতে কয়েক দিন। আমি তো তিন-চার বছরে বিবি বনে গেলাম। কেউ বুঝতেই পারবে না একদম গেরামের মাইয়া। কথা বলার বেশি দরকার করে না। আমি যখন কারো সঙ্গে বাইরে যাই, তারা তো কথার জন্যে আসে না। বড় মানষের খেয়াল, মেয়ে-মানুষ নিয়ে রাত্রে হোটেলে সফর। এখানেও কাজী সাবই সহায়। কারণ, মানুষগুলো তো তার কাছেই আসে। আমাকে খুব বাইরে যেতেও হয় না। তবে মাঝে মাঝে কাজ পড়ে। তখন আমি যাই। কাজী সাহেব জানেন। তার হুকুম ছাড়া তো কোনো কাজ করি না। বড়ো বিপদের দিনেই ওকে আল্লা জুটিয়ে দিয়েছিলেন। নইলে আর কোথাও ভেসে যেতাম। তাই বলি, সবই নদীর বান। সোঁতে কে কোন্ দিকে যাবে, তার গোড়া ওই

AMARBOI.COM

বান। চাচা আমাকে বস্তি থেকে এই বাড়িতে কাজে দিলেন। বস্তি থেকে দালান। আমি তো কখনও দালানে ঢুকি নাই। দেখার সুযোগ কোথা পাব? গাঁয়ে মিয়াদের দালান। থুঃ, এসব ইমারতের কাছে গোয়াল ঘর। এক বিঘা জমিনের উপর সাহেবের বাড়ি। বড়ো বড়ো কামরা। দেওয়ালে কি সুন্দর গোলাপী রঙ। আর কতো আসবাব। চোখ জুড়িয়ে যায়। কি রঙে রঙে মাজা, সাবরা কয় পালিশ। রান্নাঘর তো এলাহি কারখানা। কতো রকমের বাসন। কাচের, চীনামাটির, রূপার। খালি সোনার কিছু নাই। তবে সোনার মতই ঝকঝক তকতক করছে। চোখ ফিরানো দায়। চুলায় কাঠ লাগে না, মাটি তেল (কেরোসিন) লাগে না। কল টিপলে জ্বলে, নেভে। সেদিন জেনেছিলাম, গ্যাসের চুলা। আর, পাক করতে কি আরাম। বর্ষাকালে গাঁয়ে তো চোঙা ফুঁকে ফুঁকে হয়রান হতে হয়। আমার চোখ পয়লা দিন ঠিকরে মাথা থেকে বেরিয়ে আসার জোগাড়। আস্তে আস্তে সব ধিমিয়ে গেলো। আদব-কায়দা শিখে ফেললাম। শিখলাম কতো নতুন কথা : এ্যাশ্-ট্রে, ডিস, কার্পেট, ফ্রিজ— এমন নানা চিজ। মিশে গেলাম ধীরে ধীরে। চাচার আল্লা ভালো করুন। বস্তি থেকে যেনো ভেসে উঠে এলাম। রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট ঘর। সেখানে রাঁধুনির থাকার জায়গা। চাকরবাকররা অন্য জায়গায় শোয়। পয়লা রাতে শুয়ে কিন্তু ঘুম এলো না। এদের বাবুর্চি নেই, রাঁধুনি। আমি ফায়-ফরমাশ শুনব। রাঁধুনির লগে বিছানা। সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো। আবার সব গোলতাল পাকিয়ে যায়। মানুষ দুনিয়ায় এত আরাম ভোগ করে। গাঁয়ের মানুষ ছোটখাট চিজ নিয়া কতো কাইজ্যা-ফ্যাসাদ করে। কতো ছুতোনাতা ওদের চেতিয়ে দেয়। ওরা এসব দেখে না। কেউ কেউ টাকার গরম, গয়নার দেমাক দেখায়। গাঁয়ের মিয়া সাবদের বিবিরা তো এখানে মাতারি মনে হবে। কাজের মেয়েলোকদের ওই নামে ডাকা হয়, শহরে এসে শিখলাম। কেউ বলে বুয়া। চাচার আল্লা ভালো করুন। আরামে থাকতে অন্তত পারব। মাইনা পনেরো টাকা। চাচাকে এই বাড়ির সাহেব বলে দিয়েছিলেন কাজ শিখলে আরো বাড়িয়ে দেবেন। মাস মাস পনেরো টাকা! বাজানের তবু কিছু সাহায্য। অন্য দিকে আমার খাওয়া তো আর দিতে হবে না। কোন্ কাজে এলাম অসময়ে বাবা-মার। তা কী কম কথা। বার বার বলি, চাচার ভাল করুন আল্লা। তা কী সাধে। বিবিসাব এই বাড়ির বড়ো ভালো মানুষ। ঠাণ্ডা মেজাজ। কাজে ভুল করলে ধমক দেন, কিন্তু গলা চড়ে না। আর দীলে যে রহম আছে তা পেরথম দিনেই বুঝেছিলাম। 'গাঁথন আইছ?' 'জী'। 'আর বুঝি কাপড় নাই?' মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। বগলে ছিলো গাঁ থেকে আনা পুঁটলি, আর তার ভেতর এক ফালি ছেঁড়া কাপড়, গা-হাত মোছার জন্যে। বিবি সাহেব আরো দু'খানা পুরাতন শাড়ি দিলেন। সঙ্গে একটা ছেঁড়া তোয়ালিয়া। পয়পয় বললেন, 'সাফ সুতরা থাইক্‌বে। সাবান আছে রান্নাঘরে, পাশে গোসলখানা।' মেম সাবের কথা মনে আছে আজও তারপর আরো পাঁচ-সাত জন মেমসাব দেখেছি। কেউ কেউ তার মধ্যে হারামজাদী। মাদী-কসাই নিজের গরমেই ছটফট করছে দিনরাত। এক মোটা মেমের তো গরম কাটাতে যেতো বাইরে। কাজেই মেম চাকর-বাকরদের উপর তম্বি করে শোধ নিতো। মাগী হরদম যেনো গরম তাওয়ার উপর বসা বা খাড়া আছে। ধাতিংতিং নাচে দ্যাখো চৌপহর। মাঝে মাঝে মনে হতো ওর এর-ভেতর চাটুর ছ্যাঁকা দিয়ে দিই, যদি

AMARBOI.COM

শানে। অনেকে আছে, কাজের মেয়েদের তো মানুষই মনে করে না। তাই তাদের নাম থাকে না, হয়ে যায় অমুকের মা বা নানি বা চাচি। আজও আমার বুঝার বাকি থেকে গেছে, শরিফ মাগীগুলো এতো ভালো খায়, পরে, সাজগোছ করে, লেখাপড়াও শেখে বহুত, তবু মাগীগুলো মানুষ হয় না ক্যান? কিছু তো করতে হয় না। এক গাদা খায়, শরীর নড়ার নামে হরদম বেঁকে থাকে। তাই ওদের প্যাডে বহুত ভুড়ভুড়ি ওঠে। এই ভুড়ভুড়ি সুড়সুড়ি হয়ে যায় চ্যাডে। তহন মাথা ঠিগ্ থাকে না। শহরে এসে শুনলাম, মনে রোগ হয়, তার চিকিশ্শার জন্যে আলাদা ডাকতার আছে। আগে কখনও শুনি নাই। এক বাড়ির বিবি, আপা-মা-মেয়ে সাব পর্যন্ত অমন ডাক্তরের কাছে দৌড়াত। মেহনত নাই, দুনিয়ার অন্য মানুষের জন্যে দরদ নাই, শুধু বোঝে আপনাদের প্যাড্ আর চ্যাঁড—বিমারি হইবে না তো কি হইব? হড়াৎ, কথায় কথায় কোথা এসে পড়লাম। মাথা ঠিগ্ রাখা আমারও দায়। জ্বালা-পোড় জীবনে সব কিছু গোছানো সম্ভব হয় না। হ্যাঁ, আমার পেরথম মেম সাবের মতো আর মানুষ দেখি নাই। তার কাজ ছাড়তে হয়েছিলো দেড় বছর পরে। সে-আর এক লম্বা কেচ্ছা। কিন্তু বিবি আজও আমার চোখের সামনে খাড়া আছেন। যেমন ধন দিয়েছে আল্লা, তেমন মন। সকলের সুখ-সুবিধার দিকে তার নজর। আমাকে আগে তো কখনও দেখেননি। অনেক কথা জিগাইলেন। মা-বাবা আছে নাকি? জামাই কেনো চলে গেলো? বাপ ক্ষেত-মজুর, যখন কাজ থাকে না কী করে সংসার চলে। এমন কতো কথা আপনজনের মতো জিগাইত। 'সাব মাইনা ধরেছে পনেরো। আমি তোমারে আর পনেরো দিমু। তোমার বাজানকে তিরিশ টাকা মাস মাস পাঠাই দিবা।' বিবির কথা শুনে সাব আমাকে আরো এক ইলেম দিলেন। তা নইলে আর বেশি টাকার মুখ দেখতাম না। গেরস্থালির কাম আমি শিখা ফেলছি। একদিন বিবি-সাব কইলেন, 'সবুরন, পাকের কাজ শিখ্যা লও। বেতন বাড়বে। আর যেহানেই যাও, তোমার ভাতের অভাব হইব না এই শহরে।' কিন্তু আমাকে শেখাবে কে? পাকের মেয়েটা আধ-বয়সী। তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি এরে কিছু কিছু পাক শেখাও। তোমার অনেক কাজ হালকা হবে। কিছু বিশ্রাম পাবে অনেক সময়। তা-ছাড়া তোমার অসুখ-বিসুখ হলে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।' মার বয়সী মেয়ে, কিন্তু হিংসে বোঝাই। সে ভাবলে, তার চাকরি খাওয়ার মতলব করছে বিবি-সাব। তাই আমাকে শেখাত না খুব মন দিয়ে। আমি দেখে দেখে রাখতাম। কতটা লবণ দেয়, তেল কতখানি। কোন্টা কতটা ভাজা করতে হয়। বিবি-সাব আমাকে পেয়ার করেন। কারণ, আমি তো তার কাছে কাছে থাকি। ফায়ফরমাশ মুখ খুলতে হয় না, করে রাখি যেনো নিজের বাড়ি। তাই তিনি খুব খুশি ছিলেন। ঈদে আমাদের দু'জনকে শাড়ি-বেলাউজ কিনে দিলেন। আমার শাড়ির দাম সামান্য বেশি। তা-ও ওই পাকের বেডির সহ্য হয় না। কিন্তু কোন ভালো পাকসাক দরকার হলে বিবি-সাব নিজেই রান্নাঘরে এসে হাল ধরতেন। শুধু ভালো মানুষ না, পাকেও ভালো। তখন আমারে কইতেন, 'সবুরন দেইখ্যা রাখ, ক্যামনে কী করি।' তার রান্না আমি খুব মন দিয়ে দেখতাম। এমন ওস্তাদ পেলে আর শেখার কষ্ট হয় নাকি? আসল চিজ দরদ। তা থাকলে শেখার কাজ কেন, দুনিয়ায় বসবাসই অন্য রকম হয়ে যায়। মাঝে মাঝে পাকের বেটিকে বলতেন, 'তোমার শাগরেদ কেমন শিখছে, এক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধ-দিন এক-আধটা ওকে পাক করতে দাও।' বিবি-সাবের হুকুম। সে তো আর না করতে পারে না। একদিন পরীক্ষা দিলাম। পাশ। ভালো পাশ। কী একটা তরকারি পাক করেছিলাম, আজ মনেও পড়ে না। কিন্তু বিবিসাবকে মনে পড়ে। কতো রকমের রান্না শিখে ফেললাম। হয়তো নিজের রোজগারে কোনোদিন করাই সম্ভব নয়। তবু শিখে রাখতে দোষ কি? বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট, সমোসা, ইলিশ-পোলাও— সবই সেই বিবিসাবের দয়ায়। কিন্তু এক বছর গেলো না, ওই বাড়ি ছাড়তে হলো। মাইনাও বেড়েছিলো। চাচা এসে-এসে নিয়ে যেতেন। দুপুরে বিবি-সাব ঘুমাতেন। তখন বাড়ির বাইরে ক্রমে ক্রমে যাওয়ার সাহস হলো। বিবিসাবও সায় দিতেন, পথঘাট চেনা উচিত। ঘরে বসে বসে তো মানুষে আহাম্মক হয়। এই শহর আমার কাছে আর আজদাহা সাপ না যে গিলে খাবে, পেরথম-পেরথম যা মনে হতো। কতো বাড়ি না আরো বদল হয়েছে। অনেক সময় তো খামকা চাকরি গেছে। বসে বসে, গতর-না-হিলিয়ে খাওয়া বিবিদের মেজাজ কখন কি হয় বলা মুশকিল। আমি খাটুনে লোক। তবু শরীর ভালো থাকে। আর ওদের নানা রোগ ছেঁকে ধরে। এক বিবি তো সেই হিংসেয় জ্বলে মরলো। প্রায় বিছানায় পড়ে থাকে, ডাকতর আসে। শুয়ে শুয়ে বোধহয় খেয়াল হয়েছিলো আমার মজবুত গতরের দিকে বাড়ির সাব নজর দিচ্ছে। তিন-চার ছাওয়ালের মা। বুড়ির কাণ্ড দ্যাখো। আমি তার ভাতার ভাগিয়ে নিচ্ছি! পেটের ভুড়ভুড়ি— খায়ও ওরা নানা রকম, মেহনত করে না, কখন যে ওদের কোথায় কে সুড়সুড়ি দেয় আল্লাকে মালুম। বগলে কিলিবিলি উঠলে আসে হাসি। আর কোথাও হলে আর এক রকম। তহন হয়তো খাউজানি ওঠে। হিংসে না, সন্দেহ করতো ওই মেম। তা বুঝতে দেরি হয়নি। আমার তো ওই বাড়িতে ফাই-ফরমাশও খাটতে হতো রান্না বাদেও। সাবের ঘরে পানি নিয়ে গেলাম। সাব একটি চিঠি পড়ছিলেন। তা শেষ করে পানি খেলেন। ফিরতেই বিবিসাব জিগালেন, 'সাবের ঘরে এত দেরি ক্যান, ছেমড়ি?' পিত্ত জ্বইলা উড্‌ত। মাগী বিবিসাব হইছে। কথা শোনো! 'সাব তরে এত ঘন ঘন ডাকে ক্যান রে?' দাও এবার সওয়ালের জবাব। এমন বাড়িতে আর বেশি দিন থাকা যায়? শেষে এক বাড়িতে আমার বেইজ্জতি হয়েছিলো। কিন্তু খোদার কাছে শোকর, তারপর কাজী সাবকে পাওয়া গেলো। আল্লা মিলিয়ে দিলেন। আজ কতো কথা যে এক লগে ছুটে আসে। খেই ধরার পারি না। আর শহর যদি বাড়তে থাকে, চাকরির অভাব হয় না। তার মানে ধনীও বাড়ছে কিনা। তাদের লোক লাগবে। আমি খোঁজ নিতাম বাড়ির বয়-বাবুর্চি মারফত। নিজেও কখনও কখনও বেরিয়ে পড়তাম। একা বেরুতে তখন আর ভয় পেতাম না। আর শহর তো। রাস্তায় লোকজন কতো। চিক্কুর দিলে দশ-বিশ জন তো এসে জুটে যাবে। ভয়টা কোথায়? এখন হাসি লাগে। একবার দুপুর বেলা সাবদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বেরিয়েছিলাম। এই সব ধনী মানুষদের এলাকায় লোক কম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক-এক জনের বাড়ি। পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে মেলামেশাই থাকে না বা থাকলেও কম। এদিক কলকারখানা নাই, বাজার হাট নাই, লোক চলাচল কম। আমি বাড়ি ছাড়িয়ে চার-পাঁচ মিনিট হয় এগিয়েছি, একটা বড়ো গেট থেকে দুই ছোকরা বেরুলো। আঁটসাঁট মোটা পায়জামা, গায়ের জামা। আমার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলো শিস

AMARBOI.COM

দিয়ে। আমি যেনো কিছু শুনি না। এই পাড়ার ছোকরা, কাপড়-চোপড়ে তা পরিষ্কার। তারা শিস্ দেয়, আমার চেতে ওঠার কথা নয়। তারা তো কোন খারাপ মতলব জাহির করেনি। তবে বার বার শিস আর জিভে ঠোঁট জুড়ে ছররররা... শব্দ তুলতে আমার মেজাজ আর ঠাণ্ডা রইলো না। তারপর ওদের হাসি। রাস্তায় কোন লোক নাই। সবাই দুপুরে খেয়ে ঘুমায়। কিন্তু আমার এতটুকু বুক কাঁপল না। আমি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালাম, দুই-তিন বার হাতের তালু ঠোঁটে রেখে ছররররা... আওয়াজ তুলতেই 'আপনেরা শরিফ মানুষের পোলা না?' বেশ গোসায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওরা হঠাৎ থমকে যায়। অবাক হয়েছিলো নিশ্চয়। কারণ, চট করে জবাব দিতে পারে না। পরে সামলে উঠে বেশ গলা চড়িয়ে বলে, 'হয়েছে কি?' 'শরিফ ঘরের পোলা তা বোঝেন না?' ওদের মধ্যে একজন ছিলো দেখেই কেমন-কেমন ঠেকে তার চুল আর গোঁফ রাখার কায়দা দেখে। সে বলে, 'না বুঝি না।' আমার কি হয়েছিলো খোদা জানেন, আমিও গলা চড়িয়ে জবাব দিই, 'বোঝেন না। বাড়ি গিয়ে আপনের বোনের পেছনে ওই শব্দ কইরা জিগাইবেন, হে ঠিগ্ কইয়া দিব।' পাঁচ সাত বিঘা দুরে একটা মটোর আসছিলো এই দিকে। আমি আরো জোর পেয়ে গেলাম। বললাম, 'অহন চিক্কর দিমু যদি তোমরা আমার পিছু হাঁটো।' গোসা উঠে গিয়েছিলো। শরিফ খান্দানের পোলা বলে কি তামিজ করতে হবে? ব্যবহার তো ইতরের মতো। দুই ছোকরা এক দৌড় মেরে পাশের দিকে রাস্তার আড়াল হয়ে গেলো। মটোরটো ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো আমার পাশ দিয়ে। আগে জোরে আসছিলো। ড্রাইভার নয়, চেহারা কাপড়-চোপড় দেখে মনে হলো সাহেব নিজেই গাড়ি চালায়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে মটোরের চলন বাড়িয়ে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলো। আমার খুব ভালেই লাগলো। মানুষ চেয়ে দেখে তো। ছোকরা দু'টোকে আর দেখলাম না। বড়ো বেশি বেতামিজী করেছিলো। নইলে আমি রাস্তা দিয়ে যেমন হেঁটে যাচ্ছিলাম যেতাম। রাস্তায় যখন বেরিয়েছি, কেউ যদি চোখেই সুখ পায়, পাক্। আমার বলার কি আছে? রাস্তা সরকারি রাস্তা। কিন্তু আমার গতর তো সরকারি নয় যে তা নিয়ে কোনো ইশারায় মাতবে। সাহস আমার আজও আছে। তবু মাঝে মাঝে বড়ো একা লাগে, কোনো দিশা করার পারি না। যাই হোক, আসামী। আছি হাজতে। আইন আদালতের মারপ্যাঁচ আর কী বুঝবো। তার উপর কাজীসাব আটক পড়ে গেলেন। এই মানুষটার উপর অবাধ ভরসা রাখা যায়। সে-ই এখন অগাধ পানির মধ্যে। তবে দেখা যাক, সব মুশকিল আসানের মালিক আল্লা। তার উপরই এখন সব ভরসা থুয়ে বসে আছি। তিনি কাজী সাহেবকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন যেনো গায়েবী, দৈবাৎ। আবার তিনিই মসিবত থেকে উদ্ধার করবেন। দৈবাৎ ছাড়া আর কী বলা যায়? সাহেব মেমের খেদমত করার পালা সেই শেষ। অন্তত ফাই-ফরমাশের খাদেমা নই, পাকের মাইয়া নই আর। সবই এখনও করতাম। কিন্তু খাদেমা নই, বাঁদী নই। বাড়ির বিবিসাবরা কি আপন গেরস্থালির কাম করে না? এক বাড়িতে ছিলাম। লোকগুলো ভালোই। বকাঝকার কাজ করলে বকুনি খেতে হয়। তা গায়ে লাগে না। কাজেই ভালোই ছিলাম। মাস-মাস বেতন দিতে চাচার কাছে যেতে হতো। কখনও কখনও তিনি নিজে আসতেন, দিয়ে দিতাম। বাড়ির খোঁজ-খবরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যেতো। তারপর আল্লা মুখ তুলে চাইলেন। টাকা অনেক পেলাম। কিন্তু লগে চাচার দেখা সাক্ষাতের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। তার সঙ্গে বাড়ির খোঁজ-খবর। সব সুখ তো এক-লগে আসে না। এক দিক বাড়ে তো আর এক দিক কমে। কাজী সাহেব বলেছিলেন, 'আল্লা হরঅক্ত সকলকে সুযোগ দেয় না। একবার এলে তা দুই হাতে ধরা উচিত। ফস্‌কে গেলে আবার কত দিন সবুর করতে হয়, তা আল্লা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।' মেনে নিয়েছিলাম তার কথা। সব কথা মনে নাই। এখন এই হাজতে বসে-বসে মাঝে মাঝে কানে এসে বাজে। 'মাছ ধরতে গেলে গায়ে কাদা লাগে, পানি লাগে। কিন্তু যখন মানুষ মাছ-ভাত খায়, তখন আর পাঁক ঘাটতে হয় না। এই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। যদি এখন ময়লা লাগে লাগুক। একদিন সব মুছে ফেলা যাবে সবুরন।' লোকটাকে বুঝা দায়। যে-বাড়ির কাম করতাম, কাজী সাবের সেখানে যাতায়াত ছিলো। বড়ো অফিসারের বাড়ি নানা লোক ভিড় করে। তা আজব কিছু নয়। তাদের হাতে ক্ষমতা অনেক, সবাই জানে। গায়ে পড়েও তো মিল-মহব্বত রাখতে পারলে আখেরে কোনো-না-কোনো কাজে লাগে। সব তো আগে থেকে হিসেব করে রাখা চলে না। ভালোই ছিলাম ওই বাড়িতে। আল্লার মরজি, কখন কা'কে কোথায় তিনি নিয়ে যাবেন, তার মাজেরা (রহস্য) বান্দা জানে না। ওই বাড়িতে ছেলেমেয়ে চার-পাঁচ জন। বিদেশে দুই ছেলে। এক ছেলে শুধু দেশে কলেজে পড়ে। বয়স আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে, বড়ো না। আমি খাদেমা সেই-মতো থাকি। কখনও পাক, কখনও ফাই-ফরমাশ। বড়ো লাজুক ছেলে। কথা বলে কম। ফরমাশ করে, খুব নরম গলায়। টেবিলে খাওয়ার সময় দুই আপা তো বাপ-মার সাথে খই ফোটায়। ওই ছেলে চুপচাপ। জিগাইলে দু-একটা জবাব দেয়। নইলে খেয়ে উঠে যায়, কোনো দিকে ফিরেও চায় না। চড় দিলেও মুখে রা নাই, দেখে তা-ই মনে হয়। সে তার নিজের কামরায় থাকে। দুই বোনে এক কামরায়। চাকরবাকরদের ঘর একটা উঠান পেরিয়ে। তারা কাজ-কাম শেষে খেয়ে-দেয়ে যে-যার কামরায় চলে যায়। আমি থাকি রান্নাঘরে। একা তো। তাই চাকরবাকদের কোয়ার্টারে কামরা থাকলেও বিবিসাবের আমার জন্যে এই বরাদ্দ। পাক-ঘরে জানালা আছে। কিন্তু এক দিকে। বাতাস খেলে না। তাই গরম বেশি লাগলে, দরজা খুলে দিতাম। এই রকম এক গরমের রাতে দরজা খুলে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারলাম, আমাকে কে বেশ জাপটে ধরে বুকের উপর সওয়ার। দিশা পাই না। চিক্কর দিব। আমার মুখ তো আর এক জনের গরম শ্বাসে বোঝাই। মুখ আটক। গায়ে জোর একদম বাঘের। নড়তে পারছিলাম না। অন্ধকার ঘর। লোকটা আমার আন্ধারে হান্দাইয়া গেলো, এতো জলদি যে কিছু করতে পারলাম না। লহমার মধ্যে কি যেনো ঘটে গেল। ফিসফিস শব্দে আমার বুক থেকে নামার সময় সে বললে, 'কাউরে কিছু কয়ো না, এক শ' টিয়া রাইখ্যা গেলাম।' তার আগে আমার দুই ঠোঁটে গরম ঠোঁটের ছ্যাঁকা দিয়া গেলো সে। গলার স্বর তো চেনা। ছোডো সাব। মিন্‌মিনে ডাইন। এ তো ছেলে নয়, মেয়ে খাওয়ার যম। চুপচাপ পড়ে রইলাম বিছানায়। গোসা হলো ভয়ানক। কিন্তু করার কি আছে? মেম সাহেবের কাছে নালিশ করা যেতে পারে। ফজরে উঠে কাজ-কাম যেমন শুরু হয়, তার কোনো এদিক

AMARBOI.COM

সেদিক হলো না। দুই আপার কাছে একবার ভেবেছিলাম, বলে দিই। দু'দিন কোন সোয়াস্তি পেলাম না। আর একটা কাজ ঠিক করে চলে যাব? মন এমন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। ভাবলাম, মেম সাহেবকে বলাই ভাল। আবার কোন খাদেমা তো এই বাড়ির খেদমত করতে আসবে। সে যেন সহি-সালামতে থাকতে পারে। মান-ইজ্জত এক জনের গেছে, আর তো অপরের যাওয়া উচিত না। আরো দু'দিন বাদ খাওয়া দাওয়ার পর একদম জড়সড় মাটিতে মিশে বিবি সাবের কামরায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বলাও দায়। অন্য কেউ হতো, কথা আলাদা। একদম তার ছেলের ব্যাপার। চোখ কান বন্ধ কইরা কইয়্যা ফেললাম। এক নিঃশ্বাসে। শুধু টাকার কথা চেপে গেলাম। অথচ শতী নোট আমার মুঠোর মধ্যেই ছিল। একবার ভাবলাম, মুখের সামনে ফেইলা দিই। কিন্তু পারলাম না। বিবি সাবের হাল-হকিকত কী দেখা যাক। কিছুক্ষণ গম্ভীর চুপচাপ থেকে বললে, 'তুই অহন যা। আমি বিচার করবো। কাউরে কিছু কইস না।' সেদিন রাত্রেও শেষে এই কথা শুনেছিলাম আর নাফা হয়েছিলো এক শ' টাকা। আজ টাকা আমার মুঠোর ভেতর। ছেলে বেইজ্জত করে ইজ্জত দিয়েছিলো, ডেকেছিলো 'তুমি'। মা 'তুই' বললেন ইজ্জত ঠিক রেখে। পরদিন ছোট সাব আর টেবিলে খেতে এলো না। আমি বরাদ্দ কাজ সব করছিলাম, কিন্তু নিজের মধ্যে না থেকে। নাস্তার পর মেম সাহেব আমাকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন। দরজা নিজে বন্ধ করলেন। আমাকে আর হুকুম দিলেন না। ভয় পেলাম, ঝুট বলতে বাধে। করবে কি? পেরথমে আমাকে নসিহত দিলেন। জোর গলায় না। আমার দোষেই যদি কিছু হয়ে থাকে হয়েছে। তার দুধের ছাওয়াল। এমন কাজে যেতেই পারে না। দরজা খুললো কেও গরমের কথা বলতে তিনি চেতে উঠলেন। পাছে শব্দ বাইরে যায়, তাই গলা চড়া না। কিন্তু বিষ ঝাঁঝ কেউটে সাপের মতো। গরম নাকি আমার গতরের ভেতরে ছিল, বাইরে না। আমি মাথা নিচু করে শুনে গেলাম। শেষে আলমারি থেকে টাকা বের করে মাইনা মিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার ছুটি।' অন্য সময় হলে দু'দিন সময় চাইতাম, আগে তাই করেছি। কাজ জুটে গেছে দু-তিন দিনে। চলে গেছি। এবার তো এই বাড়িতে একদণ্ড থাকতে দেবে না। কসাই মাগী ঈদের সময় একটা শাড়ি দিয়েছিল। সেটা পরে ছিলাম, খুলে দিতে বললে। মায়ে আর পুতে কোন তফাত নাই। দুই জনে অপরকে ল্যাংটা করে। গাঁটরি বেঁধে সাহেবের কাছে গেলাম বিদায় নিতে। তিনি বাইরে দহলিজে কী না বলে ড্রয়িং রুমে বসেছিলেন। সালাম করতে গেলে অবাক। কি হলো? বিবিসাব ছুটি দিয়েছেন। চাকরি ঠিক হয়েছে? না। আগেও এখানে কাজী সাহেবকে দেখেছি। তিনি বসে ছিলেন এক চেয়ারে। বললেন, 'আমার তো একটা লোক দরকার।' 'তাহলে নিয়ে যাও, যদি যায়'— সাহেবের কথা। আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। জিগানো মাত্র আর কোন কথা আছে? সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হয়ে গেল। বেতন ঠিক করবার দরকার নেই। চাচার কাছে ফিরে যেতে হতো অগত্যা। কিন্তু সেই দোজখে মন সহজে ঢুকতে রাজি না। সোভান আল্লা, তোমার মেহেরবাণি। কাজী সাহেব মটোর চালিয়ে এলেন। পাশে আমি বসা। তখনই অনেক কথা জিগালেন। কেন জানিনে, অনেক কেচ্ছা বলে ফেললাম। নতুন পরিচয়। এতো খোলামেলা হওয়ার তো কথা নয়। লোকটা বদমাশ, সেদিন একবারও মনে হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় বাসা, বাসায় কে আছে, ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন কিনা— এসব জিগানের পর না এক বাসায় কাম ঠিক করতে হয়। পেরথম চাকরি করার সময় সে-ই বিবি-সাব আমাকে তালিম দিয়েছিলেন। 'মাইয়া পোলা হয়ে জন্মানো এদেশে বহুত ঝামেলা, সবুরন।' তার কথাগুলো চলন্ত গাড়ির মধ্যে বসে বার বার মনে পড়লো। সেই দরদী জনের পানে হাত না তুলেই সালাম জানাতে লাগলাম। বাসে চড়েছি। কিন্তু এমন মটোরে এইভাবে কখনও চড়ার সুযোগ মেলেনি। শহরের চারিদিকে চাই। ঠাণ্ডা বাতাসে গা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। খালি দালানের সারি, মানুষ, গাড়ি। একবার মনে হয়েছিলো, কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি! কিন্তু তা আমাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। শহরে এসে একটু লাভ হয়েছে। নসিবে মার আছে, মার খাচ্ছি। কিন্তু তারপর কী, দেইখ্যা নিতা চাই। মাঝে মাঝে বুক খালি-খালি লাগে তা-ও ঠিক, কিন্তু জোরও আসে যেনো কোথাও থেকে। কাজী সাব অনেকক্ষণ প্রায় দু-তিন ঘণ্টা মটোরে ঘোরালেন। 'কথা শেষ করে নিই' একবার বললেন। কিন্তু তা শেষ হয় না। আমার ভয়-ভয় লাগছিল। সাহেবের বাড়ি পাক্‌সাক করব। আমার এত তোয়াজে কি কাম? মটোর চালিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'আমার এখানে সব সময় তোমাকে রান্না করতে হবে না। আরো লোকজন আছে। তুমি শুধু যা বলি, অন্য কেউ থাকলে তাদের দেখাশোনা করবে।' 'তা এক বাড়িতে থাকলে করা লাগে বৈকি।' আমার জবাবে কাজী সাহেব খুব খুশি হয়ে গেলেন। 'তুমি বেশ বুদ্ধিমান মেয়ে তো।' এবার আমার খুশি হওয়ার পালা। আরো তিন বছর এক সঙ্গে কেটেছিল। আমি যে-কাজ দিলে করতে পারি তা তার জানা। মটোর এক সরু গলির ভেতর দিয়ে অনেকখানি এলো। তারপর আরো ডাইনে-বাঁয়ে ছোট গলির ভেতর। এত বড় বাড়ি! বিরাট লোহার গেট আবার লোহার পাত দিয়ে ঢাকা। বন্ধ করে দিলে বাইরে থেকে কিছু দেখার জো নেই। শহরে আছি কয়েক বছর। বড়ো বাড়ি দেখলে আর তাক খেয়ে যাই না। আমার আগে কাজী সাব, মটোর থামিয়ে এক দোকান থেকে দু-খান শাড়ি কিনে আমাকে দিয়েছিলেন। 'এগুলো তোমার পুঁটলির ভেতর রাখো।' একটা কাপড়ের ঝোলাও কিনেছিলেন শাড়ি রাখার জন্যে। 'রাখো এসব তোমার দরকার হবে।' ভয় হয়। তবে ঘাবড়াই না। সোজা তিন তলায় নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এটা তোমার কামরা।' কামরা মানে? রান্নাঘরেই তো পাকসাকের মেয়েরা ঘুমোতে পারে। ও মা এ কী! খাট আছে, বিছানা পাতা। মশারি সুদ্ধ। সাহেবরা মশারি দিতেন, অনেক সময় না। মশার চোটে অস্থির হয়েছি কতো দিন। কাজী সাহেবকে জিগাই, 'আপনের ফ্যামিলি'? তারা এখানে থাকে না?' 'এখানে আমার অন্য আত্মীয়রা থাকে।' এবার সত্যি ভয় হয়। সাহেবের মুখের দিকে তাকাই। তিনি আঁচ করতে পারেন বোধহয়। 'তুমি ভয় পেয়ো না, আরো মেয়ে আছে। সঙ্গি পাবে।' 'ওরা কারা?' 'ওরা আমারই লোক। আমি সব বলে দিচ্ছি। তুমি ওই আলমারিতে পুরাতন কাপড় ফেলে দাও। নতুন কাপড় পরে নাও। এই নাও চাবি। এই চাবি তোমার, অন্য কাউকে দিও না। গোসলখানার ভেতর তোয়ালে আছে। মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমি সুবেদাকে বলে দিচ্ছি খাওয়ার কথা।' কাজী সাহেব চলে গেলে আমি খোলস ছাড়লাম গোসলখানা থেকে মুখ হাত ধোওয়ার পর। এমন সময় একটি মেয়ে এলো। আমারই বয়সী। পাতলা গড়ন। মুখ

দেখে মনে হয়, বেশ শান্ত। সে পরিচয় দিলে। তার নাম সুবেদা। 'তুমি সবুরন? আচ্ছা, সবু বলে ডাকলে চলবে তো?' 'আপনি যা বলেন তাতেই চলবে।' আমি আরো বলি, 'আপনি কাজী সাবের কে?' 'দ্যাশের আত্মীয়।' জবাবের পরে আবার আমার সওয়াল, 'পাকের ঘর কুথা?' 'পাক আমরাই করি। নতুন এসেছ, আজ আর যেতে হবে না। এখন ঘুমোও।' 'কাজী সাব কুথা?' 'বেরিয়ে গেছে। আবার আসবে। নানা কাজে ব্যস্ত মানুষ।' 'এখানে আর পুরুষ মানুষ নাই?' আমি জিগানোর পর সুবেদা জবাব দেয়, 'পুরুষ মানুষ আবার নাই? যে-যার কাজে ব্যস্ত। যখন দরকার হয় আসে। তোমার খোঁজ নিতে হবে না।' পেরথম দিনে এইভাবে শুরু। কাজী সাব আমার কাছে এসেছিলেন সেদিন বিকেলে। দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলাম। খুলে দিতে বললেন, 'তোমার গাঁয়ের ঠিকানা দাও। মাস-মাস তোমার বাবা যেনো দু'শ টাকা পায়, তার ব্যবস্থা আমি করে দেবো।' দু'শ টাকা! আমি তো থ। হায়, নসিব, আমি বাজানের এতো কামে আইব? ছোট সাবের দেওয়া এক শ' টাকার নোটখানা আমি ওদের পাকের ঘরে একটা মশলার টিনের নিচে গুঁজে রেখে এসেছিলাম। ওই হারামির পয়সা আমি নিমু? আজ দু'শ টাকা বাজানের জন্যে বন্দোবস্ত হয়ে গেলো। নেক্-পথে থাকলে আল্লাহ মেহেরবান হন। আমার সেদিন মনে হয়েছিলো। কিন্তু অতো সোজা নয় বেঁচে থাকার খেই। আঁকবাঁক অনেক। আটকা পড়ে গেলাম। সোজা কথা নয়, মাস-মাস দু'শ টাকা। আর পাকসাকের কোন বোঝা কাঁধে নাই। রান্নাঘরে রোজ যেতে হয় না। থাকা তো আমার সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে। খাওয়াও বদলে গেলো। মাছ-গোশ্ত রোজ জোটে। আগে তো বিবি সাবদের রহমের উপর। শুধু সেই পেরথম মেম আলাদা মানুষ। সকলকে অল্প হলেও দিতেন। হয়তো ছোট টুকরা গোশ্তের কিন্তু গোশ্ত আছে। মাছের বেলা মাছ আছে। দোসরা অন্য বাড়ির মেমগুলোকে মাগী বললেও কম বলা হয়। দাওয়াত দিয়েছে। পাঁচ-সাতজন মেহমান। চাকরবাকরের খাবার বদলায় না সেদিনও। এখন নিজের হাতে সব। এলাহি শোকর, দুধ পর্যন্ত মেলে। কাজী সাহেব প্রায় মিষ্টি আনেন। আমি বাইরে গেলে কিনে আনি। কয়েক মাসে আমি শরিক হয়ে গেলাম বিজিনেসের। এই বাড়িতে এসে শব্দটা শিখেছি। কাজী সাহেব আদর করে আমাকে বলেন 'পাট্নার'। সত্যি আমি তার ব্যবসায় অনেক সাহায্য করতে পারছিলাম। এই বাড়িতে নানা লোক আসে। সব শরিফ লোক। ওদের মাঝে মাঝে মওজের দরকার হয়। কেউ কেউ সঙ্গে কাউকে চায়। শহরের এদিক ওদিক ঘুরে আসবে মটোরে। কাজী সাহেব আমাকে মনে জোর যুগিয়েছিলেন। ঠিক তা নয়। বাজানকে এমন সাহায্য করতে পারি মাস-মাস! তা কী করে ভুলে যাব! একদিন এক শ' টাকা ঘেন্নায় কেন্নু চরার মতো মনে হয়েছিলো। কয়েক মাসে সব ভুলে গেলাম। নর্দমা থেকে কেন্নু নিজে ধরে এখন নিজে শরীরের উপর ছেড়ে দিই। টাকা অনেক। কেন্নুদের মর্জির কাছে সব। একশ দু'শ-র ঢের বেশি। অবশ্য খরচ বেড়ে গিয়েছিলো। কাজী সাহেব এ বাড়িতে থাকতেন না, তবে আসতেন রোজ। আবার পাঁচ-সাত দিনের জন্যে গায়েব। কিন্তু তিনি বলে যেতেন, 'পাটনার, সাবধানে থাকবে। দরওয়ান আছে। আর বাইরে যেও না এখন।' আমি কাজী সাহেবের সব খবর রাখি না। এই বাড়িতে কিছু কিছু লোক আসে। তিনি তাদের সঙ্গে আনেন না। তারা আসে। আর অচেনা লোকের সঙ্গে বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন তিনি। কয়েক জন আসে। তারা কেন আসে, সবাই জানে। তাদের চাহিদা মিটে গেলে তারা চলে যায়। এ বাড়ির রান্নাবান্না মেয়েরা নিজেরাই করে। দুই ঝাড়ুদারনী আছে। একজন ঝুটো বাসন-কোশন মাজে সকালে। অন্যজন ঝাড়ু দেয়। ওরা পুরাতন আদিবাসী। বহুদিন থেকে এদেশে থাকার ফলে কিছু বাংলা বলে এবং বোঝে। মাইনা পায় ঢের বেশি। তাই খুশি এবং রোজ খুশি হয়ে চলে যায়। কাজী সাহেবও পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিছু সোনার গহনা কেনার। কাঁচা টাকা নাকি থাকে না। নিজেই কিনে এনে দিতেন আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে। আমাকে ইদানীং প্রায় বলতেন, 'পাটনার, বিজিনেস তুলে দেব। তুমি ঘাবড়ে যেও না। তোমার টাকা আমার কাছে জমা রাখছি। যা চাও তাই পেয়ে যাবে। গাঁয়ে কিছু জমি। আর তোমার বাজানের যেনো বুড়াকালে কোন অসুবিধা না হয়। এ-ই তো? আল্লা মালেক সব হয়ে যাবে। আমি বিজিনেসে এসেছিলাম— থাক আর একদিন শুনো।' কিন্তু কোনদিন কিছু বলেন নি। বাঁদী থেকে দয়া করে আমাকে বিবির সুখ দিলেন। তার পুরাতন কথা যদি তিনি নিজে থেকে বলেন— ভালো। আমি খোঁচাইতে রাজি না। আমাদের এই বাড়িতে কতো মেয়ে এসেছে। অনেকে সাঁজের অক্তে এলো, ফজরে হাওয়া। অনেকে আবার তিন-চার মাস থেকেছে একটানা। এইটুকু জানতাম, ওদের চাকরি দেয় কাজী সাহেবের লোকজন। সুবেদা মেয়েটা ছিলো বেশ। সে-ও একদিন চলে গেল। আমাকে একদিন পুছ করেছিলো, 'তোমার কোন্ দেশে চাকরি হবে?' 'কাজী সাহেব জানে।' এই জবাবের পর সে চাকরির কথা তুললো না। অন্য কথা পাড়লো। কাজী সাহেব তো আমাকে ধমক দিয়ে বসলেন, 'তোমার ভার আমার। তোমার চাকরি হবে বা কী হবে সে আমি দেখব, তোমার কিছু দেখতে হবে না।' মাঝে মাঝে খারাপ লাগেনি, তা নয়, তবে কোনো চাপে থাকলে সবই গা-সওয়া হয়ে যায়। কাজী সাহেবের বিশেষ কোন লোকজন এলে মওজের ভার আমাকেই নিতে হতো। নিজের দিকে যখন কামরার বড়ো আয়নার দিকে তাকাই, নিজেকে চিনতে পারিনে। কাপড়-চোপড় আর চেহারায় ভাল খেতে পেলে গতর এমন হতে পারে। বিবি-সাবদের দিকে চাইয়া তো তা ধরা যায়। কিন্তু এই সোজা কথা গাঁয়ের মানুষ বুঝে না কেনো? সেদিকে নজর নাই। অন্য নানা কথায় হুজুগে মাতে। খাওয়া পরা কোথন আসবে, তা ভাবে না কেন? কেন খেতে পায় না, তাও ভাবে না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিলো এই আবহাওয়া। কাজী সাহেব কিন্তু ব্যবসা বেশি দিন রাখবেন না, তা আমাকে বলতেন। আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা হত। কিন্তু আজব মানুষ। এই বাড়িতে আসেন। মাত্র একদিন শুধু আমার থুতনি ধরে সামান্য নেড়ে বলেছিলেন, 'আল্লা আছে। তোমার খায়েশ আল্লা মিটিয়ে দেবে।' জমি-জেরাত চাই। হাঁচা। কিন্তু আমার আর কোন খায়েশ নেই? একদিন চিবুকে হাত দেওয়ার বেশি আর কিছু হালচাল দেখলাম না ওর। অনেক সময় মওজ করতে আমারও ভালো লাগে। ঝুট বলব না। বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে সব সময় মন থাকে নাকি? মাঝে মাঝে একদম ঝিমিয়ে পড়ি। কিছুই ভাল লাগে না। কতো দিন গাঁ-ছাড়া। বাপজান কেমন আছেন? ছেলেবেলার ছবি দেখতে পাই। দু-চার জন পাড়ার মেয়ের কথা মনে হয়। কোথা আছে তারা? যাদের বিয়ে হয়েছিল তাদের ছেলেপুলে হয়েছে এতদিনে। দুঃখের সংসারে

জড়িয়ে আছে। আর দুঃখ তো বেশি লম্বা চওড়া নয়। দু'মুঠো ভাত, পিন্ধনের এক-দু'খানা কাপড়। নিজের দিকে চেয়ে আমার তো খুব খুশি হওয়ার কথা। তা হয় না। কেমন হয়ে গেল জীবন? যেনো জেগে জেগে খোয়াব দেখছি। গোসা হয় মাঝে মাঝে। সব শহরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারতাম। এখানে অঢেল ধন-দৌলত, অঢেল গুনা (পাপ)। আর গাঁগুলো খাঁ খাঁ করে শুধু খাওয়ার অভাবে। মানুষগুলো কতো ছোটখাটো চিজ নিয়ে দাঙ্গা কাইজ্যা করে। আমার পেটের ভাত জুটল। বাপ-মা সঙ্গী সাথীদেরও ফিরে পেতে চাই। মরদের কথা বহুবার মনে হয়েছে। বেচারা। কী হলো তার? চারিদিকে অনেক দুঃখ দেখে, সে কী বইরেগী (বৈরাগী) হয়ে গেল? আর সংসারে ঢুকে কাজ নেই। বাচ্চা-কাচ্চা এলে বোঝা বাড়তে থাকবে। তার চেয়ে আগেই সরে পড়ো। কিন্তু আমার কথা কী একবারও ভাবলো না? অথচ শুয়ে শুয়ে কতো মিডা-মিডা কথা বলতো! সে-শুধু কাজ বাগানোর জন্যে। হারামি দাগাবাজ। তার মুখখানা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আবার মায়াও হয় অনেক সময়। তার খেয়ালের এতটুকু ইশারাও পেলাম না। গাঁয়ের ছেলে। মুখের আদল ভালই ছিল। আমাকে তো ভালই লাগতো। আরো কতো মুখ দেখলাম এই ক'বছরে। শুয়োরের পাল, অথচ চকচকে পালিশ করা মুখ। নসিব ভালো, এদের বেশি দিন বা বেশিক্ষণ দেখতে হতো না। আমার মুখও তো এখন পালিশ করা। রোজ রোজ সাবান দিই। কল ছেড়ে গোসল করি। প্রায় পুকুরের ছবি তখন দেখতে পাই। বাজান বকা দিতেন। আমরা এক-বয়সী ক'টা মেয়ে পুকুরের পানি ঘুলিয়ে ছাড়তাম। গরমের দিনে নামলে সহজে ওঠা-ওঠি নেই। পানির ভেতর যতক্ষণ পড়ে থাকা যায়। চাচার লগে মাঠ পার হয়ে নৌকায় চড়লাম। আবার বাস। শেষে ইস্টিশান। রেলগাড়ি পেরথম দেখা। আজ আর কিছুই দেখতে মন চায় না। মনে হয় চোখ বন্ধ করে শুধু শুয়ে থাকি মাসের পর মাস। ঝিমঝিম করে গা। মানুষ মরে যায়। মরে গেলে হারিয়ে যায়। না-মরেও এখন হারিয়ে যেতে পারে। চাচা আছেন এই শহরে। দেখা হয় না। কেমন আছেন, তা-ও আন্দাজ। হারিয়ে গেছে তারা। বাজানও তো হারিয়ে গেছেন। মনে কুকথা ওঠে। ভয় পাই। যদি সত্যি বাজান হারিয়ে যায়? আমি কুথা যাব? গাঁয়ে কার কাছে উঠব? আর যদি গাঁয়ে বাজান না থাকে আমার সেখানে যাওয়া খামখা। কাজী সাহেব আছেন। কিন্তু তার সব হদিস তো জানি না। এখানে ব্যবসার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যদি না থাকে, তখন? জেগে আছি, তবু খোয়াব দেখছি। সব ঠিক ছিলো, সব ঠিক হয়ে আসছিলো। কাজী সাহেব তো লেখাপড়া জানা মানুষ, আমি মুরুক্ষু। অথচ আমাকে এতো আপন মনে করতেন। কে যে কোথায়, আর এক জনের কাছ থেকে কী পায়, বলা শক্ত। না' হলে কাজী সাহেব ব্যস্ত মানুষ, তবু আমার লগে নানা কথা বলেন। অনেক সময় অনেকক্ষণ অব্দি। আমি তো ইমেলের কথা বলি না, জানি না। কাজী সাহেব কথা বলেন আর চা খান পেয়ালার পর পেয়ালা। কী আছে ওর মনে? বয়সে তো আমি ঢের ছোটো। তা-ই কী অন্য রেস্তা পাতান না। কিন্তু তিনি চাইলে কি না দিতে পারি? অথচ মানুষটা বড়ো দূরে-দূরে থাকে। কাছে আসে শুধু বসার জন্যে, গল্প করার জন্যে। আর কখনও কখনও থাকে আমার উপর কোনো কাজের ভার। শহর এখন আমার পায়ে বাঁধা। রিকশা নিয়া যে-কোন জায়গা যাওয়া কিছু না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যে গাঁয়ের মুরুক্ষ মেয়ে, তা কাপড়-চোপড়ে কে ধরবে? এক সময় হাঁটতে যেনো হাঁচট খেতাম। এই শহরে। এখন আমি বাতাস, নিজের মতো বয়ে যেতে পারি। সব ঠিক ছিল সব ঠিক হয়ে আসছিল। আহ্, আর ভাবতে চাই না। কী হয়ে গেলো! আমার নসিবে বজ্জর পড়ল। একদিন পুলিশ এসে মাঝরাতে সব বাড়ি ঘিরে ফেলল। তারপর হঠাৎ ভাঙা ঘুমের রেশের ভেতরই যেনো হাঁটতে লাগলাম। পুলিশ তাদের গাড়ির ভেতর নিয়ে গেলো। আরো তিন চারটি মেয়ে লগে। পুলিশের বলাবলি থেকে জানলাম, কাজী সাহেব আর এক বাড়িতে ধরা পড়েছেন। সেখানে সব পুরুষ। বিদেশে ছেলে-মেয়ে পাঠানোই নাকি আসল ব্যবসা। কিন্তু তা দোষের কি? তবে আমাদের বাড়িতে তো অন্য ব্যবসা হতো। তা নিশ্চয় খারাপ। এদেশে তো থানায় নাম লিখিয়ে তা-ও করা যায়। নাম না-লেখালে কী এতো বড়ো কসুর হয়ে পড়ে? আমাদের গোটা বাড়িতে পুলিশ তালা দিলে, গেট পর্যন্ত। দোষ নিশ্চয় ছোটখাটো নয়? পুলিশের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, কাজী সাহেব হাজতে আছেন মরদ-কেতায়। চোখের পাতা পড়ে না। এক দৃষ্টে অন্ধকারের ভেতর চোখ মেলে ছিলাম যখন পুলিশের গাড়ি চলছিল। হে আল্লা, তোমার দয়ার কূল-কিনারা নাই, এ কি করলে? আমার তো সব ঠিক ছিলো, ঠিক হয়ে আসছিলো। তুমি কি করলে গফুরর রহিম? আমি চিক্কর দিই নাই। ভেতরে আমার বুক চিক্কর দিচ্ছিলো, আমি বাজানের কাছে যেতে চাই... আমাকে তুমি গাঁয়ে পৌঁছে দাও... হে আল্লা, হে মাবুদ... ঝিঁঝির ডাক... শোনা যায় না কোনদিন শহরে...

AMARBOI.COM

দুই

আমি কাজী আলামিন। আমার কোন কথা আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না। আসামী এবং হাজতে আছে, এমন সাধুর বয়ান শোনার লোক অনেক থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্য মনে করার মতো কেউ কি আছে দুনিয়ায়? এমন সব প্রশ্ন মনে জাগল হঠাৎ। কিন্তু আমার তো কোন শ্রোতার প্রয়োজন নেই। আইনের বেড়ায় আজ আটক। জীবনে আর কখনও এমন অবসর পাইনি। যখন দেহ বিশ্রাম নিত, মনের বিরাম ছিল গায়েব। অথবা অবসরভোগী মন, তো দেহ কর্মরত। অনেক দিন পরে আজ আমি নিজেকে দেখতে পাই। অতীতের খেই ধরে বর্তমানে ফিরে আসতে চাই। কূল পাইনে। কিন্তু আমার মনের গতি অব্যাহত থাকে। আমি বক্তা, আমি শ্রোতা। এমন সোচ্চার নীরবতার স্রোতে ভেসে যাই। মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে বসি। সবই নিজের ভেতরে। তার কম্পন বাতাসে কোন রকম ধাক্কা দিতে পারে, আমার জানার কথা নয়। তবু মানুষ হিসেবে পাশে কাউকে পাওয়ার বড়ো লোভ। কনুয়ের গুঁতো দিয়ে চাপাচাপি ভিড়ে পাশের সঙ্গীকে লোকে ঠেলে সরাতে তৎপর হয়। নেহাৎ বেগতিক। নচেৎ মানুষ একা থাকতে অক্ষম। প্রত্যেকেই প্রতিবেশী খোঁজে। বাউলদের মনের মানুষ আর অন্য কিছু নয়। আমি তো শুধু একজন প্রতিবেশী নয়, আমি অনেক কিছু চাই। অনেক চাই। জ্ঞানাবধি তাই খোঁজ করলাম। কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা জুটল না। কাছে প্রতিবেশী পেলাম। কিন্তু

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের পাশে সর্বক্ষণ থাকবো, তেমন সুযোগ শুধু দূরেই সরে যেতে লাগল। এই দিগন্ত মরীচিকা চোখেই লেগে রইল, যা স্বপ্নের মধ্যে শুধু সত্য। রাস্তা বদলে ভাবলাম, পরীক্ষা একটা হোক। গবেষণা ছাড়া কোন পরীক্ষা টেকে না। কিন্তু মানুষ এখানে কঠিন নিগড়ে বাঁধা। ল্যাবরেটরির উপর তার হাত থাকে না। এখন আমার বয়স পঞ্চাশ। যখন পাকিস্তান হয়, আমি কিশোর। যৌবনেই জীবিকার ভার ছিল সব কিছু অর্জনের পেছনে অর্থাৎ বলা যায়, অনেক পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে গিয়েছিলেন। চাচার গলগ্রহ। ভাল ছাত্র ছিলাম না। নিজেই বুঝতে পারলাম, কম্‌তি মগজ। তা নিয়ে কার সঙ্গে লড়াই করবে? নিজের পুঁজির মতো ব্যবসার আয়তন ঠিক কর। এখানে অনেকেই ভুল করে। সমাজে প্রতিযোগিতা থাকে। সেই স্রোতে অনেকে ভেসে যায়। তাই ঘূর্ণির মধ্যে পিছনে পড়ে নাকানি-চুবানি খায়। এই ব্যাপারে আমি বড়ো হুঁশিয়ার ছিলাম। আমারও প্রার্থনা কিছু ডাগর ছিল না। একটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের কল্পনা সীমিত হয়েই থাকে গোড়া থেকে। ছক প্রায় কাটা। কিছু বিদ্যাভ্যাস, কিছু কিছু উপার্জন। আর সচ্ছল না হোক মোটামুটি টানাটানি-মুক্ত সংসার। এখানে বাঁধাধরা ছেদ-রেখা টানা শক্ত। কার নজর কতখানি, তার উপর সব নির্ভর। গ্রামের মানুষ। সেখানে মাঠের দৌড় থাকে, কল্পনা শ্লথ। আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার চাওয়া-পাওয়া বেবহা ময়দান ছিল না। তখনও মনের উপর গাঁয়ের হাতছানি মায়া লেগে ছিল। এমন কী যখন শহরে বি. এ. পরীক্ষার দু'বছর কাটালাম, তখনও ভাবতে পারিনি, বাঁচার লড়াইয়ে জেতার জন্য শহরই প্রকৃষ্ট ময়দান। কিন্তু গ্রামেই রইলো আমার পরিবার আর আমি বড়ো শহরে। মফস্বল শহরে এখন আমার পরিবার থাকে। কিন্তু তা গত ছ-সাত বছর। গাঁ থেকে বাস উঠিয়ে আনতে হয়েছিল নানা কারণে। পরিবার বলতে কুল্লে চারজন। স্ত্রী ছাড়া দুই মেয়ে এক ছেলে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অনেক সময় দায় হতো, যখন বিজিনেসে এলাম। আগে তো শহরে ছিল কেরানির চাকরি। সেখানেই তো কুড়ি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। তখন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের একটা রুটিন বাঁধা ছিল। যদিও শহর থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে, ট্রেনে তিন ঘণ্টা মাত্র, শনিবারে গিয়ে রোববারে আবার ফেরা, মাত্র একদিনের জন্যে এতো পয়সা খরচ, এমন বিলাসিতার নসিব তো আমার নয়। অন্তত এক সঙ্গে দু-তিন দিনের ছুটি থাকলে আলাদা কথা। আর অনেক সময় গোষ্ঠী-সুখ খুব চাগান দিয়ে উঠত মনে, তখন হয়ত শনিবারেই ভেগে পড়তাম। ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে হইহুল্লোড় ভালই লাগত। কিন্তু আফসোস ছ্যাঁকার পর ছ্যাঁকা দিতে পারে। শহরে দিনযাপনের গ্লানি বেড়ে যেত। মাসে মাসে ঘর-খরচের টাকা তো আর কমাতে পারি নে। নিজের উপর দিয়ে না হয় চোটপাট যাবে, যাক। মেসে থাকা আরো তিনজনের সঙ্গে। তাদের কাছে ছোট হওয়া গৌরবের ব্যাপার নয়। কিন্তু যখন নিরুপায়? হঠাৎ ফুর্তি আমার জন্যে পরে শয্যা-কণ্টক হয়ে দেখা দিতো। মেস-সঙ্গীদের কাছ হাত পাতা, নাহয় সহকর্মীদের নিকট। তাছাড়া নিজের দেহেরও তো কিছু হেফাজত লাগে। তা বাদ দিতে হয়। বছরের পর বছর কত সাধ তো বিসর্জনে যায়। ফ্যামিলি নিয়ে শহরে থাকব, তা প্রায় দুরাশা। আবার বন্ধুবান্দব বিশেষ ছিলো না। কারণ, আমি স্বভাবে ঘরকুণো বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন। আজ আমাকে দেখে পুরাতন কারো চেনা মুশকিল। পুঁই যদি জুঁই হয়ে যায়— শাক থেকে ফুল অথবা ফুল থেকে শাক— তাহলে যে-কোন চক্ষুবান প্রতারিত হবে। ঘুমন্ত সাপ খোঁচা খেলে ফণা তোলে। অন্য-সময় ফণা তো দেখা যায় না। প্রতিপক্ষের সামনে বা প্রতিবন্ধকতার মুখেই তার অবস্থান প্রকাশ পায়। আমার জীবনে ঠিক তা-ই ঘটে গেল। বন্যার সময় বাঁধ ভেঙে ছয়লাব শুরু হয়। কিন্তু তার পূর্বে ভেতর-ভেতর অদৃশ্য ফাটল মুখিয়ে ওঠে, তা আর ক'জনে দেখে? হা হতোস্মি, পরিবার নিয়ে শহরে থাকব! অপর মানুষের জ্বালা সকলের পক্ষে উপলব্ধি সহজ নয়। এক এক বেড়ার মধ্যে এক-এক শ্রেণীর বাস। বেড়ার ওপারে চোখ যায়-ই না। আরো ঝামেলা আছে। একই চত্বরে আবার নানা খোপ। এই খোপ অন্য খোপের খবর রাখে না। সুতারাং বোবার মতো একই সঙ্গে বাস। এক জন আর এক জনের কথা শোনে না। আমার যন্ত্রণা ছিল নিজস্ব আমার। কত রকম যন্ত্রণা না আসে। কল্পনা করুন, একটানা কোন ছুটি— ঈদের মতো সাত-আট দিন আপনি বাড়ি গেলেন। গৃহিণী রজস্বলা এবং যদি লিউকোরিয়া রোগের সেকায়েত থাকে, তিনি নির্ঘাত দশ দিন ভুগবেন। জীবনের বহর আয়ের অনুপাতে গঠিত হয়। ব্যতিক্রম থাকে না যে তা নয়। ছুটির আনন্দ কোথায় থুয়ে রাখবেন আবার ভোগের জন্য? পুরাতন দিনগুলো পূর্বে জাবর কাটার সময় পাইনি। হাজতে এসে এখন এমন একান্তে যে নিজের সংলাপ চাই বা না চাই, স্বতঃস্ফূর্ত জেগে ওঠে, আমার অপেক্ষায় থাকে না। কী বিচিত্রভাবে না ছবি বদলে যায়, যদি পটে রঙ-পরিবর্তন ঘটে। খোদার কাছে শোকর আমার অসুখ-বিসুখ হতো না তেমন। ছোট-খাট সর্দি-কাশি বাদ দেওয়া যায় সহজে। কিন্তু গাঁয়ে ছেলেপুলেদের প্রায়ই অসুখ লেগে থাকত। চিকিৎসার সুযোগ তেমন নেই। মাসের শেষে বাড়ির চিঠি পেলে, চলে যাই। কোন সময় আপিসে মঞ্জুর ছুটিসহ কিছু ঋণ টাকায় পকেট বোঝাই বাড়ি দৌড়াতাম। গৃহিণী বেচারা। খেটে খেটে হয়রান। কী চেহ্‌রা ছিলো এককালে। ফরসা চেহ্‌রায় কালিমা পড়ছিল। দুঃখ হত, দয়া হত। হিজড়ে দুঃখ, হিজড়ে দয়া কারো কোন কাজে লাগে না। আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করতাম। দিন উজালা হত না। গৃহিণীর বড়ো সাধ ছিলো, শহরে গিয়ে একত্রে থাকবে। আমার জন্য অনেক ভাবনা তার, যেহেতু একাএকা থাকি। সব সময় চাকরবাকর মেলে না। মেস-সঙ্গী মিলে কোন রকমে রান্না, আহার সারা। এই সব কাহিনী শুনে ঘরণী দুঃখ পেত। শেষে শহরে অসুবিধার কথাই আর বলতাম না। কি লাভ আর একজনের অস্বস্তি বাড়িয়ে? ছেলেমেয়েদের নিয়ে কতো স্বপ্ন রচনা! ওরা লেখাপড়া শিখে যদি মানুষ হয়, আখেরে বৃদ্ধকালে হয়তো আলেমুল গায়েব আল্লা মুখ তুলে চাইবেন। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। দেশ-বিভাগের সময় আমার বয়স ত চৌদ্দ বছর। কত মিছিলে গেছি। মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, কায়দে আজম জিন্দাবাদ রবে আকাশ ফাটিয়ে ফেলতাম না? মুরুব্বিদের মুখে শুনতাম, মুসলমান সমাজের দুর্দশার কারণ ইংরেজ এবং ইংরেজের দোসর হিন্দু সম্প্রদায়। সব জায়গায় তাদের আধিপত্য। পাকিস্তান সেই জন্যে মুসলমানদের দরকার। তারপর আল্লা পাকিস্তান করিয়ে দিলেন। বি.এ. পাস করে ফেললাম। কিন্তু গাঁয়ে অভাব তো গেল না। যে-হিন্দু সমাজের আধিপত্য ছিল ভয়ের, তেমন প্রতিপত্তিশীলরা তো আর এদেশে নেই। তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। উনিশ শ

AMARBOI.COM

পঞ্চাশ হবে। দাঙ্গা লেগে গেল। বড়ো বড়ো হিন্দুরা তো এদেশ ছাড়ল। যারা রইল, তারা তো কোথাও মাতব্বরগিরি ফলাতে যায় না। তবে অধিকাংশ মুসলমানের দশা যথাস্থানে পূর্ববৎ কেন? দু-চার জন আমার গাঁ থেকেই কপাল ফেরার পর সোজা শহরে চলে গেছে, আর আসে না। কিন্তু যারা পড়ে রইল পেছনে, তাদের দিন তো আল্লা চালায়। তাছাড়া আর কি বলা যায়? হালাল (বৈধ) রুজিতে যদি দিন না চলে, তখন চালককে খুঁজতে গেলে শেষে দুনিয়ার মালিকের কাছে পৌঁছাতে হয়। আজ অনেক কথা মনে ওঠে। তখন ভাবতাম নতুন দেশে বুঝি এমন হয়। মুসলিম লীগ সরকার প্রচার করত, 'শিশু রাষ্ট্র'। নতুন দেশের জন্যে খুব যুৎসই। কিন্তু শিশু বাড়বে তো। না, জন্ম থেকে পঙ্গু? আজ এই সব প্রশ্ন মনে জাগে। তখন এমন হদিশ করতে নাপারগ, নিজেদের লেখাপড়া নিয়ে থাকতাম, ছাত্রদের যা প্রধান কর্তব্য বলে সব সময় প্রচারিত। মাথার উপর চাচা ছিলেন।। কিন্তু নিজের চাকরি পাওয়ার পর আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। আল্লা রেজেকের (জীবিকার) মালিক। তার মরজির উপর কারো তো কিছু করার নেই। আমার বাড়ির সকলে ছিলেন পরহেজগার (ধর্মপরায়ণ)। বাপকে তো মনেই নেই। চাচা নামাজ রোজা কা'যা করতেন না। তার কাছে ছেলেবেলার শিক্ষা। আমার মক্‌তবে এক মৌলবী সাহেব, বড়ো সুন্দর চেহারা, আর তার চেয়ে সুন্দর ছিলো তার সুরেলা গলা। তাঁর কোরান তেলাওয়াত ছিলো শোনার মতো। ছেলেবেলার এই সব সংস্পর্শ আমার কাছে বৃথা যায়নি। এখন আমার মুখমণ্ডলে ঘন দাড়ি দেখছেন। এই দাড়ির বয়স আমার বয়স থেকে মাত্র সতের আঠার বছর কম। ঠিক কতো বছর বয়সে দাড়ি উঠেছিল, বলতে পারব না। তাই এমন হিসেব। নচেৎ আমি কোন দিন দাড়ি কামিয়েছি বলে মনে নেই। যদি এমন গুনা করেও থাকি হয়তো দু-চারবার। যে-যার কর্তব্য করে যাও। প্রত্যেক নাগরিকের নিকট আল্লাহরও তা-ই নির্দেশ। কিন্তু সৎ থাকার পর দুনিয়ায় এতো তক্‌লিক খিঁচতে হবে কেন? আর এই যন্ত্রণা তো লাখ লাখ কোটি লোক বহন করে। অথচ দেখা যায়, যাদের সংখ্যা খুবই কম, আল্লার কোন নির্দেশও পালন করে না, তাদের দুনিয়া বেশ সুহালে চলে। 'দশ যেথা খোদা সেথা।' ছেলেবেলা কতো বার না শুনেছি মুরুব্বিদের মুখে, স্কুল কলেজের ওস্তাদদের নিকট। অথচ পৌণে দশের কাছে আল্লা থাকলেও দুঃখের ধুরমুসে পিষ্ট হওয়াই তাদের নসিব। আর পৌনে একও নয়, মাত্র মুষ্টিমেয়, তারা মজার দিন গুজরান করে। আল্লা তাহলে কাদের সঙ্গে আছেন? তিনি নেক বান্দাদের কি পরীক্ষা করেন রোজ রোজ মসিবত দিয়ে? কিন্তু শত শত বছর ইতিহাস খুললেই তো এই পরীক্ষার কাহিনী কাতার বেঁধে আসে। দেখা যায়, মুষ্টিমেয় লোক আল্লার নিয়মিত অনুগ্রহ, সমৃদ্ধি ভোগ করে। যারা সংখ্যায় প্রায় দশ তারা কেউ প্রশ্ন তোলে না, কেনো এমন ঘটে? মুনাফেকি ভণ্ডামি ধরা পড়ে না কেনো? আমার মনে এ-সব প্রশ্ন উঠেছিল অনেক পরে। কোনো সৎ জবাব পেতাম না। আমি চুপচাপ, শান্ত লোক। কারো সঙ্গে বহসে যাওয়া আমার ধাতের বাইরে। কিন্তু নিজের কাছে আমি রেহাই পেতাম না। প্রায় পেটের ভেতর খাবি খেতো এই ধারায় সওয়াল। জবাব আর কে দেবে? আমি তো বাইরের কারো কাছে প্রশ্ন করি না। আরো খারাপ লাগতো, যখন দেখতাম, আমারই সঙ্গের লোক একই চাকরি অথচ এতো দুর্দশা ভোগ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না। শেষে নিজের চোখে তার নমুনা চাক্ষুষ দেখলাম। আমরা চারজন একটা বড়ো কামরা ভাড়া নিয়েছিলাম। সঙ্গে পাকের ঘর, কল-পায়খানা ইত্যাদি। দু'জনের প্রায় আমার দশা। একজনের তবু কিছুটা ভালো। কারণ, তার মরহুম আব্বা দুচার বিঘা জমিন রেখে গিয়েছিলেন। বছরের ভাত টেনে-টুনে হয়ে যেতো। আর একজন রমিজ আলি, কয়েক বছর আমাদের সঙ্গে থেকে চলে গেলো। একই শহরে ফ্যামিলি নিয়ে সে বাস করতে লাগলো। একই অফিসের কেরানি। এক কথায়, পৃথক ফল। গীবৎ (পরনিন্দা) পাপ। আমি কারো আচরণ সম্পর্কে তাই মন্তব্য করতে বিরত থাকতাম। কিন্তু অন্য দুই সঙ্গী ছেড়ে কথা কইতো না। 'লাইন লাগিয়েছে বড়ো সাহেবের সঙ্গে। এখন পোয়া বারো।' 'শালা হারাম রুজিতে দেখি বরকত (সৌভাগ্য, প্রাচুর্য)। আর সেখানেই আল্লার মেহেরবানি বেশি।' 'চশমখোর। মেস ছেড়ে গেলো, এতো দিন এক সঙ্গে থেকেছি, ক বছর হয়ে গেলো। ফ্যামিলি নিয়ে আছিস। একদিন ডেকে তো খাওয়াতে পারিস।' এই ধারা কথা আমার ভালো লাগতো না। কিন্তু প্রায় কানে পড়ত। পাশাপাশি একা। এক কামরা। কান তো বন্ধ করে রাখা যায় না। তাই একদিন বললাম, 'ভাই, কি দরকার ওর আলোচনা। আর ওই বাড়িতে কারো এক কাপ চা খাওয়া উচিত নয়। হারাম-খোরের বাড়িতে সব কিছুই হারাম।' আমার মেস-সঙ্গী দু'জন কিন্তু চুপ করে থাকত না। একজনের তো খাওয়া দাওয়ার পর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সহকর্মী সম্পর্কে কোন কটুক্তি না করলে যেন তার ভাত হজম হতো না। এমনি সৎ লোক। দোষের মধ্যে বিড়ি খেতেন, মাঝে মাঝে সস্তা সিগারেট। আমি অবশ্যি ওই নেশা আজও ধরতে পারলাম না। কিন্তু বিজনেসে নেমে দেখা গেলো, দামী সিগারেট হাতে থাকা দরকার। লোকে বিজ্ঞাপনে খরচ করে হাজার হাজার টাকা। আমি ব্যাপারটা তেমন ধরে নিতাম। সিগারেট অফার করতাম বহু জন-কে। আসলে সব বিজনেসে নিজস্ব প্রণালী আছে। এক এক ব্যবসার আবার এক-এক রকম রীতি। ধরে নিয়েছিলাম, বিজিনেসে এসব করতে হয়। খান্‌কির খাতায় নাম লিখিয়ে সরু-মোটা বাছা ছলে না। আমিও মাঝে মাঝে সিগারেট টানতাম। কোন রকমে ধরিয়ে ধোঁয়া-ছাড়া। তা-ও নেহায়েত বাধ্য হয়ে। সিগারেট অফার করলাম। অপরপক্ষ বললে, 'আপনি?' আমার তেমন অভ্যেস নেই। আমার কাছে নেশা নয়। একটু আগে খেয়েছি। পরে ধরাব। এড়িয়ে যেতে পারলে আর ধারের কাছে দিয়ে হাঁটতাম না। বিজিনেসে নেমে কতো রকম মানুষ না দেখলাম। এক পর্যায়ে তো আমাকে আরো ঊর্ধ্বে উঠতে হলো। নিরেট থেকে তারল্য। বিজনেসের অন্ধিসন্ধি, গলি-ঘুঁজি আছে। নানা ধরনের মানুষ, তাদের নানান ধরনের খাহেশ। এক ভদ্রলোক তো বোতল ছাড়া কোন কাজই করতেন না। সব কিছুই তো বিজিনেস। লেনদেনের ব্যাপার আছে। আদান প্রদান করবে না, তা কি হয়? এক তরফা কোনো কাজ নেই দুনিয়ায়। কিন্তু খোদার কসম, শরাব আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম। একবার লিভারে ফোঁড়া হয়েছিলো পান-দোষে। সেই থেকে ডাক্তারের নিষেধ মেনে চলেছি। এই কথা বললে, আর কোন ভদ্রমহোদয় পীড়াপীড়ি করবে? দুর্জনের ছলের অভাব হয় না, কথাটা বিজিনেসে নেমে উপলব্ধি করলাম। চরম। অথচ সাপ্লাই আমাকে দিতে হয়। জিজ্ঞেস করে দেখা হয়নি কোনো ফতোয়াদাতাকে এটা সুদের মতো গ্রহণ ও প্রদান উভয় দিক থেকে হারাম

কিনা। অনেকে নাছোড়-বান্দা। একজন হয়তো বেশ গভীর নেশায় সঙ্গী খুঁজছে। সঙ্গী না পেলে তা চেতে উঠবে। আমি তাই কোনো শরবত বা সোডা জাতীয় পানীয় গেলাসে ভরে নিয়ে বসতাম। রঙ্গে রপ্তে সব শরীরে মনে বিঁধে যায়। সবুরন একদম আনকোরা গ্রাম্য মেয়ে। আমার হাতে গড়া সে। টপটপ সব সিঁড়ি পার হয়ে গেলো। ওকে কিছু লেখাপড়া শেখানো উচিত ছিলো। আরো কাজে লাগতো। তবে চৌকষ মেয়ে, রোজগার করতে নেমেছিলো। পরিবেশে পড়ে খোলস ছাড়তে কারো দেরি হয় না। পাতলুন, হাওয়াই শার্ট, স্যুট— এতো রকম লেবাস পরবো জীবনে, স্বপ্নের বাইরে ছিলো। কিন্তু বিজিনেস প্রণালী ছাড়তে পারে না, যদি বিজিনেস করতে চাও। ইস্তাফা দাও সে আলাদা কথা। তখন প্রণালী বদলে যায়। কারণ, তুমি আর এক আবেষ্টনীর মাঝখানে গিয়ে পড়েছো। বাতাস-অনুযায়ী লেবাস। হিমালয়ে মসলিন পরে থাকা যায়? আসমানে নাকি সাত স্তর আছে। জমিনেও তাই। এক রকমের আয় এক রকমের হাল-চাল, কথাবার্তা জীবন-যাপন মায় রসিকতা পর্যন্ত বাদ যায় না। ঠাট্টা সর্বস্তরে আছে। কিন্তু তার ধরণ আলাদা। প্রত্যেক স্তরে নিজস্ব নিয়মকানুন চালু থাকে। তুমি তা না মানলে, গাল খাবে। অথবা অবজ্ঞার বস্তু হয়ে উঠবে। প্রথম প্রথম আমি তো 'হংসোমধ্যে বকো যথা'— আমি বসে থাকতাম বোবার মতো। তারপর হাল হকিকত জানা হয়ে গেলো। আমিও হাসির তালে যোগ দিতাম। সব সময় যে ভেতরের তাগিদে তা না। একজনের কাছে কাজ আছে মানে বিজিনেস-সংক্রান্ত কাজ। পার্টির আয়োজন করা হলো। তাকে ছাড়া সব তোড়জোড় সাজ-সরঞ্জাম বৃথা হয়ে যেতো। মধ্যমণি সে। এটুকু আত্ম-গরিমা যদি না তার ভেতর উদ্দীপিত হয় তুমিও তো পথে বসতে পারো। কারণ বিজিনেসের সঙ্গে তোমার আত্মা ভবিষ্যৎ, উন্নতি সব লেপ্টে রয়েছে। অতএব ট্রাডেজি, কৌশল লাগে, লাগে কলাকৌশল। সে যখন রসিকতার জন্যে কোনো কাহিনী বা গপ্ পরিবেশন করে, তার কথা শেষ হওয়ার মুহূর্তেই তুমি গগন-বিদারী হাসি হাসবে— এমন যে সহজে তা থামাই জানে না এবং সঙ্গীরা উদ্গ্রীব হয়ে উঠবে। অন্যদিকে হয়তো এই প্রাবল্যের চোটে শেষে না ডাক্তারের কাছে গিয়ে তোমার নাড়িভূড়ির মধে সেলাই চালাতে হয়। অর্থাৎ তুমি ভাব দেখাও যে এমন গভীর চিরন্তন হাসির উৎস আর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি এই পৃথিবীতে। কোনো কিছু রপ্ত করার ব্যাপারে নবিশী-কাল কতো দিন লাগবে তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার উপরে। আমার বেশি দিন লাগে নি। কিন্তু আমি নিজেই ভেবে অবাক হতাম, বহুকাল এই পৃথিবীর বুকে আমি অমন নিরীহ-জন ছিলাম কি করে? বুদ্ধি বোধহয় চাপা পড়ে ছিলো। আর দেখলাম, এই মেয়ে সবুরন-কে। যেন জীবনকে তৈরি করে নিতে সে শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। কেউ শুধু একবার রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। কিন্তু ওকে নিয়ে প্রথমে আমার বেশ মুশকিল বেধেছিলো। অপরের মেয়ে আর বয়সে তো কচি। তাকে পাপের পথে ঠেলে দেব? গত বৈশাখে আমার নিজের মেয়ে ষোল-য় পড়ল। তিন জনের মধ্যে মেয়ে বড়ো। ছেলে দুজনই ছোটো। বিজিনেসের প্রণালী তো পরিত্যাগ করা চলে না। কিন্তু সবুরন বড়ো বুদ্ধিমতী। সে আমার ইশারা চট করে ধরে ফেলতো। এখন আমার কাছে স্পষ্ট, শুধু নিজের গণ্ডির মধ্যে নৈতিকতার সীমা বাঁধা থাকে। মানুষের দুঃখে সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশে সৎ-ধার্মিক ব্যক্তিমাত্র তা জানে। কিন্তু মানুষ কারা? আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি? তাদের বাইরে আর কোন মানুষ থাকে না? নিজের ভাই-ভাতিজা বোন-বোনাই বা এই-ধারা নিকট-কেউ বা প্রতিবেশীর দুঃখ— তুমি যদি সৎ হও, তোমাকে পীড়া দেবে। কিন্তু তার বাইরে তো আরো মানুষ আছে। যাদের তুমি চেন না, জান না। তারা আছে, শুধু আবছা অনুমানে। তখন? না, সেখানে তোমার কিছু করার নেই। অর্থাৎ শুধু নিজের মেয়ে অথবা আত্মীয় বা পরিচিত কারো নন্দিনী যেনো চরিত্র-ভ্রষ্ট না হয়, অসৎ পথে দেহ বেচে বাঁচার চেষ্টা না করে। তার বাইরে কিছু হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। ঈমানের গণ্ডি বড়ো ছোটো এদেশে সজ্জন মানুষদের। সবুরন তাই আমাকে বেশ দোলাচলের ভেতর ফেলেছিলো। কিন্তু সবার উপরে বিজিনেস সত্য। তার প্রণালী-প্রস্থ অস্বীকার অতো সহজ নয়। চতুর্দিকে প্রতিযোগিতার মধ্যে তোমার বাঁচা। সেখানে হঠাৎ যোগী ব'নে যাওয়া তো বিপজ্জনক। তুমি অচিরে সমাজ-চ্যুত হয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, অন্যেরা বাঁচার জন্যে তোমাকে শুধু সমাজচ্যুত নয়, একদম ধ্বংস করে ছাড়বে। কারণ, তুমি বিপজ্জনক তাদের অস্তিত্বের পক্ষে। বহু সৎ মানুষ আছে এদেশে তারা এমনই অন্ধ। ঠিক, অন্ধ বলবো না, তাদের দৃষ্টি বড়ো সংকীর্ণ সীমা-রেখায় আবদ্ধ। সচেতন সার্জন যেমন রোগীর দেহে ছুরি চালায় এবং মনে করে না সে ঘাতক, যেহেতু ভবিষ্যৎ তার সম্মুখে প্রতিভাত, আমিও তেমনই সবুরনকে অন্ধকার রাস্তায় ঠেলে দিল্যম। ঘুড়ি উড়তে দিলাম, লাটাই আমার হাতে। অনটনের অধিবাসীরা প্রথমে অভাব-মোচনের পথকেই আসল মোক্ষ পথ বিবেচনা করে। আমি ব্যতিক্রম ছিলাম না। সবুরণ তার দুঃস্থ পিতার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নিতে ব্যাগ্র। আমাকে বড়ো খোলাখুলি মনের কথা বলতো। ওকে দেখে আমার খুব মায়া হয়েছিলো। পরে জেনেছিলাম তার কেন চাকরি গিয়েছিলো। একদা-বিবাহিতা, তদুপরি ধর্ষিতা এক যুবতী দেহের ব্যাপারে তো অভিজ্ঞ রমণী। বিজিনেসের প্রণালীতে না হয় আর একবার কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক। তা-ও বেশি দিনের জন্যে বা নিয়মিত না। অভাব-মোচন বড়ো হয়ে দেখা দিলে, যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় যে-কোনো কাজের সমর্থনে। সবুরন ব্যতিক্রম ছিলো না। তাছাড়া, তার বাপজানের জন্যে সে এতো বড় সাহায্যকারী হয়ে উঠবে, যা অনেক সময় তিন-চার পুত্রের জনকের কপালে জোটে না, এই সম্ভাবনা কী তুচ্ছ? আমার বিজিনেসে ঠিকঠাক ঠিকানা না থাকাই ভালো। সবুরন তা মেনে নিয়েছিলো। তার ঠিকানা বাড়ির লোক জানত না। তার বাজানের টাকার বন্দোবস্ত ঠিক ছিলো। কারণ, আমার বিজিনেসে জাল তো শুধু এক জেলার উপর পাতা নয়। লোক বরাদ্দ হয়ে গিয়েছিল। শহরে খবরের কাগজ স্থায়ী গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর কায়দা একই। এক-এক এলাকার পিয়ন অন্য এলাকায় পিয়নের বরাদ্দ কাগজ বিলি করে। তারগুলো আবার অপরে দেয়। এইভাবে গোটা শহরে জাল পাতা। ফলে প্রত্যেকেরই সুবিধা। আমরা সেই ভাবে বহু লেনদেনের বন্দোবস্ত করেছিলাম। এখন আমি নিজেকে দেখতে পাই, হাজতে বসে আরো স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। আমার অতীতের শান্ত আবরণের তলায় গ্যাঁজানো বুদ্‌বুদ্‌ অব্যাহত ছিলো আমারও অজানিতে। নচেৎ এতো বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এতো দ্রুত পার হতে পারলাম কী করে? তবু ক্ষোভ থেকে যায়, কোথায় যেন জটে গ্রন্থি লেগে

ছিলো, আমি তা দেখতে পাইনি। নচেৎ এমন হবে কেনো? যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। পুরাতন কালের কথা। আমার পরিণাম এখন অনিশ্চিত। করাতের বড়ো দাঁতের ভেতরে ছোট দাঁত থাকে। আমারও মাথার উপর মানুষ আছে। তারা আমার মতো সরে-জমিনে জড়িত নয়। তাদের এই সুবিধা আছে, সহজে ফসকে যেতে পারে। আইন তাদের পৃষ্ঠপোষক। আমার পিঠের উপর বা সামনে ঢালের মতো তারা যদি না দাঁড়ায়, আখেরে তাদেরও জড়াতে হবে। এই এক ভরসা। সুতরাং পুলিশ কোর্টে মামলা রুজু করলেও, আইনের লড়াই সেখানে বাধবে। বড়ো বড়ো আইনজীবী আমার পেছনে নিয়োগ করতে তারা বাধ্য। সকলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলো না। কিন্তু তাদের এক-দু'জন আরো সঙ্গে সহযোগী নিয়ে আদালতে হাজির হবে। কারণ, মোটা ফী যোগানোর লোক আছে, যদিও তারা নেপথ্যে। শুনেছি, সবুরন পুলিশের জেরার মুখে নাকি শেষ পর্যন্ত সোজা হয়ে থাকতে পারেনি। অনেকের নাম বলেছে। কিন্তু তাদের ঠিকানা তো একটা নয়। পুলিশ হয়তো তদারকে গিয়ে দেখবে, খাঁচা আছে, চিড়িয়া গায়েব। আর কোথাও গিয়ে যদি কাউকে পায়, তারা জানে কী করে রেহাই পেতে হয়। সকলের মতো পুলিশও জানে, করাতের ছোটো দাঁতের উপরে বড়ো দাঁত আছে। এসব আমার অনুমান নয়। আর আমার সন্দেহ খামখা। সবুরন কিছু লোক, কিছু বাসা চিনতো। নাম জানতো কিন্তু ঠিকানার নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা অসম্ভব। নিরক্ষর সে, যদিও চালাক চতুর। নিরক্ষর নিয়ে কাজ করার অনেক সুবিধা থাকে, অনেকে জানে না। উকিলের জেরার মুখে অনেক কিছু আইনের ফাঁক বেরিয়ে পড়বে। তাছাড়া সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন বা ন্যায়-অন্যায়ের সমস্যা তো আসল কথা নয়। উকিল ফী নেয় তার মক্কেল-উদ্ধারে। বিপদের ত্রাতা তারা। কেসে হেরে গেলে উকিলের সুনাম নষ্ট হয়, যেমন জিতলে পসার বাড়তে থাকে। তবু আশঙ্কা নানা। ব্যাংকে কিছু বেশি টাকা পয়সা নেই। আমি সোজা গহনায় খরচ করতাম অথবা অল্প-অল্প জমি জেরাত কেনা ছেলেমেয়ে বা স্ত্রীর নামে। হঠাৎ চোখে পড়ার মতো বাড়ির হালচাল কিছু বাড়েনি। স্ত্রী খুব খুশি ছিলো, আমার তরক্কি হচ্ছে। কিন্তু সংসারে থাকবো শুধু ওদের নিয়ে, তা তো আর হলো না। তাই তার মন খুঁতখুঁত করতো। বেচারা স্ত্রী অনেক তক্‌লিফ সয়েছে। যখন আল্লা মুখ তুলে চাইলেন, আর এক দিক ফাঁক হতে লাগলো। এখন বুঝতে পারি, স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। অবিশ্যি পরস্ত্রীর প্রতি আমার আজও লোভ নেই। সে হয়তো বহু দিনের সংস্কারে আবদ্ধ মনের জন্যে। কিন্তু এইভাবে চললে, শেষে মন কোথায় থই পাবে, আল্লাকে মালুম। অবিশ্যি দুই মেয়ে এবং ছেলে এখনও আমার নয়নমণি। ওদের বিচ্ছেদ মাঝে মাঝে হাজার কাজের ভিড়েও, তোড়েও আমাকে মনমরা করে দেয়, সহজ ফুর্তি হারিয়ে যায় খুব সহজে। রোজগারের নেশায় এগিয়ে গেলাম, কোনো কিছুর দিকে তাকালাম না। এখন মনে হয় আখের কোন্ আস্তানায় শেষে নিয়ে যাবে? অনেক কাল পরওয়ারদেগার আল্লার কাছে মোনাজাত করেছি। হয়তো তারই মরজিতে আমার সড়ক বদলে গেলো। কিন্তু তখন মনে যেমন প্রশান্তি পেতাম না, আজও তার জের চলছে। কোথায় জটে গ্রন্থি লাগলো? কিন্তু অভ্যাসের ধারা বিচিত্র। তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার ছক কাটা রাস্তা দিয়ে, তুমি যতই ঘাড় বাঁকাও, কিছু অদল-বদল হয় না। দশ বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাট ব্যবধান কালের। কিন্তু খোঁয়ারির মতো অনুভূত। ভবিষ্যতের খুব কালো ছবি এক-একবার এঁকে যাই। দশ বছর জেল হয়ে যায় যদি? এত দিনের মেহনত আর কোনো কাজে লাগলো না। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। আর্থিক নিরাপত্তা, অবসর-মধুর দৈনন্দিনতা, পাড়া-প্রতিবেশীর চোখে কিছু মর্যাদার আসন লাভ— তার বেশি সাধারণ জীবনের আর কিছু প্রত্যাশা থাকার কথা নয়। কিন্তু সব ভণ্ডুল হতে বসেছে। অবিশ্যি বিরাট এক সান্ত্বনা মনে, ছেলেপেলেদের কষ্ট হবে না। গৃহিণীর অনেক কষ্ট হয়েছে ছেলেপেলেদের মানুষ করতে। নিজের শরীরের দিকে তাকানোর সময় কোথায়? এখন একদিকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে গহনা ইত্যাদি যা আছে। খুব বড়ো স্বপ্ন তো তার কাছে পৌঁছানোর কথা নয়। অনেক অর্থ পেলেই কী বিলাসিতা ভোগ করা যায়? তার জন্যে ত মনের প্রস্তুতি লাগে— এক কথায়, মনের কাঠামো লাগে। দরিদ্র পরিবারে, পাড়াগাঁয়ে জন্ম। বড়ো খোয়াব তো দেখা যায় না, চোখে বা মনে আগে থেকে ছবি আঁকা না থাকলে। আল্লার কাছে শোকর, আমি অনেক কিছু দেখলাম। কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত কল্পনার ব্যাপারে ভীত। সবুরন তার গাঁয়ে ফিরে যেতে চায় যেখানে তার শৈশব এবং পিতৃদেব আছেন। আমার দৌড় মফস্বল শহর পর্যন্ত। তাই ব্যবসা গুটিয়ে আনার সব পন্থা শুরু করেছিলাম। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ইচ্ছে করলেই গুটানো দায় ছিলো। দস্যুদলে ঢুকলে তা থেকে পিছলে বেরোনোও এক ধরনের কসরত। ডাকাতি করতে অসফল দলের আহত সঙ্গীর কী দশা হয়? সে তো আর তাল রাখতে অসমর্থ। হাঁটতে অপারগ না হলেও শ্লথ। আর সবচেয়ে দুশমন হয়ে দাঁড়ায় জখম-জায়গা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত রক্ত। যেখানেই যাও, তোমার গন্তব্য রক্তের সঙ্গে বাঁধা। অতএব, দলের লোক তোমাকে আর নিজেদের বহু সুখ-দুখের বন্ধু মনে করবে না। এতো দিনের সম্পর্ক, ঝুঁকির ভেতর পারস্পরিক সাহায্যের উত্তাপ; সব পরিস্থিতি— ধুয়ে মুছে গেলো এক নিমেষে। তুমিও আর তোমার সঙ্গী থাকতে পারবে না। সঙ্গীরা তোমার মাথা এবং ধড় আলাদা করে ফেলবে বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা অনুশোচনায়। কারণ তোমার মুখ তাদের কাছে পরম শত্রু। মুখ থেকে লোক-পরিচয়, লোক থেকে লোকালয়— এমন শিকল শেষে গোটা দলকে গ্রেপ্তার করে ফেলার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, শুধু মৃত্যু নয়, পাশব মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও। আগে এতো কথা ভাবিনি। আমার জানা উচিত ছিলো, ভাবা উচিত ছিলো। বড়ো দেরি করে ফেললাম। বোধহয়, এমন বিজিনেসে এই পরিণাম ঘটতে পারে। তা ভাবা উচিত ছিলো। সব সময় মাথার উপর ঝুঁকি থাকতো। তবু মনে হয়নি কেনো এমন চিন্তা? আজ অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই। স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দেওয়ার সময় ডাঙার চিন্তা তখনই করা যায়। মনের ভেতর উত্তাপ অনেকদিন পোষা ছিলো। অগ্ন্যুৎপাতের মতো যখন তা লাভারূপে বেরিয়ে এলো, তখন হাতের তালু দিয়ে ঠেকানোর প্রশ্ন অবান্তর। অতএব ভেসে যাও। অবস্থা তার ব্যবস্থা ঠিক করে নেবে। এখন আমার মনে হয়, অস্তিত্বের সংগ্রামে পরিবেশ বছরের পর বছর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ালে ব্যক্তি হিসেবে ভুল করে বসে। তখন অগ্রপশ্চাৎ সব ওজন করা কঠিন। এক পর্যায়ে বড়ো ক্লান্ত লাগছিলো। আপিস থেকে ফিরে শুয়ে পড়তাম। হয়তো ঘুমালাম সন্ধ্যার পরও। মাগ্‌রিবের নামাজ পড়া আমার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত

হয়েছিলো। অন্যান্য অক্ত যা-হয় হোক। কিন্তু তখন ঘুমের ভেতর দিয়ে যেনো আমার প্রার্থনা সেরে ফেলতাম। অন্য সময় মনে গ্লানি থাকতো। কাযা (অপ্রতিপালিত) নামাজ আবার পড়ে নিতাম। কিন্তু কিছুদিন যাবত তা নিয়ে কিছু ভাবতামই না। যেনো তেরিয়া মেজাজ, নামাজ আদায় করিনি তো হয়েছে কী? গ্লানির কোনো ছায়া থাকতো না মনে। একদিন আপিস থেকে ফিরে বাড়ি থেকে চিঠি পেলাম। গৃহিণী তার কাঁচা-হাতের অক্ষরে লিখেছে, আমার বাড়ি যাওয়া দরকার। এক সঙ্গে ছেলেমেয়ে জ্বরে পড়েছে। রোগীর সেবা, রান্নাবান্না, গেরস্থালির কাজ— চারিদিকে চোখ রাখা দায়। তাছাড়া তার শরীর এখনও বইছে সব কিছু ধুঁকে-ধুঁকে। পাড়া-প্রতিবেশী তো হরদম তার ঘরে বসে থাকতে পারে না। সকলের ঘরেই কাজ আছে। তারা ঋণ দিয়ে সাহায্য করে, তা-ই পরম সৌভাগ্য। কিন্তু পাড়ায় তেমন ধন-কুবের তো কেউ নেই। নসিব সেদিকেও মন্দা। আর তেমন কেউ থাকলেও দানছত্র খুলে আর কে বসে আছে? সেদিন অনেকক্ষণ মাগ্‌রিব কবে পার হয়ে গেছে— ঘুমালাম। হয়তো আরো ঘুমাতাম এক মেস-সঙ্গী এসে ডাক না দিলে। 'কী ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? 'না, আজকাল আপিসে কাজ সেরে আর গতরে তাগদ থাকে না।' এখন অর্থের সন্ধান বড়ো কথা। চেনাশোনা মুখ অনেকগুলো সামনে দাঁড় করালাম। খাতির জমানোর লোক আমি ছিলাম না। কথার চমক অনেকের থাকে, কারো কারো খোশ গপ্‌পের ভাণ্ডার। সেদিকে আমি শূন্য। অথচ ভেতরে ভেতরে আমি নিজের সঙ্গে গল্প করে চলতাম বহু বছর। বিজিনেসে নেমে টাকার ওপিঠ এপিঠ হয়ে গেলো। কিন্তু বারো-তেরো বছর পূর্বে আমার দুই পাশ যে-যার জায়গায় যেনো অনড় ছিলো, চোখাচোখি পর্যন্ত হতো না। ভেতরের দিকে গোঁজা ছিলো আমার মন। অথচ আমিই এখন নানা চিড়িয়ার সঙ্গে উড়তে পারি। বহির্জগত আমাকে ঢের বেশি টানে। ভেতরে সাঁতার-কাটার অভ্যাস হাজতে এসে যেনো আবার ফিরে পেলাম। আরো কয়েদি আছে, তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব মামুলি। কার কী মামলা— আমার জানার এতোটুকু আগ্রহ নেই। অনেকে হয়তো কথা বলে বুকের ভার হালকা করতে এগিয়ে এলো। আমার অমনোযোগী হ্যাঁ-হুঁ-র রকম দেখে স্বভাবতই আর কে এগিয়ে আসবে। দরদী শ্রোতা না পেলে ঠোঁট নেড়ে কে পণ্ডশ্রম করবে? আমার কয়েক দিনের চালচলন হাজতবাসীদের জানিয়ে দিয়েছিলো আমি বোবা পাথর, যদিও নড়াচড়া করি। আমার গম্ভীর মুখ এবং ঘন দাড়ির ঝিলিমিলির ভেতরে প্রবেশের নিষেধ নোটিশ। শরীরের গঠন পেয়েছিলাম ভালো। খাড়ায় কম নই। মাংসল দুই বাহুর প্রসার। চওড়া সিনা। তাই বোধহয়, কৃচ্ছ্রতার ঝাপটা অতো সহজে শরীরে লাগতো না। মুখ মনে করতে লাগলাম— বিপদে হাত বাড়িয়ে দিতে পারে এমন মুখ। পরদিন সকালে কয়েক জনের কাছে গেলাম। তারা কোনো কাজে লাগলো না। অবিশ্যি তারাও আমার মতো আর্থিক দিক থেকে। তবু দুরাশার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। একা মেস-সঙ্গী রমিজ আলি। তার কাছে গিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মনের ভেতর হাজার তোলপাড় : দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, যদিও সহকর্মী। কিন্তু বারবার বাড়ির ছবি হানা দিতে লাগলো। আল্লার নাম ইয়াদ করে, পা এগোতে চায় না, তবু হাঁটতে লাগলাম যেনো অন্ধ। বুকের ভেতর নানা তর্জার লড়াই। রমিজ আলি শুধু টাকা দিলে না, এমন সহানুভূতি দেখালে যে লোকটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্জন, এমন চিন্তা করা মনে হতে লাগলো অন্যায়। বিপদে মানুষ চেনা যায়। বিপদ থেকে বাঁচলাম। কিন্তু আমার সমস্ত আক্রোশ বাড়লো নিজের উপর। খামখা নিজের তথা-কথিত বিবেকের উপর নির্ভর করে আমি কেনো চলবো, যখন আমার স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে? তাদের মানুষ করে গড়ে তোলা আমার দায়িত্ব। আমি কী করে তা এড়িয়ে যেতে পারি? বিবেক তো এখন আত্মসুখ? অর্থাৎ আমার মনে না কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বজাত অসোয়াস্তি থাকে, তারই জন্যে আমি আর কারো দিকে তাকাচ্ছি না। আমার কাছে এই প্রশ্ন বার বার চোখের সামনে বিভীষিকার মতো ধাক্কা দিতে লাগলো। আমি আমার বহুকালের বাস্তুভিটা থেকে সরে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। রোজগারের দাঁও কিছু আপিসেই ছিলো। তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লাম না। কিন্তু আমি বহু দিনের উপবাসী। আমার ক্ষুধা প্রচণ্ড আকারে দেখা দিলো। পথই পথ দেখায়। আমি বাইরে আরো শান্ত আরো বিনয়ী। আমার বাইরের হালচালে কোনো পরিবর্তন নেই। আর প্রথম-প্রথম বাড়তি রোজগারে বরং ছেলেমেয়েদের কাপড়-চোপড় বা বায়নায় খরচ করতাম। নিজের সাদাসিধা জীবন-যাপন। কিন্তু পথই পথ দেখায়। আমার ভেতরের লোভ আমাকে আর ছোটো এলাকার ভেতর ধরে রাখতে পারলো না। এ যেনো সাপ ও সিঁড়ির খেলা। সিঁড়ি বা মই। একবার সুযোগ পেলে তা দেখবো তুমিই উঠেই যাচ্ছো উপরে। এই খেলায় সাপ আছে, তা জানতাম। কিন্তু ঝুঁকি তো মুহূর্তে মুহূর্তে আছে। হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করছে, হঠাৎ থেমে যেতে পারে। এমন আশঙ্কা থাকে বলে কি মানুষ বাঁচতে চায় না? এখন এই প্রথম সাপের মুখে পড়ে গেছি। কিন্তু খেলা যদি চলে সাপের লেজ থেকে এড়িয়ে আবার সিঁড়ি মিলতে পারে। এখন ভয়, এই সাপ বড়ো লম্বা সাপ। এখনও লেজে পৌঁছাইনি। হয়তো এই অবতরণেই বাকি জীবন কেটে যেতে পারে। যখন এক সিঁড়ি ছেড়ে আর এক সিঁড়ি পায়ের কাছে সহজে মিলছিলো তখন এসব ভাবিনি। কয়েক বছরে অনেক দূরে ছিটকে পড়লাম। কেরানি রইলাম না। চাকরিতে ইস্তফা। লোকালয়ে ইস্তফা। আমার পাড়া বদলে গেলো, ধড়াচূড়া বদলে গেলো। দৈনন্দিন বাঁচার লড়াই রইলো না। পেট ভরা থাকলেই ঢেকুর ওঠে। আমার প্রায় স্তব্ধ মুখ হঠাৎ ঝরনার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগোনোর তাগিদ কোথা থেকে যে পেলে, আল্লাকে মালুম। নিরাপত্তা এমনই তেলেস্‌মাতি দাওয়াই। পেটে আহার-দানের চিন্তামুক্ত মানুষ কিছু করতে পারে। চল্‌লেই চল্লিশ বুদ্ধি। পুরাতন মুরুব্বিরা বলে গেছেন। আমার আক্কেল হঠাৎ ঝলকে উঠলো যেনো। অন্য মণ্ডলের মানুষ হয়ে গেলাম দশ বছরে। বর্তমান বিজিনেসে এসে গেলাম। আজ সব কথা মনে করতে ভালো লাগে না। আশ্চর্য, আমাদের জগৎ। পাহাড়ের মতো তার অনেক স্তর। এক পথে উৎরাইয়ে যাওয়া যায়। সেখানকার এলাকার সঙ্গে নিচের এলাকার কোনো যোগাযোগ নেই। শুধু একই পাহাড় এই বন্ধন ছাড়া। অথবা বলা যায়, এক আকাশের নিচে বাস। কিন্তু তা দিয়ে তো তাবৎ অবস্থান বা সম্পর্কের বয়ান যথাযথ শেষ করা যায় না। পাড়া বদলানোর ফলে, পুরাতন কারো সঙ্গে দেখা হওয়া সুদূরপরাহত। হলেও, ঘনিষ্ঠতার অভাবে সালামালেকুম-আলায়কুম-যোগে তুমি জলদি পথের আলাপন শেষ করতে পারো। তাছাড়া, নিজের ভেতরেই তুমি এমন বাতাস পাবে, মনে হবে তুমি এক ঊর্ধ্বচারী বেলুন; নিচে মাটির

পৃথিবীর লোকগুলো তোমার দিকে তাকানোর অবসর মিলেছে। তাই এতো কথা মনে হচ্ছে। চাকরি ছাড়ার পরে আর আপিস-মুখো হইনি। রমিজ আলি একদিন আমার খোঁজে এসেছিলো পুরাতন মেসে। অন্য অবশিষ্ট দু'জনের সঙ্গে নতুন দু'জন বাসা বেঁধেছিলো। রমিজ ছিঁচকে চোর। কলা-মূলা পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলো। মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার— নীতি তার ঝুলিতে ছিলো না। চাকরিও সে ছাড়েনি। আমার মতো তার ভেতর লাফ-দেওয়ার তাগদ নাও থাকতে পারে। অনেক সময় সুযোগের প্রশ্ন আছে। সকলের বরাত তো সমানভাবে খোলে না। আমি একদিন রমিজ আলির বাসায় হাজির হয়েছিলাম। কিছু উপহারসহ। একটা ঘড়ি, পাঞ্জাবির ভালো তিন গজ কাপড়, আরো টুকিটাকি এই রকম কয়েকটা জিনিস। আমার খোল্‌তাই চেহ্‌রা, ধবধবে শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং পাম-শুর বাহার নিশ্চয় তাকে হকচকিয়ে দিয়েছিলো। আমার অভ্যর্থনায় কি করবে, তা ছোটো তিন কামরার বাসায় এবং গলির ভেতর, সে ভেবে পাচ্ছিলো না। আমি তাকে নিরস্ত করলাম। এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খাব না, নিষেধ আছে ডাক্তারের। 'যা দেখছেন, তার খোলস। মোটাসোটা তন্দুরস্ত শুধু চোখে, আর বয়স হয়েছে না, ভাই।' রমিজ খুব খুশি যে চাকরি ছেড়ে বিজিনেসে গিয়ে ভালই করছি। কিন্তু বিজিনেসের ধরনের প্রশ্ন যখন উঠলো। তা একদম সাধারণভাবে আমদানি-রপ্তানি। আমার বেশি বাক্যব্যয়ের প্রবণতা দেখে সে মন্তব্য করে বসলো, আপনি যে বেশি কথার লোক, তা আমি ভাবতেই পারতাম না।' এসব বিজিনেসে গিয়ে হয়েছে। উপায় তো নেই। মালবেচার পূর্বে আসলে কথা বেচা হয়, আপনি জানেন।' 'হ্যাঁ মূলে তাই।' আমার উপহার রমিজকে বিব্রত ও আনন্দিত করেছিলো সমানভাবে। কুণ্ঠার মেঘেই তার মুখের কথা বেরোয়, 'আপনি যে মনে রেখেছেন, সেই আমার সৌভাগ্য' 'মনে রাখা মানে— আপনাকে আমি কেয়ামত তক্ মনে রাখবো। বিপদের দিনে আপনি আমাকে বাঁচাননি শুধু, আমার ছেলেমেয়েদের সুদ্ধ বাঁচিয়েছিলেন।' 'ছি ছি, সবই আল্লার হাত, আমি কি করতে পারি?' আমি এই সময় দু'শ' টাকা বের করে বলি, 'ভাই অনেক পুরাতন দেনা, শোধ করছি না, আপনার বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্যে দিচ্ছি।' অনেক জবরদস্তি রমিজের হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছিলাম। আমার ঠিকানার প্রশ্ন উঠলো। 'বাড়ি বদলাব এক হপ্তার মধ্যে, আপনাকে নতুন ঠিকানা দেব, ওখানে উঠে গিয়েই।' রমিজ আলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তারও কারণ আছে। পকেটমার এবং ডাকাতে মিল তো বহু। তবুও মর্যাদায় তারা এক নয়। কারো সামনে যদি বাধ্যতামূলক বিকল্প দেওয়া হয় পকেটমার এবং ডাকাতের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার জন্যে— সে নির্ঘাত ডাকাত হতে চাইবে। সমাজে যে যতো বেশি বিপজ্জনক, তার মর্যাদা ততো বেশি। সেখানেও টাকা পয়সা জড়িত। আর বিজিনেসের প্রসার যত ঘটে, নানা মক্কেল জুটে যায়। কাজের বহর শুধু বাড়ে না, ক্রমশও জটিলতা এসে জোটে। এক মিথ্যে চাপা দিতে আরো শত মিথ্যের দরকার পড়ে। আজ মনে হয় কোথা থেকে কোথা এসে পৌঁছলাম! মামলায় শাস্তি যদি পাই, সাত-আট বছর আবার স্বাভাবিক জগৎ থেকে নির্বাসিত হবে। ফিরে এলেও স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে না। আয় তো শেষ। নতুন কোনো কাজে জীবিকা অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। সম্পত্তি আটক পড়তে পারে। সব আল্লার উপর তোয়াক্কা,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাকে যা মঞ্জুর, করবেন। আমার ছেলেমেয়ে আবার পথে না বসলেই হলো। সর্বনাশের আস্তানায় যদি শেষে ঢুকতে হয় কিন্তু আমি পারি আরো অনেকের সর্বনাশ করতে। আমার মিথ্যে তো আমি ঢাকি না, যারা বিজিনেসের বড় শেয়ার ভোগ করে, তারাই এগিয়ে আসে যদিও সরে-জমিনে নয়। এইখানে তাদের সুবিধে আছে, যা আমার নেই। সবুরন অতো মাথাব্যথা নয়। তার সাক্ষী বেশি দূর গড়াতে অক্ষম। সে অনেক লোক চেনে না। আর জায়গা চিনলেই ক্ষতি নেই। টুকিটাকি কাজ দিতাম তাকে। 'দুটো পাসপোর্ট দিয়ে আয়, একটা চেক দেবে নিয়ে আসবি।' রিকশায় যাতায়াত করতো। আমাদের ডেরায় যে-সব মেয়েরা আসতো-দু-তিন দিনের জন্যে— তাদের মোটামুটি আনন্দে রাখা অথবা বেশি দিন থাকলে যেন মন-মরা না হয়, তার ব্যবস্থাপনা ছিলো সবুরনের উপর। আমার কথা সে পীরের মতো মনে করতো, পালনে কোনো কুণ্ঠা ছিলো না। তারাই আমার সব চেয়ে বড়ো ভরসা, যাদের ছত্রছায়ায় আমার চলাফেরা নিঃশঙ্ক ছিলো। আমার উকিল ব্যারিস্টারের তদ্‌বির তারাই করবে। নিশ্চিত হতে পারবে না, যদ্দিন না আমার এসপার-ওসপার কিছু একটা হয়। অবিশ্যি নেমকের মর্যাদা আমি শেষ পর্যন্ত রাখতে চেষ্টা করবো। পরিবার নিয়ে যখন ভেসে যাচ্ছিলাম, তখন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা এক বিপর্যয় থেকে তো বাঁচিয়ে দিয়েছে। অবিশ্যি আমার ভার নেওয়ার ক্ষমতা ছিলো। আমিও পরিস্থিতি অনুযায়ী চৌকশ হতে পারি, তারা জানতো! ব্যাপারটা স্রেফ অনুগ্রহ ছিলো না। জেলে মাছ ধরে, গায়ে কাদা মাখে। তার কৃতিত্বের কথা অবিশ্যি মৎস্য ভোগীদের স্মরণ করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আমাদের কিছু আইনজীবীর সঙ্গে পরিচয় ছিলো। তাদের মারফত ছোট-খাট আইনের ব্যাপারে জানা হতো। আইনের কাছে না আমরা সহজে মার খাই, সেই ব্যবস্থার আয়োজন চলবে। তাই আমার ঘুম হয়। কোর্টে কেস উঠলে, উকিল আমার সঙ্গে পরামর্শে আসবেন। জামিন পাব না ঠিকই। অথচ কিছু খবরের কাগজের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ ছিলো। বর্তমান কালে কোনো কিছু চাপা দিতে বা একদম হাটে হাঁড়িভাঙা করতে এই প্রতিষ্ঠান অনেক সাহায্যে আসে। তোমার সব কাজ গতিবিধি কাক পক্ষীও জানে, অথচ তা নিয়ে কারো কোনো প্রতিক্রিয়া নেই বা হবে না, তার ব্যবস্থাও সাংবাদিকরা করতে পারে। আমাদের আটঘাট নানা দিকে বাঁধা ছিলো। অবিশ্যি এসব কাজে আমি যেতাম না। কারণ আমার দায়িত্বের আওতায় পড়তো না। করাতের বড়ো দাঁত এসব জায়গায় চেরায়ের কাজ চালিয়ে যায়, যদিও ছোটো দাঁত উদ্‌বৃত্ত কিছু নয়। নিচের দিকে আমার এক রিপোর্টারের সঙ্গে বেশ খাতির ছিলো। সমাজের আঁত্‌ড়ির ঠিক মানুষের আঁত্‌ড়ির মতই। ভেতরে ভেতরে শিরা যে কোথা চলে যায়। একটার সঙ্গে একটার কোনো যোগাযোগ নেই, দেখা গেলো। কিন্তু অনেক দূরে গিয়ে পেটের মধ্যে দু'য়ে গলাগলি মিশে আছি। তাই বড়ো বিজিনেসে কেউ সংবাদপত্র দূরে সরিয়ে বড়ো বড়ো কোম্পানী জনসংযোগ অফিসার রাখে কী সাধে? অনেক অর্থ খামকা ব্যয় করে না। তোমার দেশে যদি বিদেশী দূতাবাস থাকে, তাদেরও এইভাবে খাতির জমাতে হয়। সুনাম বদনামের ভয় তো তাদেরও আছে। দুনিয়া এমনই অন্ত্রনালী এখন। কতো দিকে তার ওয়্যার কতো দিকে ছড়িয়ে আছে, খেই খুঁজে অস্থির হয়ে যাবে। আর যদি গিটগুলোর খবর

নিতে চাও, দু'চার বছরে খুলতে পারবে না, যতই চেষ্টা পাও। আমাদের বিজিনেস শুধু স্বদেশে সীমাবদ্ধ নয়। আমদানি-রপ্তানির কাজ তো এখন দুনিয়া জুড়ে। সুতরাং সম্পর্কের সুতো সেই ভাবে ছড়িয়েছে, পেঁচিয়েছে অসংখ্য বিস্তারে এবং জটিলতায়। খবরের কাগজের মানুষেরা শুধু স্বদেশে কাজে লাগে না, বিদেশেও তাদের ছায়া পড়ে। এক সাংবাদিক তো আমার বিদেশে যোগসূত্রের বড়ো সহায় ছিলো। কারণ, বিদেশী দূতালয়ে তার মর্যাদা। বিজিনেসের বন্ধুত্ব কখনও শুধু একতরফা হয় না— যা প্রেমের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এখানে কেউ কোনো এক-তরফা হতাশ প্রেমিক বা প্রেমিকা থাকে না। লেনদেন নগদ। একদম আমদানি- রপ্তানি বা রপ্তানি-আমদানি। আর সুবিধা আছে এযুগে। কাউকে নিজের জায়গা ছাড়তে হয় না। এক ঠাঁয় বসে সারা দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। ব্যাংক, টেলিফোন, টেলেক্স, ক্লিয়ারিং এজেন্ট অগয়রহ নিখুঁত আজ্ঞাবাহী। সবাই চালু। তুমি অনড় থাকতে পারো, ইচ্ছে করলে। গদির উপর বা চেয়ারের উপর বসেই সব কাজ হয়ে যায়। স্বদেশে-বিদেশে কথাটা তাই অর্থহীন, যদিও ব্যবসার বাইরে কিছু থাকতে পারে— যদি একান্তই থাকে। এই বিজিনেসে মালের পরিধি অংশীদারেরা বছরে বছরে বিস্তার করেছিলো। আমার তাই ঘুম হয়। একদম হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সব চেয়ে খারাপটা যদি হয়, ধরা যাক, দশ বছর জেল। পরিবারে কোনো আর্থিক কষ্ট থাকবে না। জীবনে প্রথম দেওয়াল তো এই এক জায়গায় দেখেছিলাম। দেওয়াল টপকে যেতে কিছু হাঁটু-ছড়া, হাত বা পায়ের আঙুল, হাড় মচকানো ইত্যাদি ঘটতেই পারে। তা নিয়ে খামকা আফসোস করে লাভ নেই। অক্ষত কেউ থাকতে পারে না। শরীরের একাংশ ব্যাধিগ্রস্ত। তার জন্যে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বৃথা, এমন ধারণা অমূলক। অনেক কিছু ভাবতে পারছি নতুন পরিস্থিতির মধ্যে। তবে স্থির করেছিলাম, পুরাতন জীবনে ফিরে যাবো, এখন যখন ভাতের জন্যে দৈনন্দিনতার কুশাঙ্কুর-মুক্ত। সবুরন সরল গ্রাম্য মেয়ে। যেখানে জন্মেছিলো সেখানেই থেকে গেছে। আমি গ্রামে ফিরতে পারতাম না। উপার্জনের ধান্দার সব সময় অছিলায় পথ বন্ধ করে দিতাম সহজে। কারণ আমি আর ওই কাজেই নেই। অবসরের জীবন কী করে কাটাতাম তা পরে ভাবা যেতো। কিন্তু দলছাড়া কি সহজ হতো? পুরাতন অপরাধ যদি খুঁড়ে কেউ বের করতো? কাল সব চাপা দিয়ে দেয়। অতীত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় স্মৃতি থেকে, হয়তো প্রচুর সময় লাগে। হঠাৎ আচমকা মার খেয়ে গেলাম। হাজতের এই নিঃশ্বাসরোধী জগতে ভয় স্বতঃই আসে। লম্বা দম নিয়ে বুকের জোর ফিরে পাওয়ার চেষ্টা পাই। আল্লাকে আর নিয়মিত ডাকি না। অথচ পূর্বে বিপদকালে নয়, প্রতিদিন তার দরগায় হাজিরা দিতাম। অনেক অন্ধকার চতুর্দিকে। শান্ত্রীর বুটের আওয়াজ ক্রমশ এগিয়ে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। গৃহ-সুখের পুরাতন ছবি এক-একবার দেখতে পাই। দুঃখ-বেদনার মোচড় তেমন অবর্ণনীয় যন্ত্রণা উত্থাপনে অপারগ। এক-একবার আমার চিৎকার দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। আশ্চর্য, এই সংসারের চাল অথবা পৃথিবীর চাল। দশ জনের সঙ্গে থাকতে গেলে কতগুলো খস্‌লৎ রপ্ত করা লাগে। মান-অপমানের কতগুলো ধারণা তার সঙ্গে জড়িত। তখন পথ বেছে নিতে গেলে আর খস্‌লৎ রাখা দায় হয়ে পড়ে। তুমি অপরাধী দশের কাছে। বিবেকের কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। অথচ আবার বুদবুদের মতো তুমি আপন জলের সমতলে মিশে যেতে পারো না। ফাঁসির দড়িতে ঝুলে যাওয়ার পর গলার শিরা বিদ্রোহে মরিয়া হয়ে ওঠে, কিন্তু ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে প্রতিবাদের রেশ। তোমারই ভার তখন দড়ির সহায়ক। আত্ম-হননের সম্ভাবনা মানুষের মধ্যেও থাকে, শুধু বাইরে নয়। মাকড়সার সূতা কি হালকা তুলোর ফাঁসি কেউ দিতে যায় না। মানুষেরই ফাঁসি হয়। দুদিন থেকে একটা সন্দেহ জেগেছে আমার মনে, কোর্টে উঠলে আমার নেপথ্য অংশীদারেরা নিশ্চয় আরো সজাগ হয়ে উঠবে। করাতের ছোটো আর বড়ো দাঁতে এই তফাৎ। অথচ দুই-ই কাঠের মাংসের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করে দংশনসহ। এখন আমার উপর নির্ভর করেছে ওদের নেপথ্যে থাকা। অপরাধ তো একা করা যায় না। এক আত্মহনন ছাড়া। কেউ অপরাধে সরে-জমিন থাকে, কেউ আড়ালে। আইনে উভয়ের জন্যে শাস্তি বরাদ্দ থাকে। কিন্তু তার ষোল আনা নির্ভর করে সরে-জমিন অপরাধীর উপর। মামলার আড়াল থেকেই তারা উকিল ব্যারিস্টার যোগাবে। আমি যেনো ঘাবড়ে না যাই। এই হাজতে বসেই সে খবর পেলাম এক কয়েদি-মারফত। জাল চারিদিকে পাতা থাকলে অনেক সুযোগ-সুবিধে মেলে। আইনের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। এসব আমার জানা কথা। কিন্তু কারা প্রাচীরও ভেদ করা যায়। আমার আক্কেলে তা কোনো দিন খেলেনি। এখন অনেকখানি নির্ভর করছে আমার উপর ওদের আব্রু-ইজ্জত। সুতরাং মামলার খবর ওরা নেবে। কোনদিকে মোড় নিচ্ছে, খবরের কাগজ দেখেই তারা নিশ্চিত থাকবে না। আদালতে নিজেদের লোক পাঠাবে। কখনও জেরার সময় যদি আসামী নয় অথচ আসামী হতে পারতো এমন কারোর নাম ওঠে এবং তারা কেউ সংশ্লিষ্ট থাকে, তা খবরের কাগজে যাতে ছাপা না হয় বা রিপোর্টার উহ্য রাখে, পাছে আপিসে তার অপর সহকর্মী দেখে ফেলে— এমন ব্যবস্থা নিশ্চয় থাকবে। সমাজের শীর্ষে খামকা পৌঁছানো যায় না, যদি অতটুকু আক্কেল না থাকে। সকলেই রীতিমত মহা-মহাজন। এইখানে বদনামের উৎস আমি হয়ে যেতে পারি। যদি আমার হালচালে জেরার সময় কথা-বার্তায় তেমন মোড় দেখা দেয়, তারা কি করবে? করাতের বড়ো দাঁতের পক্ষে উপর থেকে অনেক নিচে গমনাগমন সম্ভব। নিচে উভয়ে কিন্তু একই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, সেখানে ছোটো-বড়ো কোনো ভেদাভেদ থাকে না। কিন্তু ছোটো ছোটোই। আমি যদি ঘাড় বাঁকাই, তারা ঘাড় মুচড়ে দেবে না কি? হয়তো আমার সন্দেহ খামখা। কিন্তু দুনিয়ায় সম্ভাবনা তো অনেক। অবিশ্যি এসব ভেবে লাভ নেই। একটা কিছু হবে। তবে আমি পেশাদারি সততা অক্ষুণ্ন রাখবো। জেরার সময় জবাব দিতে হবে ভেবে-চিন্তে। শুনেছি ঝানু উকিলেরা নাকি সাধারণ জিজ্ঞেস-পড়া দিয়ে শুরু করে এমন গলি পথে নিয়ে যায় যে শেষে উত্তর-দাতা বুঝতেই পারে সে কখন তার পায়ে কুড়াল মেরে বসে আছে। সন্দেহ একদম অমূলক নয়। সুদীর্ঘ দশ বারো বছরে বহু জলা-জাঙাল পার হয়েছি। একবার এক দারোগাকে রিপোর্ট কিছু এদিক-ওদিক করতে বলা হয়। একদম খালি হাতে না, লেনদেনের প্রস্তাবক ছিলাম আমি নিজে। বেচারা আইনের দোহাই দিলে। নিজের খালি হাত খালি রাখলে। ওর মগজও বোধহয় তদ্রূপ। পরিণাম কি? বদলি হয়ে গেলো এক অস্বাস্থ্যকর জায়গায়। তা ভালো ছিলো। কিন্তু যাওয়ার আগে সে মার্ডার হয়ে যায়। কে

তাকে খুন করলো, আমি জানি না। কারণ আমার ভূমিকা ছিল সামান্য ওই প্রস্তাব পর্যন্ত। পরে নতুন প্রধান এলো থানায়। সে আক্কেলমন্দ মানুষ। হয়তো অন্য কোন ঘটনার জের হিসেবে প্রাক্তন বেচারা জান খুইয়েছিলো। কিন্তু দু'দিন থেকে পুরাতন ঘটনা আমার কাছে আচ্ছন্নতার মতো কয়েক বার ধাক্কা দিয়ে গেলো। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে মনের দিশা থাকে না। কখন কোন বুদবুদ ওঠে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলা দায়। মাঝে মাঝে বড়ো একা ঠেকে না শুধু, একা হয়ে যাই। আমার চেকনাই চেহারা, রাশভারি অবয়ব, প্রৌঢ় বয়স। ফলে আরো বিচারাধীন আসামীর সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এক-আধ কথার পর তারা নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আমার কোনো গরজ থাকে না, যদিও জানি এক-একা পেলে ভাবনারা ধোপার কাপড়-আছড়ানোর মত নিঃসঙ্গ জনের উপর জুলুম চালায়। কতো দিন পরে আদালতে মামলা উঠবে? কতোদিন হাজত বাস চলবে? মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই আমার দুনিয়া। এই কুঠরি আর উঠানে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আরাম-বিশ্রামের কথা বাদ দেওয়া যায়। প্রশান্তির সঙ্গে সেসব মধুময়, অর্থময় হয়ে ওঠে। নচেৎ সব জায়গাই কণ্টক-অরণ্য। এখানে দিন আসে, রাত্রি নামে। তা-ও অর্থহীন। মাঝে মাঝে মাথা দপদপ করে ওঠে। অবিশ্যি আমার দৈহিক তেমন অসুবিধা ঘটে না। কারারক্ষী শান্ত্রিরা ছোট-খাটো অভাব অভিযোগের খোঁজ নেয় এবং যথারীতি সেই মতো কাজ করে। ওদের কিছু বলি না। কিন্তু আমি সহজে বুঝে ফেলি—যারা আমার সঙ্গে বছরের পর বছর জড়িত ছিলো, যে-সব ছোরার বাঁট হিসেবে নিজেকে ব্যবহার করেছি এবং জীবনের সার্থকতার অন্বেষণে প্রথম ধাপ বিধায় আঁকড়ে ধরেছি—তারা আমাকে একদম বন্য ডাল-কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করেনি। জটিল বিশ্বে বেঈমানি আছে। কিন্তু সেখানেও ঈমানের একটা পর্যায় রাখতে হয়, নচেৎ মানুষ কবে জানোয়ার ব'নে যেতো। আমি এই নির্জন দ্বীপে একা নই। তবু বুকে ধস নামে। বাড়ির অতি পরিচিত মুখগুলো সামনে এসে দাঁড়ায়। কখনও একা-একা, কখনও দল-বাঁধা। গৃহিণীর দুপাশ ঘিরে সন্তানেরা দাঁড়ায়, কেউ হাসে না। সব স্থাণু-চিত্র। দূর-দূর পাড়ি মেরে যায়। কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়-কাল। আবার সব একাকার হয়ে যায়। বিরাট এক মোজেক দেওয়াল কখনও রঙের ঝলক, কখনও অন্ধকারের আপন বর্ণে সমাহিত, সামনে খাড়া থাকে। হাত বাড়াতে চাই স্পর্শের জন্যে। কিন্তু আমি এবার স্থাণু। যেনো কোনো অতি খরস্রোত সরু নদীর দুই পাড়ে কয়েক জন। একজন একা, তবু দঙ্গল হতে চায়। অন্য পাড়ে এই অসুবিধে নেই। পরস্পরে দৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। নিঃশব্দ এক আর্তনাদের লহরি যেনো আবহমান কাল থেকে শুধু তরঙ্গিত এইখানে। কোথা ভুল থেকে গেলো? আজ অস্পষ্ট ছায়ারা হেঁকে যায়; "সহজ সড়ক কোনো সড়ক নয়, যদি বিশ্রামই শেষ অভিলাষ হয়ে থাকে। পদ-চারণা ছাড়া সড়ক আর অন্য কিছুয়ে পরিণত হয়। তুমি তো একা সুখ পেতে চেয়েছিলে সপরিবার। একা জগতে বাস করা যায় না।" এখন মনে হয় কঠিন সত্য যেনো আমার কাছে জানান দিতে ঠোঁট ঈষৎ উন্মোচনের মুহূর্তে থেমে যাচ্ছে। কোথা ভুল থেকে গেলো? আমি একা। একার সুখান্বেষী। সফল হলাম ধাপে ধাপে। কিন্তু সকলে তো এইভাবে এগোতে পারে না। এগোতে চাইলে কি তা করা যায়? সুযোগের প্রশ্ন থেকে যায় সব সময়। তা তো দুর্ঘটনাও বলা চলে। সুযোগ আসবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন তো কথা নেই। সবুরন নাও জুটতে পারে তো। সহকারী হিসেবে যেমন তুমি চাও তেমন নাও জুটতে পারে। আর সবাই তো ধড়িবাজ নয়। সহজ সরল মানুষেরা কোথায় যাবে? তারা কি চিরকাল ভবিতব্যের দোহাই মেরে জিন্দান-খানায় পচবে? সাফল্যের পিছনে কাজ করে কতো অনিশ্চয়তা। তার উপর তোমার বিশ্রাম ছাড়তে হয় শুধু একা নিজের সুখ-সুবিধের খোঁজে। আমার বর্তমান নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা কী তবে ভ্রান্ত পদ-চারণার প্রায়শ্চিত্ত! আমার কায়দায় একজন উদ্ধার হতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের জন্যও কি ওই পথ? না, তা হতে পারে না। ভুল সেইখানে। পথ কোথায়? হামাগুড়ি দিতে থাকি দুই চোখ মেলে। জবাব পাইনে অন্ধকারে। জবাব পাই নে কেন? শান্ত্রীর বুটের আওয়াজ কোনো জবাব নয়। ঘুলঘুলি সেলের জানালার ওপারে তাকিয়ে আকাশ দেখতে চাই। নিরেট অন্ধকার আমার মগজ-শিরায় অট্টনাদ তোলে। রাস্তা যতো সহজ মনে করেছিলাম, ততো সহজ নয়। এক মেস-সঙ্গী রমিজ আলি আমার ইমাম হয়ে বসলো। খবর পেলাম সে সাক্ষ্য দেবে, আমার অতীত জীবনের যেটুকু জানে বয়ান করবে। পুলিশ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো। যদি সাক্ষ্য দিতে আসে আমি তাকে ন্যাংটা করে ছাড়বো। কিন্তু তার খবর কতটুকু আমি জানি? আবছা অনুমান, সে উপরি-উপার্জনে পটু। আমি তো চোখে দেখিনি। প্রমাণ দেবো কি করে? তার বদান্যতার বহর এবং শহরের ব্যয়ের ধরন-ধারণ থেকে গোলতাল পাকিয়ে যায় সব। চুরি শব্দ ধাক্কাধাক্কি করে ফেরে। কান-চোখ যেনো কোনো ঘূর্ণি-আবর্তের ভেতর ক্রমশ গতি সমন্বয়ের দ্যোতনায় নিজের জায়গায় মুহূর্তও থাকতে নারাজ। হে পরওয়ারদেগার, হে মাবুদ আমার জন্যে তুমি এক ফোঁটা ঘুম পাঠাও। ঘুম, ঘুম...আমার কূল নাই। আমার কানের ভেতর অসংখ্য ঝিঁঝি ডাকে, তারস্বরে অতি তারস্বরে....

AMARBOI.COM

তিন

"মাননীয় আদালত, আজ আপনার হুজুরে আমি যে অভিযোগ আনছি, তার কলঙ্ক কালো কাফনের মতো গোটা দেশকে ঢেকে রয়েছে। অপরাধীর অপরাধ প্রায় পাপের পর্যায়ে পড়ে। অপরাধ এবং পাপ একত্রে যখন একে-অপরের হাত ধরাধরি করে আসে, তা মানব সমাজের শুধু কলঙ্ক নয়, সমাজ জীবনে তার ঘা শুধু বাইরে নয়, জাতির আত্মাও দূষিত করে তোলে। বর্তমান অভিযোগ-উত্থাপনের দায়িত্বের ভার পেশাগত দিক থেকে আজ আমার উপর পড়েছে। আমি লজ্জিত যে এমন দূষিত ঘায়ে আঙুল দিতে আমি বাধ্য। আর কারো উপর তা থাকলে আমি খুশি হতাম।"

পাবলিক প্রসিকিউটার মকবুল আহমদের ভারি এবং তীক্ষ্ণ-তীব্র কণ্ঠস্বরে নাতি-দীর্ঘ আদালত কক্ষ পূর্ণ হয়ে ওঠে। বড়ো আবেগাপ্লুত সেই নিনাদ।

যথারীতি মামলা শুরুর পূর্বেই আদালতে বেশ কয়েকজন দর্শনার্থী এসে বসেছিলো, যা সাধারণত হয় না। তা ছাড়া দুই পক্ষের উকিল এবং আসামী দুইজন, পাহারারত পুলিশ, পিয়ন আরদালির কথা না বললেও চলে। সমস্ত কামরাটা একদম ভরাট। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো কারণ ছিল। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার ছাড়া এক-আধজন উকিল থাকে সহকারী। আজ তিনজন এবং প্রত্যেকেই জুনিয়ার নয়। আসামী পক্ষে ছিল দুইজন ব্যারিস্টার আফতাব আলী, মাহমুদ হোসেন এবং সহকারী আরো চারজন। ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদ করিম নিজাসনে। পরনে কোট-প্যান্ট-টাই ইত্যাদি। সাক্ষী এসেছিল তিন-চার জন নারী ও পুরুষ।

পাবলিক প্রসিকিউটারের কণ্ঠপ্রবাহ থামে না। আবেগ-রঞ্জিত কণ্ঠস্বর এবং ভাষায় তিনি বলতে থাকেন, "মাননীয় আদালত যদিও আসামী এখানে একজন এবং অন্যজন রাজসাক্ষী বিধায় আমরা তাকে আর আসামীর পর্যায়ে রাখছি না, তবু এই সংখ্যা দিয়ে যেন কেউ অপরাধের গুরুত্ব পরিমাপ না করেন। আমি একে একে সব বিবরণ পেশ করবো। প্রধান আসামী কাজী আলামিন হলেও, দেখা যায় আসামী একা নয়। রাজসাক্ষী অনেক নাম বলেছে, কিন্তু তাদের হদিস এখনও আমাদের হাতে আসেনি। কারণ, তারা বর্ণিত ঠিকানা ছেড়ে অন্য কোথায় আস্তানা পেতেছে। দুঃখের বিষয়, কাজী আলামিনের সহকারী সবুরন নেসা নিরক্ষর। তবে পুলিশের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় সহজাত স্বাভাবিক জ্ঞানে সে যে-কোনো শিক্ষিত মহিলাকে হার মানিয়ে দেবে। অন্যান্য আসামীদের হাতেনাতে পেলে পাপের শিকড় উৎপাটিত হতো একেবারে এবং সমূলে। তা এখন সম্ভব নয়। কারণ আমি আগেই বলেছি। তবে বর্তমান আসামীর বিচার আশু প্রার্থনা করবো। কারণ এই জাতীয় মানুষেরা শুধু নিজের স্বার্থ-উদ্ধারে গোটা দেশের মুখে কালি লেপে দিতে এতোটুকু কার্পণ্য করবে না। কাজী আলামিন বেশ ঘড়েল, প্রতাপশালী ব্যক্তি মনে হয়। কারণ আসামীর জাল শুধু স্বদেশে নিবদ্ধ নয়; এক কথায় বলা যায়, প্রায় আন্তর্জাতিক। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, কুয়েত, বাহরায়েন, ওমান, সৌদি আরব প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের আরো আরো শহর তার ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে।"

আদালত কক্ষে দেখা যায়, আসামী মাথা নিচু করে বসে আছে। কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু সবুরন পাবলিক প্রসিকিউটারের কথাগুলো যেনো হাঁ-করে গিলছে। তার মুখাবয়বে কোনো ভীতির ছাপ নেই। যেনো সে এক তামাশার ভেতর পড়েছে এবং ফলে হঠাৎ অবাক। তার পরনে সাধারণ রঙিন শাড়ি। কিন্তু পা নগ্ন। অথচ জুতা পায়ে দিতে সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। হয়তো গ্রেফতারের সময় আর জুতা নেয়নি বা অন্য কিছু হবে। অবশ্যি খান-দুই শাড়ি সে পুঁটলি করে বেঁধে নিয়েছিলো। সেই গ্রেফতার-কালে যে কনস্টেবল ছিলো, সে-ই বলেছিলো এক-আধটা কাপড় নিতে পারো। হাজতে ক'দ্দিন থাকবে কে জানে। সবুরনের ধারণা, তার অসহায় চাউনি এবং মুখের আদল, হয়তো জোওয়ান পুলিশের মনে কোনো কিছু করে থাকবে।

"বিদেশে লোক-পাঠানো কোনো অপরাধ না।" পাবলিক প্রসিকিউটারের গলা এবারে কিছু খাদ-অভিমুখী, কিন্তু দৃঢ়। তিনি বলে যান, "বর্তমান যন্ত্রশিল্পের জমানায় সঙ্কুচিত পৃথিবীতে চাহিদা বিচিত্র। সব জায়গায় জনশক্তি এবং সংখ্যা সমান নয়। এক দেশের ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক আর এক দেশে যায় নিজেদের পেশারই খাতিরে। কিন্তু আসামী বিদেশে লোক-পাঠানোর নামে লাখ-লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। দুনিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটো হয়ে গেছে কিন্তু ইচ্ছা করলেই যে-কোনো দেশে যাওয়া যায় না। প্রত্যেক দেশের আইন-কানুন আছে। বহিরাগমনে, তেমনই গন্তব্যিত দেশেরও আইন-কানুন আছে। এসব না-মানা অপরাধ। পাসপোর্ট ভিসা, বৈদেশিক মুদ্রার পারমিট— আরো অন্যান্য অনুমতি প্রয়োজন হয়। আসামীর এসব জানা। কিন্তু আসামী শত শত মানুষকে প্রতারিত করেছে দুইভাবে। প্রসঙ্গত এখানে সব-পেয়েছি-র দেশ এখন ততখানি মালয় সিঙ্গাপুর নয়, বরং যতো মধ্যপ্রাচ্যের যে-কোনো শহর এবং সেখানে যে-কোনো একটি জীবিকা বেহেশতী মেওয়া। আমার কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না, সভ্য পৃথিবীর চিন্তার সঙ্গে যোগাযোগ না-রাখার ফলে, মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীরা তাদের দেশ-গর্ভস্থিত তেলের মতই ঘুমোচ্ছিল।"

এই সময় আসামী পক্ষ থেকে অন্যতম ব্যারিস্টার আফতাব আলী হেঁকে উঠলেন, "মাননীয় আদালত।"

কণ্ঠপ্রবাহ থেমে যায়। পাবলিক প্রসিকিউটার প্রতিপক্ষের দিকে সদয় চোখে তাকান না, অবিশ্যি পুরু চশমা তা ঢেকে রাখে। ম্যাজিস্ট্রেট করিম টেবিলের উপর কনুই রেখেই হাত তোলার ভঙ্গি অবস্থায় বলেন, "ইয়েস, জনাব আফতাব।"

"মাননীয় আদালত, এসব কী ইররেলিভেন্ট (অপ্রাসঙ্গিক) নয়?"

ম্যাজিস্ট্রেট : ওকে বলতে দিন।

"তারপর, যখন মধ্যপ্রাচ্যবাসী জেগে উঠল, তখন দেখলে তেল, তেল নয় তরল স্বর্ণপিণ্ড। হঠাৎ ফেঁপে উঠলো গোটা মধ্যপ্রাচ্য। কিন্তু নয়া ধনীদের যে-সব খসলৎ এসে জোটে, তাদেরও তা-ই জুটল। উপোসী ছারপোকার দশা। কড়কড়ে কাঁচা ডলার। বিদেশ থেকে নানা চকচকে বিলাস-সামগ্রীর দিকে সহজে চোখ ধায়। আরাম-আয়েশও স্বতঃই ভেতরে গুঁতোতে থাকে। এক কথায়, বিদেশীদের মতো খাওয়া-পরার অনুকরণের উপর ওরা একদম হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিছু জিনিস তৈরির দিকেও নজর ধায়। লোকসংখ্যা কম। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় মগজে নদারাৎ। লোক বিদেশ থেকে আনা ছাড়া উপায় থাকে না। তা দোষের কিছু নয়। অঢেল দৌলত। সুতরাং যারা গতর খাটিয়ে রোজগার করে, তারাও বেশ সোনাদানা পায়। অন্যান্য গরীব দেশের লোকদের চোখ স্বভাবতই মধ্যপ্রাচ্যের উপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু আসামীর টন্নী দালালরা প্রলোভন দেখাতো ঢের বেশি। বিদেশে পাঠানোর নামে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিতো। কিন্তু অনেককে পাঠাতো না। এই এক রকমের চিটিংবাজি। আর এক রকমের প্রতারণা আরো হীন, জঘন্য। কাউকে বিদেশে পাঠালো ঠিকই, কিন্তু সেখানে তাকে বিক্রি করে দেওয়া আগেই বন্দোবস্ত থাকে। এটি দাস-ব্যবসা ছাড়া আর কী বলা যায়? এই সভ্যযুগে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মানুষ মানুষকে ক্রীতদাস বানাবে এই কল্পনা, চিন্তা করাও অসম্ভব ঠেকে। কিন্তু এই জাতীয় অপরাধীর অর্থ-লালসা এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, তখন তাদের এতটুকু হুঁশ থাকে না যে তাদের ক্রিয়াকলাপ সমস্ত দেশ-জাতিকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। তেমনই হীন, কলঙ্কিত নর্দমায় নেমেছিল এই আসামী। শুধু পুরুষ নয়, নারী পাচার করতো। ক্রীতদাসীর ব্যবসা আবার ফিরিয়ে এনেছে এই মহাত্মারা, যদ্দিও প্রতিটি সভ্যদেশ বর্তমানে এই কলঙ্কমুক্ত। এই পাচারের কাজে দেখা যায়,

AMARBOI.COM

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা গ্রামের মেয়েদের ভাগিয়ে আনতো নানা প্রলোভন দেখিয়ে। তাদের অভিভাবকদের হয়তো সম্মতি থাকতো। অবিশ্যি পেছনে টাকা ঢালতো আসামীরা, তা সহজে অনুমান করা যায়। এইসব হতভাগিনীরা অকূল দরিয়ায় ঝাঁপ দিতো অবোধ বিশ্বাসে। দারিদ্র্য যে তার মূল কারণ তা চোখ বুজে বলা যায়। অন্য কারো পক্ষে কল্পনা করা কঠিন নয়, এমন ব্যাপার। তবে এই সব হতভাগিনীদের বেইজ্জতিও শুরু হতো আপন স্বদেশে। পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায়, এইসব মেয়েদের এই শহরেই এনে রাখা হতো। তারপর তাদের পাচারের অন্যান্য বন্দোবস্ত। পাসপোর্ট ভিসা— যদি আইনসঙ্গত পথ আসামীরা ধরে অথবা অন্য উপায়। এই সময়টুকু ভাগ্যহত মেয়েরা একদম বেকার থাকতো না। আসামী দু'তিন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলো। সেখানে মেয়েদের রাখা এবং অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা ছিলো, রুটিন ব্যাপার। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সব ললনা-নিকেতনে সন্ধ্যার পর যাতায়াত করতো। তারা অবিশ্যি কি উদ্দেশ্যে যেতো তা পুলিশ অনুমান করে, তবে সাক্ষীসাবুদ দিতে অক্ষম। কয়েকটি মেয়ে গ্রেফতারের সময় ধরা পড়ে। সকলে বলেছে, তারা চাকরির আশায় এই বাড়িতে ছিলো। গ্রামের মেয়ে নিজের ইজ্জত-হানির কথা সহজে স্বীকার করে না। তবে স্বীকার না করলেও ধরে নেওয়া যায়, এসব বাড়ি ব্যভিচারের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ যাকে রাজসাক্ষী রূপে খাড়া করেছে, সেই সবুরন নিজের ইজ্জত-হানির ব্যাপারে স্পষ্টভাষিণী হলেও অপরের ব্যাপারে কিছু বলতে পারে না। মনে হয়, নিজের পাপ সে অপরের উপর ছড়িয়ে দিতে নারাজ। এই মেয়ে-আসামী পুরুষ-আসামীর সঙ্গে সাত-আট বছর আছে। তার কেন কোথাও চাকরি হয়নি বা তাকে কেন অন্যান্যদের মতো বিদেশে পাচার করা হয় নি, সে বিষয়ে তার তেমন ধারণা নেই। পুলিশকে বলেছে— মালিক যা করেন আমার তো বলার কিছু ছিলো না, বা হাত ছিলো না। যা হোক, মোদ্দা কথা, নারী-পাচার এবং ক্রীতদাসসুলভ পন্থা আসামী গ্রহণ করেছিলো। আরো জানা গেছে, শুধু গ্রামের মেয়ে নয়, শিক্ষিত কিছু মেয়ে পর্যন্ত প্রলোভনের শিকার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সোনার খনি আছে। সেখানে গেলেই এই দুনিয়ার তাবৎ সুখ-আরাম হাতের মুঠোয়। এই প্রবণতা আশ্চর্যভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিতকে এদেশে পেয়ে বসেছে। পুলিশের হাতে একটি শিক্ষিত মেয়ের চিঠি অভাবনীয়রূপে এসে পড়ে। তা প্রয়োজন হলে পরে শোনানো যেতে পারে। মেয়েটি লিখেছে, আরাম-আয়েশের বহুত কিছু সে রোজ পায়। কিন্তু তার বিনিময়-হার বড়ো চড়া। বুঝতে দেরি হয় না, একটি মেয়ে যখন লেখে এসব কথা, তার যন্ত্রণা কোথায়। আসামী এইভাবে শুধু অর্থ-গৃধ্নুতার পরিচয় দেয়নি, দেশের মা-বোনকে দেহ-বিক্রয়ের নিমিত্ত নিয়োগ করেছে। এই কলঙ্ক লজ্জা শুধু গুটি কয় সেই বদনসিব মেয়েদের নয়— এই কলঙ্ক গোটা দেশের, এই লজ্জা গোটা দেশের....। সকল মা-বোনের.....।"

পাবলিক প্রসিকিউটার এই সময় যেন ঈষৎ বিশ্রাম ও নিঃশ্বাস নিতে সামান্য থামেন। সবুরনকে দেখা যায়, সেও নতমুখী, চোখ পর্যন্ত ঢেকে উকিলের অভিযোগ ভাষণ শুনছে। শুনছে কিনা বলা দায়। কারণ কান খোলা থাকলেই তার ভেতর সব সময় শব্দ প্রবেশ করবে এবং অর্থময় হয়ে উঠবে, এমন গ্যারান্টি তো অনিশ্চিত। কাজী আলামিন গোড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মাথা নিচু করেছে আর তোলেনি। আশ্চর্য ধৈর্য। তার যেনো ঘাড় ব্যথা হতেই পারে না, এই বয়সে এক নাগাড়ে শারীরিক অবস্থান যথাযথ রেখে।

পাবলিক প্রসিকিউটার সামান্য কেশে গলা পরিষ্কারের পর আবার দরাজ আওয়াজে শুরু করেন : "উপার্জনের নেশায় আসামীরা— যদিও এখানে এখন একজন— তবু তারা যে দল বেঁধে নানা উপায় নানা ফন্দিফিকির গ্রহণ করে, তার জন্যে খুব বেশি কল্পনা-শক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। আমি একটা ফন্দি বয়ানের পূর্বে ওদের আরো দুষ্কর্মের কিছু কথা না বলে পারছি নে। এইসব মেয়েদের তারা বিদেশে পাঠানোর পূর্বে দেহ-ব্যবসায় পাকা করে তোলার জন্যে আরাম-আয়েশের ঢালাও জোয়ার বইয়ে দিত। একদম গাঁয়ের কুঁড়েঘর থেকে আসার পর যদিও কেউ মোজেক করা বাথরুমে সাধারণ প্রাকৃতিক কর্ম-সারার সুযোগ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তোফা খানা পোলাও-বিরিয়ানি দুধ-পনির, নানা রকমের ফল প্রতিদিন ভোজ্য তালিকায়— তাহলে কী দশা হবে? আর লেবাসের তেমনই পরিবর্তন। গোড়ায়ই কারো কপাল ক্রমশ চমকায় এবং বিদেশে চাকরি পাওয়ার পূর্বে তাহলে আখেরে কতো সুখ না হা-পিত্যেশ করে রয়েছে— এই ধারণা তো সহজে আসা স্বাভাবিক, তাছাড়া অমন সদ্য গ্রাম-থেকে-আসা মেয়েদের পক্ষে এমন লালসের কাছে বহু শিক্ষিত জ্ঞানবান পুরুষই তো সবকিছু ভাসিয়ে দিতে পারে। তারও প্রমাণ খুব ভূরিভূরি নয়, কিন্তু তবু কিছু আছে। বহু ডিগ্রিধারী যুবকও সর্বস্বান্ত হয়েছে প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে। কিন্তু দুঃখ হয় হতভাগিনী মেয়েদের কথা শুনে, যারা সরল বিশ্বাসে ভবিষ্যতের হাতছানির উপরও আস্থা রেখেছে দুই চোখ বুজে। আমি জানি অনেকের বিদেশে আর— ।"

পাবলিক প্রসিকিউটার তাঁর বাক্য শেষ করতে পারেননি, যখন সাক্ষীদের আসন থেকে ডুকরে কান্নার শব্দ আদালত কক্ষে হঠাৎ আবহাওয়ার ছেদ টানে। কান্না নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত। তখনই সকলের দৃষ্টি সেদিকে ধেয়ে যায়। সবুরনের পাশেই একটি মেয়ে বসে ছিল। তারই কান্না। কিন্তু ওইখানেই সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত। কারণ, মেয়েটি ফিট হয়ে গেছে। আদালতময় কিছু কর্মচাঞ্চল্য। পার্শ্ববর্তী মেয়েদের সাহায্যে তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা। নাকে মুখে পানির ছিটা-দানের ব্যবস্থা। প্রায় দশ মিনিট এইভাবে অতিবাহিত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে আবার বিচার-পর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। পাবলিক প্রসিকিউটার তার বক্তব্যের খেই আবার পাকড়ে ধরেন।

"মাননীয় আদালত, অনেক হতভাগিনীর আর বিদেশে যাওয়া হয়নি। স্বাস্থ্যবতী যুবতী-চেহারা যে-রকমই হোক, রুগ্ন সুন্দরী অপেক্ষা ঢের বেশি লোভনীয়। বিশেষত, যারা কয়েক ঘণ্টার ফুর্তি লুটের আসরে দুনিয়ার তাবৎ রমণীদের সঙ্গে শয়নে-অভিলাষী। তাদের খায়েশের কোন স্থায়ী শিকড় নেই। ফলে, এসব হতভাগিনীরা একদিন লুচ্চা-ব্যবহৃত 'কনডমে'র মতই এস্তেমালের পরই ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়। সাক্ষী মেয়েটির মুখ-জবানি আপনারা পরে শুনবেন। পুলিশের রিপোর্টে তা বিশেষভাবে বিবৃত আছে। বড়ো দুঃখ লাগে, বিদেশেও আমাদের কলঙ্ক-কালিমা ঢাকার মতো আর কিছু নেই। এখন প্রতারকদের ফন্দিজাল সম্পর্কে আমি মাননীয় আদালত সমীপে আরো তথ্য পরিবেশন করতে চাই। আমার এতো বিস্তৃত সময় নেওয়ার আর কোন হেতু নেই— শুধু

AMARBOI.COM

একটি ব্যাপার জন-সমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্য ছাড়া। তা হচ্ছে, এই অপরাধীরা যে অপরাধ করেছে— অপরাধ কেন পাপ— তার গুরুত্ব যে কতখানি, তার সম্যক উপলব্ধি করুন গোটা দেশবাসী এবং দেশবাসীর ন্যায়-বোধের প্রতিভূরূপে মাননীয় আদালত। আসামী ফিকিরের জাল কীভাবে বিস্তার করত, তার একটা বয়ান মনে রাখা দরকার। সাধারণত বিদেশে লোক পাঠাতে গেলে প্রয়োজন হয় একটি সার্টিফিকেট। বাজারে সংক্ষেপিত নাম 'এন ও সি'— অর্থাৎ নো অবজেক্শান সার্টিফিকেট। ধরুন, যে দেশে যে যাবে তার জন্যে ওই দেশের কেউ জামিন থাকবে যে সে প্রেরিত-জনের খাওয়া-দাওয়া থাকার জন্যে দায়ী। এই সার্টিফিকেট একান্ত জরুরি। চাকরিদাতা ফার্মগুলো এসব করতে পারে অথবা কোনো ব্যক্তি। হয়তো দু'জনের এমন এন-ও-সি সার্টিফিকেট পাওয়া গেলো। আসামীরা তা পঞ্চাশ জনকে দেখিয়ে পঞ্চাশ জনের কাছ থেকে মোটা টাকা পঁচিশ-তিরিশ-চল্লিশ হাজার যখন যা পারে হাতিয়ে নেয়। এমন টাকা দিতে অনেকে দ্বিধা করে না। কারণ, চাকরি-স্থলে গেলে দু'মাসেই এই টাকা আদায় হয়ে যাবে। বাকি তো সবই লাভ এবং দ্রুত সুখ, আরামের চলন্ত সিঁড়িতে পা রাখা এবং এই সিঁড়ি কখনও নিচের দিকে নামে না, শুধু ক্রমশ উপরেই ওঠে। পঞ্চাশ জনের এই মোট টাকা তখন আসামীরা নিজের ব্যবসা বাণিজ্যে খাটায়। এখানে মরীচিকা সৃষ্টির কারণ থাকে। তিন মাসের মেয়াদ। যারা টাকা দেয়, তারা তিন মাস কিছু বলতে পারে না, তাদের সবুর করতেই হয়। আর তা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। বিদেশে পাঠানোর হাঙ্গামা আছে। পাসপোর্ট তো সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। ভিসা কী সঙ্গে সঙ্গে মেলে? সুতরাং ধৈর্য এবং তিন মাস তো এমন কিছু নয়। কিন্তু পরে তাদের ধৈর্য টলতে পারে। কিন্তু সেখানেও অতি অধৈর্য হলে চলে না। 'লবি' প্রথা অর্থাৎ স্বমতে বা সপক্ষে আনার জন্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই কৌশল প্রয়োগ করা হয় কিছু লোক মারফত। বিদেশে আদম-পাচারকারিগণও একই ফন্দি প্রয়োগ করে। কোনো লোক হয়তো ক্রমশঃ বেসবুর হয়ে উঠছে, তখন আশেপাশেই লোক থাকে, তারা বোঝায় আপনি তিন মাস অপেক্ষা করলেন আর কিছুদিন পারেন না? আপনার কেস তো এবার হওয়ার পথে। লজিকে কোনো ফাঁক নেই। হাঁচা কথা। অধৈর্য হয়ে বর্তমানে কে আর আখের খোয়াতে চায়? তখন প্রতীক্ষা করতে হয়। কেউ বেশি জিদ ধরলে, তাকে বলা হয়ে থাকে, বেশ এখন পাঁচ হাজার নিয়ে যান। আপনার কাজেই তো টাকা ব্যয় হয়েছে। সব আমাদের কাছ থেকে এখনই চাইতে পারেন না। তাও সত্য কথা। সুতরাং অপেক্ষার প্রশ্ন আবার আসে। খামকা চল্লিশ হাজার দিয়ে পাঁচ হাজার নিয়ে তো লাভ নেই। অনেকে এই ভাবে খোয়ার হয়েছে। গ্রামে নিজেদের জমি-জেরাত বিক্রি করে টাকা যোগাড় করেছিলো। এখন এমন বেহাল। আমি এখনই আপনাদের কাছে এক সাক্ষী হাজির করতে পারি। শাকের আলি—" পাবলিক প্রসিকিউটার ডাক দেওয়ামাত্র একজন সাক্ষী হয়ে উঠে দাঁড়ালো। সকলে তার দিকে তাকায়। কিন্তু প্রসিকিউটার তখনই বললেন, "তুমি এখন বসো। আমি তোমাকে পরে হাজির করবো। মাননীয় আদালত, এই হতভাগ্যের মুখের দিকে তাকান।" সকলেই সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। পাবলিক প্রসিকিউটারের কথা এগোতে থাকে, "পরে ওর মুখজবানি আপনারা শুনবেন। আমি শুধু সংক্ষেপে বলছি, গাঁয়ের বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচ্ছল পরিবার শাকের আলির। চাষী পরিবার। শাকের আলি আই এ পর্যন্ত পড়েছিলো। সংসারে সে-ই উচ্চ শিক্ষিত। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও থাকা স্বাভাবিক। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলের তরক্কী (উন্নতি) চাইবেন, তা বিচিত্র নয়। কিন্তু বৃদ্ধ আর তেমন ভেবেচিন্তে দেখেননি। শহর ফেরত ছেলে। কারণ, শহরে কলেজে দু'বছর পড়েছিলো। ছেলে প্রস্তাব দিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু পিতা তা মেনে নেবে কেনো? কিন্তু এই বৃদ্ধ আর এক ফাঁদে পড়েছিলেন। মনে রাখবেন, কিছু কিছু লোককে প্রতারকরা বিদেশে পাঠাতে সক্ষম হয়। তারা প্রচুর রোজগার করে। সেই টাকা বিদেশ থেকে আসে। ধরুন, এক গ্রামে একজন মাত্র লোক বিদেশে গেছে। তা শুধু জানান দিতে আসে, 'আমার দিকে তাকাও।' গ্রামে তো তখন হাজার হাজার টাকা আসে। গাঁয়ে কারো রোজগার মাসে মাসে হাজার, তা তো একটা খবর গোটা এলাকাময়। শুধু তাই নয়, যখন উপার্জনকারী বিদেশ থেকে আসে এক বছর কি দেড় বছর পরে, তার দিকে তো চাওয়া দায়। তার পরনে দামী স্যুট, হাতে দামী ঘড়ি, ট্র্যানজিস্টার। তার স্যুটকেস বোঝাই দামী-দামী শাড়ি, কাপড়ে-চোপড়ে। বাড়ির লোকেদের জন্য তো ঈদের উৎসব। এই সব চোখে দেখার পর পাড়া-প্রতিবেশী কার মগজ ঠাণ্ডা থাকতে পারে? আরো বড়ো টোপ হয়ে আসে জমি। রোজগারী বিদেশ থেকে এসে জমি কিনছে বাজারদরের চেয়ে অনেক চড়া দাম দিয়ে। জমি! এই দেশে গ্রামে জমির জন্যে সকলে হন্যে। কারণ, মান-ইজ্জত আহার বিহার তো ওই অমূল্য সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল। এই সব চোখে দেখার পর এলাকা থেকে এলাকা খবর ছড়িয়ে যায়—সুদূর এক দেশ আছে যার নাম আরবস্থান—আরব দেশ, সেখানে কোনো রকমে পৌঁছুতে পারলেই জীবনের সব অভিলাষ পূর্ণ হয়ে যায় এবং তার জন্যে বেশি সময় লাগে না। সবুর শুধু গন্তব্যে পৌঁছানোর ওয়াক্ত পর্যন্ত। তারপর তো এলাহির দরগা, যা চাইবে তাই পাবে। সকলেই প্রার্থনা করে কিন্তু সকলে কী পায়? কিন্তু এখানে নিয়ত অপূর্ণ থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে হাসেল। বৃদ্ধের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছিলো, পাশের গ্রামের এক যুবক। সুতরাং পুত্রের জন্যে আর অপেক্ষা কেনো? পিতার আরো পুত্র ছিলো, তারা জমি বর্গা দেয় কখনও কখনও নিজেরা চাষ করে। মোটামুটি সংসার চলে পাড়া-গাঁয়ের আর দশ জনের চেয়ে ভালো। কিন্তু আরো ভাল হওয়া দরকার। সুতরাং এক শিক্ষিত ভাই তো শুধু বর্তমান নয়, উত্তর-পুরুষের আখের পর্যন্ত গুছিয়ে দিতে পারে। প্রতারকদের প্ররোচনাও সক্রিয় কম না। শহরে একজন মক্কেল এনে দিতে পারলে তিরিশ-চল্লিশ হাজার থেকে সে কিছু কমিশন পেয়ে গেলো। নিজ স্বার্থেই গ্রামাঞ্চলে, মফস্বল শহরে এবং যেখানে দাঁউ মেলে, সেখানেই দালালদের ইলেম চালু হয়। শাকের আলির বৃদ্ধ পিতা এখন কান্না ফুরোতে পারে না। আর পুত্রকে তো আপনারা দেখছেন। আসামী কাজী আলামিন অবিশ্যি নিজে টাকা গ্রহণ করেনি। টাকা নিয়েছিলো একই দলীয় ব্যক্তি। সে কিন্তু পলাতক। আসামী ফেরারের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে অনেকে। বিদেশে লোক পাঠানোর লাইসেন্স আসামীর নেই। কিন্তু লাইসেন্সধারীদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতো। অবিশ্যি নারী-পাচারের ব্যাপারে আসামী সক্রিয় ছিলো। কারণ কয়েকটি বাড়ির তদারকে কাজী আলামিনকে হাতেনাতে পাওয়া যায়। মোদ্দা কথা, যদিও আসামী কোনো অপরাধ পুলিশের কাছে স্বীকার করেনি,

বরং অন্য নাম বলেছে, মনে হয় তারাই মূল গায়েন সমস্ত দুষ্কৃতির। তবু কাজী আলামিনের অপরাধ আইনের চোখে ক্ষমার অযোগ্য। সবুরন গ্রামের সরল মেয়ে। সে নাম বলে, কিছু ঠিকানায় সে পুলিশ-সহ গিয়েছিলো। কিন্তু কোথাও বাড়ি খালি। কোথাও অন্য লোকের আস্তানা এখন। তবে এখন আইনের প্রহরিরা অতি সতর্ক। কোনো শিকার ফসকে যাবে না। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে আসামী নারী-পুরুষদের আশ্রয় দিত বিদেশে পাঠানোর পূর্বে। সেই জন্য বরাদ্দ বাড়ি ছিলো। আসামীর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় একমাত্র আশ্রয় প্রদান ছাড়া তার আর কোনো কাজ ছিলো না। সে যে 'এ্যাবেটার'—আইন লঙ্ঘনের কাজে সাহায্যকারী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতারণা, নর-নারী বিদেশে পাচার, বিক্রয়, ব্যভিচারের প্রশয়দানের অভিযোগে আসামীকে ফৌজদারী আইনের চারিশত কুড়ি, তিনশ' একষট্টি, চারশ' আটানব্বই, তিনশ' চুয়াল্লিশ, একাত্তর-বাহাত্তর ফৌজদারী ধারা মতে অভিযুক্ত করা যায়। আমি প্রারম্ভে বলেছি, আসামী কী জঘন্য দুষ্কর্মে লিপ্ত এবং ভদ্র ঠাঁট-বাটে জীবন-যাপন করলেও তার অভ্যন্তর এমনই পঙ্কিলময় যে তা দেশের কলঙ্করূপে এখন পৃথিবীময় ছড়ানো। সমাজের স্বাস্থ্য, দেশের আইন-শৃঙ্খলা যথাযথ বজায় রাখার জন্যেই এমন হীনচরিত্র ব্যক্তিদের বিচার হওয়া উচিত। আমি মাননীয় আদালতের নিকট সেই আরজ পেশ করছি।"

পাবলিক প্রসিকিউটার তার বক্তব্য শেষ করলেন। দরাজ কণ্ঠের ভাষণ এবং ভেতরে সমাজ-দরদী এক মানুষ লুকিয়ে থাকায় যখন খাদেও নামেন তিনি, তখনও আবেগের রেশ সহজে থামে না। আদালতের কক্ষময় একটা থমথমে ভাব বিরাজ করে।

আসামী পক্ষের উকিল অতঃপর কয়েকজন সাক্ষীকে জেরা শুরু করার কথা। প্রথমে রমিজ আলির নাম উঠলো। কিন্তু পেশকার জানালো যে সাক্ষী অসুস্থ। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটসহ সে আজ অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে। ছোট-খাট আরো সাক্ষীদের জেরা শুরু হতে-হতেই দুপুরের টিফিনের সময় ঘনিয়ে আসে। ম্যাজিস্ট্রেট পরদিন এই কেস ধরবেন না, তারিখ ফেলেছিলেন। আরো পনেরো দিন পরে।

এই মামলা সংবাদপত্রের কল্যাণে এবং দুই পক্ষের উকিলদের বহস ও তক্‌রারে ক্রমশ বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখা গেলো, আদালত কক্ষে দর্শকদের আসন প্রায় পূর্ণ হয়ে থাকে। অনেক সময় এমন ভিড় জমে যে ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদ করিম বহু দর্শকদের বাইরে যেতে বাধ্য করেন। আদালতের প্রাঙ্গণে প্রায় লোক জিজ্ঞাসা করে, মামলার কী হলো? উকিলদের তর্কযুদ্ধ নানা রসিকতা, বিদ্রূপ মন্তব্যের উৎস হয়ে ওঠে। ফলে শহরের বহু বেকার যুবক আদালতে এসে হাজির হয় তামাশা দেখতে। আর প্রতারিত বহু জন তো এই মামলার ফলাফলের উপর ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। কারণ, শহরে দেখা যায়, আরো বে-আইনী আদম-পাচার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছিল পূর্বেই। তাদের গতিবিধি অতো বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

ক্রমশ এই মামলার গুরুত্ব এতো বেড়ে যায় যে প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এই খবর পরদিন নিজ-নিজ পত্রিকায় পরিবেশনের জন্যে হন্যে হয়ে উঠলো। সবুরন এবং কাজী আলামিনের ফটো তুলতে কোন চিত্র-সাংবাদিক বাদ যায়নি। সরকার পক্ষে এবং আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার উকিলগণ পরস্পরের বাদ-প্রতিবাদে এমন অধৈর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠেছিলে যে একজনের বক্তব্য চলার সময়ই হয়তো আর একজন তার মন্তব্য ছুঁড়ে বসে রইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদ করিম নিজেও মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন-প্রতিবাদে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কারণ ব্যাপার ক্রমশ জটিল হয়ে উঠলো। আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের প্রশ্ন বারবার দেখা দিতে লাগল। সাক্ষীসাবুদের জেরা তেমন চিত্তাকর্ষক বা জটিল হয়নি কোনো কালে। তবে সিদ্ধান্ত করা যায়, আলামিন কাজী বিভিন্ন দেশে নারীদের বিক্রয়-ব্যাপারে জড়িত ছিলো। কিন্তু এই কাজের যে প্রক্রিয়া, তার মধ্যে সমাজের অনেক উচ্চ ক্ষমতাধারী, প্রতাপশালী ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া তা করা কোনো কালে সম্ভব হতো না। শুধু জেরার সময় একবার কাজী আলামিন ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলেছিলো, এতো জটিল কাজ একা একা করা যায় না, তা সত্য। কিন্তু সে তো নিমিত্ত মাত্র। কিছু মেয়ে বা পুরুষকে সে আশ্রয় দিতো। অন্য কাজে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ, তাদের ঠাঁই-ঠিকানা ঠিকুজি রাখার দায়িত্ব তার ছিলো না। কিছু দরকার বিদেশ যেতে। সংশ্লিষ্ট সাহায্যকারী যোগাড় হয়ে যেতো কিছু টাকার বিনিময়ে। কিন্তু সে তো এসবের অংশীদার নয়। শুধু ঘর-ভাড়া করে কিছু মেয়েকে কাছে রাখা ব্যতীত সে কোনো অন্ধকারে ঢোকেনি। সবুরন বিভিন্ন জায়গায় যেতো স্বীকার করেছিলো। কাজী আলামিনের দৌলতেই তো কোনো জায়গা তার চেনা। কিন্তু বাড়ির নম্বর পর্যন্ত সে জানে না। কিছু নাম বলে দিতেন কাজী সাহেব। কিন্তু নামের সঙ্গে মুখ মিলিয়ে চিনে রাখা তার পক্ষে দায় ছিলো। আর রোজ রোজ তো বাড়ির বাইরে যেতো না। সবুরনের বাজানকে একজন গ্রামে গিয়ে টাকা দিয়ে আসতো। পুলিশ অনুসন্ধানে তা জানে। কিন্তু সেই লোক গত তিন মাস থেকে আর গ্রামে যায় না। পুলিশ তবু সেদিক থেকে আশাবাদী যে ধীরে ধীরে সব আসামী ধরা পড়বে তাদের সামাজিক অবস্থান যতো উর্ধ্বেই হোক। আইনের সাঁড়াশি নিষ্ক্রিয় নেই।

মামলার শেষ পর্যায়ে বহু জেরা, সওয়াল এবং জবাবের পর এমন জমে উঠলো যে শেষ পর্যন্ত কাছি-টানাটানি শুরু হলো তিন না চার জনের মধ্যে। পাবলিক প্রসিকিউটার অর্থাৎ সরকার পক্ষের প্রধান উকিল, আসামী পক্ষের দুই ব্যারিস্টার আফতাব আলি ও মাহমুদ হোসেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদুল করিমের মধ্যে। পাবলিক প্রসিকিউটারের দেহ বিশাল, মাংসল চেহারা, দুই হাতের তালুর ভেতর বুড়ো আঙুলের দিকে বেশ উঁচু মাংসের জন্যই। ঝুপো গোঁফ এবং দরাজ গলার জন্যে ভদ্রলোকের ভাষণ বেশ ঝঙ্কার তোলে। ব্যারিস্টার আফতাব সেদিক থেকে বিপরীত। পাতলা গড়ন, তবে খুব কৃশ নয়। কণ্ঠস্বর সহজে উচ্চগ্রামে উঠে না। কিন্তু তার যুক্তির শেল বড়ো তীক্ষ্ণ। চেহ্‌রা ফরসা নয়, তবে এক কালে তা ছিলো বেশ ফর্সা, বোঝা যায় বর্তমান রঙে। ষাটের কাছাকাছি বয়স। গোঁফ পাতলা, তিল এবং চাউল মেশানো বর্ণ। কথা বলার সময় দৃষ্টি কিছুক্ষণ সামনে ছড়িয়ে আবার জমিন-অভিমুখী হয়। ব্যারিস্টার মাহমুদ হোসেনকে দেখেই বুঝা যায়, বয়সে অনেক কনিষ্ঠ, পঞ্চাশের বেশি নয়। খাড়াই চেহ্‌রা এবং পরিমাপে ব্যারিস্টার আফতাবের চেয়ে পুরু। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটার অপেক্ষা তুলনায় কৃশ। মুখ গোলগাল। দুই গণ্ডদেশে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ঝলক দিয়ে ওঠে। আইনের তর্কে ব্যাপৃত হলে টাইয়ে বা গাউনের কোনো একদিকে হাত স্বতঃই চলে যায়। সহকারীর

দিকে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে হাত বাড়ায়। তাড়াহুড়োর লক্ষণ নেই কোথাও। কিন্তু প্রতিপক্ষকে আইনের প্যাঁচে ধরাশায়ী-কালে দ্রুতগামী হয়ে ওঠে বাচন-ভঙ্গি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এখানে বৈষ্ণব অবতার। বড়ো পাতলা দৈহিক গঠন। নম্রতা সারা মুখে। যদিও এজলাসে প্রধান স্তম্ভ, তবু আচরণে কোনো উত্তাপ বা প্রতাপের ভাব নেই। পরনে টাইট ইউরোপীয় লেবাস। ফলে, পাতলা শরীর আরো পাতলা ঠেকে। কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বড়ো মোলায়েম। মনে হয় ওই গলা থেকে প্রেমের আধ-ভাষ বেরুতে পারে। হুকুম? কস্মিন-কালেও না। অঙ্গসৌষ্ঠব অনুকূল না হলেও ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদুল করিম সারল্যের সাহায্যেই সব দম্ভের মাথা নুইয়ে দিতে পারেন। তা তার শান্ত মাঝারি সাইজের দুই চোখের চাউনির তীক্ষ্ণতা সহজে জানান দেয়। চার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ-জাত ঘূর্ণিত স্রোতের চিত্র নিম্নলিখিত ভঙ্গিতে কিছুটা আঁকা যায়।

এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, পূর্বেই কথিত বাদানুবাদের উত্তাপের অনেক সময় তিন ব্যবহারজীবীই আদালতের রেওয়াজ— মাননীয় আদালত, বাদীপক্ষ বা প্রতিবাদী পক্ষের উকিলকে সম্বোধন ইত্যাদি প্রায় বিসর্জন দেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসব ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। কারণ তিনি নিজে এই তর্কবিতর্কের ঘূর্ণিঝড়ে এমন সাঁতার কাটছিলেন যে কী রায় দিতে পারেন এমন পর্যায় অব্যাহত থাকলে, সেই ভবিষ্যৎ ঝিলিক যেনো এখনই তাঁকে কাবু করে ফেলেছিলো। তাছাড়া আইনের কোনো ফাঁক না-থেকে যায়, সেদিকে তো হুঁশিয়ার থাকতেই হয়। উপর-আদালত থেকে সমালোচনা আসুক, তা কে চায়?

দেখা গেলো, পাবলিক প্রসিকিউটারের পর জওয়াব দান-কালে দুই ব্যারিস্টার পালাক্রমে দোহার এবং গায়েনে পরিণত এবং একে অপরের জায়গা নিতে দেরি হয় না। সবই যেনো রীলে-রেসের মতো আগে থেকে ঠিক করা আছে। একজন আর একজনের ব্যাটন হাতে পেলেই দৌড় দেবে।

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার মাহমুদ হোসেন এক পর্যায়ে বলতে থাকেন : 'মাননীয় আদালত, প্রতিপক্ষের ব্যবহারজীবী মহোদয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির নানা ধারার শিকলে আমার মক্কেল কাজী আলামিনকে বেঁধেছেন এবং এখন রায়ের কশাঘাতের জন্যে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু অনুমানের উপর কোনো ঘটনা বাস্তব হয় না, তা সকলের জানা। কমলাপুর স্টেশনের সব টিকেট-কালেক্টর সকলের আগেই টের পায় শহরে লোক বাড়ছে। অথবা বাদামতলী স্টিমার ঘাটের টিকেট-কালেক্টরকেও সেই পর্যায়ভুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তারা কেউ বলতে পারবে না, কোন্ এলাকায় লোক বাড়লো। আজিমপুর, ধানমন্ডী, শান্তিনগর, রাজারবাগ, সেগুনবাগিচা, মালিবাগ না কলাবাগান? প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর ঘটনার সত্যতা-অসত্যতা নির্ভর করে। আমি একদম মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেবো না। কারণ, পৃথিবীতে অনেক সময় সত্য না মিথ্যে কোনো ব্যাপার, তার সবই সন্দেহের অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনাকে সত্যের ইশারা দিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু বলতে অক্ষম। বিবস্ত্র সত্যের জন্যে চোখ লাগে এবং সুস্থ মগজ দ্বারা পরিচালিত। উন্মাদের, মাতালের চোখ তো কতো কিছুই দেখে। বাড়ির প্রাঙ্গণে পুকুর। তা তার প্রত্যক্ষ হলেও সত্য নয়। অন্য সুস্থ, কারো কাছে তো নয়ই। আমার মক্কেল নারী-ব্যবসায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে রমণী ও পুরুষ পাচারে দাগী এবং আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো জঘন্য কাজে লিপ্ত। দাস-ব্যবসায়ী নামেও কলঙ্কিত আমার মক্কেল। কিন্তু প্রতিপক্ষের ব্যবহারজীবী কমলাপুর স্টেশনের টিকিট-চেকার-সুলভ অনুমান প্রয়োগে দক্ষতা দেখিয়েছেন। বাস্তব কঠিন প্রকৃত অবস্থা কোথাও চাক্ষুষ তুলে ধরতে পারেননি। চরিত্রে কলঙ্ক-আরোপ করা যায় সহজে। তা নিতান্ত স্রেফ বাক্‌যন্ত্রের ব্যাপার। ঠোঁট জিহবা কণ্ঠনালী ইত্যাদি সক্রিয় থাকলেই কারো উপর কালিমা মাখানো কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সত্য-প্রকাশে তো কঠিন জমিনের কাছে যেতে হয় এবং কঠিন প্রমাণের পুঁজি লাগে সঙ্গে সঙ্গে। বাস্তব তথ্য মূল কথা। কিন্তু অপরপক্ষ কেবল পরিণাম থেকে কাজের গোড়ার দিকে এগোনোর চেষ্টা করেছেন। তাই দেখা যায়, নৈতিকতার উপর তাদের জোর চাপ কিন্তু নৈতিকতা ও বৈধতা কী এক জিনিস? 'লিগালিটি' এবং 'মোরালিটি' উভয়ের সম্পর্ক আছে। কিন্তু পার্থক্যও কম নয়। স্ত্রী-সহবাস আইন-সম্মত এবং অনৈতিক কিছু নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে পার্কে জন-বিরল জায়গায় ঝোপেঝাড়ে তা বে-আইনী এবং সুতরাং দণ্ডনীয়। নৈতিকতার সূত্র যদিও সমাজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে ওঠে, তবু শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্য ও জোর চাপ পড়ে কিন্তু ব্যক্তির উপর। আইনের লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত যৌথ-জীবন বা সমাজের উপরেই থেকে যায়। আমার মক্কেল বে-আইনী কাজ করেছে, অপরপক্ষ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম। মাননীয় আদালতের গোচরে তা আমি আনতে চাই। নারী-পুরুষ বিক্রয়ের অপরাধে আমার মক্কেল অপরাধী— এই কথা বার বার বলা হয়েছে। বিদেশের জেলে কিছু এদেশীয় লোকের অবস্থান, কিছু মেয়েদের দুর্দশার কাহিনী চিঠি-মারফত জানা যায়। কিন্তু এইসব হতভাগ্য নারী-পুরুষ আমার মক্কেলের দুর্নীতির শিকার, তার কোন প্রমাণ নেই। আর ব্যভিচারের অভিযোগ নিতান্ত অমূলক। চারজন পরহেজগার ব্যক্তির চাক্ষুষ সাক্ষ্য ছাড়া মুসলমান সমাজে এই জাতীয় অভিযোগ ধোপে টেকে না। এবং স্মরণ রাখতে হবে, চারজন ব্যক্তির ধর্মপ্রাণতাও বিচার্য। শুধু দেখলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। অপরপক্ষে ব্যবহারজীবী মহোদয় এইসব দিকে কোনো লক্ষ্য না-রেখেই সোজা অভিযোগের মই চালিয়ে দিলেন এবং নির্বিবাদে এবং বিনা দ্বিধায়। তাদের অবগতির জন্যে আমি—।"

ব্যারিস্টার মাহমুদ হোসন এক সহকারীর দিকে ঘাড় ঈষৎ ফিরিয়ে বললেন, "কোরআন শরীফে দাগ দেওয়া আছে। পাতাটা বের করুন।"

বেশি দেরি হয় না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদ তার ভাষণে রত হন, "আল্লাহ পাকপরওয়ার দেগার পবিত্র কোরআন শরীফে ফরমাচ্ছেন—", সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, "জনাব আফতাব, আপনি তো আরবি ফারসির মওলানা। আপনার উচ্চারণ শুদ্ধ হবে, মেহেরবানি করে আরবি অংশ পড়ুন।"

কিন্তু বাধা দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট করিম, "মি. মাহমুদ, আমরা কেউ আরবি জানি না। বাংলা তরজমাটুকু পড়লেই হবে।"

তথাস্তু।

ব্যারিস্টার শুরু করেন, "পবিত্র কোরআনের সুরা চব্বিশ, চতুর্থ আয়াত : 'পবিত্র চরিত্রের মহিলাদের উপর যারা ব্যভিচারের অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হয় না, প্রকৃতপক্ষে ইহারা পাপাচারী। শরীয়তের বিধানে ইহাদের আশি দোররা (কশাঘাত) প্রাপ্য। এদের

সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।' পবিত্র কোরআনের নির্দেশ আপনারা শুনলেন। আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে তেমন বাস্তব প্রমাণ কোথায়?" প্রতিপক্ষের সাক্ষী দিতে পারেনি। তবে পরিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অনুমান। কিন্তু অনুমান তো সন্দেহের ব্যাপার। আর সন্দেহ মানে, যার সত্যতা হলফ করে বলা দায়। যা অসত্য তার কোনো প্রমাণ হতে পারে না। মিথ্যে সাক্ষ্য আর কাকে বলে, আমার জানা নেই। আমার মক্কেলের আরো একটি অপরাধের কথা বারবার এই আদালতে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি নাকি এই শতাব্দিতে আবার দাস-প্রথা চালু করেছেন, যখন গোটা পৃথিবীর সভ্যসমাজ এই অপবাদমুক্ত। প্রথমে লক্ষ্য করা দরকার, যাদের বিক্রি করা হয়েছে পুরুষ বা নারী তারা আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করেনি এই আদালতে। জেলের ভেতর আমরা আমাদের মক্কেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম এই মামলার ব্যাপারে। আসামী নিরপরাধ। অন্তত এই কলঙ্কমুক্ত— আমাদের কাছে বলেছেন। কিন্তু তিনি নির্দোষী তা প্রমাণ করতে পারেননি। কারণ বিদেশের জেলে প্রতারিত অনেক মানুষ গিয়ে ঢুকলো কীভাবে ওদেশের আইন লঙ্ঘন করে? এখানে তার উপর আবার সন্দেহের চাঁদোয়া টানানো যায়? গাছের তলায় ফল পড়লে বুঝা যায়, ওই গাছের ফল। আর পাশাপাশি বহু গাছ থাকলেও কী ফল থেকেও ধরা যায়, কোন্ গাছের ফল? একটা গাছই যদি ওখানে থাকে তাহলে নিশ্চিন্ত বলে দেওয়া যায় ফলের উৎস কোথায়? এখানে ফল আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট। বিদেশে অনেক প্রতারিত নর-নারীর কাহিনী। প্রতারিত এবং সর্বস্বান্তদের আহাজারি। কিন্তু এ দেশে আমার মক্কেলই কী একমাত্র ব্যক্তি রয়ে গেছেন এই দেশে? আর বাকি যারা ছিলো তাদের তিনি বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং এখন একা আছেন। সুতরাং অপরাধী সাব্যস্ত করতে আর বিশেষ বেগ পেতে হতো না। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য : এ দেশের লোকসংখ্যা কত কোটি? বিদেশে লোক-পাঠানোর জন্যে তো লাইসেন্স লাগে, তেমন আর কেউ আছে কি না। আমার মনে হয়, আর অন্য কোনো মন্তব্য অবান্তর। তবু আবার বলা যায়, দাসত্ব-বিরোধী আইন কে পাস করেছিলো? কখন? তাও বর্তমান প্রসঙ্গে একবার ভেবে দেখা উচিত। দেড়শ বছর হতে যায়, ঠিক একশ চল্লিশ বছর পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৮৪৩ সনের পাঁচ নম্বর আইন— ভারতীয় দাসত্ববিরোধী আইন। পাস হয় ৭ এপ্রিল তারিখে, যখন লর্ড এলেনবরা গভর্নর জেনারেল। তারপর বৃটিশ আমলে ঈষৎ পরিবর্ধন রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ১৮৬০ সনে। ৪৫ নম্বর ফৌজদারি দণ্ডধারা। আইন পাসের পরেও বলবৎ করতে সময় লাগে। এ দেশে সিলেটে ১৮৭৯ সনে পশ্চিম জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স এলাকায় ১৮৮১ সনে, গারো-খাসিয়া জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে ১৮৯৭ সনে প্রায় বিংশ শতাব্দিতে বলা চলে। অনেকের কৌতূহল থাকতে পারে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের কী খবর? হাজারা পেশোয়ার, কোহাট বান্নু, ডেরা ইসমাইল খান, ডেরা গাজী খান প্রভৃতি জায়গায় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ আইন পাস হওয়ার পর আরো তেতাল্লিশ বছর কেটে গেছে। তবে বলবৎ। অন্যান্য দেশ অপ্রাসঙ্গিক নয়। আফগানিস্তানে উচ্ছেদ হয় ১৯২৩ সনে, নেপালে ১৯২৬ সনে, ট্রান্সজোর্ডান ও ইরানে ১৯২৯ সনে, বাহ্‌রায়েনে ১৯৩৭, সৌদি আরব ১৯৬২। আর ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু বর্তমান স্বাধীন দেশে আমরা কী খ্রিস্টান ইংরেজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইন মানতে বাধ্য? মনে রাখা দরকার, আমার মক্কেল একজন মুসলমান।"

ব্যারিস্টার মাহমুদ হোসেনের ভাষণ শেষ হয়নি। তিনি আরো কি যোগ করতে উদ্যত, কিন্তু আর সুযোগ পান না। পাবলিক প্রসিকিউটার বেশ অধৈর্য হয়ে ছিলেন বুঝা যায় ভেতরে ভেতরে। কারণ আদালতকে তিনি সম্বোধন না করেই দাঁড়িয়ে পড়েন এবং প্রায়-হাঁক মেরে ওঠেন, "নারী-ব্যবসায়ী মুসলমান হতে পারে না।"

দুই ব্যবহারজীবীর চারি চক্ষুর মিলন ঘটে। কিন্তু মি. মাহমুদ একদম শান্ত বরফ। তিনি পাশেই উপবিষ্ট ব্যারিস্টার আফতাবের দিকে তাকান। দুই জনের চোখে চোখে নিশ্চয় কোনো বাক্যালাপ হয়ে থাকবে। নচেৎ ডিফেন্স্-রত ব্যারিস্টার বসে পড়বেন কেনো, তা-ও চ্যালেঞ্জের পর? উঠে দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার আফতাব আলি। তিনি উর্ধ্বনেত্রে দুই পাশে ঘাড় ঘোরান। যেনো উপর থেকে নিচের সমতলে কী হচ্ছে আঁচ করতে চান অথবা জবাব দেওয়া খামকা উলুবনে মুক্তা ছড়ানো, মনে করতে পারেন। কিন্তু তারপরই ঘাড়ে গাউনের অংশ খামচি দিয়ে সামান্য তুললেন, বোধহয় ভেতরে ঘামের জুলুম থাকতে পারে। কিন্তু পরমুহূর্তে সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে শুরু করেন : "ইয়োর অনার মাননীয় আদালত," তারপরই একটু অপাঙ্গ দৃষ্টি পাবলিক প্রসিকিউটারের পানে।

"ইয়োর অনার। বড়ো বৈধ প্রশ্ন এবং বৈধতার প্রশ্ন তুলেছেন সরকার পক্ষের ডিফেন্স্, নারী-ব্যবসায়ী মুসলমান হতে পারে কি না। তাদের বক্তব্য স্পষ্ট। অর্থাৎ সমাজ-বিরোধী ব্যক্তি মুসলমান কওম থেকে খারিজ হয়ে যায়।"

"নিশ্চয়।" বসে-বসেই অধৈর্য পাবলিক প্রসিকিউটার মকবুল আহমদ মন্তব্য করে ফেলেন।

"ইয়োর অনার, মাননীয় আদালত, কিন্তু নিশ্চয়তার সার্টিফিকেট কে দেবে?" ব্যারিস্টার আফতাবের কণ্ঠ বড়ো শান্ত। উত্তেজনায় আভাস কোথাও নেই, যদিচ ভাষা ঈষৎ রেশ বহন করে।

"মাননীয় আদালত, তাহলে বলতে হয় চোর-চুট্টা ঠগ, দাগাবাজ গাঁটকাটা-পকেটমার, লুচ্চা-লম্পট, স্বার্থান্বেষী, অর্থগৃধ্নু, বদমাশ, বিশ্বাসঘাতক, বেশ্যাভোগী, খুনী, ষাঁড়ের দালাল, টন্নি ঘুষখোর, নিষ্ঠুর পরস্বাপহারী, সম্পত্তি-লোভী অগয়রহ অগয়রহ কেউ মুসলমান নয়।"

জনান্তিকে পাবলিক প্রসিকিউটার হেঁকে ওঠেন, "নিশ্চয় না।"

ব্যারিস্টার আফতাব শোনেন, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ না করেই বলে যান, "মাননীয় আদালত, মুসলিম লীগ অর্থাৎ জিন্না সাহেব মুসলিম বা মুসলমান বলতে কী বুঝতেন? তাহলে মুসলিম লীগের পতাকার নিচে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সমবেত হয়েছিলো, তারা কেউ সমাজ-বিরোধী মানুষ ছিল না। সবই ছিলো সদ্‌গুণের অধিকারী সৎ নাগরিক। কিন্তু আমরা জানি, মুসলিম লীগ মুসলমান বলতে তা বুঝতেন না। তারা মুসলমান বলতে বুঝতেন, মুসলিম পরিবারে জন্ম এমন লোক— সে চোরছ্যাচোড় লুচ্চা-লম্পট, লোভী খুনী যা খুশি যা-হোক তার গুণাগুণের পরিচয় অনাবশ্যক। কোনো নির্বাচন-পর্বে ভোটের লিস্ট সেইভাবে তৈরি হতো। আর সেই জন্যে অসংখ্য সমাজবিরোধী লোক মুসলিম লীগের ভেতর ঢুকেছিলো। তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। গোড়ায় আঁটসাঁট

থাকলে কি পাকিস্তান দু-টুক্‌রো হয়ে যেতো, না বাংলাদেশের জন্ম হত? সুতরাং বুঝা যায়, ঠগ চোর-চুট্টা দাগাবাজ গাঁটকাটা পকেটমার লুচ্চা-লম্পট স্বার্থান্বেষী অর্থগৃধ্নু বদমাশ বিশ্বাসঘাতক বেশ্যাভোগী, খুনী, রাঁড়ের দালাল, টন্নি ঘুষখোর নিষ্ঠুর পরস্বাপহারী, সম্পত্তিলোভী, আয়েশখোর চোগল্‌খোর ইত্যাদি ইত্যাদি মুসলিম লীগে জায়গা পেয়েছিলো। কারণ কে মুসলমান তা জানার কোনো প্রয়োজন তখন ছিলো না। অথচ আমার মক্কেল আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই মুসলমান কওম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন।"

"ইয়োর অনার, মাননীয় আদালত" পাবলিক প্রসিকিউটার ব্যারিস্টার আফতাবের ঈষৎ থামার সুযোগের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "রায় কী হবে, তা কারো জানতে বাকি নেই। ডিফেন্সের ব্যবহারজীবী মুসলমান শব্দের সংজ্ঞা-ডেফিনেশান জানেন না। মাননীয় আদালত, আমার আরজ অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছুর জের টানা অনাবশ্যক।"

মকবুল আহমদ বসে পড়ামাত্র ব্যারিস্টার আফতাব "ডেফিনেশান-সংজ্ঞা-ডেফিনেশান—" শব্দ ক'টি তিন মরতবা বা তিনবার উচ্চারণ করলেন। কণ্ঠস্বরে বিস্ময় না অবজ্ঞা লীলায়িত বুঝাবার উপায় নেই। এই সময় তাঁর দুই চোখ জমিনের উপর থাকে না। কিন্তু পরমুহূর্তে তাঁর স্বর বেশ চড়ে যায়, "মাননীয় আদালত, একটা কাজ-চলা সংজ্ঞা নিয়ে মুসলিম লীগ অর্থাৎ মি. জিন্না এ্যান্ড হিজ পার্টি (মি. জিন্না ও তার অনুসারীরা) ভালই করেছিলেন। তার ফল ভালো না খারাপ হয়েছে এখানে বিচার্য নয়। তবে ডিফেন্সের যুক্তিধারীগণ জেনে রাখুন সংজ্ঞা অতো সহজ নয়। তা দিতে গিয়ে বহু জন সংজ্ঞাহীন হয়ে গেছে।"

এই সময় আদালত কক্ষে প্রায় পিন-পতনের নীরবতা বজায় ছিলো, শুধু মি. আফতাবের শান্ত কণ্ঠস্বর ছাড়া, যদিও বর্তমানে ঈষৎ চড়া। আজ সাধারণ দর্শক নয়, বহু তরুণ আইনজীবী এবং আপন মকদ্দমার ফাঁকে অবসরভোগী উকিলে আদালত কক্ষ পূর্ণ। হঠাৎ চাপা হাসির শব্দ ওঠে। সকলের দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হয়। দেখা গেলো, মকবুল আহমদ তার উৎস। ডিফেন্স-রত ব্যারিস্টারদের চোখ স্বতঃই আকর্ষিত। দেখা গেলো তার চোখেও যেনো ঝিলিক উঠেছিল এবং তারই সঙ্গে সমঝোতায় কণ্ঠস্বর শুধু উচ্চগ্রাম নয়, বেশ রুক্ষ হয়ে উঠলো। তিনি যোগ করে যান, "মাননীয় আদালত, আমার বাক্যে কোনো উৎপ্রেক্ষা নেই, নো হাইপারবোল বাট আদার্স শুড্‌ লিস্‌ন টু-উ (অপরেরও শোনা উচিত)। বুঝতে দেরি হয় না, কার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। হাইকোর্টে এখনও ইংরেজি চালু আছে। কিন্তু ব্যারিস্টার আফতাব, মাহমুদ এবং আরো কিছু ব্যবহারজীবী আছেন হালদার, শাহাবউদ্দীন প্রমুখ নিম্ন-আদালতে বাংলা বলেন এবং ভালো বাংলা বলেন। যারা ভালো বাংলা জানেন, তারা ভালো ইংরেজিও জানেন। কিন্তু ব্যারিস্টার আফতাব গোস্বায় আর তাল সামাল দিতে পারেন না। তখন ইংরেজি বেরিয়ে পড়ে। পরমুহূর্তে আবার বাংলায় শুরু হয় : "মুসলমানের সংজ্ঞাদান অতি সহজ নয়। মাননীয় আদালত, আমাকে সামান্য অতীতে যেতে হয়। অনেকের স্মরণ আছে, আবার অনেকের যে স্মরণ নেই তা এখনই টের পাওয়া গেলো। তাই কিঞ্চিৎ প্রাচীন কেচ্ছা ঘাটিতে হয়— কাসুন্দিও বলতে পারেন। মাত্র তিরিশ বছর পূর্বে তদানীন্তন পাকিস্তানের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঞ্জাব প্রদেশে তুমুল দাঙ্গা হয়। এই উপমহাদেশে দাঙ্গা বললেই আমরা বুঝি হিন্দু-মুসলমান। না, পাঞ্জাবের দাঙ্গা মুসলমানে মুসলমানে। মুসলমান এক সম্প্রদায়। কিন্তু সম্প্রদায়ের ভেতর আবার উপ-সম্প্রদায় থাকে। পতির উপর উপপতি থাকলে পারিবারিক জীবনে হাঙ্গামা বাধে। সুতরাং এখানে দাঙ্গা বাধা বিচিত্র নয়। একদিকে সুন্নী মুসলমান, অন্যদিকে আহমদীয়া মুসলমান। এই দাঙ্গার ভয়াবহতা আজও যে-কোনো সুস্থ মানুষের কাছে বিভীষিকা মনে হবে। শুধুমাত্র ধারণার সামান্য পার্থক্য থাকার ফলে কোথাও মানুষে মানুষে, বিশেষত একই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন খুন-খারাবি, লুট-পাট, হত্যাকাণ্ড, অগ্নিদাহ হতে পারে, ভাবা রীতিমতো কঠিন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, প্রদেশময় মাত্র কয়েক দিনে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়। অবিশ্যি আহমদীয়রা সংখ্যালঘু। ফলে চোট-পাট তাদের উপর দিয়েই যায় বেশি। দেখা গেছে, বহু মানুষকে একত্রে ঘরে বন্দী করে পরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সবই ধর্মের নামে। ধর্মের নাম নিয়ে যে ধর্মকে কলঙ্কিত করা যায়, তার নজির অবিশ্যি পৃথিবীতে বহু। কিন্তু পাঞ্জাবের সুন্নী-আহমদীয়া দাঙ্গা মাত্র তিরিশ বছর আগেকার ব্যাপার। আমার এই ভূমিকা দীর্ঘ হওয়ার কারণ, মুসলমানের সংজ্ঞা নিষ্পত্তির এই বিশেষ সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সেই সময়। কতো কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তখন ধ্বংস হয়, সঠিক বিবরণ মেলে না। আমি সম্পত্তির কথাও তুললাম। কারণ, গরীব দেশে সম্পত্তির মূল্য মানুষের মূল্যের চেয়ে কম নয়। মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে গেলে কিছু জাগতিক চিজ লাগে। তা ছাড়া মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তোলা অসম্ভব। এই কথা এদেশে অনেকে ভুলে যায়, আর অনেকে স্বার্থ-উদ্ধারের জন্যে তা অপরকে ভুলিয়ে রাখে। কাপড়-চোপড়, আহার, মাথাগোঁজার ঠাঁই, কাগজ পেনসিল ইস্কুল কলেজ— আমার যা মনে আসছে বলে যাচ্ছি— উদ্দেশ্য এসবই জাগতিক চিজ-জড় ব্যাপার। মানুষের মেহনতেই তৈরি হয়। তা নিমেষে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা মানে মানুষ-তৈরির পথ ধ্বংস করা। আর গরীব দেশে কতো ত্যাগে-মেহনতে না একটা জিনিস তৈরি হয়— তা ভেবে দেখা উচিত। পাঞ্জাবের দাঙ্গা-নিরোধে শেষে সেনাবাহিনী তলব করতে হয়, তবে হাঙ্গামা থামে। তারপর পাঞ্জাব সরকার এক ইন্‌কোয়ারি কমিশন নিয়োগ করে। জাস্টিস মহাম্মদ মুনীর ছিলেন তার প্রধান এবং জাস্টিস রুস্তম কিয়ানী অন্যতম সদস্য। তাঁদের রিপোর্টের সরকারী নাম ছিলো '১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্ত রিপোর্ট।' কিন্তু এই রিপোর্টটি 'মুনীর রিপোর্ট' নামে খ্যাতি লাভ করে, তার অতি সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ এবং মন্তব্যের জন্যে।"

ব্যারিস্টার আফতাব এই সময় ঈষৎ থেমে তার সহযোগীর দিকে হাত বাড়ান। তিনি একটি বই এগিয়ে দেন। তা হাতে নিয়ে মি. আফতাব আলি আবার বক্তব্য করেন, "এই সময় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট পরহেজগার উলেমা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তদন্তের এক পর্যায়ে জাস্টিস মুনীর তাদের এক-একজনকে বলেন, 'ডিফাইন মুসলিম— মুসলিম শব্দের সংজ্ঞা দিন।' এই দলে ছিলেন মৌলানা আবুল হাসনাত, সৈয়দ মোহম্মদ আহমদ কাদেরী, জামীউল উলামায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, মৌলানা আহমদ আলি, প্রেসিডেন্ট জমিয়াতুল উলামায়ে ইসলাম মাগরেবী পাকিস্তান, মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী, আমির জামায়াৎ-ই-ইসলামী, হাফিজ

রিফায়েৎ হোসেন, ইদারায়ে হাকুকী তাহাফফুজে শিয়া, মৌলানা আবদুল হামিদ বদায়ুনী, প্রেসিডেন্ট জামিয়া-উল-উলামায়ে পাকিস্তান, মুফ্‌তী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস, জামিয়া আশ্‌রাফিয়া, নীঠল গম্বুজ (ল্যাহোর)-প্রমুখ। অর্থাৎ, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী এবং এক-একজন দিকপাল। সকলের সংজ্ঞা-দানের ফিরিস্তি এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি মৌলানা আবদুল হামিদ, প্রেসিডেন্ট জামিয়াতুল উলামায়ে পাকিস্তানের বক্তব্য রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনাই।"

ব্যারিস্টার আফতাব যখন পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সম্বোধন করেন, "মি. আফতাব, উই ওয়ান্ট্‌ টু ফরগেট ইংলিশ ফর এ ফিউ মোমেন্টস্‌ (জনাব আফতাব, আমরা কিছুক্ষণের জন্যে ইংরেজি ভুলে যেতে চাই।" পরে আবার বাংলায় সংযোজন, "আপনি তরজমা করে শোনান।"

আদালতে অনেকেই জোরে হেসে ওঠে ম্যাজিস্ট্রেটের স্মিত হাসির সঙ্গে সঙ্গে। এই তরল হাওয়া বেশিক্ষণ থাকে না। ডিফেন্সের ব্যারিস্টার আফতাব আলী আবার শুরু করেন : "মাননীয় আদালত, যথানির্দেশ। আমি জাস্টিস মুনীর এবং মৌলানা বদায়ুনীর সংলাপের বাংলা অনুবাদ পড়ে শোনাই। তা এইরূপ :

মুনীর : আপনার মতে কাকে মুসলমান বলা যায়?

বদায়ুনী : যে লোক জরুরিয়াৎ-ই দ্বীন বা ধর্মের প্রয়োজনীয় আচার পালনে বিশ্বাসী তাকে বলা যায় মুমিন এবং প্রত্যেক মুমিনই মুসলমান।

মুনীর : জরুরিয়াৎ-ই দ্বীন কি?

বদায়ুনী : যে লোক ইসলামের পাঁচ স্তম্ভে বিশ্বাসী এবং যে বিশ্বাস করে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) প্রেরিত পুরুষ, সেই জরুরিয়াৎ-ই দ্বীন প্রতিপালন করে।

মুনীর : এই পাঁচ স্তম্ভ ছাড়া একজন মুসলমানের জন্য কী আরো কিছু করণীয় আছে, না সে-সব ইসলামের এলাকার বাইরে?

এখানে লক্ষণীয় সাক্ষীদাতা মৌলানাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়— করণীয় অর্থ সেইসব নৈতিক আচরণের নিয়মাবলী যা আধুনিক সমাজে যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকৃত।

বদায়ুনী : আলবৎ।

মুনীর : একজন মুসলমান; ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ এবং হজরতের নবুয়তে বিশ্বাসী; কিন্তু যদি সে অপরের জিনিস চুরি করে, আমানত রাখা সম্পত্তি খেয়ানত করে, প্রতিবেশীর বিবির দিকে বদনজর দেয় এবং তার সবচেয়ে বড়ো উপকারীর প্রতি ডাহা অকৃতজ্ঞতা দেখায়— তাহলে তাকে তো আপনি মুসলমান বলবেন না?

বদায়ুনী : এই ধরনের লোক যদি পূর্ব বর্ণিত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়, সে এসব গর্হিত কাজ সত্ত্বেও মুসলমান।

ব্যারিস্টার আফতাব এটুকু পড়ার পর বলেন, "ঐ রিপোর্টের ২১৭ পৃষ্ঠা দেখুন। তাছাড়া আরো সংজ্ঞা আছে এক-এক দিকপাল ধর্মশাস্ত্রবিদগণের। কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজনের মিল নেই। তাই জাস্টিস মুনীর মন্তব্য করছেন, আমি আবার আদালতের নির্দেশ মতো তরজমায় শোনাচ্ছি, উক্ত রিপোর্টের ২১৮ পৃষ্ঠায় যা লিপিবদ্ধ : 'কয়েকজন বিদগ্ধ উলেমা মুসলমানের যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেইদিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে যে কোথাও দুই বিদগ্ধ বুজর্গ এই মূল সূত্র সম্পর্কে একমত নন? আমরা যদি প্রত্যেক বিদগ্ধ বুজর্গ যা করেছেন সেই কায়দায় আমাদের নিজস্ব সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা পাই এবং সেই সংজ্ঞা যদি অন্যান্যরা যা দিয়েছেন, তা থেকে আলাদা হয়, তাহলে আমরা ইসলামের নিরাপদ আশ্রয় থেকে খারিজ হয়ে যাবো ওদের সর্বসম্মতিক্রমে। আর আমরা যদি উলেমাদের কোনো একজনের দেওয়া সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তাহলে আমরা ওই মতাবলম্বীদের মতে মুসলমান থাকবো, কিন্তু অপরাপর সংজ্ঞা অনুযায়ী কাফের হয়ে যাবো।' "মাননীয় আদালত, আপাতত মুনীর রিপোর্ট থেকে আমরা বিদায় নিতে পারি।" ব্যারিস্টার আফতাব আলি তাঁর সহকারীর হাতে পুস্তকখানি এই সময় সোপর্দ করেন এবং পর মুহূর্তে আবার নিজ যুক্তিধারার খেই ধরেন 'ইয়োর অনার, আমার বেচারা মক্কেলের মুসলমানত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার হেতু নেই। কারণ, সংজ্ঞার ব্যাপারে জিন্না সাহেব থেকে অন্যান্যরা যা করেছেন, তার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ, যে মুসলমান পরিবারে জন্মেছে তাকেই মুসলমান বলে ধরে নেবো। আমার মক্কেলের অপরাধ কী? তাকে দাস-ব্যবসায়ীরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই ব্যবসা গর্হিত অপরাধরূপে গণ্য। কিন্তু কারা এই আইন প্রণয়ন করেছে? খৃস্টান ইংরেজ— যাদের চলতি মুসলমানী লফ্‌জে (শব্দে) বলা হয় : নাসারা। মধ্যপ্রাচ্যে গ্যালিলি এলাকার শহর ছিলো নাজারেথ। সেখানকার খৃস্টান অধিবাসীদের আরব দেশে বলা হতো নাসারা অর্থাৎ নাজারেথের অধিবাসী। যীশুখৃস্টের নামের সঙ্গে শতাব্দীর পর শতাব্দী নাজারেথ নাম প্রসিদ্ধ। মুসলমান নাসারার আইন মানতে বাধ্য না। এই আদালতে পূর্বেই উচ্চারিত এদেশে দাসত্ব-বিরোধী আইনের কথা। ডিক্সেন্স থেকে সেই ঠিকুজি আমার সঙ্গী কর্তৃক পরিবেশিত। আমার প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লালাহো আলায়হেস সালাম যে-সব উদাহরণ রেখে গেছেন আচরণে এবং বাণির সাহায্যে, তা-ই আমাদের পথ। তদুপরি আছে, আল্লার পবিত্র কোরআন শরীফ। আমরা তো অন্য আইনের দ্বারস্থ হবো না। বিশেষত স্বাধীন দেশে। নাসারা শাসক কী করেছে, তা আজ বিচার্যের বাইরে। কোরআন-সুন্নায় দাসপ্রথা কোথাও 'কন্‌ডেম্‌ড্‌' ঘৃণ্য দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত নয়, যদিও দাসগণের উপর ব্যবহারের পুনঃ পুনঃ নির্দেশ আছে যেনো কেউ নিষ্ঠুর না হয় গোলামের প্রতি। পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রভাব বুঝা যায়, যখন প্রাক-ইসলামী যুগের দাসদের অবস্থা তুলনা করে দেখা হয়। রোমানগণ ক্রীতদাসদের সোনা, তামা প্রভৃতির খনিতে আমৃত্যু দুঃসহ পরিশ্রম করাতো সামান্য আহারের বদলে। কিন্তু মুসলমান দেশে শুধুমাত্র গেরস্থালির কাছে তারা নিয়োজিত থাকত। এই তুলনা থেকে বুঝা যায়, ইসলামের আবির্ভাবের পর দাসগণের সামাজিক মূল্য কী পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু দাসপ্রথা উচ্ছেদের নির্দেশ কোথাও নেই। কোরআন, হাদিস এবং সম্রাট আকবরের আমলে মিশ্‌কাৎ শরীফ ফারসি ভাষায় তরজমা হয়ে এলো এদেশে— এমন সব মূল্যবান পবিত্র গ্রন্থে কোথাও দাসপ্রথা উচ্ছেদের কথা নেই। আমার মক্কেল যদি দাস-রমণী বিক্রয়ই করে থাকে— ধরে নিলাম— তাহলে তার অপরাধ কোথায়?"

ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদুল করিম এই সময় বাধা দিলেন, 'মি. আফতাব, যুগের কথা ভুলে যাবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মাননীয় আদালত, আমার পবিত্র গ্রন্থসমূহ এবং নির্দেশাবলী ঠুন্‌কো কিছু নয় যে কালের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। আমার পবিত্র গ্রন্থরাজি চিরন্তন, শাশ্বত। কাল সেখানে মাথা ঠুকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অথচ আমার মক্কেল অভিযুক্ত। মেশ্‌কাৎ শরীফের ত্রয়োদশ খণ্ডের বিংশ অধ্যায় পড়ুন, দেখবেন দাসপ্রথা গর্হিত কর্ম এমন কোথাও উল্লেখ নেই। আঠারো শতকের শেষ দিকে নিগ্রো দাস ধরে ক্রয়-বিক্রয়ে খৃস্টানদের সঙ্গে আফ্রিকার মুসলমান শাসকেরাও হাত মেলায়। সুতরাং আমার মক্কেলের অপরাধ খুব নিন্দনীয় কিছু বলা চলে না। যদিও রায়ের পূর্বেই বহু গালিরূপী বিশেষণ তার উপর ছুঁড়ে মেরেছেন অভিযোগকারীগণ। এইসব নারীপাচারের কাজ সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হতো না। তাই তৎপূর্বে তাদের দেহ-বিক্রয় কাজে নিয়োগের অপবাদও এই আদালতে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয়, নাসারার আইন আমরা মুসলমান হিসেবে মানতে বাধ্য নই, তাহলে দাস-রমণীদের উপর তৎসুলভ আচরণে অন্যায় কোথায়?'

অতঃপর ব্যারিস্টার আফতাব শুধু ম্যাজিস্ট্রেট নয়, আদালতের দর্শনার্থীদের দিকেও চোখ ফেরান। তার বাম হাতের তর্জনী তখনও উত্থিত, যেন কোনো জবাব প্রত্যাশা করছেন কারো কাছ থেকে। শেষে সঙ্গীর দিকে চোখ। আবার যেন কোনো দৃষ্টিময়, নীরব ভাষায় সংলাপ— একত্রে সম্পাদিত। আইন বিশারদ বসে পড়লেন। তার বোধহয় আর বক্তব্য কিছু নেই।

কিন্তু না, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার মাহমুদ হোসেন। তার পুরু মাংসল গণ্ডদেশ কিছুটা আরো স্ফীত হয়ে ওঠে, বাঁকা হাসি যেহেতু, ঠোঁটের এক দিকেই চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি সময়ের ফাঁক আদৌ রাখেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃদু অথচ গমগমে স্বর আদালত-কক্ষ পূর্ণ করে তোলে 'ইয়োর অনার' সম্বোধনে এবং বাকি বাক্যরাশি বেরিয়ে আসে দ্রুত : "মাননীয় আদালত, আমি আরো পরিষ্কার করে দিতে চাই, যদি কারো সন্দেহ কিছু থাকে। দাস রমণীদের সামাজিক মর্যাদা যা-ই হোক, রমণীরূপে তাদের ব্যবসার সে-যুগে তো কোনো বাধা ছিলো না। আমি আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই। পাক পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌তালা তেত্রিশতম সুরা আহযাবের পঞ্চাশ আয়েতে ফরমাচ্ছেন, পুরা আয়াত আমি আর উচ্চারণ করলাম না। কারণ আল্লাহর কালামের সামান্য অংশ আমাদের বর্তমান প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। বাংলা তরজমায় শুনুন : 'আমি তোমার জন্যে হালাল করেছি তোমার মোহর-প্রদত্ত স্ত্রীগণকে তোমার গণিমৎরূপে আল্লার প্রদত্ত তোমার আয়ত্তাধীন দাসীগণকে...।' সুতরাং স্পষ্ট দেখা যায়, আমার মক্কেলের অপরাধ তেমন গুরুতর নয়। অবিশ্যি এইসব তরুণী রমণীদের অভিভাবকদের কাছে থেকে কেনা হয়েছে কিনা সে-প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু দাসপ্রথা 'কন্‌ডেম্‌ড' দণ্ডনীয় ঘৃণ্য অপরাধ, এমন অভিযোগ কেউ আনতে পারে না। কারণ, আল্লার কালামের চেয়ে অন্য কোনো বড়ো আইন থাকা তো দূরের কথা, এমন চিন্তাও মহাপাপ। আমি অন্যান্য সুরা বা গ্রন্থের দিকে হাত বাড়ালাম না। কারণ একই বাণি পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্নরূপে কথিত। মাননীয় আদালত, আমি আরো বলতে চাই, ইতিহাসে দেখা যায়, এই সব বাঁদীদের কিন্তু স্ত্রী-রূপে স্বীকার করা হতো না। তাদের আরব দেশে বলা হতো 'উন্মুল ওয়ালাদ' অর্থাৎ ছেলে-মেয়ের মা। ছেলেমেয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা কিন্তু স্ত্রী নয়। অর্থাৎ, স্ত্রীর মর্যাদা পেতো না। আমার মক্কেলকে ভাগ্যহত বলতে হয়। নচেৎ এতো বেইজ্জতি সইতে হবে কেন? আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। ফৌজদারী আইনের পাঁচ-সাতটি ধারায় তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রার্থনা, এই আদালত-কক্ষেই শোনা গেলো। কিন্তু মূলের দিকে অভিযোগকারীগণ এতোটুকু দৃষ্টি দিয়েছেন বলে আদৌ মনে হয় না। অভিযোগের ভিত্তি কোথায়? ভিত ছাড়াই বনিয়াদ গড়া যায়? অবিশ্যি গড়া যায়। তা কল্পনায়। কিন্তু আদালতে, আইনের নিরপেক্ষ দুই চোখ এবং ন্যায়-বিচারের দাঁড়িপাল্লার সামনে কল্পনার কোনো স্থান নেই। যদি ধরে নেওয়া হয়, আমরা কেচ্ছা বা কাব্য রচনার জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি, তাহলে মাননীয় আদালত, আমার আর অগ্রসর হওয়া নিরর্থক। বিচারের পূর্বেই রায় হয়ে গেলে আর ব্যবহারজীবীদের তো কিছু করার থাকে না। আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযোগ করা হয়েছে, জাল ভিসার সাহায্যে নাকি সে— হ্যাঁ তা-ই বলবো— কারণ, আসামী এখন একজন, যদিও রাজসাক্ষী আরো আসামীর নাম করেছে, যেহেতু তারা এখনও আড়ালেই থেকে গেছে এবং কিছু পলাতক— এই একক আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সে জাল ভিসার সাহায্যে বিদেশে লোক পাচার করেছে। কিন্তু পাসপোর্ট, ভিসা লাগে কেন? এক দেশ থেকে যখন কেউ অন্য দেশে যায়, তার জন্যে ওই মুলুকের সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে এখন নানা ধরনের কওম আছে। সকলে তো মুসলমান নয়। অন্য কওম হলে অবিশ্যি সেই দেশের আইন-অনুযায়ী পাসপোর্ট ভিসা লাগতে পারে। কিন্তু মুসলমানের দেশে যেতে ভিসা লাগবে কেন? আমার প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলতে পারেন অন্য জাতির দেশে যখন তুমি যেতে চাও, তখন তাদের আইন অস্বীকার করতে পারো না। ঠিক। কিন্তু মুসলমানদের দেশে যেতে তার প্রয়োজন কোথায়? মুসলমানরা তো এক জাতি। মুসলমান পশ্চিম ইউরোপের ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতে পারে না। পবিত্র কোরান হাদিসে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের নামগন্ধ নেই। প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলহেস্ সালামের আখেরী খোৎবার কথা স্মরণ করুন, যেখানে বলেছেন যে মুসলমানদের মধ্যে কেউ আরবি-আজমি থাকবে না। তারপর ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ কোথা থেকে আসে? নাসারা, বেদ্বীনের কায়দায় চলতে গিয়ে বর্তমানে আমরা গোমরাহির (ভ্রান্ত) পথ ধরেছি। মুসলমান এক জাতি। ইউরোপের 'নেশন' মুসলমানের উপর প্রযোজ্য নয়। কবি ইকবালকে নিশ্চয় আপনারা ভুলে যাননি। তিনি সাফ বলে গেছেন, 'চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা। মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতন হ্যায় সারা জাঁহা হামারা।' সমস্ত দুনিয়া আমাদের বাসভূমি। যদিও তা এখনও হয়নি, অন্য বেদ্বীন নাসারা, ইহুদী অগয়রহ কওম আছে; কিন্তু যে-সব মুসলিম মুলুক আছে, সেখানে আমরা কীভাবে ইউরোপীয় মাপকাঠি ব্যবহার করতে পারি? ইরাক-ইরান গত চার বছর ন'মাস ধরে লড়ছে জাতীয়তার নামে। ওরা তো মুসলমান নয়। তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের তা জোর দিয়ে ঘোষণা করা উচিত। ইরান-ইরাকে পীর-দরবেশ উলেমা-আউলিয়া থাকতে পারে। কিন্তু তাদের কী আমরা মুসলমান বলবো? না, তা আর বলতে পারি না। পবিত্র হজব্রত পালন করতে অন্য দেশের মুসলমানদের ভিসা লাগে। মক্কা-মদিনায় যেতে কেন ভিসা লাগবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তওবাস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ! হজরতের কেউ-আরবি-আজমি-থাকবে-না বাণি খোৎবা কী ওদেশের শাসকেরা এইভাবে পালন করছেন? চমৎকার সুন্নৎ-পালনের দৃষ্টান্ত।"

আইনজীবী মাহমুদ হোসেন সাধারণত বিচারকের সম্মুখে ভাষণকালে আবেগের বশবর্তী হন না। আইনের শক্ত মাটি তাঁর পায়ের নিচে থাকে। যদি আবেগ কিছু এসে যায়, তা গলায় আদৌ ফোটে না— ফোটে শুধু ভাষায়। কিন্তু আজ তিনি চিরাচরিত অভ্যাস থেকে দূরে। কণ্ঠ ক্রমশ আবেগাপ্লুত বেজে চলে, "মোদ্দা কথা মাননীয় আদালত, ন্যাশনালিটি, জাতীয়তাবাদ, নেশান-স্টেট বা জাতিক রাষ্ট্র— এসবই নাসারা ইউরোপের ধ্যান-ধারণার ফল। আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ বেদ্বীনের কাজ। যদি কেউ তা করে অজানিতে, গফুরর রহিম আল্লার কাছে তাদের মাফ চাওয়া উচিত। মুসলমানেরা এক কওম বা জাতি। নচেৎ পাকিস্তান হলো কী করে? তা তো জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কবি ইকবাল সাহেবের স্বপ্নদোষ হয়নি, তিনি সত্যিই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার বাস্তব রূপায়ণ তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমি তাই বলতে বাধ্য, আমার মক্কেল নিরপরাধ। ভিসা থাকাই উচিত নয়, কোনো এক মুসলমান রাষ্ট্র থেকে আর এক মুসলিম রাষ্ট্রে যদি কেউ যেতে চায়। ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কোনো কাজের বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যাশ্রয় তেমন গুনা নয়। সে গুনা আল্লা মাফ করে দেবেন। আমার মক্কেল নিরপরাধ। মাননীয় আদালত, আমি আরো দু-একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাবৎ গরীব মুসলমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট। কেন? মনে রাখা দরকার, কুৎসিত রমণীকে কেউ বলাৎকার করতে ধায় না। সুন্দরী রমণীর প্রতিই সকলের আকর্ষণ থাকে। সুতরাং অপরাধের জন্যে যদিও ধর্ষককে অভিযুক্ত করা হয় পুরোপুরি তা হওয়া উচিত নয়। এক হাতে তালি বাজে না। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমানরা বড়ো দরিদ্র। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাদের দৃষ্টি যায় তাদের হালফিল সম্পদের জন্যে। মাননীয় আদালত, অন্যপক্ষের ব্যবহারজীবীর ভাষণে আগেই তা স্বীকার করেছেন। তেল তো মরুভূমির তলায় বাবা আদমের কাল থেকে মজুদ ছিল। সেই তেল মাটির উপরে আনতে গেলে মগজেও তেল দরকার হয়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান অধিবাসীদের মগজের তেল তো শুকিয়ে গিয়েছে শত শত বছরের জীবনবোধের অভাবে। সেখানকার শাসকশ্রেণী পবিত্র ইসলামকে বিকৃত, অলঙ্কিত, ধিক্কৃত করে রেখেছে শত শত বছর। মানুষের মনের বিকাশ, চিন্তার প্রসার রুদ্ধ। ফলে মগজের তেল শুষ্ক। নাসারারা শত শত বছর তো বসে থাকেনি। তারাই বিশ শতকের শেষার্ধে এসে তেল তুলতে লাগলো তাদের হিকমত-থরথর মগজের সাহায্যে। নাসারাদের কল্যাণে আজ মধ্যপ্রাচ্য এখন ধন-দৌলতে ডগমগ। নয়া ধনী। আল্লার এতো নেয়ামত তো জীবনে দেখেনি। অথচ তাদের সাংস্কৃতিক জীবন বহু শতাব্দী রুদ্ধ। ফলে নতুন সম্পদের ব্যবহারও তো ওরা জানে না। নয়া-ধনীদের সব খসলৎ ওদের পেয়ে বসেছে। তারা শিশ্ন এবং উদরের বাইরে কিছু কল্পনা করতে পারে না। অভিযোগ উঠেছে যে বিদেশী মেয়েরা সেখানে পাচার হয় অর্থনৈতিক কাজের মতলবে। নয়া ধনীদের কল্পনার দৌড় দুই উরুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা অতি স্বাভাবিক। তাছাড়া ওরা জানে না, শহরের ময়লা জল নিকাশে ড্রেন থাকার মতো দৈহিক লালসা নিবৃত্তির জন্যে কিছু থাকা আবশ্যক। নচেৎ সমস্ত শহর

AMARBOI.COM

দূষিত হয়ে পড়বে। নিষিদ্ধ পল্লী থাকলে বিদেশ থেকে মেয়ে-আমদানির প্রয়োজন হতো না। কিন্তু শত-শত শতাব্দির ক্লোজ্‌ড্ সোসাইটি-বদ্ধ সমাজে সমাজ-সংস্কারের চিন্তা তো অস্বাভাবিক। তাই মধ্যপ্রাচ্যের নয়া-ধনীরা এখন বিদেশে মুক্ত-সমাজে হাওয়া খেতে যায় শুধু মাত্র নৈতিক ছুটি উপভোগের জন্য। আমার নিরীহ মক্কেল ইতিহাসের শিকার। আমি পূর্বেই বলেছি কুৎসিত রমণী ধর্ষিত হয় না। মধ্যপ্রাচ্যে নাসারাদের মগজের তেলে প্রাপ্ত হঠাৎ-পাওয়া রাশি রাশি ধনদৌলত পৃথিবীময় পাপ-বিস্তারে একটি অন্যতম বড়ো উপাদান। ধনদৌলতের সঙ্গে আহার-বিহারের ভোল বদলে যায়। আহার ভালো জুটলে এবং যদি কোনো সুস্থ সামাজিক পরিবেশ না থাকে তখন বিহার— একদম রতিক্রিড়া অর্থে— সহজে জায়গা পেয়ে যায়। ইউরোপে আলু আমদানি হয় ষোড়শ শতকে। ফলে, ওদের আহারের একটা অভাব মিটে যেতে লাগল। অধিবাসীদের দেহে চিকনাই বেড়ে গেলো ক্রমে ক্রমে। ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, খাদ্য-তালিকায় আলু আগমনের ফলে শুধু ওদের দেহ নয়, লিঙ্গও স্ফীত হয়ে উঠলো— 'ইভন দি পেনিস্ বিকেম সোলেন।' মধ্যপ্রাচ্যে হঠাৎ বেশুমার দৌলত আসার ফলে ঠিক সেই ঐতিহাসিক কাণ্ডেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে বর্তমানে। সাংস্কৃতিক জীবন জোরদার থাকলে মানুষ ভবিষ্যৎকেও চোখের সামনে রাখে। আজ মধ্যপ্রাচ্য বর্তমানের ভেতর এমন কূপবদ্ধ যে ভবিষ্যতের দিকে তাকায় না। সকলে আরাম আয়েশে মশ্‌গুল আছে। তার প্রমাণ, মাত্র পঁচিশ লাখ ইহুদী নিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্র শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে জবরদস্তি প্যালেস্টাইনের স্থানীয় অধিবাসীদের হটিয়ে দিয়ে। পেছনে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন-বৃটিশের সহায়তা। মাত্র তিরিশ বছরে তারা একের পর এক এক এলাকা দখল করে চলেছে। বারো কোটি মুসলমান বসে-বসে তামাশা দেখছে। বারো কোটি। হ্যাঁ, বারো কোটি! অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে শতকরা তিনজন ইহুদী পেঁদিয়ে আরবদের প্রপ্রাদেশ পাংশুল রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। তাদের দাপটে শতকরা সাতানব্বুইয়ের আচরণ দেখুন। এইসব দেশের শাসকরা সকলে ইসলামের মোহাফেজ, ফর্মাবরদার বলে দাবি করে। অথচ তাদের মুসলমান ভাই ফিলিস্তিনীদের অধিকার রক্ষায় এতোটুকু গরজ দেখায় না। কারণ এরা ধনদৌলতের শিকলে বাঁধা। তাদের বেশুমার পুঁজি খাটে ধনকুবের আমেরিকা ও বৃটিশ ব্যাংকে। তাই ফিলিস্তিনীদের সহানুভূতি দেখায় মৌখিক, কিন্তু সাহায্যদানে নামে না, পাছে তাদের নাসারা বন্ধুরা চটে যায়। কিন্তু তারাও যে ভবিষ্যতে নাসারাদের কবলে পড়বে, তা আজ ভাবে না। ভাবতে অক্ষম। যেহেতু শত-শত বছরে মগজের তেল তো শুকিয়ে গেছে। তাই বর্তমান আরাম-আয়েশের দিকে এতো ঝোঁক। আর তাই রমণী আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। আমার মক্কেল কোন্ সামাজিক ঘূর্ণি-স্রোতের শিকার, আজ তা উপলব্ধি করতে কারো বেশি সময় যাওয়ার কথা নয়। আমার মক্কেল নিরপরাধ। ফৌজদারী আইনের ৩৪০ ধারা মতে বেআইনী আটক, নারী দেহের ব্যবসার জন্য ৩৭২/৭৩ ধারায় এবং আরো অন্যান্য ধারা মতে অভিযুক্ত। কিন্তু মূল ভিত্তি ঠিক করার পূর্বে এসব আইন কোনো মুসলমানের উপর প্রযোজ্য নয়। তার হেতু সম্পর্কে আমি সবিস্তার পূর্বে বলেছি। তাই আমার বিনীত আরজ, মাননীয় আদালত যেন সকল খুঁটিনাটি বিবেচনা করে দেখেন। আমাদের মনে হয়, কোনো অভিযোগ শেষ পর্যন্ত টেকার কথা নয়। মাননীয় আদালতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকট আরো প্রার্থনা করবো এই বিচার-পর্ব যেন সত্বর শেষ হয়। কারণ, কয়েক মাস জেরা ও অন্যান্য তদন্তে পূর্বেই অতিবাহিত।"

ব্যারিস্টার মাহমুদ হোসেন বসে পড়লেন। পাশেই সঙ্গী আইনজীবী আফতাব আলি সঙ্গী সহকর্মীর অকাট্য যুক্তি বর্ষণে উৎফুল্ল, টেবিলের তলায় করমর্দন কালে ফিসফিস শব্দে উচ্চারণ করেন, 'আলহামদুলিল্লাহ— সকল প্রশংসা আল্লার জন্য।'

কয়েক মাস ধরে আদালতে আইনের তুমুল তর্ক উঠেছিল। তার মোটামুটি একটা ছবি প্রদত্ত।

আসামীর দুই ব্যারিস্টার অবিশ্যি মূল নায়ক। মাঝে মাঝে মকবুল আহমদ অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটার যথা-সম্ভব প্রতিপক্ষদের কোণ্ঠাসা করার চেষ্টা পান। কিন্তু দুই ব্যারিস্টার যেন কুস্তিগীর এবং তাদের এমন সব প্যাঁচ জানা আছে যে, পাছড়ে ফেলে দিয়েছে অপর পক্ষ মাটির উপর এবং বুকে দুশমনের গোটা শরীরের ভার, তবু নিমেষে পাশা উল্‌টে যায়। দেখা গেল, যে মাটিতে পড়েছিল সে এখন প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তিগীরের ছাতির উপর। ফলে, গোটা শহর যেন চেতে উঠেছিল। অনেকেই আগ্রহী। ততোঃ কিম? তারপর কী? সাংবাদিকদের কথা না বললেও চলে। শুধু কোর্টের রিপোর্ট দেয় এমন জন নয়, অন্যান্য বিভাগের রিপোর্টার এসে জুটত। তরুণ আইনজীবী, যাদের পেশা এখনও কোর্টে যাতায়াত এবং লাইব্রেরিতে পঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা একদিনও বাদ দিত না। পেশাদারগণ এসে বসতেন নিজেদের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে। আদালত কক্ষ দর্শনার্থীদের ভিড়ে অনেক সময় তেতে উঠত। নিঃশ্বাসে তপ্ত। বহুকাল পরে শিক্ষিত মহলে একটা সাড়া জেগেছিল এই মামলা কেন্দ্র করে। অনেক জনই ফলে এসে জমে যেতো।

এইভাবে জেরা-সওয়াল-জওয়াব সব শেষ হয়ে যায়। বাকি থাকে শুধু রায়। তারই অপেক্ষায় বহু কৌতূহলী মানুষ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এক মাস সময় নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মামলার পরবর্তী তারিখ এক মাস পরে। সাধারণত এমন হয় না। খুব তাড়াতাড়ি দেওয়াই রেওযাজ। অনেক সময় হয়তো পরদিন। কিছু জটিলতা থাকলে এক হপ্তা। কিন্তু এইবার এক মাস। বুঝা গেলো, জটিলতা হয়তো বেশ গ্রন্থীময়। কৌতূহলীরা রীতিমতো অধৈর্যের তুফানে হাবুডুবু। কিন্তু উপায় তো নেই। রায়ের জন্য অপেক্ষা করতেই হয়।

কিন্তু এমনই পরিস্থিতি যে, এক মাস পরেও আর রায় বেরুলো না।

সংবাদপত্রে খবরটা ছোটো করেই ছাপা হয়েছিলো আইন-আদালতের কলামে। একমাত্র এমন সংবাদে আগ্রহী ছাড়া কারো চোখে পড়ার কথা নয়। হেডিংও এক কলামের মধ্যে ছোটো টাইপে : বিচারাধীন আসামীর মৃত্যু। তারপর সংক্ষেপে খবরটি পরিবেশিত : আদম-ব্যবসায়ের মামলায় জড়িত কাজী আলামিন নামক আসামীকে জেলে মৃত-অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ বা পরিবেশগত কোনো খবরও ছিল না। যেন অতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাধারণত, এমন আকস্মিক মৃত্যু এবং বিচারাধীন আসামীর জেলের ভেতর মৃত্যু সংবাদিকদের প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। কারণ এমন ঘটনা তো কাহিনী আকারে কয়েক দিন পরিবেশন করা যায়। ফলে, উক্ত পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়ে। অনেক সময় এক ঘটনার জের পত্রিকার পাতায় হপ্তার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হপ্তা ভেসে থাকে। পরিবেশনের দক্ষতার উপর পত্রিকার প্রচার নির্ভর করে। কিন্তু এই সংবাদ যেন অতি ফিকে সংবাদ, ফলে দৈনন্দিনতার ঢেউয়ে সহজে তলিয়ে গেল।

অবিশ্যি কানাঘুষা এবং জনরব নানা কায়দায় চালু হয়েছিল। জেলের ভেতর বিচারাধীন আসামীর মৃত্যু। জেল-কর্তৃপক্ষের তো জবাবদিহি হওয়ার কথা। কিন্তু সেদিক থেকে কোনো বিন্দুমাত্র বুদ্বুদ উঠল না। অনেকে বলাবলি করতে লাগল, আসামীর পেছনে আরো বড়ো বড়ো রাঘব বোয়াল আছে। তারাই হয়তো যোগ-সাজশে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। কারো কারো ধারণা, পাপ করলে মনের রেহাই থাকে না। আত্মগ্লানি এক ধরনের অন্তর্দাহ, যা সুপ্ত অগ্নিগিরির মতো ভেতরে সক্রিয় থাকে। এমন অবস্থায় চরম অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যা করে বসে। মরার ইচ্ছা থাকলে, উপায় আবিষ্কার কঠিন কিছু নয়। একটা-না-একটা হিল্লে জুটে যায়। জনরবের ধারা এক-এক মহলায় আলাদা-আলাদা আকার ধারণ করে।

উকিল মহল এবং সাধারণ কৌতূহলী মহলে পার্থক্য থাকবে, তা আর বিচিত্র কী?

নানা সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়েছিল এই জন্যে যে, কর্তৃপক্ষ আসামীর ঠিকানায়, এমন কী তার মামলার ব্যবহারজীবীদেরও এত্তেলা দিয়েছিল। কিন্তু লাশ নিতে কেউ আসেনি। ফলে, জেল-কর্তৃপক্ষই নিরুপায় শেষকৃত্যের ভার নিয়েছিল। এই খবরটি সত্য। কিন্তু বাকি সবই জনরবের ঢেউ।

মূল আসামী মৃত। রায় দেওয়ার আর বেশি তাড়া কোথায়?

অবিশ্যি মামলা আদালতেই জিয়ানো থাকে। কারণ রাজসাক্ষীর জবানি মতো কিছু আসামী পলাতক। সেই অধ্যায়ের অপেক্ষা।

শেষ হয়েও কেস শেষ হয় না।

AMARBOI.COM

চার

সকালে আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম?

সবুরন নিজেকে জিজ্ঞেস করে বারবার। কোনো উত্তর পায় না।

এমন কী হতে পারে?

সে তো জানে, এই হাজত থেকে তার মুক্তি নেই, যদ্দিন না মামলা শেষ হয়। কিন্তু অভাবনীয় ব্যাপার। এক সহকারী জেলার, সঙ্গে সিপাই, তাকে খবর দিল, ইচ্ছে করলে সে এখন বাড়ি চলে যেতে পারে। পুলিশ থেকে জানানো হয়েছে, আসামীরা ধরা পড়েনি। কবে পড়বে তা অনিশ্চিত। সুতরাং রাজসাক্ষীর অনির্দিষ্ট কাল হাজতে পচার কোনো মানে হয় না। সে ইচ্ছে করলে তার বাড়ি চলে যেতে পারে। আসামী ধরা পড়লে, তখন আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তাকে খবর দেওয়া হবে।

দুনিয়ায় এতো গোলক-ধাঁধা আছে সবুরনের জানার কথা নয়, কেঁদে ফেলেছিল সে। হাজতে আরো মেয়ে ছিল তার সঙ্গী। সুখে দুঃখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা। কতো মুখ। সে খালাস হয়ে গেছে জেনে চারপাশে এসে ভিড় করে। কী বলবে তাদের সে?

সিপাই জেলার দাঁড়িয়ে আছে জেনানা ফটকে। একে একে বিদায় নিতে হয়। মায়া বসে গিয়েছিল এক সঙ্গে থাকতে থাকতে।

চটপট সবুরন তৈরি হয়ে যায়। সঙ্গে ছিল খান-দুই শাড়ি। স্যান্ডেল সে সঙ্গীনীকে দিয়ে দিলো। গ্রামে ফিরবে সে। একটু দাম দিয়ে কেনা জুতা। এমন বিলাসিতার আর প্রয়োজন নেই। যেখানে সে ফিরে যাবে, সেখানে জীবনের চাহিদা বড়ো কম, অতি অল্প।

চোখ মুছতে হয় বারবার। চাচির কথা আজ আরো মনে পড়ে। হাজতে তাকে পেয়ে বুকে অনেক বল জমা হয়েছিল। নচেৎ এতো দিন ধরে ভেবে-ভেবেই সে হয়ত মরে যেতো।

জেলগেটে তেমন হাঙ্গামা হয়নি। তার দুই হাতের দু'খানি সোনার বালা আর দশটি টাকা জমা ছিল। কাগজে টিপসই দেওয়ার পর সে ফেরত পেয়ে গেল।

আবার জেলগেটের বাইরে। খোলা হাওয়ার মুখোমুখি। দেওয়াল ছিল না আশেপাশে।

কিন্তু দেওয়াল ছুটে আসে।

কোথায় যাবে সে? পুরাতন ঠিকানা তো আর নেই। পুরাতন সেই বিবি সাহেবের মুখ মনে পড়ল। সেখানে গেলে কী এক বেলা ঠাঁই হবে না? সৎ শান্ত দরদী মানুষ। তার অন্তর আজ বারবার সবুরনকে ডাক দিতে লাগল। কতো বছর হয়ে গেছে। যদি সেই বাড়িতে না থাকেন? যদি মারা যান বা আর কিছু ঘটে যায় তাঁর জীবনে! এমনই নানা প্রশ্ন তার সামনে এসে জমা হয়। কিন্তু নসিব ঠোকা তো অনেক কিছু চেষ্টা করে দেখা যায়।

সবুরনের জন্যে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়েই দেখা দিয়েছিল। সেই বিবি সাহেব তাকে জায়গা দিলেন না শুধু, আরো উপকার করলেন, যা তার মনে অক্ষয় হয়ে থাকার কথা। এলাকা চেনা। কাছে দশটি টাকা ছিল, রিকশার ভাড়া দিতে অসুবিধা ছিল না। ঠিকানা মতই সে পৌছতে পেরেছিল। অবিশ্যি অতীতের ঘটনা সে চাপা দিয়ে রাখলো। এক বাড়ি থেকে চাকরি গেছে। আগে কোনো-না-কোনো চাকরি মিলে যেতো। সুতরাং এক ঘর বন্ধ হলে অন্য ঘর খোলা। এবার তা হয়নি। শহরে কোথায় সে যাবে? তার চাচা আর পুরাতন ঠিকানায় থাকে না। ডাহা মিথ্যে। সবুরন সে-পথই মাড়ায়নি। বাঁচার জন্যে এতোটুকু করা যায়, নাগরিক অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছিল। বিবি সাহেবের সঙ্গে কথা রইলো, সে গ্রামে থেকে ফিরে তাঁর কাছেই আসবে। যদি তাঁর বাড়িতে কাজ না থাকে, যেন অন্য কোথাও চাকরির সন্ধান তিনি রাখেন। এমন মানুষের কাছে মন খুলে ধরা যায়, সবুরন তা অনুভব করেছিল। কারণ তিনি শুধু দু'দিন জায়গা দিলেন না, তার সোনার বালা দু'টি পর্যন্ত বিক্রির ব্যবস্থা করলেন, নিজে ওকে সঙ্গে নিয়ে। "তুমি বিক্রি করতে গেলেই তো ধরবে। বছরের পর বছর মেহনতে গড়া, তা ওরা বুঝবে না। হয়তো পুলিশ ডাকবে, কোন্ বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছে।" বিবি সাহেবের এমন কথা শুনে তার চৈতন্য হয়েছিল। দুনিয়ায় সব মানুষ এমন বিবি সাব হয় না কেন? অনেক রকম মাদী-কুত্তী সে দেখেছে পরিচারিকার জীবনে। তাই কৃতজ্ঞতা আজো ধাক্কা দেয়।

সোনার দাম বেড়েছে। আড়াই হাজার টাকা পাওয়া গেল। সবুরনের একটা গোলাপ ফুল-মার্কা টিনের বাক্স কেনার শখ হয়েছিল। বিবি সাহেব বারণ করলেন, "সঙ্গে টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যাবে, ওসব হাঙ্গামা করো না। চোর বাটপাড় আছে রাস্তায়। পুঁটলির ভেতর রাখো। একটা বড় গামছা হলেই চলে বা একটা শাড়ি।"

বিশেষ কিছু কিনতে হয়নি। বাজানের এক জোড়া লুঙ্গি, নিজের জন্যে আর মার জন্যে দু-য়ে দু-য়ে চারখানা শাড়ি, সাবান দু'টো, তেল এক শিশি, দু'টো গামছা, আর কিছু টুকিটাকি যা সংসারের কাজে লাগতে পারে। গ্রাম্য মেয়ের মতই সে ফিরে যাবে। এক জোড়া চটি জুতো কিনেছিল শুধু বাজানের জন্যে, নিজের জন্যে না।

স্টেশন সবুরনের জানা। নিজের গ্রামে পৌঁছানোর হদিশ সে আগেই জানতো। কাজী সাহেব বাতলে দিয়েছিলেন। কাজী সাহেব মিথ্যে বলেননি। তার বাজান মাস-মাস টাকা পেতো। মামলা চলার সময় সে জানতে পেরেছিল, পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, তিন মাস থেকে টাকা দেনেওয়ালা আর ও-মুখ হয় না। ধরা পড়ার ভয়ে, তা সবুরন বোঝে। অতোটুকু হুঁশিয়ার হয়েছে সে। পুঁটলিটি বড় সতর্কতার সঙ্গে নিজের মুঠির ভেতর ঝুলিয়ে রাখে। টিকেট করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি, তেমন ভিড় ছিল না।

টিকেট নিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকে গেছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাক দেয়, 'ও মা, শোনো।'

সবুরন ফিরে তাকায়। এক বৃদ্ধা মহিলা। তবে মোটাসোটা এবং বেশ শক্ত আছে এখনও। প্রচুর পান খায়, দাঁতে ধরা পড়ে। চোখ দু'টি কিন্তু ছোটো ছোটো। মুখে দরদের ছায়া সহজে পড়ে না।

'আমাকে ডাকেন?'

'হ্যাঁ, মা। যাবে কুই?'

'হিজলিয়া।'

'আ রে আমাগো পাশের গাঁ।'

'একই লগে যামু।'

সবুরন নিশ্চিন্ত হয়। একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

ট্রেনের কামরায় দু'জনে পাশাপাশি। বৃদ্ধা মহিলা কথা বলার জন্যে যেন হন্যে হয়েছিল। সবুরন 'হ্যাঁ-হু'র বেশি এগোতে নারাজ। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে সে গাছপালা ময়দান দেখে এবং বুকে তোলপাড় অনুভব করে। কেমন আছেন বাজান? ছ-সাত মাস টাকা ছাড়া। কেমন রয়েছে এখন শরীর? চুল কী পেকে গেছে? মা, সৎ-মা তবু ভালো মানুষ। হেই বেডি ক্যামন অইছে আল্লাকে মালুম। এমনতরো নানা ভাবনার রাশি তাকে ছেয়ে থাকে। বৃদ্ধা মহিলার কথায় সে স্বোয়াস্তি পায় না। নির্জন জায়গা যখন কাম্য তখন এমনই হয়।

ট্রেনের দুলুনিতে সবুরনের কেমন খোয়ারি ধরেছিল। হঠাৎ বৃদ্ধার ডাকে সে হতচকিত হয়ে যায় : 'ও মা উইড্যা পড়ো, আইয়া পড়ছি, লগে ইস্টিশান।

সবুরন আর জিজ্ঞেস করেনি কোন্ স্টেশন। একই জায়গায় যখন যাওয়া, তখন আর জিজ্ঞাসা কী?

কিন্তু স্টেশনে নেমে বৃদ্ধা হাউমাউ করে বলে, 'ঘাবড়াস না, মা। দুই ইস্টিশান আগে নামছি ভুল কইরা।'

AMARBOI.COM

'অহন উপায়।' সবুরনের মাথা চক্কর খায়।

'ঘাবড়াস না মা। সেই রাইতে গাড়ি। যাওয়া ভালা না। কাল বিহানে যামু। এহানে আমার এক বইন থাকে। তার লগে থাকমু।'

এমন সময় দুই যুবক এই ট্রেন থেকে নেমেছিল। তারা এসে হাজির হয় এবং বৃদ্ধাকে খালা বলে ডাক দেয় এবং দু-এক কথার পর চলে যায়।

অগত্যা নিরুপায় সবুরন। অচেনা বৃদ্ধার সঙ্গে সে ভয়ানক অসোয়াস্তি অনুভব করে। স্টেশনের কাছেই গ্রাম। তবে রিকশা চলে। বৃদ্ধার সঙ্গে সবুরনকে রিকশায় উঠতে হয়। অখ্যাত স্টেশন। এখানে তো রাত কাটানো অসম্ভব। বয়স ছাড়া তার নিকট আরো ইহজাগতিক সম্পদ আছে : তার সারাজীবনের ভবিষ্যৎ, তার বাজানের ভবিষ্যৎ।

সবুরনকে তারপর আর কেউ কোনদিন কোথাও দেখেনি।

অখ্যাত গ্রামের মেয়ে। তার খোঁজে কারই বা এতো প্রয়োজন? পুলিশের তদন্তে পরে নিখোঁজের খবরটা তার গ্রাম ও আশপাশের লোক জানতে পারে। কয়েকজন আসামী ধরা পড়েছিল। তাদের তো শনাক্ত করার জন্যে সবুরনকে দরকার। তখনই তার গ্রামের ঠিকানায় পুলিশ গিয়েছিল। সবুরনকে না-পেয়ে আরো তল্লাসি তদন্ত কর্তৃপক্ষ চালায়। সেই সূত্রেই জানা যায়, অমুক স্টেশনে একটি যুবতী মেয়ে, পুঁটলি হাতে এবং এক বৃদ্ধা মহিলাকে দু-একজন পথচারী দেখেছিল। তার বেশি আর কোনো হদিস দিতে তারা অক্ষম।

সবুরন তার বাজানের কাছে আর কখনও ফিরে যায়নি।

নির্জন ভিটায়, বিজন বন-বনান্তরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে, দিন-রাত্রি অসংখ্য ঝিঁঝি ডেকে যায় অবিরাম, অবিশ্রান্ত...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

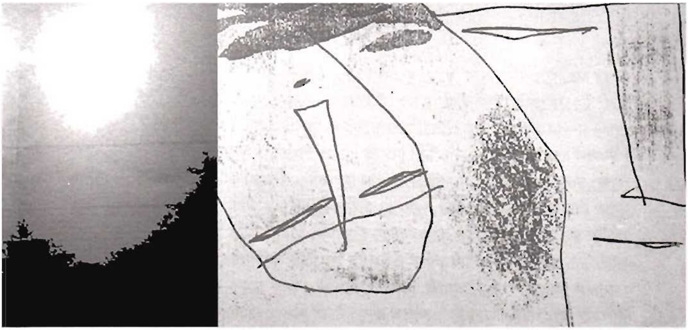

পিতৃপুরুষের পাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

খোয়াবের ভেতর হাঁটা। তিরিশ বছর এইভাবেই ত দিন কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ার পর মনে হয় আমি জেগে আছি। তবু বিশ্বাস ফিরে আসে না। এ যেন খোঁয়ারির দশা? ঘুম এবং জেগে থাকার হদিস দায়। কোন দিকে পাল্লা ভারি নয়। মন ভেসে-ভেসে চলে নদীর ভেতর খড়-কুটার মত। কোথাও আটক থাকার কথা নয় এক ঠাঁয়। কথা গুছিয়ে বলা কষ্টকর। বহুদিন বোবা ছিলাম। ভয়ে চুপ করে যায় যারা আমি তাদেরই দলে। বাপ একবার চোখ রাঙালে আমি সেই সুরত সারাদিন দেখতাম আমার সামনে ভাসছে। ছেলেবেলায় পেসাব করে ফেলতাম। লালবানু আমার নাম। বাপ একবার ডাক দিলে আমার বুক ধড়ফড় করত। কী জানি কী হয়, বাপ আমাকে ডাকে কেন? ফায়ফরমাস তিনি আমাকে করতেন না। দরকার ছিল না। অবস্থাপন্ন ঘর। গ্রাম হলেও আমাদের জমি-জিরাৎ ছিল। খুব বেশি না। একটা তিন-চার জনের পরিবার বেশ স্বচ্ছল চলে যেতে পারে। দু'তিন জন কাম্‌লা প্রায় থাকত সংসারে। চাষবাসের সময় ভিন গাঁর কাম্‌লা এসে জুটত। হালের গরু ছিল দুই জোড়া। তাছাড়া গাই একটা না একটা থাকতই। বাপের রাত্রে দুধ চাই। সুতরাং গাইপোষা তাঁর বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। ঘরে দুধের না ঘাট্‌তি পড়ে। তাই এমনভাবে এক জোড়া গাই রাখা হত যেন একটার দুধ বন্ধ বলে অন্যটি যোগান দেয়। রাখাল ছোকরা শুধু মাঠের জন্যে নয়, বাড়ির ফায়ফরমাসও তার কাজের মধ্যে। তাই হুকুম তামিলের জন্যে বাপ আমাকে ডাক দিতেন না। তাঁর কাছে গেলেই নসিহত শুরু হত। এটা ভাল, ওটা মন্দ— এমন ধারায় তিনি কথা বলতেন। আমি পাঁচ বছর বয়স থেকে শুনে আসছি। আনমনা হলে বকুনি। পাড়ায় আরো সমবয়সী মেয়ে ছিল। তাদের সঙ্গে খেলতে যেতাম বৈকি। অন্দরেও আমাদের একটা পুকুর ছিল। খুব ছোট নয়। তার চওড়া পাড় বেশির ভাগ তাল-নারিকেল গাছে বোঝাই। এদিকে পুরুষ মানুষ কেউ আসত না। কারণ, পাড়ের সীমানা শেষে আকাট বুনো ঘাসের ও বাঁশের জঙ্গল। সেদিকে শেয়ালের রাজত্ব ছিল। একবার একটা বাঘ পর্যন্ত নাকি এসে পড়েছিল। তাকে আর জঙ্গলে ফিরে যেতে হয়নি। পরে জানা গেল বাঘটা অসুস্থ। নচেৎ গাঁয়ের লোকের হৈচৈ-শব্দে বাঘ কেন খড়ের গাদার নিচে গিয়ে লুকাবে? বর্ষাকালে উই ধরে খড় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমাদের এক পড়শী মাটি থেকে হাতখানেক উঁচুতে মাচা বানিয়ে খড় রেখেছিল। তার নিচে বাঘ

আশ্রয় নিলে। গাঁয়ের এক সাহসী যুবক দাঁও-মত জায়গা থেকে সেটা গুলি করে মারে। মার কাছে এসব গল্প শুনেছি। খেলতে গেলে এমন ভয় দেখাতেন। একটেরে পরিষ্কার ছায়াদার জায়গা পেয়ে আমরা প্রাণের সুখে হল্লা করতাম। এমন তোফা আস্তানায় কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়ার যো ছিল না। হঠাৎ বাপের দরাজ গলার ডাক পৌঁছল : লালবানু। লালবানু তখন মরে-কী-বাঁচে এক দৌড়ে আগে মার কাছে গিয়ে পৌঁছল, তারপরে বাপের সামনে কোরবানির ছাগল। অথচ এত ভয় পাওয়ার কী ছিল? কিন্তু আমি ভয় পেতাম। আমার স্বভাবের ভেতর তা ছিল, এখন বুঝতে পারি। অথচ ভয় গেল কোথায়? আজ আর কাউ-কে ডরাই না। ধোঁয়া থেকে আগুন জ্বলে। আমার বেলায় তা-ই ঘটেছে। অনেক বছর ধুঁইয়েছি নিজের ভেতর। মনে-মনে সিদ্ধ হওয়া। সাহস এত দিন ছিল না কেন? তার জবাব আমি দিতে পারব না। তবে এটুকু বুঝেছি একবার রুখে দাঁড়িয়ে গেলেই ডর-ভয় পালাতে থাকে। তখন বুকেও তাগদ এসে যায়। সেই মনের অবস্থা টিকিয়ে রাখতে কথাও বুকের ভেতর ডাক দিতে শুরু করে। বহুকাল পরে আমি আমার জোর ফিরে পেয়েছি। আমার বুক আর কাঁপে না। তাই সকলকে শুনাতে বসেছি আমার কেচ্ছা। মা বলতেন, দশ হাত শাড়ি পরেও মেয়েমানুষ ন্যাংটা। এমন কথা শুনলে কার পিলে চমকায় না? আমার বাজানকে ভয় পাওয়ার অনেক কিছু ছিল। বেঁটে মানুষ কিন্তু পুরুষ্টু চেহারা। একদম তন্দুরস্ত। হাতের গোছা কী মোটা! তার উপর লোম বোঝাই। গলার আওয়াজ ছিল বেশ চওড়া ধরনের। গাঁয়ের শালিসে তাঁর ডাক পড়ত। বিচারের মজলিসে সেই উঁচু গলা অনেক দূর গড়িয়ে যেত। গতরের জোর। গাঁয়ে অবস্থাপন্ন গেরস্থ। মার ছেলে-পুলে হত, বাঁচতে না বেশিদিন। অনেকে আতুর-ঘর থেকে বিদায় নিত। অনেকে ছেলেবেলায় জোর তিন-চার বছর বয়স পর্যন্ত দুনিয়ার বাসিন্দা। মা এইসব শোকে কাতর হয়ে পড়তেন। শান্ত স্বভাবের মানুষ। তার উপর এই খোদায়ী মার। বাপের সামনে তিনিও কেঁচো। দুনিয়ার লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার জন্যে বোধহয় আমি শুধু মরে যাইনি। বেঁচে গিয়েছিলাম কোন রকমে। ঠিক কোন রকমে নয়। মার কাছে শোনা, আমার জন্মের পূর্বে তিনি আমাদের গাঁ থেকে এক ক্রোশ কী ওই রকম দূর হবে এক মাজার আছে, মা সেখানে মানৎ করেছিলেন। বাপ তার কিছু জানেন না। আমার যখন তিন মাস বয়স তখন নাকি মা বাপকে না জানিয়ে এক রাত্রে আমাদের পাড়ায় এক বুড়ি মুরুব্বি মেয়ের— বাবার চাচি সুবাদে— সঙ্গে গিয়েছিলেন মানৎ পরিশোধে। পরে মার উপর দিয়ে এক দুর্দিন লাঞ্ছনা গঞ্জনার ঝড় বয়ে যায়। কড়া পর্দার ভেতর ছেলেবেলা থেকেই দিন গুজরান। পাড়ার বউড়িদের ত কথা নেই। খুব বুড়ি না হলে মুরুব্বিরাও অমন প্রথা সামান্য শিথিল করার সাহস পেত না। হয়ত সেই মাজারে মরা, তৌবা, মরে গেলেও জেন্দা পীরের দোয়ায় আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। বাপের আদর পেতাম বড় কম। তা-ও অবরে-সবরে। হয়ত মায়ের অমন বেহায়া কাজের জন্যে তিনি মনে মনে গোস্বা হয়েই ছিলেন। ছেলে বা মেয়ে বলতে আর ত সংসারে কেউ ছিল না। আমিই সবেধন মণি-পাথর। কিন্তু আমার রেহাই ছিল না। এসব কথা আমার মনে ওঠে। কিন্তু তা-ই বা বলি কী করে? পরে যে সব কাজ করেছেন তা আমার জন্যে তার অগাধ মায়া-মমতা ছাড়া— অন্য কিছু বলা যায় না। অনেকে মনের ভাব অপরকে জানাতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালচালে, অনেকে পারে না। বুকে অগাধ ভালবাসা। অথচ বাইরে তার পেরকাশ (প্রকাশ) নেই। এমন ত হয়। বাপের বেলা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু তাঁকে বুঝে-উঠা আমার সাধ্যের বাইরে। আজও বুঝতে পারিনি। ভাল খেতেন, পড়তেন, ভালো চেহারা— অসুখ-বিসুখ কম। অপরের উপর দম্ভ করা কী তাদের সহজে পেয়ে বসে? আমার তা-ই মনে হয়। কিন্তু নিজের মেয়ে এবং যখন একটাই মেয়ে, তখন কী হদিস উল্টায় না? আজ এসব ধানাই-পানাই খামখা। কিন্তু মনে কথাগুলো ওঠে। আরো কত কথা ভিড় করে। এসব অপরকে না শোনালে যেন আমার স্বস্তি নেই। লোকে বলত জব্বার হাওলাদার একটা জব্বর মানুষ। জমিজিরাৎ থাকলে লোক-বলও জুটে যায়। আর গাঁয়ে বেকার কিছু লোক থাকলে ত কথা নেই। অবস্থাপন্ন গেরস্থর আশেপাশে তাদের ধর্ণা দিতে হয়, যদি কিছু জুটে যায়। বাপের তেমন ন্যাওটা বেশ কিছু লোক ছিল। অভাবে অভিযোগে তারা জব্বার হাওলাদারের কাছে এসে পড়ত। তাছাড়া ছিল বর্গা দেওয়া জমিনের লোকজন। আবাদের সময় বিদেশী-গাবুর-কামীন আসত, তাদেরও ত ন্যাওটার মধ্যে ধরা যায়। এইভাবে রাজার দরবার গড়ে ওঠে। আমার বাপ রাজা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর দরবার গড়ে উঠেছিল। বৈঠকখানা সব সময় সরগম থাকত। গাঁয়ের মাতব্বর লোক। তাঁর কাছে লোক হরহামেশা ওঠা-বসা করে। কেউ কেউ আসে ভবিষ্যতে কিছু সুখসুবিধা বাগিয়ে নেয়ার লোভে। অনেকে ভাবে জবরদস্ত লোককে উঁচু পিঁড়া দিয়ে রাখাই মঙ্গল। এক গাঁয়ে বাস করতে গেলে, কখন কোন বিপদ-আপদ বা দায়দফা আসে বলা যায় না। তখন তো মোড়লমুক্ষি হাতে থাকা ভালো। আজ আমি স্পষ্ট এসব বলতে পারি। তখন অত শত ভাবার ক্ষমতাও ছিল না। আর আমি ঠেকে শিখেছি। আমার চাচা হেদায়েত হাওলাদার ছিল বাপের আর এক ন্যাওটা। এমন মোসাহেব না হলেও তার চলত। কিন্তু হেদায়েত বা হিদু চাচা আর এক ধরনের লোক। পৈতৃক সম্পত্তি দু-ভা'য়ে সমান পেয়েছিল। কিন্তু বিষয়-আশয় দেখার মত তার ক্ষমতা বা ধৈজ্জ (ধৈর্য) সে পায়নি। সব মিয়াভায়ের উপর সোপর্দ। মিয়াভাই অর্থাৎ আমার বাপই তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কপাল ভালো, চাচা বাঁজা, ছেলেপুলে ছিলনা। শুধু অন্ন আলাদা। চাচা-চাচি আলাদা রান্না করে খেত। রসদ যোগাতেন বাপজান। সম্পত্তি দেখা-শোনার ভারও তাঁর উপর। হিদু চাচা আড্ডা দিয়েই আধখানা বয়স পার করে দিয়েছিল। তাস ছিল নেশা। মাঝে মাঝে অন্য হুজুগ। যেমন বাইচ খেলা। বর্ষাকালে চাচা এসবে এমন জমে থাকত যে বাপ পর্যন্ত বকুনি দিত। আর রাতকে রাত ঘরে না ফেরার জন্য শুরু হত চাচির লগে কোন্দল। চাচির ছেলেপুলে ছিল না, আমাকে খুব আদর করত। বাপের হুকুম তামিল করতাম মুখ বুঁজে। কিন্তু মার ফায়ফরমাস কে আর শোনে। তখন মা কোন কোন সময় দিতেন ধমাদ্দম পিটে। চাচি আমার কান্না শুনে ছুটে আসতো এবং মাকে বকুনি দিয়ে বলত, 'বড়-বু, আপনার হাতে আজার (কুষ্ঠরোগ) হবে। মরে-হেজে এই একটা কোন রকমে ঠেকেছে। তার উপর হাত তুলতে আপনার বাধে না?' অনেক সময় মারধোর খেয়ে চাচার বাড়ি ঘুমিয়ে পড়তাম। মার অনুরোধে চাচা আমাকে নিদন্ত অবস্থায় বাড়িতে রেখে যেত। ছেলেবেলার এমন কত কথাই না মনে পড়ে। আজ নিজের সাধের সেই সব জায়গা ছেড়ে এসেছি। বাপ-মার কাছে এই

জন্মে আর ফিরে যাব না। বাপের জন্য দুঃখ হয়। তার দয়ামায়ার আদ্‌ল একদিন আমার কাছে ছিল চাওয়া-পাওয়ার শেষ কথা। কিন্তু আজ মনে হয়, কী বিষম ফেরে না মানুষ দুনিয়ায় বাঁচে। এক-এক সময় মানুষ কী করে তার হিসেব-নিকেশও তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এক-এক জন এক-এক রকম ভোল পাকড়েই দিন গুজরান করে। এত অন্ধিসন্ধি গোড়ায় বুঝলে, বছরের পর বছর অত রগড়ানি খেতে হত না। বাড়ির এক মৌলবি সাবের কাছেই আমার হরফের সাথে পরিচয়। আমাকে মকতবে যেতে হত না। হাওলাদার বাড়ির মেয়ে অন্য জায়গায় খামখা যাবে? ইজ্জতের সওয়াল আছে। বাপ আমাদের দহ্‌লিজে (বৈঠকখানা, সদর) তাই মৌলবি বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্রায় বাপের বয়সী তিনি। তাকে আমার মনে আছে, যদিও তেমন কথা পরে অনেকের কাছে শুনেছি। বাপ যেদিন পয়লা আমাকে ওঁর সামনে হাজির করেন, মৌলবি সাব বললেন, "হাওলাদার সাব, আল্লা আপনারে খুবসুরাৎ মাইয়্যা দিছেন। মোটা তাজা তন্দুরস্ত। আমার বহুৎ বহুৎ দোয়া, ওর ভবিষ্যত যেন খোদা খয়ের (মঙ্গল) করেন। সোবহান আল্লা...."। মোটা-তাজা-খুবসুরৎ-তন্দুরস্ত। সব কথার হদিস তখন আমার জানার কথা নয়। তবে শুনে মনে মনে খুব হাসি লেগেছিল, যদিও মুরুব্বিদের সামনে ভয়ে জড়সড়, লজ্জায় লাল। পরে টের পেলাম অনেক বছর পরে এমন সব তারিফের ফলাফল কী? বাপ সেদিন খুব খুশি হয়ে জবাব দেন, "আপনাদের সকলের দোয়া চাই। আল্লা যা দিছেন যেন বজায় রাখেন। মরদ-পোলাগুলো থাইকলে আজ আমার ঘর বোঝাই থাকত। অহন ওই এক পিদিমেই ঘর উজালা"। আরো কি কি যেন বলেছিলেন বাপজান। আজ মনে নাই। বাপের ঘর উজালা করেই ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না, আমি শুধু জ্বলতাম, পিদিমের যা কাজ। রোশ্‌নাই না হলে আর কোথা থেকে আসবে? বহু বছর পর আজ সব হদিস করতে পারি। আমি নিজেও জানতাম না দুনিয়ায় এত রকম কাণ্ড হতে পারে। লেখাপড়া ত শেখার তেমন সুযোগ পেলাম না। পাড়াগাঁয়ে শরিফ লোকেরা ওদিকে চোখ বুঁজে থাকে। মেয়েদের আবার লেখাপড়া কী? তারা আপিসে যাবে না, চাকরি করবে না, তখন মৌলবির পেছনে মাস-মাস বেতন গোনায় কোনো ফায়দা আছে? দু-তিন বছর ওই মৌলবি সাব আমাদের গাঁয়ে ছিলেন, আমার ইলেমের দৌড়ও সেই পর্যন্ত। অক্ষর পরিচয় হয়েছিল। তার বেশি ত কিছু নয়। কিন্তু আমি নিজে নিজে এক চিল্‌তে ছাপার কাগজ পেলে পড়ার চেষ্টা পেতাম। কতো দিন ঠোঙা নাড়াচাড়া করে দেখতাম। বাজার থেকে মশালা বা আর কিছু এলে মা ঠোঙা খালি করতেন। আমি তখন তা নিয়ে লাফালাফি করতাম। অনেকক্ষণ পরে ফুঁ দিয়ে ফটাস শব্দ তোলার ফন্দি। মা তা-ই ভাবতেন। কিন্তু অমন খেলায় ঢোকার আগে আমি ঠোঙার উপর কিছু ছাপা থাকলে তা পড়ার চেষ্টা করতাম। সব ত আয়ত্তে আসত না। বানান করে কুল মিলত না। কিন্তু আমার এই খসলৎ বহুদিন বজায় ছিল। মার কাছে আবদার করতে পারতাম লেখাপড়া শেখার। কিন্তু লাভ কী? মাও বাপের সামনে কথা বলতে ভয় পেতেন। জব্বার হাওলাদারের গোঁফ দেখলে তা-কে হয়ত মনে করত বাঘ। আমার কাছে ত তেমনই মনে হত। অবিশ্যি আমার স্বভাব শুধ্‌রে যেতে পারে, তা কোনোদিন ভাবিনি। অথচ স্বভাব শুধ্‌রে যায়। তা আর নতুন কথা নয়। আজ নিজেকে যত দেখি, তত অবাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে। অমন ভীতু ছিলাম কেন? যদি ভয়েই আটকে পড়ে থাকতাম, তাহলে আর এক জন্মের মুখ দেখার কপাল হত না। ভয় আছে বৈকি দুনিয়ায়। কিন্তু তা দূর করা যায়। আমি তা আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি। লেখাপড়ার সুযোগ পেলাম না। তা পেলে চোখ খুলত। কিন্তু এক পর্যায়ে আমার সে-সুযোগও জুটেছিল। বই আমি পেয়ে যেতাম। পড়তাম লুকিয়ে লাকিয়ে। কে জানে, হয়ত সেই হরফের দৌলতে আমার বুকের রগ, শিরাগুলো শক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ভয় পালিয়ে গেল। এখন একা-একা ভাবলে বিশ্বাস হয় না, আমাকে দিয়ে দুনিয়ায় এমন কাজ সম্ভব। হাজার চোখের সামনে আমি যেন আঙুল উঁচিয়ে বাপের বেটির মত হাঁক দিয়ে বলতে পারি, "শোনো, আমি যা বলছি সব সত্যি।" তখন আর কেউ প্রতিবাদ করছে না। বরং সকলে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকবে না কেন? আমি ত কুচ্ছিত কিছু নই। আমি সুন্দরী কি না জানি নে, কিন্তু নিজের চেহারা আয়নায় দেখে আমার খুব ভাল লাগে। অন্যদের যে ভাল লাগত, তার হিসেব-নিকেশ ত আমার কাছেই আছে। আমার কাছে মানে আমার এই দেহে আছে। ছাই, পোড়া দেহের দাম-ও অনেক পরে বুঝতে শিখলাম। পয়লা-পয়লা মনে হত, ওটা একটা খেল্‌নার মত। পুরুষেরা নিয়ে খেলে। আমার পয়লা বিয়ের দিনগুলো স্মরণ করলে এখন হাসি পেয়ে যায়। লোকটা পাগল নাকি? সারারাত ধরে এত সব কথা বলে ঘুমাতে দেয় না। আর ঘুরেফিরে একটা কথা ত তিরিশ বার ফিরে আসত : তোমাকে ভালবাসি। আমি হি-হি হাসতে গিয়ে থেমে যেতাম। কত রকমের পাগল-বুলি না ফিস্‌ফিসানিতে উচ্চারণে অন্ধকারে ভরে থাকত।

লালবানু...

কী...

ঘুমিয়েছ...

হ্যাঁ...

আরো কাছে সরে এসো...

মা-কে বলে দেবো...

বয়স ছিল কম। এখনও মনে মনে হাসি আর আফশোস হয়। লোকটাকে আমার তবু ভাল লাগতে শুরু করেছিল, যদিও রাত-ভর ঘুমোতে পারতাম না তার জ্বালায়। আজ ওলট-পালট হয়ে যায়। পুরাতন দিনের কথা টুকরো-টুকরো ভেসে চলে, পান্‌কৌড়ির মত তারপর হঠাৎ ডুব মারে। ধরার চেষ্টা করলেও শুধু পানির ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বাতাস নিতে উপরে নাক জাগাই। আর কোথাও কিছু দেখি না। জলের বহর ঢেউ হয়ে কোথায় যেন অন্ধকারে মিলায়...

লালবানু...

তোমার বুক বড় নরম, ভেতরটা শক্ত...

কী সব পাগলের কথা....

উলঙ্গ শরীরের লড়াই ত নয়, এক-তরফা ধ্বস্তাধস্তি। লোকটা-কে আমার ভাল লাগতে শুরু করছিল। শিশুর বোল ফুটতে বছর পার হয়ে যায়। আমার বেলা ত বছরের পর বছর— উঃ! কতদিন পেরিয়ে গেল। যেন অবোধ শিশু হয়েই ছিলাম পুরাতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে। নচেৎ এত জ্বালা-যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়? ভয়ে নিঃসাড় হয়ে যায় কথা বলার ক্ষমতা। আমার ভেতরে সেই রাক্ষস ছিল। এত বছর লেগে গেল তবে ওটা মরল। আমার পেরথম স্বামীর জন্যে বড় দুঃখ হয়। বেচারা! তার অনেক-অনেক বুলি সবই প্রাণ-থেকে খসে-পড়া, ঝরে-পড়া। আমার কাছে হয়ে দাঁড়াত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। এমন-ই হয় দুনিয়ায়, একের ডাকের ভাষা যখন অপরে বুঝে না। আহা, বেচারা! তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল ঘটকের দৌলতে। কিন্তু পেছনে একটা ব্যাপার ছিল। মা-চাচিদের আলাপ থেকে শোনা। আমি ত লজ্জায় মরে থাকতাম। আর ভয় ছিল রাজ্যের। বাপ-মা ছেড়ে কোথায় চলে যাব? শ্বশুর-বাড়িতে মেয়েরা মারধোর খায়। মরদ পেটে, শাশুড়ি পেটে। এসব ত নতুন কিছু নয়। ভয়ে হাত-পা বুকের ভেতর সেঁধিয়ে যেত। আমার দুলা-মিয়া নাকি আমাকে দেখে পছন্দ করেছে খুব। তারপর নাকি ঘটক পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমাকে দেখল ক্যামনে? দু-তিন কোশ দূরে ওদের গাঁ। আর আমি ত নিজের পাড়া ছেড়ে আর কোথাও যাই নে। লোক-মুখে শুনে অনেকে দিওয়ানা হয়ে যায়। পুঁথির কাহিনীর মত একটা কিছু হবে। বাপ মত দিতে দেরি করেননি। ওদের অবস্থা খুব ভাল। জোত-জমি ছাড়া গঞ্জে কারবার আছে। যৌথ পরিবার। ভাসুর-দেবর করে জমজমাট বাড়ি। পাওনার কোনো দাবি ছিল না ওই তরফ থেকে। বেশ কয়েকখান গহনা পেয়েছিলাম। আজ খোয়াবের মত পুরাতন ছবি দেখতে পাই। আমার পেরথম দুলামিয়া হয়ত দিওয়ানাই হয়েছিল। শত কথা বলত। আমি ত জবাব দিতে পারতাম না। এমন-কী বিয়ের পাঁচ-সাত মাস পরে। শ্বশুর-বাড়ি দু'বার গিয়েছিলাম। সকলের ব্যবহার খুব ভাল পাই। এক ছোটো ননদ ত আমাকে ফূর্তির ভেতর রাখতে কতো ফন্দি না করত। শাশুড়িও মাটির মানুষ। এমন বড় গেরস্থ ঘরের গিন্নী কিন্তু দেমাগ ছিল মনে হয় না। বড় আদর করতেন। শাশুড়ির কানেও হয়ত গিয়েছিল, আমি কম কথা বলি। তিনি ওদের শুনিয়ে বলতেন, "ছেলেমানুষ, সরম বেশি। কয়েকবার যাতায়াত করুক, তহন দেখিস ওই মুখে কত কথা ফুটব। অহনই কাইজ্যা শুরু করব নাকি তোগোর লগে? কাইজ্যায় অনেক কথা হয়। তোরা কি চাস নতুন বউ কোমরে কাপড় বাইন্দা ফ্যাসাদ করবো?" এই ধারা কথায় শাশুড়ি আমাকে দেবর-ননদের ছোঁ থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। ওকে আমার গোড়া থেকেই খুব ভাল লেগেছিল। পরে কী হত খুদা জানে। কিন্তু নসিব ত আর এক দিকে ধাইল। ওই বাড়ি আমার কাছে হারাম হয়ে গেল। আর দুলা-মিয়া? সে-ও আর আমার দুলা রইল না। পিছলে যেতে লাগল সব কিছু আমার নাগাল থেকে। তখন আমি দিশেহারা হইনি। দিশেহারা হয় মানুষ যখন একজনের উপর নিজেকে সামাল দেওয়ার ভার থাকে। যখন তা থাকে না তুমি ত স্বাধীন। কিন্তু সত্যি কি স্বাধীন? খড়কুটো ভেসে যায় নদীর স্রোতে। তারা কী স্বাধীন? এক সময় আমার সে-ই দশা ছিল। বাপ-মা যা করে তা-ই ত আমার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা বলে কিছু আছে নাকি? যদি থাকেও তার কোনো দাম নেই। জোর হুঙ্কারের নিচে অন্যান্য সব নিচু গলার শব্দ-ঝঙ্কার তলিয়ে যায়। আমিও তলিয়ে যেতাম। এমন সময় গোস্বা হতে পারে, দুঃখ উপ্‌চে উঠতে পারে। কিন্তু আমার কিছুই হত না। আমি নিঃসাড় যেন একটা কিছু। বোবা জানোয়ারেরা কসাইয়ের ছোরা শান দেওয়া দেখে কী ভয় পায়? কিছু কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝে? জবাই করার সময় অবিশ্যি ব্যা-ব্যা চিৎকার করে। সে ত দেহের উপর জুলুমের জের। কয়েকজন যখন তাদের পাছ্‌ড়ে মাটির উপর ফেলে, তখন স্বাভাবিক অবস্থার রদ-বদল ঘটছে এবং দেহে যন্ত্রণা হচ্ছে। তার ফলে, চিৎকার করা ত ভাবনার ফল নয়। ছাগল কী আদৌ কিছু ভাবে এইভাবে জবাই হয়ে যাওয়ার পূর্বে? আমি বলতে পারব না। আমি মুরুক্ষু গাঁয়ের মেয়ে। পণ্ডিতেরা কী পারে? হাজার ইলেম তাদের। বাপ-মা মুরুব্বিরা আমার হয়ে সব ভাবনা করে। আমাকে আর ভাবতে হয় না। তাই নসিবের রাস্তা নানা অলিগলি তৈরি করে এগিয়ে যাচ্ছিল। যখন আমি নিজের নায়ের হাল নিজে ধরতে শিখলাম, তখন গলুই আর এদিক-ওদিক হতে পারে না। কব্জির এত দাম আমি পূর্বে জানতাম না। অবিশ্যি কব্জি যখন নিজের তাঁবে থাকে। গতরে রক্তের চলাচল আছে হাত-মুখ-পা সবই সচল, তবু তুমি পুতুলের বেশি আর কিছু নও। যে তোমাকে দম দিয়ে ছেড়ে দেয়, সে শুধু মজা দেখে। এই দম দেওয়া যখন আর কারো হাতে থাকে না, তুমি নিজেই নিজের কলকব্জা চালাও, তখন আর তুমি পুতুল নও। পেছনে তাকাই। ধিক্কার দিতে হয়। এমন ছিলাম কেন? পুতুলের ছায়ায় আমার বসবাস। পুড়ে-পুড়ে খাঁটি হয় নাকি সব ধাতু। মানুষের জন্যেও কী তা-ই বরাদ্দ? নানা কথার দুদ্দাড় দৌড় আমার বুকের মধ্যে। মাথা গরম হয়ে ওঠে। বুকের ভার আমি হাল্কা করতে চাই। তাই পাড়াগাঁর এক অধম মেয়ের কাহিনী শুনুন। অনেক রকম বাঁক আমার এই নদীর। বুকে বালুর চড়াও কম নয়। তবু পাশেই শীতল পরিষ্কার পানির ঝিলিমিলি। তাই বাঁচার সাধ নতুন করে আবার ফিরে পাই। আমার পেরথম দুলা-মিয়া কী গোড়ায় তেমন বীজ বুনেছিল? তাকে আমার ভাল লাগতে শুরু করে। তারপর যা-কিছু আঁকড়ে ধরে টাল-সামাল দিতে যাই— সবই পিছলে যেতে লাগল নাগালের বাইরে, চোখের বাইরে। খারাপ-খারাপ আর ভয়ঙ্কর 'খাব' দেখার পর আমি জেগে উঠলাম...

AMARBOI.COM

দুই

আবদুল জব্বার হাওলাদার বেশ ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলেন। সেদিন গরুর গাড়িতে ওঠার আগে বাড়ির আঙিনায় লালবানুর গলা জড়িয়ে তিনি বললেন, "মা রে, অহন আহি।" শক্ত মানুষ হাওলাদার। মেয়েকে আর কখনও এমন আদর করেছেন তাঁর মনে নেই। মেয়ে ত অবাক। বাপের অসুখ নিশ্চয় খুব কঠিন।

কঠিন ত বটেই। নচেৎ গাঁয়ের ডাক্তার সারাতে পারল না কেন? দু'মাস থেকে চিকিৎসা-বাবদ অনেক টাকা উড়ে গেল। দরগার পানি-পড়াও বাদ যায় নি। কিন্তু রোগ সারল না। প্রথম-প্রথম পেটে ব্যথা ধরত। গাঁয়ের ডাক্তার তেমন পাশ কিছু নয়। নেই মামার চেয়ে কানা মামার খাতির। ভদ্রলোক বুড়ো হয়ে এসেছেন। তবে হাত-যশ আছে। আশপাশের গাঁয়ে তেমন ডাক্তার নেই। পাঁচ-ছয় বর্গ মাইল জুড়ে এই এক জনের জীবিকা চলে যেত। বহু বছর ডাক্তারের কেটে গেছে এই এলাকায়। শেষে তিনিই রায় দিলেন, কোনো বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ এখান থেকে

দশ-বারো মাইল দূরে নদীর ধারে গঞ্জ, সেখানে ভাল ডাক্তার আছে, তার কাছে যাও। রোগির জন্যেও বড় দুঃখের বিষয়, তা ব্যাধির চেয়ে মারাত্মক। কারণ, এই পথে এক গরুর গাড়ি ছাড়া আর অন্য যানবাহন নেই। ভাড়া যাতায়াতে পঞ্চাশ টাকা। তারপর যদি দুই দিনেও ডাক্তারের কাছ থেকে ছাড়-রফা না মেলে, গাড়োয়ানের খোরাকি গচ্চা দাও। জব্বার হাওলাদারের নিজের আহারের জন্যে খরচে কোনোদিন পেছ্‌পা ছিল না। কিন্তু রোগের জন্যে এত ব্যয়! হাজার বিরক্তি ছেঁকে ধরলেও সমস্যা গুরুতর। ঘাব্‌ড়ে গেলেও হাওলাদার মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। মনে মনে হিসাব করেন জমি-জিরাৎ কিছু ছেড়ে দিতে হবে। তা দিতে হলে হবে। আগে প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা।

লালবানু বাপের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস পেত না। সেদিন তার কাতর আঁখি পুরাতন অভ্যেস কাটিয়ে উঠেছিল। হাওলাদার নিজের রোগের কথা ভুলে যান নি। কিন্তু তাঁর যন্ত্রণা অন্য দিক থেকে এসেছিল।

দূর পথ। অসুস্থ শরীর। একা যাওয়া ঠিক নয়। সঙ্গে ছোট ভাই হেদায়েত যাবে। সে-ও গাড়িতে উঠেছিল সেদিন।

লালবানু পরে মায়ের সামনে কান্না রোধ করতে পারে নি। বাপ ছাড়া সে নিজের কথা ভাবতে অক্ষম। অবিশ্যি বাপ-কে নিজের বা প্রতিবেশীর মামলা-মোকদ্দমায় পাঁচ-সাত দিনের জন্য কতো বার সদরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সেই যাওয়া আর এই যাওয়ার মধ্যে তফাৎ অনেক। সড়কে গরুর গাড়ি যদ্দুর দেখা যায়, লালবানু তাকিয়ে রইল।

গেরোর ফের নানাভাবে শুরু হতে পারে। ওষুধ-পত্র কেনা এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে গঞ্জের ডাক্তার ছিল না। একদিন পরে কর্মস্থলে পৌঁছল। তার কাছ থেকে যে-রায় পাওয়া গেল তা যে-কোন লোককে মুষড়ে দিতে যথেষ্ট। এই ডাক্তার বললে, রোগির ঢাকা শহরেই যাওয়া উচিত। বোধহয়, পেটে টিউমার জাতীয় কিছু হয়েছে। ওখানে সঠিক বলতে পারবে পরীক্ষার পর।

ওষুধ নিয়ে হাওলাদার গাঁয়ে ফিরেছিলেন। ব্যথা দুদিন আসেনি। তিনি ভেবেছিলেন, বোধহয় গঞ্জের বড় ডাক্তারের ওষুধেই সেরে যাবে। কিন্তু তৃতীয় দিন ব্যথা এমন জেঁকে এলো যে সে-ধারণা নিমিষে চুরমার হয়ে গেল। ঢাকা না গিয়ে উপায় নেই, যদি বাঁচতে হয়।

ডাগর ডাক্তার মানে ডাগর খরচ। লজ্জায় মাথা কাটা গেলেও হাওলাদার কয়েক বিঘা জমি বেচে দিলেন। পাড়াগাঁয়ে অবস্থাপন্ন গেরস্থ যখন পড়তি-দশার দিকে যায়, তখন অনেকে সামনা-সামনি সহানুভূতি দেখালেও পেছনে হাসে। হাওলাদার তা জানেন। এক কালে পাটোয়ারীদের জমি তিনি এইভাবেই খরিদ করেছিলেন। মনের ভেতর ছিল তখন অশেষ তৃপ্তি। একজন সমান জোট-বলের প্রতিদ্বন্দ্বী কমে গেল। কুস্তির ময়দানে তা-ই নিয়ম। হাওলাদার জানতেন না তেমন ভিয়েনে তারও সিদ্ধ হওয়ার মওকা আসবে। অনেক জমি ত এইভাবে সম্পত্তিভুক্ত। গাঁয়ে এক কথা চালু আছে : একবার বেচারাম গেরস্থ ঘরে ঢুকলে নাকি লক্ষী ছেড়ে যায়। হাওলাদার তা বিশ্বাস করতেন এবং মনে প্রাণে। আর যখন কেনারাম ঢোকে, তখন সব দিন উজালা হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে বেচারামকে প্রশ্রয় না দিলে আর প্রাণে আরাম পাওয়া যায় না। অবিশ্যি শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাটোয়ারী কেন দেশ-বিভাগের সময় অন্য প্রতিবেশীর জমি তিনি পানির দরে কিনেছিলেন। তখন ছোট ভাই হেদায়ত ভাল পরামর্শদাতা। অথচ সে জমি-জিরাতের লোক নয়। কিছু নির্ঝঞ্ঝাট ফূর্তি আর আহার পেলেই সে খুশি। কিন্তু সেই সময় হেদায়েতের বিষয়-বুদ্ধি বেশ খুলে গিয়েছিল। গরজ যখন বিক্রেতার তখন দাম আর উঠবে কেন? অনেকে জমিজিরাৎ বেচে আর কোথাও চলে গিয়েছিল। বহু ভিটে তার সাক্ষী। এক-আধজন বুড়োবুড়ি আছে হয়ত, নচেৎ সন্ধ্যার পর নির্জনতা সব গ্রাস করে। বিপদে পড়ে হাওলাদারের নিকট অনেক পুরাতন স্মৃতি ছুরি হয়ে গায়ে বিঁধতে লাগল। কিন্তু নিরুপায়। জমি বেশ কিছু বেরিয়ে গেল। হেদায়েতের মনে তখন আর একবার বিষয়-বুদ্ধি চেগেছিল। কিন্তু অসুস্থ অগ্রজের সামনা-সামনি আর কিছু বলতে সাহস করে নি। আর তার জমি ত বাপ বেঁচে থাকতে-থাকতে আলাদা করে দিয়েছিল। জমির দেখা-শোনা বড় ভাই করে। কিন্তু দলিল দস্তাবেজ সব তার নামে। আর বছর-বছর খাজনা দেওয়া হয় কি না, তার জানা থাকে। কারণ, সরকারের কাচারিতে সে-ই যায় বছরে একবার।

এক কথায়, সম্পত্তি অনেক বেরিয়ে গেল। মোটামুটি খোঁজ নিল হাওলাদার। শহরের হাসপাতালে ভর্তি হলেও অনেক খরচ রোগিকে বহন করতে হয়। যদি অপারেশন লাগে, তার জন্যে ডাক্তারের খাঁইয়ের উপর সব নির্ভরশীল। কে কত হাজার হাঁকবে আল্লা-কে মালুম। সঙ্গে টাকা রাখতে হয়। অবিশ্যি ঢাকায় কয়েকজন আত্মীয় আছে, তাদের বাসায় প্রথমে উঠে খোঁজ-খবর নিলেই হবে। হাওলাদারের এক আত্মীয় গাঁয়ের সব সম্পত্তি বেচে ঢাকায় উঠে গিয়েছিল। সে আর ভিটেমুখী হয় না। সুখেই আছে। এটা-সেটা করে কপাল ফিরিয়ে ফেলেছে। প্রদেশের রাজধানী। দেশ বিভাগের পর ক্রমশঃ প্রসার-মুখী। জমি-জায়গার দাম বেড়ে গেছে। তার আত্মীয়ের এই দূরদৃষ্টি ছিল। সে তা-কেও তখন পরামর্শ দেয় ধীরে ধীরে গাঁয়ের বাস উঠিয়ে ফেলতে। কিন্তু হাওলাদারের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। আর হেদায়েত ত অন্য ধাঁচের লোক। এই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে তার মন বসবে না। অনেক প্রতিবেশী চিরতরে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। কী করে যায় তারা। হেদায়েত সেদিন ভাবতে পারেনি। হঠাৎ এই বিপদে অগ্রজ হাওলাদারের জমির আয়তন কুঁচকে আসতে সে-ও বেশ চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল।

এবারও মিয়াভায়ের সঙ্গে তার শুরু হল ঢাকা-প্রবাস। গঞ্জের ডাক্তার ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। পেটে টিউমার ছাড়া অন্ত্রনালী-জড়িত আরো জটিল ব্যাধি জব্বার হাওলাদারের। অপারেশান অবিশ্যি জরুরি। এবং ডাক্তার রায় দিলেন, তাড়াতাড়ি করা উচিত। খরচ প্রচুর। এমন প্রচণ্ড ধাক্কা আবদুল জব্বার হাওলাদারের বুকে আর কখনও লাগেনি। গাঁয়ে কেন শহরেও হাসপাতাল সম্পর্কে যে-সব কিংবদন্তী আছে তা হাওলাদারের শোনা বৈকি। একবার তিনি ভেবে ছিলেন, তাঁর গ্রামে ফিরে যাওয়াই উচিত। সেখানে যা-হয় হোক। টেবিলে রোগি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে যখন ডাক্তার তার ছুরি চালায়। এই অবস্থায় মৃত্যু হলে কেউ দায়ী হয় না। অপারেশনের পূর্বে নাকি তাই একটা কাগজে সই করে দিতে হয়। হাওলাদার কিন্তু বাইরে কোন দুর্বলতা প্রকাশের বান্দা নন। টাকা আরো কয়েক হাজার প্রয়োজন। আত্মীয়ের কাছে চাওয়া যায় না।

জমি তা-কেই বিক্রি করা যেত। কিন্তু সে শহরবাসী। গাঁয়ের সঙ্গে সুবাদ রাখা তার মনপূত নয় আর। তাই ছোট ভাইকে অমোক্তার-নামা দিয়ে গ্রামে পাঠাতে হলো আর কিছু জমি-বিক্রির জন্যে। আত্মীয় ভদ্রলোক পরামর্শ দিয়েছিল, "তোমার শরীর নিয়ে আর অত নড়াচড়া ভাল নয়। যাতায়াতের কী হাংগামা। পায়ে হাঁটো, নৌকায় চাপো, বাসে চাপো, ট্রেন ধরো। এই সব ঝামেলার দুঃখেই গাঁ-ছাড়া। নচেৎ বাপ-মার ভিটে কেউ সহজে অন্ধকার করে চলে আসে?" বিশেষ ঠেকার মধ্যে হাওলাদার এই সব বাণির মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিলেন। অসুস্থ শরীরে আরো বেশি অনুতাপ ঘিরে ধরেছিল তাকে। সেই ত শহর ছাড়া শেষ পর্যন্ত চলে না। তবে আর বাপ-মার ভিটে-ভিটে করে এত হাপিত্যেশ কেন?

হেদায়েত ফিরে এসেছিল যথা-সময়ে। জমির দাম খুব খারাপ পায়নি এবার। তাদের জমি কিনেছে গাঁয়েরই এক লোক। তার শহরে প্রচুর সম্পত্তি আছে। অবাক হয়েছিলেন, হাওলাদার ভায়ের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে। তিনি যখন শহর-মুখী তখন অনেক শহরবাসী গ্রাম-মুখী। হদিস ধরতে পারেন নি হাওলাদার। অসুখ সেরে উঠুক। তখন ভেবে দেখার সুযোগ মিলবে। কিন্তু এখন আর পূর্বের মত সম্ভব নয় নতুন পত্তন। শহরে জমির দাম এত বেড়ে গেছে যে গাঁয়ের জমি নিঃশেষ করে এখানে এক বিঘা কেনা অসম্ভব। এমন হাজার বিক্ষিপ্ত চিন্তায় জেরবার ছিলেন হাওলাদার সাহেব। তবে ভাইকে মাটির দরে জমি বেচতে হয়নি, তার জন্যে খোদার কাছে হাজার শোকর। এখন ভালয়-ভালয় অপারেশনটা হয়ে গেলে অন্য চিন্তা করার বহুৎ মৌকা মিলবে। মৃত্যুচিন্তা এমন ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে টুঁ দিত বৈকি। হাওলাদার তার চেয়ে অসোয়াস্তি বোধ করত যখন পয়সা বেরিয়ে যেত বেপথে। নামে হাসপাতাল। অথচ দাওয়াই কিনতে হয় রোগিকে। তার উপর ডাক্তারকে ফী বাবদ দিতে হয় বাড়ি গিয়ে। আত্মীয় আশ্রয় দিয়েছিল। সে শহরবাসী। তাই অনেক কম ধকল গেল। নচেৎ আরো কতো ভোগান্তি না হত। পয়সাও বেরিয়ে যেত অনর্থক। বেচারা হেদায়েতের দৌড়াদৌড়ি গেল অনেক। অগ্রজের উপর সে অনেকখানি নির্ভরশীল। অবসর-পুষ্ট জীবনে তার একটা দিক গড়ে উঠেছিল। তার মূলে এই আবদুল জব্বার হাওলাদার। তাছাড়া গ্রামে মান-ইজ্জৎ সবই ত তার দৌলতে। হঠাৎ কিছু যদি নড়চড় হয়ে যায়, বিপত্তি বেধে যাবে নানাভাবে। যেহেতু জমি বর্গা দেওয়ার ব্যাপারে সে সোজাসুজি জড়িত নয়, গাঁয়ে তার বিরুদ্ধে কারো কিছু আক্রোশ ছিল না। সকলের কাছে ছোট-মিয়া নামে পরিচিত, তার মর্যাদা বরং বড়মিয়ার চেয়ে বেশি। তবু জমি-বিক্রির সময় হেদায়েতের মনে এক ধরনের অসোয়াস্তি দেখা দিয়েছিল। তার হদিস সে দিতে অক্ষম। কিন্তু তা আছে। হাসপাতালের খাবার অখাদ্য। সেদিকে আত্মীয় ভদ্রলোকের নজর ছিল। দুপুরে তার বাড়ি থেকে রোগির আহার যেত। বাহক হেদায়েত হাওলাদার। আবাদের মৌসুম তখন। নিজেরা গাঁয়ে থাকলে খরচ কম হত। বেশি ফাঁকি দিতে পারত না কামলারা। কিন্তু দোসরা উপায় ত নেই। অসুস্থ এবং ঘোরতর অসুস্থ শরীরের সামনে অন্য কিছুর জন্যে বিবেচনা অবান্তর।

যাক, ভালয়-ভালয় অপারেশন শেষ হয়। তবু আট-দশ দিন হাসপাতালে থাকতে হলো হাওলাদারকে। তারপর গ্রাম-অভিমুখী। যেন নতুন জন্ম হাওলাদার সাহেবের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেটের উপর অপারেশনের লম্বা-লম্বা দাগ তিনি গেঞ্জি তুলে কতো জনকে না দেখালেন। "সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।" এই ধারায় বেশ কিছু দিন ধরে প্রায় ধূয়া তুলতেন। হাওলাদারের শরীরে আর কোনো শেকায়েৎ ছিল না। কিন্তু পূর্বের তন্দুরস্ত কাঠামো গায়েব। লোকে বলাবলি করত, এক মাস হাসপাতালে থেকে বড়মিয়া কাহিল হয়ে গেছেন। কিন্তু হাওলাদারের অসোয়াস্তির বীজ পোঁতা হয়েছিল অন্যত্র। পুরাতন ঠাট-বাট রাখা দায়। জমি বহুৎ চলে গেছে। তা পাঁজর খসে যাওয়ার মতন। আরো কাঁটা তখন বুকে ক্রমশঃ বিঁধছিল। মাথার উপর ত পাহাড় চেপে বসছে। মেয়ের শাদি দিতে হবে। বাড়ন্ত চেহারা। বেশি দেরি করলে পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দেওয়া দায়। শুধু বয়সের অজুহাত তুলে পাত্রপক্ষ হটে যাবে। দুলা পাওয়া তখন কঠিন হয়ে পড়বে। লালবানুকে বিদায় করা উচিত। এক অসুখ থেকে ওঠার পর আর এক অসুখ। এবং তার ছোবল সামান্য নয়।

দুলা-পক্ষ কনের পিতার উপর চাপ না দিলেও অন্য ঝামেলা আছে। মজ্‌লিসে লোকজন দেখতে চায়, কে কী জেওর দিল। অন্যান্য যৌতুক কী ধরনের। এখানে পূর্বপুরুষেরা ওঁৎ পেতে থাকে। বংশ-মর্যাদা আছে প্রত্যেকের। সেই হিসেবে আদান-প্রদানের ফিরিস্তি খাড়া হয়। হাওলাদার এখানে বেশ বিব্রত এবং ক'দিন ঘুমই ধরত না তাঁর ঠিকমত। গাঁয়ের মানুষের কাছে মাথা নিচু করা তাঁর কাছে রীতিমত অবমাননার সামিল। এই অবমাননা শুধু তাঁর নয়, উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের মুখে কালি-ছিটানোর ব্যাপার। তা কী সম্ভব? এসব ছাড়া অতিথি ও গ্রামবাসী কুটুম্ব ইত্যাদির খাওয়ানোও এক সমস্যা বৈকি। দিন দিন জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। খরচ কম হবে না। গ্রামে ঘনবসতি চার-পাঁচশ' লোকের বন্দোবস্ত। এসব কোনো কিছুই সমস্যা নয়, যদি পকেট ভরা থাকে। সেখানেই ত বাগড়া। শেষে জমির উপর আবার হাত পড়বে। আবার পাঁজরের উপর হাত নয় শুধু তা খসিয়ে অঙ্গ-ছাড়া করে ফেলতে হবে। পূর্বপুরুষরা জমি করে গিয়েছিল। কুলাঙ্গার অধঃস্তনেরা তা অপরের হাতে তুলে দিচ্ছে। শয়তান বেচারাম ঘাড়ে সওয়ার। নামানোর উপায় নেই। হাওলাদার একবার ভেবেছিলেন, জমিন কারো কাছে বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এই শুভ কাজ সমাধা করার। কিন্তু বন্ধক আরো অবমাননাকর। চাষবাসে ফসলের তেমন প্রাচুর্য থাকলে সাহস করা যেত, হাজার খুৎখুতানি সত্ত্বেও। কিন্তু জমির ফসল ত বাড়ে না। পুরাতন কালের জমি, প্রায় উনো-ফসল। দুনো হওয়ার স্বপ্ন না দেখাই ভাল। হাওলাদার অগত্যা জমি বেচতে শুরু করলেন। এখানেও বাজার প্রথা-পরিত্যাগে অক্ষম। গরজ বিক্রেতার। অতএব ক্রেতার পোয়াবারো। অনেক জমি বেরিয়ে গেল বড় হাওলাদারের। ছোটভাই এবার প্রচণ্ডভাবে শঙ্কিত। শেষে তার জমির উপর কোপ পড়বে না ত, যদি আর একটা কোন বিপত্তি পরিবারের উপর এসে পড়ে। মিয়াভাইয়ের মত তারও ত অসুখ করতে পারে? বিপত্তির ধরন কী হবে কে জানে? বিয়ের খরচের ব্যাপারে অবিশ্যি হিদু হাওলাদার থুথু দিয়ে চিঁড়ে ভেজানোর পক্ষপাতী নয়। আর মেয়ে ত পরিবারে একটা। প্রথম শাদি। ধূমধাম নিশ্চয় কিছু হওয়া উচিত। আতসবাজি ত তার জিদেই বাদ গেল না। বেফজুল ব্যয় এমন আরো কিছু জুটল। ছোটভাইয়ের শখ। অন্যদিকে মান-ইজ্জতের সওয়াল। বড় হাওলাদার একে

একে সায় দিতে লাগলেন। ফলে, খরচের তালিকা বেড়ে গেল এবং তার চাপ গিয়ে পড়ল জমির উপর। শেষে অবস্থা এ-ই রকম যে বছরের খোরাকের হয়ত অভাব হবে না। কিন্তু যদি খরা-বন্যা বা অন্য কোনো কারণে ঠিকমত ফসল না মেলে, সংসার চালানো দায় হয়ে পড়বে। ব্যাপারটা হাওলাদার বেশ মর্মে-চর্মে টের পেলেন বিয়ের পর। আল্লার যা মরজি তা-ই হবে। শেষ পর্যন্ত এখন নির্ভরতার দিকে ঝোঁক। হতাশার ভেতর পড়ে সব মানুষ, তা-ই করে। অবিশ্যি বিয়ে খুব ধূমধামের সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়। এক বেলা ভাল আহার। গাঁয়ের মানুষ খুব তারিফ করেছিল বৈকি। আর বিয়ের যা আসল আকর্ষণ— দুলা-দুল্‌হিন তার প্রশংসা কে না করবে? যদিও লালবানুকে গ্রামে সকলে দেখেনি; রূপের খ্যাতি কিন্তু মেয়েমহলে বহু দূর গড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে যায়। দুলাও খুব সুশ্রী। আর এক জোতদারের ছেলে। জোয়ান এবং লম্বা চওড়া। লালবানুর সঙ্গী-সাথী কেউ তেমন ছিল না। তাই তার কাছে শ্বশুর-বাড়ির কাহিনী প্রায় নেপথ্যে রয়ে গেল। মা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে যা সামান্য বের করেছিলেন : শ্বশুর কেমন, শাশুড়ি কেমন, ঘরদোরের কী হাল, জমিজমা কতো আছে... ইত্যাদি টুকিটাকি। আর একবার লালবানু শ্বশুর-বাড়ি গিয়েছিল। তারপর ত বাপের বাড়িতেই। জামাই প্রায় আসত। বেশ ফূর্তিবাজ ছোকরা। চাচা-শ্বশুরের সঙ্গে তার বেশ ভাব জমেছিল। অবিশ্যি শ্বশুর-জামায়ের ব্যবধান বজায় রেখে। গাঁয়ের আরো ছেলের সঙ্গে তার খাতির হয়। বিকেলে গল্প-গুজবের ভেতর দল বেঁধে এদিক-ওদিক বেড়ানো ত একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর সড়কে হল্লা করে কেউ যাচ্ছে। এই আলামত কানে পড়লেই পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করত, বড় হাওলাদারের জামাই এসেছে। অনেক সময় ফুটবল খেলায় জিতে অন্য গাঁয়ের খেলোয়াড়সহ লোকজন গেলেও, জামাই-ই নিমিত্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু কোথায় যেন গিঁঠ জড়ো হয়েছিল। লালবানু আর শ্বশুরবাড়ি যায় নি। জামাই নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিত বৈকি। একবার বিয়াই এসে হাজির। দুই প্রৌঢ় জন। হাওলাদার প্রচণ্ড খাতির করলেন দুলার বাপের। যাকে আতিথেয়তায় পুঁতে ফেলা বলা চলে। মেয়ে কেন পাঠাতে পারেন না? মেয়ের বাপ বলেছিলেন, "মিয়াভাই, আমাদের বয়সে মন বড় নরম হয়ে আসে। বুকে আর জোর থাকে না। আপনি ত জানেন, শরীরের উপর দিয়ে কী ঝড় গেল, (এই সময়ে গেঞ্জি তুলে পেটের একাংশ) আল্লা কোনো রকমে হায়ত (আয়ু) রেখেছিলেন, ফিরে এলাম শহর থেকে। নচেৎ গাঁয়ের মাটিতে আর কবর হত না। আল্লাহর হুকুম। আওলাদ (বংশধর) বলতে ওই মেয়ে। কাছ-ছাড়া করতে বড় ভয় হয়...।" এই জাতীয় কথা। তখন অপর পক্ষের জোর কমে আসে। আর জামাই অর্থাৎ ছেলে যখন আসে এবং তেমন তাগিদ দেখায় না, বিয়াই আর কী বলব? পাল্টা অবিশ্যি দিয়েছিলেন তিনি, "পোলার মায়ের শখ। মাঝে মাঝে বউ দ্যাখার মন চায়।" আলাপ-আলোচনার এই খাত বা মাকু ঠেলাঠেলি। হাওলাদার জিতে গিয়েছিলেন।

অবিশ্যি এই রকম খেলার হদিস মেলে অনেক পরে। আসলে হাওলাদারের রসদ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠাঁটবাট হাল-চালের ধারা প্রায় আগের মত। অনেক সময় ভেতরে দুর্বল হলে তা ঢাকার জন্যে মানুষ যেমন গতর ফুলিয়ে দাঁড়ায়— এ-ও ঠিক তেমন। হালেচালে বরং ঝলক আরো বেড়ে গেল। ফলে খরচ। এদিকে ভাণ্ডারে ত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার-রূপার ঝলক নেই। শরীরও আর পূর্বের মত সহায়ক নয়। আহারের দিকে নজর দিতে হয়। যৌবনের বেপরোয়া ভাব ত প্রৌঢ়কালে চালু রাখা নেহায়েৎ জবরদস্তি। হাওলাদার সেদিকে বড় সচেতন ছিলেন। বাজারে নিজেই যেতেন সঙ্গে লোক নিয়ে। কেনাকাটা রুচি-মাফিক। মাছ কিনলে টাটকা সেরা মাছ, দাম যা-ই হোক। অবিশ্যি পরিবার বড় নয়। কিন্তু সাধারণ আহার ত যোগাতে হয় প্রতিদিন আরো দুতিন কামলার। আবাদের সময় পরিবার বেশ বড়। হয়ত চাল বা পয়সা দিয়ে এই ঝঞ্ঝাট থেকে হাওলাদার মুক্ত থাকতে পারতেন, কিন্তু পূর্বপুরুষের রেওয়াজ ভাঙলে লোক কী বলবে? কাতার-বন্দী বসিয়ে জন-কামীনদের আহার পরিবেশনে একটা মাদকতা আছে। হাওলাদার সহজে এখানে মনের সঙ্গে লড়ে বুঝে উঠতে পারতেন না। হেদায়েত এই সময় খুব উৎসাহী। কামীনদের আহার হয়ত নগণ্য। ডাল-ভাতই বলা যায়। ছোট মাছ, কোনো কোনো দিন তরকারির সঙ্গে ডাল, আলু ভর্তা, কোনো শাক। এই মোচ্ছবের উপকরণ। তবু জোতদারের বাড়িতে কেউ রান্না করে খাবে, তা শোভন নয়। অন্দরে লালবানুর মা এবং এই সময় বাড়তি একজনের জায়গায়, আর এক পরিচারিকা থাকত। তারা হিমসিম খেয়ে উঠত বৈকি। তবু এই সব মেহনতের পেছনে ছিল মনের এমন সব সায় যার বহমানতা আরো অতীতের। হাওলাদার ওই সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব তামাসা দেখতেন। কখনও একটা জলচৌকির উপর বসে তদারকি করতেন, ফুঁকতেন তামাক। অপরের জন্যে পাত-পাতা-র আনন্দ তার কাছে কম নয়। কোনো কোনোদিন আনন্দে পরদিনের আহার্য ঘোষণা হয়ে যেত। 'কাল আল্লা চাহে ত তোমাদের গোস্ত খিলামু।' খরচের হিসেব নেই। মনের আনন্দে এমন ঘোষণা। পরদিন আর পেছপা হওয়া চলে না। 'ভাবনা উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'। অর্থাৎ একদিকে তহ্‌বিলের ছিদ্র আরো বেড়ে গেল। এক কথায় বলা যায়। বনিয়াদী রেওয়াজ চালু রাখতে গিয়ে হাওলাদার ক্রমশঃ ভেতরে-ভেতরে দুর্বল হতে লাগলেন। বাইরের লেফাফা-দুরস্তি যথাপূর্ববৎ। লালবানুর শাদির পর শ্বশুরবাড়ি থেকে তাগিদ এসেছিল তাকে পাঠানোর। কিন্তু ওজরের হিল্লেয় সব সোপর্দ। জামাই বেশি জিদ ধরত না। কিন্তু জামায়ের গুরুজন আছে। একান্ন পরিবার। তার মত ত সর্বেসর্বা নয়। শ্বশুর চিঠি লিখতেন এবং লোক-মারফৎ পাঠাতেন। ছেলের শ্বশুর তার এমন বিনীত মোলায়েম জবাব দিতেন যে আর বেশি বলার কিছু থাকত না...ভাইসাব,... আমার শরীরের কথা আপনি জানেন। অপারেশনে ত আল্লার মেহেরবানিতে কোনো রকম বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার ধকল আজও সামলে উঠতে পারিনি। প্রায় মাথায় চক্কর দেয়। রাত-বিরেতে, আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, বেশ ভয় পেয়ে যাই। তবে আল্লা হায়াতের মালিক তাও জানি বৈকি। তবু মনে হয়, জান্ কখন বেরিয়ে যাবে, কে জানে। আল্লা আর ত আওলাদ দিলেন না। ওই একজন। একটি মেয়ে। মরণকালে যেন তার হাতের পানি পাই, এই জন্যে আল্লার দরগায় সব সময় দোয়া মাঙি।— আমি কি বুঝি না, আপনার সংসারে নতুন বউয়ের শখ। বিশেষতঃ বিয়ান সাহেবার। কিন্তু এই গরিবের কথাও মনে রাখবেন। আমি দুলা-মিয়াকে সব সময় বলি, তোমার বাপ-মার বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই গরিরের কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিও আর বল, আমার মনের অবস্থা শরীরের অবস্থা কেমন। আপনারা যদি এই

গরিবের বাড়িতে দুই জনে বেড়িয়ে যান, নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে করব। আপনার এজাজৎ (অনুমতি) পেলে পালকি ও লোক পাঠিয়ে দেব—' ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখতেন হাওলাদার। পাকা মুসাবিদ ছিলেন। বিয়াই-বেয়ান কোনোদিন তার বাড়িতে আসেন না। অবিশ্যি জামায়ের ত না এসে উপায় ছিল না। বাপ মনে মনে ভাবত, ছেলেটা বউয়ের ভেড়ুয়া ব'নে গেছে। কিন্তু দুই পরিবারে ওই ব্যাপার নিয়ে কোনো মন কষাকষি শুরু হয়নি। এমন জায়গায়, ছেলের বাপের না মেয়ের বাপের ইজ্জৎ বড়, তার প্রতিযোগিতা চলে এবং বহু চিড়খাওয়া আত্মীয়তার কাহিনীর উৎস সামান্য কাছি-টানাটানির ব্যাপার।

ইতোমধ্যে বাপ এবং মেয়ের সম্পর্কে নতুন কোনো পরিবর্তন ছিল না। কারণ, লালবানু পিতার ছায়াই বলা যায়। সংসারে টানাটানি কিছু শুরু হয়েছে বৈকি। আয়ের চেয়ে ব্যয় ডাগর। সেই খাদ বেড়েই যায়। হাওলাদার বিয়ের সময় মেয়েকে কিছু গহনা দিয়েছিলেন। এক সময় সেই গহনার উপর হাত পড়ল। 'মা রে হঠাৎ ঠ্যাকায় পড়েছি। তর গহনা দোকানে দিতে আমারই কী ভাল লাগে...?' এইভাবে পিতৃদত্ত গহনা নিঃশেষ। হাওলাদার বলতেন গহনা বন্ধক দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সোজা বিক্রি করে দিতেন। এইভাবে লালবানু নিরলঙ্কার হতে লাগল। অবিশ্যি সে নয়। বরং কাঠের বাক্স। কারণ গহনা ত সেও হরহামেশা পরত না, কোনো উপলক্ষ ছাড়া। আর দুলা আসার খবর পেলে মা নিজেই তাকে সাজিয়ে দিতেন। লালবানু আপত্তি তুলত, এত পরার কী দরকার? কিন্তু মা মেয়ের বারণ মানত না। স্বামীর কাছে এমন সেজেগুজে যাওয়ার কেন প্রয়োজন, লালবানুর তখন অবগতির বাইরে। শ্বশুরবাড়ির গহনা আর ছিল না। জামাই কোনও দিন এই গহনার দিকে কৌতূহল দেখায় নি এতটুকু। সে ত তাকে নিয়েই মশগুল থাকে। যখন ঘুমায় না অজস্র কথা বলে। মাঝে মাঝে হাত-পা এবং আরো-আরো অঙ্গ সক্রিয়। গহনা খোঁজের সময় কোথায়? তার মা অবিশ্যি মেয়ের গহনা-বিলোপের সংবাদ জানতেন, তেমন মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। কারণ, তার জাঁহাবাজ স্বামীর খসলৎ ভাল করে জানা। তবু একদিন ফিস্‌ফিস্ শব্দে মেয়েকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এবার গহনা চাইলে সে যেন পুরাতনগুলার খবর নেয়। অবিশ্যি মেয়ের গহনা দিয়েই এখন সংসারের ফাটল বন্ধ হচ্ছে, তা মেয়ে হয়ত টের পেয়েছিল। কিন্তু সোচ্চার কোনো মতামত প্রকাশ থেকে ত অবস্থান বহু দূরে। নিজের দেওয়া গহনার উপর শেষে হাত দিলেন হাওলাদার। মেয়ে নির্বিকার। অবিশ্যি গহনার বাক্স তার নিজের তত্ত্বাবধানে রাখে মায় চাবি পর্যন্ত। কিন্তু বাপ চাইলে সে গড়িমসি করবে, না ওজর আপত্তি তুলবে? তওবা, তওবা। এমন গুনার কাজে লালবানু অক্ষম। বাপ দাঁড়িয়ে আছে, মেয়ে বাক্স খুলছে নতমুখে। তারপর গহনা বাপের হাতে তুলে দিচ্ছে। তখনও একদম নতমুখ না হলেও, গ্রহীতার মুখের উপর অন্ততঃ পূর্ণভাবে নিবদ্ধ নয়। দাতা শুধু সজীব কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্যে। তার জৈবিকতার সংজ্ঞা প্রসার শুধু ওই সীমানাটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাক্স বন্ধ করার পর চোখে লালবানু দেখত, তার সামনে বা ঘরে আর কেউ নেই। গ্রহীতা কবে উধাও হয়ে গেছে। তার জন্যে দাতার প্রতিক্রিয়া কিছু আছে বলে মনে হয় না।

এই সময় জামাইয়ের লালবানুকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। শ্বশুরের ওজর অবিশ্যি ছিল। কিন্তু তিনি এমনভাবে তা জামায়ের কাছে তুলে ধরতেন যে অন্য পক্ষ আর বেশি দূর এগোত না।

"দুলামিয়া?"

"জী।"

"আমি বুঝতে পারি। তোমার বাপ-মা বুড়ো হয়েছেন ছেলের বউ নাতি-নাতনিরা সব কাছে-কাছে থাকুক। হায়াৎ-মওত কখন কী হয়। সবই ত আল্লার হাত...।"

"জী।"

"আমাদের মত বুড়ো-বুড়িদের জন্যে তোমাদের অনেক অসুবিধে হয়।"

"জী, না।"

"দুলামিয়া, এসব বললে কী কেউ বিশ্বাস করবে? আমাদের মন-রাখা কথা, তুমি যা বলছ। কিন্তু আসল কথা কী জানো, বাপজান, তুমি দোটানায় পড়েছ?"

"জী, না।"

জামায়ের শ্বশুরের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার অভ্যেস কোন কালেই ছিল না। সব সময় এক রকমের অসোয়াস্তি ভাব ভেতরে থাকে। গুরুজনের সঙ্গে বসে ঠিক সমবয়সীদের মত মানসিকতা অর্জন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এই দুলামিয়া তার ব্যতিক্রম ছিল না। হাঁ-না-র পক্ষে কয়েকটা শব্দ যোগ করতেই তার দম বেরিয়ে যেত। অথচ এই জোয়ানই বন্ধুবান্ধব মহলে একদম কড়ার উপর ফুটছে, কথার জায়গায়, খই। শাশুড়ি অন্দরের জীব। তিনিও খুব সহজে জামায়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারতেন না। কেমন আছে তোমার মা-বাজান, বাড়ির ভাই-ভাবী? তাদের ছেলে-পুলেরা কেমন আছে— এমন কয়েকটি কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া শাশুড়ির মুখে আর কোন প্রশ্ন দেখা দিত না। লালবানুকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এই এক সুপারিশের দিক ছিল। কিন্তু সে পথ বন্ধ। জামায়ের অবিশ্যি জানা ছিল না, শ্বশুর এই অবলার স্বামী ছাড়া আর কোন চিজ। দুলামিয়ার বাড়ির দিক থেকে চাপ ছিল বাহুল্য। অবিশ্যি সে-চাপ যে খুব জোরালো তার কোন প্রমাণ নেই। তেমন থাকলে ত একটা ফয়সালা হতে পারত। কিছুদিন পরে জামায়ের মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার বাপ সঙ্গে লোক নয়, পাল্কি-বেহারা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হাওলাদার অনেক ভাবনা-চিন্তার পর পাল্কি ফিরিয়ে দেন। কারণ, তার নিজের স্ত্রীও শয্যাশায়ী। এমন দুর্বিপাকে আর কে কাকে দায়ী করতে পারে? দুলামিয়ার বাপ বেচারা পাল্কি-বেহারাদের দণ্ড গুনেছিলেন। কিন্তু খুব রাগ করেননি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে ঠেকে রইল না। বরং আরো আওড় নিল, সামনে বাধা থাকলে স্রোতের যে-দশা হয়। দুলামিয়ার মা সেই যাত্রা আর আয়ু সঞ্চয় করতে পারেন নি। বউ দেখার জন্যে প্রতীক্ষা-কাল অল্পস্বল্প হলে চলত না, কে জানে, তেমন পূর্বাশঙ্কায় বৃদ্ধা মহিলা খামখা দুনিয়ার কামনা-বাসনা বাড়িয়ে লাভ কী— এমন ভেবে ছিলেন কি না। লালবানুর শাশুড়ির মৃত্যু হাওলাদারকে রীতিমত বিচলিত করে তুলেছিল। তিনি সংবাদ পাওয়ামাত্র আর পাল্কির অপেক্ষা করেন নি। সাত-আট মাইল পায়ে হেঁটে বিয়াইবাড়ি পৌঁছান। দুই বিয়াইয়ে একটা সমঝোতা হয়েছিল বৈকি। পুরাতন কথা। হায়াৎ-মওত মানুষের হাতে নেই। এত তাড়াতাড়ি ত বিয়ান সাবের দুনিয়া ছাড়ার কথা নয়। ছেলের

বউকে দেখার সাধ ছিল। মরার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও নাকি তিনি লালবানুর খোঁজ করেছিলেন। হাওলাদার অনুতাপ শুধু কথায় প্রকাশ করেন নি। কথা বলতে বলতে কয়েকবার ধরা গলায়, এক পর্যায়ে ত কেঁদে ফেললেন। ছেলের বাপ বিব্রত। শেষে পাল্টা বিয়াইকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, "আপনি আর দুঃখ করেন না। নসিবে যা ছিল তা হয়ে গেছে। দুনিয়ার সব সাধ কি মেটে?" হাওলাদার বিয়াই বাড়িতে আর এক দিন ছিলেন। অনেকখান পথ। শেষে পাল্কি চড়েই বাড়ি ফিরেন। খরচ দেখলে ত শুধু হয় না। বিপদে পাঁয়ে হেঁটেছেন। তা কেটে গেছে। শরিফ মানুষ এখন ত আর শরীরের উপর তক্‌লিফের লাঠি ঘোরাতে পারেন না। মানুষের কাছে হাল্কা হয়ে গেলে ইজ্জতের নৌকা ডুবতে থাকে ক্রমশঃ। লালবানুর শ্বশুর অবিশ্যি বিয়াইকে আরো দু-একদিন, বেশি না পারলে, থাকতে অনুরোধ জানান। ঘরে স্ত্রীর শরীর ভাল নয়। কয়েক মাস থেকে এই জের টানতে হচ্ছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে এখন বাড়ি ছেড়ে থাকাই মানে বিপদ, উদ্বেগ। এমন ক্ষেত্রে মন কোথাও গিয়ে বসে না। আর এখানেও এই বিপদের ছায়া। তবে আবার আসার কথা দিয়েছিলেন হাওলাদার। বেয়ান-বুড়ি মরে তাকে কম মসিবতে ফেলেননি। হাওলাদারের আঁচ সত্যি ফলতে লাগল আর অল্প সময়ের ব্যবধানে। বেশি দিন নয়।

একদিন জামাই বাপের পত্র এবং মুখ-জবানি সংবাদ নিয়ে পৌঁছেছিল। তার বাপ বুড়ো। এবার আর বউকে কাছ-ছাড়া করতে নারাজ। হঠাৎ কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না। মা মরে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন হা-পিত্যেশ। অমন আফ্‌সোস! গোয়ালপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয়ে দড়ি ছিঁড়াছিঁড়ি করে। আর তেমন ভুলের না পুনরাবৃত্তি ঘটে। হাওলাদার সবই মন দিয়ে শুনলেন। নিশ্চয় নিশ্চয়। মেয়েকে আর রাখা চলে না। মেয়ের বাপের যেমন সাধ আর শরীর আছে, ছেলের বাপেরও তা আছে বৈকি। খামাখা কেউ বাড়িতে মেয়ে পোষে নাকি? একটার পর একটা বিপদের মুখে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে হাসপাতালে তার অপারেশনের সময় থেকে শুরু। কবে যে কীভাবে শেষ হবে, খুদা জানেন। একটিমাত্র সন্তান। খুদা সেখানেও মেরে রেখেছেন। স্নেহ মায়া-মমতা দুনিয়ায় না থাকলে মানুষ হয়ত অনেক সুখে থাকত। হাওলাদার এমন দার্শনিকতায় বুঁদ অনেক কথা বললেন যার মধ্যে তার ভেতরেও আকুলতা আঁচ করা যায়। কিন্তু তার উৎস কী তা এক অন্তর্যামী বলতে পারে। জামাই অন্য সময় শ্বশুরের কাছ থেকে অবসর পেলেই সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলত, সেদিন প্রমাণ করে বসল সে সত্যি পিতৃভক্ত সন্তান এবং ওদিকের ওকালতি একদম এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে করল যে হাওলাদারের মত ঝানু সাক্ষী কাৎ হয়ে গেলেন। মেয়েকে আর রাখা অন্যায়। মনে মনে বুঝলেন, বেশি ঠেলাঠেলি করলে শেষে আত্মীয়তা হয়ত আর থাকবে না। ছেলের বাপ। এমনিতেও মেয়ের বাপের চেয়ে তার মর্যাদা ঢের বেশি। তার জোর খাটে বেশি। ছেলের উপর চাপ দেওয়া তার পক্ষে সহজ। মেয়ে নিয়ে জোরজবরদস্তির ফলাফল তিক্ত। তাই লালবানুকে পাঠানোর মত দিলেন। তারিখও ঠিক হয়ে গেল। জামাই নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। অবিশ্যি বলে গিয়েছিল, এবার সে আসবে না, অন্য লোক আর বেহারা পাঠাবে পাল্‌কিসহ।

দিন পনের ফরসুৎ পেয়েছিলেন হাওলাদার। মেয়ে পাঠানোর ঝামেলা অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন শাড়ি শুধু মেয়ের জন্যে দিলেই চলে না। জামায়ের মা নেই। একটা লুঙ্গি অন্ততঃ কিনতে হয় বাপের জন্যে। এক বোন আছে এখন ওদের বাড়িতে। যদিও সে বিবাহিত, তাকে শাড়ি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। যাক, সে সব আজকাল সব খুঁটিয়ে নাটিয়ে পালন হয় না। তবু মেলা খরচ। লালবানুর মা মেয়ে-ছাড়া হবেন, সেই বিচ্ছেদের চিন্তা করাও তার পক্ষে এখন কঠিন। বুক বাঁধার চেষ্টা থেকে সবার অলক্ষিতে তাঁকে চোখ মুছতে হয়। মেয়ে আরো কাতর হয়ে পড়বে সেই ভয়ে তার কাছে কোন আদিখ্যেতা প্রকাশ করেন না, বরং উল্টো বলেন, "তোর শাউড়ি তরে দেইখ্যা যাইতা পারে নাই, মা, হে দুঃখ তর হউরের আছে। বুড়া মানুষ। অনেক দোয়া পাবি তার পাশে পৌঁছলে। মুরুব্বিদের দোয়া আখেরে বড় কাজে লাগে, মা।" মেয়ের কানে অবিশ্যি এসব উপদেশ তেমন প্রবেশ করত মনে হয় না। কারণ তার চোখ প্রায় ভিজে উঠত। শ্বশুরবাড়ি ত তার কাছে স্বপ্নের মত দেখা। কোন আকর্ষণ থাকার কথা নয়। সেই বাড়ির চেনা মাত্র একজন : দুলামিয়া। তার হালচাল ইদানিং অত আর খারাপ লাগত না লালবানুর। কিন্তু বাপ-মা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া? লালবানু নিজের ভেতর তলিয়ে যেত। তার হাত-পা হিম হয়ে আসত। এবার দুলামিয়া বহুবার শুয়ে শুয়ে তার বাপের কথা বলেছে। বুড়া মানুষ যদি মরে যায়! বাপ-মা কেউ তাকে দেখল না। গাঁয়ের লোকের ধিক্কারে তার মাথা কাটা যাবে। আর লালবানু কোন মুখ নিয়ে সেখানে সংসার করবে? জা-ননদদের খোটা মিষ্টি কিছু নয়। পয়পয় একই কথায় প্রায় রাত্রের অনেক প্রহর কেটে গিয়েছিল। প্রচণ্ড আদর সোহাগের বন্যা অবিশ্যি লালবানুর জন্যে কখনও অভাব হয়নি। দুলামিয়া ভাল মানুষই মনে হয়। অন্ততঃ ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে আলু-ভর্তা বানানোর কায়দায় কী-কী সব নড়াচড়া করে। তা বোধহয়, পুরুষ মানুষের খসলৎ। তবু লালবানু খাতিরজমা হতে পারেনি। পরের বাড়ি। ভুক পেলে মুখ খুলে চাওয়া নিষেধ। মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, যদ্দিন না নিজের সংসার আলাদা গড়ে ওঠে। যৌথ পরিবার ওদের। বাপ বেঁচে থাকা পর্যন্ত সে সব প্রশ্ন ওঠে না। লালবানুর পক্ষে এমন সব সমস্যা কল্পনাও কঠিন। তবে অতটুকু বুঝত যে পরের বাড়ি বাপ-মার বাড়ি নয়। বিয়ের সময় বাপের বাড়ি ছাড়ার সময় সে সারা পথ ফুঁপিয়ে অথবা নিঃশব্দে কম কান্নাকাটি করেনি। আবার যেন সেই বিপদ ফেরৎ এলো। শাশুড়ি বেঁচে থাকলে হয়ত আরো কিছুদিন আগেকার মত কাটিয়ে দেওয়া যেত। তা আর সম্ভব নয়। লালবানুর সরল মনে এসব বুদ্বুদ হয়ত উঠেছিল। ঘাড়ে খাঁড়ার কোপ পড়ে যাওয়ার পর ত আর চিন্তা করার কিছু থাকে না। মাথার উপর ঝুলন্ত খাঁড়াই সমস্যা। এই সময় তার মনে পড়েছিল গহনার কথা। ভয়ে স্বামীকে কিছু তিনি বলেননি। কারণ, হাওলাদার কুশলী মানুষ। গহনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে বৈকি। বন্ধক আছে, তা ছাড়িয়ে আনার প্রশ্ন। মেয়ের সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথা হয়নি। পাড়াগাঁয়ে এক সময় গহনা ধার পাওয়া যেত। শ্বশুরবাড়ির গহনা বাপ হয়ত কোন বিপদে-আপদে বিক্রি করে বসে আছে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তখন ভর্তুকি দেওয়া। উপস্থিত ঠ্যাকা কাম চালানো। তারপর সুবিধামত আবার গহনা ফেরৎ দেওয়া। হাওলাদার-গিন্নী ভেবেছিলেন, কর্তা এবার তেমনি কিছু করবেন। আর গহনা প্রায় নিঃশেষ। এক-আধ পদ যা আছে, তার

একটাও শ্বশুরবাড়ির নয়। একদম নিরাভরণ ত মেয়েকে পাঠানো অসম্ভব। দু-এক পদ কম। অনেক থাকে। কে আর বসে থাকে সব পরে? চোর-ডাকাতের ভয়ও ত আছে। ফলে, বাক্সবন্দী। লালবানুর মা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। প্রায় নতুন শ্বশুরবাড়ি পাঠানো মেয়েকে। বিয়ে হয়েছে বছর তিন। যদি যাতায়াত থাকত ঘন ঘন, পুরাতন কুটুম, তাহলে একটা কিছু ওজর দিয়ে চালানো সম্ভব ছিল। সেদিন আর পরিস্থিতি সেই পর্যায়ে ছিল না। গহনা ত দূরের কথা কাপড়-চোপড় কিনতে হয় রেওয়াজ পালন অনুযায়ী। তারও কোন তাগিদ দেখা গেল না হাওলাদারের মধ্যে। অথচ দিন ঘনিয়ে আসছিল। স্ত্রীর সঙ্গে কোন সমস্যা নিয়ে আবদুল জব্বার হাওলাদার কখনও আলোচনা করতেন না। মেয়েমানুষ, কতটুকু তাদের আক্কেল। আর সমস্যা সমাধানের তাগিদই বা কতটুকু? খামখা সময় নষ্ট। অন্যদিকে উদ্যমের অপচয়। লালবানুর যাওয়া কিছু দিন পেছিয়ে দেওয়া যায়, সব দিক তৈরি না থাকলে। কিন্তু হাওলাদার তাও করলেন না।

ধার্য দিন সত্যি এসে পড়ল। শ্বশুরবাড়ি ভুলে যায়নি। একটি লোক, বেহারা ও পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার আগের দিনেই লালবানুর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দৈবাৎ দুর্ঘটনা, না যোগ-সাজসের ফল এই পরিস্থিতি। তা অনুমান করার মওকা কোথায়? অসুখ-বিসুখ ত কারো হাতে নয়। ডাক্তার এসেছিল গতকাল। পাড়ায় পাড়ায় হাওলাদার-গিন্নীর অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছতে বেশি দেরি হয় না। তিনি ত হেঁজিপেজি লোকের স্ত্রী নন। এই গাঁয়ের মোড়ল-মুরুব্বি ঘরের বউ। হাওলাদারের অবস্থা পড়ে যেতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে বংশ-মর্যাদা ত আর খাট হয়ে যায় নি। হাতির বাচ্চা হাতি-ই থাকে বুড়া কালেও। বংশ-মর্যাদার ক্ষেত্রে জীবজন্তু এক। হাওলাদার বেশ বিব্রত, পাল্কির সঙ্গের লোকটিকে সব আহওয়ালের বয়ান দিলেন। এমন বিপদে মানুষ পড়ে না এক আল্লার মেহেরবানি থেকে খারিজ না হলে। তিনিই মসিবৎ পাঠান। বিয়াই সাহেবকে নিজের চোখে সে দেখে গেল যেন গিয়ে সব বলে। হাওলাদার সাহেব এক ছোট চিঠি লিখে দিলেন লোক মারফৎ। পাল্কি ফিরে গেল। অনর্থক এই খরচ। লালবানুর শ্বশুর কিন্তু এবার একদম চুপচাপ থাকলেন না। বিয়ায়ের কাছে পত্রযোগে জানালেন, হাওলাদার-গিন্নী সুস্থ হলেই যেন তিনি মেয়েকে পাঠাতে বন্দোবস্ত করেন। এবার তিনি পাল্কি পাঠাবেন না। তার নিজের ছেলে যাবে এবং যেদিন আসা সম্ভব হয়, সেদিন ওই এলাকার পাল্কিযোগে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরবে। এক চিঠির মধ্যে তিনবার উল্লেখ আছে। "এবার আর কোন ওজর আপত্তি তুলিবেন না, যদি সম্পর্ক রাখিতে চান।" রীতিমত অবমাননাকর এই সুর। কিন্তু হাওলাদারকে হজম করতেই হল। কাঠগড়ায় তার জায়গা। সেখান থেকে উচ্চবাচ্য করা চলে না। লালবানুর মার অসুখ লেগেই রইল। কিন্তু তা আর কোন বায়না হতে পারে না।

বেশ দু-এক মাসের ব্যবধানে একদিন জামাই এসে হাজির। তার উদ্দেশ্য এবার শুধু শ্বশুরবাড়ি আসা নয় শুধু বাবার হুকুমও সঙ্গে তামিল করা। শ্বশুরকে ত জানানোর প্রয়োজন ছিল না। জামাইকে দেখামাত্র হাওলাদার সাহেব সব বুঝেছিলেন। 'হঠাৎ এসেছ তুমি। দু-একদিন থাকো। তারপর শুভদিন দেখে তুমি সওয়ারি নিয়ে বাড়ি যাও।' হাওলাদার মন্তব্য করলেন। জামায়ের বৃদ্ধা জননী বধূ-মুখ না দেখেই পৃথিবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্যাগ করেছেন, সেই পুরাতন স্মৃতির উল্লেখ পর্যন্ত বাদ গেল না শ্বশুরের মুখ থেকে। আল্লাহর যা মরজি তা-ই হয়। মানুষের হাতে কোন চারা নেই। রাত্রে লালবানুর কাছে আবেদন করেছিল সে যেন বাপ-মার উপর চাপ সৃষ্টি করে। প্রায় বোবা ছিল যে একদিন সে তবু স্বামীর মতো আজকাল দু-চার কথার জবাব বা প্রস্তাবে সাড়া দেয়। কিন্তু বাপ-মার উপর চাপ সৃষ্টি? কেমন পদার্থ সেই জিনিস? লালবানু বুঝে উঠতে পারে না। সম্মতি দিয়েছিল সে। ওই পর্যন্তই। স্বামীকে খুশি রাখলে ভাল হয় সংসারে। এমন শোনা কথার উপর নির্ভর করে লালবানু মুখ খুলেছিল, 'হ কমু। আমি বাজানরে কইয়া দেখমু।' স্বামীর নিকট এই দিলাশা স্রেফ স্তোক। অতটুকু সাহস থাকলে লালবানুর গহনাগুলো গায়েব হয়ে যেত না। জামাই তার উপর এবার নির্ভর করছিল। যদিও ছেলেমানুষ বউ, ষোল সতর জোর বয়স, তিন বছরে কিছু সেয়ানা ত হয়েছে। অন্ততঃ ইদানীং বিছানার হালচাল থেকে অনুমান করা যায়। যখন দেহ এগোয় তখন সময় পেছোয়। দুলামিয়া নিশ্চিন্ত ছিল এবার আর বেশি দেরি হবে না। মেয়ে-পাঠানোর ঝক্কি আছে। সব বাপ-মাকে সে ঝামেলাটুকু সামান্য ধীরে সুস্থে সইবার সময় দেওয়া উচিত। বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেই হলো। দু-চার দিন দেরি এমন কিছু নয়। আর বাপকে সেটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। নিশ্চিন্ত শ্বশুরবাড়ি থেকে জোয়ানকালে বিদায় নেওয়ার জন্যে কে অত আগ্রহ দেখায়। তবে জামাই জানে তার বাপ রগ-চটা লোক নন। কিন্তু কারো উপর যদি তিনি বিরূপ হন, তা সহজে তার মনে থেকে মুছে যায় না। এবং তখন রীতিমত শত্রুতা শুরু হয়। গাঁয়ের লোক তার পিতাকে সৎ মানুষ জেনে খুবই খাতির করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা এটুকুও জানে মিয়াসাহেব রাগলে সহজে সেই রাগ নেভে না, যদিও তার মেজাজ উত্তপ্ত হতে সময় লাগে। বাপের এই স্বভাবের উপর দুলামিয়ার খুব আস্থা ছিল।

AMARBOI.COM

আজ-কাল করে বিলম্ব বেশ অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছেছিল। দুলামিয়ার ধৈর্য আর থাকে না। হঠাৎ বাপের দূত যদি এসে পৌঁছায় তখন আরো ভয় পাওয়ার কথা। বৃদ্ধ মানুষ যদি রাগে, কোন রায় দিয়ে দেয়, তা আর পাল্টানো দায়। তাই হাওলাদার সাহেব জামায়ের জেরার সামনে জেরবার দুই জনের ভেতর তিক্ততার বীজ পত্তন হওয়াস্বাভাবিক। কিন্তু কী হয়েছিল তা খুদাকে মালুম। জনরবে পরে শোনা, নাকি শ্বশুর-জামায়ে তক্‌রার শুরু হয়। হয়ত জামাই একটা হেস্তনেস্ত সমাধান চেয়েছিল। তা পরিস্থিতির সাক্ষ্য থেকে ধরা যায়। জামাই শেষে নাকি কথায় কথায় উত্তপ্ত, শ্বশুরকে বলেছিল, "যার জবান ঠিক নেই, তার জন্মের ঠিক নেই।" গ্রামের শরিফ মাতব্বর পর্যায়ের একজন মানুষকে টিকি ছুঁয়ে কথা বলা কতো গর্হিত অপরাধ এবং আস্পর্দ্ধা কেবল্‌মাত্র ভুক্তভুগীর পক্ষে তার মর্ম উপলব্ধি সম্ভব। অমন উচ্চারণ ত হেস্তনেস্ত একটু চরমপত্র জাতীয় ব্যাপার। জন-রবে আরো জানা যায়, শ্বশুর নাকি এমন ক্ষিপ্ত এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন যে জামায়ের গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে এবং তাকে জাপ্‌টে ধরে রেখে এক ত্রাহি চিৎকার দিয়েছিলেন। অন্দরে সকলে সন্ত্রস্ত— কী হলো? তখন প্রথমে ছুটে এসেছিল ছোটমিয়া হেদায়েত। তারপর আরো আরো লোক একে একে। এক কালের ভগ্নদশা ছোট্ট তালুকদার লোকবলহীন— এমন হতে পারে না। আরো লোক জুটেছিল।

গালিদাতা আসামীর পালানোর কোন উপায় ছিল না। শ্বশুরবাড়ি মধুপুরী থেকে ঝাঁটার বাড়িতে পরিণত হতে পারে। হয়েছিল তা-ই। এক বস্ত্রে দুলামিয়ার মধুপুরী ত্যাগ সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনামাত্র। এবং এতকিছু ঘটেছিল সেই রাত্রির মধ্যে। ভোর হওয়ার পূর্বেই কয়েকজন জামাইকে একদম গাঁয়ের শেষ সীমানায় পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সবই হাওলাদারের নির্দেশে এবং তারা হাওলাদারের অনুগত আশ্রিত ব্যক্তি— তা না বললেও চলে।

তিন

লালবানুর কাহিনী কী অত সহজে শেষ হয়?

কারণ, হতভাগী লালবানুর সহজে মরণ আসে কৈ। আরো বেঁচে ছিলাম, আজও বেঁচে আছি, দুনিয়ার নানা তামাসা দেখতে। এখন বুঝি বেঁচে থাকা উচিত। নচেৎ দুনিয়ার এত শিক্ষা আর কী করে পেতাম?

ঘুম ধরে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাল্লাক। না বাপ, না দুলা সদর থেকে ফিরে আসে। কী হল? অমন চিৎকার, তারপর আরো লোকের যাতায়াত হাঁকডাক। ভয়ে-ভয়ে দুইজনে অস্থির। মাও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তিনিই বললেন, "অহন ঘুমা গিয়া। দুলামিয়া যহন আহে আইব।" তিনি নিজেও দাঁড়ালেন না। নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। আমি নিজের ঘরে ফিরলাম। কিন্তু মন উচাটন। বাপে চিক্কর দিলেন ক্যান? দুলামিয়ার কোন সাড়াশব্দ নাই। মন বলে, 'অহনই আইয়া পড়ব।' খামাখা জেগে থাকি। কান খাড়া রাখি। একটু শব্দ হলেই আধ-বোঁজ চোখ খুলে তাকাই। দরজা খালি ভেজানো আছে, খিল দিই নাই। অনেক সময় খাওয়া-দাওয়ার পর ত দুলা বাইরে যায়। পেশাব-পায়খানা আছে। তখন দরজা খোলাই থাকে। একদিন ত আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। মিয়া কখন আইছেন জানি না। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি মিয়া নিজের ধান্দায় আছে। আমি টেরও পাই নাই। তাই আমারে কইত, 'অপর মরদ আইলেও তুমি টের পাবা না।' মানুষটা ভালই মনে হয়, দুষ্টু কামের দিকে নেশা যদি না থাকত। গতবার আর তার আগের বার আমার জন্যে খোশ্‌বু তেল আর কি কি যেন আনল। গল্পের বইয়ের কথা ব'লে দিয়েছিলাম, তা ভোলেনি। নিজে নিজে পড়ি মাকে লুকিয়ে। একটা বড় গল্পের বই এনেছিল। একটা কাহিনী। মরদ আর মেয়ে ছাড়া বুঝি দুনিয়ার কোন গল্প হয় না? প্রায়ই গল্পের এক দশা। মা জানতেন, জামায়ের বই সে শ্বশুরবাড়ি এলে পড়ে। কিন্তু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাগ বসাতাম। দুনিয়ায় কত কী যে ঘটে। খামখা ত গল্প বানানো ভাবছি। দরজা খুলতে আমি ডাক দিই, কে? ফিসফিস শব্দে মা বললে, "বানু আমি। শব্দ করিস না। অনেক রাইত অহনও কেউ আসে না। আমার মন ক্যামন করতাছে। একটু সজাগ থাকিস। আমি আহি।" মা চলে গেলেন। আমার বুক তখন ভয়ে টিপ্‌টিপ্ করে। এত দেরি কেন? বাইরে সদর বৈঠকখানায় তখন লোক আছে। আর তারা এক দুজন নয়। হিদু চাচাও যে গেছেন আর আসার নাম নাই। ঠাণ্ডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাস বইল। তার সঙ্গে ফুরফুর ফুলের গন্ধমাখা এমন বাস পেলে আজকাল আমার কেমন ভাল লাগে। তখন পাশে কেউ থাকলে বেশ আনন্দ পাই। তাই বলে মা না। মাও ত দোয়া দিতে গায়ে হাত রাখেন, মাথায় হাত রাখেন। তখন শরীরে কোন মৃদু কাঁপুনি উঠে না। কিন্তু মিয়ার হাত ত সারা গতর চম্‌কে দেয়। এদিক ওদিক হাতের চলাচল শেষে বুকের উপর একদম কায়েমী। তখন বেঁছে আছি কি না, কেউ জিগালে, জবাব দিতে পারব না। আমি অপেক্ষা করছিলাম দুলামিয়ার জন্যে। সত্যি এমন আর কখনও হয়নি। দেরি হচ্ছে। তার উপর অত গভীর রাত। মন বলছিল, "আইয়া পড়ো। তুমি যা চাও সব দিমু। তোমারে আমি পেরথম-পেরথম চিনতে পারি নাই। অহন চিনছি। আমার কাছে এসে একবার দ্যাখো আমি ঝুট না হাঁচা কথা বলছি...।" বুকের ভেতর এই জাতীয় শত তোলপাড়। ওর বালিশে হাত দিই আর আঁচড় টানি আঙুল দিয়ে। শেষে গোটা বালিশটা দুমরাতে থাকি বুকের কাছে টেনে যেন কোন জ্যান্ত মানুষ তার ভেতর শুয়ে আছে, আর আমি তাকে বের করে দেখতে চাই। নিজের বালিশ ছেড়ে শেষে ওর বালিশে মুখ গুঁজে মাথা ঘষতে থাকি। এখনও আসে না ক্যান? ঘটনাটা কী? বাপের লগে কী কোন ফ্যাসাদ বেধেছে। সে ত মেয়ের লগে বাধে বিয়ের পয়লা রাত থেকে। শ্বশুরের লগে কী ফ্যাসাদ? একটা কিছু হয়েছে। এই আন্দেশা ভাবনায় শেষে বিছানায় শুতে পারছি না। উঠে উবু হয়ে বসি। কান ত, সামান্য শব্দ হলেও তা আমার কাছে পৌঁছে দেয়। আর মানুষের পা-তালি? সেদিন রাত্রে আমার কানের যে দশা তা এক ক্রোশ দূরের আওয়াজকে বেঁধে আনতে পারত। পেঁচার ডাকে গেরস্থর অমঙ্গল হয়। না, বালিশ নেই কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন কীভাবে বলা দায়। সকালে মা এসে ডাক দিতে তবে ধড়মড় উঠে বসি। দরজা ত সারা রাত খোলাই ছিল। "কহন ঘুমাইছস্?" মার সওয়ালের পাল্টা আমার সওয়াল, "বাজান আইছে?" "হ আইছে।" তারপর মার বুকে আমার মাথা বন্দী। তিনি আর কিছু বললেন না। আমি আবার জিগাই, "মা কী অইছে কন না ক্যান?" কয়েকবার জিগানোর পর জবাব পাওয়া গেল, শ্বশুর-জামাই কাইজ্যা। জামাই চইলা গেছেগ্যা। জামাই গেলে বুঝি আর আসে না? কাইজ্যা হলে কী তা মেটে না? বিশেষতঃ শ্বশুর-জামায়ের বিবাদ। তার জন্যে মার এমন দশা কেন? যেন কেউ মারা গেছে বাড়িতে। আমার দিশা থাকে না। হঠাৎ মনে হয় সব ঝুট। আমার বিয়া হয় নাই। মা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি তাকে ধমক দিলাম, "খামখা কাঁদেন ক্যা? বাড়িতে ত কেউ মরে নাই।" আমার মুখ থেকে এমন কথা বেরিয়ে যেতে পারে, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। হঠাৎ কী আমার বয়স বেড়ে না আক্কেল খুলে গেল। মনের ভেতর একটা শলা খচ্‌খচ্ বিঁধতে লাগল। জবর একটা কিছু হয়েছে। মা আমার কাছে গোপন রেখেছে। কিন্তু তেমন কী ঘটতে পারে? শ্বশুর-জামায়ের কাইজায় কেউ ত খুন হয়ে যায় নি। খুন হয়ে যাওয়ার তেমন কী কারণ থাকতে পারে? স্বার্থ খুব বেশি হলে অমন কাণ্ড ঘটে। বউ নিয়ে তো খুন-খারাবি হয় না। মা আমার পাশেই শুয়ে পড়ে বললেন, "তুইও আমার লগে ঘুমা। সারা রাত জাইগ্যা রইছি। এক লহমা ঘুম নাই দুই চোখে।" তার কথা শুনলাম। বালিশ থেকে আর মাথা তুলি নাই। ঘুমের চেষ্টা পাই। কিন্তু তা কি কইলেই আইয়া পড়ব। পাশে মা শুয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দুই চোখ বুঁজে ছিল ঠিক। আমার মনে হয় মিয়াই সদর থেকে ফিরে এসেছেন। এখনই তার খসলৎ দেখা যাবে। গলা জড়িয়ে কি কি যেন কইবে আর বুকের কাছে হাত। একটু পরে কাপড় ধরে টানাটানি। কেউ আমাকে ছোঁয় না। কেউ যদি একবার আমাকে বলে দিতে পারত, কী হয়েছে আমার মিয়ার, তা হলে আর এত আকুলিবিকুলি করতাম না। মা ঘুমোতে লাগলেন। আমি উঠে পড়লাম। অন্দরে পুকুর আছে। মেয়েরা সেখানেই হাতমুখ ধোয়, গোসল করে। ঘাটে দেখা হলো চাচির সঙ্গে। তাকে জিগালাম, হিদু চাচা কোথায়? জবাব পেলাম, সে তখনও নাকি ঘুমুচ্ছে। রাত্রে বাইরে ছিল। কেন? তার কোন সঠিক জবাব দিলে না চাচি। শুধু বলল, কী যেন কাজে আটক ছিল। কিন্তু আমার দিকে চাচি যেভাবে তাকালে মনে হল তার নিশ্চয় কিছু জানা আছে। আমি বাড়ি ফেরার সময় পিছনে তাকাই। তখন দেখি ঘাটের দিকে চাচির মুখ নয়। সে তাকিয়ে আছে আমার পানে। একবার মনে হল চাচির কাছে ছুটে যাই আর তাকে বলি, "যদি তোমার কিছু জানা থাকে আমাকে বলে দাও, তোমার পায়ে পড়ি মা। মা-চাচি জুদা কিছু নয়। আমাকে বলে যাও— তুমি যদি টের পাও।" কিন্তু আমার পা উঠল না। আর যদি কিছু মনে করে চাচি। আমার দুঃখ, একটা লোক গেল আর এখনও এল না। সে ত অন্ততঃ বাইরে থাকার বান্দা নয়, আমি যখন এখানে আছি। এমন করে লোকটাকে আর কখনও নিকটে পাইনি এই ক'বছরে— যদিও এক বিছানায় লেপ্টা-লেপ্টি করে শুয়ে থাকা ছিল তার রীতি। আমার বুকের ভেতর মনে হলো তার হাত খামচি দিচ্ছে। এমন আর ত কখনও হয়নি। আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে কাজ করত। বহুদিন থেকে আছে। বিধবা বুড়ি। তাকে জিগালাম, বাপ কোথায়? সে কোন জবাব দিতে পারলে না। আমি ত দেখি নাই। উল্টে সে জিজ্ঞেস করে, বিবিসাব ঘরে? আমার ঘরে। বুড়ি অবিশ্যি কানে কম শোনে। তার সঙ্গে কথা বলা মানে চিক্কর দেওয়া। এত তাগত আমার ছিল না। আর অপরকে শোনানোর মত ব্যাপার হলে না হয়ত এগোতে পারতাম। মার কাছে ফিরে এসে দেখি তিনি তখনও ঘুমে। আমি তাকে জাগিয়ে বসে রইলাম এক পাশে। ভুকপিয়াস সব গায়েব হয়ে গেছে। ওদিকে আকাশে রোদ্দুর উঠে গেছে বেশ কড়া। যদিও বাড়িতে দুজন বাড়তি লোক আছে এক রাখাল ছেলে ছাড়া। তবুও মাকে সবকিছু তদারক করতে হয়। বাপের নাস্তা ত তিনিই বয়ে নিয়ে যান। কোন ভাল মাছ গোস্ত এলে মা-ই রান্না করেন। বাপের পছন্দ শুধু তারই জানা। আমি তাই মার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম। তিনি খুশি হলেন। এতক্ষণ তার বিছানায় পড়ে থাকা শোভা পায় না। বাপ যদি নাস্তা চেয়ে না পান। বেশ বকুনি খাবেন। এত বয়স হয়ে গেছে, কবে মার বিয়ে হয়েছে বলতে পারবেন না তবুও ভয় যায় নি। আমি ভয় পাই। ছেলেমানুষ। সে অন্য কথা। মা চলে গেলেন। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। বাপ সেই যে কাল রাত্রে সদরে গেলেন আর অন্দরে ঢোকেন নি। কী ব্যাপার। রাত্রে কী তার কোন বিশ্রাম দরকার হয় নি। না, আর কোথাও গিয়েছিলেন? অবিশ্যি তিনি চাইলে বাইরে ঘুমোতে পারেন। পুরাতন কালের সদর বেশ বড়। একটা কামরা আছে। সঙ্গে বড় 'হল', বারান্দা তিন দিকে। বাইরে থেকে মেহমান এলে সেখানে বড় তক্তপোষে ব্যবস্থা হয়। অন্য সময় বাপও দুপুরের খাওয়ার পর বাইরে চলে যায়। শোবার বন্দোবস্ত করাই থাকে। বালিশ-বিছানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবই আছে। বাপ কী সেখানে ঘুমোচ্ছেন? এক রাখাল ছেলে তখনও মাঠে যায় নি। তাকে জিগালাম, সে বললে, মিয়াসাব ত রাত্রে সেখানে ছিলেন। আমাদের কাউকে থাকতে দেয় নাই। গাঁয়ের সব লোক ছিল। সকালে বাপ ওই কামরায় থাকেনি। শ্বশুর-জামাই কোথা গেল তবে? রাখাল ছেলেটাকে ইচ্ছা করছিল জিগাই, দুলামিয়ারে দেখছ কি না? কিন্তু সরমে মুখ বন্ধ হয়েই রইল। একটা খবর পেলে ত আর এত হাতড়-পাতড় করা লাগে না বুকের মধ্যে। চুপচাপ কামরায় গিয়ে শুয়ে থাকি তার চেয়ে। মা বাধা দিলেন। নাস্তা কইরা যা। নাস্তা! আমার এতটুকু ভুক ছিল না। তবুও মুখে কি যেন দিলাম। তাড়াতাড়ি উঠতে মা আরো পীড়াপীড়ি করতে লাগল খাওয়ার তরে। কিন্তু ভুকপিয়াস আমার চিরকালের জন্য চলে গেছে। আমি আমার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াই, এমন সময় বাপ এসে পড়ল। এক ঝলক তার মুখের দিকে তাকাই। কাহিল হয়ে গেছে। গায়ের রঙ এখন বেশ ময়লা। চোখে চোখ পড়তে আমি তখনই তা নামিয়ে নিই। বাপ আমার দিকে চাইলেন ঠিকই। কিন্তু কিছু বললেন না। অনেক বছরের পুরাতন কথা। তবুও বাপের সেই চোখের চাউনি আমি এখনও দেখতে পাই। আমি যেন তার কাছে কতো অচেনা। আমাকে দেখলেন শুধু। অজানা মাইয়া-পোয়া। তার লগে বেগানা মরদ, আর কি কথা কইবে। আমি নিজের ঘরের দিকে এগোই। বাপ কিছু বললেন না। আমি শুনতে পাই পিছনে বাপের হুকুম নিশ্চয় মার উপর। "নাস্তা দে।" সকালে খাওয়া অভ্যেস। আজ এত বেলা। বাপ কিছু খায়নি বুঝা গেল। খালি পেটে থাকলে পিত্ত হয়। একথা কতোবার না ওর মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু কী ঘটল যে সব লণ্ডভণ্ড এক রাত্রে। ঝড়ে হঠাৎ ঘর-বাড়ি গাছি-গাছালি তছনছ হয়ে যায়। আমাদের কী তেমন কিছু ঘটল? কিন্তু কী ঘটল? ভেতরে ভেতরে আমার সাহস হয়, কাউকে খোলাখুলি জিগাই। কিন্তু পারি না। নিজেকে নিজে গাল দেই। পিঁপড়ের বুকের পাটাও হয়ত আমার বুকের পাটার চেয়ে বড়ো। শূন্য কামরা যেন আমাকে গিলে ফেলতে বাকি রাখলে। এই রাতের আগের রাতে এই বিছানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি, আর কোন রকমে নিজের চোখের পানে চেপে রাখি এই বিছানা। ওই ত সে শুয়ে আছে। একটু রাগ-রাগ ভাব। আমার দিকে পেছন ফেরা কিন্তু কী যেন খোঁজে। আমার পিঠে খামছি দিয়ে আবার নিজের কাছে ফিরে যায় সে। আমার সরম-ডর কোনদিন কমেনি। আমি ওর নাগালের বাইরে গিয়ে একটু থেমে আবার হাত বাড়াই। দেখি ওর হাত কোথায়। হঠাৎ কনুয়ের আঙুল লাগামাত্র আমি সরিয়ে নেই। এই খেলা কতক্ষণ চলেছিল, বলতে পারব না। এক সময় সে তার এক পা দিয়ে আমি কোথায় আছি হদিস করছিল। পায়ে-পা ঠেকানো গোনা। তৌবা। আমি বউ হয়ে তা করতে পারি না। পুরুষ মানুষ। তার কথা আলাদা। এক-একবার পা আঁকুশির মত করে সে পায়ের পাতা আর আঙুলের সাহায্যে। জড়াতে চায় আর কী। এবার আমি অজানিতেই হেসে ফেলতাম প্রায়। তাহলে আর রক্ষে ছিল না। তখনই আমাকে জাপ্‌টে কী যে শুরু করত— আল্লা জানে। হাতের খেলা পায়ের খেলা। শেষে সাপের খেলা। এক সময় আর পেছন ফিরে শুয়ে নেই। বরং আমি যে পেছন ফিরে শুয়েছিলাম এতক্ষণ তাই চট করে ঘুরে পড়ে একদম চিৎ করে ফেলে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতে থাকে। এক সময় উরু উলঙ্গ হয়ে যায়। শুধু আমার না, তারও।

সাপের খেলা। পাকা ওস্তাদ বেদে ঝাঁপির ডালা নিয়ে কত তামাসা দেখায়। এই বেদেকে ভয় পেতাম না। কী সব যেন তখন মনে হত। অবস্থা সেদিনও জানতাম না। আজও বলতে পারি না। আমি খোয়াবের ভেতরে হেঁটে যাই। সব আবছা। কুয়াশা হয়ে যায় গোটা দুনিয়া। ঘুমিয়ে পড়ব আবার ভেবেছিলাম। কিন্তু পোড়া চোখে মরার ঘুম আসবে কেন? একবার ভাবলাম মা'র কাছে ছুটে যাই। তার কাছে গিয়ে কাঁদি আর সব কথা জিগাই। বাপ আছে অন্দরে। আর সাহস কোথা থেকে আসবে? খোয়াবের ভেতর শুধু পরশু রাতের বিছানা নয়, আরো-আরো রাতের ছবি দেখতে লাগলাম। কখনও কাঁদি কখনও হাসি সবই মনে। নিজের ভেতর নিজে পাগলি। এক পাগলির লগে অন্য পাগলি কথা কয়। এক জনেরই কথা দুভাগ হয়ে যায়। কার সওয়াল কে জবাব দেয় ঠিক নাই। এইভাবে সারা জীবন শুয়ে থাকতে পারলে বড় আরাম লাগত। কী হলো এই বাড়িতে? বাড়ির দুটি কাজের মেয়ে। ওরা কী কিছু বলতে পারবে না? হেদায়েত চাচির কাছে যাওয়া যাক। মাঝখানে একটা পাঁচিল ফারাক। ওদের বাচ্চা না থাকার জন্যে ঝামেলা কম। চাচি বাঁজা সন্দেহ নাই। নিজেই বড় জা-কে বলে, 'বুবু আপনার দুটো বেশি থাইক্‌লে আমি একটা নিয়া মানুষ করতাম। আল্লা সে রাস্তা বন্ধ কইরা দিলেন। ঘর বড় ফাঁকা লাগে।' চাচার ছেলেপুলে নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ত কম নয় সংসারে। তার চেয়ে বেশ আছি, ভাবীসাব। বিয়া-শাদি, মানুষ করার হাঙ্গামা কম না। খামকা পোলা-পোলা কইরা মাথা ঘোলাইও না। ওই বাড়ি এম্নিতে শান্ত। একবার গিয়ে দেখে আসা যায়। চাচি কী কিছু জানবেন না? চাচির লগে কতো মশ্‌করা করে চাচা। আমার বাপ হাসে কিনা জানা নাই। সাত-পাঁচ নানা কথার ধানাই-পানাই। ঘুম আসে না। তাই চাচাদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। হেদায়েত চাচা বাড়িতে নাই। ফজরে এসে আবার বেরিয়ে গেছে। চাচির মুখের দিকে চাই। তিনি অন্য দিনের মতো হেসে-হেসে বলেন না, "আ রে মাইয়া কী মনে কইরা।" সেদিন তেমন কিছু তার মুখ থেকে শোনা গেল না। বরং এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে পালঙের একপাশে বসালেন। কী যেন তিনি বলতে পারছেন না। তার দরদের রকম দেখে আমি ভেতরে ভেতরে পুড়তে লাগলাম। খামখা এখানে আসা। সকলেই হয়ত জানে কী ঘটেছে, শুধু আমিই বয়রা—কিছু শুনতে পাই না। অসতী স্ত্রীর স্বামীর নাকি এমন দশা হয়। তার ব্যাপার গোটা দুনিয়া জানে, অথচ তার জানার বাইরে থেকে যায় সবকিছু। চাচি টুকিটাকি কথা জিগালেন। নাস্তা করছি কি না, মা এখন ঘরে কী করে। আমাদের বুড়িটা কানে বড় খাটো। এসব হদিসে আমার কী হবে? কাজেই আর ভাল লাগে না, মনও বসে না। ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। মা রান্নাঘরে ছিলেন না। কোথায় এখন? সে-খোঁজে আমার দরকার নেই। আবার নিজের বিছানায়। সুঁচের উপর শুয়ে থাকা বোধহয় তার চেয়েও আরাম। এমন হলো কেন? মানুষটার গোটা আদল এখন আমি খুঁটিনাটি চোখের সামনে মেলে ধরি। ওর চোখে চোখ পড়েছে কতোদিন, তখনই নামিয়ে নিয়েছি। এই তিন চার বছরেও আমার মড়ার সরম সহজে যেতে চায় না। লোকটা খুব কালো নয়। যখন ঘুমিয়ে থাকত, তখন দেখতাম। চেহারার গঠন বেশ ভাল। তার উপর লম্বা-চওড়া মানুষ। রাতে দুষ্টামি করে কেন? তাই ত মন বেজার হয়ে উঠত পেরথম-পেরথম। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অত হয় না। লোকটার ব্যবহার ত বেশ মিষ্টি। 'রাগ করলে', 'থাক তাহলে আজ' 'আমাকে বুঝি তোমার মনে ধরে না'... কত কথা না তার মুখে। আমি নিঃসাড়, জবাব দিতে পারতাম না। ইদানিং ঠোঁটে যোগান দিয়ে উঠত সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কিছু আর শব্দ বেরুত না। 'এখন দেখছি আমার মরাই ভাল, তুমি আর একটা মনের মত দুলা পেয়ে যাবে।' ছিঃ ছিঃ। লোকটা এমন কথা মুখে কীভাবে আনে? আমি ত ওকে তেমন কোন তক্‌লিফ দিই না। তবু অমন অলখ্‌খুনে কথা বলে যায়। তারপর অনেকক্ষণ গুম হয়ে শুয়ে থাকে। আবার হাত বাড়ায়, আমি খুব দূরে সরে গেছি কি না দেখতে। আমি দূরে সরে থাকলেও এক সময় ওর পিঠের কাছে সরে আসতাম। হাত বাড়ালেই আমি। তখনই হাত সরিয়ে নিত। কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। আবার বাড়ানো হাতের খেলা। এক সময় চট করে ঘুরে আমাকে জাপ্‌টে ধরত। আর কোন কিছুয়ে বাধা দিতাম না। সে তার কাজ করে যেত। কুমির যেন শিকার ধরে লেজ আছড়াচ্ছে। চোখ বুঁজে থাকলেও যেন পুরাতন ছবি হু হু দৌড়ে আসে। আমার বুকে মাথা গুঁজে লোকটা কী যে সব ফিস্‌ফিস্ আওড়াত, আল্লাকে মালুম। কেন জানি, আমার মন ঘুরছিল। মন কী এমন ঘোরে? এক জায়গায় থাকে না। কিন্তু পাশ ফেরে নাকি? এক দিক থেকে আর এক দিকে ধায়। নাহলে আমার এত খারাপ লাগছিল কেন? আগে ত ভেতরে ভেতরে রেগে উঠতাম। বলা নেই, কওয়া নেই, কাপড় ধরে দে টান। চুপ করে থাকতাম, তা-ও ঠিক। কিন্তু পরে গা-সওয়া, ধরে নিয়েছিলাম, ওর শখ মিটে গেলেই ভিজে বেড়াল। দে শখ মিটিয়ে। কিন্তু তখন সে কথা শোনার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে। কী বলবে অমন লোকের সঙ্গে। শুয়ে দাঙ্গা না বাধলে তার ঘুম হবে না। সেদিন চাচির বাড়ি ফেরার পর ভাবলাম, একবার দেখা হোক ওর সঙ্গে, এবার বোঝাপড়া করে নেব। আর কাইজ্যা করব না। মন ঘোরে বৈকি। কোথা থেকে কোথা এলাম? আমার কামরার দরজা খোলাই ছিল। পায়ের আওয়াজ পেলাম। চোখ বোঁজাই ছিল। তবু সামান্য খোলার চেষ্টা। মা উঁকি দিয়ে ভাবলেন, আমি বোধহয় ঘুমোচ্ছি। আর ডাক দিলেন না। যেমন এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন। কেন এসেছিলেন মা? কোন খবর পেয়েছেন হয়ত। না, আর চাব না ওদিকে। বাপ হয়ত ঘরে আছেন। তার সামনে পড়া আর বাঘের সামনে পড়া এক কথা আমার কাছে। হয়ত কথা কিছু চাপা থাকে না শেষ পর্যন্ত। আজ আমাকে কে বলে দেবে, সে কোথায়? মাকে গিয়ে জিগাই। আমার স্বামীর খবর নিতে চাই। দোষ কোথায়? রাখাল ছেলেটা মাঠ থেকে আসুক, ওরা বলতে পারবে। এক ফাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করব। কাল ওরা রাত্রে কোথায় ছিল? ওদের ত গোয়াল-ডাঙায় অথবা সদরেই শোয়ার কথা। ওরা কিছুই জানবে না। একটা গোলমাল শোনা গেল অত রাত্রে। তা কী খামখা? হাজার কথা মনে ওঠে। হাজার রকমে মনকে ভোলানোর চেষ্টা পাই। এক কথা বার বার ফুটে কেটে বেরিয়ে আসে নানা চিন্তার ভেতর দিয়ে। রাত্রে সেদিন থেকে আর একা শুতাম না। পূর্বে তাই বন্দোবস্ত ছিল। যখন দুলা আসে তখন ত আর ঘরে একা নই। কাজেই আর কারো শোয়ার সওয়াল ওঠে না। প্রায়ই বুড়ি মেয়েটি এসে মেঝে বিছানা পেতে শুয়ে থাকত। তার সঙ্গে কথা বলা যায়। আগেই বলেছি। কানে খাটো। চিক্কর দিয়ে গোটা পাড়ার লোককে কোন কথা না শুনিয়ে ওকে শোনানো অসম্ভব। এবার

বুড়িকেই মা পাঠিয়ে দিয়েছে। আর একজন আছে। সে এলে ভালই হত। কিছু জানতে পারতাম। কথায় বার্তায় নিজের দুঃখের কথা ভুলে থাকা যায়। এলো বয়রা বুড়ি। সে ত বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। বুড়ো মানুষ। সারা দিন খাটুনি কিছু করতে হয়। এখন শরীরে কুলায় না। ঘুম চোখে লেপ্টে থাকতেই পারে। কিন্তু সেদিন ওকে আমার পালঙের পাশে বসিয়ে এক ফন্দি করলাম। একদম কানে মুখে দিয়ে যদি কথা বলা যায়, হয়ত জোর শব্দ হবে না। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিসের চেয়ে আরো একটু বেশি গলা তুলে একটা কথা জিগালাম। আমার ফন্দি বিফলে যায়নি। দেখলাম শুনতে পেয়েছে এবং জবাব যা দেওয়ার ঠিকই দিয়েছে। এইভাবে এ-কথা সে-কথা। কিন্তু আমার মন ত পড়ে আছে আসল ব্যাপারে। শেষে সোজা জিগালাম, "আমার মাথার কিরা, একটা কথা জিগামু তুমি কাউকে কইবে না। কথা দাও।" বুড়ো মানুষ হচকচিয়ে যায়। তবে ছেলেবেলা থেকে আমাকে মানুষ করেছে, তাই আমার উপর ওর মায়া ত কিছু আছে। মুরুব্বি মানুষ। আমি কখনো ওকে কোন কটু কথা বলি নাই। বুড়ি বলেও ডাকি না। বলি, "বুয়া।"

"তৌবা, তৌবা। কী এমন কথা রে ভৈন আমারে ক'। আমি কাউকে কমুনা।"

"আমার দুলামিয়া কোথায় গ্যাছেগ্যা? হে দিন রাইতে যে বারাইছে আর আহে নাই। তুমি কিছু জানো?"

সেই সময় বুড়ি বুয়ার রকম-সকম দেখার মতো। দুঃখের আঁচ যেন তারও বুকে। ফিস্‌ফিস শব্দে আমাকে বলে, "ভৈনরে, তর নসিবে এত দুঃখ আছিল?"

"দুঃখ ক্যান?"

"আমি হুনছি অপরের মুখে। হেরাও এই কানে তোমার লাহান মুখে হেরাও বারণ করেছে য্যান আর কাউরে না কই। তুমারে কইব— আমার কাছথন হুনছ কাউরে কইও না।"

"খুদার কসম, আর কারে?"

"তোমার মারে যদি কও।"

"কাউকে কমু না। মা আমাকে কিছু কয় নাই।"

"তুমি জিগাও নাই?"

"সরম করে।"

"হ। হেও এক কথা।"

বুড়ি আমাকে নিজের মনে কত কী বলার পর কইল, "বুবুজান, নসিব—। আমি হুনছি, তোমার দুলা আর কোন দিন আইব না।"

"ক্যান?"

"হাওলাদার মিয়ার লগে নাকি জবর কাইজ্যা অইছিল। তাই ওরে খেদাইয়া দিছে।"

বুড়ি বুয়ার কথা আমার বুকের ভার যেন কিছুটা হালকা করে দিয়েছিল। একটা খবর অন্ততঃ পাওয়া গেল। কিন্তু সে ত নিজের জিনিসপত্র এখান থেকে নিয়ে যাবে। একটা ছোট সুটকেস দু-চারখান কাপড় এনেছিল। যদি এমনই হয় আর আসবে না কোনদিন, বিয়ের সময় তারা গহনা দিয়েছিল, তা না নিয়ে চলে যাবে? গহনা সব বাপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে আছে, হয়ত দিয়ে দিয়েছে অথবা কোন ব্যবস্থা হয়েছে। আমার মনের ভেতর নানা তোলপাড়। খেদাইয়া দিছে? বাপ আমার কথা ভাবল না এতটুকু! জামায়ের লগে খামখা কেউ ঝগড়া করে? একটা খবর পেলাম। কিন্তু বুক হালকা যা হল তার চেয়ে ভারি পাথর আবার চেপে বসতে দেরি হয় না।

বুয়া?

কী, বু-জান।

আর কিছু হুনছ?

না।

মাথার কিরা। যা হওয়ার হৈছে, যা জানো কয়ে ফেলাও। আমার আর সহ্য হয় না।

বুড়ি-বুয়া কোন জবাব দেয় না। বেশ দু-পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকে। আমি আরো উতোলা হই। হয়ত বুড়ি সব জানে, আমাকে গোপন করছে, বেচারার কানে মুখ দিয়ে কথা। সে আমার মাথায় হাত রেখে, আবার গায়ে হাত বুলায়। আমার ব্যথার ব্যথী। সে বুঝতে চায়। শেষে জবাব দেয়, "বুবুজান, আমি আর কিছু জানি না। চুপ কইরা আছি কেন জানো? হাওলাদার সাব এমন একডা কাম করলেন। আগে-পিছে ভাবলেন না, মাইয়াডার কী হৈব। আখেরি জামানা। দুনিয়া শেষ গারৎ (ধ্বংস) হৈয়া আইতাছে। আইজ-কাল আর কেউ কাউরে দেইখব না। পোলা দেখব না মা-বাপরে। মায়ে দেখব না পোলারে। বাপ মুখ ফিরাইয়া নিব মাইয়ার কাছ থেইক্যা...এই চইল্‌তে থাইকব। আখেরি জামানা...।"

কালা মানুষ। হঠাৎ তাল রাখতে পারে না। জোরে জোরে দু-চার কথা বলে ফেলে। আমি তখন তার হাত মুখে হাত চাপা দিই আর বলি, "আইস্তা কন্, আইস্তা কন্।"

এই বুড়ি মানুষ তখন আমার বড় আপনজন হয়ে উঠেছিল। রোজ আমার কাছে শুতে আসত। বেশি জাগতে পারত না। সারা দিন মেহনত করে। মা তার উপর তেমন ভারি কাজ দিতেন না। কিন্তু খামখা কে কার জন্য ভাত অপচয় করে? অনেক সময় আমার সঙ্গে কথা বলেছে, আমি জবাব দিয়েছি। মাঝ-পথে ডাক দিই, "বুয়া"। তখন কোন উত্তর নেই। নাক ডাকতে শুরু করেছে। আমি আর ওকে বিরক্ত করতাম না। ঘুমাক বেচারা।

"আর কোনদিন আইব না।" বুয়ার এই কথা প্রায় আমার কানে এসে ঘা দিত। কেন আসবে না সে? আমি তার কাছে অনেক দোষ করছি। আমি ছোট ছিলাম। তার মর্যাদা বুঝতাম না। এখন ত বয়স বাড়ছে। অনেক জিনিস বুঝতে শিখছি। মুরুব্বিদের মুখের উপর জবাব দিতে পারি না এখনও। তা-ও ঠিক। কিন্তু অনেক ছওয়াল আমার বুকে জমা হচ্ছে। বুয়া আমাকে বলে, "বু-জান, চুপ থাকলে পইড়া পইড়া মার খাইতে অয়।" কিন্তু কাকে কি বলব? বাপ যেন ক্যামন? বাইরে বাইরে মাতবর মানুষ, ঘুরে বেড়ান। আমার সঙ্গে মা'র সঙ্গে কতটুকু তাঁর ওঠা-বসা। বাপ-কে এবার আমি একদিন জিজ্ঞেস করব, কী কাইজ্যা যে তার এমন কড়া শাস্তি দিতে হল একটা মানুষকে। মনে মনে রুখে উঠতাম। বাইরে আমিও কেঁচো। কেঁচো ফণা তোলে না কোন দিন। অতীতের কথা আজ বলতে পারছি। কারণ, আমার নিজেকে এখন দেখতে পাই।

'আর কোন দিন আইব না।

আমার দিন রাত কেটেছিল কী ভাবে, তা উপরে খুদা ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। রাতের অন্ধকার, দিনের আলো আমার কাছে কোন তফাৎ ছিল না। আমাদের বাড়ির ভেতর চিপা-চিপা। এক পুকুরপাড়ে গেলে তাল আর বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে অনেক দূরদূর সামান্য একচিল্‌তে মাঠ আর আকাশ দেখতে পেতাম। সেদিকে ত সব সময় যাওয়া যেত না। এক গোসলের সময় কারো সঙ্গে আসা। নচেৎ দিনেও গা ছুম-ছুম করত। বড় নিরালা। অন্য পড়শিদের ঘর একদম আমাদের ভিটের চাতালে নয়। পাড়া বেড়াতে হয় মেয়েদের। তা মাঝ-বয়সীরা ছাড় পেত। বউড়ি-ঝিউড়ি জোয়ান মেয়েদের অত স্বাধীনতা নেই। উঠান ঘরদোর সব আমাদের কাছে চিপা ঠেকত। যেন দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। তবু ছিলাম। দিন যেত, দিন আসত। মাঝে মাঝে নিজের উপর রাগ হত। যে গেছে সে গেছে। সে ত বলে যায় নি তার কেন মাথাব্যথা হবে? গেছে যাক। আমি মাইয়া পোলা। সে ত মরদ পোলা। তার এতটুকু সাহস হল না? তাজ্জবের ব্যাপার। অমন তরতাজা জওয়ান যেন মেনি বিড়াল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ত বাঘ বনে যেত। খালি রক্ত খেত না। তা খাওয়া সম্ভব হলে বাদ যেত না নিশ্চয়। এমন হিজ্‌ড়ে মরদ কোন মেয়ের কাজে লাগবে? দূর হোক আমার চোখের সামনে থেকে। কিন্তু বললেই কী কেউ দূর হয়ে যায়? একা একা অন্ধকারের ভেতর তাকাই। মুখটা দেখতে পাই। একদম পষ্ট। দিনের বেলায় তার চোখের দিকে সোজাসুজি চাইতে পারতাম না। লোকটা আমার কাছে অচেনাই হয়ে গেল। আজ যখন ভালভাবে ওর পরিচয় নিতে মন আকুলিবিকুলি করে, তখনি সে নেই। হাত বিছানায় এদিক ওদিক এগোয়। আর কাউকে মেলে না। বাতাসের শব্দ পর্যন্ত হঠাৎ কানে বিঁধতে থাকে। অথচ শব্দ ত তীর নয়, কোঁচ। বুড়ি বুয়ারা তখন নাক ডাকছে। কারো সঙ্গে কথা বলতে পারতাম একবার। তবু মনের ভার কেটে যেত। একদিন ত আমার পাশে লোকের অভাব ছিল না। সে ত আমাকে জাগিয়ে রাখার কত ফন্দি করত। আমার চোখে খোঁয়ারি লেগেছে। সে কথা বলছে। কী বলছে সেই জানে। আমি পেরথমে হাঁ-হুঁ একটা কিছু শব্দ করে সায় দিতাম। আমি চুপ করে গেলে আমার শরীরের জোড়-জায়গায় তখন তার হাত চালাচালি শুরু হল। তারপর ঘুম আসে? বিরক্ত এমন লাগত। জালেমের হাতে সঁপে দিতাম। যা বলত তা-ই করতাম। যদিও আমি ভেতরে ভেতরে তেতে রয়েছি। সে বলত, 'তুমি এত কাছে থেকেও দূরে কী ভাবে নিজেকে আল্‌গা রেখেছ?' তার কাছে যাওয়ার পালা এবার আমার। সে দূরে গিয়ে কাছে এসেছে।

কয়েকদিন বাড়ির আবহাওয়া কেমন যেন রইল। মা আগে তবু হাতে কাজ না থাকলে আমাকে ডেকে এটা-সেটা জিগাতেন। তার সে-বালাই চুকে আছে। বাপের সামনে পড়লে 'কেমন আছিস?' 'ভাল'— এ জবাবটুকু পেলেই তার সব খবরাখবর নিয়ে নেওয়া হত। মেয়ের সাথে বাপের তার বেশি আর কোন কথার দরকার আছে? এক সওয়ালেই সব শেষ। আমিও এই ফাঁদ থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছাড়তাম। সবাই দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। বুড়ি বুয়াকে বড় নিকটের মানুষ মনে হত। বেচারার কানটা ভাল থাকলে সোয়াস্তি পাওয়া যেত অনেক। অনেক ভার কলিজার উপর। তা নিয়েই শুয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতাম দুপুরে। খাওয়ার ইচ্ছেও হত না। মা এসে তাড়া দিতেন। তিনিও এমন। আমি কিছু জিগাই না। কিন্তু তিনি ত নিজের থেকে একটা কিছু হদিস দিতে পারতেন। তার দিক থেকে এমন চুপচাপ ভাব। আমি ত বোবা ছেলেবেলা থেকে। হিদু-চাচা আগে সময়-সময় মার লগে অনেক গল্প করতেন। মা বোধহয় তার সঙ্গেই, বয়সে ছোট দেওর— খোলামেলা কথা বলেন। দিনে ত কখনও এই বয়সেও মাকে দেখিনি যে বাপের সঙ্গে গল্প করছেন। রাত্রে কী হয়, ওরা দুজনে জানেন। চাচি নিশ্চয় চাচার মুখ থেকে সব খবরই পেয়েছেন। আমাকে শুধু কিছু বলতে নারাজ। আমার অনুমান। হয়ত তা নাও হতে পারে। তবে ওরা দুজনে ছেলেপুলে না থাকার জন্যে এক সঙ্গে বসে বসে সময় কাটান। চাচার তামাকের নেশা খুব। চাচি হুঁকা বেশ পরিপাটি করে রাখেন। ওদেরও একটি কাজের মেয়ে আছে। সে গাঁয়েরই বিধবা। রান্না করে দিয়ে নিজের খাবার নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি চলে যায়। আবার সকালে আসে। বাসি হাড়িপাতিল মাজা এবং পরদিনের রান্নার ভার তার উপর। চাচা বাজার করেন না। তা আমাদের বাড়ি থেকেই হয়। নগদ টাকা খরচের জন্যে মাস-মাস হয়ত বাপ চাচাকে কিছু দিয়ে দেন। দুই ভাইয়ে কী বন্দোবস্ত আমাদের জানার কথা নয়। নিরালা সংসার ওদের। আমি মাঝে মাঝে যে যেতাম, তাও বন্ধ করে দিলাম। মনে হত, চাচাও আমাকে পাশ কাটিয়ে যান। এইভাবে দিনগুজরান। জেলের মধ্যে আটক থাকা । জেলে শুনেছি আরো কয়েদি থাকে। তাদের সাথে মেলামেশা করা যায়। আমার কেউ ছিল না। আমি রাতের বেলার জন্যে অপেক্ষা করতাম। কোন রকমে এক মুঠো খেয়ে নিজের কামরায় এসে শুয়ে থাকা। সেখানে আর একজনের অপেক্ষা। কখন বেচারা বুড়ি-বুয়া তার হাতের কাজ সেরে আমার কাছে আসবে। বুড়া মানুষ। তাকে মা একটু আগে ছুটি দিয়ে দিতে পারেন। না, তা হয় না। এখন আমি বুঝতে পারি, জুলুমের রাজ্যে এই ঘটে। তোমার উপরে যদি জুলুম থাকে, তুমি তোমাদের নিচের মানুষের উপর দিয়ে তার শোধ নাও । নচেৎ মায়ের বুড়ো মানুষের উপর সামান্য দয়া দেখাতে আপত্তি কেন? তিনি ত জানেন বুয়া না আসা পর্যন্ত আমার দরজা খোলা থাকে। সাত বন্ধের ভেতর আমাদের অন্দর। সেখানে বাইরের লোক আসতে পারে না। এসব ব্যাপারে বাপ আবার হুঁশিয়ার। চোর-চোট্টা এই বাড়ির পাঁচিলের ভেতর ঢুকলে বেরোনো দায়। হাওলাদার সাবের বাড়িতে বন্দুক আছে, তা গাঁয়ের কেন, আশপাশের এলাকার সব মানুষ জানে। কিন্তু আমার পোড়া কপাল। একা-একা পড়ে থাকা। বুয়া-বুড়ির কান গেছে। তবে হুঁশিয়ার মানুষ। ঘরে ঢুকে খিল দেবে। অমি তার শব্দ শুনব। তারপর ডাক দেবে, "বু-জান তুমি ঘুমাইয়া পড় নাই ত?"

ঘুম?

অমি তখন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তাম এবং বুয়ার কানে মুখ নিয়ে বলতাম, "বুয়া, আমার মরণ ভাল। ঘুমই আসে না। তয় মরব ক্যামনে?" "তৌবা, তৌবা, কী যেন কন বুবু-মণি। মরণ আমার হোক। তৌবা, তৌবা! আপনের দুঃখ আর কয় দিন। কি বা তোমার বয়স।" বুয়ার ঠিক থাকত না, কখনও আমাকে আপনি, কখনও তুমি বলে ডাক দিত। বেচারার মাথা ঠিক না থাকার কথা। কেউ দেখার লোক নাই। এইখানেই তার

AMARBOI.COM

বাকি কাল কাটিয়ে দিতে হবে। মা এম্নিতেই শান্ত মানুষ, সেই মা-ও মাঝে মাঝে বুয়ার উপর ক্ষেপে যান। এমন বয়সে এই অবস্থায়, কাজকর্মে ভুল ত হতেই পারে। মা তার উপর গঞ্জনা দিতে থামেন না। এক-আধবার বললেই চলে যায়। তা হওয়ার যো নেই। মার মেজাজও হয়ত ক্রমশঃ বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে। আমারই সেই সময় এমন গোস্বা ধরত যে মনে হত, দা দিয়ে মা-বাবা, চাকর-বাকরদের কুপিয়ে শেষ করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই। আমার মাথা গরম হয়ে উঠত। নিজে কাউকে না দেখিয়ে পানি দিতাম মাথায়। আমাকে এক রাত্রে সে বলেছিল, চলো বাইরে ঘুরে আসি। দুলামিয়ার শখের রকম সকম কম নয়। বাইরে চাঁদনি রাত। সে বলত, "চলো না বাইরে একটু ঘুরে আসি।" আমি গ্যাঁট বিছানার সঙ্গে সাঁটা। একটু চুপ থেকে আবার বলত, "তুমি ভাবছ, বাইরে যাওয়ার নাম করে, আমি যদি তোমাকে নিয়ে বাড়ি পালিয়ে যাই। আরে না। তুমি এক শরিফ ঘরের মেয়ে। আমরাও কিছু নিচু নই বংশে। তোমাকে শ্বশুর-বাড়ি এইভাবে এক কাপড়ে কেউ নিয়ে যাবে, না যেতে পারে। আমার কী মাথা খারাপ হৈছে?" আমি সাড়াই দিতাম না। মানুষের ঢং দ্যাখো। বউ নিয়ে রাত্রে বাইরে যাবে ঘর ছেড়ে। আজ মনে হয়, সেদিন সত্যি যদি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেত, আজ এই দোজখে পড়তে হত না। আফ্‌শোস, মানুষ চেনাও দুনিয়ায় শিখতে হয়। তখন চিনলাম না। ইলেম পেলাম, বড় দেরিতে। আজ আফশোস করে আর লাভ নেই। তবু এই আফশোসের নাগর-দোলায় চড়ে মাথায় চক্কর খেয়ে একই জায়গায় আবার ফিরে আসি। বুড়ি বুয়া ঘুমিয়ে যায়। আমি পারিনা কেন ওর মত? ওর দুঃখ ত অনেক। তার কি কুলকিনারা আছে? তবু বেটি বেশি ঘুমাতে পারে। নিজের ভেতর সাঁতার কেটে কত দিন আর বাঁচব? জীবনের উপর ঘেন্না ধরে যায়, এমন বাড়ি। কেউ নেই যার কাছে গেলে দু দণ্ড শান্তি মেলে। মার কী দরদ আছে আমার উপর? আমিই ত বংশের একমাত্র পিদিম। মায়া-মমতা ত অনেক বেশি থাকার কথা। অথচ আজ পর্যন্ত এতটুকু আঁচ দিলেন না, জলজ্যান্ত লোকটা রাত্রে ঘর থেকে সদরে গেল; ব্যস, সেই যাওয়াই যাওয়া। আর আমার মড়ার শরম। নিজের স্বামীর কথা সোজাসুজি জিগানোর মুরোদটুকু পর্যন্ত নেই। কাল সকাল হোক, মার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। শুধু মার সঙ্গে কেন? বাপ বাদ যাবে কেন? পরদিন সকাল ঠিকই হত। নতুন সকাল। আমি যা কিন্তু যে-পুরাতন সেই পুরাতন। মুখ আর ফুটত না। সকলের কাছ থেকে আলগা হয়ে পেঁজা তুলার মত বাতাসে ভেসে বেড়ানোর দশা। এই সময় বুড়ি বুয়া একদম কাছে না থাকলে, হয়ত জান্ শেষ করে ফেলতাম। বেচারার সঙ্গে কথা সহজভাবে বলা যায় না। কানে মুখ দিয়ে ফিস্‌ফিসানি। তবু এই দুঃখিনীই আমার একদম একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছিল। নিজের দুঃখের কাহিনী বলে যেত। আমার মত দরদী শোনার লোক বোধহয় সে আর কখনও পায়নি। গাঁয়ের চাষিবাসির পরিবার। নিজের কিছু জমি ছিল। গরিবই। তেমন গরিব নয় যে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। বিয়ে হয়েছিল বেশ ভাল ঘরে। তাদের অবস্থা আরো ভাল। ছেলেপুলে মেয়ে নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি বেশ দাপটের সঙ্গে থাকত। কোনো অভাব ছিল না সংসারে। কপালে সুখ নেই, নইলে স্বামী হারাবে কেন পাঁচ বছরের মধ্যে। শুধু স্বামী নয় একদিকে এক বড়ভাই আর বাপও দুনিয়া ছেড়ে গেল। চাষের মাল নিয়ে বাপ-বেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঞ্জে গিয়েছিল। সেখানে সব বিক্রি করে, সংসারের দরকারি জিনিসপত্তর নিয়ে বাড়ি ফিরবে। এই ফেরার সময় ঝড় আর বিষ্টির মুখে 'লা' ডুবে যায়। এই ঘটনা ঘটে, বেশি দিন তফাৎ নয়। বাপ-মা গেল। তারপর নিজের মরদ। শ্বশুর খুব বুড়ো নয়। ভাল সাঁতার জানে। গায়ে-গতরে কাহিল না। আর ছেলে ত জওয়ান। কপালের দুঃখ। বুড়ো কোনো রকমে সাঁতরে-সুতরে বেঁচে গেল। কিছু বেটা আর ফিরল না। বাপ সেই শোকে অকেজো হয়ে মাত্র কয়েক মাসের ভেতর মরে গেল। ওই বাড়িতে আর কার জোরে থাকে বুয়া? বাপের ভিটেয় ফিরে এলো। সেখানেও বেশি দিন ভাত জোটেনি। অভাবের সংসার। ভাইদের মায়া-মমতা থাকলেও তাদের বৌরা খামখা এক পেট পোষার পক্ষপাতী ছিল না। এই শুরু হলো ভেসে বেড়ানো। এক মিয়া-বাড়ি থেকে আর এক মিয়া-বাড়ি। নানা ধরনের মানুষ দুনিয়ায়। এক-এক বাড়ির যা বয়ান শুনতাম, কেচ্ছা লাগে কোথা তার কাছে। আমি ত কানে ফিস্‌ফিস উস্‌কে দিয়ে খালাস, তার পর বুয়া বলে যেত। তখন শুনতে কোনো অসুবিধা নাই। কেবল আওয়াজ জোরে না আস্তে বেরোচ্ছে, তা সব সময় ধরতে পারত না বুড়ি। আমি তার গায়ে টোকা দিলে বুঝত, গলা জোর হয়ে গেছে। তখন গলা খাটো করে বুড়ি তার কাহিনী আবার শুরু করত। "বু-জান চুল পাকছে। হাড় পাকছে। খামখা না। কতো কী যে দেইখলাম। হুইন্যা রাখো। তোমার মতো আর কাউরে পাই নাই দুঃখীর কথা শোনার তরে।" তারপর এমন লম্বা শ্বাস ফেলত বুয়া যে আমার বড় খারাপ লাগত। খামখা মানুষের পুরানো বুকের ঘায়ে খোঁচা দেওয়া ঠিক না। কিন্তু বুয়াকে থামানো যেত না সহজে। অনেক সময় দরদি কারো কাছে দুঃখের বোঝা নামাতে পারলে, ভালই লাগে। নিজেকে দিয়েই তা বুঝি। তাই বুড়িকে আর বারণ করতাম না। শেষে আমি মেঝেয় বিছানা পেতে তার শোয়া বন্ধ করলাম। পালঙে আমার পাশেই তার শোয়ার ব্যবস্থা। পেরথম, পেরথম বুয়া বড় আপত্তি করত। বিবিসাব বকা দিবো। 'হে দেখব না, বুয়া।' নিচে বিছানা একটা পাতা থাকত। শহরেও এক মিয়া বুয়াকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে মন টেকেনি। জোয়ান কালে অসুবিধে অনেক। মান ইজ্জৎ রাখা দায়। মিয়াবাড়ির সকলে ত সৎ নয়। বাড়ির চাকরানি কী তাদের নিজেদের মধ্যেই কত কাণ্ড হয়। শহরে পাঁচ বছর ছিল বুয়া। এক বিবিসাব ত তার ভাসুরের জোয়ান পোলা নিয়া ফূর্তি করত। এসব কাহিনী তখন আমার কাছে তেমন মজার কিছু মনে হত না। বহু বছর পরে সে-সব পুরানো কেচ্চা রসালো ঠেকে। নিজের দিকে তাকিয়ে আমি আজ নিজেকে চিনতে পারি না। বুঝতে পারি না, সাহস হারিয়ে মানুষ বাঁচতে চায় কেন? একদিন আমার বুক ফাটত মুখ ফাটত না। বহু দিন পর বুঝলাম, বাঁচার জন্যে বুকের পাটা লাগে। তা না থাকলে, মানুষ জানোয়ার হয়ে যায়। বুয়ার মতই আমিও সারা জীবন চুপচাপ সব সয়ে যেতাম। অবস্থার ফেরে আমার চোখ খুলল। বুড়ি বুয়া নিজের কাহিনী বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়ত, আমিও জানতাম না। কারণ, আমার মনে এমন একটা ছোঁয়া পেতাম এই দুঃখী জনের কথায় যে এক সময় খোঁয়ারি এসে যেত। আমার কাছ থেকে সামান্য মায়া মমতায় বুড়ি গলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সে আমার কাছে চলে আসত। আগে এক সময় আমি মার সঙ্গে খেতাম। আজকাল আর তা হয় না। বাপের খেতে চিরদিন দেরি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদরে তার মজলিস আছে। অন্দর থেকে চা দিতে হয়, মাঝে হুকুম মত। কখন গাঁয়ের সালিশ বসে। দেরি হয়ে যায়। বাপের কোনো বাঁধা খাওয়া-দাওয়ার সময় নেই। অপারেশনের পর বেশি রাত করতেন না । নিয়ম মেনে চলতেন। এখন সে-পাট উঠে গেছে। বাপের দিকে চাইলে বুঝা যায়, বয়সের সঙ্গে তার শরীরে ধস কিছু নেমেছে। হাঁক ডাক রোয়াব কিছু কমেনি। অন্দরে খরচপত্র ঠিক আছে। জামাই চলে গেল। তার গহনাগুলো এখনও বাড়িতে। ওরা কোনো দিন এসে দাবি করবে। কিন্তু আমার কাছে আর কিছু নেই। এমন কী বাপের দেওয়া গহনাগুলোও গেছে। দু'হাতে দু-গাছা সরু সরু চুড়ি এবং কানে দুটো ফুল। এই আমার সম্বল। ওরা যদি এসে দাবি করে, আমাকে তার কোনো জবাব দিতে হবে না। কতবার ভেবেছি, মার কাছেই আবদার করে বলব, আমার গহনাগুলো দাও, পরব। কিন্তু ওই রাতের ঘটনার পর আর সে কথা মনে জায়গাও দিই না। কী হবে গহনা, মানুষই যখন গেছে। আমি টের পেতাম, বাপ আমাকে এড়িয়ে চলেন। আগে তবু কাছে ডেকে নিতেন কোনো কোনো সময়, এখন আর তা-ও করেন না। অথচ বাড়িতে লোক ত তিন জন। বুড়ি বুয়া আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। নানা অবস্থার ভেতর দিয়ে শেষ জীবনে এই বাড়িতে তার জায়গা হয়। শহরের দিকে তার মন আর টানেনি। একবার এক মিয়াসাব তাকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন জওয়ান মানুষ, অনেক ঝামেলা মাথার উপর। একবার দালালের হাতে পড়েছিল। সে বিয়ে দেওয়ার ভারও নেওয়ার জন্যে রাজি। "বু-জান, হের সঙ্গে গেলে আর ফিইরা আসা দায় অইত। জেলখানার মত বন্দি করে রাখে আর খারাপ কাম করায়। তোমার কাছে কিছু লুকাব না। জওয়ান কাল। একবার ভাবছিলাম, কেউ যদি বিয়া-শাদি করে, একজন মুরব্বি মিলল। তার চাইয়া বড়ো কথা, প্যাডের ভাতের চিন্তা থাকে না। পেরায় রাজি হৈয়া গেছলাম। হেই বাড়িতে কাম কইরত আর এক আমার মত বদ-নসিব বিধবা। বয়স চল্লিশ হৈব। সে আমারে ছোড ভৈনের মত দেইখ্ত। তারে সব খুইলা বল্লাম। হে কইল, খবরদার-খবরদার। লোভে পইড়া এই কাম কইরো না। অচেনা মানুষের লগে এই ভাবে যাইবা আখেরে পস্তাইবা।" বুয়া তারপর আর এক মেয়ের লম্বা কাহিনী বলেছিল। কোথায়-কোথায় না সেই মেয়েকে শাদির লোভ দেখিয়ে বহু মান্ষের লগে খারাপ কাম করিয়ে ছাড়ত। শেষে এক ফাঁক দেখে সে পালিয়ে তবে গুনার কাম থেকে রেহাই পায়। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ঝক্মারি সেদিন আমিও বুঝেছিলাম। একটা মানুষ আমার কাছে এসেছিল। বড় আপন করে নিতে চেয়েছিল আমাকে। আমি তার কাছে ধরা দিলাম না। এখন আফশোস খামখা। প্রায় মনে হত, একবার যদি কোনো রকম সে এই বাড়িতে আসে, তার সব দুঃখ এক লহ্মায় মিটিয়ে দেব। এই বাড়িতে অন্ততঃ আর থাকব না।

হয়ত এই ভাবেই সারাজীবন চলে যেতে পারত। প্রায় দেড় বছর কেটে গেল। পথ চেয়ে থাকাই সার। আরো অবাক কাণ্ড, লোকটার শ্বশুর-শাশুড়ি তার নাম পর্যন্ত আর মুখে আনল না এতটুকু, এমন-কী এক দিনের তরে। বাপ-মা এমন হতে পারে? বুয়ার লগে তখন আমি ক্রেমে-ক্রেমে মন খুলে ধরতাম। সে-ও অবাক। "মাইয়ার দুলা। বিয়া দিলে অত ধুমধামে। অত খরচ। অহন তার খোঁজ-ও লস না। এ কী কারবার?" প্রায় বলত বুড়ি। সমব্যথী জন বুয়া বেচারা বেশি কিছু জানে না। মা-কে নাকি একদিন বুয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করেছিল, "দুলা-মিয়া আহে না ক্যান?" মা শান্ত মানুষ। তারও চোখ মুখ এমন লাল হয়ে উঠেছিল সে বুড়ামানুষ আর কিছু বলতে সাহস করেনি। ওটুকু জিগানোর পেছনে এত কসুর থাকতে পারে, বুয়ার পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন বৈকি। লোকটা বেঁচে আছে ত? এই কথাও অনেক সময় আমার মনে হত। ওকে খুন করেও ত ফেলতে পারে। বাপের যে-সুরত তখন দেখেছিলাম, আমার পক্ষে এমন বিশ্বাস খুব সহজ ছিল। গাঁয়ের মাতবর। বহু লোক বসে আছে। একটা লোক খুন করানো বাপের পক্ষে সহজ। অজানিতে আমার চোখে পানি এসে যেত। বুয়ার সামনে আমি কেঁদে ফেলতাম। বুড়ি আমাকে বুঝ দিত। "কাঁদিস না বু-জান। আল্লা নসিবে মরদের ঘর করা লিখে দিলে, আবার তা-রে ফিরা পাইবি।"

বুয়ার কথা ফলেছিল বৈকি। তবে অন্যভাবে। সেই মানুষটা আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। তার খবর আমার কাছে এসেছিল দশ বছর পরে। বড় দেরি লেগেছিল। তবে সেই মানুষ-কে আমি আর ভুলে যাইনি। আমাকে সবক দিয়ে গিয়েছিল সে। মানুষ আর এক মানুষকে একদম ভেতর থেকে চায়। সকলে সকলকে পায় না। এমন পাওয়ার ভেতর বাঁচায় অনেক সুখ। তেমন সুখ সহজে আর কোথাও মেলে না। এই দুনিয়ায় মিল মহব্বত, দয়া-দরদ উঠে গেলেই দোজখ শুরু হয়। নিজের জীবন দিয়ে এসব শেখা। লেখাপড়াও আমার শেখা কিছু হয়েছিল। অন্য বাংলা বই পড়ার মত ইলেম। তা পড়ে-পড়েও অনেক শিখেছি। এই লম্বা কাহিনী বলার ক্ষমতা না হলে আমি পেতাম না।

দুবছর কি সামান্য বেশি, একদিন মার মুখেই শুনলাম, "দুলামিয়া ত আর আইল না। হে নাকি তালাক-নামা পাঠাইয়া দিছে শ্বশুরের নজ্‌দিগ। অহন—।" এখন বাপ-মার কর্তব্য। মেয়ের কাঁচা বয়স। এই বয়সে বিধবার মত ত একজনকে রেখে দেওয়া চলে না। বেশি বয়স, কি আধবুড়া হলে কথা ছিল আলাদা। "মানুষে কী কইব জওয়ান মাইয়া ঘরে রাইখ্যা ওগোর প্যাডে ভাত সান্ধায় ক্যামনে?" এই টানে মা একগাদা কথা বলার পর যেখানে গিয়ে পৌঁছল, তার সোজা মানে, আমার বিয়ে দেওয়া উচিত। বাপ-তাই ঠিক করেছেন। ভাল দুলা পেলে দেরি করবেন না। তবে এবার আর ভুল হবে না। ভাল বংশ, ভাল অবস্থার কম-বয়সী কোনো দুলা পেলেই কাজে নেমে পড়বেন। এসব ব্যাপারে আমার কী করার আছে। হ্যাঁ-না কোনো কিছুই বলার নেই। বাপ-মায়ে যা করে, তাই করা হবে। আর আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। কানে শোনা পর্যন্ত দৌড়। কান খোলা থাকে। শুনতেই হয়। কথাটা বুড়ি বুয়াও জানে। তাই আমাকে একদিন বললে, "বু-জান, নসিবের খেলা রে, বু-জান। না হলে জওয়ান দুলা বেগর-কসুর তোমারে ছাইড়া দিল ক্যান? অহন হাওলাদার মিয়াসাব বুইঝ্যা-সুইঝ্যা কাম কইরবেন। ভবিষ্যতের কী হয় কেউ জানে না। তবু কাম কইরবার আগে ভাবা উচিত। বু-জান, মরদ মরছিল অল্প বয়সে। আমি আর নিকা বসি নাই। ভুল করছি। মাইয়া-পোলার অনেক দুঃখ। একা থাকা ভাল না।" তা ঠিক। একা থাকা মানে অনেকের চোখে পড়া। বুয়ার মত মেয়ে আর ক'জন হয়। অনেক বিপদে পড়েছেন একা থাকার জন্যে। মেয়ে মানুষের দেহ-ও তার দুশমন। আবার দেহ থেকেই আনন্দ পাওয়া যায়। তার আঁচ আমি পেতে শুরু করেছিলাম। একা থাকার বিপদ অনেক। কিন্তু আর কেউ এলেই কী মসিবত

আর আসবে না? বেশ ছিলাম। বাড়ির তেমন কোনো কাজ করা লাগে না। রাত্রে বুয়ার লগে কথাবার্তা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়া। এ-ই ছিল ভাল। ভাঙা ঘুমে মন ছাল-তোলা কৈমাছের মত ধড়ফড় করত। তবু ভাল। একজন দরদের মানুষ মিলেছিল বুয়ার মধ্যে। তার কাছে শুলেই বড় ভাল লাগত। আবার নতুন কোনো মানুষ আসবে। সে কেমন দেখতে, কেমন তার মেজাজ সবই টলোমলো ব্যাপার, কী ঘটে কেউ জানে না। আঁধারে হামাগুড়ি দিয়ে কোনো জিনিস খোঁজা। কী দরকার আবার শাদির? কিন্তু আমি ত কিছু না। বাপ-মা যেখানে ফেলে দেয় সেখানেই নোঙর। বুয়া একদিন আফ্‌শোস করে বললে, "বু-জান, আজ তোমার পাশে আমি। এর পর ত অন্য মানুষ আইব। আমি কিন্তু জীবনে আর তোমার মত কাউকে পাই নাই। যেহানেই যাও সুখী হও যেন।" বুড়ো মানুষটার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়। কী হবে কে জানে। নতুন বাড়ি যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গে নিতে পারতাম বড় ভাল লাগত। পরের বাড়ি, আমার কী হাত থাকবে? শাশুড়ি-ননদ থাকলে ত আর কথা নাই। বাবা যিনি আমার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন তিনিও ক্রমশঃ কাছে ডেকে দু-এক কথা শুধান। তখনই আমি বুঝতে পারি, আমাকে নিয়ে আবার একটা কিছু হতে যাচ্ছে। হাতি-ঘোড়া হবে আর কী? আমি বিধবা না হলেও স্বামীর তালাকের ছ্যাঁকা সারা গায়ে। বাপ-মা সেই দাগ মুছানোর আয়োজন করছে। তা ওদের হালচাল থেকে বুঝা গেল। বিয়ের জন্যে কিছু সরঞ্জাম ত আছে। চাল-ডাল, মাছ-গোস্ত ইত্যাদি। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর মুখে শুনলাম, আমি দেখতে শুনতে খুবসুরাৎ। সেই খবরেই ছ-সাত মাইল গাঁয়ের এক জোতদারের পোলার আগ্রহ। দোজবরে দুলা। তার পেরথম বিয়া হইছিল। কিন্তু কপালের গেরো, এক বছরের মধ্যেই বউ মারা যায়। তারপর তিন চার বছর আর বিয়া করেনি। বাপ-মা আছে। তাদের পীড়াপীড়ি ছিল খুব। কিন্তু পোলা চেতেনি। এতদিনে নাকি মত হয়েছে। সে জেনেছে আমার দুলা মরেনি। তবে মরার সমান। সম্পর্ক ত আর নেই। তবে অনেক খোঁজ-খবর নেওয়ার পরই নাকি পোলা বাপ-মার কাছে নিজের ইচ্ছা জানিয়েছিল। সোজাসুজি না। নিজের বন্ধু-বান্ধব মারফৎ। আমাকে বললেন, "ছেলে দোজবরে।" আমার মুখ থেকে তখন জবাব এসে গিয়েছিল, 'আমি কোন কুমারী বিয়ার কনে?' কিন্তু সামলে নিলাম। নিজের মেজাজের কথা ভেবে অবাক হই। আমার ভেতরের আগুন সব-সময় চাপা থাকতে নারাজ। কিন্তু পরের লহ্‌মায় আমার ভয় হয় খামখা। অনিশ্চিত সব কিছু। ভবিষ্যৎ কী হবে, ভবিষ্যৎ জানে।

বেশ ধুমধামে আবার আমার শাদি হয়ে গেল। আমি আর নতুন কনে নই, যদিও বিয়া নতুন। বিছানায় আমার পাশে আর একজন। কোথা থেকে রাজ্যের শরম এসে জড়ো হয়। আমার সব জানা। দুলামিয়ার হালচাল কিভাবে শুরু হবে, আর কখন-কোথায় শেষ হবে। কিন্তু ভয়ে আমি নিঃসাড় হয়ে যাই। আর একজনের কথা মনে পড়ে। সে বেচারার অনেক তকলিফ সইতে হয়েছে শুধু আমার কাছে পৌঁছতে। অমন কঠিন হওয়া ভাল নয়। কঠিন ছিলাম। কারণ, কিছু আমার জানা ছিল না। সস্তার সাত অবস্থা। আমি আর সস্তা-ও হতে পারব না। পেরথম দুলাকে আমার ওস্তাদই বলতে হবে। তাকে যখন ভাল লাগছিল, তখনই সে পিছলে সরে পড়ল। কিন্তু কেন চলে গেল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে তালাক দেওয়ার কি অপরাধ পেলে? হয়ত এসব কথা বাপের বানানো। অন্য কিছু হয়েছে। আমার ছাই, সাহস নেই কাউরে সোজা জিগাই। এই মানুষ তেমন কিছু হবে না ত? নিজের মধ্যে দু-রাত্রি বুঝাপড়া করেছিলাম। কিন্তু লোকটা বড় মিষ্টি। বড় সবুর আছে ওর। তাড়াহুড়া নেই কোনো কাজে। দুপুরে দু'দিন পরে সে আমার কাছে দু-তিনটে গল্পের বই এনে দিলে এবং পড়ার অনুরোধ করে গেল, যখন কাছে কেউ থাকে না। সূঁচ হয়ে ঢোকে এবং ফাল হয়ে বেরিয়ে যায় অনেকে। আমি গোয়াল-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাব বৈকি। লোকটা ত ভালই মনে হয়। পরে কী হবে কে জানে। কেমন একটা বাধ-বাধ-ভাব ওর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল। ওর কাছে নিজেকে ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবু সামান্য গেরো যেন কোথায়। বড়শির সুতো যা-ই হোক, ফাৎনার দিকে নজর রাখতে হয়। বেশি ঢিলও দিতে নাই, আবার বেশি টান-ও না। চারে মাছ এলে সবুর করতে হয়। ধীরে ধীরে মানুষটা-কে খুব ভাল না লাগলেও, খারাপ লাগছিল না। অনেক দিন পরে পুরানো দিনের কেচ্ছা বয়ান। এখন স্পষ্ট নিজেকে দেখতে পাই। সেদিন অবিশ্যি এত বিচারের ক্ষমতা আমার ছিল না। তবে মনের তাগিদে কাজ করে যেতাম। আর ঘা-খাওয়া জান্ ত? তা থেকেই ভেতরে-ভেতরে অনেক কিছু শেখা হয়ে গিয়েছিল।

আমার নতুন শ্বশুর-বাড়ি পূর্বের মতই জম-জমাট। লোকজন অনেক। আমার দুলার গঞ্জে দোকান আছে। শহরের সঙ্গেও যোগাযোগ বেশ। একদম গাঁয়ের জোতদার নয় সে। তার আদরের ধরন থেকেও বেশ বোঝা যেত। নতুন বউ আমি। দ্বিতীয় বার মাত্র যাওয়া। তখনই সে আমাকে গঞ্জে সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে এলো। জীবনে আর ত কখনও এমন তামাসা দেখি নাই। আমার আনন্দের কথা কিছু বয়ান করা দায়। নৌকায় কয়েক মাইল যেতে হয়। ফেরার পথে জোছনা-রাত্রে ভেতরে আমি ত ভেস্তের আনন্দ পাচ্ছিলাম। এই ভাবে ভালই জীবন যেতে পারত। কিন্তু নসিবের গেরো। তা হয়নি। আমার জন্যে আরো আঁকাবাঁকা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছিল।

এই শ্বশুর-বাড়ি দু-বার কি তিনবার আমি গিয়েছিলাম। তারপর আর যেতে হয় নি। এই দুলামিয়া চলে আসত এবং ঘন ঘন আসত। ভাল-লাগার ব্যাপারে সাবধান হতে হয়। একবার ঠকেছি কিনা। কিন্তু এই লোক গঞ্জে ব্যবসা করলেও বেশ সৌখিন হালেচালে। আমার জন্যে মাঝে মাঝে গহনা গড়িয়ে আনত। শাড়ির ত কথাই নাই। যদিও যৌথ পরিবার, বোধহয়, নিজে রোজগার করত বলে তার হাত ছিল দরাজ। বাপ-মা দু-জনে খুশি ছিলেন এই জামায়ের উপর। তাদের জন্যেও এটা-ওটা কিনে আনত।

পেছনের দিকে তাকাই। কতো কথা মনে পড়ে। কানে কতো জনের গলার আওয়াজ পাই। আর চোখের সামনে চলাফেরার কী কামাই আছে? এক ছবির উপরে কতো ছবি জমা হয়ে যায়। এই দুলার নাম ছিল কামেল। আমাকে অবিশ্যি সে লালী বলে ডাকা শুরু করেছিল পেরথম দিন থেকে। পরে আমাকে বলেছিল, "সকলের কাছে তুমি লালবানু থাকো। কিন্তু আমার কাছে লালী। কারণ, তুমি সকলের চেয়ে আমার কাছে আলাদা।" কথাটা আমার মনে বড় গেঁথে গিয়েছিল। এই লোক কখনও দাগাবাজি করতে পারে না, বা কোন খারাপ কাজ ওকে দিয়ে সম্ভব নয়। আমি নিজেকে এবার সঁপে দিতে শিখছিলাম

অপরের হাতে। আমার জানা হয়ে গিয়েছিল সেখানেও অনেক সুখ আছে। দুই উরুর ভেতর ত অনেককে জায়গা দেওয়া যায় না।

পিছন ফিরে তাকাই।...

আরো কত কী গেল জীবনের উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে এই ভোজবাজির ভেতর হাঁ-করে চারিদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া যেন কিছুই লাগে না দুনিয়ায় বাঁচার তরে।...

চার

হেদায়েত হাওলাদার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেশ বদ্‌লাতে শুরু করেছিল। খেয়াল মত অবসর কাটাতে পারলেই তার আর কিছু লাগে না। ছোটভাই। তাই বড় হাওলাদার তা-কে তার-মত বাড়তে দিয়েছিলেন। এক কালে জমি-জায়গা প্রচুর ছিল। একটা মানুষের শখ মিটাতে এই পাড়াগাঁয়ে আর কতই বা খরচ। হিদু হাওলাদার সেদিকে খুব যে খামখেয়ালী তা বলা চলে না। মাঝে মাঝে এমন বাতিক পেয়ে বসে। গাঁয়ের উত্তর মাঠে এক কালে তাদের একটা ছোট বিল ছিল। নল-খাগড়া-সহ জলা-জায়গা। জেলেরা ইজারা নিত। কিছু মাছে কিছু টাকায় শোধ দিত। মাছ চুরি হত বৈকি। বিলের জলকর এক শ' বিঘে ত হবে। চারিদিকে পাহারা দেওয়া দায়। ছোট হাওলাদারের এক বছর খেয়াল হল, কাউকে ইজারা না দিয়ে বিল খাসে রাখবে। পাহারার বন্দোবস্ত করলে মাছ চুরি হবে না, ফলে প্রচুর আয় হবে। মাথায় যখন ফিকির খেলে গেছে; ওটা শেষ হওয়া দরকার। বড় হাওলাদার বাধা দিলেন না। আগে জেলেরা দুই পাড়ে কুঁড়ে বেঁধে পাহারা দিত। কিন্তু হিদু হাওলাদার ওভাবে যেতে নারাজ। সে বিলের মাঝামাঝি টং বাঁধবে। সেখানে একটা ছোট নৌকা বাঁধা থাকবে যাতায়াতের জন্যে। চাকরবাকর নিয়ে সে নিজে পাহারা দেবে। তার শখ চেপেছিল আসলে এমন পরিবেশে কিছুদিন বসবাসের জন্য। চারিদিকে এক শ' বিঘে জুড়ে এমন কাকচোখা জল। মাঝখানে তার উপর বাঁধা টং। শোভা কত সুন্দর। ছোট হাওলাদার বাড়ি থেকে তোষক বিছানার চাদর নিয়ে এলো। রাত্রে এখানে বেশ ঠাণ্ডা লাগে। গা শিরশির করে। সুতরাং তার জন্য সুন্দর নক্‌শি কাঁথা। সঙ্গে দু'জন পাহারাদার। তারা পালা করে পাহারা দিত। হাওলাদার একটা পাঁচ ব্যাটারি টর্চ বাতি পর্যন্ত কিনল। অনেক দূর দূর দেখা যায়। কেউ জাল ফেললে শব্দ হবে। তখন হাঁক দিয়ে চোর ভাগানো। হেদায়েত হাওলাদারের কোন ঠিক ছিল না। কোন কোন সময় সারাদিন টঙের উপর থাকত আর বই পড়ত। তার ওই এক নেশা। চাকরবাকর দুপুরের খাওয়ার বয়ে আনত। কখনও টঙে রাত্রিবাস। ছোট নৌকা নিয়ে বিলে ঘোরাঘুরি করাও তার এক প্রচণ্ড শখে দাঁড়িয়ে যায়। দংগলে থাকা তার অভ্যেস। তবু মাঝে মাঝে এইভাবে হেদায়েত চলে আসত যেন সংসার-ছাড়া। জব্বার হাওলাদার কিছু বলতেন না। সেবার কিন্তু মাছের ব্যবসা খুব খারাপ গেল। চুরি হয়েছিল বৈকি। একে টং বানাতে হাজার টাকার বেশি চলে যায়। ছোট হাওলাদার বেকুফ। কিন্তু অগ্রজ তা-কে কিছু বলেন নি। ঠিক এই ধারায় শখের জন্যে হেদায়েত বেশ দণ্ড দিত। অবিশ্যি খরচের টাকা ত সব বড় হাওলাদারের হাত থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরোয়। হিসেব তিনিই রাখেন।

ইদানিং তহবিল না-হোক হেদায়েত হাওলাদার মনে মনে হিসাব করছিল। বড় ভায়ের জমি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এবার মেয়ের বিয়েতেও প্রচুর খরচ করলেন। বেশ কিছু জমি বেরিয়ে গেছে। অত ধুমধাম না করলেও চলত। সময় যে বদলে যাচ্ছে এবং গেছে সে-ব্যাপারে ত বেখবর। ছোটভাইয়ের টনক নড়েছিল। এতদিন সম্পত্তির দলিলপত্র হাওলাদার রাখতেন। কোথায় কী আছে, জানার জন্যে হেদায়েত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মাঠে জমি আছে। তা জানা। কিন্তু কোন জমি কোন সীমানা, কত বিঘের বন্দ— এসব ত তার জানার দরকার পড়েনি এত দিন। বড়ভাই অবাক হয়েছিলেন, হঠাৎ এই মতি পরিবর্তন। কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি। ছোটভাইয়ের সাময়িক খামখেয়ালের মত বোধহয়, নতুন বাতিক কিছু।

কিন্তু আখেরে দেখা গেল, ব্যাপার আরো গভীর। বড়ভাই কোথায় কী করে রাখছেন, সে জানে না। সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেলে তার দশা কী হবে? যদিও ছেলেপুলেও নেই, তবু স্ত্রী আছে। কে আগে যায় দুনিয়া থেকে কিছু বলা যায় না। বিধবা মানুষ কোথায় দাঁড়াবে তখন? এসব ভাবনা-চিন্তা যে হেদায়েত হাওলাদারের মনে উদয় হয়েছিল, তা পরে বুঝা গেল। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বড়ভায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তার পছন্দ নয়। দলিলগুলো চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে। বাপ এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার, দু ছেলেকে সমান ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোন আক্‌চাআক্‌চি হোক ছেলেদের মধ্যে নিশ্চয় তিনি চাননি।

বড় হাওলাদার দলিলগুলো এক দিন চেয়ে বসলেন। ছোটভায়ের কাছে থাকলে কোন ক্ষতি নেই। তবে নিরাপদ তার হেফাজতে রাখা। হেদায়েত এসব ঝামেলা পছন্দ করে না। সম্পত্তি আছে থাক। সে গায়ে বাতাস লাগিয়ে থাকার মালিক। তারপর আর সম্পত্তির খোঁজ রাখার কী দরকার? কিন্তু সে যে খোঁজ রাখতে আরম্ভ করেছিল, তা বুঝা যায় যখন দুতিন বার চেয়েও দলিল বড় হাওলাদারের হাতে পৌঁছল না। বহুকাল পরে শঠে শঠে কোলাকুলি শুরু হয়েছিল, এমন অনুমান স্বতঃই এসে পড়ে। দলিল কোথায়? তার খোঁজে হিদু হাওলাদার জবাব দিয়েছিল, "আমি একজন-কে দেখতে দিয়েছি।"

"আমাদের দলিল। আর অন্যকে দেখতে দিয়েছ, তার মানে?" বিস্মিত অগ্রজের পাল্টা প্রশ্ন।

"আমি দেখতে দিয়েছি, যদি কোন ভুলচুক থাকে, শুধরে নেব।" হেদায়েতের জবাব।

"সে কী কোন উকিল?"

"না।"

"তবে সে কী করে ভুলচুক বুঝবে?"

"উকিল না হলেও বিষয়-সম্পত্তি তাদের আছে। এসব ব্যাপার ভাল জানে।"

"কে সে লোক?"

"আমাকে মাফ করবেন। তার নাম আমি বলতে পারব না।"

বড়ভাই তারপর পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু ছোটভায়ের কাছ থেকে আর নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করতে পারেন নি।

এই ঘটনায় তিনি খুম মর্মাহত হন। তার ছোটভাই এমন হয়ে গেল কেন? অন্য কোন তালে নেই ত? সহজে চেতে ওঠা ঠিক নয়, তবে হাওলাদার খোঁজ নিতে লাগলেন শুধু দলিলের নয়, ছোটভায়ের গতিবিধিও ওই এলাকায় পড়ল। সে তার ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে দিন কাটায়। আহার আর স্বচ্ছন্দ জীবন ছোটভায়ের প্রধান কাম্য। সে আবার অন্য লোকের সঙ্গে দলিল নিয়ে শলা-পরামর্শ করে, জব্বার হাওলাদারের পক্ষে স্বপ্নে কল্পনাও অসম্ভব। শেষে ঘরে দুশমন। ব্যাপারটা তাকে বেশ বিচলিত করছিল। ভায়ের সঙ্গে ওঠা-বসা চিরদিনই কম। সে বয়সে ছোট। নিজের মত থাকে। বড়দের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ যদি না করে, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু দলিল ত গুরুতর ব্যাপার। গাঁয়ে তাদের তেমন শত্রু নেই। কিন্তু তারা ভাল খায় পরে, বংশ-মর্যাদায় উঁচু। তার জন্যেও ত অনেকের চোখ টাটাতে পারে। হেদায়েতকে শলা-পরামর্শ দিয়ে ভা'য়ে-ভা'য়ে মনোমালিন্য-সৃষ্টির বীজ পুঁতছে না ত কেউ? জব্বার হাওলাদার বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আর একদিন দলিল চেয়ে বসলেন।

"আমি এখনও ফেরত আনিনি।"

"এত দিন অন্য মানুষের কাছে জরুরি তায়দাদ ফেলে রাখা ভাল না।"

"বিশ্বাসী লোক। ঘাবড়ানোর কিছুই নেই।"

"তোমার মঙ্গলের জন্যে এসব বলা। আমাদের সম্পত্তি যদিও ভাগ করা আছে। তবুও যৌথ। আমরা নিজেদের মধ্যে সব ত ভাগ করিনি তাই তোমাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া।"

অগ্রজের উপদেশ ছোট হাওলাদারের কানে কতটা ঢুকেছিল বলা দায়। সে-ও ভাবতে লাগল, দলিলে নিশ্চয় কোন মাহাত্ম্য আছে। এই গাঁয়ে বাড়ি, চেনা উকিলের সঙ্গেই অবিশ্যি তার আলাপ-আলোচনা। তার কাছ থেকে দলিল নিজের বাড়িতেই এনে রেখেছিল। কিন্তু বড় ভাইকে তা জানতে দেয়নি সে। এই সময় অগ্রজ অনুজের সঙ্গ পাওয়ার চেষ্টা পেলেন। কিন্তু হেদায়েত বে-আদব নয়। দাদা ডাক দিলে সে হাজির হয়, কিন্তু শুধু দায়-সারা জবাব দেওয়ার বেশি সে আর এক লফ্‌জ (শব্দ) এগোতে অক্ষম। এই গাঁয়ে সম্পত্তি-ইজ্জৎ রাখতে অনেক গ্রাম্য দলাদলিতে জড়াতে হয়েছে। হেদায়েত তখন ভায়ের ডান হাত, বাঁ-হাত। এই ডান হাত বাঁ-হাত হঠাৎ কেটে ফেলা যায় না। অনেক কিছুর সাক্ষী এই সোদর। নিজের মধ্যে কাইজ্যা করে সব খোয়াতে হতে পারে। অতি হুঁশিয়ার জব্বার হাওলাদার। চুপচাপ রইলেন বেশ কিছুদিন। তবে তার মনে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তা একদম অমূলক নয়।

মাঝে মাঝে হেদায়েত বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেত। শ্বশুর-শাশুড়ি অনেক আগে মারা গেছেন। তার ছেলে-মেয়েরা আছে। সকলে অবস্থাসম্পন্ন। হাল-কিতার লেখাপড়া শিখে শ্যালকরা সরকারী চাকরি করে। একজন ব্যবসায় গেছে। সে শহরে থাকে, গাঁয়ে কালেভদ্রে আসে। শ্বশুর এই মেয়েকে তিনচার বিঘা জমি দিয়ে গেছেন। শালারাই দেখাশোনা করে। হেদায়েত সেখান থেকে কিছু আনে না। দশ-বারো মাইল দূরে শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু যাতায়াতের এমন হাঙ্গামা যে, সে— কী তার বউ পর্যন্ত বাপের বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে চায় না। মা-বাপ গত হয়ে গেছে। হয়ত আকর্ষণ কম। তবু বউ বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা শুনলে আদৌ উল্লসিত হত না। সেবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল স্বামী-স্ত্রী। প্রায় পনরদিন পরে ফিরে আসে তারা। তার কয়েক দিন পরে হেদায়েত ভাইয়ের কাছে এক প্রস্তাব দিলে। শুনে বড় হাওলাদার অবাক।

শ্বশুরদের ভিটা প্রায় ফাঁকা থাকে। দেখা-শোনার লোক নেই কেউ। তার শালারা তাই প্রস্তাব দিয়েছে সে যদি ওখানে চলে যায় খুব ভাল হয়।

— গাঁ ছেড়ে চলে যাবে?

অগ্রজের প্রশ্ন। মাথা নিচু করে হেদায়েত জবাব দিয়েছিল, "নাচার, ভাইসাব। ওখানে আমার সম্পত্তি রয়েছে। ও বেচারারা কেউ থাকে না গাঁয়ে। তাই আমি ঠিক করলাম—।" ছোটভাই আর বাক্য শেষ করেনি।

— বেশ। তোমার যা ইরাদা। তবে ভেবে দেখ।

— না। আর ভাবার কিছু নেই।

হাওলাদারের চোখ সজল হয়ে উঠতে দেখা গেছে, কেউ বলতে পারবে না। সেদিন দুই ভাই বেশ নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে ছিল। কিন্তু হেদায়েত তার সিদ্ধান্ত থেকে আর নড়েনি।

পাশাপাশি বাড়ি। এক দিন একদম ফাঁকা হয়ে যাবে। হেদায়েত প্রস্তাব দিয়েছিল, বড়ভাই যেন তার সব সম্পত্তি কিনে নেয়। কিন্তু কাঁচা টাকা ত তার নেই। আবদুল জব্বার নিজের দুর্বতার কথা গোপন রাখলেন। ভাইকে বললেন, "বিক্রি করার কথা এখনই ভেবো না। ওখানে গিয়ে দ্যাখো মন বসে কি না, তারপর যা হয় করো।"

কিন্তু ছোটভাই ত হাঁড়ির খবর সবই জানে। তার সম্পত্তি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার যা-ই দাম হোক, তা অগ্রজের পক্ষে কেনা অসম্ভব। মেয়ের বিয়ে দিলেন নিজের জমি বেচে। তার পক্ষে অপরের জমি-কেনার কথাই ওঠে না।

হেদায়েত হাওলাদার বড়মিয়াকে এক জবর ঘা মেরে বাপ-মার ভিটা ত্যাগ করেছিল। গ্রামের আর এক উঠ্‌তি ব্যবসাদারকে চুপিচুপি ভিটা বাদে সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় জব্বার হাওলাদারের অগোচরে। ক্রেতা জমি-জায়দার দখল নিতে এলে আর কিছু গোপন রইল না। হেদায়েত মালপত্র নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। বড় হাওলাদার ভাবেনি এমন ঘটতে পারে।

পাঁচ

হতভাগিনী লালবানু অনেক কিছুর সাক্ষী হয়ে রইল। যম ত তা-কে চোখে দেখে না।

হিদু চাচা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বসবাস করবে কারো কিছু বলার ছিল না। কিন্তু অমন দাগ দিয়ে গেল কেন? পরে আমি বাপের মুখে শুনলাম, বিক্রি করার অমন মতলব থাকলে তিনি নিজেই কিনে নিতেন। বাপ খুব দূরে-দূরে আর থাকেন না। ডেকে কাছে বসিয়ে দু-চার কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু চাচা চলে যাওয়ার পর তাকে বেশ মনমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম। গম্ভীর লোক এম্নিতে। তার উপর মুখ ভার। মনের ভেতর ওর কিছু চলছে বুঝা যেত। ভাই চলে গেছে। তার সম্পত্তি গেছে। কিন্তু সম্পত্তি ত তার। যে যা-খুশি করুক, কার কী বলার আছে? বাপ ত এতদিন তার সব সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। ভাই তার উপর অবিশ্বাসী, দুঃখ বাপের বুকে লাগতে পারে। আমার বড় খারাপ লাগত। একই ভিটা। সেদিক শূন্য পড়ে আছে। মার কাছে ঘরের চাবি দিয়ে গিয়েছিল চাচা। আমাদের সংসারে আর ক'জন লোক। পাশে অমন ফাঁকা-ফাঁকা। মনের ভার হাল্কা করতে, আগে তবু বাড়ি থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারতাম। তা-ও খসে গেল। তবে বাবা-মা আমার কাছে খুব সহজে যেন ধরা দেন এই দোস্‌রা শাদির পর। গহনা সব বাদ দিয়েছিল ওরা বিয়ের সময়। জামাই ঘরে লুকিয়ে-লুকিয়ে কিছু গহনা গড়িয়ে দেয়। সেগুলো যেন ওর বাপ-মা না দেখে বা কেউ জানে। যৌথ সংসার। অন্যান্য জা-ননদের খোঁটার খুঁটু হয়ে লাভ কী? কামেল নামটা আমার বড় ভাল লেগেছিল। গঞ্জের ব্যবসায় আরো উন্নতি হলে পরে শহরে ব্যবসা করার ইচ্ছা আছে তার। আমি ত কখনও শহর দেখি নাই। আমার লোভ হচ্ছিল খুব। একদম তার সাথে মিশে যেতে কোথায় যেন বাধত। কিন্তু কেন এই বাধা? আমি তার কোন জবাব দিতে পারতাম না নিজের কাছে। প্রতি হপ্তায় মিয়া এসে পড়ত। পনর দিন ছাড়া আসা ত বাঁধা। যখন আসত না, কাছে বুড়ি বুয়া। আমি আর একা নই। আমার মনে বড় বল পেয়েছিলাম। বুয়া জিগাত, "বু-জান, এই দুলা কেমন?" "খুব ভাল।" আমার জবাবে বুড়ি সন্তুষ্ট হতো না।

— আরে বু-জান। হাতের রাশ হাতে রাখিস। একদম সব ছাইড়া দিস না।

— ক্যান বুবু?

— একবার অমন চোট খাইলি, তবু তোর আক্কেল হয় না।

— কী যে বলো বুঝি না, বুয়া।

— মরদ-মানষ রে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নাই।

— ক্যান?

— হেরা সব দাগাবাজ।

— একজন দাগাবাজি করছে তাই বইল্যা হগ্‌গলে—

আমার কথা শেষ করতে দেয় না। বুড়ি বুয়া তখন চেতা-সুরে জবাব দেয়, "ফের চোট খাইলে তুমার যদি কিছু হুঁশ হয়।"

আমি হাসতাম। কারণ বুড়ির কথায় শুধু হুঁশিয়ারি ছাড়া আর কিছু নাই।

বাপের দিনকাল আগের মতই চলে। আমাকে মাঝে মাঝে কাছে ডেকে কথা বলেন, তার বেশি ত আমি কিছু চাইও না। মা অবিশ্যি চিরকালের শান্ত মানুষ। তার কাছ থেকে কোন উপ্‌চানো কিছু মেলে না। আদর করতেন ছেলেবেলা। তখনও কিছু বাড়াবাড়ি ছিল না। যদিও ঝাপ্সা পুরাতন দিন। তবু কিছু কিছু ছবি ত পরিষ্কার। আমার দোস্‌রা শাদির পর তাই আর মনে তেমন ভার ছিল না। নতুন মানুষ পেলাম। সে ত আমার গোলাম বনতে রাজি আছে। মিষ্টি কথা কত যে বলে। তার কোনটাই মনে হয় না বানিয়ে বলছে। সব আসছে বুকের ভেতর থেকে। "লালী, অত চুপচাপ ক্যান? মুখ চুপচাপ ত হাতও অমন বন্দ রাইখবে।...ওটা চালু কর! পাশে মড়া নিয়ে শুয়ে থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়? ...বুকে বুক মিলাইয়া তুমি অমন ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফ্যালো ক্যামনে? মুখ বন্ধ কইরা আছো। তয় তোমার মুখে আমার মুখ থুইয়া তা-ও বন্ধ কইরা দিই...আমারে চুমু দিতে ভয় পাও ক্যান?"...হাতে হাত লাগলে সরিয়ে নিই। আবার পরক্ষণে হাতে হাত ধরি। তখন সে এমন জোরে আমাকে টান মারে যে তাল সামলানো দায়। তারপর দেখি আমি তার বুকের উপর। তৌবা, বুক উদোম, পেছনে উদোম। মার-প্যাঁচের খেলায় আমিও সায় দিতে শুরু করেছিলাম। পনর দিন পর সে আসত। বই আনতে ভুলত না। আমাকে বলত, "ইস্কুলে যাওয়ার দরকার কী? মন থাইকলে নিজে নিজে অনেক কিছু শিখ্যা নিতে পারো।" আমার ত সময় কাটার কথা আছে অন্য সময়, যখন যে কাছে থাকে না। সময় আমার ভালই কাটছিল। পথ চাইতে শুরু করেছিলাম, দিন গুনতে শুরু করেছিলাম। মনে গেরো রাখার কোন দরকার নেই। এমন মানুষ কাছে থাকলেই সুখ। তখন অন্য কিছু আর লাগে না। কিন্তু ওদের মন কখন কী হয়, কে জানে? আবার গোড়ায় ফিরে যাই। পুরাতন কথা মনে এলে অনেক সময় বমি-বমি লাগে। আমি তখন ছোট। মরদের মর্যাদা জানতাম না। তা-কে চিনতে পারিনি। বেচারা ভেতরে-ভেতরে বহু তক্‌লিফ সয়েছে। এখন আমি নিজে তা টের পাই। বুধবারে ওর হপ্তা। এক বুধবার গেল, অন্য বুধবার তার আসার তারিখ। সেদিন সকালে মনে হত যদি আজ না আসে ও। শুরু হতো মনের ভেতর এলোপাতাড়ি দৌড়াদৌড়ি। ঘরের জানালার কাছ থেকে বেশি দূর দেখা যায় না। ভিটের চতুর্দিকে বাঁশবনের ঝাড়। ফাঁক দিয়ে যদ্দুর চোখ যায়, সেখানে ফাঁকা কিছু শূন্য জায়গার ভাব। সেখানেই চোখ পড়ে থাকত, এদিক ওদিক হত না। যদি না আসে। ওই একটু ভয়— ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা ভেবে ভয় ঘিরে থাকত আমাকে। কিন্তু খুদার মরজি। বর্ষাকালে যাতায়াতের খুব অসুবিধা. তখনও অমন কিছু হত না। পরে আমাকে বুকে জড়িয়ে বলত, 'না এসে কী পারি?" আমি পাল্টা কোন দরদ দেখাতাম না। খুঁৎ তবু মনের ভেতর? আঁধারে ঠোঁট বাঁকিয়ে নিঃশব্দে হাসতাম। বাইরে কিছু বলতাম না। হাত হয়ত কিছু জবাব দিত দায়-সারা গোছের। সেই অন্ধকারে বুড়ি বুয়াও যেন চিৎকার দিত, "মরদ মানুষরে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নাই।" কোথায় যে জড়তা, বুঝা দায়। তবু খুদার কাছে শোকর, দিনগুলো আমার ভালই লাগছিল। একা-একা ভাব অনেকখানি কেটে গেছে। বুয়া-কে পাই বড় সমব্যথী। আর যখন কামেল আসে বুধবার-বুধবার নিজের ভেতরে তখন আনন্দে ডুবে থাকি। ও এলে একনাগাড় চার পাঁচ দিন কাটিয়ে দিতে পারে না। ব্যবসার খাতিরে চলে যেতে হয়। রোজগার না থাকলে ত সংসারের রসও চলে যাবে। ওর মুখে শুনতাম। মরদের অভাব কী মেটাতে পারে? তবে বুয়া কাছে থাকলে মনে হত আমার বুক ভরা আছে। মার কোন দোষ নাই। বেচারা একদম গোবেচারা। বাপের ঠিক বিপরীত। এখন বলতে পারি, আমার বাপ খুব ধড়িবাজ লোক ছিলেন। গাঁয়ে মাতবর বলে তার খাতির খামখা না। কিন্তু তুখোড়, ধড়িবাজ লোক। কিন্তু তখন বাপ আমার কাছে ভয়ের একটা কিছু। তার মুখ-বরাবর সোজাসুজি চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারব এমন সাহস আমার কোন কালেই হত না। কিন্তু জীবনের ভেলা কোথা-কোথা না দিয়ে শেষে এক শক্ত ডাঙা কিনারায় এসে ঠেকল। তাই অমন দাপটের সঙ্গে আমি কথা-বলার তাগদ পেলাম। নচেৎ ঘাস

ছিলাম। ছাগলে খেয়ে যেত, লোক পায়ে মাড়িয়ে যেত, আর মাথা তুলে কিছু দেখতে পেতাম না। এক দুনিয়া থেকে যেন আর দুনিয়ায় ছিটকে পড়লাম। কিন্তু কত রগড়ানি গেল বুকের উপর দিয়ে আজ আর তা হিসাবে মন এগোয় না।

ভালই কাটছিল আমার দিন। শ্বশুরবাড়ি যেতে আমার আর আপত্তি থাকত না। বাপ-মার জন্যে মন খারাপ হয়। বুড়ি বুয়া বলে, "বু-জান, হে আর ক'দিন? পেরথম পেরথম এক হপ্তা, দু-হপ্তা নেই এক মাস দু'মাস। তারপর আর বাপের বাড়ির দিশা অত দুঃখায় না। মাঝে মাঝে মনে পড়ে— একটু কষ্ট। বেশিক্ষণ থাকে না তা। যার কাছে মাইয়ারা যায়, হে যদি মনের মত হয়, দুনিয়ায় আর সব কিছু তুচ্ছ লাগে। বু-জান রে, অহন ভুলতে পারি না মানুষডা-কে। কিন্তু আল্লা কবালে দুক্ষু রাখলে কে খণ্ডাবে, বুবু।" তারপর বুড়ির দুই চোখ ভরে পানি ঝরত। আমি তার চোখ মুছিয়ে দিতাম নিজের আঁচলে। বেচারা! তখন আমার মনে হত, কী জানি, আমার নসিবেই বা কী আছে। এই ত বুড়ি মানুষ। সারা জীবনে দুঃখ সয়েই গেল। এ-বাড়িতে এসেছে যখন খাটতে পারত। এখন ত আর সে-তাগদ নেই। বাড়ির অবস্থা ত আর ফিরছে না। হিদু চাচা থাকলে না হয় একটা দশা ছিল। তার সম্পত্তির আয় ত বন্ধ। বাড়তি লোক বাড়িতে যদি বাপ না রাখে। এই বয়সে বুড়া মানুষ কোথা যাবে— ভাবতেও খারাপ লাগে। কামেল-কে আমার ভাল মানুষই মনে হচ্ছে। যদি তেমন কিছু ঘটে আমি ওকে বলে রাখব, বুয়া যেন বুড়া বয়সে কষ্ট না পায়। আমার যখন রাত পোহাত না সহজে তখন ওই অনাথিনী বুড়ি আমাকে বাঁচিয়েছে, মরার হাত থেকেই বলা চলে। আমি কি খাই তা-ও দেখত। কম খেলে অসুখ করবে। তখন দুঃখ কী কমবে? বুড়ি বুয়া আরো বলত, "শোন, বু-জান। গতর ভাল থাইকলে দুক্ষ-কষ্ট সওয়া যায়। কাহিল গতরে দুক্ষ আরো ঘিরা ধইরব। খাওয়া-দাওয়ার উপর রাগ করো না কোন দিন।" সেই সব বুলি সহজে ভোলা যায় না।

কামেলের কাছে আমি ধরা দিতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে যাইনে। মনে মনে সব রাখা। ভেতরে ভেতরে আমার মনে হত, ও থাকলেই হল। আর দুনিয়ার কিছু দরকার নাই।

কিন্তু আমার দুনিয়া যেন ছক-বাঁধা। যেন একই ভাবে যা ঘটবে, তা কেউ আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। তার এদিক-ওদিক হবে না এক চুল।

সাধারণত কামেল আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছত সাঁঝের কিছু আগে। কোন কোন দিন দেরি হয়ে যেত। নৌকা লঞ্চের ব্যাপার। দেরি হতেই পারে। জোয়ার-ভাটা, নদীতে পানির প্রশ্ন আছে। কিন্তু তখন আমার বুকে ঢেকির পাড় পাড়ত। নানা রকম অলখ্খুনে কথা উঠত মনে। যদি আর না-ই আসে কোন দিন। এমন অপয়া ছবি সামনে। নিজে মন-কে হাজার বুঝানোর চেষ্টা করতাম। দেরি ত হতেই পারে। কিন্তু অবুঝ মন আমাকে পাগল করে ছাড়ত। এদিক ওদিক উঠানে পায়চারি করি। মগরেবের অক্ত। ইমাম আজান দিত মসজিদে। আমি মাথায় কাপড় দিতে ভুলে যেতাম। খেয়াল থাকত না কোন দিকে। তখন সদরে লোকজন হয়ত আছে। গাঁয়ের কোন চাষিবাসি। বাপের কাছে ত কতো মানুষ আসে। কিন্তু সে সদরে পৌঁছলেই, আমাদের একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল্‌চে ধরনের কুকুর ছিল, ঘেউ ঘেউ করে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে রাখাল ছেলে বা আর কেউ খবর দিয়ে যেত, "চা বানান, দুলামিয়া আইছে।" আমার বুকের ধরফড়ানি তখন বেড়ে যেত। যেন শুনেও কিছু শুনছি না। কিন্তু ভেতরে আমার খুশির জোয়ার ধীরে ধীরে বইতে শুরু করেছে। মাঝখানে আমি কিছু ঠিক করতে পারি না। কেমন দিশেহারা। তারপর আবার শান্ত হই আস্তে-আস্তে। বুকে তখন খুশির বান কুলুকুলু গাইতে শুরু করেছে। এমন কতো সাঁঝ না গেলে। একবার অপেক্ষা সার। রাত দুপুরে এসে কামেল ডাকাডাকি করে। চড়ায় লঞ্চ আটকে এত বিলম্ব। আমার মড়া ধড়ে সেদিন জান ফিরে এসেছিল কোন রকমে। সেবার ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। রাতে শোয়ার আগে দেখা হতে আমি তার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে দিই। "কী হল? কান্না কিসের?" "তোমার আসতে এত দেরি।" এই জবাব দেওয়ার পরই আমার মনে হয় আমি ধরা পড়ে যাচ্ছি। তাই পরক্ষণে আবার জোড়া দেই, "এত রাত। বিপদ-আপদ যে-কোন মানুষের হতে পারে। ভয়ে অস্থির ছিলাম।"

জম-জমাট একাকার হওয়ার আগেই এই খেলা ভেঙে গেল।

দু'বছরও যায়নি বা তিন বছর হতে পারে। তার মধ্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল। আর একবার মাত্র সেখানে গিয়েছিলাম। পরে যাওয়ার কথা উঠলে কোন না কোন বাধা পড়ে গেছে। এই পক্ষের শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ খুব বুড়া নয়। হয়ত ওদের অসুখ-বিসুখ কম। তাই আমাকে নিয়ে যাওয়ার কোন তাগিদ ছিল না। অথবা, এমন হতে পারে যে কামেলের বাপ খুব হিসেবী মানুষ। ভেবেছেন, একজন লোক বাড়া মানে একটি পেট বাড়া। সেখানে আহার যোগান লাগে। এতদিন পরে এসব ভাবতে পারছি। দশ বছর আগে আমার আক্কেলের দৌড় এমন ছিল না। শ্বশুরবাড়ির ব্যাপার তারা জানে। বাপের বাড়িতে আছি। আর এখন সুখে আছি। শ্বশুরবাড়ি গেলে একজন-কে আমি রোজ পাব। তা ঠিক। কিন্তু অন্য অসুবিধা ত থাকতে পারে। অতশত ভাবনা তখন ছিল না। আজ মনে হয় কতো পুরাতন কথা। খেই ধরা দায়।

একদম আগেকার ছক।

কামেল এতদিন একনাগাড় কখনও শ্বশুরবাড়ি থাকত না। সেবার পাঁচ দিন রয়ে গেল। গঞ্জে ব্যবসার কাজ, বুঝিয়ে দিয়েছে। একদিন থেকে আর চলে যেতে হবে না। আমি মনে মনে খুশি। রাত কেন দিনেরও বেশ কিছু সময় এক সাথে কাটবে। দুপুরের খাওয়ার পর ঘুম। এই ঘুমও মধুর হবে। হয়েছিলও তা-ই। আমি কী জানতাম, কালরাত্রি সামনে। আমি বিন্দু বিসর্গ জানিনে। শ্বশুর-জামাইয়ে কী হয়েছিল। কথা ধরে কোন বচসা, মন-টানাটানি বা তেতো কোন সম্পর্ক। আমি কিছুই জানলাম না। সদরে ডাক পড়েছিল কামেলের। বাপই খবর দিয়েছিলেন। তারপর সামান্য কথা-কাটাকাটির শব্দ শোনা গেল। আমি ত কান-খাড়া করে আছি। তা-ই হয়ত আবছা আবছা কিছু কানে এসে ঘা দিয়েছিল। তারপর আর সারারাত কামেলের দেখা নেই। সারারাত আমি ঘুমোইনি। শেষে একটু খোঁয়ারি ধরেছিল। সেই টানে সামান্য ঘুম। তখন রোদ উঠে গেছে। আমি একদম চুপ থাকতে পারলাম না। হঠাৎ বুকে বল কে যেন যুগিয়ে দিয়েছিল। মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, কামেলের কথা। "কী জানি, কী অইছে। তর বাপ আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কয় নাই।" আমি আর প্রশ্ন করতে পারিনি। মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি। বাপও নাকি অন্দরে আসেননি। এলেই বা কী। তাঁ-কে ত আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না। হঠাৎ ঝড়ে সব ওলটপালট। দুপুরের খাওয়ার পর আমাকে বাপ ডেকে আদিখ্যেতা করলেন আমার মাথায় হাত রেখে। নিজের কাছে বড় আদরে বসালেন। আর কখনও অমন আদর পেয়েছি মনে পড়ে না। বাপের কাছেই শুনলাম। ওই ছোকরা আসলে বদ্‌মাশ। ওর আর এক বউ আছে। সে-ঘরে ছেলেপুলে আছে। মিঠা-মিঠা কথা বলে। ওসব নাকি তার বদ্‌মাশী ঢাকার জন্যে। বাপের দুঃখের অন্ত নেই। না জেনে এমন জানোয়ারের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন। এত কথা সেদিন আমার কানে কী ভাবে যে ঢুকেছিল, আল্লা জানে। মাথার ভেতর ঝন্‌ঝনি-শব্দ। দুপুরে এক মুঠো কোন রকমে গিলেছিলাম। তারপর নিজের বিছানায় কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে জানি নে। সাঁঝ-বাতি দিতে এসে মা আমাকে ঘুম থেকে তুলেছিলেন। কম কথার মানুষ তিনি। আমার পাশে বসে তবু বললেন, "মা রে, সব নসিব। এমনও কপালে থাকে! দু-বার দাগা খাইলি, মানুষ চেনা দায়।" মার কথায় আমার কী হবে? একটা মানুষকে তারা যা-কিছু বলতে পারে। কিন্তু আমার মন আছে। আমার মন বলে, না, সব মিছা কথা। সব মিছা কথা। বাপ-মা মুরুব্বি। তাদের কথা ছেলেমেয়েদের ভালোর তরে বলে। তবু সব মিছা। এই মিছা বাপ বানিয়েছেন।

আজরাইলের মত রাত এগোয়। সেদিন খেয়েছিলাম বৈকি কিছু। বুড়ি বুয়া আমার পাশে। সে আমার হাত নিজের হাতে এমনভাবে চেপে ধরেছিল যেন আমার সব দুঃখ ওইভাবে আমার কাছ থেকে তার কাছে চলে যাবে। একজনের দুঃখ আর একজন মুছে দিতে পারে না সত্য। কিছু ভার বওয়া কঠিন নয়। বুয়ার কথা, বুয়া পাশে আছে, হাত বাড়ালেই তা-কে পাব— এই বোধ, আমার মনে অনেক শান্তি দিয়েছিল। সে পুরাতন কথা তুললে, "বু-জান, আমি বলি নাই, মরদ মান্‌ষে বিশ্বাস কইরলে ঠকতে হয়।" আমি আপত্তি তুললাম। নিজের অনেক কথা ওর কাছে বলতে লজ্জা পেলাম না এক ফোঁটা। সব শুনে বুয়া বুড়ি মাথা দোলায়। আমি যেন তা-কেও বুঝাতে পেরেছি, সব মিছা কথা। কিন্তু লোকটার কি হল? আর একটা মানুষের ত পাঁচ বছরেও কোন হদিস পেলাম না। তারা গহনার দাবি ত করতে পারত। কাবিনে দেনমোহর আছে তার টাকা অবশ্য তাদের দিতে হবে। সেই জন্যে হয়ত তারা আর কোন খোঁজ দেয়নি। লোকটা-কে বাপ খুন করেনি নিশ্চয়। পুরাতন ঘা আবার দগ্‌দগে কাঁচা হয়ে দেখা দিল। যখন সব বুকের ভেতর তৈরি, শুধু বাইরে তা বের করব— তখনই এমন শেল পড়ে গেল। বুড়ি বুয়া যে বলে, সব নসিব, বু-জান। তা-ই কী ঠিক? এই সময় প্রায় খাবের ভেতর আবার হাঁটতে লাগলাম। ফিস্‌ফাস শব্দ চারদিক থেকে কতো কী শুনিয়ে যায়। 'লালী, ভার লাগে না ত তোমার বুকের উপর শুয়ে আছি। ... তোমার ঠোঁট এত ঠাণ্ডা কেন এখনও। ... তোমাকে নিয়ে একবার কোথাও নাইওর যাব। এক মাস বাড়ি ফিরব না। চব্বিশ ঘণ্টা এক নাগাড় লগে থাকব...একদম ছাড়াছড়ি এক লহ্‌মার জন্যে হব না।...আমি দাগাবাজ নই...কতো বার বলেছি কত শত বার তবু আবার বলছি আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি...।" শেষে কে যেন আমার কানের ভেতর চিৎকার দিতে থাকে। "বু-জান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ঘুমাও। এ দুক্ষু থাইকব না।" কপালের কাছে মার-খাওয়া সরল মানুষ। হদিস করতে পারে না সব। এই দুঃখ কী যাওয়া অত সহজ? মানুষের বদলে মানুষ মেলে। কিন্তু ওই মানুষটা কে এনে দেবে? সে ত আর আসবে না। একজন গিয়েছিল পাঁচ বছর আগে। কতো দিন ভেবেছি সে এসে পড়বে। বুয়া কইত, "বু-জান, তুমার হক্কের ধন অইলে ফের ফিইরা আসব। হে কেউ ঠ্যাকাইয়া রাখতা পারব না।" আবার সেই কথা বুয়ার মুখ থেকে নতুন করে শুনলাম। ঢেঁকির পাড় বুকে পড়তেই থাকে। বাপের আদরের বহরে আরো ঘাব্‌ড়ে যাওয়ার কথা। অন্দরে থাকলে আমার লগে ডেকে ডেকে কথা বলে। তার সান্ত্বনা হরদম মেলে এখন। কিন্তু বাপ ত বুয়া নন। আমার বুকের কাছে ওসব কথা যেতে পারে না। "লালু আম্মা, মনে রাখিস, জুতা যদি পায়ে না লাগে, হে-জুতা বদ্‌লানোই ভাল। আখেরে আরো ভাল হয়। মান্‌ষে বলল, দোজবরে বটে তবে ছোকরার স্বভাব-চরিত্তর ভাল। অহন বুঝলাম হগ্‌গলে মিছা কথা কইছে...।" এসব আদিখ্যেতা আমার কানে ঢুকত না। বাপ ডেকে এনেছেন তাই একদম পাশে যখন-যেমন দাঁড়িয়ে থেকেছি বা বসেছি। পুতুল আমি তখন। আমার ধড়ে কিছুই ছিল না। যন্ত্রপাতি কিছু থাকতে পারে। কিন্তু রক্তমাংস না। মা হয়ত এক পাশে বসে বাপের জন্য পান সাজছেন। আমি অনেক সময় তার কাজে সাহায্য করতে লেগে যেতাম। বাপের ওয়াজ-নসিহৎ অন্য দিকে চলতে থাকত, যতক্ষণ না পান মুখে গুঁজে চিবোতে-চিবোতে সদরের দিকে বেরিয়ে যান। দুঃশ্চিন্তায় বোঝাই মন। শরীর ভাল থাকা দায়। ক'দিনে শুকিয়ে গেলাম। বেচারা বুয়া শুধু আমার চেয়ে আদিখ্যেতা করে। "বু-জী, মাথায় ত্যাল দ্যান না ক্যান? দেহেন ত মুখের ছিবি ক্যামন অইছে?" সে-ই মাঝে মাঝে এমন খবরদারি করত। দু'টি মুখ তখন আমাকে রেহাই দিত না। কামেল যেন সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে মিটিমিটি হাসছে। সেই মুখ হঠাৎ আর একজনের মুখ হয়ে গেল : আমার পয়লা পক্ষের দুলা। তার মুখ ভার। আঙুল তুলে গোস্বার সঙ্গে আমাকে বলছে, "তোমার বাপ আমাকে খুন করেছে। গাঁয়ের লোক তার হাত-বশ। আমার ত কেউ ছিল না। আমি মানে মানে ওরা যা বললে মেনে নিলাম। আমার লোকজন থাকলে কী অত সহজে তোমাকে হারাই। তোমাকে আর কী দোষ দেব? তোমার ত কোন কসুর নেই। দাগাবাজ বাপ তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দাগাবাজি করল। থুঃ, অমন শ্বশুরের মুখে...।" তার গলার আওয়াজ আমার কানে লেগে থাকতে থাকতে হঠাৎ স্বর বদলে যেত। কথা বলছে কামেল। "তুবি বেদরদী খুব ছিলে না। আমার দিকে তোমার পুরো না হোক কিছু টান ত ছিল। আমি ব্যবসা করে খাই। আমি তোমার সেই টানটুকু পুঁজি করে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। মাঝে মাঝে নাফা (লাভ) ভালই হত। আবার লোকসানের চোটও পেতাম। ব্যবসা করতে গেলে তা অমন হয়ে থাকে। আমি কিছু হতাশ হইনি। কিন্তু এ কী হলো? এক সঙ্গে পাঁচ দিন ত বিয়ের পর থেকে থাকাই হয়নি। এলাম অবসর হাতে। নির্ভাবনা ক'টা দিন কাটবে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা মা তবু বলেন কখনও-কখনও। কিন্তু বা-জান তেমন গা করতেন না। আমি ভাবতাম, তুমি খুব ডাগর নও। তাই ছেলে-মানুষি আছে তোমার আচারে-ব্যবহারে। বাপের বাড়ি থেকে আরো সেয়ানা হও। তখন সব সুদে আসলে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হয়ে গেল আর এক কাণ্ড। আমার

কষ্ট হয়েছিল কিনা— তুমি জিগালে কোন জবাব দেব না। কারণ দরকার নেই। তুমি নিজেই জানো আমার কী হতে পারে অমন অবস্থায়।" অমন গলার আওয়াজের ভেতর ভেসে উঠত দুই ডাগর কাজল চোখ। পুরুষের চোখ ছলছল করে উঠছে। তারপর ওই মুখ নিচু। আর চোখ দেখতে পাইনে। একটা লোকের মুখ গিয়ে ঠেকছে বুকে। অন্ধকারে সব স্পষ্ট দেখা যায় না। আমি হাত বাড়াই বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সব কিছু নাগালের বাইরে। দুই মুখ পাশাপাশি পিছিয়ে যায় তরতর বেগে। আমি যেন দৌড়াচ্ছি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। বুক দুম্‌ড়ে শ্বাস ফেলি। পাশে বুয়া জেগে ওঠে। তারপর ডাকে, "লালু বুজি।" আমি জবাব দিই না। বুড়ি মানুষ চুপ করে যায় না। নিজের মনেই বলে যায়, "আল্লা তুমি ত সব-কিছুর মাবুদ। আমার এই বুবুর দীলে শান্তি দাও। এই কচি বয়স। এক এক বার নয়, দু-দুবার ঘা খাইল। তুমার বান্দা অনেক দুঃখ সইতে পারে তুমি যদি পিঠের উপর ঢাল হয়ে দাঁড়াও। আমাকে অনেক দুক্ষু মানুষে দিল। তুমি বুকে সবুর দিলে। তাই সব সয়ে-সয়ে চলতাছি। অহন এই মাসুম (নিরপরাধ) বাচ্চা মাইয়াডারে তুমি রহম (দয়া) করো... হে আল্লা, হে খোদা দো-জাঁহানের মালিক...আমি আমার তরে দোয়া মাঙি না। তুমি এই মাসুম বুবুর বুকে তাগদ দাও। তুমি ত সবই দেখতে পাও... হে খোদা... হে আল্লা...রহম করো...।" আমার কানে প্রতিটি শব্দ যায়। আমি চুপ করে মট্‌কা মেরে পড়ে থাকি। আহা, বেচারা বুয়া!

হয়ত সেই বিধবা-জনের ফরিয়াদ আল্লার দরবারে পৌঁছেছিল। কে জানে, এমন ত হতে পারে।

বছর দেড়েক পরে আমি আবার শান্তির বৈঠা দেখতে পেয়েছিলাম। সেই রাস্তা ধরেই ত সুখ আসে।

বাপ আবার আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। ভেতরে যতই ফুঁসে উঠি না কেন, আমার ত কিছু বলার থাকে না। তিনি চালান আমি চলি। আমাদের গোটা সংসার তাঁর হুকুমে ওঠ্‌-বস্‌ করে।

তেস্‌রা শাদি। তবে ধুমধাম কিছু কম ছিল না। অনেকে ভাবতে পারে, আমার দুলা জোটে কিভাবে। বাপের হদিস কি যারা সম্বন্ধ করতে চায়, তারা জানে না? শাদি অনেক খোঁজখবর নিয়েই দেওয়া হয়। তারা আমার কাহিনী কী জানে না? দু দু'বার তালাক। তবু বর জোটে। কারণ আমার রূপের তারিফ ত এ-কান সে-কান, এ-গাঁ সে-গাঁ হতেই পারে। তাই দুলা-পক্ষ সব মানিয়ে নেয়, মেনে নেয়। এক-আধটু খুঁতে কী এসে যায়। তেস্‌রা দুলা-মিয়ারও বউ মারা গেছে বিয়ের অল্প দিন পরে। তবে আমি তেজ্‌বরে এবং সে দোজ্‌বরে। তফাৎ বেশি কিছু না।

মরদের হাল-হকিকত আমার অনেকখানি জানা হয়ে গেছে। বয়স ত এক জায়গায় বসে নেই। আয়নার সামনে, আমার নিজের দিকে তাকাই। বড় ভাল লাগে। অবহেলা করতে পারে হয়ত কেউ-কেউ। কিন্তু আমি যার পাশে শুয়ে থাকব, সে আমার দিকে চোখ না ফিরিয়ে পারবে না। এত রগড়ানি চোটপাট গেছে মনের উপর দিয়ে, তা খামখা যায়নি। বয়সের সঙ্গে আমিও বুঝতে শিখছিলাম। ভেতর-ভেতর আমার বুকের পাটা চওড়া হচ্ছিল বৈকি। ঠেকে অনেক কিছু শেখা যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বেশি দেরি হয় নি। ওর নাম মুবারক। ওকে আমার চোখের দেখা দরকার ছিল শুধু। দু-দিন সম্ভব ছিল না। নতুন বউ। লজ্জায় মরে থাকা। তিন দিনের দিন সে ফিরতি এলো আমাদের বাড়ি। সাহসে দুই চোখ খুলে আমি ওকে দেখলাম। তারপর আমি দেরি করিনি। মন সঁপে না দিলে মন পাওয়া ভার। আমার শরীরে বান ডেকেছিল খুশির। ছ্যাঁকা খেয়েছি পূর্বে দু'বার। ভবিষ্যৎ কোথায় যায়, কি যে কী হয় কে জানে। কিন্তু আর হিসাবের ব্যাপার নেই। পুরাতন দাগ মুবারক তার গোরা পুরুষালি আদল দিয়ে সব মিটিয়ে দিলে কারণ-অকারণ চুমোয় চুমোয়। পেরথম একাকার হতে শিখলাম জীবনে।

এই ভাবে বাকি দিন কেটে যেতে পারত। মুবারকের বাপ-মা নেই। মানে, শ্বশুর-শাশুড়ির বালাই নেই। সুতরাং কোথায় থাকলাম, ক'দিন থাকলাম— কেউ হিসেব নেবে না। মাথার উপর দুই বড়ভাই, নিচে ছোট একজন। শহরে ছোট কেরানির চাকরি করে মুবারক। এখনও যৌথ সংসার। তবে আলাদা কেউ হয়নি বাপ মারা যাওয়ার চার পাঁচ বছর পরেও। মোটামুটি সকলের সম্পর্ক খুব ভাল। জমি-জিরাৎ, মফস্বলে ছোটখাট ব্যবসা ইত্যাদির জোড়াতালি দিয়ে ওদের সংসার চলে যায়। শ্বশুর বা শাশুড়ির চাপে সেখানে গিয়ে দিন গুজরানের সমস্যা সেখানে ছিল না।

আমি অপর জনের ভেতর পেরথম উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে শিখেছি। এই ভাবেই ত আরো সামনের বছরগুলো কেটে যেতে পারত।

কিন্তু নদী আবার আওড় নিল। সেই পুরাতন বাঁকে। সেখানে সব মাপা। যা ঘটার তা ঠিক আগের মতই নক্‌শা দিয়ে ভেসে উঠল।

মুবারকের ডাক পড়েছিল এক রাত্রে বাইরে আমাদের সদরে। সে আর ফিরে এলো না। পরদিন এবার সাহস করে মার কাছ থেকে তার খোঁজ নিতে তিনি বললেন, বাপের সঙ্গে কী যেন বচসা থেকে কাইজ্যা। তারপর সে রাত্রেই চলে যায়।

পুরাতন দিনের কথা আর নতুন করে কিছু বলব না। বুড়ি বুয়া আমার সহায় হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুমের ঘোরেই আমার জন্যে সে দোয়া করত। মুবারক কী আমাকে তালাক দেবে? তালাক দিতে পারে কী? এই সব সওয়ালের একটা জবাবই আমি পেতাম— না, না, না। অসম্ভব।

আগের মতই দেখলাম বাপের গম্ভীর মূর্তি আরো গম্ভীর। মুবারক কী বেয়াদবি বা গর্হিত কাজ করতে পারে যে হঠাৎ ওলটপালট। সাময়িক রাগ হয়। ভাল সুবাদ থাকলেও হঠাৎ-হঠাৎ রাগ উঠতে পারে। কিন্তু আমি ত নিজে ভুগেছি। অমন রাগ পড়েও যায়। দুনিয়ার বহু পরিবারে তা ঘটে। কিন্তু আমার নসিব ত অন্য রকম। দু'বারের পর এই তেসরা বার। আমি কী করে অন্য ভাবে সান্ত্বনা পাব? মুবারক আমার সামনে যদি এসে বলে, তোমাকে ছেড়ে দিলাম চিরতরে, তাহলেই আমি বিশ্বাস করব। নচেৎ সবই মিছা ঝুটা। আর সবাই বেঈমান, মিথ্যুক।

এক হপ্তা রাত্রে বুয়ার পাশে শুয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতাম। পাগলের মত কখনও মনে মনে হাসা, আবার পরক্ষণে কান্না। বুকের বল হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কিন্তু এক হপ্তা যায়নি, হঠাৎ একদিন মা এসে খবর দিলেন, বাপের তলব। সকালে নাস্তার পর বাপ নিজের ঘরে হুঁকা টানছিলেন। তার মুখেই শুনলাম মহকুমা সদরে গিয়ে

মুবারক নালিশ করেছে। কিসের নালিশ? বাপ নাকি জবরদস্তি খুন করার ভয় দেখিয়ে তালাকনামা লিখিয়ে নিয়েছে। কোর্টে মামলা। বাপের অমন নরম আওয়াজ আর আমি কখনও শুনিনি। তিনি আমাকে বললেন, "মা, এখন আমার মান ইজ্জৎ সব তোমার উপর নির্ভর। আদালতে তুমি বলবে— আমার স্বামী আমার উপর জুলুম করত। যৌতুক আরো দেওয়ার কথা ছিল, তা সে পায়নি। সেই জন্যে আমার উপর চাপ দিত এবং শেষে মারপিট চালাত দিনের পর দিন। এই ভাবে আদালতে হাকিমের সামনে তোমাকে বলতে হবে। তা না হলে আমার জেল হবে। হ্যাঁ জেওরের কথা উঠবে। তুমি হাকিম কী উকিল জিজ্ঞস করলে জবাব দেবে, গহনা মুবারক সব নিয়ে গেছে।"

আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম। এ কী। এসব নিয়ে মামলা হতে পারে না কি? গহনার কথা এত দিনে আমার মনে পড়ল। গহনা ত আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে কম পাইনি। বাপ সব নিজের কাছে রেখে দিতেন। গাঁয়ে চুরি ডাকাতি বেড়েছে। তাই তার কথা-মত বাপের সিন্দুকে সব রাখা থাকত। শুধু নিজের হাতে কানে সামান্য কিছু জেওরের কথা এত দিনে আমার মনে হল। বাপের কাছে আছে, তা নিয়ে অত ভাবনা চিন্তার কী থাকতে পারে?

বাপ যে বেশ বিচলিত তা আমার টের পেতে দেরি হয় না। আমাকে প্রতিদিন পাখি-পড়া করান আদালতে কী বলতে হবে। উকিল নাকি নানা রকম জেরা করে। আমি ঘাব্ড়ে গিয়ে যেন উল্টোপাল্টা কিছু বলে না ফেলি। তাহলে তিনি জেল খাটবেন।

শেষ পর্যন্ত আমার দুনিয়ার আরো সীমানা দেখার সুযোগ মিলল। নানা-নানি অনেক দিন পূর্বে গত। তেমন আত্মীয়স্বজন ছিল না যে নাইওর যাবে। তাহলে আমার ঘোরাঘুরি হত। এই ভিটের ভেতরই ছাব্বিশ-সাতাশ বছর কেটে গেছে।

কিন্তু মহকুমা আদালতে আমারও ডাক পড়ল। আসল মামলা ত আমাকে নিয়ে। সেখানে আমার হাজিরা দিতেই হবে। বাপের চেহারা সেই ক'দিনে দেখার মত। অস্থির আর ব্যস্ত সারাক্ষণ।

আমাকে নিয়ে আদালতে পৌঁছানো সহজ ব্যাপার নয়। মার একটা বোরকা ছিল পুরাতন, তা-ই আমি পরে নিলাম। তারপর নৌকায় কিছু রাস্তা কিছু রাস্তা বাসে। এক উকিলের বাসায় আমি উঠলাম। তিনি আমাকে ঠিক বাপের মত সব বুঝাতে লাগলেন। আমার বলা-না-বলার উপর কী নির্ভর করছে। একটু এদিক ওদিক হলে বাপের ঠাঁই জেলে। আর গাঁও গেরামে যে ইজ্জৎ ছিলো, তা কিছু থাকবে না। আমাকে একান্তে পেয়ে বাপ আরো বললেন, "মা, হাজার হাজার টাকার গহনা। তিন বারে তোর বিয়েতে কতো খরচ গেল। তোর চাচা হিদু দাগাবাজি করলে ছোটভাই হয়ে। ওর গহনা দাবি করলে কোথা থেকে দেব? জেল-খাটা ছাড়া আর রাস্তা থাকবে না।"

বুক টিপটিপ করছিল যখন কাঠগড়ায় উঠলাম। আগে ত বসেছিলাম! তা-কে পেরথম দেখতে পাইনি। তারপর নেকাবের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, মুবারক শামলা-পরা একটা লোকের সঙ্গে কী যেন বলছে। তার উকিল হবে। হ্যাঁ তারই উকিল। কিন্তু কী হবে পুরাতন দিনের কাসুন্দি ঘেঁটে। মুবারকের উকিলের কথাগুলো আমার কানে আজও বিঁধতে থাকে। সব ঠিক ঠিক মনে নেই। তবে কথা স্পষ্ট। বুঝতে কোন কষ্ট নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"...মাননীয় আদালত...নানা রকম ফন্দিবাজ আছে দুনিয়ায়। ...তবে এমন ফন্দি আর সহজে দেখা যায় না। .....এই মেয়ের আরো দুবার শাদি হয়েছিল। তৃতীয় দফা শাদি হয় আমার মক্কেলের সঙ্গে। আগে দু'জন ওকে তালাক দিয়েছিল। ওরা নিশ্চয় ওকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়নি। জোর করে নিয়েছে। ওর দ্বিতীয় স্বামী কামেল মোহাম্মদের কাছ থেকে জানা যায়, গাঁয়ের লোক জুটিয়ে ছুতোনাতা মিথ্যে অজুহাত বানিয়ে জোর করে তালাক-নামায় সই করিয়ে নিয়েছিল। তিনি দরকার হলে সাক্ষী দিতে রাজি আছেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে আমার মক্কেল।"

"অর্থাৎ ফন্দিটা বুঝতে পারছেন...মেয়েকে ভাড়া খাটানোর এক চমৎকার তরকি...উপায়...সোজা খান্‌কি-নিকেতনে মানে বেশ্যাবাড়ি না পাঠিয়ে এই ফিকিরে অনেক কিছু রক্ষা করা যায়...মান ইজ্জৎ বাঁচল, সামাজিকতা, বিশ্বাস, ঈমান রক্ষা পেল...আর রক্ষা পেল পাকস্থলী...এক কথায় পেট (উকিল নিজের পেটে টোকা দেন) বেশ তরীবতের সঙ্গে বেঁচে গেল"।

আমি তখন কী ভাবে সোজা স্থির দাঁড়িয়েছিলাম, বলতে পারব না। মুবারক-কে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। সে আমাকে তালাক দিতে পারে না। কারণ, অক্ষম। আমি কী ওকে তালাক দিতে পারি? না। দুনিয়ায় সম্ভব অসম্ভব— দুটো শব্দ আছে।

মামলার আরো দিন পড়তে পারত। কিন্তু মাঝ-বয়সী এক হাকিম বেশি গড়াতে দিলেন না। তিনি দুই পক্ষের উকিলদের ডেকে নিয়ে গেলেন তার এজলাসের পেছনে যে-ঘর আছে সেখানে। আমাকে আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি।

হাকিমই বলে গেলেন, "মা, তুমি এখন নিজের সীটে গিয়ে বসো।" পাশেই বাপ। তিনি ফিস্‌ফিস্ আমার কানে মুখ দিয়ে কী বললেন, তা বুঝা দায়। এক-আধ শব্দ থেকে অনুমান করা যায়, এই ক'দিন ধরে যে বুলি আমাকে মুখস্থ করিয়েছেন— তারই আবার বয়ান। পাশে বাপের উকিল থাকার কথা। তিনি তখন হাকিম সাহেবের সঙ্গে। আদালতে আমি একমাত্র মেয়ে আর সব বেটাছেলে। জোড়া-জোড়া চোখ আমার দিকে ধেয়ে আসে। আমি ওদের দেখতে পাই। নেকাবের ফাঁক খুব অসুবিধা করতে পারে না। হঠাৎ আমার ভয় ধরেছিল সেদিন। কী বলতে কী বলে ফেলি। বাপ ত আমার দিকে চেয়ে আছেন সর্বক্ষণ। আমার কথার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। একদিন তার কথার উপর আমি বাঁচতাম বা মরতাম। কেন জানি না, সেদিন বেশ মজা পাচ্ছিলাম।

দুনিয়ায় চাকা ঘোরে আর এই ভাবে ঘোরে।

এজলাস থেকে হাকিম ও দুই পক্ষের উকিল বেরিয়ে এলেন। এবার আদালত চালু হবে। আমার শরীর টান-টান। বলির আগে পাঁটার গলার শিরা নাকি এমন হয়। বইয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আদালত শুরু হয় না। হাকিম সাহেব বললেন সোজা আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে, "আমাদের কথা শেষ হয়েছে। এবার আসল কথা শেষ হওয়া দরকার। আমি বলছি, ফরিয়াদি মুবারক খান এবং প্রতিবাদী লালুবানু তোমরা নিজেরা ঠিক করে নাও এই মামলার কী বিচার হওয়া উচিত। তোমরা আমার ভেতরের কামরায় যাও। পনের মিনিট সময় দিলাম। টেবিল কলিং বেল বাজলে বুঝবে, তোমাদের সময় শেষ। বোঝাপড়া করে নাও। তোমরা কী বোঝাপড়া করলে, আমি তা নিজ কানে শুনতে চাই।"

আমার ত হোঁচট খেয়ে পড়ার দশা। বিচারের এ কি রীতি? একজন পুলিশ এসে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যায়। পেছনে মুবারক। প্রায় দেড় মাস পরে দেখা। আমরা কেউ স্থির থাকতে পারিনি। একে অপরের বুকে বাঁধা পেরথমে, কথা বলার তাগদ উবে নিয়েছিল। মুবারক মরদ মানুষ। তারও চোখে পানি। ঠোঁটগুলোর কথা বলার কাজে কোন আগ্রহ ছিল না। ওদিকে কখন ঘণ্টা বেজে যায়, সে ভয় আছে। মুরুব্বি মানুষের সামনে কোন বেয়াদবি অশোভন।

হাকিমকে বড় দরদী মনে হল। পনর মিনিট পরেই ঘণ্টা বাজল। তিনি এলেন। খোলাখুলি আমাদের তিন জনের মধ্যে প্রায় আধ-ঘণ্টা কথাবার্তা চলেছিল সেদিন। তারপর আমাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি এজলাসে এসেছিলেন।

শুরুতেই তিনি বললেন, "আজ বেশি সওয়াল জওয়াবের দরকার নেই। ফরিয়াদি প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কথা আশি শুনেছি। এখন আমি বেগম লালবানুকে একটি প্রশ্ন করব। তার ফলাফলই হবে আমার রায়। আর লম্বা রায় লেখার কোন দরকার হবে না।"

তারপর হাকিম সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বেগম লালবানু, তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যেতে চাও, না তোমার বাবার সঙ্গে?"

আমি স্তব্ধ। কী জবাব দেব? জবাব ত আমার দেওয়া আছে। আবার এত লোকের সামনে কেন এই প্রশ্ন?"

"জবাব দাও।"

"আমি...।"

"কী আমি...?"

"আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যেতে চাই, হুজুর।"

"বেশ, বেশ। মুবারক খান, আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এজলাস থেকে আপনার যেখানে খুশি যান। আমার রায় ইচ্ছা করলে শুনতে পারেন। তবে প্রয়োজন হবে না। খুব সংক্ষিপ্ত রায়। আর তা শোনার জন্যে উভয় পক্ষের উকিল ত আছেই। মুবারক খান—।"

হাকিম মৃদু হাঁক দেন এবং বলেন, "মুবারক মিয়া, আপনার স্ত্রীকে কাঠগড়া থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

এই সময় আনমনা আমি নেকাবের জানালা তুলে চারিদিকে তাকাই। আমার সারা মুখ খোলা। চোখ ত বটেই। কী করে যে আমার লাজ-লজ্জা-শরমের মাথা আমি খেয়ে বসেছিলাম, বলতে পারব না।

এজলাসের বাইরে এলাম আমরা।

মুবারক আগে-আগে পথ দেখায়। আমি তার পিছু পিছু। কারো দিকে আর তাকাই না।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল বুড়ি বুয়ার কথা। তিনি যেন পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যখন আমরা হেঁটে চলেছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ওসমান
সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ॥ জানুয়ারি, ১৯১৭। পাড়া মেহেদী মহল্লা। গ্রাম : সবলসিংহপুর। থানা : খানাকুল। মহকুমা : আরামবাগ। জেলা : হুগলী। রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ। রাষ্ট্র : ভারতবর্ষ।

পিতা ॥ শেখ মহম্মদ এহিয়া। মাতা : গুলেজান বেগম।
শওকত ওসমান সাহিত্য ক্ষেত্রের ছদ্মনাম। আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান।

শিক্ষা ॥ প্রথমে মক্তব, সবলসিংহপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা এবং পরে ১৯২৯-এ কলকাতা মাদ্রাসা-এ আলিয়ায় ভর্তি হন সপ্তম শ্রেণীতে। নবম শ্রেণীতে এ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখায় স্থানান্তর। ১৯৩৩-এ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস। ভর্তি হন অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স ক্লাসে। ১৯৩৯ সালে বি.এ. পাস। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ.।

AMARBOI.COM

পেশা ॥ ১৯৪১-এ কলকাতায় গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজে প্রভাষকের পদে যোগদান। ১৯৪৭-এ দেশ-বিভাগের সময় অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করেই পূর্ববঙ্গে অপশন দিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে যোগদান। ১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজে বদলি হন। ১৯৭০ সনে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭২ সালে ১ এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর নেন, যাতে পূর্ণকালীন সাহিত্য-চর্চা করতে পারেন। চট্টগ্রামে বসবাস করতেন ৩৪ বি চন্দনপুরায় এবং ঢাকায় নিজ বাসগৃহে ৭ এ মোমেনবাগ, ঢাকা ১২১৭ ঠিকানায়।

পরিবার ॥ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের জনাব শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৩৮ সালের ৬ মে। জ্যেষ্ঠপুত্র বুলবন ওসমান, দ্বিতীয় পুত্র আসফাক ওসমান, তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস ওসমান, চতুর্থ পুত্র মরহুম তুরহান ওসমান, কন্যা আনফিসা আসগার, কনিষ্ঠ পুত্র জাঁ-নেসার ওসমান, সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা মরহুমা শারমনি ওসমান।

বিদেশ ভ্রমণ ॥ পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক, ইরান, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স।

পুরস্কার ॥ ১৯৬২ সালে আদমজী, ১৯৬৬ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭ প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরমেন্স পদক, ১৯৮৩ একুশে পদক, ১৯৮৬ নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক, ১৯৮৮ মুক্তধারা পুরস্কার, ১৯৯৬ মাহবুব উল্লাহ ফাউন্ডেশন পদক, ১৯৮৯ ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯১ টেনাশিস্ পুরস্কার এবং ১৯৯৭ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার।

মৃত্যু ॥ সকাল ৭.৪০ মিনিট, ১৪ মে ১৯৯৮, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা।

সাহিত্য-কর্ম

উপন্যাস ॥ বণি আদম ১৯৪৬, জননী ১৯৫৮, ক্রীতদাসের হাসি ১৯৬২, চৌরসন্ধি ১৯৬৬, সমাগম ১৯৬৮, রাজা উপাখ্যান ১৯৭০, জাহান্নম হইতে বিদায় ১৯৭১, দুই সৈনিক ১৯৭৩, নেকড়ে অরণ্য ১৯৭৩, জলাংগী ১৯৭৪, রাজসাক্ষী ১৯৮৩, পতঙ্গ পিঞ্জর ১৯৮৩, আর্তনাদ ১৯৮৫, পিতৃপুরুষের পাপ ১৯৮৬, রাজপুরুষ ১৯৯২।

ছোটগল্প ॥ পিঁজরাপোল ১৯৫০, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প ১৯৫২, সাবেক কাহিনী ১৯৫৩, প্রস্তর ফলক ১৯৬৪, উভশৃঙ্গ ১৯৬৮, তিন মীর্জা ১৯৮৬, মনিব ও তাহার কুকুর ১৯৮৬, পুরাতন খঞ্জর ১৯৮৭, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৯০, হস্তান্তর ১৯৯১।

কাব্যগ্রন্থ ॥ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত ১৯৮২, শেখের সম্বরা ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৯২।

নাটক ॥ তস্কর লস্কর ১৯৪৪, বগদাদের কবি ১৯৫০, আমলার মামলা ১৯৫২, কাঁকরমনি ১৯৫২, জন্ম-জন্মান্তর ১৯৬০, নষ্টতান অষ্টভান ১৯৮৬, তিনটি ছোট নাটক ১৯৮৯।

শিশু-সাহিত্য ॥ ওটেন সাহেবের বাংলো ১৯৪৪, তারা দুইজন ১৯৫৪, মশফোন ১৯৫৭, ডিগবাজী ১৯৬৪, এতিমখানা ১৯৬৪, প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প ১৯৬৯, জুজুগগা ১৯৬৯, ক্ষুদে সোস্যালিস্ট (মুজিব নগরের সাবু) ১৯৭৩, ছোটদের নানা গল্প ১৯৮২, ছোটদের কথা রচনার কথা ১৯৮৩, পঞ্চসঙ্গী ১৯৮৭।

প্রবন্ধ ॥ সমুদ্র নদী সমর্পিত ১৯৭৩, ভাব-ভাষা-ভাবনা ১৯৭৪, ইতিহাসে বিস্তারিত ১৯৮৫, সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই ১৯৮৬, মুসলমান মানসের রূপান্তর ১৯৮৬, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা ১৯৯০, উপদেশ-কুপদেশ ১৯৯১।

আত্ম-জীবনীমূলক রচনা ॥ স্বজন স্বগ্রাম ১৯৮৬, কালরাত্রি খণ্ডচিত্র ১৯৮৬, মন্তব্য মৃগয়া ১৯৯০, অনেক কথন ১৯৯১, গুডবাই জাস্টিস মাসুদ ১৯৯৩, স্মৃতিখণ্ড : মুজিবনগর ১৯৯৩, উত্তরপর্ব : মুজিবনগর ১৯৯৪, অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ ১৯৯৪, সোদরের খোঁজে স্বদেশের সন্ধানে ১৯৯৫, পোর্ট্রেট গ্যালারি ১৯৯৬, আর এক ধারাভাষ্য ১৯৯৬।

অন্যান্য রচনা ॥ হপ্তম পঞ্চম ১৯৫৪, সম্পাদনা : ফজলুল হকের গল্প-প্রতিভা প্রজ্বলিত নিমেষে নির্বাসিত ১৯৮৩, সমালোচনা : Eyeless in the urn by Sanjib Datta ১৯৮৩।

অনুবাদ ॥ নিশো (উপন্যাস) ১৯৪৮-৪৯, টাইম মেশিন ১৯৫৯, পাঁচ কাহিনী (লিও টলস্টয়) ১৯৫৯, স্পেনের ছোটগল্প ১৯৬৫, পাঁচটি নাটক (মলিয়র) ১৯৭৮, ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা (নাটক) ১৯৭৩, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ ১৯৮৫, সন্তানের স্বীকারোক্তি (অমৃতা পৃতম) ১৯৮৫।

ইংরেজিতে অনূদিত ॥ Janani (জননী), State Witness (রাজসাক্ষী), Laughter of Slave (ক্রীতদাসের হাসি), God's Adversary and Other Stories (ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী), Bankajol (জলাংগী)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~